ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৯ | ১ম সংখ্যা

বাংলার সাবান শিল্পের ইতিহাস

আমাদের দেশে প্রথমে North West Soap Factory হয় যাহা এখনও চলিতেছে ও যাহার সাবান পশ্চিম অঞ্চলে বহু প্রচলিত। সাবানের কার্য্যে এত লাভ যে ইংলণ্ডের Sunlight Soap Factoryর মালিক Lever Brothers ইহা খরিদ করিয়া এই দেশে সাবানের ব্যবসা চালাইতেছেন।

অনেকে বলিবেন যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে অনেক সাবানের কারখানা হইয়াছিল; এই কারবার চলে না। আমি বলি—১৯০৩ সালে Bengal Soap Factory হয়। তাহার Toilet সাবান বাজারে খুব চলে। Management লইয়া ঝগড়াতেই এই কারখানাটী নষ্ট হয়। তাহার পর Oriental Soap Factory হয়। সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রমথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ১০০০০৲ টাকা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের হস্তে নষ্ট হয় ও কারবারটী উঠিয়া যায়। এই Factoryর Transparent Soapএর বাজারে খুব সুনাম হইয়াছিল। তাহার পর ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের National Soap Factory প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সাবান খুব ভাল হইয়াছিল।

আমাদের দেশে honest expert Manager পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার। শুনা যায় স্যার নীলরতনের স্বদেশী কল কারখানা ও ব্যবসায়ে উন্নতির উদ্যম তাহাদের হস্তে নষ্ট হইয়াছে। শেষে Calcutta Soap Works Ltd হয়। ইহাদের নির্ম্মলীন সাবান প্রসিদ্ধ। Sunlight Soapএর অপেক্ষা কোন ক্রমে নিকৃষ্ট হয় নাই। যদি এই Factoryটী চলিত Sunlight Soapকে এই দেশ হইতে পাততাড়ি গুড়াইতে হইত। ইহাদের বাঙ্গালী পল্টন

সাবানেরও বেশ কাট্‌তি ছিল। দুঃখের বিষয় আমাদের কোন Factory চালাইলে তাহাতে প্রথমে Raw Materials চুরি হয়, তাহার পরে Finished Pro.lucts চুরি হয়।

এদিকে বাজারে ধারে মাল বিক্রয় করিতে হয়। যদি Factory চালাইতে চাহেন ও পড়তা কম করিতে চাহেন—মাল তৈয়ার করিয়া যাইতে হইবে। কারখানা বসাইয়া রাখিলে লোকসান; মজুরেরা টিকিয়া থাকে না।

কম মাল প্রস্তুত করিলে বেশী খরচ পড়িয়া যায়। দাম সস্তা করিতে হইলে ঘরে তৈয়ারী মাল বসাইয়া রাখিতে হয় না। মাল কাট্‌তি করিতে চাহিলে ধারে বাজারে মাল ছাড়িতে হয়। মাল ধারে ছাড়িলে বাজারের দোকানদারগণ আর মালের দাম দিতে হইবে মনে করেন না। তাগাদা করিলে ২০।২৫৲ ভিক্ষা স্বরূপ দেন। এইরূপভাবে টাকার সরবরাহ হইতে থাকিলে কারবারে যত মূলধন থাকুক, কালে কারবারগুলি টাকা অভাবে অচল হইয়া পড়ে। এইরূপে বাজারে ৮০০০০৲ লহনার দরুণ কলিকাতা সোপ্‌ কোম্পানীকে মূলধন অভাবে Liquidation যাইতে হইয়া ছিল। Imperial Bank of India এই সাবানের কারখানাকে দেড় লক্ষ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। এই দেশী কারখানাকে সাহায্য করিতে যাইয়া Imperial Bank প্রায় লক্ষ টাকা লোকসান দিয়াছে।

আমরা প্রায় অনুযোগ করি যে ব্যাঙ্করা আমাদের দেশী ব্যবসায়ে সাহায্য করে না। এই রূপ লোকসান দিবার জন্য তাহারা কেন সাহায্য করিবে?

প্রথমতঃ আমাদের ব্যবসা চালাইবার সম্যক জ্ঞান নাই। ভাল রকম কোন ব্যবসা না জানিয়া হঠাৎ কোন ব্যবসা করিতে আরম্ভ করি। শেষে মূলধনের অভাব হয়। কারবার চালাইতে পারা যায় না। আমাদের expertরা One man Show করেন। তাঁহারা কোন কার্য্য কাহাকেও শিক্ষা দেন না, পাছে তাঁহাদের কদর কমিয়া যায়। ফলে দাঁড়ায় expert-এর মৃত্যুতে বা অনুপস্থিতে বা বদমাইসিতে কারবার অচল হইয়া যায়।

তাহার পর honest লোকের অভাব। দেশের কয়জন লোক বড় গলা করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি তাঁহার কারবারের মূলধন তাঁহার অংশীদার বা কর্ম্মচারীগণের নিকট ফেরত পাইয়াছেন? এই জন্যই বাঙ্গালার সমস্ত ব্যবসা একে একে মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের হাতে গিয়াছে। মাড়োযারী ধনীরা সুদূর বিকানীরে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের ১০০৲ বেতনের নায়েব গোমস্তারাই তাঁহাদের ক্রোর ক্রোর টাকা খাটাইতেছেন।

মাড়োয়ারীরা তাহাদের ধনী বা মহাজনকে মারে না—দেউলিয়া হইয়া বাজার মারে। অধিকাংশ স্থলেই অংশীদারেরা বা Dishonest Expertরা নিজে মালিক হইয়া সেইরূপ কারবার করিবার মননে বা ইচ্ছাতে ধনীর কারবারটী উচ্ছন্ন দেন। যতদিন না বাঙ্গালী জাতির এই Moral sense হইবে যে সৎ পথে থাকিলে দ্বিপ্রহর রাত্রেও একমুঠা অন্ন জুটিবে ততদিন এই জাতির উন্নতি নাই।

আমার মতে এই dishonesty বা অসাধুতার কারণ হইতেছে অভাব। এই অভাব আমরা নিজেরাই বাল্যবিবাহের দ্বারা সৃজন করি। ধরুন একজন যুবকের পিতা হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁহার উপর তাঁহার বিধবা মাতা, ভগিনী,

ছোট ছোট ভ্রাতা, নিজের স্ত্রী ও দুই একটী পুত্র কন্যার ভরণ পোষণের ভার পড়িল। তিনি যে বেতন বা কারবারে লভ্যের অংশ পান তাহাতে তাঁহার সংসার খরচ সঙ্কুলন হয় না। তখন তিনি অগত্যা বাধ্য হইয়া অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন ও শেষে মনিবের টাকা ভাঙ্গিয়া বসেন। অতএব বাঙ্গালী যুবকেরা যেন Self Supporting না হইয়া অল্প বয়সে বিবাহ না করেন।

হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করিয়া যে কোন ব্যবসাতে নিযুক্ত হইলে পরিশ্রম করিলে, সৎপথে থাকিলে, কালে নিশ্চয়ই উন্নতি হইবে। Examples are better than Precepts —ইংরাজীতে চলিত কথা আছে। সাবানের বিষয় লিখিতেছি অতএব সাবানের ব্যবসায়ে উন্নতির জলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে দিতেছি; আশা করি প্রত্যেক সহরে জেলার Head Quarterএ আমাদের B. Sc. M. Sc. শিক্ষিত যুবকেরা চাকরীর আশা ছাড়িয়া সাবানের বা অন্য কোন জিনিষের কারখানা করিবেন। পরের চাকরী করিয়া সময়, ক্ষমতা ও অর্থ (time, Money and energy) নষ্ট করেন কেন? আজকালকার চাকরীতে ১০০।১৫০ টাকায় বেতন শেষ। কিন্তু ব্যবসাতে তাহার অনেক বেশী উন্নতি হইবে।

ধোবী বা কাপড় কাচা সাবানের কারখানা প্রথমে স্বর্গীয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ভ্রাতা বাবু রাজেন্দ্রনাথ শীল, কলিকাতাতে স্থাপন করেন। তাঁহার মতন কাপড় কাচা ধোপার সাবান (Dhobie Soap যাহাকে বলে) কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাবান বাজারে সর্ব্বোচ্চ দরে বিক্রী হইত। তিনি মণপ্রতি অন্ততঃ এক টাকা বেশী দর পাইতেন। এই সাবানে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিয়াছেন। ইঁহার দেখাদেখি কলিকাতার পূর্ব্বে বাগমারীতে মুসলমানেরা অন্ততঃ এক শতটী ধোবী বা কাপড় কাচা, সাবানের কারখানা করিয়াছে। মুসলমানেরাই কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করা ও তাহার shaping করা ভাল শিখিয়াছে।

মুসলমানেরাই কাপড় কাচা সাবান সহরে ও পল্লীগ্রামে বেশী বেশী বিক্রয় করে। "দাসু" বলিয়া বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীর জনৈক কুলী ছিল; তিনি এরূপ সাবান প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন যে নিজে তিনটী কারখানা করিয়াছেন এবং এক্ষণে অন্ততঃ ৭।৮ লক্ষ টাকার মালিক।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—ঢাকার সাবান কারখানার মালিক জাপানী Takada। ইনি Bengal Soap Factoryর Stamping বিভাগে ১৫৲ টাকা বেতনের একজন চাকর ছিলেন। Japanese expert Koizcuni সাহেবের সাবান প্রস্তুত প্রণালী দেখিয়া সাবান তৈয়ারী করা নিজে নিজে শিক্ষা করেন। এক্ষণে নিজে ঢাকা সহরে একটী সাবানের কারখানা করিয়াছেন। ব্রাহ্মিকা বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে মোটর গাড়ী চাপিয়া কারবার চালাইতেছেন ও যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন।

এদেশে কোন ব্যক্তির পক্ষে একশত টাকা মাসিক আয় (বা Net Profit) বেশ decent income. যে কোন একজন শিক্ষিত সাবান প্রস্তুত কারক Boiled & cold process এ সাবান প্রস্তুত করিয়া সহজেই ইহা উপায় করিতে পারেন। এই কারখানার expert তিনি নিজেই হইবেন। এই সাবান খরিদ বিক্রী নিজের জিলাতে বা সহরে চলিবে, ইহাতে বিজ্ঞাপনের দরকার নাই, বা কাহাকেও কমিসন দিতে হইবে না।

স্বদেশী হুজুগের সময় কয়েকটী যুবককে খদ্দরের কাপড়, দেশী মোজা ও গেঞ্জী বিক্রয় করিতে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহারা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। শিক্ষিত যুবকেরা কি নিজের হাতের প্রস্তুত সাবান বাজারে ফিরি করিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন? নিজে সাবান বিক্রী করিলে সাবানের defect গুলি শুনিতে পাইবেন ও সেই দোষগুলি সারিয়া দিলেই বেশী পরিমাণে সাবান বিক্রয় হইবে ও চাহিদা বাড়িয়া যাইবে।

আমাদের দেশের যুবকেরা পরিশ্রমী নহে; বড়ই শ্রমকাতর। B. Sc. M. Sc. পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরা ২৫।৩০ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য লালায়িত না হইয়া, সহরে সহরে জেলায় জেলায় ছোট ছোট সাবানের কারখানা প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

আমাদের দেশে সাবানের ব্যবসা যে প্রতি সহরে ও প্রতি জেলাতে বিস্তৃত ভাবে চলিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য লিখিতেছি যে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ২০০০০ টন গায়েমাখা ও Sunlight এর ন্যায় কাপড় কাচা সাবান বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানী হয় ও দেশে প্রায় ২৪০০০ টন সাবান প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া দেশী "ধোবী" (সাধারণ কাপড় কাচা সাবানকে ধোবী

সাবান বলে) যে কত প্রস্তুত হয় তাহার পরিমাণ (Figures) কোন Statistical record হইতে পাওয়া যায় না, কারণ বহু ছোট ছোট সাবানের কারখানা আছে ; তাহারা কত মাল তৈয়ার করে তাহার Figures গবর্ণমেণ্টের পাইবার সুযোগ নাই। উপরোক্ত বিদেশী সাবানের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ টয়লেট সাবান যাহার দাম duty (শুল্ক) বাদে আমরা ৫৭৲ হইতে ৬০৲ দিই।

১৯১৯ সালের authoritative figures of productionএ দেখা যায় যে সুদূর ব্রহ্মদেশেও ৯০০০ টন সাবান প্রস্তুত হয়। তাহার পর বঙ্গদেশে ৭০০০ টন। মান্দ্রাজে ৫০০টন যাহা এক্ষণে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে ৩৬৬০ টন। সিন্ধুদেশে ২২৩০ টন। পাঞ্জাবে কেবলমাত্র ৬৪ টন। দিল্লীতে ১৫ ০ টন। যুক্তপ্রদেশে ৫২০ টন। মধ্যদেশে ২৬৪ টন।

ভারতের স্বাভাবিক সুবিধা :—

বিদেশ হইতে আমাদের দেশে সাবান তৈয়ারী করিবার নিম্নলিখিত সুবিধা আছে।

১। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সাবান তৈয়ারীর উপযোগী নিম্নলিখিত তৈল ও চর্ব্বি কারখানার নিকটেই পাওয়া যায়।

(১) নারিকেল তৈল (Fine and inferior qualities)

(2) বাদামের তৈল (Ground-nut oil)

(3) Maroli oil

(4) Pooname oil

(5) Mohrah oil

(6) Pougacu oil

(7) Punna oil

(8) Castor oil বা রেড়ীর তৈল

(9) Dupafat

(10) Tallow বা চর্ব্বি (Mutton, beef, buffalo)

(11) Rosin or colophony বা রজন।

(12) Fish Oil Stearine (Sardnia Oil) Stearine for Saddle Soaps,

(13) Cotton seed oil (তুলার বীজের তৈল)

(14 Kokum Butters (Mango stein butter)

(15) Mohrah fat বা মহুয়ার তেল

(16) Sardine oil

(17) Shark liver oil বা হাঙ্গরের তেল

(18) Linseed oil বা তিসির তৈল।

(19) Safflowers seed oil

(20) Poppy seed oil বা পোস্তের তৈল।

(21) Niger seed oil

(22) Rapeseed oil রাই সরিষার তৈল।

এ দেশে কেবল Palm oil অর্থাৎ তাল জাতীয় বৃক্ষ হইতে নিস্কাষিত তৈল কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণাংশে সমুদ্রোপকূলে কতক পরিমাণে Palm oil পাওয়া যায়।

(২) উপরোক্ত তৈলগুলির মধ্যে প্রধানত: নারিকেল তৈল ব্যবহারে শীঘ্র, সহজ প্রণালীতে, ও সস্তায় সাবান প্রস্তুত করা যায় এবং সে সাবানের চাহিদা সকল সময়েই আছে।

৩। এই দেশে মজুরী, জমির দর এবং এক তালা কাঁচা বা পাকা কারখানা প্রস্তুতের খরচ খুব কম।

৪। অন্ত দেশের তুলনায় সাবানের

কারখানার উপর ট্যাক্স, Municipal areaর বাহিরে খুব কম।

৫। এখানকার সাবান বিক্রীর বাজার—কারখানাও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামে বা সহরেই আছে। ইহার জন্য রেল ভাড়া, প্যাকিং, রপ্তানী খরচ (export Charges) বিদেশী সাবানের মত লাগে না।

৬। বিদেশী সাবানের উপর ৭২% শুল্ক আছে। অন্ততঃ এই ৭৷৷০%ও লাভ হইবে নিশ্চয়।

৭। আমাদের দেশের কারখানাওয়ালারা খরিদ্দারের ইচ্ছামত মাল মসল্লা দিয়া অর্থাৎ চর্ব্বি না দিয়াও সাবান প্রস্তুত করিতে পারেন। খরিদ্দারকে hard এবং brakish waterএর অর্থাৎ সমুদ্রের ফেনাযুক্ত লবনাক্ত জলের উপযোগী সাবান করিয়া দিতে পারেন। যেরূপ আকারের সাবান খরিদ্দার চাহে, সেই আকারের করিয়া দিতে পারেন। গন্ধ যেরূপ চাহেন তাহা করিয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ বিদেশী সাবানে শুকর ও গরুর চর্ব্বি থাকে। আমরা উপরোক্ত উদ্ভিদ তৈলের সাবান দিতে পারি

৮। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের দ্বারায় দেশের নানাস্থানে অসংখ্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হইতে পারে, যাঁহারা খুব কম দরে বেশী কাটতি করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারেন।

৯। এ দেশীয় মৎস্যের তৈল যাহা সাবান প্রস্তুতে দরকার তাহা Crude বা Hardened অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে এবং অন্য দেশ অপেক্ষা সস্তা দরে পাওয়া যায়।

১০। জ্বালানী কাঠের ও কয়লার দাম এদেশে অন্য দেশ হইতে সস্তা।

১১। আমাদের দেশের তাপ (Natural temperature) অন্য দেশ হইতে সুবিধাজনক। অপর দেশের জল খুব ঠাণ্ডা, তাহা ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে হয়। আমাদের দেশে অত্যধিক তাপের জন্য সাবান শুকাইবার খুব সুবিধা আছে। Glycerine তৈয়ার করিবার জন্য Spent lye evaporate সহজেই হয়।

১২। আমাদের দেশের লোকেরা চর্ব্বিবিহীন সুগন্ধযুক্ত গায়ে মাখা সাবান খুব ভালবাসেন। আমাদের দেশের যে কয়েকটী কারখানাওয়ালা গায়ে মাখা সাবান করিতেন তাঁহারা এক বৎসরে কোটী সাবান (Cakes) প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিদেশ হইতে আনীত গায়ে মাখা সাবান ৩৩ কোটী লোকে কত ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। গায়ে মাখা সাবানের দর যাহা ৬০৲ হন্দর তাহার advalorem শুল্ক কত বেশী! আমাদের দেশে যত সস্তায় গন্ধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে সস্তায় নিম্নলিখিত গন্ধ তৈল পাওয়া যায়।

(১) Lemon grass oil
(২) Citronella oil
(৩) Sandal wood oil
(৪) Linalole oil
(৫) Vetivert (খস্‌খস্‌) oil
(৬) Eudalyptus oil
(৭) Eucalyptus citron scented oil
(৮) Thymol & Thymene oil
(৯) Winter Green oil
(১০) Ginger grass oil
(১১) Palmorose oil

আমাদের দেশে সাবানের কারখানা করিতে নিম্ন লিখিত অসুবিধা আছে।

১। আমাদের দেশে বিদেশের নানা রূপ চর্ব্বির ন্যায় সস্তাদরে Kitchen stuff, Melted fats, Bone fats, Bone grease, waste grease from ships, Railways, mines & Factories পাওয়া যায় না। Soap stock (mucilage) Low grade oil & foots from the great oil Presses, Hardened fish oil পাওয়া যায় না।

২। Caustic alkalies এদেশে প্রস্তুত হয় না; বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

৩। এদেশের factoryগুলি বিদেশের factory অপেক্ষা ছোট, সেই জন্য বিদেশের ন্যায় বৃহদাকারে সাবান প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় দ্রব্য (raw materials) আক্রা বা বেশী দরে কিনিতে হয়। বিদেশী কারখানাগুলির নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী সমস্ত raw materials সরবরাহের জন্য নিজেদের ষ্টীমার ও Plantation বা চাষ আছে।

৪। মূলধন অভাবে কারখানাগুলি দরের প্রতিযোগীতায় (competition in price) দাঁড়াইতে পারে না। বহুদিন ধরিয়া মাল প্রস্তুত করিয়া আটকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা নাই। কারখানাতে ৫টী কারণে মূলধনের আবশ্যক। প্রথম কলকারখানার জন্য; দ্বিতীয় raw materialsএর stock এর জন্য; তৃতীয় লোকের wages; ৪র্থ finished products বা তৈয়ারী মাল মজুত রাখা ও ৫ম বাজারে মাল চালাইবার খরচাদি।

*৫। বিদেশী কারখানাওয়ালারা নিজ নিজ ব্যবসার দরুণ Barrel বা পিপা, বাক্স Crates & card board boxes নিজেদের factoryতে তৈয়ার করে। তাহাদের নিজেদের Lithographic & color designers and printers on the large export scaleএ থাকে যাহাতে তাহাদের খরচা খুব কম পড়ে। এখানকার কারখানায় যাহাদের এই সকল তোড়জোড় আছে তাহাদের সংখ্যা নাম মাত্র। সব কারখানাওয়ালাদের এগুলি বাহির হইতে খরিদ করিতে হয়।

৬। Glycerine Recovery একটী অত্যন্ত লাভের জিনিষ। ইহা প্রস্তুত করার জন্য কল কারখানা স্থাপন করার ক্ষমতা অনেক দেশী কারখানার নাই। বেশী পরিমাণ সাবান না করিলে বেশী পরিমাণ glycerine পাওয়া যায় না। Glycerineএর দাম সাবান অপেক্ষা দ্বিগুণ ও ত্রিগুন। অতএব বিদেশী কারখানাওয়ালার glycerineএ লাভ করিয়া সাবান সস্তা দরে বিক্রী করিতে পারে। এখানে crude Glycerine কোন central Distilleryতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু কোন central distilleryই নাই।

৭। Rise in exchange :—বিলাতে ওখানকার টাকার দামের হার বৃদ্ধি বিনিময়ে বিদেশী সাবানের এক্ষণে সস্তায় বিক্রীর পড়তা হইতেছে।

৮। বিদেশে কারখানাওয়ালারা মাল তৈয়ার করিয়া Distributing houseএ দিলে মালের শতকরা ৮০ ভাগ দাম পাইয়া থাকে। সেইজন্য তত মূলধনের অভাব বোধ করে না। এখানে সেইরূপ কোন Distributing house নাই। কারখানা ওয়ালাদের মাল তৈয়ার ও বিক্রী উভয় কার্য্যেই টাকা সরবরাহ করিতে হয়।

আয় ব্যয় হিসাবে মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ২০৲ টাকা লাভ হয়। লাভ মাল প্রস্তুত ও কাটতির উপর নির্ভর করিতেছে। Japanese Processএ Soap একদিনে এক কড়া Toilet নামাইতে পারা যায়। English Processএ absolutely free from alkali করিতে ৮।৯ দিন লাগে। ধোবী সাবানও এক দিনে এক কড়া নামে। মাসে যত কড়া মাল প্রস্তুত করা ও কাটান যায়, লাভ ততই হয়। অতএব লাভের সীমা মাল বিক্রয়ের উপর নির্ভর করিতেছে।

আমি কয়েকটী সাবান প্রস্তুতের প্রণালী ও formulae পরবর্ত্তী মাসে দিব, যাহা অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের কতিপয় সাবানের কারখানা পূর্ব্বে সাফল্যলাভ করিয়াছিল ও তাহাদের প্রস্তুত সাবানের যথেষ্ট সুনামও হইয়াছিল।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেকার বাঙ্গালী

বাংলাদেশে বেকার সমস্যা যেরূপ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে ভারতের আর কোনও প্রদেশে সেরূপ দেখা যায় না। এখানে দেখা যায় যে কোনও আপিশে চাকুরী খালির বিজ্ঞাপন দিলে ২০ টাকা মাহিয়ানাতেও বহু গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েট সেই চাকুরীর জন্য লালায়িত হইয়া দরখাস্ত করে এবং সেই কর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য নানা সুপারিশ জোগাড় করিয়া বেড়ায়। অথচ সেই আপিশেই দরোয়ান এবং পিওনেরা ১৬ টাকা হইতে ২০ এবং ২৫ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকে। কলিকাতার গৃহস্থ বাড়ীতে যাহারা পাচক এবং চাকরের কাজ করে তাহাদের মাহিয়ানাও এই সকল শিক্ষিত যুবকদিগের মাহিয়ানার সমান এবং কোনও কোনও স্থলে বেশী। কলিকাতায় সাধারণতঃ উড়ে বামুনেরা ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা মাহিয়ানার কমে চাকুরী করে না। তাহার উপর খাওয়া, ধোপা, নাপিত এবং জল খাবারের পয়সা ফ্রী। কলিকাতায় একজন লোকের শুধু খাই খোরাকীর ব্যয় দশ টাকার কমে কদাচ হয় না।

তাহার উপর জল খাবারাদির ব্যয় ধরিলে দেখা যায় যে বামুনেরা মাসে ২৪।২৫ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পায়। চাকরের মাহিয়ানা ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা; তাহার উপর খোরাকী ও খাবারাদি আছে। সুতরাং তাহারাও মাসে ২০৲ টাকা হইতে ২৫ টাকা মাহিয়ানা উপার্জ্জন করে। মুটে, মজুর, পানওয়ালা, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি রোজ এক টাকা হইতে ১২।১২ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করে। সুতরাং তাহারাও মাসে ৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা পায়। আর শিক্ষিত গ্রাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েট বাঙ্গালী ১৫ টাকা হইতে সুরু করিয়া ২৫টাকার মধ্যে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়।

এই মর্ম্মভেদী দারুণ দুরবস্থা দূর করিতেই হইবে, নচেৎ বাঙ্গালীর আর রক্ষা নাই। শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার এবং কাল্‌চারে বাঙ্গালী ভারতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও কেন তাহার এই দুরবস্থা হইল তাহার মীমাংসা করিতেই হইবে। কিন্তু কোনও সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সমস্যাটা কি তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

চাকুরীর বাজারে যে আর স্থান নাই তাহার কোনও প্রমাণ প্রয়োগের দরকার করে না। যদি থাকিত তবে ২০।২৫ টাকা মাহিয়ানার জন্য শিক্ষিত যুবকেরা দ্বারে দ্বারে গিয়া ধন্না দিত না। Learned Professions যথা ওকালতী, মোক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি লাইনেও অভাব (demand) অপেক্ষা জোগানের (supply) সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় এসব লাইনেও মুষ্টিমের কয়েকজন ছাড়া আর সকলেরই অবস্থা দিন আনা দিন খাওয়ার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সকলেই নূতন রাস্তার সন্ধানে বাহির হইয়াছেন।

নূতন রাস্তার মধ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথাই আমরা আলোচনা করিব। বাংলাদেশে কৃষিকার্য্য বহু শতাব্দী হইতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের হাতে ন্যস্ত আছে। বাংলাদেশে চাষের উপযোগী যে জমি আছে লোকসংখ্যার অনুপাতে তাহাই ইহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; ইহার উপর যদি কয়েক লক্ষ শিক্ষিত বেকার জমির উপর ভাগ বসাইতে যায় তবে সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। তাহার উপর হাতে কলমে কাজ না করিতে পারিলে চাষে লাভ হয় না। চাষীরা স্ত্রী, পুত্র কন্যা সকলে মিলিয়া চাষের কাজ করে বলিয়া তাহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়। আর শিক্ষিত বাবুদের জমি চাষ হইতে সুরু করিয়া, জমি নিড়ানো, জল সেচা, শস্য কাটাই, মাড়াই প্রভৃতি সব কাজই লোক রাখিয়া করিতে হইবে। তাহাতে এক দিকে যেমন যথেষ্ট ব্যয় হয়, অপর দিকে তেমনি কাজেও অনেক ফাঁকি পড়ে। ফল, এই দাঁড়ায় যে বাবুদের কৃষি কাজে কোনও লাভ হয় না। তা'র পর বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে, সব ছেলেরাই ননীর পুতুল হইয়া বাহির হয়; সুতরাং তাহাদের পক্ষে চাষীদের মত গ্রীষ্মের "খরা" এবং বর্ষার ধারা সহ্য করিয়া চাষবাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আরও অনেক কারণ আছে, তবে মোটামুটী কয়েকটী কারণের এখানে উল্লেখ করা গেল।

তা'র পর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান করিতে গেলে কল, কব্জা, ও কারখানাদির জন্য যে টাকা লাগে —সে টাকা হাজারের মধ্যে একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং শিল্পের রাস্তাও বাঙ্গালীর পক্ষে সুগম নহে।

এইবার ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথা আলোচনা করা যাক। এই রাস্তার দিকে উঁকি মারিতেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই যে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ইহার সকল রাস্তার ঘাটী আগ্লাইয়া বসিয়া আছে। প্রথমে ধরা যাক কলুটোলা ষ্ট্রীটের কথা—এখানে শুধু দিল্লিওয়ালারা—(প্রধানতঃ দিল্লির মুসলমানগণ) আসিয়া কারবারের জন্য জড় হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নানারূপ মনোহারী দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবসায় ইহাদেরই হাতে; যথা—সস্তা আয়না, চিরুণী, ক্ষুর, সাবান, নানাবিধ এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, অয়েলম্যান ষ্টোর ইত্যাদি। এই প্রকার অনেক প্রয়োজনীয় এবং মনোহারী জিনিস-পত্র ইহাদের দোকানে বিক্রয় হয় এবং তাহার পাইকারি ও খুচরা বিক্রীতে ইহারা মোটা লাভ করিয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়—ইহাদের কারবারে বাঙ্গালী বাবুরা কেরাণী বা 'টাইপিষ্ট'এর কাজ করিতেছে কিন্তু বোধ হয় একজন বাঙ্গালীও প্রতিযোগী হইয়া দিল্লিওয়ালাদের মত দোকান চালাইতে রাজি নহে কিম্বা সক্ষম নহে।

'ম্যাচ্' বা দেশলাইর ব্যবসা ক্রমেই ভিন্ন দেশীয় লোকের হাতে চলিয়া যাইতেছে। 'ম্যাচ্' ফ্যাক্টরী অধিকাংশই বোম্বাই-ওয়ালারা চালাইতেছে এবং বিদেশ হইতেও 'ম্যাচ্' আমদানি করিতেছে।

কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর 'ড্রাইভার' ও 'কনডাক্টর' প্রায়ই অবাঙ্গালী—ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুস্থানি; নেপালী প্রভৃতি জাতিও স্বল্পাধিক পরিমাণ আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী এতদিন এ লাইনে মোটেই ছিল না, এখন দারুণ অন্ন সমস্যায় কেহ কেহ ঢুকিয়াছে। এমন কি বাংলার শিল্পী শ্রেণীর লোকেরাও ট্রাম গাড়ীর

ড্রাইভারের কাজ করিতে অপমান বোধ করিয়া থাকে।

কলিকাতার 'ট্যাক্সি' গাড়াগুলি শিখদের হাতে এক রকম চলিয়া গিয়াছে এবং অনেক ট্যাক্সির মালিক ড্রাইভারগণ আপনাদের নিজহস্তে চালিত ২।১ খানা গাড়ী দ্বারা সহরের চারিদিকে ঘুরিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। ইহা করিলে, উপযুক্ত জামিন দিয়া কোনো মোটর কোম্পানীর নিকট হইতে, যে কেহ একখানা গাড়ী hire purchase system (কিছু টাকা নগদ দিয়া বাকী মূল্য গাড়ী চালাইয়া উপার্জ্জন করার সঙ্গে সঙ্গে কিস্তি করিয়া পরিশোধ করার নিয়মকে 'হায়ার পারচেজ সিস্‌টেম্‌' বলে) এ কিনিতে পারে। এই প্রকারে যখন গাড়ীর মূল্যটা পরিশোধ হইয়া যায়, তখন যাহা কিছু উপার্জ্জন হয় সে সবই লাভের অঙ্কে যায়; শিখেরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থায় ট্যাক্সি খরিদ করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এত সুবিধা সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা এ কার্য্যের জন্য বড় অগ্রসর হয় না।

বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান এবং সূত্রধরের কাজেও খুব পটু; তথাপি চীনারা বহুদূর হইতে আসিয়া এখানে ছুতোরের কাজ করিয়া বেশ পয়সা কামাই করিতেছে—তাহারা আবার দুই চারিজন বাঙ্গালী কারিকর আপনাদের অধীনে রাখিয়া আজকালকার মোটর বাসের বাহিরের ঠাট (bodies for motor buses) তৈরি করিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন কোন বাঙ্গালীর পরিচালিত সম্ভ্রান্ত ছুতোরের কারখানা নাই, যে এই সকল কাজের 'কন্‌ট্রাক্ট' লইয়া আপনার কারখানাকে লাভবান করিতে পারে।

জুতার ব্যবসার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উৎকৃষ্ট বুট ও সাধারণ জুতা এবং মেয়েদের পায়ের নানা প্রকার সুন্দর মজবুত জুতা সকল বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে ও নিউ মার্কেটে চিনারা তৈরি করিতেছে। বাঙ্গালী এই লাভজনক ব্যবসাকে হেয় বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে। আজকাল কলেজ ষ্ট্রীটের মার্কেটে অল্প কয়েকখানা বাঙ্গালীর জুতার দোকান খুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ।

বাংলার পাটের কারবার ইউরোপীয়দের হাতেই রহিয়াছে—তাহার অধিকাংশ স্কটল্যাণ্ডের সাহেব, মাঝে মাঝে দুই চারিজন আরম্যানি সাহেবও আছে। সম্প্রতি বিরলারা এবং হাটখোলার শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়েরা পাটের কল খুলিয়াছেন বটে কিন্তু ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপীয়দিগের হাতে আছে। মাড়ওয়ারিরা সুদূর রাজপুতনা হইতে আসিয়াও বাংলার ২।১ জায়গায় পাটের কারবার স্থাপন করিয়া 'ডিভিডেণ্ট' পর্য্যন্ত দিতেছে। মাড়ওয়ারিরা পাটের ও এই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যবসায়ের সুপটু সেয়ারের দালাল; অবশ্য এ সমস্ত ব্যবসায়ে ঝুঁকি (speculation) থাকায় সেয়ার অগ্রিম বিক্রয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই ব্যবসায়ে ইউরোপীয় ও আরম্যানি সাহেবরাও আছে; কিন্তু দুঃখের কথা বাঙ্গালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। যদি কোন বাঙ্গালী ধনীকে কিছু টাকা কারবারে খাটাইবার জন্য অনুরোধ করা যায়, তবে তিনি প্রশ্নকারীকে হয় ত ভিন্ন পথ দেখাইয়া দিবেন। তাঁহারা টাকার যাহা সুদ পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট; প্রকৃত প্রস্তাবে কোন লাভবান কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ, কেন না তাহাতে লাভ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও ঝুঁকি বা risk অনেক আছে।

কাজেকাজেই যখন ক্ষমতাশালী ধনী বাঙ্গালীর নিকট হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের এতটুকু সাহায্য পাওয়া সম্ভব নহে, তখন ভদ্রলোক শ্রেণীর অধিকাংশ লোক যে অনশনে মরিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অনেক বাঙ্গালী যুবক আজকাল ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি ও জাপান প্রভৃতি দেশে নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার জন্য যায় সত্য, কিন্তু তাহারা যখন কোন একটা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে, তখন আপনার জাতভাই, ধনী বাঙ্গালীর কাছে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য পায় না বলিয়া তাহারা কল-কারখানা স্থাপন করিতে অসমর্থ হয়। ফলে বাধ্য হইয়া এ সকল শিক্ষিত যুবকেরা অবাঙ্গালী-পরিচালিত কোনো ফার্মে চাকুরী খুঁজিয়া মরে। চাকুরী পাওয়াও আজ কাল সহজ নহে; পাইলেও বিদেশী স্বত্বাধিকারী বাঙ্গালীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখান না এবং দেখাইতে ইচ্ছুকও নন।

কলিকাতার পান-বিড়িওয়ালারা মাথাপিছু গড়পড়তা ১ টাকা হইতে ১৷৷০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩০৲ টাকা থেকে ৪৫৲ টাকা অনায়াসে উপায় করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা কি ভীষণ শোচনীয় অবস্থা নহে যে গড়পড়তা বাঙ্গালী গ্রাজুয়েটের মাহিনা মাত্র ২৫৲ টাকা। কেবলমাত্র কাপড়,

ছাতা, জুতা ইত্যাদির দোকান করিলেও একজন লোক একজন বাঙ্গালী গ্রাজুয়েটের ডবল রোজগার করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল ছোট ছোট কারবার করিতে বাঙ্গালীর মান ইজ্জত যায় মনে করিয়া ইহা তাহাদের পছন্দ হয় না। অবশ্য এখন বাধ্য হইয়া কেহ কেহ এই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন।

যখন এতগুলি স্বর্ণপ্রসূ ব্যবসায়ের রাস্তা বাঙ্গালী অকুণ্ঠিত চিত্তে, স্বেচ্ছায় পরিহার করিতেছে, তখন কলিকাতার যথার্থ বেকার সমস্যাটা কি? অবশ্য অনুসন্ধিৎসু এখানে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন যে এই সমস্ত ব্যবসা চালাইতে মূলধন দরকার হয় না কি? কথা সত্য; তবে এইরূপ ছোটখাটো ব্যবসা চালাইবার মত সামান্য মূলধন বহু বেকার যুবকের আছে; কেবল আত্ম-সম্মানের এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এই সকল ছোটখাটো ব্যবসাকে অতীব হীন চক্ষে দেখে অথচ এই সকল ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত আছে, তাহারা অনায়াসে মাসে ৫০।৬০।৭০ টাকা রোজগার করিয়া থাকে।

অনিশ্চিত ব্যবসায়ের কথা শুনিলে সাধারণ বাঙ্গালী ধনীর মন আতঙ্কে শুকাইয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় "বাঙ্গালী ধনীরা মূলধন খাটাইতে চিরকাল নারাজ" ভারতের সর্ব্বত্র এই দুর্ণাম রটিয়াছে।

ব্যবসায়ে মূলধনের চিন্তা সকলের পরে করা দরকার—ইহাতে চাই—"সাহস ও অদম্য পরিশ্রম।" হেন্‌রি ফোর্ড ও টমাস্ এডিসন উপরোক্ত গুণের পরিচয় দিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর ভিতরও রাম-দুলাল সরকার, কৃষ্ণপান্তী, মতিশীল, বটকৃষ্ণ পাল ও স্যার রাজেন্দ্রনাথের নাম উপরোক্ত গুণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি কেহ ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে ও কি করিয়া তাহা চালাইতে হয়, তাহা ভাল করিয়া জানে, তখন মূলধনের অভাব হয় না।

আমরা চারিদিকেই গ্রাজুয়েটের বন্যা দেখিতেছি; ইঁহারা হাইকোর্টের বারেন্দা পর্য্যন্ত, জেলার দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত, পুলিশকোর্ট প্রভৃতি একেবারে ছাইয়া ফেলিয়া তীর্থের কাকের ন্যায়—মোকর্দ্দমার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছেন। ইহারা সকলেই পরগাছা জাতীয়। কারণ ইহারা নিজে কোনও অর্থ সৃষ্টি করেন না অপরের অর্জ্জিত অর্থ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া নিয়া দেশকে নিঃস্ব করে। সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও মূর্খতা'র উপরে ইহাদের জীবিকা নির্ভর করে। ইহারা নিজের পকেট ভর্ত্তি করার জন্য, পুরুষে পুরুষে ও স্ত্রীলোকে-স্ত্রীলোকে ঝগড়া বিবাদ বাধাইয়া দিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে। ডাক্তারদের কথা ধরিলেও আমরা দেখিতে পাই, প্রতি বৎসর আমাদের স্কুল-কলেজ হইতে এত ডাক্তার পাশ করিয়া নূতন বাহির হইতেছে যে কলিকাতা সহরে এত ডাক্তারের কোনো প্রয়োজন নাই। বাজারে হাজার গণ্ডা 'পেটেণ্ট' ঔষধ থাকিতে মরিবার সময় ছাড়া ডাক্তার ডাকার যে বাহুল্য খরচ তাহাই অনেকে বহন করিতে পারে না—অবশ্য মরিবার সময় ডাকাইয়া ফল কি? তাহাতে রোগীর বা ডাক্তারের কাহারো লাভ নাই। তথাপি আমাদের ডাক্তারবাবুরা সহরের (বিশেষতঃ কলিকাতার) রমণীয়তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া গ্রামে বা ক্ষুদ্র সহরে—যে সকল স্থানে হাজার হাজার লোক চিকিৎসার অভাবে

দিন রাত মরিতেছে, অথচ ডাক্তাদেরও দু পয়সা উপার্জ্জনের পন্থা আছে, সে সকল স্থানে যাইতে রাজি নহেন। কলিকাতায় অনেক ডাক্তার অর্দ্ধোপবাসী অবস্থায় দিন কাটাইতে রাজি আছেন, তবু পয়সা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা পাড়াগাঁয়ে যাইবেন না। ইঁহারা যদি কলিকাতায় তথাকথিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে যাইয়া ডাক্তারখানা দিয়া বসেন, তবে সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া কি দেশের প্রচুর উপকার করিতে পারেন না ?

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের যুবকদিগের মনে এমন একটা ভুয়া আশা মরীচিকার সৃজন করে যে তাহারা পিতামাতার দুঃখে অর্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করতঃ কলিকাতার রাজপ্রাসাদ তুল্য, ইলেকৃটিক লাইট্-ফ্যানযুক্ত কলেজ হোষ্টেলে বাস করিয়া ইউনির্ভার্সিটির ডিগ্রি পাইলেই তাহারা এক এক জন হোমরা-চোমরা উকীল বা ডাক্তার হইয়া বিস্তর টাকা উপায় করিতে পারিবে মনে করে। তাহারা সকলেই ভাবে যে তাহারা একদিন হাইকোর্টের জজ এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারেল, বা আই, এম, এছ, হইবে, এবং এই গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া দেশের যুবকেরা কেবল এই আশা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটীয়া নিজেদের সকল শক্তি ক্ষয় করিতেছে। অথচ ইহারা যদি একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারে যে হাজারের মধ্যে দুই একজনের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলেও বাকী সকল যুবককেই উদরান্নের জন্য অন্য কোনও পথ অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু বাধ্য হইয়া যখন তাহারা এইরূপ কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিতে আসে তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে এই বৃত্তি তাহাদের ধাতে পোষাইবে না; এইরূপে হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকের ব্যর্থতার ফলে জাতীয় জীবনের যে দারুণ অপব্যয় হইতেছে, তাহাতে বাধা দেওয়ার কেহ নাই বলিয়া এই অপব্যয়ের 'ড্রেণ' অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছে। ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমাদের যুবকেরা কলিকাতার প্রসাদতুল্য হোষ্টেলের বড় বড় কামরায় বাস করিয়া, কলেজের প্রকাণ্ড আলো-বাতাস যুক্ত কামরায় ক্লাশে বসিয়া এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে অসামান্য সুখ-সুবিধা উপভোগ করিয়া যখন তাহাদের গরীব পিতামাতার গ্রামস্থ পর্ণকুটীরে ফিরিয়া যায়, তখন আর তথায় তাহাদের মন টিকে না। তাহারা তাহাদের পল্লীগৃহের আকর্ষণ শূণ্য আবেষ্টন ত্যাগ করিয়া যৎসামান্য আয় দ্বারাও সহরের গলিঘুচিতে আশ্রয় লয়। ইহার প্রধান কারণ তাহাদের পৈত্রিক গ্রামে তাহারা যে সুখ সুবিধা চায় তাহা পাইতে পারে না; আর কলি-কাতায় থাকিলে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, নাচ, তামাসা, ও সাফ পোষাক, ট্রাম জল ইত্যাদি হাজার গণ্ডা ফতো বাবুগিরির যে সুবিধা পাওয়া যায়, পাড়াগাঁয়ে তাহার নামগন্ধও নাই। শিক্ষার ব্যাপদেশে গরীব পিতা মাত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আপনার সন্তানকে কলিকাতায় রাখিয়া, তাহার যে 'ঘোড়ারোগ' ধরাইয়া দেন, তাহাতে চিরদিনের তরে সে বিগড়াইয়া যায়; এই কারণেই প্রধানতঃ বাংলাদেশের গ্রাম সকল দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে এবং ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধিতে ধ্বংসোম্মুখ হইয়া পড়িতেছে; সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় কলিকাতা বা তাহার উপকণ্ঠে অথবা অন্য কোন সহরে আসিয়া বস-বাস করিতেছে— আর গ্রামে যাহারা থাকে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য

বলিলেই চলে। অবশ্য কতক লোক যে স্বীয় উন্নতি ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য সহরে বাস করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

যে সকল লোক হয়ত নানারূপ কাজ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত তাহারা সহরে আসিয়া নানারূপ আফিসে যৎসামান্য মাহিনায় কেরাণীগিরি করিতেছে; অথচ ঐ সামান্য মাহিনায় তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করাই অসম্ভব ব্যাপার!

এই যে হাজারে হাজারে ছেলের দল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে মেষপালের মত ছুটিতেছে, আর পতঙ্গের আগুণে ছুটিয়া পড়ার মত ছাত্রের দল ডিগ্রীলাভের উন্মাদনা দেখাইতেছে, ইহা 'চেক্' করিতে হইবে। এই সকল যুবকের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় 'সেক্সপিয়র', 'মিল', 'গেনো' ও 'রস্কো' ইত্যাদি পড়িয়া ব্যয়িত হইতেছে—অথচ এই পুঁথিগত বিদ্যাতে ইহাদের কার্য্যকরী জীবনের কোন প্রকার সহায়তা করে না।

আমাদের স্কুল-কলেজে আজকাল নামমাত্র শিক্ষা হইয়া থাকে। কারণ মাষ্টার ও প্রফেসরগণ এত সামান্য মাহিনা পাইয়া থাকেন যে তাঁহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষা দেওয়ার সময়ও ইচ্ছা কিছুই নাই। পারিবারিক অভাব-অনটন তাঁহাদিগকে যেরূপ গুরুতররূপে পেষণ করিতেছে, তাহাতে শিক্ষার জন্য ছেলেদের যে সকল পাঠ্য-পুস্তক তাঁহারা পড়ান, তাহার মানে বুক বা টীকাটিপ্পনি হইতে কেবলমাত্র গোটাকতক নোট দিয়াই ইঁহারা স্কুলের ঘণ্টাটি কাটাইয়া দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতি বৎসর বহু যুবক বি-এস্ সি, এম-এস্ সি প্রভৃতি ডিগ্রী লইয়া বাহির হইতেছেন সত্য, কিন্তু কার্য্যকরী রসায়ন শাস্ত্র বা পদার্থ-বিদ্যার প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন শিক্ষাই হয় না। ছাত্রেরা পড়িবার সময় গোটাকতক 'ফর্ম্মুলা' মুখস্ত করে, তাহাও আবার অনেকে (Expriment) হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখে না। (Research) তত্ত্ব পরীক্ষা ও গবেষণার মৌলিক চেষ্টা কাহারো নাই। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে দেশে কোনও ফলিত রসায়ণবিদ বা বৈজ্ঞানিক জন্মিতেছে না। অবশ্য যে দুই একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান শিক্ষার গলদ সত্ত্বেও নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমাদের আত্মকৃত বেকার সমস্যা আমাদের মধ্যে দাসত্ব করার চিন্তা বদ্ধমূল করিয়াছে—"চাকুরী" "চাকুরী" করিয়া সকলেই ভেড়ার পালের মত একদিকে ছুটিয়াছে। কাহারো মধ্যে প্রায় স্বাধীন ব্যবসা করার একটা প্রবল ইচ্ছা নাই। স্বাধীন ব্যবসায় যে মানুষকে ধন, মান, যশঃ ইত্যাদি আনিয়া দেয় তাহাও বাঙ্গালীরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের যুবকেরা চায় বিনা কষ্টের কাজ (Soft Job);—আফিসে ইলেক্ট্রিক ফ্যানের নীচে বসিয়া সারাদিন কলম পেশা বা টাইপরাইটারে 'ঠক্ ঠক্' করা পাইলে আর বাঙ্গালী মাথার ঘাম ফেলিয়া কোন দিকে যাইতে রাজি নহে।

বাংলার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে কাহার না প্রাণ ক্ষোভে দুঃখে আপ্লুত হইবে?

ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরবর্ত্তী সংখ্যায় বর্ত্তমান অবস্থা দূর করার উপায় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

শঙ্কর জনন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Hybridization :—দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রণালীর মূল নীতি এক এবং অভিন্ন একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এস্থলে আমরা উভয়ের কথা একই সঙ্গে আলোচনা করিতেছি।

পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, মানুষের ন্যায় উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী পুরুষের প্রকার ভেদ আছে। ফুল যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার মধ্যস্থলে একপ্রকার রেণু অথবা পরাগ দেখা যায়। ফুলের আবার দুই প্রকার অঙ্গ আছে। যথা :— স্ত্রী অঙ্গ এবং পুরুষ অঙ্গ। সাধারণ ভাবে এগুলি ধরা পড়ে না। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোনটি স্ত্রী অঙ্গ এবং কোনটি পুরুষাঙ্গ তাহা সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। এই পুরুষাঙ্গের রেণুগুলি স্ত্রীঅঙ্গের ফুলের রেণুগুলির সহিত মিশিয়া থাকে এবং তাহাতেই ফল উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদের পুষ্পবিকাশ হইলে রেণু আনিয়া অন্য ফুলের উপর ছড়াইয়া দিলে এই উভয়ের সংযোগে নূতন আকারের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নবজাত ফসলের মধ্যে উভয় প্রকার উদ্ভিদেরই কিছু কিছু অংশ থাকিবে।

আমাদের দেশে অকস্মাৎ কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, লাল জবার গাছে সাদা জবা ফুল ফুটিয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, কিরূপে এরূপ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বৃদ্ধেরা তখন মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলেন, সকলই ভগবানের লীলা ; আসলে কিন্তু কিছুই নয়— সমস্তই প্রাকৃতিক নিয়ম। বাগানের গাছে গাছে ভ্রমর জাতীয় পোকা মাকড় প্রায়ই উড়াউড়ি করে। ইহারা এক ফুল ছাড়িয়া অন্য ফুলের উপর বসে— একটি কোরক হইতে রেণু লইয়া গিয়া অন্য কোরকের গায়ে নিক্ষেপ করে ; ইহারা যে ইচ্ছা করিয়াই এরূপ করে তাহা নহে। অনেক সময় ভ্রমরের পাখার সহিত ফুলের অতিশয় সূক্ষ্ম পরাগ লাগিয়া থাকে এবং অন্য ফুলের উপর তাহা পতিত হয়। এই অবস্থায় যদি কখনও লাল জবার অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুঁড়ির উপর সাদা জবার রেণু পতিত হয় তাহা হইলে পরদিন প্রভাতে হয়ত দেখা যায় লাল জবার গাছে সাদা জবা ফুল ফুটিয়াছে। কোন কোন সময়ে বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া গিয়া বাগানের এক ফুলের রেণু অন্য ফুলের উপর পড়িতে পারে। তাহাতেও অনেক সময় "শঙ্করজনন" সম্ভবপর হয়।

আর এক উপায়ে "শঙ্করজনন" সম্ভবপর হইতে পারে ; তাহা এই যে, পাশাপাশি দুই প্রকার শাক সব্জীর চাষ করিয়া ফসল জন্মিবার প্রাক্কালে উভয়কে জড়াজড়ি করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় একের রেণু অপরের রেণুর উপর অনায়াসে পড়িতে পারে। তাহা ছাড়া

আজকাল অনেক কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। হস্তদ্বারা ফুলের রেণু স্পর্শ করিলে তাহা অনেক সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। তাই বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এগুলিকে একটি হইতে অন্যটিতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। যথেচ্ছভাবে "শঙ্কর জননের" চেষ্টা করিলে হয়ত খুব ভাল ফসল সৃষ্টি হইতে পারে, আর না হয় একেবারে কুৎসিত ফল পাওয়া যাইতে পারে।

"শঙ্কর জননের" আসল উদ্দেশ্য হইল এই যে কোনও দুই ফসলের মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ আছে সেগুলিকে একত্র করা এবং কদর্য্যতা পরিহার করা। সাধারণতঃ আমরা যে সকল ফল ও ফসল ব্যবহার করি তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। অনেক সময় মনে হয় যে, একটির সুস্বাদ যদি অপরটির কোমলতার সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে একটি পরম উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে "শঙ্করজননের"(Hybridization)এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এদেশে এমন অনেক ফল মূল এবং তরিতরকারি আছে যেগুলির উপর এই প্রণালী প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

MUTATION OR SALTATION

নূতন নূতন শাকসব্জী সৃষ্টি করিবার উপযোগী চতুর্থ প্রণালীকে Mutation or Saltation নাম দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর উদ্ভিদের আকস্মিক পরিবর্ত্তনকে এই নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনও গাছের ফল, ফুল বা পাতায় অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অথচ এই পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কেহ কেহ ইহাকে "প্রকৃতির খেয়াল" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ব্যাপার তাহা নহে। গবেষণার ফলে এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনেরও কারণ নির্ণীত হইয়াছে। পরে তাহা বর্ণিত হইবে।

এখা ন বলা প্রয়োজন যে Mutation এর সহিত Crossing কিম্বা Hybridization এর কোন সম্পর্ক নাই। কারণ এস্থলে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাতে দুইটির সংমিশ্রণ হয় না—মোটামুটি আকার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে যে, শশা ও কুমড়া এই দুইয়ের সংমিশ্রনে যদি কোন নূতন ফসল উৎপন্ন করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ইহাকে Hybridization এর ফল বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে অকস্মাৎ যদি কোনও কারণে একটা শশা এমন প্রকাণ্ড হয় যে তাহার ওজন ১৫ সের হইয়া যায় তাহা হইলে ইহাকে Mutation এর ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এই চতুর্থ প্রণালীর সহিত Selectionএর বরং কতকটা যোগ আছে। Mutation দ্বারা স্থায়ী ভাবে ফল লাভ করিতে হইলে প্রকারান্তরে selection এর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

Mutation এর আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; ইতিপূর্ব্বে Hybridization প্রণালীর আলোচনা প্রসঙ্গে লাল জবার গাছে সাদা জবা ফুল ফুটিবার কথা বলা হইয়াছে। সেই সাদা জবা হইতে বীজ উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে গাছ জন্মাইয়া যদি দেখা যায় যে সেই গাছেও সাদা জবা ফুটিয়াছে তাহা হইলে ইহাকে Mutation বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে ফুলের রং

পরিবর্ত্তন হইল। লাল জবাই লাল জবা হইয়া গেল বটে, কিন্তু ইহাতে অপর কোন ফুলের অংশ আনিয়া মিলিত হইল না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এইটিকে Mutation না বলিয়া Hybridization বলিবার প্রয়োজন হইত।

বাগানের শোভাবৃদ্ধির জন্য অনেকে অনেক প্রকার রঙ্গীন ঘাস লাগাইয়া থাকেন। প্রায়ই এরূপ ঘাসের আকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমিতে ঘাস হয়ত অনেক বড় বড় এবং সবুজ রঙের হইয়া থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর এবং জলহীন জমিতে তাহা ছোট ছোট হয় এবং লাল রং ধারণ করে; অনেক সময় ঠিক দুই প্রকার ঘাস বলিয়া মনে হয়। যেরূপ আবহাওয়া এবং যেরূপ জমিতে ঘাসের রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া ঠিক সেইরূপ অবস্থার মধ্যে পুনরায় সেই ঘাস জন্মাইতে হয়। তখনও যদি দেখা যায় যে, ঘাসের নূতনত্ব অটুট রহিয়াছে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, Mutation এর ফল ফলিয়াছে।

গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে যে, জমির উর্ব্বরতা, আবহাওয়া, শক্তিশালী বীজ—এই সমস্তের উপর Mutation এর সাফল্য নির্ভর করে। সাধারণতঃ এক একটী বেগুন ওজনে এক পোয়া হয়। কিন্তু সেই বেগুনই উর্ব্বর জমিতে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করার ফলে এক সের পর্য্যন্ত হইতে পারে। Mutationএর ইহাই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে Mutation মোটের উপর "প্রকৃতির খেয়াল" নহে ইহার পশ্চাতে বিজ্ঞান সম্মত কারণ রহিয়াছে।

এই প্রণালী অবলম্বনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে নানা প্রকার শাক সব্জী এবং ফল মূলের উপর পরীক্ষা করিতে হয়। যত বেশী সংখ্যক জিনিষ ধরিয়া পরীক্ষা করা হয় ততই বেশী সাফল্য

লাভের সম্ভাবনা থাকে। কেবল শাক সব্জীর দিকে নজর দিলেই চলিবে না—হরেক রকম জমি, আবহাওয়া এবং উর্ব্বরতার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অল্প উর্ব্বর জমিতে যেমন গাছ হয় বেশী উর্ব্বর জমিতে তেমনটি হয় না। দুই স্থানেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে - কোনটী ভাল দেখায় এবং আমাদের ব্যবহারের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়।

আলুর যে গাছ থাকে সেটায় কিছু হয় না। সেটা নেহাৎ অপব্যয় হয় দেখিয়া সেখানকার কৃষকেরা উপরের অংশটাতে টোমাটো ফলাইতেছে।

আমাদের দেশেও প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক শঙ্কর জননের ঘটনা দেখা যায়। কোনও মানুষের চেষ্টায় ইহা হয় নাই। কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বালী-

শঙ্করজনন
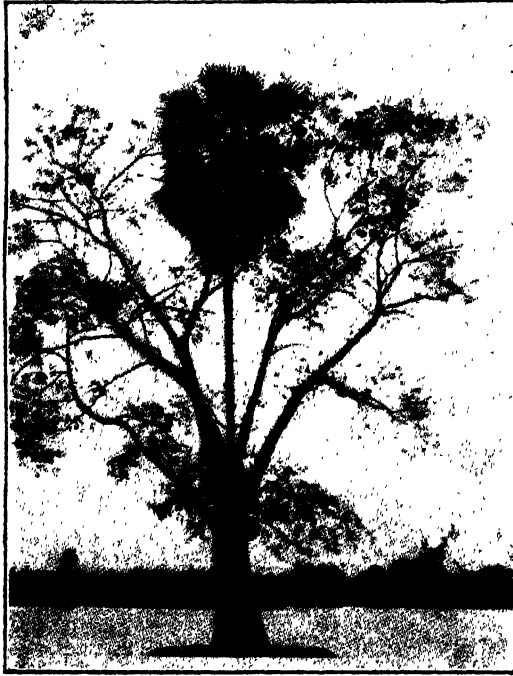
শঙ্কর জননের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিপূর্ব্বে আমরা পূর্ব্বের প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে আমেরিকায় একই গাছে দুই রকমের ফল ফলানো হইতেছে। কৃষকদের বহু ক্ষেতে একই গাছে উপরে টোমাটো ফলিতেছে এবং মাটীর নীচে আলু হইতেছে। এই সকল ক্ষেতকে সে দেশে (Potatomato) পোটাটোম্যাটোর ক্ষেত বলে। মাটীর উপরে

গঞ্জের Lake areaতে একটী বটগাছের উপর একটী তালগাছ জন্মিয়াছে এবং উভয় গাছই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও ফলন্ত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার ছবি দিলাম। প্রাকৃতিক নিয়মে এদেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে এবং হইতেছে, মানুষের চেষ্টায় যে তাহার অনেক উন্নতি সাধন করা যায় এবং ব্যবহারিক জীবনে নানারূপ ফলমূলাদির ক্ষেতে

যে তাহার প্রয়োগ করা যায় এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের কৃষকেরা ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতেছে।

নূতন নূতন শাকসব্জী এবং ফলফুল উৎপাদনের গোড়ার কথা উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ কোন জটিলতা নাই বটে; তবে ধৈর্য্য সহকারে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। একাগ্রতা এবং অভিনিবেশের অভাব হইলে "শঙ্কর জননে" সাফল্য লাভ করা যায় না। যাহারা একার্য্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের পক্ষে একথাগুলি মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ছোট বড় সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের লোকই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এমন কি শীর্ণকায় মহিলা এবং দুর্ব্বল বৃদ্ধেরাও এ কাজে আমোদ পাইবেন। ইহাতে গুরুতর পরিশ্রমের দরকার হয় না।

যন্ত্রপাতি :—সামান্য কয়েকখানি যন্ত্রপাতির দরকার হয়। নিম্নে সেগুলির নাম দেওয়া গেল :—

(১) এক জোড়া চিম্‌টা—জহুরীরা গহনাপত্র নির্ম্মাণের সময় যাহা ব্যবহার করেন সেইরূপ চিম্‌টা হইলেই চলে।

(২) ধারাল একখানা ছুরি।

(৩) সুন্দর একখানি বুরুস (Brush)—ইহার লোমগুলি খুব মোলায়েম হওয়া দরকার।

(৪) একটা Saucer or watch glass.

(৫) একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope)—ছোট হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা খুব শক্তিশালী (powerful) হওয়া দরকার। ইহা দ্বারা ফুলের অতি সূক্ষ্ম পরাগ অথবা রেণুগুলি পরীক্ষা করিতে হয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

Crossing অথবা Hybridizing প্রণালীতে নূতন ফসল উৎপাদন করিতে হইলে এক ফুলের রেণু আনিয়া অন্য ফুলের উপর নিক্ষেপ করিতে হয়। এই সময় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে রেণুগুলি অকর্ম্মণ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই মোলায়েম বুরুস দ্বারা রেণুগুলি অতি সাবধানে Saucer অথবা watch glassএর উপর প্রথমতঃ সেগুলিকে রক্ষা করিতে হয়। তারপর আবার মোলায়েম বুরুসের সূক্ষ্ম লোম দ্বারা এই রেণুগুলি অপর ফুলের অঙ্গের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। কোন কোন সময়ে কেবল বুরুস দ্বারাই কাজ হাসিল করা যায়—watch glassএর প্রয়োজন হয় না। বুরুস দিয়া এক ফুলের পরাগ তুলিয়া লইয়া অপর ফুলের গায়ে নিক্ষেপ করিলেও অনেক সময় কাজ হইয়া যায় বটে; তবে watch glass ব্যবহার করিলে সব দিক দিয়া নিরাপদ থাকা যায়।

এই সমস্ত কাজের উপযুক্ত সময় হইল পূর্ব্বাহ্ণ। বেশী রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্বেই কাজ শেষ করা ভাল। যখন দেখা যাইবে যে, মৌমাছিরা ফুলের উপর দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে, ফুলের রেণু বিনিময়ের উপযুক্ত সময় হইয়াছে। অসময়ে রেণু অদল বদল করিলে হয়ত মোটেই কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। যথা সময়ে রেণু বিনিময়ের কাজ সমাপ্ত হইলে নূতন ফসল উৎপাদন কারীর আর কোনই ভাবনার বিষয় থাকে না—ইহার পরবর্ত্তী সমস্ত কাজই প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; তবে এই টুকু দেখা প্রয়োজন যে, বাহিরের কোন শত্রু —যেমন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি আসিয়া যেন সকলের কোন অনিষ্ট না করে।

কলম করা :—প্রসঙ্গ ক্রমে কলম করার (grafting) কথা এস্থলে আলোচনা করা যাইতে পারে। যে সমস্ত ফল প্রতিবৎসর একবার করিয়া উৎপন্ন হয় সেগুলির মধ্যে "শঙ্কর জননের" চেষ্টা করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফল সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হইতে পারা যায়। কিন্তু এমন অনেক ফলের গাছ আছে—সেগুলি অন্ততঃ ১০।১২ বৎসরের আগে ফল প্রসব করে না। সেগুলির মধ্যে যদি "শঙ্কর জননের" চেষ্টা করিতে হয় তাহা হইলে কম পক্ষে ৪০।৫০ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতে হইবে। বহুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে। আমেরিকার কৃষিতত্ত্ব বিশারদ লুথার কারব্যাঙ্ক দেখাইয়াছেন যে,এত দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। কলম করার যে প্রণালী আছে তাহা অবলম্বন করিলে অতি সহজে কয়েক বৎসরের মধ্যেই শঙ্কর জননের কার্য্যে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ কোনও ফলবান বৃক্ষের শাখা কলম করিয়া কাটিয়া লইয়া ভূমিতে রোপন করা হয়। ইহাতে দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই ছোট গাছটিতে ফল উৎপন্ন হয়। ইহার ঠিক উল্টা আর একটি প্রণালীতে কলম (grafting) করা যায়। তাহা এই যে, মাটিতে চারাগাছ উৎপাদন করিয়া তাহার কাণ্ড যখন একটি কাঠপেন্সিলের ন্যায় বড় হইবে তখন

ইহাকে কলম করিয়া লইয়া গিয়া কোনও ফলন্ত বৃক্ষের ঠিক তত বড় একটি শাখার মধ্যে বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় চারাগাছটি যদি বাঁচিয়া যায় তাহা হইলে দুই এক বৎসরের মধ্যেই বড় গাছটির শাখা রূপে পরিনত হইবে এবং তাহাতে ফসল উৎপন্ন হইবে।

এইরূপে আম গাছে জাম, লিচু প্রভৃতি ফলান যাইতে পারে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই চারা গাছ হইতে ফল পাওয়া যাইবে। অবশ্য নূতন ফল ঠিক আমের মত কিম্বা জামের মত না হইতে পারে—শঙ্কর জননের ফলে ইহার গুণাবলীর তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশে অনেক ফলন্ত গাছ আছে যাহাতে প্রচুর ফল হয়; এই সমস্ত ফল কোন কাজেই লাগে না। এরূপ গাছের উপর যদি প্রয়োজনীয় ফলের চারা গাছ কলম করিয়া লইয়া গিয়া বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। দৃষ্টান্ত স্থলে আম গাছের কথা বলা যাইতে পারে। কোন কোন গাছের আম এত বেশী টক যে, তাহা খাওয়া যায় না। এরূপ গাছের উপর যদি কলম-করা উৎকৃষ্ট আমের চারা বসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সুস্বাদু আম পাওয়া যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার লুথার বারবাঙ্ক সাহেবের কথা বলা হইয়াছে। তিনি এই প্রণালী অবলম্বনে একটি কুল গাছে ৬০০ প্রকারের কুল উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন।

“শঙ্কর জনন” সম্পর্কে আর একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের দেশে এমন অনেক ফল আছে যেগুলিতে বীজ অত্যন্ত বেশী। বীজের এই বাড়াবাড়িতে ফলের সুস্বাদ পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া যায় এবং খাইবার সময় বড়ই বেগ পাইতে হয়। এই বীজ একেবারে দূর করিতে না পারিলেও সংখ্যায় এবং আকারে তাহা যথেষ্ট পরিমানে হ্রাস করা যাইতে পারে। আম, লিচু, পেয়ারা, কমলা প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

অনুসন্ধানের ফলে যদি কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি ফলের মধ্যে বীজ খুব কম, তাহা হইলে সেইটিকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। সেই ফলের বীজ হইতে যে গাছ হইবে তাহার ফলের মধ্যেও বীজ খুব কম হইবে। এইরূপে কয়েক বার Selection এবং Re-selection দ্বারা দেখা যায় যে, বীজের সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে এবং বীজের আকার ছোট হইয়াছে। একটু অধ্যবসায় এবং কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে এই “শঙ্কর জনন” দ্বারা অনেক অকর্ম্মন্য ফল হইতে উৎকৃষ্ট ফল জন্মান যাইতে পারে।

ব্যবহারিক জগতে টেলিভিসনের ক্রিয়া

রোটারি ক্লাবের সাপ্তাহিক সভায় প্রোফেসার এস, কে, মিত্র টেলিভিসনের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলজনক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমন দিন আসিতেছে যখন এ দেশের লোক বৈঠকখানার আরাম কেদারায় শুইয়া কলিকাতা হইতে সুদূর বিলাতের ডার্বিরেস অথবা ফুটবলের ফাইনাল্ খেলা দেখিতে সক্ষম হইবেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের বস্তু এবং ঘটনা সকল চক্ষের সম্মুখে হাজার হাজার মাইলব্যাপী নদ, নদী, পর্ব্বত, প্রান্তর প্রভৃতির নানা বাধা অতিক্রম করিয়া জলজ্যান্ত সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় তাহার নাম সরল ভাষায় টেলিভিসন।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র টেলিভিসন যন্ত্রের ক্রিয়া দেখাইতেছেন

বক্তা অতঃপর ফটোগ্রাফি এবং টেলিভিসনের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেন।

ফটোগ্রাফির সাহায্যে যে কোনো স্থান এবং নিশ্চল জিনিসের ছবি তোলা যায় এবং টেলিভিসনের সাহায্যে সকল প্রকার চলচ্চিত্রের

ছবি উঠান যায়। এখনো টেলিভিসনের শৈশব অবস্থা বলিতে হইবে। বায়োস্কোপ, এরোপ্লেন প্রভৃতির মূল সূত্র যেমন বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইলেও নানা মনীষীর যত্ন, চেষ্টা ও বহু বৎসরের গবেষণা দ্বারা উহা বর্ত্তমান উন্নতিজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তেমনি টেলিভিসনের নানা উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক নানা প্রকার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। আমেরিকায় ইতিমধ্যেই রেডিও সেটের (Radio Set) ন্যায় টেলিভিসন সেটও বাজারে বিক্রয় হইতে সুরু হইয়াছে।

টেলিভিসনের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে ডাঃ মিত্র বলেন যে এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে যখন প্রত্যেক অফিসে টেলিফোনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম কর্ত্তারা এক একটি টেলিভিসন রাখিয়া দিবেন এবং নানারূপ চাতুরীর হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় যে টেলিফোনের সাহায্যে অনেকে নানারূপ প্রতারণা করিয়া থাকেন। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

সকলেই জানেন, প্রত্যেক বড় বড় অফিসে বেচা, কেনা এবং বাজার দরের কোটেসন্ টেলিফোনের সাহায্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে এবং অনেক সময় এইরূপ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া অফিসের কর্ম্মকর্ত্তারা বেচা কেনা সম্বন্ধে আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই সূত্র ধরিয়াই প্রতারকেরা আবার ঠকাইবার সুযোগ পায় এবং সাধারণতঃ বাজারের বড় বড় দালালের নাম করিয়া মিথ্যা কোটেসন পাঠাইয়া দিয়া প্রতারণা করিবার চেষ্টা করে। এইজন্য অনেক বড় বড় অফিসে কর্ম্মকর্ত্তারা নিয়ম করিয়াছেন যে টেলিফোনের উপর তাঁহারা কোনো বেচাকেনা করিবেন না। প্রায় সকল অফিসেই এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে যে টেলিফোন করার পর চিঠি দ্বারা সেই কথার পোষকতা (Confirm) না করা পর্য্যন্ত টেলিফোনের বলে কোনো কাজ করা হয়না। ইহাতে সময় নষ্ট হয় এবং অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ফার্মের প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য কাজও হয়ত হাতছাড়া হইয়া যায়। এই জন্য টেলিফোন নিয়াও ব্যবসায়ীরা তাহার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু টেলিফোনের সহিত টেলিভিসন সেট থাকিলে আর এইরূপ প্রতারণা করিবার সুযোগ বা সুবিধা থাকিবে না। কর্ত্তারা অফিসে বসিয়াই যে টেলিফোন করিতেছে তাহার চেহারাটি দেখিতে পাইবেন।

ঘরে ঘরে আজ যেমন সকলে রেডিও সেট রাখিতেছেন ভবিষ্যতে তেমনি টেলিভিসন সেট রাখিতেও তাঁহারা আকৃষ্ট হইবেন।

অনেক সময় কাহারো গান অথবা বক্তৃতা রেডিও সেটে বারবার শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য স্বতঃই মনে আগ্রহ জন্মে। রেডিওর সহিত টেলিভিসন সেট থাকিলে শ্রোতা যেমন তাহাদের গান ও বক্তৃতা শুনিবেন, তেমনি তাঁহাদের চেহারা, চালচলন এবং হাব ভাবও দেখিতে পাইবেন।

সম্প্রতি ক্যাপ্টেন লিণ্ডবার্গের সন্তান চুরীর কথা সভ্য জগতে কাহারও জানিতে আর বাকী নাই ; আমেরিকায় এক জাতীয় ঠগ আছে যাহাদের ইংরাজীতে (Gangster) বলে। ইহারা প্রসিদ্ধ ধনীদিগকে অথবা তাহাদের কোনও সন্তানকে চুরী করিয়া লইয়া যায় এবং শেষে বেনামী চিঠির দ্বারা অথবা টেলিফোন যোগে তাহাদের বাড়ীতে সংবাদ পাঠায় যে এতলক্ষ ডলার অমুক স্থানে অমুক

সময়ে আসিয়া রাখিয়া গেলে অপহৃত ব্যক্তিকে তাহারা মুক্তি দিবে।

লিণ্ডবার্গের সন্তান চুরীর ব্যাপারে সমগ্র সভ্য জগতে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ঠগেরা উড়ো চিঠির দ্বারা এবং টেলিফোন সহযোগে লিণ্ডবার্গকে জানায় যে দেড় লক্ষ ডলার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া গেলে তাহারা তাঁহার সন্তানকে ফিরাইয়া দিবে। তিনি সন্তান প্রাপ্তির আশায় পুলিশকে কিছু না জানাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে টাকা রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ঠগেরা সেখান হইতে টাকাগুলি লইয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহার ছেলেকে আজিও ফিরাইয়া দেয় নাই। তাহারা টেলিফোনের সাহায্যে পুনরায় তাঁহার নিকট দেড় লক্ষ টাকা দাবী করিয়া পাঠাইয়াছে এবং এই টাকা দিলে তবে ছেলে ফিরাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমেরিকার পুলিশ অথবা ডিটেক্‌টিভ বাহিনী কিম্বা কোনও লোক এই র স্যজনক চুরীর কোনও কিনারা করিতে পারে নাই, কিম্বা কে, বা কাহারা, যে টেলিফোন সাহায্যে মাঝে মাঝে এই সকল খবর পাঠাইতেছে তাহারও কোনও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। যদি টেলিফোনের সহিত টেলিভিষণ যন্ত্র থাকিত তবে যাহারা টেলিফোন করিতেছে তাহাদের চেহারা এবং চাল চলন তখনই সকলে দেখিতে পাইত এবং এইরূপে এই ভীষণ চুরীর একটা রাস্তা বাহির করা সহজ হইত।

কিছুকাল পূর্ব্বে লোকের বাড়ী হইতে ইলেক্‌ট্রীক ফ্যান্ চুরী সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। গৃহস্বামীরা আফিসে অথবা কর্ম্মস্থানে বাহির হইয়া গেলে দুপুর বেলায় বাহির হইতে টেলিফোনের ডাক পড়িত। চোরেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাড়ীর গিন্নী অথবা চাকরদের টেলিফোনে ডাকিয়া কথা বলিত যেন বাড়ীর বাবুই তাহাদের টেলিফোনে জানাইয়া দিতেছেন যে আফিস হইতে তিনি ইলেকট্রীকের মিস্ত্রী পাঠাইতেছেন; সে মেরামত করার জন্য পাখা কয়টা খুলিয়া আনিতে যাইতেছে; তাহার নিকট পাখা কয়টা দিও।

এইরূপ টেলিফোন করিলে সাধারণতঃ বাড়া হইতে উত্তর আসিত "আচ্ছা"। তখন পাখা চোরেরা গৃহস্বামীর বাড়ী আসিয়া পাখাগুলি খুলিয়া নিয়া চম্পট দিত, আর গৃহস্বামী বাড়ী আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া মাথা চাপড়াইয়া মরিতেন। টেলিভিষণ থাকিলে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব হইত। কারণ বাড়ীর লোক তখনই টেলিফোন্ যোগে দেখিতে পাইত যে সত্যসত্যই তাহাদের বাড়ীর কর্ত্তা টেলিফোন্ করিতেছেন কি না। এইরূপ টেলিভিসণের শত সহস্র রকমের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

টেলিভিসনের ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্বন্ধে যাঁহারা নানারূপ অনুসন্ধিৎসায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিলাতের Mr. J. S. Baird বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, এবং জাপানের বহু মনীষী, বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক জগতে দিন দিন যে কত উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। গভীর বেদনার সহিত আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,

"ভারত শুধু কই?"

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

উচ্ছে, করলা, পালা ঝিঙে, শশা, বর্ষাতি লাউ কুমড়া প্রভৃতি দেশীয় সব্জী চাষের এই সময়! ফাল্গুন মাস পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হয়।

নিতান্ত বেলে মাটী ব্যতীত অপর সকল মাটীতেই প্রায় উচ্ছে জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়।

৩।৪ হাত অন্তর মাদায় ৩।৪টী করিয়া বীজ পুতিয়া ২।১ দিন অন্তর বৈকালে মাদায় জল দিতে হয়। ৬।৭ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাহির হয়, তখন গোড়ার মাটি মধ্যে মধ্যে খুড়িয়া দিতে হয়। প্রত্যেক মাদায় ২।৩টী করিয়া সজীব গাছ রাখিয়া বাকিগুলি ফেলিয়া দিবে। অনুচ্চ মাচায় গাছ বহাইয়া দিলে ফলন বেশী হয়।

করলা বর্ষাকালে ফলে, এই জন্য উচ্চ জমিতে ইহার চাষ করিতে হয় করলা দুইবার বপন করা চলে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসপর্য্যন্ত এবং আর একবার শ্রাবণ মাসে। ৪।৫ মাস পরে ফল ধরে।

গাছের গোড়ায় কিংবা বীজ পুতিবার আগে মাদায় পুরাতন গোবর সার বা পোড়া মাটি দিলে ইহার বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। ভাল বর্ষা না হইলে গাছে জল সেচন করা উচিত; উচ্ছের মত করলার গাছও মাচায় তুলিয়া দিতে হয়।

শশা, ভিটা মাটীর উপর ও উচ্চ মাঠান জমিতে ভাল হয়; দোয়াঁস মাটীই প্রশস্ত। সাধারণ গোবর সার এবং গোয়ালের ছাই মাটী মিশ্রিত আবর্জ্জনাই ইহার উত্তম সার।

দেশী বা পালা শশার বীজ বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিতে হয়, আষাঢ় হইতে আশ্বিনের মধ্যে ফলে। আর এক জাতীয় ভুঁয়ে শশা আছে বৈশাখ মাসে উহার বীজ বপন করিতে হয়, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল পাওয়া যায়; ভুঁই শশার ফলন অধিক হয়।

বর্ষাতি মিঠে কুমড়া ও সাঁচি কুমড়ার বীজ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিতে হয়। আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহা ফলে।

শারদীয় জাতির গাছগুলি বর্ষা পাইয়া শীঘ্র দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এই জন্য ইহার ডগা কাটিয়া না লইলে ফলন আরম্ভ হয় না।

এটেল ও দোঁয়াস মাটীই কুমড়ার পক্ষে উপযুক্ত। সাধারণ গোবর সার ও পুষ্করিণীর তোলা মাটীই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। গোমূত্র, ছাই, খরকুটা মিশ্রিত পরিণত সার ব্যবহার করিলে ফল খুব বড় হয়। প্রত্যেক গাছে এই সার ৫ সের পরিমাণে দেওয়া উচিত।

ঈষৎ ক্ষার মাটী, আঁইস জল, চাল ধোয়া জল গোবর সার এবং গোয়ালের আবর্জ্জনাই লাউ গাছের উত্তম সার। পোড়া মাটী, মাছ পচা, সরিষার খৈল মিশ্রিত করিয়া সার তৈয়ারী করিয়া উহা মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় ২।১ সের করিয়া দিলে ফল খুব বড় হয়। বর্ষাতি বীজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ বা আষাঢ়ের প্রথম পুতিতে হয়। আর্দ্র হাওয়াতে লাউ আকারে খুব বাড়ে। জলাশয়ের ধারে বা

উহার উপর মাচা করিলে ফলন খুব বৃদ্ধি হয় ও ফল বড় হয়। ইহার সুবিধা না থাকিলে মাচানের তলায় লাউয়ের নীচে গামলায় করিয়া জল রাখিয়া দিলে লাউ আকারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

প্রতি মাদায় একটীর বেশী গাছ রাখিতে নাই। ক্ষেতে চাষ করিতে হইলে ২ হাত অন্তর দড়ি বাঁধিয়া মাদা করিয়া বীজ পুতিতে হয়। সরিষার খৈল ও যথেষ্ট পরিমাণে ছাই মিশ্রিত গোবর, পোড়ামাটী ইহার উত্তম সার। গাছের গোড়ায় মাটী আলগা না রাখিলে ফল ভাল হয় না। ঢেঁড়স খুব বলকারক তরকারী। ইহাতে ১ম শ্রেণীর ভাইটামিন যথেষ্ট থাকে। কাল রঙের ঢেঁড়স সমধিক পুষ্টিকর।

গবাদির পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত।

আউসে বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়; কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র

এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেতে চাষ দিতে হইবে। আউস ধানের ক্ষেত, বাঁশ ঝাড় এবং কলাগাছে এই সময় পাক মাটী ও সার দিতে হয়।

এক্ষণে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদ বাক্য সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটি। বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতা ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয় এবং চৈত্রমাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয়। বাঁশ পাকা না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অড়হর ও আউস ধান বুনিতে হয়।

চৈত্রের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পর্য্যন্ত তুলার বীজ বপন করিতে হয়।

ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান

শীতকালের বিলাতি মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতের ও শেষ হইল, গোলাপেরও ফুল ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এখন বেল মল্লিকা যুঁই হইতেছে; এই সকল ফুলের ক্ষেতে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

ক্যাণ্ডিটাফট, পপি, ন্যাষ্টারসম প্রভৃতি ফুলের বীজ এই সময় বপন করা চলে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সময় শালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতির বীজ বপন করা হইতেছে এবং আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান

ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই।

জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে সে সকল লিচু গাছ এখন জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। না হইয়া থাকিলে এখন বুনিয়া তাহাতে জল সেচন একটি প্রধান কার্য্য।

ঢেড়ঁস ও কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টার দানা এই মাসের শেষে বসাইলে ভাল হয়।

মাঘ মাস হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ঢেঁড়সের বীজ বপন করা যাইতে পারে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে যে বীজ বপন করা যায় তাহার গাছ ৮ ১০ আঙ্গুল বড় না হইতেই ফল ধরে। এই সকল ছোট গাছের ফল ছিঁড়িয়া দিতে হয়। এই সময় গাছে প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া উচিত। বর্ষার গাছ ৫।৬ ফুট উঁচু ও ঝাড়াল হইয়া অনেক ফল প্রদান করে। আষাঢ় মাস হইতে এই সকল গাছে ফল দেওয়া আরম্ভ হয়।

ঢেঁড়স গাছ হইতে পাটের ন্যায় অতি সুন্দর শুভ্র, চিক্কণ ও শক্ত তন্তু বাহির হয়। গাছে ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া পাটের ন্যায় কাচিয়া লইলেই তন্তু বাহির হয়; কিন্তু তন্তু তৈয়ারী করিতে হইলে পাটের ন্যায় ঘন ভাবে বীজ বুনিতে হয়, নতুবা গাছ, শাখা প্রশাখা শূন্য ও দীর্ঘ হয় না।

কয়েকটী কাজের কথা

(১) ছোট ছেলে মেয়েদের ছাদের উপর খেলিতে দিও না, বা রাস্তায় একা বাহির হইতে দিও না।

(২) খাবার ঔষধ ও অন্য বিষাক্ত ঔষধ এক যায়গায় রাখিও না। বিষাক্ত ঔষধ ভিন্ন করিয়া দূরে রাখিও এবং সমস্ত ঔষধই খাওয়ার পূর্ব্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইও। বিষাক্ত ঔষধ খাইবার ঔষধ ভাবিয়া খাওয়াতে অনেক পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

(৩) যে রাস্তায় সর্ব্বদা গাড়ী চলাফেরা করে সেখানে রাস্তার একপাশ হইতে অপর পার্শ্বে ডিঙ্গাইয়া যাইবার পূর্ব্বে, দুই দিকে দেখিয়া লইও কোনোদিক হইতে গাড়ী আসিতেছে কিনা।

(৪) আগুণ, ছুরী, ও কাদা নিয়া ছেলেদের খেলিতে দিও না।

(৫) ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে পয়সা দিয়া খেলা করিতে দিও না। অনেক সময় না বুঝিয়া উহারা পয়সা গিলিয়া ফেলে।

(৬) শূন্যের দিকে ঢিল ছুঁড়িয়া অনেক ছেলে মেয়ে খেলা করিয়া থাকে। এসব ঢিল উহাদের মাথায় পড়িয়া মাথা কাটিয়া যাইতে পারে।

(৭) পুকুরে ছেলে মেয়েদের একদম যাইতে দিও না। দুপুর বেলা গৃহিনীরা যখন শুইয়া থাকেন বা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেই অবসরে দুষ্ট ছেলেরা পুকুরে খেলা করিতে যাইয়া নানারূপ বিপদ ঘটাইয়া থাকে।

(৮) বাজী পোড়াইতে যাইয়া ছেলে মেয়েরা অনেক সময় নানারূপ বিপদ সৃষ্টি করিয়া বসে।

(৯) পায়ে লোহা বা অন্য কিছু ফুঁড়িলে উহা বাহির করিয়া ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ধুইয়া "আইডিন" লাগাইয়া দিবে নতুবা পরে বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে।

১০। নাপিতের ক্ষুর ব্যবহার করিও না। উহার দ্বারা কোন স্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান যাহাতে বিষাক্ত হইয়া না উঠিতে পারে এমন কিছু লাগাইয়া দিবে। নাপিতের নরুনেও আঙ্গুল কাটিয়া অনেক সময় বিষাক্ত হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। ক্ষৌরির জন্য প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন "সেট্" থাকা দরকার। শুধু ক্ষৌরির জন্য কেন, স্বাস্থ্যের জন্য অন্যের ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়, গামছা চিরুণী ইত্যাদি কোন কিছুই ব্যবহার করা উচিত নয়।

(১১) তামা বা পিতলের জিনিষে খাবার রাখিলে বিষাক্ত হইয়া উঠে।

(১২) দিয়াশালাইর কাঠি জ্বালিয়া কাজ হওয়ার পর যেখানে সেখানে ফেলিও না।

(১৩) পেট্রোলিয়াম বা কেরোসিনের নিকট সিগারেট বা তামাক খাইও না, অথবা অন্য কোনরূপ আগ্নেয় জিনিষ ইহাদের নিকট রাখিও না।

(১৪) সোডার বোতল খুব সাবধানে ভাঙ্গিও। ভাঙ্গার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসিতে দিও না।

(১৫) খবরের কাগজ যে কালী দ্বারা ছাপান হয় উহা বিষাক্ত খবরের কাগজে খাবার রাখিয়া খাইবার অভ্যাস করিও না।

(১৬) কপিং পেন্সিল মুখে দিয়া লিখিও না, উহা বিষাক্ত।

(১৭) পুরাতন কাপড় ইত্যাদি অনেকদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার পর ভাল করিয়া ঝাড়িয়া পুনরায় ব্যবহার করিও। অনেক সময় উহাদের ভিতরে চেলা, বিছা, বা অন্যান্য বিষাক্ত কীট লুকাইয়া থাকে।

(১৮) রাত্রি বেলা শোয়ার সময় কাছে একটি দিয়াশলাই বা ইলেক্‌ট্রিকটর্চ্চ রাখিতে ভুলিও না।

(১৯ বিদেশে পথে ঘাটে চলার সময় সঙ্গে কয়েকটি মোমবাতি ও দেয়াশলাই অথবা টর্চ্চ লাইট্ অবশ্য নেওয়া দরকার।

(২০) ধোপার বাড়ী কাপড় দিবার সময় সার্ট, কোট, প্যান্টের পকেট ভাল করিয়া দেখিয়া দিও।

বীমা প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Non Forfeiture

এণ্ডাউমেণ্ট অথবা whole life পলিসিতে সাধারণতঃ বীমা বাতিল না হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাকে non-forfeiture বলা হইয়া থাকে। নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইল।

নির্দ্দিষ্ট বৎসর বা মাসের মিয়াদে বীমা না হইলে non forfeitureএর সুযোগ সাধারণতঃ দেওয়া হয় না। এইরূপ বীমার বিশেষত্ব এই যে কয়েক কিস্তী টাকা দেওয়ার পরে প্রিমিয়াম বন্ধ করিলেও তৎক্ষণাৎ বীমা নষ্ট হয়না। ধরা যাউক একজন বিশ কিস্তীতে বীমা করিল। তিনটি প্রিমিয়াম দেওয়ার পরে তাহাকে কোন কারণে টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে হইল। তখন সে যতবার প্রিমিয়াম দিয়াছে ততবার বীমার আসল টাকার কুড়িভাগের এক ভাগ টাকা paid up policy করিয়া রাখিতে পারিবে। লাভসহ বীমা করা হইলে বীমাকারী এইরূপ paid up policyর উপরেও তাহার লাভ পাইতে পারিবে। আর এক প্রকার non-forfeiture বীমা খুব প্রচলিত আছে। ইহাতে পলিসি বাতিল হইয়া গেলেও প্রত্যর্পণ মূল্যের টাকা দিয়া (Surrender value) যতদিন সম্ভব পলিসিটী অব্যাহত রাখা হয়।

অন্যান্য সুবিধা

ইহা ব্যতীত জীবন বীমা পলিসির আরও অনেক সুবিধা আছে।

(১) যে সকল বীমা স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণের জন্য করা হয়, তাহার টাকা বীমাকারীর পাওনাদারগণ ক্রোক দিতে পারে না।

(২) এক স্থানে বীমা করিলে উহাতে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে বিচরণের কোন বাধা থাকে না। অর্থাৎ বীমার পরে বীমাকারী পৃথিবীর যে কোন স্থানের অধিবাসী হইতে পারেন, অথবা স্থায়ীভাবে বাসা স্থির করিতে পারেন, তাহাতে কোম্পানী বীমার দায়িত্ব লইতে অস্বীকার করেন না। অবশ্য বীমাকারী যদি আকস্মিক বিপদসঙ্কুল কোন স্থানে গমন করেন, অথবা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন তাহা হইলে তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ।

(৩) বীমার প্রিমিয়ামের উপর ইন্‌কাম্ ট্যাক্স বা আয়কর ধরা হয় না। ইহাতে বীমাকারীর সঞ্চয়ের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

পলিসি প্রদান

বীমাকারী কোন্ প্রকারের বীমা করিল, কত টাকা প্রিমিয়াম কিরূপ কিস্তী অনুসারে দিতে হইবে, এবং তাহার দাবীর টাকা কত বৎসর পরে পাওনা হইবে, তাহার উত্তরাধিকারী কে প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত একখানি চুক্তিপত্র প্রত্যেক বীমাকারীকে দেওয়া হয়। উহাই তাহার বীমার প্রথম ও প্রধান দলিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীই স্ত্রী বা পুত্রকন্যাদের জন্য বীমা করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক স্বামী পুত্রদের জন্য বীমা করিয়াছেন এরূপ সংবাদ অতি অল্প মিলে। আজীবন বীমা করিলে বীমাকারীর মৃত্যুর পরে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির নিকট স্বহস্তে টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পলিসির উত্তরাধিকারিণী যদি স্ত্রী হন এবং বীমা যদি এণ্ডাউমেণ্ট বীমা হয় তাহা হইলে বীমার কাল উত্তীর্ণ হইলেই অথবা বীমাকারীর আকস্মিক মৃত্যুতে পলিসির টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন অফিস স্ত্রীলোকদের টাকা পাইতে যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য বীমাকারীর স্ত্রীকে বীমাকারীর নিযুক্ত ট্রাষ্টি স্বীকার করিয়া Settlement policy ইস্যু করিয়া থাকেন। ইহাতে মহিলাদের বীমার টাকা পাইতে আর কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু সেটলমেণ্ট পলিসির কতকগুলি দোষ আছে বলিয়া এই প্রকারের পলিসি অনেকেই পছন্দ করেন না। সেটলমেণ্ট পলিসি যদি paid up policyতে পরিণত করা যায়, তথাপি ইহা Surrender করা যায় না। প্রিমিয়াম দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে পলিসির উপর কর্জ্জ লওয়া যায় না, বীমার বোনাস নগদ লওয়া যায় না। এই সকল কারণে সেটলমেণ্ট পলিসি না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

পলিসি গ্রহণের পূর্ব্বে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পলিসি গ্রহণের পরে বীমা সম্পর্কে যে সকল অসুবিধা হইতে পারে তাহা আলোচনা করা যাউক।

পলিসি কার্য্যকরী হইবার পরেই এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস বা এক বৎসর পরে আবার প্রিমিয়ামের চাঁদা পাওনা হয়। প্রিমিয়াম জার্ণাল নামে কোম্পানীর বড় খাতা থাকে। এই খাতা বারো মাসের বারো অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক মাসে কত মাসিক প্রিমিয়াম পাওনা হইবে তাহা লেখা থাকে। এইরূপে জানুয়ারী মাসে যে সকল প্রিমিয়াম পাওনা হইবে তাহা সমুদয় জানুয়ারী মাসের খাতায় লিখিত থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসের পাওনা ফেব্রুয়ারীতে, মার্চ্চের পাওনা মার্চ্চে, এইরূপে প্রতি মাসের পাওনার পরিমাণ এবং তারিখ ধারাবাহিক ভাবে লেখা থাকে। এই বই হইতেই টাকা দিবার জন্য তাগিদপত্র (renewal notice) এবং রসিদ লেখা হয়।

যিনি বীমা করেন তাঁহাকে আগামী কিস্তীর প্রিমিয়ামের তারিখ এবং টাকার পরিমাণ জানাইয়া প্রায় একমাস পূর্ব্বেই কোম্পানী হইতে নোটিশ পাঠানো হয়। প্রিমিয়াম দিবার নির্দ্ধারিত দিনের পরেও এক মাস পর্য্যন্ত বিনা জরিমানায় প্রিমিয়াম দেওয়া চলে। এই অতিরিক্ত সময়ের নাম period of grace; পূর্ব্বেই প্রিমিয়াম দিবার নোটিশ পাওয়াতে এবং বিনা জরিমানায় টাকা দিবার জন্য অতিরিক্ত সময় থাকাতে, উপযুক্ত দিনে প্রিমিয়াম দিতে বীমাকারীর কোন অসুবিধা হয় না। যদি এই সময়ের মধ্যেও প্রিমিয়াম দেওয়া না পড়ে তাহা হইলে কোম্পানী দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণ করেন। অথবা কোম্পানীর এজেন্টকে বীমা কারীকে তাগিদ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়বার তাগিদের পরেও প্রিমিয়াম না পৌছিলে উহা নষ্ট হইল বলিয়া গ্রহণ করা হয়। যদিও দ্বিতীয় স্মারক-লিপি প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তাহাদের বীমা বাতিল বলিয়া লিখিয়া রাখেন, তথাপি বীমাকারী আবেদন করিলে বীমাটি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কোম্পানী সদয় ভাবে বিবেচনা করেন।

ডিরেক্টরগণের অনুমতি ব্যতীত কোন বীমা উদ্ধার করা যায় না। ডিরেক্টরগণ এইরূপ ব্যাপারে সাধারণতঃ কিছু জরিমানা লইয়া, বীমাকারীর স্বাস্থ্য ভাল আছে কিনা তাহার প্রমাণ স্বরূপ ডাক্তারী পরীক্ষা করাইয়া তবে বীমাটি পুনরায় উদ্ধার করার অনুমতি দিয়া থাকেন। অনেক সময় পলিসি ইসু করার পরে কোম্পানীর নিকট নোটিশ আসে যে, বীমাকারী তাহার পলিসি মর্টগেজ রাখিয়াছেন, অথবা কোন কারণে কাহাকেও এসাইন করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ কোন নোটিশ পাইলেই কোম্পানী তাহা রেজেষ্টারী করিয়া পলিসির অন্যান্য কাগজের সহিত উহা সাবধানে রাখিয়া দেন।

এসাইনমেণ্টের নোটিশ

এসাইনমেণ্টের নোটিশ রেজেষ্টারী করিতে নোটিশের সহিত কিছু টাকা পাঠানো আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কোম্পানী কাহারও এসাইনমেণ্ট নোটিশ রেজেষ্ট্রী করিলেই পলিসির উপর এসাইনির দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। সাধারণতঃ যে প্রথা অনুসরণ করা হয়, তাহা এই :—

কোন পলিসি সম্পর্কে নগদ বোনাস্ প্রত্যর্পণ মূল্য অথবা দাবীর টাকা দিতে হইলেই যিনি বীমার টাকা চাহেন কোম্পানী তাঁহাকে বীমার উপর তাঁহার দাবীর দলিলাদি দেখাইতে বলেন। এই সকল দলিল পাইলে কোম্পানী নিজেই অথবা তাঁহাদের সলিসিটরগণের মারফতে দাবী-কারকের দাবীর সত্যতা অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে উহা সত্য প্রমাণিত হইলে, তখন টাকা দেওয়া হয়। অনেক প্রকারের এসাইনমেণ্ট আছে, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান। যথা (১) ইকুই-টেবল চার্জ্জেস, (২) মর্টগেজ, (৩) এবসলিউট এসাইনমেণ্ট (ট্রাষ্ট এসাইনমেণ্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত)।

ইকুইটেবল্ চার্জ্জ

উপরোক্ত এসাইনমেণ্ট সাধারণতঃ ব্যাঙ্কারগণ বীমাকারীকে অগ্রিম টাকা বা ওভার ড্রাফট দেওয়ার জন্য গ্রহণ করিয়া থাকেন ওভার ড্রাফট সর্ব্বদাই অল্প সময়ের জন্য দেওয়া হয়। এই জন্য ব্যাঙ্ক ওভার ড্রাফট টাকার জামীনরূপে পলিসিখানি তাঁহাদের নিকট বন্ধক রাখিয়া দেন।

ইহার আরও সুবিধা এই যে ওভার ড্রাফটের টাকা পরিশোধ হইয়া গেলেই ব্যাঙ্ক হইতে বীমাকারীর পলিসি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এজন্য অনেক সময় আর পলিসি রি-এসাইনমেণ্টের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্ক তাঁহাদের টাকা পাইয়াছেন বলিয়া বীমা অফিসে পত্র দিয়া থাকেন এবং উহাতে পলিসির উপর তাঁহাদের যে কোন প্রকার দাবী নাই, তাহাও উল্লেখ করেন, এবং বীমা কোম্পানীও বীমাকারীর পলিসির দাবী স্বীকার করিয়া লন।

মর্টগেজ

টাকা কর্জ্জ করিতে হইলে প্রতিভূ স্বরূপ কথনও কথনও বীমার পলিসি মর্টগেজ রাখা হয়। মর্টগেজের দলিলে যথারীতি শীল ও ষ্ট্যাম্প দেওয়া আবশ্যক। যাহার নিকট পলিসি মর্টগেজ করিয়া টাকা আনা হয় তাহার নিকট এই মর্ম্মে এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে, ছয় মাসের নোটিশে নির্দ্ধারিত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সুদে মর্টগেজের টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে। এতদ্ব্যতীত আসল টাকা পরিশোধের পূর্ব্বে যেসকল সুদের টাকা পাওনা হইবে, তাহাও কিস্তীবন্দী মতে পরিশোধ করিতে হইবে। মর্টগেজের সময় কর্জ্জ গৃহীতাকে ইহাও লিখিয়া দিতে হয় যে যদি কথনও সুদের টাকা যথারীতি আদায় না হইয়া বাকী পড়ে, তাহা হইলে যাহার নিকট পলিসি বন্ধক থাকিবে, তিনি ইচ্ছামত পলিসি খানি বিক্রয় করিয়া অথবা কোম্পানীর নিকট surrender করিয়া তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবেন। যদি পলিসির মূল্য কর্জ্জকারীর গৃহীত আসল টাকা ও সুদের মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তবে মর্টগেজের equity of redemption দ্বারা পলিসির মূল্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার মর্টগেজ খালাস করিতে পারেন। তবে পলিসি বিক্রয় অথবা surrenderএর জন্য মর্টগেজির কোন প্রকার দায়িত্ব থাকিবে না। যিনি মর্টগেজ দেন তাঁহাকে মর্টগেজর এবং যিনি মর্টগেজ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে মর্টগেজি বলে। পলিশি যাহাতে নষ্ট না হয় তজ্জন্য বোনাস প্রভৃতির উপর মর্টগেজির কোন দাবী থাকিবে না বলিয়া দলিলে চুক্তি করা হয়।

এবসলিউট এসাইনমেণ্ট

যে কয় প্রকারের absolute assignment আছে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল :—

(১) আর্থিক কারণে এসাইন করা

(২) স্বেচ্ছামত বা উত্তরাধিকার সূত্রে এসাইন করা

(৩) আইনের প্রয়োগের ফলে এসাইন করা।

আর্থিক প্রয়োজনে এসাইনমেণ্ট

এই প্রকার এসাইনমেণ্ট অতিশয় সহজ। ইহাতে পৃথক দলিল দ্বারাও এসাইন করা যায়, অথবা পলিসির পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়াও এসাইন করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না দিয়া ইহা করিলে শুদ্ধ হইবে না। নিয়মানুযায়ী ষ্ট্যাম্প দিয়া দলিল তৈরী করিয়া উহা পলিসির সহিত ক্রেতার (এসাইনীর) নিকট দিলেই তিনি উহার অবিসংবাদী মালিক হইবেন। পলিসি ক্রেতা বা এসাইনী ক্রয়ের অব্যবহিত পরেই উহা কোম্পানীতে জানাইবেন, কেননা প্রত্যেক কোম্পানী এসাইনমেণ্ট সম্পর্কে কোন দাবী

বিবেচনা করিবার সময় যাহার নামে পলিসি প্রথম এসাইন করা হইয়াছে, তাহার দাবীই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করেন।

VOLUNTARY এসাইনমেণ্ট

এইরূপ এসাইনমেণ্টে যদি এসাইনকারী এসাইনমেণ্টের তারিখ হইতে দুই বৎসর হইতে ১০ বৎসর মধ্যে দেউলিয়া হয়, তাহা হইলে দেউলিয়ার ট্রাষ্টি মহাশয় উহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এসাইন করার পরে দশ বৎসরের মধ্যে যদি কেহ দেউলিয়া হয়, তবে এসাইনীকে প্রমাণ দিতে হইবে যে তিনি যখন এসাইনমেণ্ট করেন, সে সময়ে এসাইনর পলিসির টাকা বাদেও তাহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন। পলিসির সকল স্বার্থই যে এসাইন করার দিন হইতে বীমাকারীর নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহাও দেখানো আবশ্যক। পাওনাদার গণ যাহাতে না ঠকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এইরূপ এসাইন করা পলিসির টাকা দিবার সময়ে কোম্পানীও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। কেননা ইহাতে অনেক প্রকার আইনের গোলমাল বাধিতে পারে। এসাইনকারীর মৃত্যুবশতঃ যদি দাবীর সময় হয় তবে আর কোন গোলমালেরই আশঙ্কা হয় না। ভলাণ্টারী এসাইনমেণ্টের পরে বীমাকরীর মৃত্যু হইলে তাহার দেউলিয়া ষ্টেটের ট্রাষ্টি কিছুতেই উহা ধরিতে পারেন না।

আইন প্রয়োগে এসাইনমেণ্ট

কেহ দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হইলে তাহার সমুদয় সম্পত্তি জীবন বীমা পলিসি প্রভৃতি সকলই আইনতঃ রিসিভারের নিকট যাইবে। তিনি যেরূপভাবে ইচ্ছা সেরূপভাবে পাওনাদারকে উহা দিতে পারিবেন। ইহাকেই আইন প্রয়োগে এসাইনমেণ্ট বলে।

(ক্রমশঃ)

বীমা কর্ম্মীদের আসন কোথায় ?

সমাজের উন্নতি কল্পে ও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত বীমা কোম্পানীগুলি যে কতদূর সাহায্যকারী সে বিষয় যেমন অন্যান্ত দেশের লোকেরা উপলব্ধি করিয়াছে তেমনি আমাদের দেশের লোকেরাও কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রাচীন কুসংস্কার ও ভুল ধারণাগুলি আমাদের মধ্যে আ.জিও বর্ত্তমান রহিয়াছে,তাহাতে আমাদিগকে বিশেষ পিছাইয়া রাখিতেছে। মানুষের মনে যতদিন এই সকল অন্ধধারণা বদ্ধমূল থাকিবে ততদিন সে কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। কুসংস্কাররূপ অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া আমাদের সমাজে এখনও যেমন কতকগুলি দুঃখ ও অশান্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ কতকগুলি ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের দেশের কতকগুলি লোকও বহু দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে।

অনেক লোককে দেখা গিয়াছে এককালে

বিশেষ উপার্জ্জন করিয়া শেষে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে যে পরের কাছে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা তাঁহাদের কোন-রূপে উদর পূরণ করিতে হয়। তাহাদিগকে বীমা করিবার কথা বলিলে হয়ত নানারূপ ওজর আপত্তি সহ শেষে এজেন্টদের ভয়ে বাড়ীর বাহির হইতেন না। আমাদের দেশের কতকগুলি লোক মনে করেন যে এজেন্টদেরই ইহাতে যথেষ্ট স্বার্থ, আর তাঁহাদের সর্ব্বনাশ। এই ধারণাগুলি সে কতরূপে ব্যক্ত হইয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে তাহা লিখিলে একটী ছোট পুস্তিকাতে পরিণত হইতে পারে।

এখানে আমি একটী উদাহরণ দিতেছি; কোন এক ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে বসিয়া একদিন গল্প হইতেছে, এমন সময় একটী ভদ্রলোক আসিলেন; তিনি সেই ডাক্তারের বিশেষ পরিচিত —গল্প বলিতে, আমাদের বীমা সম্বন্ধীয় কথাই হইতেছিল। ডাক্তার সেই ভদ্রলোককে যেমনই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তুমি বীমা করিয়াছ? অমনি দেখিলাম তাঁর চোক দুটী বড় হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রুকুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠ বিশেষভাবে নড়িতেছে— তিনি বলিলেন;—

আঃ ওসব আবার কেন বাবা!
থাক্‌না; বেড়াতে এসেছি, এখন
জ্বালাতন কর কেন?

ডাক্তারও ছাড়িবার পাত্র নন; এবারে আমাকে ইঙ্গিত করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইলেন, আমিও তাঁহার সাথে বিশেষ যোগদান করার ফলে লাভ হইল কতকগুলি অপমান সূচক বাক্য শ্রবণ করা। তিনি বলিলেন "আপনারা ত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেই আছেন—আমার আবার সর্ব্বনাশ করিতে কেন চান্ চুপ করুন।" ভদ্রলোকের কথায় আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যেমনি উত্তর দিতে গেলাম তিনি অমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়াই 'চলিলাম' বলিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাইলেন।

এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে যাহাতে আমাদের দেশের লোকের মনস্তত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অশিক্ষিতদের মধ্যেই অনেকে বীমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝেন না। কিন্তু তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলে অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহাদের দ্বারাই বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে। অনেকে এমন আছেন যে সবেতেই "সবযান্তা"। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে "কুচ্ নেই যান্তা"। এই সব "সবযান্তা" লোকের কাছে কেহই কিছু করিতে পারিবেন না।

এখন কথা হচ্ছে কতকগুলো লোক এত খোসামোদ, অনুরোধ, উপরোধ করিয়া লোককে বীমা করাইতে চায় কেন? তাহাতে স্বার্থ কি কেবল তাহাদেরই, না যাহাদিগকে বীমা করানো হয় তাহাদেরও ইহাতে কিছু স্বার্থ আছে? এর উত্তরে কতকগুলি সমঝদার লোক নিশ্চয়ই বলিবে যাহারা বীমা করায় তাহাদেরই আয় হয়, যাহারা করে তাহারা দিয়েই মরে। কতক-গুলো লোক বলিবে না না না, উভয়েরই ইহাতে স্বার্থ আছে; কিন্তু আমি বলিব স্বার্থ কেবল তাহাদের যাহাদিগকে বীমা করান হয়। আর যাঁহারা করান তাঁহারা শুধু বীমা কারীরই উপকার করান না, দেশের এবং সমাজেরও যথেষ্ট কাজ করেন।

যাঁহারা বীমা করাইবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদিগকে এজেন্ট বলা হয়; কিন্তু

আমি তাঁহাদিগকে দেশসেবক বলিয়াও অভিহিত করিতে চাহি। তাঁহারা যে কেবল নিজের স্বার্থেই পরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান,তাত নয়ই, বরং সমাজ ও দশের উপকারের ব্রত লইয়া লোকের সম্মুখে
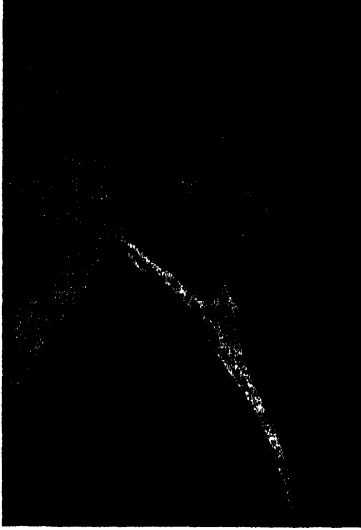
শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু।

দেশের ভবিষ্যৎ, দেখাইয়া দেন। আর এই দেশ সেবকদের ঘৃণার চোক্ষে দেখে এই পরাধীন দেশের লোকগুলো। যখনই ব্যাগটি হাতে লইয়া কাহারও দ্বারে গিয়া দাঁড়াই, গৃহস্থ বুঝি মনে করে, এ একটা ভিখারীরও অধম এসেছে।

এখন কথা হচ্ছে যাহাদিগকে দেশ সেবক বলিয়া অভিহিত করিতে চাই তাহারা কে? তাহাদের মধ্যে কি কি গুণ বর্ত্তমান? বীমা সম্বন্ধে তাহাদের কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে। তাহারা পরস্পরের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়ায় কিনা। নিজে কৃতকার্য্য হইবার জন্য অন্য কোম্পানীকে দোষারোপ করেন কি না? অন্য কার্য্যের সাথে এই কার্য্য "হাতের পাঁচ" হিসাবে লইয়া থাকেন কিনা? নিজে বিশ্বাস যোগ্য কিনা? উদ্দেশ্য অসৎ কিনা?

এই সমস্ত অনেক কিছু দোষগুণ এজেন্টদের মধ্যে বিচার করিবার আছে। যাঁহারা সমস্ত গুণে গুণবাণ ও শুধু বীমার কাজ লইয়াই থাকেন তাঁহাদের দ্বারাই প্রকৃত কার্য্যের আশা করা যায় ও তাঁহাদিগকেই দেশ সেবক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা অন্যান্য পাঁচ রকম কার্য্যের সহিত বীমার কার্য্যও লইয়া থাকেন ও ইহাতে সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিতে পারায় অনেক সময়েই অকৃত কার্য্য হন ও নূতন বীমাকারীর কাছে প্রকৃত জিনিষ টুকু বুঝান দূরে থাকুক বাজে বকিয়া নিজের যে শুধু ক্ষতি করেন তা নয়, অন্যান্য এজেন্টদের ক্ষতি করেন ও বীমাকারীর মনে অন্যান্য কোম্পানীর বিষয় বদধারণা জন্মাইয়া দেন।

আবার এমন অনেক অসৎ ব্যক্তি আছে যাহারা নানারূপ মতলবে নানা কার্য্যের সহিত বীমার কার্য্য লইয়া অনেক সময় নিজের অভীষ্ট সাধনে লোককে মিথ্যা বুঝাইয়া অন্যান্য এজেন্টদের সর্ব্বনাশ সাধন করে ও সেই কোম্পানীকে চোর প্রতিপন্ন করে। এ সমস্ত লোকগুলিকে এড়াইয়া কোম্পানীর সুনাম করিতে হইলে কোম্পানীর পরিচালকগণকে বুঝিয়া এজেন্ট নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে আমার বেশ ভাল করে অভিজ্ঞতাই আছে, কারণ আমি এরূপ কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। আর একটা মজার ব্যাপার দেখা যায় এই যে একটী কোম্পানী হইতে হয়ত কোন লোকের অসাধুতার জন্য এজেন্সী cancell করা হইল; সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অন্য কোম্পানীতে যাইয়া স্থান পাইল। কোম্পানীর পরিচালকগণ

তাহার বিষয় বিনা সন্ধানেই এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন ও ২।৪টি বড় বড় কথা শুনিয়াই আপ্যায়িত হইয়া গেলেন ; ফলে সেই কোম্পানীকে যে তাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না তাহা কে জানে। এইরূপে বাস্তবিকই এই সমস্ত ব্যক্তির জন্য আমাদের দেশের লোকদের অনেক সময় অনেকরূপ ভুল ধারণা জন্মায় যাহাতে অন্যান্য এজেন্ট, কোম্পানী ও লোকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এইজন্য প্রত্যেক কোম্পানী যখন কোন এজেন্ট নিযুক্ত করিবেন তখন তাহার শিক্ষা ও সততার বিষয় বিশেষরূপে প্রমাণ লইয়া তবে তাহাকে এজেন্ট নিয়োগ করিবেন। আর প্রত্যেক কোম্পানীরও উচিৎ ভাল এজেন্টের সহিত ভাল ব্যবহার করা ও তাহাদের কার্য্যে নানারূপ সাহায্য করা।

কোম্পানীগুলির দিক হইতেও বলিবার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সময়াভাবে এবার স্থগিত করিতে হইল।

ফণীন্দ্রনাথ বসু।

———

বীমাকারীর নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা

[শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার]

জীবন বীমা করিবার সময় কোন্ বীমা অফিসে জীবন বীমা করিব এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার সদুত্তর বড় একটা পাওয়া যায় না। বীমা কোম্পানীর এজেন্টগণ নিজ নিজ কোম্পানীর গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, অন্য কোম্পানীর সুবিধাজনক সর্ত্তের কথা আদৌ বলেন না। বিভিন্ন কোম্পানীর বিবরণ পত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে একই কোম্পানী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান নহে। যেমন, যে বীমা প্রার্থী বিপদজনক কর্ম্মাভি-লাষী তাঁহার পক্ষে 'ন্যাশনাল্' ভাল; যিনি প্রায়ই ইউরোপ বা আমেরিকায় গমন করেন তাঁহার পক্ষে 'ওরিয়েণ্টাল' ভাল; যাঁহার বীমা পত্র বাজেয়াপ্ত হইবার আশঙ্কা অধিক, তাঁহার 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' ভাল। 'হিন্দুস্থান' ও 'ভারত' automatic extension দিয়া থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এই সর্ত্তের সুবিধার তারতম্য অনেক।

কোন বিশেষ বীমা কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ ব্যক্তি পাশ্চাত্য দেশে অনেক আছেন। কোন্ অফিসে জীবন বীমা করিলে বীমাকারীর সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হইবে এ সম্বন্ধে তাঁহারা নিরপেক্ষ অভিমত দিয়া থাকেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর সর্ত্ত গুলি কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন কিম্বা দেখাইয়াছেন কি? চুক্তিপত্রের বিভিন্ন সর্ত্তগুলির বিশ্লেষণ দেখিতে পাইলে বীমাপ্রার্থীদের খুব সুবিধা হয়।

আমি একজনের কথা জানি যাহার একই কোম্পানীর দুইখানি বীমা পত্র চাঁদা না দেওয়ার জন্য বাতিল হইয়া গেল; একখানির প্রত্যর্পণ মূল্য লইয়া অপরটীকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। সমস্ত টাকাই নষ্ট হইল। বীমা পত্র বাতিল হইয়া গেলে যে সকল বীমা অফিস প্রত্যর্পণ মূল্য একেবারেই দান করে না, সেই সকল অফিসের বীমা পত্র গ্রহণে যে ভীষণ ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। নিরপেক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন কে বীমা প্রার্থীকে এসব কথা বুঝাইয়া দিবে? এক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কর্ম্ম যদি বীমাকারী গ্রহণ করেন, ও শেষোক্ত কর্ম্ম যদি পরিচালকবর্গের মতে বিপদ সঙ্কুল বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে পরিমাণে অতিরিক্ত চাঁদা চাহিবেন তাহাই প্রদান করিতে বীমাকারী বাধ্য হইবেন, নতুবা বীমাপত্র বাতিল হইবে, এই সর্ত্তে অনেক বীমা অফিস বীমা পত্র বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা অধিকাংশ বীমাকারী অবগত নহেন। এজেন্টগণের নিকট কোম্পানীর গুণের কথাই কেবল শোনা যায়, কিন্তু নিরপেক্ষ পরামর্শদাতার নিকট দোষের কথাও শুনা যাইবে।

উপযুক্ত বীমা পত্র নির্ব্বাচনে অসমর্থ অনেক বীমা প্রার্থী তরুণ বয়স্ককে কুড়ি বৎসরের মেয়াদী বীমা পত্র গ্রহণ করিতে দেখি। এরূপ বীমা পত্র বিক্রয় কোম্পানী ও এজেণ্ট উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট লাভজনক। বীমাকারী প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হইতেই বীমা কোম্পানীর সকল দায়িত্বের অবসান হয়। চাঁদার হার অধিক হওয়ায় এজেণ্টও মোটা কমিশন পাইয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ জীবন বীমায় বিধবার ভবিষ্যতের সংস্থান হয় না। সুতরাং জীবন বীমার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ন্যূনপক্ষে ৫০০৲ টাকার একটী আজীবন মেয়াদী বীমা পত্র স্ত্রীপুত্রের সংস্থানের জন্য সকল বীমাপ্রার্থীর ক্রয় করা উচিত। যে বীমা পত্র নির্ব্বাচন করিলে কোম্পানীর অপেক্ষা বীমাকারীর সুবিধা অধিক হইবে, সে বীমা গ্রহণ করিতে এজেণ্টগণ পরামর্শ দেন না। বীমাকারীর নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা এইজন্য আবশ্যক।
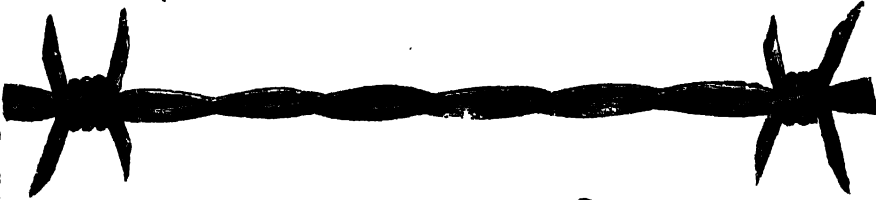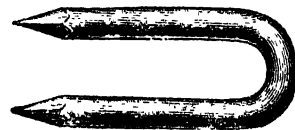
বীমা কোম্পানী সমূহের ব্যালান্স্ সীট্

লিমিটেড কোম্পানী সমূহের Balance Sheet বা সাল তামামীর হিসাব লইয়া সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে এই অভিযোগগুলির বর্ণনা করিয়া ইহার কতগুলি প্রতিকার সাপেক্ষ সেই সম্বন্ধে আমরা আজ আলোচনা করিব।

১। সাধারণ অভিযোগ এই যে এই সকল কোম্পানীর ব্যালান্স সীট্ এমন সংক্ষিপ্ত (condensed and abridged) ও জটিলভাবে প্রকাশ করা হয় যে সাধারণ অংশীদিগের পক্ষে তাহা বোঝা দুঃসাধ্য এবং অনেক সময় অসাধ্য। অথচ লিমিটেড্ কোম্পানী সমূহের অংশ আমাদের দেশে জন সাধারণের মধ্যেই বিক্রীত হয়; কারণ এদেশে যাঁহারা ধনী, জমিদার ও মহাজন—অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে যাঁহাদের ঘরে পুরুষানুক্রমে ধন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে এবং থাকিবার কথা, তাঁহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কোম্পানী সমূহে সাধারণতঃ কোনও অংশ ক্রয় করেন না।

যখনই কোনও কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই আমরা দেখিয়াছি ক্যান্‌ভাসারগণ জনসাধারণের মধ্যেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেয়ার বিক্রয় করে এবং এইরূপে "রাই কুড়াইয়া বেল" করার মত কোম্পানীর মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের কোম্পানী সমূহের constituents বা অংশীগণ অধিকাংশই এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কোম্পানীর ব্যালান্স সীট যখন তৈরী হয় তখন এমনভাবে ও ভাষায় উহা প্রকাশ করা উচিত যাহাতে অংশীদারদিগের পক্ষে উহা বুঝিতে কষ্ট না হয়।

লক্ষ লক্ষ টাকা যে সকল কোম্পানীর মূলধন, হাজার হাজার টাকা যাঁহারা মাল মসলা কিনিতে এবং যাতায়াত খরচ বাবদ অকাতরে খরচ করিয়া থাকেন, তাঁহারা Balance Sheet খানা ছাপাইবার সময় আরও দুই তিন ফর্দ্দ কাগজ বাড়াইয়া একটু সহজ ও বিস্তৃতভাবে কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব নিকাশের বিবরণ যে কেন প্রকাশ করেন না, ইহা অন্ততঃ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ব্যালান্স সীট কেবলমাত্র অংশীদিগের মধ্যেই প্রচারিত হয়; সুতরাং কোম্পানীর ভিতরের অবস্থা বাহিরে প্রচারিত হইবার অজুহাতও এক্ষেত্রে খাটে না। এই যে জটিলভাবে Balance Sheet প্রকাশ করার ব্যবস্থা, ইহা এদেশের কোম্পানী পরিচালকগণ বিদেশী কোম্পানী সমূহের পরিচালনা পদ্ধতি হইতে ধার করিয়াছেন এবং বিদেশী Actuaryগণ যে পদ্ধতিতে ব্যালান্স সীট্ তৈরী করেন এদেশের Actuaryগণও ঠিক মাছিমারা কেরাণীর ন্যায়

তাহারই অন্ধ অনুসরণ করিয়া থাকেন। অথচ এই ব্যালান্স সীটেরই item বা বিষয়গুলি যদি বিস্তৃততর রূপে এবং সহজভাবে প্রকাশ করা হয় তবে আইনের ব্যাঘাতও হয় না, অথচ অংশীদার গণও কোম্পানীর ক্রিয়া কলাপ এবং পরিচালন পদ্ধতি বুঝিতে পারার দরুণ কোম্পানীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট এবং ইহার সুখে দুঃখে অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে পারেন। এইখানে একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বা সাক্ষ্য দিতেছি।

মফঃস্বলে যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোন কোম্পানী আছে তাহাদের ডিরেক্টরগণ বাংলায় যে ব্যালান্স সীট প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাও drawn in conformity with Law. কিন্তু তাহা এমন সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করা হয় যে গ্রাম্য অংশীদিগেরও তাহা বুঝিবার কোনও কষ্ট হয় না। ইহাতে কোম্পানীর সাধুতা ও সুনাম বাড়ে বই কমে না। আর এক কথাও বিবেচ্য। বিলাতের লোক এদেশের লোকদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত; বিশেষতঃ যাহারা কাজ কারবারে টাকা খাটায় তাহারা সকলেই Regular Investors বলিয়া হাজার হাজার টাকার সেয়ার খরিদ করিয়া থাকে এবং লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালকদের সব রকম কারসাজীর বিষয়ে ওয়াকিব্ হাল।

আমাদের দেশের লোক যাহারা সেয়ার কেনে তাহারা investment হিসাবে খুব কমই কিনিয়া থাকে। একসঙ্গে "রথ দেখা ও কলা বেচার" মত দুই চারিখানা সেয়ার কিনিয়া হয়ত দুই একশত টাকা invest করতঃ মনে করে যে প্যাট্রিয়টও হওয়া গেল এবং ব্যবসায়েও "কিছু" খাটানো হইল। কারবারে এই জাতীয় অংশীদের কোনও stake নাই বলিয়াই ইহারা লিমিটেড কোম্পানীর ব্যালান্স্ সীট আদি বুঝিতে চেষ্টাও করে না। অথচ এই জাতীয় অংশীদের অর্থ নিয়াই আমাদের দেশে কোম্পানী গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং "বিলাতে এইভাবে ব্যালান্স সীট তৈয়ারী হইয়া থাকে, অতএব আমরাও অন্ধের ন্যায় তাহারই অনুসরণ করিব" এইরূপ যুক্তির অবতারণা না করিয়া এদেশের জ্ঞান বুদ্ধির উপযোগী করিয়া সরল এবং প্রাঞ্জলভাবে ব্যালান্স্ সীট রচনা করার আমরা পক্ষপাতী।

দ্বিতীয় অভিযোগ

অংশীদিগের চোখে ধুলা দিবার জন্য অডিটরের সাহায্যে ডিরেক্টরেরা অংশীদিগের নিকট অনেক সময় যে রিপোর্ট প্রচার করেন, আসল রিপোর্ট তাহা হইতে ভিন্ন। আইনের হাত এড়াইবার জন্য অডিটরেরা এ সম্বন্ধে যে চালাকী খেলিয়া থাকেন অংশীদিগের মধ্যে প্রায় পনেরো আনা লোকই তাহা ধরিতে বা বুঝিতে পারেন না। ইহাতে আইনের হাত এড়ানো যায় সত্য, কিন্তু ভবিষ্যৎ কোম্পানী গঠনের রাস্তা ক্রমশঃই বিঘ্ন সঙ্কুল করিয়া তোলা হয়।

কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষার সময় অডিটরেরা অনেক সময় হয়ত অনেক মারাত্মক গলদ দেখিতে পান; অনেক সময় হয়ত দেখেন যে ডিরেক্টরেরা নিজেরা কোম্পানীর তহবিল হইতে টাকা কর্জ্জ নিয়াছেন তাহার উপযুক্ত সিকিউরিটি নাই; হয়ত এমন জায়গায় কয়েক লক্ষ টাকা লগ্নী করিয়াছেন যাহা আদায় হবার সম্ভাবনা নাই, কিম্বা হয়ত আধা বা সিকি আদায়

হইতে পারে, অথচ ডিরেক্টরেরা তাহা good assets বলিয়া দেখাইতেছেন ; ইত্যাদি নানা রকমের ক্ষুদ্র বৃহৎ গলদ বাহির হইতে পারে। এই সকল গলদের কথা নানা কারণে ব্যালান্স্ সীটের মধ্যে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া অডিটরেরা অনেক সময়ে একখানি স্বতন্ত্র রিপোর্টে এই সকল কথা সেয়ার হোল্ডারদের গোচরে আনিবার জন্য ডিরেক্টরদিগের নিকট লিখিয়া পাঠান এবং ব্যালেন্স সীট্ স্বাক্ষর করার সময় লিখিয়া দেন—subject to our separate letter or report sent to the Directors. অর্থাৎ এ বিষয়ে আমরা ডিরেক্টরদের নিকট যে স্বতন্ত্র রিপোর্ট বা পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম তাহার মূলে অথবা তাহাই ভিত্তি করিয়া এই ব্যালান্স্ সীট সহি করিলাম।

ব্যালান্সসীটের নীচে যেখানে অডিটরেরা স্বাক্ষর করেন সেখানে এই কথাগুলি লেখা থাকে। সাধারণ অংশীরা এ সকল জানেও না, এবং পড়িলেও পৃথক পত্র বা রিপোর্ট তাহাদিগকে দেখানো হয় না। সুতরাং আসল গলদগুলির কথা ধামা চাপা দেওয়াই থাকে। কিন্তু ক্ষত যদি দুঃসাধ্য এবং গলিত ক্ষতে পরিণত হইয়া থাকে তবে চাপা দিলে তাহা সারে না। একদিন ইহাই কোম্পানীর মৃত্যুর কারণ হয়। তখন সব গলদের কথা বাহির হইয়া পড়ে এবং দেশের লোকের মনেও একটা অবিশ্বাস ও ত্রাসের হাওয়া বহিতে থাকে।

এই সকল কারণের জন্য লিমিটেড কোম্পানীর সেয়ার বেচা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আমাদিগের মতে ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে অংশীদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। তাহা করিতে হইলে সব বিষয়েই তাহাদিগকে সকল কথা অকপটভাবে জানাইতে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইবে যে অংশীরাও কোম্পানীর "হরা মরার" সাথী হইবে এবং তাহাকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এইজন্য কোম্পানীর যে ষান্মাষিক বা বাৎসরিক হিসাব নিকাশ বা ব্যালেন্স সীট্ বাহির হয় তাহা এমন সহজ, সরল এবং অকপট ভাবে বাহির করা উচিত যাহাতে অংশীরা সব বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিলেই পরিচালকদিগের প্রতি যেমন তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িবে, কোম্পানীর প্রতিও তাহাদের সেই পরিমাণে দরদ হইবে। আমরা আমাদের এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য লিমিটেড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।

———

বীমার ইতিহাস

[চুণীলাল লাহিড়ী]

ভারতবর্ষে যাঁহারা অন্ততঃ কিছুকাল যাবৎ বীমার বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না যে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া নূতন নূতন বীমা কোম্পানীর আবির্ভাব বাড়িয়াই চলিতেছে এবং এই প্রকার নূতন নূতন বীমা কোম্পানী যেমন স্থাপিত হইতেছে তৎসহ শত শত নূতন লোকও আসিয়া নানাভাবে বীমা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হেতু কোম্পানী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যেই বলুন আর পরিচালকগণের মধ্যেই বলুন কিম্বা কোম্পানী সমূহের কর্ম্মীগণের মধ্যেই বলুন, দুঃখের বিষয় এই যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই বীমা বিষয়ের আদ্যোপান্ত ইতিহাস, বিভিন্ন প্রকারের বীমার প্রয়োজনীতা এবং উপকারীতার বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যাহাতে সম্যক জ্ঞান বিস্তার হয় তাহার কোনও চেষ্টা করেন না। পরন্তু যাঁহারা কিছুকাল যাবৎ এই বিষয়ের কোনও না কোনও বিশেষ বিভাগের কার্য্যে ব্রতী হইয়া আছেন, এবং যে যে বিভাগের কার্য্যভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে তাহাতেই তাঁহারা এত ভারাক্রান্ত এবং এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার দিনে নিজ নিজ কোম্পানীর জন্য বৎসরের পর বৎসর উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে নূতন বীমার কার্য্য কিরূপে সংগ্রহ করা যায় তাহারই চিন্তায় তাঁহাদিগকে এতই মগ্ন থাকিতে হয় যে তাঁহাদিগের পক্ষে ব্যাপক-ভাবে বীমা বিষয়ের যাবতীয় তথ্যানুসন্ধানের অবসর অতীব অল্প।

বিলাতের চার্টার্ড ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউট (Chartered Insurance Institute of London) নানাভাবে বীমা বিষয়ের শিক্ষা বিস্তারে বদ্ধপরিকর হওয়ায় জগতের অনেক কল্যাণ সাধন করিতেছেন এবং এজন্য আমরা সকলেই ঐ অনুষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষেও এইরূপ অনুষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হইতেছে এবং তাহার ফলে বীমা ব্যবসায়ে ব্রতী শিক্ষিত যুবকগণ অনেকেই ঐ সকল অনুষ্ঠানের সদস্য হইতেছেন কিছুকাল পূর্ব্বেও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য ২।১ জন ব্যতীত আর কাহারও এইরূপ শিক্ষালাভের বাসনার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই বীমার সকল বিভাগেই জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

যুক্তরাজ্যে সর্ব্বপ্রথম যে বীমার চুক্তি পত্র প্রদান করা হয় তাহার ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অক্সফোর্ডের জগদ্বিখ্যাত বডিলিয়ান লাইব্রেরীতে ঐ বীমা চুক্তিপত্রের একখানি অনুলিপি সংরক্ষিত হইয়াছে। উহা একখানি সামুদ্রিক বীমা চুক্তিপত্র (Marine Insurance

Policy) এবং ইংরাজী ১৬১৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঐ বীমা চুক্তি পত্রের তারিখ। কিন্তু বীমা প্রথা প্রচলনের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় পাইতে হইলে ৩০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে এসাইরিয়ার (Assyria) পুরাতন পুস্তকাগারে অনুসন্ধান করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত চুণীলাল লাহিড়ী

আধুনিক সভ্যতার বহুপূর্ব্বে নানা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের মধ্যে নিজ নিজ সম্পত্তি যথা জাহাজ, কিম্বা শস্যাগার, কিম্বা ভারবাহী পশু প্রভৃতির সমূহ নাশ জনিত ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণেরমধ্যে নানা প্রকারের সমিতি গঠিত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ইজিপে্টে (Egypt) কৃষকদল বা গ্রাম্য ব্যক্তিগণ নাইল নদীর তীরে যে সকল গাধার পাল খাটাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহাদিগের বীমার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দলের মধ্যে পরিষৎ গঠন করিয়া ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিত।

সামুদ্রিক বীমায় (Marine Insnrance) ঝড় ঝঞ্ঝা প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটিলে জাহাজের মাস্তুল ছেদন ও মাল প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা, বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত, ইচ্ছাপূর্ব্বক জাহাজের যে সকল ক্ষতি করা হইয়া থাকে, মালিকগণের মধ্যে অংশানুক্রমিকভাবে ঐ সকল ক্ষতি বন্টনের যে ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে ইংরাজী ভাষায় সামুদ্রিক এবং বীমা জগতে"General Average"আখ্যান দেওয়া হয়।

খৃষ্টাব্দের প্রায় ৯০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে বীমা

প্রথার প্রারম্ভের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তৎকালে টায়ার (Tyro) (a) ও সাইডন (Sidon) (b) এবং রোডস (Rhodes) (c) এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী গ্রামের ব্যবসায়ী বা বণিক সম্প্রদায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক, উপরোক্ত "General Average" সম্বন্ধে অনুসৃত বিধি সমূহের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঐ সকল নিয়মাধীনে সমুদ্র যাত্রায় কথনও কোনও বিপর্য্যয় ঘটিলে তজ্জনিত যে ক্ষতি হইত তাহা কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সহ্য করিতে না হইয়া সম্প্রদায়ভুক্ত যাবতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ ক্ষতি বণ্টন বা বিভাগ করিয়া লওয়া হইত। ঐ সময়ের অনেক পরে রোমের সম্রাট জষ্টিনিয়ান তাঁহার প্রসিদ্ধ আইন সম্বন্ধীয় ব্যবহার বিধির মধ্যে উপরোক্ত প্রথার যে প্রবর্ত্তন করেন এইখানে তাহার কিয়দংশের উলেখ করা গেল।

"...if in order to lighten a ship, merchandice is thrown overboard, that which has been given for all, shall be replaced by the contribution of all."

ইংরাজী ১৯০৬ সালে যুক্তরাজ্যের সামুদ্রিক বীমা আইনেও (Marine Insurance Act of 1906) ঠিক এই একই ভাষায় ইহারই উলেখ করা হইয়াছে এবং ইহাই লিপিবদ্ধ আছে। ইহার পরিবর্ত্তে যে প্রথা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে বণিকদিগকে তাঁহাদের জাহাজ বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং নিয়ম ছিল যে নিরাপদে সামুদ্রিক যাত্রা সম্পন্ন করিয়া জাহাজ নিজ নিজ বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, অতীব উচ্চহারে সুদসহ ঐ কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করিতে হইত। কিন্তু সামুদ্রিক যাত্রা-কালীন কোনও বিপর্য্যয়বশতঃ জাহাজ ডুবি প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটিলে উক্ত কর্জ্জ টাকা মায় সুদ সমস্তই মাপ করা হইত।

তারপর আরম্ভ হয়, সামুদ্রিক যাত্রাকালীন বাণিজ্য পোতাধ্যক্ষের জীবনের উপর বীমাচুক্তি পত্র প্রদান করা; কেননা তৎকালে বাণিজ্য পোতাধ্যক্ষগণ নিজেরাই প্রায় জাহাজের মালিক ছিলেন এবং তখনকার ন্যায় দুঃসাহসিক সামুদ্রিক যাত্রায় বাণিজ্য পোতাধ্যক্ষগণই প্রধান বণিক থাকায় ঐরূপ যাত্রাকালীন তাঁহাদিগের জীবনের ক্ষতি ঘটিলে, জাহাজ গন্তব্য বন্দরে পৌঁছিলেও, বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতিরই কারণ হইয়া উঠিত। ঠিক ঐ একই সময়ে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সামুদ্রিক যাত্রা কালীন সামুদ্রিক দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লুণ্ঠনাদি ব্যাপারের জন্য বিপদগ্রস্থ হওয়ায় যে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিত তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার আশায় বণিকগণ বা বাণিজ্য পোতাধ্যক্ষ গণ কর্ত্তৃক দস্যুদিগকে অর্থ প্রদানে বন্ধনদশা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সামুদ্রিক যাত্রার পূর্ব্বেই উপযুক্ত পরিমাণে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া যাইবার প্রথা প্রচলন হয় এবং ইহাও এক প্রকার বীমা প্রথার মধ্যেই গণ্য হইত।

এইভাবে গ্রীস, রোম ও ফিনিসিয়ার অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক, সামুদ্রিক যাত্রা কালীন নানারূপ বিপদের হাত হইতে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে, তাঁহাদিগের মধ্যে এইভাবে নানাপ্রকারের বীমার প্রথা প্রচলিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ তাঁহারা এই সকল প্রথাকে বাঁধাবাঁধি আইনের মধ্যে

For (a) (b) (c) (see Collin's New Advanced Atlas) in Palestine and Turkey in Asia, all on the Mediterranean coast.

আনয়ন করতঃ আদর্শানুরূপ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পান।

রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বেও এইরূপ বীমা প্রথা প্রচলনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের ২৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কার্থেজের সহিত যুদ্ধকালীন রোমের শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ যুদ্ধজনিত বিপদের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত একটি বীমা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন; ইহার নাম ছিল "War Risks Insurance office" এইরূপ বীমার ফলে সৈনিকদিগের জন্য বহুদূরে রসদ সরবরাহকালীন বণিকগণকে শত্রুপক্ষ কর্তৃক কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলে, ঐ সকল ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইত।

খৃষ্টাব্দের প্রথম ১০০০ বৎসরের মধ্যে বীমা প্রথার পরিচয় বা উত্তরোত্তর উহার প্রচলন বৃদ্ধির প্রমাণ ইতিহাস হইতে খুব কমই পাওয়া যায়; কিন্তু বেলজিয়মে প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক কালে, বীমাপণের পরিবর্ত্তে, সামুদ্রিক যাত্রার বিপদাশঙ্কার কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে, বীমা প্রথার যে প্রচলন ছিল ইতিহাস হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ সময়ে ইটালী বাণিজ্য জগতের প্রধান কেন্দ্রস্থল থাকায়, ইটালীরই অনুকরণে বেলজিয়ামে ঐরূপ বীমা প্রথার প্রচলন হইতে থাকে। ইহাও প্রায় সুনিশ্চিত যে ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে ভেনিস এবং ইটালীর উত্তর অঞ্চলের যাবতীয় নগরীর বণিক এবং মহাজন সম্প্রদায় কর্তৃক বীমা কার্য্য পরিচালিত হইত এবং তাঁহারাই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ইউরোপে ঐ সকল বীমা প্রথার প্রবর্ত্তন করেন এবং জার্ম্মাণীর বাণিজ্য ঘটিত সম্মেলনের সাহায্যে ঐ বীমা প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত করিতে অগ্রগামী হয়েন এবং ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ কর্তৃক লণ্ডনস্থিত ইটালীয়ান অধিবাসীগণ যতদিন না লণ্ডন হইতে বিতাড়িত হয়েন ততদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের লম্বার্ড ষ্ট্রীটে ইটালীর অর্থশালী মহাজনগণ তাঁহাদের নিজের আয়ত্বাধীনে ঐ বীমা ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

এলায়াঞ্জ্ আণ্ড্ ষ্টাট্ গার্টার লাইফ্ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

গত যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী ভারতবর্ষের বাজারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহার পরিত্যক্ত স্থানে জাপান গ্যাট্ হইয়া বসিয়া আছে। তার রপ্তানী মাল রাখিবার জন্ম বাজারে কোথাও এতটুকু স্থান নাই। তবে বহুকাল ধরিয়া আদান প্রদানের ফলে ভারতবর্ষ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যে প্রীতি জমিয়া উঠিয়াছিল তাহা অটুট আছে দেখিয়া জার্ম্মাণী আশ্বস্ত হইল।

ভারতবর্ষে বীমার ব্যবসা করিয়া অনেক বিদেশী কোম্পানী প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ দেশে লইয়া যায়, ইহা জার্ম্মাণী বহুদিন যাবৎ দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নানা কারণে এই বীমার বাজারে মনোযোগ দিবার বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ এতদিন তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে বাধ্য হইয়া তাহাকে এইদিকে নজর দিতে হইল। বীমার ব্যবসায়ে একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, বীমাকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ীকে নিজের ঘর হইতে কোন কাঁচা মাল বাহির করিতে হয় না। বীমাকারী তাহার টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ীর প্রতিশ্রুতি-পত্র বগলে করিয়া সন্তুষ্ট মনে ঘরে ফিরিয়া যান। বোধ হয় লাভের দিক দিয়া এমন ব্যবসা দ্বিতীয় আর একটি নাই।

গত যুদ্ধের পর হইতে জার্ম্মাণীর আর্থিক দুরবস্থার কথা কাহারও অবিদিত নাই। দেশের অর্থোন্নতিকল্পে "এলায়াঞ্জ্" কোম্পানীর কর্ত্তারা ডাঃ ডি, এন, মজুমদার নামধেয় জনৈক বাঙ্গালীকে পদগৌরবে ভূষিত করিয়া তাঁহারই মারফতে "এলায়াঞ্জ্ আণ্ড্ ষ্টাট্ গার্টার লাইফ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড" কোম্পানীকে ভারতবর্ষের বীমার বাজারে প্রেরণ করেন। কোম্পানী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে ভারতবাসীকে অনেক কিছুই জানান হইয়াছে—হয়ত অনেক কিছু বাকীও আছে। বিদেশী কোম্পানী—বিশেষতঃ এই 'এলায়াঞ্জ্' প্রমুখ কোম্পানী সমূহের, যাদের জন্মস্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন দেশেই নয়—এদের সম্বন্ধে সবিশেষ ও সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা ভারতবাসীর পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য না হইলেও যে বড়ই দুরূহ, এবং অর্থব্যয় সাপেক্ষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কোম্পানী সম্বন্ধে জানান হইয়াছে—ইউরোপ মহাদেশে এই কোম্পানী একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর মূলধনের বহর ও আড়ম্বরানুষ্ঠানে জনসাধারণের এমনই তাক লাগিয়া গিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বেকার এতবড় যে "জার্ম্মাণ-মার্ক" প্রহসনটা, তাও লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য কোম্পানী, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও ডোমিনিয়ান কোম্পানীগুলিতে একটা সনসনি ভাব দেখা দিয়াছে।

কিছুদিন হইল একখানি দৈনিক কাগজে এলায়াঞ্জ

আণ্ড ষ্টাট্গার্টার্ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ এর জন্মতারিখ সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল ; কিন্তু কোম্পানী সে বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। যাহা হউক সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কোম্পানীর ভারতীয় প্রস্পেক্টাসে কোম্পানীর জন্মতারিখ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ও লণ্ডনের "ফাইনান্সিয়াল্ টাইম্সে" এই সম্বন্ধে যে বিবৃতি আছে, মূল ইংরাজী সহ তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

Allianz এর জন্মতারিখ সম্বন্ধে তাহাদের Prospectus এ উক্ত হইয়াছে :—

The Allianz und Stuttgarter Life Insurance Bank Limited was established IN THE YEAR 1889. In recent years it has absorbed numerous large German Life Insurance companies and has thereby come to be the largest Life Insurance Company on the continent of Europe."

এলায়াঞ্জ্ আণ্ড্ ষ্টাট্ গার্টার লাইফ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৮৮৯ খৃঃঅব্দে স্থাপিত হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক বড় বড় জার্ম্মাণ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত মিলিত হইয়া এখন এই কোম্পানী ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। (প্রস্পেক্টাস ৫ম পৃষ্ঠা)

লণ্ডনের "ফাইনান্সিয়াল্ টাইমস" ইং ১৯২৮ সালের ৫ই অক্টোবর সংখ্যায় লিখিতেছে—"This Company, **which was formed through the amalgamation in 1927** of the four undertakings—The Allianz Life Assurance Company of Berlin, Stuttgart Lubeck Life Assurance Company of Stuttgart, The Stuttgart Life Assurance Company and The Bavarian Life Assurance Company of Munich is itself a constituent of the well-known Allianz and Stuttgart Union Insurance Company, which, in turn, originated from the merger in 1927 of the Stuttgart Insurance Company. The Stuttgart Berlin Insurance Company of Berlin and the Allianz."—এই কোম্পানী,(এলায়াঞ্জ্ আণ্ড ষ্টাট্গার্টার লাইফ ইন্সিওরেন্স্ ব্যাঙ্ক্ লিমিটেড্) ১৯২৭ সনে "দি এলায়াঞ্জ লাইফ এসোরেন্স কোম্পানী অব বার্লিন," "দি ষ্টাট গার্ট লুবেক লাইফ এসোরেন্স্ কোম্পানী অব্ ষ্টাট্ গার্ট". "দি ষ্টাটগার্ট লাইফ এসোরেন্স কোম্পানী" এবং "দি ব্যাভেরিয়ান লাইফ এসোরেন্স কোম্পানী অব মিউনিক"—এই চারিটি কোম্পানীর সমবায়ে গড়িয়া উঠে। পরন্তু, ইহা প্রসিদ্ধ এলায়াঞ্জ্ আণ্ড ষ্টাটগার্ট ইউনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরই অংশীভূত ;—এই এলায়াঞ্জ্ ষ্টাটগার্ট ইউনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী আবার ইং ১৯২৭ সালে দি ষ্টাটগার্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, দি ষ্টাটগার্ট বার্লীন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অব বার্লীন এবং এলায়াঞ্জ্ প্রমুখাৎ কোম্পানীগুলির একত্রীকরণের ফল। (কোম্পানীর এক সার্কুলার হইতে সংগৃহীত)।

লণ্ডনের, 'ফাইনান্শিয়াল্ টাইমস্" বিশ্ববিশ্রুত। এই পত্রিকার উক্তি বাজে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। উপরোক্ত বিবৃতি

পাঠ করিয়া, এলায়াঞ্জ আণ্ড ষ্টাটগার্টার্ লাইফ ইন্সিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জন্মতারিখ সম্বন্ধে সংশয় কেবল বাড়িয়াই যায়—অথচ একটি কোম্পানী, যে নিজেকে ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে যে নিজের জন্মতারিখ সম্বন্ধে এতবড় ভুল করিয়া বসিবে, ইহা চিন্তার বহির্ভূত! আশা করি এলায়াঞ্জ আণ্ড্ ষ্টাট্ গার্টারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এ সম্বন্ধে Financial times of Londonএর উক্তি এবং তাঁহাদের নিজের প্রচারিত প্রস্পেক্টাসের উক্তির সম্বন্ধে সমতা দেখাইয়া দিয়া সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

যদি Financial Times এর উক্তি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে আমার বক্তব্য এই যে বীমাকারীর জন্মতারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেই গচ্ছিত টাকা কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়—কিন্তু বীমা কোম্পানী ঠিক সেই অপরাধে অপরাধী হইলে তাহার কোন প্রতিকার আছে কি?

ইতি—বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ।

ওরিয়েণ্টালের বার্ষিক রিপোর্ট

গত ২০শে এপ্রেল তারিখে ওরিয়েণ্টালের সেয়ার হোল্ডার ও পলিসি হোল্ডারদিগের বার্ষিক সভায় গত ৯৩১ সালে কোম্পানীর কাজের যে বার্ষিক বিবরণী গৃহীত হইয়াছে তাহার এক কপি কর্তৃপক্ষগণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

আমরা এই বার্ষিক বিবরণীর আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িবার এখনও সময় পাই নাই। সেইজন্য সূক্ষ্ম সমালোচনা না করিয়া কোম্পানী গত ৩১ সালে যেরূপ কাজ করিয়াছেন তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

গত দুই বৎসর যাবৎ পৃথিবীব্যাপী যে মন্দার বাজার চলিয়াছে তাহার হাত হইতে কেহ পরিত্রাণ পায় নাই। সকল রকম ব্যবসায়ই নানারূপ ধাক্কা খাইয়াছে এবং বীমার ব্যবসাও এই দারুণ দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। লোকের উপার্জ্জনের পরিমাণ যেমন দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে তেমনি উপার্জ্জনের রাস্তাও সব বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আয় না থাকিলে লোকে নূতন বীমাই বা করিবে কেমন করিয়া এবং পুরাতন বীমার প্রিমিয়ামই বা জোগাইবে কোথা হইতে?

এইরূপ মন্দার বাজারে এবং দারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্যেও যে ওরিয়েণ্টাল গত ৩১ সালে ৫ কোটী সাড়ে চৌত্রিশ লক্ষ টাকার উপর পলিসি বিক্রয় করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের কম কৃতিত্বের কথা নহে।

নূতন কাজ

আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা ২৬,৪৮৬খানা পলিসির উপর মোট ৫,৩৪,৬০,৯৫৪ টাকার বীমা বিক্রয় করিয়াছেন। ইহার বার্ষিক প্রিমিয়াম আয় ২৯,১৫,০২৭৮৶ টাকা। যে জীবনের উপর কোম্পানী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকার বীমা করিয়াছেন তাহার পরিমাণ এক লক্ষ টাকা।

মজুদ পলিসি

এযাবত কোম্পানীর নিকট যত টাকার পলিসি মজুদ আছে তাহার সংখ্যা ১,৯০,৭১৩খানা এবং বোনাস্ সমেত তাহার টাকার পরিমাণ ৪১,৪৮,৭৪,০৩৮ টাকা। ইহার মধ্যে ২১,৪০,৫৪০ লক্ষ টাকা অন্য কোম্পানীর নিকট Reinsure বা পুনর্বীমা করা আছে।

মজুদ অ্যানুইটী

মোট মজুদ অ্যানুইটীর সংখ্যা ৬৬খানা এবং তাহার জন্য বৎসরে ৪১,১০৯৵৮ টাকা দিতে হয়। আলোচ্য বর্ষে ৩খানা অ্যানুইটীর আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া গিয়াছে যাহার জন্য কোম্পানীকে বৎসরে ১০,২০ টাকা দিতে হইত।

প্রদত্ত দাবীর টাকা

আলোচ্য বর্ষে বোনাস্ সমেত মোট ৮৬,২০,১৪৬৸৵৯ টাকার দাবী কোম্পানীকে

দিতে হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে অর্দ্ধেক মৃত্যু-জনিত দাবীর টাকা এবং অপরার্দ্ধেক মেয়াদী বীমার বাবদ টাকা।

আয়ের পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর আয় হইয়াছে ২,৪৫,৪৫,৭৫২৵২ টাকা। তন্মধ্যে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৬২৷৵ টাকা প্রিমিয়াম হইতে আয়। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৭,৮১,৩০৯।৭ টাকা প্রিমিয়ামের আয় বেশী হইয়াছে। মোট খরচের পরিমাণ ,৫০,৫১,৩০৪৸৫ টাকা, সুতরাং এ বৎসরে কোম্পানীর নেট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৯৪,৯৪,৪৫২।৴৯ টাকা।

ফাণ্ডের পরিমাণ

বৎসরের শেষে কোম্পানীর ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১,৩১,৬৯,৩৮২ টাকা।

লগ্নীর কথা

১৯৩০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর লগ্নী সমূহের বাজার দর যেরূপ পড়িয়া গিয়াছিল ৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং তাহার পরে লগ্নীকৃত কাগজ সমূহের বাজারদর তাহার অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর Assets ও Liabilities সমূহের কোনও Valuation করার প্রয়োজন না থাকায় (কারণ Valuation due হয় নাই) এবং গভর্ণমেণ্ট পেপার সমূহের বাজার দর যথেষ্ট বাড়িয়া যাওয়ায় আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট পেপার সমূহে লগ্নীকৃত টাকার কোনও ঘাটতি বাড়তি দেখানো হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয়রা বলিয়াছেন যে, কোম্পানীর Depreciation Equalisation Fundএ যে রিজার্ভ আছে তাহা লগ্নী সম্বন্ধীয় সকল রকম ঘাটতি পুরাইবার পক্ষে যথেষ্ট রহিয়াছে।

সুদের হার—

লগ্নীর উপর আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ইন্‌কমট্যাক্স বাদে গড়ে ৫.৬ পারসেণ্ট সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

ডিভিডেণ্ড—

অংশীরা সেয়ার প্রতি ইন্‌কম্‌ট্যাক্স বাদে ৭৫৲ টাকা করিয়া লভ্যাংশ পাইয়াছেন।

কর্ম্মচারীদিগের বোনাস্—

যাঁহারা অন্ততঃ একবৎসর কোম্পানীর কাজ করিয়াছেন সেই সকল কর্ম্মচারী একমাসের মাহিয়ানা বোনাস্ স্বরূপে পাইয়াছেন।

বীমাকারীদের ঋণের সুদের হার—

ওরিয়েণ্টাল বীমাকারীদিগের পলিসি বন্ধক রাখিয়া এযাবৎ শতকরা ৯৲ টাকা হারে সুদ লইয়া টাকা কর্জ্জ দিতেন। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে বীমাকারীদিগের সুবিধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এই সুদের হার কমাইয়া সাড়ে সাত পারসেণ্ট করিয়া দিয়াছেন।

খরচের হার—

প্রিমিয়ামের আয়ের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ওরিয়েণ্টালের খরচের হার মাত্র ২১.৪ পারসেণ্টে দাঁড়াইয়াছে। ৩০ সালে খরচের হার ছিল ২২.৪ পারসেণ্ট এবং ২৯ সালে ছিল ২৩.৮ পারসেণ্ট। আপাততঃ দেখিলে মনে হয় যে ২৯ সাল হইতে ওরিয়েণ্টাল প্রতিবৎসরই খরচের হার কমাইয়া আনিতেছেন। কিন্তু ২৯ সালে

কোম্পানীর কাজের পরিমাণ হইয়া ছিল সাড়ে ছয় কোটী টাকা এবং বর্ত্তমান সালে ব্যবসায়ে জগধ্যাপী মন্দার জন্য উহা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটী ৩৪॥ লক্ষ টাকায়। সুতরাং ২৯ সালে কোম্পানীর খরচের হার বেশী ছিল এবং কাজ কম হওয়ায় ৩১ সালে খরচের হার কম হইয়াছে। দুর্বৎসরেও ওরিয়েণ্টাল তাহার সুনাম ও কৃতিত্ব বজায় রাখিয়া ভারতবর্ষের সমুদয় জীবনবীমা কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিয়া আছে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। আলোচ্য বর্ষে ওরিয়েণ্টালের কৃতিত্বে বীমা সম্পর্কে সকলেই উপকার লাভ করিয়াছেন।

১। অংশীরা ইন্‌কমট্যাক্স বাদে সেয়ার প্রতি ৭৫৲ ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন।

২। একবৎসরের পুরাতন কর্ম্মচারীরা একমাসের মাহিয়ানা বোনাস্ স্বরূপ পাইয়াছেন।

৩। পলিসি হোল্ডারগণ মাত্র ৭॥ পারসেণ্ট সুদে পলিসি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ পাইয়াছেন। পূর্ব্বে সুদের হার ছিল ৯ পারসেণ্ট।

বারান্তরে আমরা চেয়ারম্যানের উক্তির সার সঙ্কলন প্রকাশ করিব।

বাংলা এবং উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

আমদানী লবণের উপর মণপ্রতি ।১০ আনা কর ধার্য্য হওয়ায় দেশী লবণ প্রস্তুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দেশীয় লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায়ে পূর্ব্ব হইতেই লিপ্ত আছে তাহারা এই সুযোগের ষোল আনা সুবিধা ভোগ করিতেছে এবং অন্যান্য অবাঙ্গালী ধনীগণ এই অপ্রত্যাশিত সুবিধার সদ্ব্যবহার করার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

মণপ্রতি ।১০ আনা শুল্ক দিতে হওয়ায় বিদেশী লবণ এদেশে আমদানী করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই সুযোগে দেশের ধনীরা যদি লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করেন, তবে নিজেরাও যেমন যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন, তেমনি নুনের বাবদে আমাদের যে কয়েক কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত তাহা এদেশে থাকিয়া যাইবে এবং তাহার দ্বারা অন্যান্য ব্যবসায়ের পত্তন করা সম্ভব হইবে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যার সমুদ্রতটে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ তৈয়ারী হইত এবং তদ্দারা এদেশের লোকের ও গবাদি পশুর নুনের অভাব মিটানো হইত। বাংলা এবং উড়িষ্যায় সর্ব্বত্র "নুনিয়া" নামক এক সম্প্রদায় ছিল যাহাদের একমাত্র ব্যবসাই ছিল নুন তৈরী করা। আজিও এই সকল দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নুনিয়াদের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা আর নুন তৈয়ারী করে না। কারণ মদ, গাঁজা প্রভৃতির ন্যায় নুন সরকারের নিজস্ব—একচেটিয়া ব্যবসা। সরকারের বিনা লাইসেন্সে কেহ এই সকল জিনিষ তৈয়ারী করিলে দণ্ডিত হয়।

একদিকে সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly Trade), অন্যদিকে লিভারপুল, স্পেন, এডেন প্রভৃতি বৈদেশিক বন্দর হইতে সস্তা দরে এবং বিনা শুল্কে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নুন এদেশে আমদানী হইতে থাকায় দেখিতে দেখিতে বাংলা ও উড়িষ্যার লবণ প্রস্তুতের কেন্দ্রগুলি একে একে ধ্বংস হইয়া গেল এবং নুনিয়াদের ব্যবসায়ও লোপ পাইল।

এতদিন পরে এই নষ্ট শিল্পটীর পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা হইয়াছে। ভারত সরকার কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদের খেওরার নিমকমহলের ম্যানেজার মিঃ পিটকে এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্টও দাখিল করিয়াছেন। বাংলায় লবণ তৈয়ারী করার জন্য অনেকের মনে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এই রিপোর্টে তাঁহারা অনেক বিষয়ের সন্ধান পাইবেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টের সার সঙ্কলন ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমরা এইখানেই বলিয়া রাখিতেছি যে মিঃ পিটের প্রকাশিত রিপোর্টের সহিত আমাদের অনেক মতভেদ আছে এবং এবিষয়ে যাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান আছে (Expert knowledge), তাঁহাদের

মতও মিঃ পিটের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করার পর আমরা এই সকল বিশেষজ্ঞের মত প্রকাশ করিব। মিঃ পিটের ন্যায় একজন বিশেষজ্ঞ সরকারী কর্ম্মচারী এদেশে লবণ প্রস্তুতের সুবিধা অসুবিধার সম্বন্ধে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমরা সব বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও যাঁহারা লবণের ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকারে পা দেওয়ার চেয়ে সবদিক ভালমন্দ দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া তবে কাজে নামা ভাল এই বোধে আমরা সর্ব্বাগ্রে সরকারী রিপোর্টের সার সঙ্কলন বাহির করিলাম।

লবণ প্রস্তুতের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখিয়া ট্যারিফ বোর্ড এবং সল্ট সার্ভে কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার ভার পরে লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লীর সল্ট ইন্ডাষ্ট্রি কমিটির উপরে বিগত ১৯৩১ সনের ১২ই মার্চ্চ তারিখে। তাঁহারা রিপোর্টের তথ্যগুলির উপর নির্ভর করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে স্বদেশী লবণকে জীয়াইয়া রাখিতে হইলে বিদেশ হইতে যে নিমক রপ্তানী হইয়া আসে, তাহার প্রতিমণের উপর ।১০ আনা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করা একরূপ অপরিহার্য্য। তাঁহাদের রিপোর্টের ২নং প্যারাতে উক্ত হইয়াছে—

"এক মনে ।১০ আনা করিয়া শুল্কধার্য্য করিলে যে আয় হইবে (মোটামুটি ৩৪ লক্ষ টাকা)। তাহা নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য বরাদ্দ করিয়া রাখিতে হইবে :—

(১) সল্ট সার্ভে কমিটি উত্তর ভারতের যে-সমস্ত প্রদেশে নিমক পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সংস্কার ও উন্নতির জন্য যে খসড়া করিয়াছিলেন, তাহার অনুমোদন (যথা,খেয়োরাতে বেশী করিয়া মাল প্রস্তুত করা ও পচবদ্রে জুওলজিক্যাল সার্ভে করা)

(২) ভারতের অন্যত্র যেমন, বাংলা বিহার উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্বদিকের সমুদ্রের তটে-তটে—এই ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করা। সম্ভব হইলে, পরীক্ষা মূলক তথ্য লওয়া। এবং—

(৩) দামের তারতম্য এবং উ্ঠতি পড়্তির সাম্য রক্ষা করিবার জন্য যদি কোন মার্কেটিং বোর্ড এবং তাহার ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের দরকার পড়ে, তবে তাহার জন্য অভিজ্ঞতানুযায়ী কাজের উপযোগী পথ নির্দ্দেশ করা :

উপরোল্লিখিত নির্দ্দেশগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, তহবিলের উদ্‌বৃত্ত অর্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু বণ্টন করিয়া দিবার সময় সেই সমস্ত প্রদেশগুলির কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, যাহারা বিদেশীয় রপ্তানী নিমক দেশে সরবরাহ করিয়া থাকে; কেননা, তাহাদের যে আবার অতিরিক্ত শুল্কও দিতে হইবে!"

ভ্রমণের তালিকা—

মিঃ পিট্ নিম্নলিখিত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন :—

বাংলা—

(ক) পশ্চিম সুন্দরবন বিভাগ এবং তদন্তর্গত সাগরদ্বীপ, ফ্রেজার গঞ্জ, লোথিয়ান দ্বীপ, কগ্‌দ্বীপ, সিদ্ধিচক্

(খ) মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-সন্নিকটস্থ সমুদ্রতীর এবং

(গ) মহিষ বাথানের লবণের হ্রদ সমূহ

উড়িষ্যা—

চিল্কা হ্রদ এবং তদ্‌সমীপস্থ পাঁশপদা, তুয়া দ্বীপ, গুরুবাই এবং নরসিং পাটনা।

মাদ্রাজ—

হুম্মা, সুমদি, পুন্দি, এবং নৌপদের লবণ তৈয়ারীর কারখানা সমূহ।

তদন্তের সীমা—

১৯৩১ সনের সল্ট সার্ভে কমিটি সিন্দু, কাথিয়াওয়ার্ড,রাজপুতানা এবং পাঞ্জাবের কারখানা গুলি কি পরিমাণে বাংলার বাজারের চাহিদা মিটাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া যে রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন বর্ত্তমান রিপোর্টকে তাহার পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হইয়াছে বাংলা এবং উড়িষ্যা, যেখানে পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে নিমক প্রস্তুত হইত।

সঠিক সংবাদ দুষ্প্রাপ্য—

পূর্ব্বোক্ত সল্ট সার্ভে কমিটির সহিত বর্ত্তমান অনুসন্ধান সমিতির একটি বিষয়ে বিশেষ গরমিল লক্ষিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত কমিটি সেই সমস্ত স্থলই পরিদর্শন করিবার ভার লইয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষভাবে বাংলা কিংবা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে লবণ সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা সম্ভবপর নহে। কেননা এবারকার দ্রষ্টব্য স্থলসমূহে লবণ আদৌ প্রস্তুত হয় না। পশ্চিম তীরের নিমক তৈয়ারীর আড্ড সমূহ লবণ প্রস্তুত প্রণালী এবং উহা রপ্তানীর সমুদয় বি রণ আমরা স্বচক্ষে দেখিবার এবং লবণ পর্য্যালোচনা করিবার সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছিলাম উক্ত ফ্যাক্টরী সমূহের পরিচালক আমার মন্তব্যগুলি আনুমানিক হইলেও উহার মূল ব্যবসা হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিবার আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমার অনুসন্ধানের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; কেননা, এ পর্য্যন্ত এদিক দিয়া কোন কাজ হয় নাই এবং এখনো কেবল জল্পনা কল্পনাই চলিতেছে আমি তাই কেবল নিমক তৈয়ারীর স্থল সমূহের উপযোগীতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলিব। স্থানীয় অফিসারগণ এবং যাঁহারা এই কাজ করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছ হইতে আমি লবণ প্রস্তুতের ব্যয় সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আভাব পাইয়াছি। আনুমানিক হইলেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, তাহাদের খসড়া সত্যিকার ব্যয়ের কাছাকাছি যাইয়া দাঁড়াইবে—যদিও উহার ব্যত্যয় হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

বিক্রয়ের দাম—

অনুসন্ধানের সমস্ত ক্ষেত্রেই মনে রাখা হইয়াছে যে সল্ট বোর্ডের হিসাবানুযায়ী কলিকাতায় প্রতি ১০০ মণে ৭৬৲ টাকা করিয়া (Ex-Ship এবং এফ ও আর (রেলে ফ্রি হিসাবে গেলে) এ ৮৫৲ টাকা করিয়া স্বদেশী লবণে ব্যয় হয়। কাজেই যাঁহারা লবণের ব্যবসায় ক্ষেত্রে নামিতে চাহেন, তাঁহাদের এই দরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে।

জল বায়ু সম্বন্ধে তদন্ত—

বাংলা এবং উড়িষ্যায় লবণ তৈয়ারীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে যাইয়া একটী কথা বেশী করিয়া মনে পড়ে; বাংলার উপকূলে কখনো সূর্য্যের উত্তাপে জলীয় অংশ দূরীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয় নাই। উড়িষ্যা সৈকতে—চিল্কা হ্রদের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত - এই একই নিয়ম পালিত হইয়াছে; ইহার পরবর্ত্তী স্থান সমূহে সূর্য্যোত্তাপে নিমক তৈয়ারীর প্রথা এককালে প্রচলিত থাকিলেও প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া বাংলা এবং উড়িষ্যা তটের উত্তর সীমান্তে এইরূপে আর লবণ প্রস্তুত করা হয় না। কাজেই লবণ তৈয়ারীর উপর আবহাওয়া কতখানি প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ, এইরূপে নিমক প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইলে, ব্যবসা হিসাবে ইহা অনেক লাভজনক হইবে। বোম্বাইয়ের আব্হাওয়া বর্ত্তমান অনুসন্ধিতব্য ক্ষেত্রগুলির অনুরূপ এবং সেখানেও সূর্য্যোত্তাপে বহুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কতকগুলি অবস্থার প্রভাব—

সল্ট সার্ভে কমিটির রিপোর্টে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্যের উত্তাপে লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া মোটেই চলিবে না। সমুদ্রের জলে লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ, বৎসরের মধ্যে যে কয়দিন সূর্য্যের উত্তাপ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার দৈর্ঘ্য, আবহাওয়ার তারতম্য এবং ঐ সময়ে বায়ুর বেগ প্রভৃতি হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বোক্ত সার্ভে কমিটির রিপোর্টে বলিয়াছিলাম যে, কোন নির্দ্দিষ্টস্থলে সূর্য্যোত্তাপে কতখানি লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে—তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি হইতেছে, তৎ তৎ স্থলসমূহের আবহাওয়ার সঠিক বিবরণ লওয়া (Meteriological Conditions)। যেখানে লবণ প্রস্তুত করা হইতেছে সেই জায়গার জল বায়ুর হিসাব নিকাশ করিয়া উহাকে প্রস্তাবিত স্থলসমূহের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের আনুমানিক লবণের অঙ্ক বাহির হইবে; কেননা, এ-সমস্তস্থলে জলবায়ুর তারতম্যানুসারেই নিমকের পরিমাণেরও তারতম্য হইবে। বাংলা এবং উড়িষ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়া আমি এই কথা বরাবর মনে রাখিয়াছি।

লবণাক্ত জলের সরবরাহ—

আমাদের প্রথমে ভাবিতে হইবে, জলে কি পরিমাণে লবণের অংশ পাওয়া যাইতে পারে। বাংলার সমুদ্রতটস্থ জলের সহিত পশ্চিম ভারতীয় জলের তুলনা করিলে দেখা যায়, যে, বাংলার জলে লবণ অপেক্ষাকৃত কম। আমি এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের সল্ট ও এক্সাইজ ডিপার্ট-মেণ্টের কর্ম্মচারীগণ পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলাম যে বাংলার সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ ১'৫° "বমীর" বেশী তো নয়ই, বরং বেশী সময়ই কম। এই তথ্য আমরা নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সমস্ত বৎসর ধরিয়া জলে লবণের আপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব—

কলিকাতার পোর্টকমিশনার দয়া করিয়া আমাকে জলীয় লবণের আপেক্ষিক তারতম্যের একটা হিসাব দিয়াছিলেন। উহা কলিকাতা ইলেট্রিক্যাল সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেডের পাওয়ার ষ্টেশনের বয়লারের উপর লবণাক্ত জলের কখন কিরূপ ক্রিয়া হয় তাহা নির্দ্ধারণ

করার জন্য মেটিয়াবুরুজ হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে বছরের কোন্ মাসে নদীর জল কিরূপ লবণাক্ত থাকে তাহা নিম্নের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

	লবণাক্ত ভাগ। গ্রেণ—প্রতি গ্যালনে।
নভেম্বর, ১৯৩০	১ ২৮
ডিসেম্বর, „	১.৩২
জানুয়ারী, ১৯৩১	১.৭৬
ফেব্রুয়ারী, ,,	১৪.০৫
মার্চ্চ, ,,	৩৩'৪৩
এপ্রিল, ,,	১৪৪'৪০
মে, ,,	১৯২'৫৮
জুন, ,,	১৫২'৭৭
জুলাই, ,,	৯'৩০
আগষ্ট, ,,	৯০
সেপ্টেম্বর, ,,	'৯০
অক্টোবর, ,,	'৮৮

জলীয় লবণের তারতম্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উহা অনেক সময় অসম্ভব রকমের বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া থাকে। এমন কি, প্রতি গ্যালনে ০ হইতে ৩৫৯ গ্রেণের তফাৎ হইতে দেখা গিয়াছে। যদিও লবণ তৈয়ারীর কাজে উহার সত্যিকার মূল্য খুব বেশী নহে, তথাপি মৌসুমী বায়ু (প্রথম বর্ষাসূচক হাওয়া) বহিতে থাকিবার পূর্ব্বে জলীয় লবণের অবস্থা কিরূপ থাকে তাহার মোটামুটি আভাষ এই সমস্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। তবে অনুমান হয়, যে গভীর সমুদ্রের জলের লবণাক্ত ভাগ মৌসুমীবায়ু বহিবার আগের দিকেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কম লবণাক্ত জলের অসুবিধা—

বাংলার সমুদ্রজলে লবণের ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া গভর্ণমেণ্ট লবণ তৈয়ারী বন্ধ করিয়া দিবার সময় ইহাকে অন্যতম যুক্তি বলিয়া খাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট প্রামাণ্য ব্যক্তিদের যুক্তির দ্বারা খণ্ডিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত কপিলরাম ভকিলও তন্মধ্যে একজন। তবে এখন আমাদের হাতে যে সমস্ত তথ্য আছে, তাহাতে লক্ষিত হইবে যে পশ্চিম ভারতীয় উপাদানের তুলনায় বাংলায় লবণ তৈরীর সুবিধা অনেক সীমাবদ্ধ। এডেনে অক্টোবর মাসে এবং করাচী, কাথিয়াওয়াড় এবং বোম্বাই তে তৎপরবর্ত্তীমাসে লবণাক্ত জলের যে অনুপাত অঙ্ক লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে লক্ষিত হইবে যে ৩০ "বমাই" (Beaume) সর্ব্বনিম্ন অনুপাত। লবণের ভাগ সাধারণতঃই ইহার চেয়ে বেশী থাকে এবং উপরোক্ত স্থলসমূহে উহার ঘনত্ব সচরাচর আর বেশী বাড়ে-কমে না। সল্ট সার্ভে কমিটির পরিভ্রমণের সময় আমরা দেখিয়াছিলাম যে কাথিয়াবাড়ে নভেম্বর মাসেই লবণ জমিয়া উঠিতেছিল, করাচীতে আরো আগে। বাংলার সমুদ্র জলে যে পরিমাণ লবণ আছে তাহার শক্তি কিছুতেই উপরোক্ত স্থলসমূহের মত হইতে পারে না ; ইহাই ব্যবসা-হিসাবে লবণ প্রস্তুত করার একটী প্রধান অন্তরায় বটে। গ্রীষ্মকালে জলে লবণের ভাগ বেশী হইলেও উহা বেশী কার্য্যকরী হইবে না ; কেননা, বাংলা দেশের প্রচণ্ড বৃষ্টির বেগ এপ্রিল মাসের দিকে কমিতে সুরু না করিলে ভালরূপে কাজ আরম্ভ করা আদৌ সম্ভবপর হইবে না।

জলে বেশী পরিমাণ লবণ থাকার প্রয়োজনীয়তা—

লবণাক্ত জলে যে অন্ততঃপক্ষে ৩° "বমীর" শক্তি থাকা নেহাৎ প্রয়োজনীয়, তাহা অনেকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন না। লবণ তৈয়ারীর প্রধান অঙ্গই হইতেছে জলকে সূর্য্যোত্তাপে কিংবা অন্যকোন প্রকারে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলা। যদি কোন দুইটী ফ্যাক্টরীর একটীর জলে অপরটীর অর্দ্ধাংশ লবণ থাকে তাহা হইলে সমপরিমাণ নিমক প্রস্তুত করিতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে আবহাওয়া দুইস্থলে একই প্রকার, তাহা হইলেও সূর্য্যোত্তাপে সমপরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিতে গিয়া উহাকে অপরটীর দ্বিগুণ জায়গা লইতে হইবে; তৎপরে জলসেচ কার্য্যে, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য এবং জমির খাজনাদি দিতে গিয়া প্রায় শতকরা ৪০ পার্সেণ্ট হিসাবে খরচ বাড়িয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আর্টিফিসিয়াল ইভাপোরেশন প্ল্যাণ্ট বা কলকারখানা খাড়া করিলে কয়লা কিংবা জ্বালানী কাষ্ঠ খরচ প্রভৃতি আনুসঙ্গিক ব্যয়ও আরো বাড়িয়া যাইবে। যদি আনা নেওয়া করার সুবিধা (Transport facilities) এবং বাজারের অবস্থা দুইপক্ষেই সমান থাকে তাহা হইলে, যে কারখানা বেশী লবণাক্ত জল ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়, তাহার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করা অন্য ফ্যাক্টরীর (যাহা কম লবণ-জল ব্যবহার করে) পক্ষে সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

মেসিনের সাহায্যে চিনি প্রস্তুত প্রণালী

লবণের ন্যায় বিদেশ হইতে আনীত চিনির উপর গভর্ণমেণ্ট উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসানোয় দেশী চিনি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এবিষয়ে গত পৌষ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ এবং চিনির নানরূপ Statistics সহ আমরা এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর মেসিনের সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং সাধারণতঃ দেশী চিনি প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে নানাস্থান হইতে আমরা অনেক চিঠি পত্রাদি পাইয়াছি। এই সকল পত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উত্তর দেওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা পুনরায় পত্রিকার সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য সংবাদ দিতেছি। যাঁহারা আমাদের পৌষের সংখ্যায় প্রকাশিত "দেশী চিনির কারবার" নামক সুদীর্ঘ এবং বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েন নাই তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে পৌষের সংখ্যা হইতে সেই প্রবন্ধটী মনোযোগ সহকারে পড়িতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলির প্রতি তাঁহারা সমধিক আকৃষ্ট হইবেন।

(১)

গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করার সহজসাধ্য উপায় সম্বন্ধে শ্রীযুত উষাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১২ নং মুখার্জ্জিপাড়া লেন কালীঘাট হইতে লিখিয়াছেন।

চিনি প্রস্তুত করা অতি সহজেই হইতে পারে। তজ্জন্য বিশেষ দ্রব্য সংগ্রহ, কলকারখানা ও খরচ না করিলেও চলে; পাড়াগাঁয়ে ঘরে ঘরে বিনা খরচে চিনি তৈয়ারী করা যায়; যাহাদের ঘরে আঁক বা খেজুরের গুড় তৈয়ার হয় তাহাদের ত কথাই নাই, যাহাদের বাড়ীতে হয় না.তাহারাও বাজার হইতে এক হাঁড়ি গুড় কিনিয়া আনিয়া চিনি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

প্রথমে একটা গাণি ব্যাগ বা থলেতে এক হাঁড়ি গুড় ভরিয়া তাহার মুখ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া একটী আড়কাঠের সঙ্গে বা ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলাইয়া তাহার নীচে একটা গামলা রাখিতে হইবে; পরে ঐ থলের গায়ে জলের ঝাঁপটা দিতে হইবে। ক্রমে থলে হইতে গুড়ের রস বাহির হইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নীচে গামলায় পড়িতে থাকিবে। প্রথমে লালরঙের রস পড়িতে থাকিবে কিন্তু ক্রমে লালরঙ কাটিয়া গেলে থলেটা নামাইয়া একখানি চাটাই, পাটী, মাদুর বা চটের উপরে গুড়গুলি বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে, তাহার উপর পুকুর হইতে 'কাঁচা শেওলা' যাহাকে ২৪পরগণায় 'পাটা শেওলা' বলে তাহা বিছাইয়া দিবে এবং তাহার উপর আর একখানা থলে, চাটাই বা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; একদিন ঐরূপ অবস্থায় থাকিলে, তারপর দিন ঐ শেওলাগুলি ফেলিয়া দিলেই উৎকৃষ্ট পরিষ্কার সাদা চিনি পাওয়া যাইবে। যাঁহারা সামান্য গুড়ে পরীক্ষা করিতে চান, তাঁহারা গাণিব্যাগের বদলে একখানা মোটা গামছা বা তোয়ালেতে গুড় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া জলের ঝাপটা দিতে পারেন।

জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে গত তিন বৎসরে এক বাংলাদেশে কত টাকার চিনি আমদানী হইয়া বিক্রয় হইয়াছে, তাহা পড়ুন :—

পরিষ্কৃত চিনি

১৯২৩-২৪ সালে ৫,৭৮,০৫১৫৬ কোটী টাকা

১৯২৪-২৫ সালে ৭,২৪,৪৫,৫৯৫ কোটী টাকা

১৯২৫-২৬ সালে ৬,২৫.৯৪,১২০ কোটী টাকা

(২)

যদি বাঙ্গলায় ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বেল্ প্রসেসে দানাদার গুড় ও সেন্ট্রিফিউগেল

মেসিন দ্বারা চিনি প্রস্তুত করা যায়। ইহা সাধারণ গৃহস্থও অল্প মূলধনে সহজে করিতে পারেন। বেল্ প্রসেস্ খুবই সহজ এবং খরচও সামান্য। প্রত্যেক বৎসর ভারতে বহু কোটা টাকার বিদেশী চিনি আমদানি হইয়া থাকে; যা কিছু চিনি ভারতে প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশই পশ্চিমাঞ্চলের দুঃখের বিষয় এপ্রকার লাভজনক ব্যবসায়ে বাঙ্গালী একরূপ নাই বলিলেই চলে।

১৯৩০ সালে ভারতে তের লক্ষ টন চিনি খরচ হয়; তন্মধ্যে তিন লক্ষ টন চিনি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে দুই লক্ষ টন চিনি এই বেল্ প্রসেসের গুড় হইতে পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ গৃহস্থরা সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা প্রস্তুত করে—আর একলক্ষ টন চিনি ভ্যাকম্প্যান্ ওয়ালারা প্রস্তুত করে ভারতবর্ষের ৪৩টি চিনির কারখানা হইতে এই চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। বাকী দশ লক্ষ টন চিনি বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলায় যাহাতে অন্যান্য চাষ অপেক্ষা এই প্রকার লাভজনক ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি হয়, তাহা কৃষকদের বুঝান এবং তাহাদের সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। মুজাফরপুর, চম্পারণ, বেথিয়া ইত্যাদি জেলায় পূর্ব্বে নীল চাষ হইত, নীলের দাম কম হওয়াতে ঐ সকল জমিতে এখন ইংরাজ কোম্পানী নীলের পরিবর্ত্তে বিরাট আকারে ইক্ষুর চাষ করিয়া অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্যাকম-প্যানওয়ালা চিনির কারখানা করিয়াছেন। আমাদের শ্রীমান রাজা সাহেব আজ প্রায় তেইশ বৎসর হইল চিনির কারখানা করিয়াছেন। পরে এই স্থানেই তিন বৎসর হইল আর একটী প্রকাণ্ড চিনির কারখানা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যহ ১৪।১৫ হাজার মণ ইক্ষু পেশাই হয়। এইরূপ অন্যান্য ধনী ব্যক্তিগণ আগামী বৎসরে নানাস্থানে কয়েকটী প্রকাণ্ড চিনির কারখানা করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গলার ধনী ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের এই সমস্ত দেখা আবশ্যক; পিলিভিটে এই প্রকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা চিনির কারখানা থাকা সত্ত্বেও পিলিভিটের পার্শ্ববর্ত্তী রায়বেরেলী জেলাদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ গৃহস্থগণ উপরোক্ত বেল প্রসেসে গুড় প্রস্তুত করতঃ কেবল সেন্ট্রিফিউগেল মেসিনদ্বারা উত্তম চিনি প্রস্তুত করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। বেলের গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি সুস্বাদু ও অন্যান্য

বাঙ্গালী যুবকেরা মোটা গলা করিয়া পথে, ঘাটে, মাঠে গাহিয়া বেড়ায়—

মানুষ আমরা নহিত মেষ

যদি সত্যই মানুষ হও, তবে চিনির বাবদে সারা দুনিয়া মিলিয়া এই বাংলাদেশ হইতে যে কোটী কোটী টাকা লইয়া যাইতেছে, সেই শোষণ বন্ধ কর।

চিনি অপেক্ষা মূল্যেও বেশী। বাঙ্গালায় যাঁহারা চিনির কারখানা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে একবার এদেশে আসিয়া বেল ও ভ্যাকুমপ্যান দ্বারা কিরূপ প্রসেসে চিনি প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেখা খুবই আবশ্যক।

মিঃ পি, এন, পাল, এ, এস, টি, এ, ওয়ার্কস ম্যানেজার, পুরাতন চিনির কারখানা, পিলিভিট, ইউ, পি।

বিহার ও উড়িষ্যায় ১৬, বোম্বাইয়ে ২, মাদ্রাজে ৫, পাঞ্জাবে ২, যুক্তপ্রদেশ, আগ্রা ও অযোধ্যায় ১০।

ইহাদের মধ্যে ভারতীয় মূলধনে চলে ১২টি
অ-ভারতীয়মূলধনে ১৫টি
ভারতীয়, অভারতীয় মিশ্রিত মূলধনে ১টি

বাকি ১০টির মূলধন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানা যায় নাই।*

শ্রীমহাদেব নন্দী শিবপুর, হাওড়া।

আক, খেজুর ও বীট এর রস হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের জমীতে অল্পায়াসে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই তিন ফসল জন্মানো যায়; তাহাতে বাংলার অভাব মিটাইয়া জগতের মুখ মিষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। চাই কেবল ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় এবং ধনীর সহযোগ।

(৩)

বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত স্থানে চিনির কারখানা আছে।

(১) বেঙ্গল পাম্ সুগার্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোঃ লিঃ, সালকিয়া, রেজিষ্টার্ড আফিস:—১৫ কলডাঙ্গা লেন, শালিখা, হাওড়া।

২। ইষ্ট বেঙ্গল সুগার মিলস লিমিটেড, রেজিষ্টার্ড অফিস:—৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৩। তারপুর সুগার ওয়ার্কস, কোট চাঁদপুর, যশোহর।

ভারতবর্ষে আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত মোট ৩৮টী চিনির কল আছে। যথা:—বাঙ্গলায় ৩,

(৪)

বাঙ্গলা সরকার ও বঙ্গীয় জুট গ্রোয়ার্স্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে পাট চাষীদিগকে পাট চাষ কমাইয়া তাহার জায়গায় অধিকতর পরিমাণে ইক্ষু প্রভৃতি অন্য ফসলের চাষ প্রচলন করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কতকটা উপরোক্ত প্রচারের প্রভাবে, এবং কতকটা পাটের মূল্য হ্রাস হেতু স্বেচ্ছায় হয়ত চাষীরা এবার পাটচাষ কমাইয়া ইক্ষুর চাষই অধিক পরিমাণে করিবে। কিন্তু এভাবে ইক্ষুর চাষ বাড়াইবার পর যদি সেই ইক্ষুকে কাজে লাগানোর কোন উপায় না করা যায় তবে তাহাও সেই পাটের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে;

*সংযুক্ত প্রদেশেআরও কতকগুলি চিনির কল তৈয়ারী হইতেছে।—সম্পাদক।

অর্থাৎ বাজারে চাহিদা না থাকার দরুণ উপযুক্ত মূল্য আনয়নের ক্ষমতা থাকিবে না। কাজেই ইক্ষু চাষের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে কাজে লাগানোর অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিস্কৃত সাদা চিনি তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবেই ইক্ষু চাসের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের অর্থ সংস্থান হইয়া দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থার কিছু সমাধান হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা বাংলার কৃষক, জোতদার, জমিদার এবং ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারে চিনি প্রস্তুতের বৃহৎ কেন্দ্র সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণে বাংলা ভারতবর্ষের চতুর্থস্থান অধিকার করিয়াও অদ্যাবধি একটিও ভাল চিনি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কিন্তু মাদ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি প্রদেশ উৎপাদনের পরিমাণে বাংলা হইতে বহু নিম্নে হইয়াও লাভজনক ভাবে একাধিক কারখানা চালাইতেছে।

বর্ত্তমানে বিদেশী চিনির উপর আমদানী শুল্ক বসায় দেশী চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করার স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ বাংলা যদি এই সুযোগের সুবিধা লইয়া তাহার চিনির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা না করে তবে সে আর কোনদিন এই ব্যবসায় নিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

(৫)

সমস্ত ইক্ষুপ্রধান দেশে অর্থাৎ জাভা ফিলিপাইন, ফর্মোসা, হাওয়াই, আমেরিকা, কিউবা, কোস্তোরিকো প্রভৃতি দেশের সব কারখানাগুলিই কেবলমাত্র সুগার রিফাইনারী বা চিনি সংশোধক কারখানা বাদে ইক্ষুর রস হইতে একেবারে চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে। গুড় কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়। এই চিনি শিল্প সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিষ্ট্রী সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং কারখানা চালাইবার পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা প্রয়োজন। এইরূপভাবে শিক্ষিত "বিশেষজ্ঞের" তত্ত্বাবধানে আধুনিক প্রণালী অনুযায়ী কারখানা স্থাপিত হইলে সস্তায় চিনি প্রস্তুত হইবে ও তাহা বিদেশী চিনির প্রতিযোগীতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে কোন আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানা নাই। যুক্ত প্রদেশ, বেহার, পাঞ্জাব, ও মাদ্রাজে মোট ন্যূনাধিক ৪০টি আধুনিক কারখানা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গদেশে সম্প্রতি "বেঙ্গল ডেট্ সুগার ফ্যাক্টরী লিমিটেড" কোম্পানীর স্থাপনা হইয়াছে ৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা, এই ঠিকানায় ম্যানেজিং এজেন্টসকে পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ জানা যাইবে। ইতি—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা কি প্রকারে উত্তম চিনি প্রস্তুত করা যায় তাহার প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

Centrifugal Machine অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। এই প্রকার অয়েল ইঞ্জিন সহ একটি দেড় ফুটের সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা ছোটখাট একটি চিনির ব্যবসা খুব সামান্য খরচে বেশ চালান যায়। সেন্ট্রিফিউগেল মেসিনটি উৎকৃষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

যেখানে খেজুর বা ইক্ষুর দানাদার গুড় পাওয়া যায়, সেখানে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুবিধা ও লাভজনক। ইঞ্জিন ব্যতিরেকে এই কল হাতেও চালানো যায়, ইলেক্ট্রিকের সুবিধা থাকিলে

মটর দ্বারা কিংবা কোন প্রকার চাউল আটাদির কল থাকিলে বেলটিঃএর সাহায্যেও এই কল চালানো যায়। কোনটাতেই হাঙ্গামা কিছুই নাই। একবার দেখাইয়া দিলে অতি সহজে কল চালান যায়।

যে দেশে যে দ্রব্যের অভাব, সেই দেশে সেই দ্রব্য প্রস্তুত হইলে নিশ্চয়ই লাভ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন বহু মূলধন দ্বারা বিস্তর কাপড়ের কল হইতেছে, সেইরূপ বহু মূলধন দ্বারা ভ্যাকুম্প্যান্-ওলা প্রকাণ্ড চিনির কারখানা ও প্রস্তুত করা যায়; অভাবে অল্প মূলধনে কেবল সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন দ্বারা চিনির ব্যবসাও যথেষ্ট লাভজনক, এবং ইহা অধিকাংশ গৃহস্থই করিতে পারেন।

বাঙ্গলায় এইরূপ ছোট কারবার একেবারেই নাই বলিলে হয়। অথচ বাঙ্গলায় বাজারে গুড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পরন্তু বাঙ্গালার লোককে আরও ভাবিয়া দেখা উচিত যে, বিহার, মজঃফর পুর, চাম্পারণ, বেতিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সকল জমিতে নীলের চাষ হইত, নীলের দর কম হওয়াতে ঐ সকল জমিতে ইংরাজ কোম্পানী ইক্ষু চাষ করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে ভ্যাকুম্প্যানওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিনির কারখানা কত করিয়াছেন ও করিতেছেন। রায়বেরেলি ও পিলিভিট জেলাদ্বয়ের মধ্যে ভ্যাকমপ্যানওলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ২টী চিনির কারখানা থাকা সত্ত্বেও ওখানে বহু গৃহস্থ ব্যক্তি এই প্রকার সেন্টিফিউগেল মেসিন সাহায্যে ছোট ছোট চিনির কারখানা করিয়া কত উন্নতি করিয়াছে ও দিন দিন তাহাদের আরও উন্নতি হইতেছে! কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যেখানে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিস্তর ইক্ষুর চাষ হইত, সেখানে পাটের লোভে এখন তাহার সিকিভাগও হয় কি না সন্দেহ, অথচ উপযুক্ত জমিও বিস্তর পড়িয়া আছে। ইক্ষু ৯।১০ মাসে পরিপক হয়। চিনির ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য জুয়ার গাছে ইক্ষুর কলম বাঁধিয়া পাঁচ মাসেই ইক্ষু পরিপক করার বিশেষ চেষ্টা এই দেশেই হইতেছে।

আজ কালকার দিনে আরও স্মরণ রাখা উচিত যে বিদেশী চিনির উপর ডিউটি বাড়িয়া যাওয়ার জন্যে ১৯২১ সালে বিদেশী চিনির দর ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছিল। বাঙ্গলায় এইপ্রকার সেন্টিফিউগেল মেসিনের সাহায্যে চিনির ব্যবসা করার মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

মেসিন চালান ও চিনি প্রস্তুতাদির বিবরণ

হ্যাণ্ড মেসিন সকলেই সহজে বসাইতে পারেন। জমির উপর সামান্য ইটের গাঁথুনী করিয়া মেসিন বল্টু দ্বারা কসিয়া বসাইতে হয়। মেসিনের নীচে হইতে সিমেণ্ট দেওয়া একটা পাকা নালী সংযোগ করিয়া একটু তফাতে সিমেণ্ট দেওয়া পাকা একটা হাউস বা বড় গর্ত্ত করিতে হয়। তাহাতে রাব জমা হয়। এই প্রকারে মেসিন বসাইয়া চালাইবার পূর্ব্বে মধ্যের ঢাকনাটি নীচে নামাইয়া দিতে হয়। তাহা হইলে নীচে গুড় পড়িতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে গুড়ের কলসী ভাঙ্গিয়া কলসী ভাঙ্গা খাবরা আলাদা বাছিয়া গুড়ের ঢেলা ভাঙ্গিয়া সামান্য থকথকে অবস্থায় (যেন বেশী গলা না হয়) এক স্থানে জমা করিতে হয়। পরে পঁয়ত্রিশ সের আন্দাজ এই গুড় এককালীন এইরূপ সেড় ফুটের মেসিনের মধ্যে ঢালিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইবে। উহা খুব সহজে ঘোরে; বেশ জোরে ঘুরাইবে। প্রতি মিনিটে ১৪০০হইতে২০০০ পাক মেসিন ঘুরিতে থাকিবে. দশ বার মিনিটের মধ্যেই মেসিনের মধ্যে
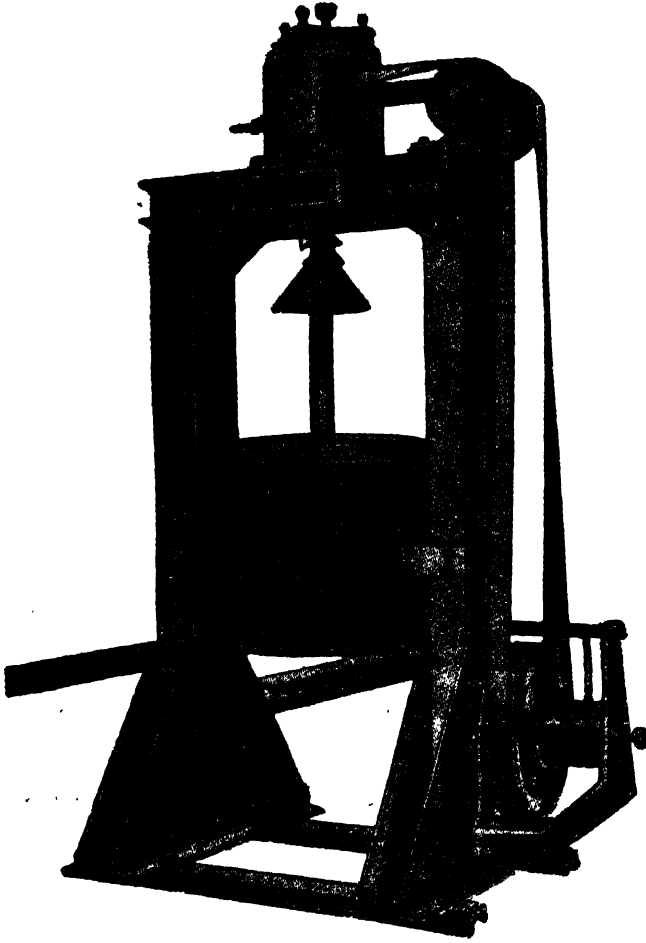
CENTRIFUGAL MACHINE

এই কল অল্প পাওয়ারের অয়েল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত হইয়া থাকে এবং কলের আকারানুযায়ী ইহার দ্বারা দৈনিক দশ মণ হইতে বিশ মণ চিনি তৈয়ারী করা যায়। ঠিক এইরূপ কলই হাতে চালাইবার উপযোগী করিয়া বলবেয়ারিং এর উপর তৈয়ারী হয় এবং কুলী দ্বারা চালাইয়া দৈনিক ২ মণ হইতে ৫ মণ পর্য্যন্ত চিনি তৈয়ারী করা যায়।

গোলার চতুর্দ্দিকে খুব সাদা চিনি জমাট বাঁধা দেখা যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সরু পাকা নালী দিয়া পাকা গর্ত্তে মাত্ জমা হইবে। যখন ঐ প্রকার মেসিনের চতুর্দ্দিকে জমাট বাঁধা চিনি দেখা যাইবে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ছিদ্রযুক্ত পিত্তলের বা টিনের একটী বড় পিচকারী দ্বারা একটু একটু জল ঐ চিনির গায়ে দিতে হইবে। পরে নীচে একটী পাত্র রাখিয়া মেসিন চালান বন্ধ করিয়া সেই নীচের ঢাকনাটি উঠাইয়া উপরে আটকাইয়া একটি কাষ্ঠের খুন্তির দ্বারা সমস্ত চিনি চাঁচিয়া নীচের পাত্রে ফেলিতে হয়। প্রত্যেক বারে উক্ত পরিমাণের গুড় হইতে ১৬ বা ১৭ সের উজ্জ্বল সাদা চিনি প্রস্তুত হয়। দেড় ফুটের উৎকৃষ্ট বিলাতী মেসিনে প্রতি ঘণ্টায় দুই মণের অধিক চিনি পাওয়া যায়। পরে ঐ চিনিকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেলা থাকিলে মুগুর দ্বারা পিটিয়া লইতে হয়; হাণ্ড ও ইঞ্জিন সাহায্যের প্রত্যেক মেসিনের একই নিয়ম। অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুতের জন্য আড়াই ফুটের বড় মেসিনও পাওয়া যায়, তাহাতে ঘণ্টায় চারি মণ চিনি হয়। পরে ঐ প্রথমকার মাতকে পুনরায় পাকাইয়া গুড়ের মত দানা প্রস্তুত করিয়া উহাতে পুনরায় ঐ প্রকারে কিছু বাদামী রংয়ের দু'নম্বর চিনি প্রস্তুত হয়। একান্ত অসুবিধা হইলে ঐ মাত খাইতে সুস্বাদু বলিয়া বেশী দামে বিক্রয় করা যায়।

অনেকে সেণ্টিফিউগেল মেসিন যেরূপ জোরে ঘোরানো উচিত সেরূপ জোরে হয়ত ঘুরাইতে পারে না; ইহার প্রধান কারণ মেসিনের মেকার ভাল নহে এবং যেরূপ উৎকৃষ্ট বলবেয়ারিং (Ballbearing) দেওয়া উচিত সেরূপ দেওয়া হয় নাই। এই সব কারণে উৎকৃষ্ট কোয়ালিটীর মেসিন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমান আন্দোলনে মরা গাঙ্গে বান আসার মত বাংলাদেশের বহু পুরাতন চিনির কারখানার কেন্দ্র সমূহে আবার জীবনের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। নানাস্থানের কারখানা সমূহে আবার নবোৎসাহে এবং নবোদ্যমে চিনি তৈয়ারীর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বিহারের সাহারানপুর এবং পশ্চিমের সাজাহানপুর প্রভৃতি ইক্ষু-চিনি তৈরীর প্রধান কেন্দ্র সমূহেও খুব তোড়জোড় চলিতেছে। কিন্তু যে কারণে বাঙ্গালার এবারের উদ্যমও নষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা সঙ্গত এবং সময়োচিত বলিয়া মনে হইতেছে।

এবারেও দেখিতেছি কয়েকটী জায়গা ছাড়া বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই সেই পাটা শ্যাওলার চাপা দিয়া গুড় হইতে সাদা চিনি তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে। এই প্রক্রিয়ায় চিনি তৈরী করিতে যে কত দীর্ঘ সময় লাগে এবং কত অর্থের অপচয় হয় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তখনই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ৭ দিনে যে পরিমাণ চিনি তৈরী হয় একটী Centrifugal machineএর সাহায্যে এক ঘণ্টায় তাহাপেক্ষা অনেক বেশী চিনি তৈরী হয়। সনাতনী প্রথায় চিনি তৈরী করিতে অনেক লোক লাগে এবং বিস্তর হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, সুতরাং চিনি তৈরীর পড়্তা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় বিদেশী চিনির সহিত দামে টক্কর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আর মেসিনের সাহায্যে দুই একজন লোকে সেই কাজ অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচে অনেক বেশী চিনি তৈরী করিতে পারে। ছোট ছোট কুটীর শিল্পের উপযোগী অল্প ব্যয়ে Centrifugal machine অতি ছোট Hand powerএর বা হস্তচালিতও যেমন পাওয়া যায় তেমনি আবার

বড় বড় কারখানার উপযোগী বিরাট কলও আছে। সুতরাং যাহার যেমন সাধ্য তিনি সেই আকারেই কলের সাহায্যে অল্প পড়তায় চিনি তৈরী করিতে পারেন। আমরা শুধু এই বলিতে চাই যে—এই কলকারখানার যুগে শুধু হাতে সনাতনী প্রথায় বিদেশীর সহিত টক্কর দিবার চেষ্টা অসম্ভব। এই-রূপ এক একটা প্রচেষ্টার নিষ্ফলতায় জাতীয় জীবনে যে হতাশা, নিরুৎসাহ এবং অসাড়তা আনিয়া দেয়, তাহার ধাক্কা হইতে সামলাইয়া উঠিতে এক যুগ কাটিয়া যায়। প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে এখনও গরুর গাড়ী চড়িয়া যাওয়া যায়। কিন্তু যিনি ই, আই, রৈলের মেল অথবা এক্সপ্রেস গাড়ী ছাড়িয়া গোযানে যমুনা সঙ্গমে যাইতে চাহেন, তাঁহার যে শুধু অপরিমিত সময় এবং অর্থ ব্যয় হয় তাহা নহে, লোকে তাঁহার বুদ্ধিমত্তারও প্রশংসা করে না।

হাতে অথবা ইঞ্জিন দ্বারা চালাইবার মত centrifugal machine আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি এসম্বন্ধে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ম্যানেজারের নিকট পোষ্টেজ সহ পত্র লিখিলে সকল জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর পাইবেন।

বীরনগর গ্রামের বিবরণ

জেলা নদীয়ার রাণাঘাট থানার অধীন উলা বা বীরনগর গ্রাম। এই উলা বা বীরনগর অতি প্রাচীন ও বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে বহু ময়রা ছিল; গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় ময়রাদিগের দোকান ছিল। ময়রাগণ উৎকৃষ্ট সন্দেশ, মোণ্ডা, সুরাতোলা পানিতোয়া, ছানাবড়া, রসগোল্লা, এলাচদানা, বীরখণ্ডী, বাতাসা ও কদমা প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। উলার বীরখণ্ডি অতি বিখ্যাত। উহা শীতকালে প্রস্তুত হয় ও উহা হইতে ঘৃত গড়াইয়া পড়ে। উহার মূল্য সন্দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী। বর্ত্তমান কালে বীরখণ্ডি ফরমাইস দ্বারা প্রস্তুত করাইতে হয়; কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় না, কারণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঘৃত পাওয়া যায় না। সে ময়রা আর নাই। সন্দেশ আজিও উৎকৃষ্ট হয়। মহামারীর পূর্ব্বে ময়রা পুকুরের ধারে বহু ময়রার বাস ছিল। সোনা ময়রা বিখ্যাত তক্তিপাকের সন্দেশ করিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ আহার করিতেন। বৈকুণ্ঠ ময়রা উৎকৃষ্ট বীরখণ্ডি করিত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও নীলকমল, রাখাল ও হরি প্রভৃতি ময়রা ও মোহিনী ময়রাণী ভাল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। বর্ত্তমান কালে ৩ ৪টী মিষ্টান্নের দোকান আছে। উলার মিষ্টান্ন বিক্রেতাগণ বিবাহ আদি ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে মিষ্টান্নের ফরমাইস পাইয়া থাকে। এককালে স্থানীয় ময়রাগণ গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিত। কিন্তু উহা বহুকাল পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। ময়রা ব্যতীত গ্রামে কয়েকজন হালুইকর ছিল।

উক্ত বিখ্যাত ময়রাদের মিষ্টান্ন-উৎপাদিকা শক্তি ও কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া উলা গ্রামবাসী জনৈক ভদ্রব্যক্তি শ্রীরোহিণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত একটি চিত্তাকর্ষক কবিতা আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

গীত।

(তর্জ্জার সুর)

মরি হায় গো……… ..

(আহা কি) দেবভোগ্য তক্তিপাক্ সোনা ময়রা বাঁধে।
(ও তার) ষোল দানা হয় যে সমান ওজনে ছটাক পরিমাণ,
(আবার) মুখে দিলে আস্বাদ পেলে ভীমে ছোঁড়া কাঁদে।
[ভীমনাগ—কলিকাতার বিখ্যাত ময়রা]
(ওধারে) বলিহারি বীরখণ্ডি সেই বৈকুণ্ঠ বেঁধেছে।
(তা দেখে) বৈকুণ্ঠেরি নারায়ণ বীরনগর এসেছে।
(আহা সেই) বীরনগরের বীরখণ্ডি যে নদীয়ার সেরা
(কিন্তু) বর্দ্ধমেনে সীতাভোগ তার পিছনে দেয় সাড়া।
ছিল রাখাল হরি নীলকমল সেই মোহিনী ময়রাণী
তারা ভিয়ান করতো দোকান ঘরে গন্ধে ভরতো গ্রামখানি।
(আজ) চলে গেছে সে সব শিল্পী দু'একটী তার আছে ;
(তারা) ভীম আর নবীন কাঁদবে বলে যায় না বেশী কাছে।

৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে উলার মধ্যে ঘন বসতি ছিল। গ্রামের মধ্যে আম কাঁঠালের বাগান করিবার স্থান ছিল না। গ্রামের প্রান্তে স্থানে স্থানে আম কাঁঠাল বাগান ছিল বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও নিম্নশ্রেণীর গরীব লোকের ঘন বসতি ছিল। মহামারীর পর উলা গ্রাম বিদ্ধস্ত হইয়া একেবারে জনশূন্য হইয়া যায় এবং সেই জনমানব বেষ্টিত নগরীর বিদ্ধস্ত বক্ষের উপর ত্যক্ত ভিটায় আজকাল ঘোর অরণ্যে আচ্ছন্ন। তথায় পিটুলী জীবন, তুঁত, সোঁদাল, বাবলা, পুঁয়া, বাঁশ, দেশী সেগুণ প্রভৃতি জ্বালানী ও আয়কর বৃক্ষ আম কাঁঠাল, কদবেল, জাম, গাব, তেঁতুল, বেল, বকুল, বট, অশ্বত্থ, নোনা, আতা, নারিকেল, তাল, পেয়ারা, ছাতিম, শাঁড়া, চালতা, মাদার মেহগেণী ও অন্যান্য কলাগাছ প্রচুর আছে। নদীয়ার মহারাজা ৺কৃষ্টচন্দ্র কৃত ১টী সুবৃহৎ আম্র বাগান অদ্যপিও বর্ত্তমান আছে। উহা গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। উত্তপ্ত নিদাঘ তাপিত পথিকদিগের বিশ্রাম ও ফল ভক্ষণের নিমিত্ত হৃদয়বান মহারাজ ঐ বিরাট কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। প্রবাদ বাক্য এখনও জনমুখে প্রচারিত হয় যে উহা লুটের বাগান। তাঁহার সময় হইতে এখনও এবং যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ঐ বাগান মাত্র পথিকদিগেরই জন্য অবারিত দান। কেহ চুরি করিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিতে বা একটীও বিক্রয় করিতে পারিবে না। উলা গ্রামের প্রান্ত ভাগে আর একটী আম্র বাগান আছে সেরূপ অতি বৃহৎ বাগান বোধ হয় নদীয়ায় আর কোথাও নাই। তাহাকে বাঘের বাগান কহে। যে সমুদয় ফলকর বৃক্ষ আছে তাহার ফল গ্রামে গ্রামান্তরে ও সহরে বিক্রয় করিয়া উলাবাসীগণের কিঞ্চিৎ আয় হয়। জ্বালানী

কাষ্ঠ ও তক্তা করিবার জন্য আম জাম কাঁঠাল কাষ্ঠ রেলযোগে চালান দিয়া থাকে।

উলায় ভিটা জমি এমনি প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া আছে যে যদি কোন ভদ্র যুবক যাহারা বেকার অবস্থায় রহিয়াছেন তাঁহারা যদি দেশে থাকিয়া তাহাতে আওলাৎ করেন তবে তাঁহাদের অনায়াসে পরিবারবর্গ প্রতিপালন হইয়াও মাসে ২৫৲।৩০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে।

পতিত অনাবাদী ও ভিটা ও ফল জলা প্রভৃতি সেই বিরাট জন কোলাহল বেষ্টিত নগরকে গ্রাস করিয়া আছে। ১৯১৭-১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেটেলমেণ্ট জরীপের ফল হইতে জানা যায় যে বীরনগর মৌজায় অনুমান ৬০০০ বিঘা জমি আছে তন্মধ্যে প্রায় ৪০০০ বিঘা গ্রামের ভিটা জমি, বাকি প্রায় ২০০০ বিঘা মাঠের জমি। বীরনগর মৌজা ২।০ মাইল দীর্ঘ ও ১॥০ মাইল প্রশস্ত। উহার পরিমাণ ফল ৩॥০ বর্গমাইল। উলার ভিটা জমিতে তরি তরকারী, সরিষা, মুগ, ছোলা, মটর ইত্যাদি প্রচুর হয়। ভিটা জমিতে ইট ও খাবরার আধিক্য বশতঃ শাক আলু মুলা প্রভৃতি মূলজ গাছ খুব ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দ হয় না; কিন্তু যে জমিতে ইট ও খোলা ভাঙ্গা নাই তথায় ঐ গুলি খুব ভাল হয়। চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাঁধা কপি, ফুলকপি ও ওলকপি প্রভৃতি উলার ভিটা জমিতে মন্দ হয় না। উলার ভিটা জমিতে কলা, আনারস ও পেঁপের ফলন প্রচুর হয় এবং আকার বড় হয়। গ্রামের ভিটা জমিতে গোলাপ, যুই, বেলা, টগর, মল্লিকা, কুন্দ, শেফালী ও গাঁদা প্রভৃতি ফুল আকারে বড় ও প্রচুর হয়। উলার বাহিরে মাঠে উলু খড় এবং বোরো জালী, আমন ও আউস ধান্য হয়। অনুকূল অবস্থায় উলার উৎকৃষ্ট জমিতে বিঘা প্রতি প্রায় ১৭।১৮ মণ ধান পাওয়া যায়। উলার জমিতে সোণা মুগ, হারি মুগ, ছোলা, মটর, মুসুরী, মাসকলাই, ঠিকরে কলাই ও অড়হরের ডাল এবং গম, যব, মশিনা, রাই, তিল, লঙ্কা, পাট, শন, তামাক, হরিদ্রা, ঝাল পটল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নদীয়া ও যশোহর জেলা নীলের চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় বাৎসরিক প্রায় ৮০২৩ মণ ও যশোহর জেলায় প্রায় ৮৬৩৫ মণ নীল উৎপন্ন হইত। কার্পাস নীল ও তুঁত এ অঞ্চলে যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। এ সকল চাষ এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। বহু পূর্ব্বে দেশীয় লোকদিগের হস্তে ছোট ছোট নীলের চাষ ও কারবার ছিল। ধনী ইংরাজ বণিকগণ নীল চাষের জন্য জমি ও উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় কারবারগুনি আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ক্রমে প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে। উলার বহির্দ্দেশে স্থানে স্থানে নীলকুঠী ছিল। উলার মধ্যে বহু খেজুর গাছ আছে। ইহাদিগের রস হইতে শীতকালে উৎকৃষ্ট সরস কলসীর বা নাগরীর গুড় ও শুষ্ক পাটালি গুড় প্রস্তুত হয় ও নানা স্থানের লোক উহা খরিদ করিয়া লইয়া যায়।

এবিষয়ে যদি কাহারও কিছু জানিবার থাকে তবে প্রবন্ধ লেখকের নিকট নিম্নের ঠিকানায় পোষ্টেজ দিয়া পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীরোহিণীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ—বীরনগর, উলাগ্রাম
(নদীয়া)।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ২য় সংখ্যা

সাবান প্রস্তুতের নানারূপ উপাদান

কাপড় কাচা সাবান দুই জাতীয়।

প্রস্তুত প্রণালী ভেদে এদেশে প্রচলিত কাপড় কাচা সাবান প্রধানতঃ দুই জাতীয়। প্রথম জাতীয়ের নাম "গোলা সাবান," "ডেলা সাবান" "ডিগা সাবান" "ভিজে সাবান," "চোটা সাবান" ইত্যাদি ইহার বিভিন্ন নাম আছে। ইহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান। ইহার কোন বিশিষ্ট আকার নাই, সাধারণতঃ তাল বা পিণ্ডাকারে বিক্রীত হয়। অপর জাতীয় সাবানের নাম "বাক্স সাবান"; নানাপ্রকার আকার ও মার্কা বিশিষ্ট, চতুষ্কোণ, গোলক প্রভৃতি এবং "বার সোপ" এই শেষোক্ত জাতীয় সাবান। এই সাবান উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধই হইয়া থাকে।

যন্ত্রাদির ব্যবহার।

অল্প মূলধনের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় এই প্রবন্ধে বর্ণিত সাবান প্রস্তুত ব্যাপারে যন্ত্রাদির ব্যবহার অতি অল্প মাত্রই নির্দ্দেশিত হইয়াছে, এবং যাহা হইয়াছে তাহাও প্রস্তুতকারীর ইচ্ছা সাপেক্ষ। যে যে স্থলে যন্ত্রাদির ব্যবহার অপরিহার্য্য কেবল সেই সকল স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। সাধ্য হইলে যন্ত্র ব্যবহার করা ভাল, কারণ শ্রম লাঘবকারিতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি গুণের জন্য যন্ত্র ব্যবহারের যে উপকারিতা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাবান প্রস্তুতের জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যন্ত্রাদি দরকার হয়।

১। একমণ তৈলের সাবান জ্বাল দিতে অন্ততঃ ৫/ মণ জলের একটী কড়াই।

২। শিলিকেট মিশাইবার জন্য উক্ত পরিমাণ পক্ষে ৴ মণ জল ধরে এরূপ একটী কড়াই।

৩। কষ্টিক ভিজাইবার জন্য একটী লোহার কড়াই।

৪। তৈল ও কষ্টিক জল ইত্যাদি ঢালা-ঢালি করিবার জন্য মগ, বাল্‌টী ইত্যাদি।

৫। সাবান জ্বালের সময় প্রয়োজন অনু-সারে উহা নাড়িবার জন্য লোহার খন্তি ১টা।

৬। তরল সাবান উঠাইয়া দেখিবার জন্য এবং কড়াইর গাত্র হইতে সাবান উঠাইয়া দিবার জন্য কর্ণিক ১টা।

৭। দাঁড়ী পাল্লা ও ওজন ১ সেট।

৮। দ্বিতীয় কড়াইতে সাবান ও শিলিকেট একত্র মিলাইবার জন্য অগ্রভাগে প্রশস্ত একখণ্ড কাষ্ঠ শলাকা। (নৌকার বৈঠার ন্যায়)

৯। সাবান ছাঁচ করিবার জন্য মাটীর মুচী অর্থাৎ পেয়ালা। ইহা মণ প্রতি ১২৫।১৫০টী লাগে।

(ক) সাবানের কারখানার ভিতর খুব নিকটে ভাল জলের বন্দোবস্ত থাকা দরকার; সাবানে যে জল দিতে হইবে তাহা যেন Hard water না হয়।

(খ) সাবান জ্বাল দিতে কাঠের জ্বালই ভাল তবে কয়লা দিয়াও কাজ চলে।

(গ) কড়াই দুইটীর মাপ অনুযায়ী দুইটা চুল্লীর দরকার।

উপাদান ভেদে সাবানের গুণাগুণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জাত তেল, জান্তব চর্ব্বি, প্রভৃতি হইতে সাবান প্রস্তুত হয়; কিন্তু সকল তৈল বা চর্ব্বি হইতে যে একই প্রকারের সাবান পাওয়া যায় তাহা নহে। কোন তৈল বা চর্ব্বির সাবান অতিশয় কঠিন হয়, আবার কোন তৈলের সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া থাকে। সাবান অতিশয় কঠিন হইলে তাহা কাপড়ে মাখাইবার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়; আবার অত্যন্ত নরম সাবান ছাঁচ বা বাক্স মধ্যে জমিয়া কঠিন হইতে পারে না। সুতরাং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা সহকারে বিভিন্ন পরিমাণে একা-ধিক প্রকার তৈল বা চর্ব্বির সংযোগে সাবান প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রায় সকল জান্তব চর্ব্বি হইতে কঠিন সাবান উৎপন্ন হয়। যে সকল উদ্ভিজ্জাত তৈল সাধারণতঃ কঠিন অবস্থায় থাকে তদুৎপন্ন সাবানও কঠিন হইয়া থাকে। তিসির তৈল, রেড়ীর তৈল প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত সাবান অতি-শয় নরম হইয়া থাকে। মহুয়া তৈল ও বাদাম তৈল হইতে নাতি কঠিন সাবান পাওয়া যায়। বিভিন্ন তৈল ও চর্ব্বির সংমিশ্রণে প্রস্তুত সাবান যদি অত্যন্ত কঠিন হয় তাহা হইলে ব্যবহার কালে উহা অতি অল্প অল্প ক্ষয় হয়, ও ফলে বস্ত্রাদি ভালরূপে পরিষ্কৃত হয় না। উপযুক্ত মাত্রায় কঠিন সাবান উৎপাদক ও নরম সাবান উৎপাদক চর্ব্বি ও তৈলের ব্যবহার করিলে তবেই সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উত্তম সাবান প্রস্তুত হয়।

সাবান না কঠিন না কোমল হওয়া দরকার। শক্ত সাবানের তৈল এবং নরম সাবানের তৈল এই দুই রকম তৈল উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সাবান তৈয়ার করিলে উত্তম সাবান হয়।

যে সাবানে যত বেশী ফেনা হয়, সেই সাবানে কাপড় ততবেশী পরিষ্কার হয়। তৈল নির্ব্বাচন ঠিক হইলে সাবানে বেশী ফেনা হয়। তৈলের সাথে রজন মিশাইলে ফেনা বেশী হয়।

"বার সোপ" (সাবান) প্রস্তুত জন্য প্রায়

সকল উদ্ভিজ্জাত তৈল ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গোলা সাবান প্রস্তুতে সাধারণতঃ বাদাম ও মহুয়ার তৈল ব্যবহার হয়।

তৈল ও চর্ব্বির বিশুদ্ধতা।

সাবান প্রস্তুত কার্য্যে যে সকল তৈল ও চর্ব্বি ব্যবহৃত হইবে সেগুলি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ, অর্থাৎ ভেজাল বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। ধুলা. মাটি, কুটী, প্রভৃতি তাদৃশ অপকারী নয়; কারণ লবণ যোগে গ্লিসারীণ পৃথক করার সময় ঐ সকল ধুলা, মাটী, ইত্যাদি সাবান হইতে দূরীভূত হয়। অনেক সময় বাজার চলন উদ্ভিজ্জ তৈলের সহিত বর্ণ গন্ধহীন এক প্রকার খনিজ তৈল ভেজাল থাকে। খনিজ তৈল মধ্যে, সাবানের উপাদান নাই, সুতরাং উহা হইতে সাবান প্রস্তুত হইতে পারে না। পরন্তু উহা সাবান প্রস্তুতের ঘোর অন্তরায় স্বরূপ। সুতরাং খনিজ তৈল মিশ্রিত উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহার করা অবিধেয়।

কষ্টিক সোডা।

সাবানের অপর উপাদান "তীক্ষ্ণক্ষার" বা কষ্টিক সোডা বর্ত্তমানে বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বে ঐরূপ পাওয়া যাইত না। তৎকালে প্রত্যেক সাবানের কারখানায় কাপড় কাচা সোডা ও চূণের সাহায্যে কষ্টিক সোডা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে কারখানায় চূণের প্রয়োজন হইত বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল যে সাবানের সহিত চূণ মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এখনও বহু লোকের সাবান সম্বন্ধে অন্ততঃ অল্প মূল্যের সাবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা আছে। বলা বাহুল্য এই ধারণা বর্ত্তমানে অমূলক; সাবান প্রস্তুত করিতে চূণের প্রয়োজন হয় না। ইহা সর্ব্বদাই জলের সহিত গুলিয়া তরল অবস্থায় তৈলের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। লোহা ব্যতীত অন্য কোন ধাতুর পাত্রে কষ্টিক রাখা বা ভিজান সহজও নহে। কষ্টিক জলে দিবার পর মাঝে মাঝে নাড়িতে হয়; নচেৎ অনেক সময় পাত্রের নীচে জমাট বাঁধিয়া যায়। কষ্টিক সোডার "লাই" তেলের সাথে মিশাইতে হয়। কখনও শুধু কষ্টিক সোডা তৈলে মিশাইবে না।

সাবান তৈয়ারীর অন্ততঃ ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে লাই তৈয়ার করিবে। কারণ কষ্টিক সোডা জলে গলিতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগে।

বিভিন্ন জাতীয় তৈল ও চর্ব্বির জন্য বিভিন্ন পরিমাণে কষ্টিক সোডার প্রয়োজন হয় না। এই পুস্তিকায় যে সকল তৈল ও চর্ব্বির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলির ১০০ ভাগ পরিমাণের সহিত ১৩ হইতে ১৭ ভাগ কষ্টিক সোডা ব্যবহার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কষ্টিক সোডা যদি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়, তবেই ঐ পরিমাণ লাগিবে। অবিশুদ্ধ হইলে উহাপেক্ষা অধিক লাগিবে। নবীন শিল্পীর পক্ষে এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া সোডা ব্যবহার করা উচিত। পরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইলে আর পূর্ব্ব হইতে পরিমাণ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইবে না; সাবান প্রস্তুত কালে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা কষ্টিক সোডার হ্রাসাধিক্য, প্রয়োজনীয়তা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যাইবে।

৭৬ ৭৮% কষ্টিক সোডা ব্যবহার করা উচিত। ৯৮% কষ্টিক সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়।

দশ সের তৈলাদিতে ৭৬—৭৮% এর কষ্টিক সোডার পরিমাণ নির্দ্ধারণ

১০ সের নারিকেল তৈলে ২ সের ১১ ছটাক কিম্বা ২ সের ১১॥ ছটাক কষ্টিক সোডা নিলে ভাল হয়।

১০ সের অন্যান্য তৈল ও রজন প্রভৃতিতে ১ সের ১৪॥০ ছটাক কিম্বা ১ সের ১৫ ছটাক কষ্টিক সোডা নিলে ভাল হয়।

এই কষ্টিক সোডা জলে গলাইয়া লাই করিবে। হাইড্রোমিটারে (Hydrometer) "ব্যোম" (Baume) দাগে ১০ ডিগ্রী বা টোয়াডল (Twaddle) দাগে ১৫ ডিগ্রীর লাই প্রথম অবস্থায় এবং শেষভাগে ব্যোমদাগে ১৫ ডিগ্রী বা টোয়াডল দাগে ২২ ডিগ্রীর লাই মিশাইবে।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবানের প্রস্তুত প্রণালী একাধিক প্রকার। তাপ দ্বারা ফুটাইয়া (পাকান সাবান boiling Process বা Semi boiling Process) এবং বিনা তাপেও (ঠাণ্ডা সাবান Cold Process) সাবান প্রস্তুত হয়। সাবান প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে "গ্লিসারীণ" নামক একটী রাসায়নিক পদার্থও উৎপন্ন হয়। কোন কোন প্রণালীতে ঐ উৎপন্ন গ্লিসারীণ সাবানের মধ্যে থাকিয়া যায়। উন্নত প্রণালীতে তাপ দ্বারাই সাবান প্রস্তুত হয়, এবং ঐ রূপে উৎপন্ন গ্লিসারীণ হইতে সাবান পৃথক করা হয়। এই উভয় প্রণালীই বর্ত্তমান পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

পাকান সাবান (Boiling Process)

সাবান জ্বাল দেওয়ার প্রণালী চারিভাগে বিভক্ত, যথা :—

১। সাবান পাকান (Saponification)

২। সাবানের জল কাটান (Salting out)

৩। উপযুক্ত সিদ্ধ ও পরিষ্কৃত করা (Boiling Proper and purification)

৪। শিলিকেট্ মিশান (mixing Silicates)

সাধারণ কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ সাবান পাকান ও শিলিকেট মিশান এই দুইটী প্রক্রিয়াই করা হয়। সাবানের জল কাটান ও উপযুক্ত সিদ্ধ ও পরিষ্কৃত করণ করা হয় না। উত্তম কাপড় কাচা সাবান এবং গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত করিতে সকল প্রক্রিয়াই করা হয়।

সাধারণ কাপড় কাচা সাবানে China clay Soap stone প্রভৃতিও মিশান হয়। তাহা শিলিকেট মিশানকালীন মিশাইতে হয়।

সাবান পাকান (Saponification)

যে সকল চর্ব্বি বা তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করিতে হইবে সেগুলি বা তাহাদের মধ্যে কোনটী কঠিনাবস্থায় থাকিলে অগ্রে তাহা তাপ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া তরল করিতে হইবে। তরল হইলে শীতল হইবার পূর্ব্বেই যে যে চর্ব্বি বা তৈল যে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে তাহা মাপিয়া কড়ায় ঢালিতে হইবে। অতঃপর ঐ তৈলাদির সহিত কষ্টিক সোডার জল মিশাইতে হইবে।

তৈলাদির সহিত সর্ব্বপ্রথম যে লাই মিশাইতে হইবে উহাতে কষ্টিক সোডার ভাগ অল্প এবং জলের ভাগ অধিক হওয়া চাই। ঐ লাইয়ে শতকরা মাত্র সাড়ে ছয় ভাগ কষ্টিক সোডা ও অবশিষ্ট সাড়ে তিরানব্বই ভাগ জল থাকিবে।

উপরোক্ত লাই হাইড্রোমিটারে (Hydrometer) "ব্যোম" দাগে হইবে ১০ ডিগ্রী, এবং "টোয়াডল্" দাগে হইবে ১৫ ডিগ্রী।

তৈলাদির সহিত লাই সংযোগ করিয়া কড়া মধ্যস্থ মিশ্র পদার্থ উত্তপ্ত করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে আলোড়িত করিতে হয়। আলোড়নের জন্য বড় খুন্তী ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাপদানের ফলে কড়ামধ্যস্থ পদার্থ ফুটিতে থাকে, এবং ধীরে ধীরে তৈলাদি মধ্যস্থ এসিড ভাগের সহিত কষ্টিক সোডার সংযোগ ঘটে ও তৎফলে সাবান উৎপন্ন হইতে থাকে। তৈলাদি সর্ব্বদা আলোড়িত অবস্থায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিছুক্ষণ এইরূপ ক্রিয়ার ফলে কড়ামধ্যস্থ কষ্টিক সোডাটুকু নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন পুনরায় লাই যোগ করিতে হয়, এবং কিয়ৎকাল পরে উহাও নিঃশেষ হইলে আবার লাই যোগ করিতে হয়। এইভাবে বারে বারে লাই যোগ করিতে হইবে।

প্রত্যেকবার লাই যোগ করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে কড়ামধ্যস্থ পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া উচিতমত হইতেছে কি না। পরীক্ষা দ্বারা যখন বুঝিতে পারা যাইবে যে যথাযথ ক্রিয়া হইতেছে, ও তৎফলে কষ্টিক সোডা নিঃশেষিত হইতেছে, তখনই আবার লাই যোগ করিতে পারা যাইবে, নচেৎ নহে। তবে পাকের প্রথম ভাগে কষ্টিক সোডা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হইলেও, আংশিক নিঃশেষিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই, পুনরায় লাই যোগ করা চলিতে পারে। পাকের শেষভাগে কিন্তু

এরূপ করা চলে না। তখন যে কষ্টিক সোডা পূর্ব্বে যোগ করা হইয়াছে তাহা একেবারে নিঃশেষিত না হইলে পুনরায় লাই যোগ করা অবিধেয়।

তবে এইটুকু সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যে ঘন ঘন কষ্টিক লাই কড়ায় ঢালিয়া কষ্টিক সোডার শক্তি যেন হঠাৎ বেড়ে না উঠে। কেন-না তাহাতে সাবান উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে। তৈল ও জল মিলিয়া সাবান প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই যদি জল শুকাইয়া যাইয়া জিনিষগুলি অস্বাভাবিক ঘন হইয়া যায়, তবে উপযুক্ত পরিমাণ জল দিবে।

সাবান প্রস্তুত ক্রিয়া যখন শেষ হইয়া আসিবে তখন অপেক্ষাকৃত ঘন কষ্টিক লাই যোগ করা আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে উৎপন্ন সাবানের সঙ্গে অধিক পরিমাণ জল থাকিবে না। Saponification এর শেষ অবস্থায় অত্যন্ত তরল কষ্টিক করিলে অযথা কাজ বেড়ে যায়। কেননা লবণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে ঐ জল জ্বাল দিয়ে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিতে হয়। কাজেই বেশী জল থাকলে তা উড়িয়ে দেবার জন্যে বেশীক্ষণ জ্বাল দিতে হবে।

সাধারণতঃ পাকের শেষভাগে যে "লাই" যোগ করা হইয়া থাকে উহা (১৫° ব্যোমী বা ২২° টোয়াডেল)।

পাকের শেষভাগে দেখিতে হইবে যে,সমস্তটুকু

তৈল বা চর্ব্বি নিঃশেষে সাবানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না ; এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে, সাবান মধ্যে কষ্টিক সোডার বিশেষ আধিক্য থাকিয়া গেল কিনা ? উত্তমভাবে পাক কার্য্য সম্পন্ন হইলে তৈলাদি বা কষ্টিক সোডা এতদুভয়ের কোনটীই অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু শেষে যতক্ষণ না কষ্টিক সোডার ঈষৎ আধিক্য লক্ষিত হয়, ততক্ষণ নিঃসংশয়ে জানা যায় না সে সমস্ত তৈলটুকুই সাবান হইয়াছে। পাক শেষে বরং কষ্টিক সোডার ঈষৎ আধিক্য থাকা ভাল, কিন্তু অরূপান্তরিত তৈলাদি থাকা ভাল নহে।

পাকের পরিসমাপ্তি নির্ণয় করিবার জন্য জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

যথোচিতভাবে পাককার্য্য সমাপ্ত হইলে কড়া মধ্যে তরল সাবান ও গ্লিসীরীণ এবং সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ অব্যবহৃত কষ্টিক সোডা থাকে। এক্ষণে ঐ গ্লিসীরীণ ও কষ্টিক সোডা হইতে সাবান পৃথক করিয়া লইতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা এবং উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে শুধু লবণ তৈয়ারী করা যাইতে পারে

উত্তর মান্দ্রাজের ফ্যাক্টরীগুলিতে অনেক লবণ তৈয়ারী হইলেও, তাহাদের কাজ জানুয়ারী কিংবা তাহার কিছু পরেই আরম্ভ হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, যে বাংলা এবং উড়িষ্যা তীরের লবণ প্রস্তুত করা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভূভাগের মত সুবিধাজনক না হইলেও, বৎসরের মধ্যে কিছুদিন কাজ চলিতে পারে।

লবণাক্ত জলের শক্তি পরীক্ষা

আমার মনে হয়, সমুদ্রের জলে কি পরিমাণ লবণ থাকে, তাহা জানিবার জন্য সমুদ্র তীরের বিভিন্ন স্থলে সারা বছর ধরিয়া তাহার পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক। এই কাজ স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে; তাহারা লবণ জলের নমুনা লইয়া উহা আলিপুর গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসে (পরীক্ষা গৃহ) পাঠাইলেই, উহার বিশ্লেষণ চলিতে পারে—এইরূপে যে খরচ হইবে তাহা বিশেষ আমদানী শুল্ক ফণ্ড হইতেই মিটানো যাইতে পারে। বয়মে হাইড্রোমিটার কিংবা কেবল মাত্র হাইড্রোমিটার দিয়া অনুপাতের হিসাব বাহির করিলে তাহা নির্ভুল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। এই সমস্ত যন্ত্রের ব্যাপারে অনেক ভুল হওয়া সম্ভব; কিন্তু ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় সঠিক বিবরণ সহজেই আদায় হইবে।

বৎসরে কতদিন কাজ করা সম্ভব

অস্বাভাবিক উত্তাপে (artificial heat) সাধারণ সমুদ্র জল গরম করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে খরচ অনেক বাড়িয়া যাইবে—কাজেই সূর্য্যোত্তাপের উপর কিঞ্চিৎ নির্ভর করিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রে, যেখানে কাজ সুরু করা হইবে সেখানকার আবহাওয়ায় কতদিন সূর্য্যের উত্তাপ পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। বৃষ্টি বাদল ভরা বাংলার ঋতুর সহিত অবশ্য এডেন কিংবা উত্তর পশ্চিম তীরের তুলনা করিয়া কোন লাভ নাই; কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতা, উত্তর মান্দ্রাজ ও চিল্কা হ্রদের সহিত পারস্পরিক তুলনা করিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না। বৃষ্টিপাতের দিনপঞ্জী যাহা আমাদের হাতে আছে, তাহাতে লক্ষিত হইবে যে, সূর্য্যোত্তাপে লবণ জমানো এপ্রিল মাসের পরে আর চলিবে না—বৎসর খুব ভাল হইলে, মে মাস পর্য্যন্তও কাজ চলিতে পারে। তবে ডিসেম্বর মাসের দিকে জলে লবণের শক্তির পরিমাণ বেশ বাড়িয়া যায়। আমি উত্তর পূর্ব্ব তীরের জলহাওয়ার পরিবর্ত্তন ডিসেম্বর হইতে

মে মাস পর্য্যন্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে জুনমাসে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ ১০" হইতে ১২" তে পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই এ সময়ে সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করা নেহাৎ হাস্যাস্কর। আমি ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত—পাঁচ মাসের—বৃষ্টিপাতের একটা হিসাব এবং শুধু মে-মাসের একটা হিসাব স্বতন্ত্রভাবে খাড়া করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব্বোক্ত পাঁচ মাসের কাজ মে মাসেও ধারাবাহিক ভাবে করিয়া যাওয়া সম্ভবপর কিনা তাহাই দেখা। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত এই যে, কাজ করিবার মাসগুলিতেও (working season) সমানভাবে লবণ তৈয়ার করিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। যদি সম্ভব হইত, তবে, এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের পরিশ্রম শীতকালের কাজের চেয়ে ঢের বেশী ফলপ্রদ হইত।

আবহাওয়ার বিবরণ

বোম্বাই, পুরী এবং ভিজাগাপতমের জলবায়ুর অবস্থা বোম্বাই, গঞ্জাম এবং নৌপদের প্রতিও প্রযোজ্য। বোম্বাই-এর আবহাওয়া তত্রাত্য লবণ তৈয়ারী করিবার কেন্দ্রগুলির অনুরূপ হইলেও, পুরীর অবস্থা গঞ্জামের চেয়ে একটু অসুবিধাজনক। নৌপদ-কারখানার চেয়ে ভিজাগাপতমের আবহাওয়ার অবস্থা আবার একটু বেশী আশাজনক। নিম্নে জলবায়ুর অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণিত হইল :—

জায়গার নাম	উত্তাপ		বৃষ্টিপাত ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত	বৃষ্টিপাত মে মাস	বাস্পাবস্থা humidity	বায়ুবেগ
	সাধারণ আধিক্যের হার	সাধারণ নিম্নতার হার				
বোম্বাই	৮৬°২	৭১°৫	০°৩৫	০°৮৪	৭৩°১	৯°৩
পুরী	৮৪°৭	৭১°৬	২°৬৯	২°৮৩	৮২°৫	৮°৭
ভিজাগাপতম্	৮৫°৭	৭৩°৫	৩°০৫	১°৯৯	৭০°৫	৩°৫
কলিকাতা	৮৪°৭	৬৩°৪	৪°৯৭	৫°৭৫	৮১°৪	৫°০
সাগর দ্বীপ	৪২°৩	৭৭°২	৪°২৬	৪°৪১	৮৫°৪	৭°৮
মেদিনীপুর	৮৮°৩	৬১°৫	৫°২	৫°৩২	৬৮°৮	২°৩
বালেশ্বর	৮৬°৯	৬৩°৬	৬°২৮	৫°০১	৭৭	২°৭

প্রধান কেন্দ্রগুলির উৎপাদন শক্তি—প্রতি বৎসরে এক এক একরে নিম্নলিখিতরূপে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে :—

		বাৎসরিক	প্রতি একরে
		মণ	টন
বোম্বাই	...	৮০০	২৯
নৌপদ	...	১০০০	৩৬
গঞ্জাম	...	৬০০	১৮

উপরোক্ত অঙ্কগুলি প্রত্যেক বৎসরেই বিভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়—বাজারের চাহিদা এবং জলবায়ুর পরিবর্ত্তন তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী ; উহাকে সাধারণ বৎসরের মোটামুটি বিবরণ হিসাবে নির্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বোম্বাইতে অনুকূল অবস্থা বর্ত্তমান—আমাদের হাতের মালমসল্লা দিয়া সবাই করিতে গেলে, যদিও লবণ তৈয়ারীর আড্ডা হিসাবে বোম্বাইকে করাচী কিংবা এডেনের সহিত তুলনা করা আদৌ চলে না, তবুও কাজের মরশুম সময়ে, উহাকে হিসাবের তালিকা হইতে বাদ দিলে মারাত্মক রকমের ভুল করা হইবে। যেখানে আমরা দেখি যে বোম্বাইতে বৎসরে গড়ে ৭০.৬" বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে বালেশ্বরে হয় ৬২.৭" কলিকাতায় ৬২.৫" এবং ভিজাগাপতমে ৩৭·০"। মোট কথা বোম্বাইতে ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত পড়পড়তায় ০·৩৫" বৃষ্টিপাত হয় এবং মে-মাসে হয় ০·৮৪"। কাজের যখন মরশুম পড়িয়া যায় তখন ১·১৯" এর চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা নাই। এখানকার বাষ্পাবস্থার পরিমাপ শতকরা ৭৩·১ এবং উহা প্রায়ই করাচীর কাছাকাছি। এই সময়ে বায়ুবেগও প্রতিঘণ্টায় ৯·৩ মাইল করিয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমরা সল্ট সার্ভে কমিটীর কাজে সফরে বাহির হইবার সময় ইহার চেয়ে বেশী বায়ুবেগ অন্যকোন লবণ কেন্দ্রে লক্ষ্য করি নাই। ভারতের পশ্চিম তটের অন্যান্য ফ্যাক্টরীর তুলনায় এখানকার তাপও অসুবিধাজনক নহে। আরো একটী সুবিধার কথা এই যে বোম্বাইতে বৃষ্টিপাত কর্ম্মহীন অকেজো দিনগুলিতেই বেশী হয়—বাংলা এবং উড়িষ্যাতীরে ঠিক ইহার উল্টা।

বাংলা এবং বালেশ্বরের সৈকত ও তদীয় অবস্থা—প্রথমে বাংলার তীরভূমি ও উড়িষ্যান্তর্গত বালেশ্বর জেলার কথাই ধরা যাউক। কাঁথির জলবায়ুর হিসাব নিকাশ পাওয়ার সুবিধা না-ঘটায়, আমরা মেদিনীপুরের অবস্থা দিয়াই কাঁথিকে যাচাই করিয়া লইব। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, মেদিনীপুর সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১৫ মাইল অন্তর্ভাগে ; কাজেই সমুদ্রতীরের সাধারণ উত্তাপের হিসাব মেদিনীপুর হইতে কম এবং বেশী—উভয় দিক দিয়াই—একটু কমিয়া যাইবে। বায়ুবেগ আরো বাড়িবে বই কমিবে না, যদিও বৃষ্টিপাত সামান্য একটু কমিতেও পারে। মেদিনীপুর হইতে এখানকার বাষ্পাবস্থা বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। বালেশ্বর সমুদ্রতীর হইতে ৭.৮ মাইল দূরে কাজেই উপরোক্ত মন্তব্যগুলির অঙ্কের ভাগ একটু কমাইয়া লইলে উহা বালেশ্বর সম্বন্ধেও খাটিবে।

জলবায়ুর তুলনামূলক সমালোচনা—সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমি বলিব যে কলিকাতা এবং সাগরদ্বীপের সর্ব্বোচ্চ এবং সাধারণ তাপ অন্য তিনটী কেন্দ্রের চেয়ে কতকটা কম হইলেও কলিকাতার বাষ্পাবস্থা বোম্বাই এবং ভিজাগাপতমের চেয়ে বেশী ; কিন্তু ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে পুরীর চেয়ে ইহা (বাষ্পাবস্থা) কতকাংশে কম বটে। পরিষ্কার

রূপেই ইহার কারণ বোঝা যায় যে, কলিকাতা খোলা সমুদ্র হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। দ্বীপের বাষ্পাবস্থা আবার একটু বেশী এবং এই হিসাবে মেদিনীপুর এবং বালেশ্বরের তীরের অবস্থা কতকটা বেশী আশাপ্রদ। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সাধারণ সর্ব্বনিম্ন তাপের অঙ্ক কেন্দ্রীয় স্থলগুলির চেয়ে একটু বেশী রকমেই কম বটে। একমাত্র সাগরদ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তাবিত পূর্ব্বতীরের স্থলগুলির বায়ুবেগ বোম্বাই এবং পুরীর তুলনায় মোটেই আশাপ্রদ নহে, যদিও উহা ভিজাগাপতমের চেয়ে বেশী নীচে হইবে না। কিন্তু কাজের মরশুমে বাংলার তীরভাগে যে বৃষ্টি পড়িবে, তাহা অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় অনেক অসুবিধা ঘটাইবে। কেবলমাত্র সাগরদ্বীপে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়; ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত তাহাও আবার ৪·২৮"-র কোঠাতে থাকে। মে-মাসে উহা ৪·৪১"তে যাইয়া দাঁড়ায়। এই প্রচণ্ড বাদলের দৌরাত্ম্যে মে-মাসে সূর্য্যের উত্তাপে কোন কাজই চলিতে পারে না; মনে রাখিতে হইবে, ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এ ভূভাগে বোম্বাই অঞ্চলের ১৪ গুণ বৃষ্টি বেশী হয়। কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং বালেশ্বরের বৃষ্টির অনুপাত আরো নৈরাশ্য জনক।

এই অবস্থার কারণ কি?—অঙ্কের এই-উত্থান পতনের মূল কারণ বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোন ঝড় এবং বায়ুচাপের হ্রাস। মেটিরিয়োলজিক্যাল সার্ভের নক্সার দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়, সাইক্লোন বা ঝঞ্ঝার পথে পড়িয়া বঙ্গোপসাগরের মোহানার অবস্থা কিরূপ সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছে! দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুও বিশেষভাবে ইহাকে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এই বাষ্পযুক্ত বায়ুতে উত্তাপের কাজ ভালরূপে চলিতে পারে না এবং অনেক সময়ে ইহা মার্চ্চ মাস হইতেই বহিতে আরম্ভ করে। কাজেই নভেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভূ-ভাগের দিক হইতে হাওয়া মোটেই পাওয়া সম্ভবপর নয়। বোম্বাইতে আবার এপ্রিল কিংবা তৎপরেও শুষ্ক পূর্ব্বোত্তর বায়ু বহিতে থাকে।

সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করা অসম্ভব আমি জলবায়ুর এই অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, ব্যবসা হিসাবে সূর্য্যের তাপে লবণ প্রস্তুত করা বাংলা এবং উত্তর উড়িষ্যা তীরে মোটেই সম্ভবপর নহে। জলবায়ুর অবস্থা এবং সমুদ্রের জলে লবণাক্ত ভাগের পরিমাণ কতটুকু—এই কথা মনে করিলে আমাদের উৎসাহ অনেকাংশে কমিয়া আসে। আজকাল যেখানে লবণ প্রস্তুত হইতেছে, সেখানে তাহারা এইদিক দিয়া কিছু সুবিধা ভোগ করিতেছে। যদি জলে লবণের শক্তির পরিমাণ একটু বেশীও থাকিত, তাহা হইলেও সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইত না। মেদিনীপুরের সৈকত হইতে হুগলী পর্য্যন্ত যে জায়গা আছে, তাহা হইতে সাগরদ্বীপ এবং বালেশ্বর উৎকৃষ্ট জায়গায় অবস্থিত হইলেও ইহা অসম্ভব যে ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বেই জলে লবণের শক্তি বাড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ২।৩ মাস কাজ চলিতে থাকিবে, এবং বৃষ্টি পড়িলেও তাহাতে কাজের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এরূপ স্থলে, লবণ উৎপাদন সম্বন্ধে মতামত দেওয়া নিরেট মূর্খের কাজ হইবে—যদি বৎসর ভালো হয় এবং অদৃষ্ট ভাল থাকে, প্রত্যেক একরে ৯।১০ টনের বেশী প্রস্তুত করা সম্ভব নয়; খারাপ বছরের কথা না বলাই ভালো; বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত অঙ্কে অর্দ্ধেক কিংবা এক তৃতীয়াংশ হইতে পারে

সূর্য্যোত্তাপের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসার জন্য লবণ প্রস্তুত করা তাই নিতান্ত হাস্যকর।

আমার সিদ্ধান্তের অন্যান্য প্রমাণ—সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করা সম্বন্ধে এইরূপ মত অপরেও প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কপিলারাম ভকিলের সিদ্ধান্তও আমার উপরোক্ত মন্তব্যের অনুকূল, মাদ্রাজ নিমক বিভাগের কর্ম্মচারী গুস্ (Gooch) সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর লিখিয়াছেন যে, "পুরী জেলার উত্তরে যে-কোন স্থলে সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করার জন্য যদি কেহ পরামর্শ দেন, আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারিব বলিয়া মনে করি না।" পুরাণো নথি পত্র বিশেষরূপে ঘাটিয়াও আমি বাংলা কিংবা বালেশ্বরের তীরে কেবলমাত্র সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত হইত বলিয়া কোন প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই।

সুপারী কাটা কল

জার্ম্মাণী হইতে এই কল আমদানী হইয়াছে। কলের Slot বা ছিদ্রে সুপারী দিয়া হাণ্ডল ঘুরাইলেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এক একটী সুপারী কাটা হইয়া যায়। কলের মধ্যে যে Screw আছে তাহা ঘুরাইয়া adjust করিয়া কাগজের স্থায় পাতলা অথবা যেরূপ মোটা কাটার ইচ্ছা তদনুরূপ সুপারী কাটা যায়।

খুলিয়া ইচ্ছামত ধার করিয়া লওয়া যায় এবং এই দুইটী জিনিষ Sparepart হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায়।

এই কলের দ্বারা বহুকালের একটী অভাব মেটান হইয়াছে। প্রচলিত প্রথায় সুপারী কাটা সম্বন্ধে যেসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয় আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। :—
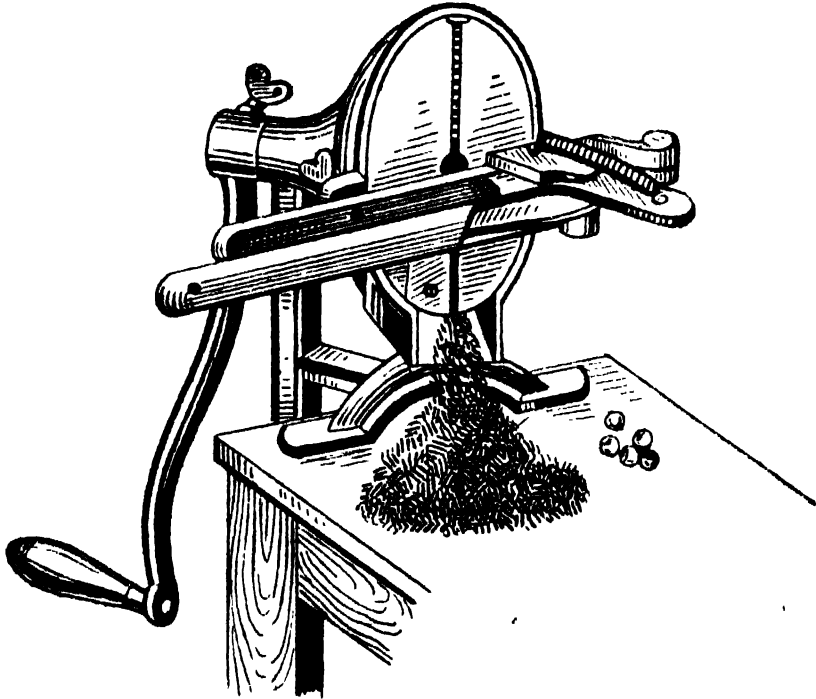
সুপারী কাটা কল

যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে এক একটী কল বহুকাল স্থায়ী হয়। ইহার মধ্যে এক Spring এবং সুপারী কাটা ছুরী ব্যতীত আর কোনও অংশ বিগড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। ছুরী

১। প্রথমে সুপারীটাকে দুই টুক্‌রা করিয়া নিতে হয়। সুপারী যদি চ্যাপ্টা (flat bottomed) এবং নরম থাকে তবে জাঁতি দিয়া কাটীতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু সুপারী যদি

conical shape বা গোলাকার বিশিষ্ট হয় এবং শক্ত থাকে তবে কাটীতেও যেমন কষ্ট হয় তেমনি আঙ্গুল কাটার আশঙ্কাও থাকে খুব বেশী। ইহার উপর যদি জাঁতিখানা খুব ধারাল না থাকে কিম্বা তাহার খিল্‌টা বেশ টাইট (Tight) অবস্থায় না থাকে, তবে অবস্থাটা ঠিক গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় হইয়া উঠে এবং সুপারী কাটার সময় অতিরিক্ত জোর দেওয়ায় বসাইয়া কাটিবার সময়েও এই আঙ্গুল কাটার আশঙ্কা থাকে যথেষ্ট এবং এইরূপে এক একটী সুপারি কাটীতে সময়ও কম লাগেনা।

৩। বহুকাল যাবত সুপারী কাটীতে দক্ষ লোক ব্যতীত অপর কেহই পাত্‌লা করিয়া কাটিতে পারেন না। কোনও টুক্‌রা মোটা কোনও টুক্‌রা পাতলা হইবেই হইবে। আর অনভিজ্ঞেরা ত' সুপারী পাতলা করিয়া কাটীতেই
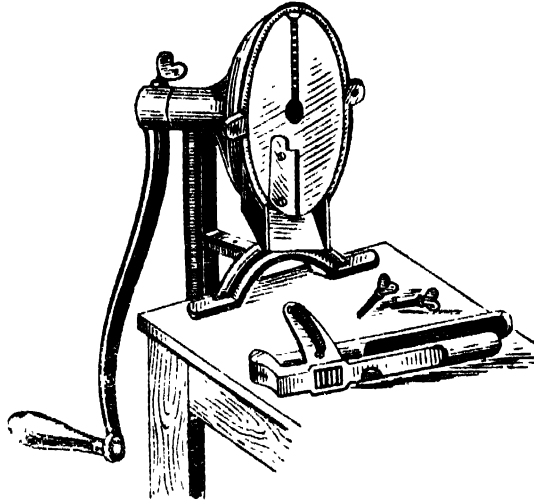
সুপারী কাটা কলের Sectional View

এবং জাঁতির খিল্‌ লগ্‌বগে অবস্থায় থাকায় ইহা ঠিক সমান ভাবে বিভক্ত না হইয়া এক পাশ হইতে কাটিয়া অনেক সময় ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া যায়। এই অবস্থায় আঙ্গুল কাটার আশঙ্কা থাকে খুবই বেশী—

২। দুই টুক্‌রা করার পর, সুপারী এক হাতে ধরিয়া আর একহাতে প্রতিবার জাঁতি পারে না। সব সুপারীটা ভুমা ভুমা করিয়া কাটে এবং এক একটা সুপারী কাটীতে অন্যূন পাঁচ মিনিট সময় লাগায়।

কলের দ্বারা এই সকল অসুবিধা একেবারে দূরীভূত হইয়াছে।

১। কলটী টুল অথবা টেবিলে নিমেষে লাগাইয়া লওয়া যায় এবং লাগাইবার পর স্ক্রু

(screw) টা adjust করিয়া নিতে হয়। ব্যস, তার পর আর কোনও ঝঞ্ঝাট নাই। এক একটী করিয়া সুপারী কলের ছিদ্রে ফেল আর হাতলটী ঘুরাও, চোখের নিমেষে তলায় পাতলা পাতলা, সমান ভাবে কাটা সুপারী স্তূপীকৃত হইতে থাকিবে। এক হাত দিয়া কলে সুপারী ছাড়া (feed করা) এবং হাতল ঘুরানো ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। মিনিটে ২।৩ টা সুপারী কাটা হইয়া যাইবে। ইহাতে আঙ্গুল কাটার ভয় নাই, সুপারী ঠিক্‌রিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাবার ভয় নাই এবং নানা আকারের মোটা, পাতলা, কিম্বা ডুমা ডুমা সুপারী কাটার আশঙ্কা ও বিড়ম্বনা নাই।

পাশ্চাত্য দেশে জীবন যাত্রা সহজ করার জন্য এবং সময়ের অযথা অপচয় নিবারণ করার জন্য কতরকমের যে গার্হস্থ্য শ্রমলাঘবকারী (Domestic labour saving machine) যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার হইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, Egg Beater (ডিম ফেটানোকল) Meat Mincer (মাংস থোড়ার কল) Egg Slicer (ডিম্ পাতলা করিয়া কাটার কল) Bread Cutter (পাঁউরুটী কাটার কল) Cocoanut Corer (নারিকেল কোরাইবার কল) Butter churn (মাখন তোলা কল) ইত্যাদি বহু মেসিনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর আমরা আজিও সেই অন্ধকারেই পড়িয়া আছি ; কারণ আমাদের কাছে সময়েরও মূল্য নাই কিম্বা গার্হস্থ্য জীবনে আরামেরও কোন আদর্শ নাই। ফলে আমরা জীবন সংগ্রামে অন্যান্য বলিষ্ঠ জাতির নিকটে সকল বিষয়েই দিন দিন পরাস্ত হইয়া পিছু হটিয়া আসিতেছি। অবশ্য সুপারী কাটা কল না কিনিলেই যে আমাদের জাতি একেবারে জাহান্নমে যাইবে একথা আমরা বলিনা, কিন্তু ইহা আমাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর একটা Index বা লক্ষণ, যাহা দেখিয়া বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের উদ্যমহীন শ্লথ জীবনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রচলিত প্রথায় জাঁতির দ্বারা সুপারী কাটার চেয়ে কলে কাটিলে যে কত আরাম পাওয়া যায় এবং সর্ব্বোপরি শঙ্কা ও সময়ের অপচয়ের হাত হইতে কত রক্ষা পাওয়া যায়—তাহা আমরা আজিও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে শিখি নাই এবং শিখিলেও গড্ডালিকার প্রভাব এড়াইতে গেলে যে শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কলের মূল্য অতি সামান্য, সুতরাং ইহা বহন করিতে পারেন এরূপ লক্ষ লক্ষ পরিবার এদেশে আছেন। তাহা ছাড়া এইরূপ এক একটা কল নিয়া বেকার যুবকেরা এক একটা পানের দোকান দিলেও ২।৩ মাসের মধ্যে কলের দাম উঠাইয়া স্থায়ী রোজগারের পথ রচনা করিয়া লইতে পারেন।

যদি কেহ এই কল কিনিতে চান তবে আমাদের লিখিলে উহা পাঠাইয়া দিতে পারি।

পরীক্ষিত ফরমুলা

লোকের বাহিরটা দেখিলে যেমন তাহার ভিতরের চরিত্রের খানিকটা আভাষ পাওয়া যায় তেমনি মুখের সৌন্দর্য্যের অবস্থা দেখিলে তাহার শরীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও অনেক কিছু বুঝিতে পারা যায়। কছমেটিক্ দ্বারা বাহিরের make-up বা রূপসজ্জা সম্বন্ধে সাময়িক যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করা গেলেও তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী মাত্র। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরের অভ্যন্তরের ময়লা ও ক্লেদ বাহির করিয়া নূতন তাজা রক্ত শরীরের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া না যায়,ততক্ষণ পর্য্যন্ত কছ্‌মেটিকের সাহায্যে স্থায়ীভাবে সৌন্দয্যবৃদ্ধির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও দুনিয়াশুদ্ধ নরনারী এই সাময়িক রূপসজ্জার প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, তাই সমগ্র পৃথিবীতে কোটী কোটী টাকার কছ্‌মেটিক্ বিক্রয় হয়।

বিলাতে জনসাধারণের মধ্যে ধারণা যে ষাঁড়ের রক্ত দিয়া মুখমণ্ডল ধৌত করিলে মুখে ব্রণ, মেছেতা ও নানারূপ দাগ উঠিয়া যায় এবং মুখের রং পরিষ্কার হয়। কিন্তু এইরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে আশু রং পরিষ্কার করা অপেক্ষা ধীরে ধীরে রংএর উৎকর্ষতা সাধন করা অনেক ভাল। ঘোলের দ্বারা প্রত্যহ মুখ ধুইলে মুখের রং, লাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। পাঞ্জাবে ইহার যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। সমান অংশে Hydrogen Peroxide ও Lemon Juice বা নেবুর রস লইয়া একত্রে মিলাইয়া দিনে দুইবার মাখিয়া তাহার পর নিম্নলিখিত অয়েণ্টমেণ্ট দিনে দুইবার লাগাইলেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

Thymol ১০ গ্রেণ
Boric Acid ১২০ গ্রেণ
Witch hazel ১আউন্স
গোলাপ জল ১ আউন্স

এই অয়েণ্টমেণ্ট লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়; নচেৎ উহা শুকাইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে চামড়াও টানিয়া চড়্‌চড়্ করিতে থাকে।

শারীরিক সৌন্দয্য স্থায়ী করিতে গেলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসরণ করা একান্ত আবশ্যক; নচেৎ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির আশা করা বিড়ম্বনা।

১। সহজে পরিপাক হয় এরূপ খাদ্য পরিমিত রূপে এবং যথাসময়ে নিয়ম বাঁধিয়া আহার।

২। প্রত্যুষে ভ্রমণ এবং নির্ম্মল বায়ু সেবন।

৩। প্রতিদিন অন্ততঃ ১৫মিনিটকাল সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালিত হয় এরূপ ব্যায়াম, যাহার ফলে সর্ব্বশরীর হইতে প্রচুর ঘাম বাহির হইয়া যায়।

৪। প্রত্যহ কিছু ফল ভোজন করা চাই-ই—এবং কিছু ফলের রস হইলে আরও ভাল হয়।

৫। প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ গ্লাস জল পান করা চাই।

BOUQUET বা ফুলের তোড়া তাজা রাখিবার নিয়ম

ফুলের তোড়া তাজা রাখিতে হইলে উহাতে অল্প পরিষ্কার জলের ছিটা দিয়া তোড়াটী সাবান

গোলা জলে কিছুকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিলে ফুলগুলি সতেজ হইয়া উঠে এবং ঠিক যেন নূতন ফুটন্ত ফুলের মত দেখায়।

যদি কেহ ফুলের তোড়া সতেজ রাখিতে ইচ্ছা করেন তবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেন।

প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে ফুলের তোড়াটী ২।১ মিনিট করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া উহা কিছু-কালের জন্য সাবান গোলা জলে ডুবাইয়া লইবেন। ৪।৫ দিন অন্তর এই সাবানের জল বদলাইতে হয়। এই প্রকারে ফুলের যত্ন নিলে ফুলের তোড়া প্রায় ১ মাস সতেজ থাকে।

ব্রংকাইটিজ (BRONCHITIS) উপশমের কতিপয় নিয়ম

ব্রংকাইটিজ একটী গুরুতর এবং যন্ত্রণাদায়ক পীড়া—এই পীড়া নিবারণের অনেক ঔষধ বাহির হইয়াছে, কিন্তু নিম্নলিখিত ঔষধটী বিশেষ ফলপ্রদ।

একটী কাঁচের গ্লাসে জল রাখিয়া উহাতে অর্দ্ধ চামচ Common Saltpetre বা সোরা দিয়া গুলিয়া মালিস হিসাবে ব্যবহার করিলে ব্রংকাইটিজ খুব তাড়াতাড়ি আরাম হয়। যতবার এই ঔষধটী ব্রংকাইটিজ রোগে ব্যবহার হইয়াছে প্রত্যেকবারই ইহার দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। বালকের পক্ষে এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা সমান উপকারী। একখণ্ড Saltpetre সল্ট পিটার মুখে দিয়া বন বনের মত চুসিতে থাকিলেও ব্রংকাইটিজ আরাম হয়। যদি কখনও কাহারও এই যন্ত্রণা-দায়ক পীড়া হয় তবে এই ঔষধটী ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

স্বর্ণ রৌপ্যাদির দ্রব্য পরিষ্কার

স্বর্ণ রৌপ্যাদির দ্রব্য পরিষ্কার করিতে হইলে একটী পাত্রে জল রাখিয়া উহাতে ভাল করিয়া সাবান গুলিতে হয়। তারপর উহার ভিতর এই দ্রব্যগুলি দিয়া প্রায় ৫ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিতে হয়, তারপর তুলিয়া আস্তে আস্তে ব্রাস দিয়া পরিস্কার করিয়া শুকনো ন্যাকড়া দিয়া জল মুছিয়া ফেলিতে হয়; দ্রব্যগুলি ন্যাকড়া দিয়া মুছিয়া রৌদ্রতপ্ত কিম্বা আগুনের তাপে তপ্ত কোনও পাত্রে রাখিয়া শুকাইতে হয় তাহা হইলে উহার রং উজ্জ্বল হয়।

মাখম তাজা রাখার উপায়

মাখম তাজা রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী বেশ সুন্দর। স্কটলণ্ডে ইহার যেমন প্রচলন আছে তেমনি ইহার আদরও আছে। Dr. Anderson বলিয়াছেন যে নিম্নলিখিত প্রণালীতে শোধন করা মাখম তিনি ৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়া খাইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কোন বিস্বাদ বা গন্ধ হয় নাই।

দুই কোয়ার্ট (Quarts) উৎকৃষ্ট Common Salt বা লবণ, এক আউন্স চিনি এবং এক আউন্স Common Saltpetre বা সোরা একত্রে মিশাইতে হয়।

এই মিশ্রিত পদার্থটীর এক আউন্স পরিমাণ লইয়া এক পাউণ্ড মাখমে ভাল ভাবে মিশ্রিত করিয়া মাখমের তাল করিতে হয়। তারপর একটী পাত্রে এই মাখম রাখিয়া পাত্রটীর মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে এবং যতদিন সেই মাখম ব্যবহার না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত পাত্রটীর মুখ খুলিতে নাই। এই প্রকারে শোধিত মাখম দেখিতেও যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনি উৎকৃষ্ট। কিন্তু সকলেরই জানিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রকারে মাখম শোধন করিয়া ৩।৪ সপ্তাহ বাদে ব্যবহার করিতে হয়। শীঘ্র খুলিলে এই মাখমের সহিত লবণ ভাল ভাবে মিশিতে পারে না।

জুতা ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়

Mechanics' Magazineএ জনৈক লোক লিখিতেছেন যে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তিন জোড়া বুট (Boot) ছিল এবং আরও ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার আর বুটের প্রয়োজন হইবে না। তাহার কারণ তিনি বুটের প্রকৃত যত্ন জানিতেন।

তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই—

১ পাউণ্ড চর্ব্বি (tallow) আর অর্দ্ধ পাউণ্ড ধূনা (Rosin) একটা পাত্রে গরম করিতে হয় এবং যখন এই দুইটী দ্রব্য গুলিয়া একত্রে মিশ্রিত হইয়া যায়, তখন এই মিশ্রিত গরম পদার্থটী ব্রাস দিয়া ভাল ভাবে জুতার সোলে (Sole) লাগাইয়া দিতে হয়। আর যদি শীঘ্র বুটের পালিশ (Polish) করিতে হয় তবে এক আউন্স মোমএর সহিত এক চামচ (lamp black) ভুষা কালী একত্রে গলাইয়া লইতে হয়। অবশ্য জুতা যদি কালো রংএর হয়। তারপর "বুটে" চর্ব্বি এবং ধূনা লাগাইবার এক দিন পরে এই মোম এবং ভুষা কালী মিশ্রিত পদার্থটী বুটের উপর লাগাইতে হয়। এইরূপ করিলে বুটের উপরটা একেবারে মোম দিয়া আবৃত করা হইয়া গেল এবং দেখিতেও বেশ উজ্জ্বল হইল।

বর্ষাকালে সর্ব্বদা জল লাগিয়া জুতার তলা এবং কিনারা ভিজিয়া যায়। তাহাতে একদিকে জুতা যেমন শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় তেমনি পায়ের তলায় ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দিকাশী হবার সম্ভাবনাও খুব বেশী থাকে। এই সময় জুতার তলা এইরূপে water proof করিয়া নিলে ভাল হয়।

দুগ্ধ এবং লেমন (লেবু) স্পঞ্জ

গ্রীষ্মকালের সুস্বাদু এবং শীতল পানীয়ের মধ্যে দুগ্ধ লেমন—এবং মিষ্টি—জিলাটিন মিশ্রিত পানীয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দুগ্ধের মধ্যে এসিডের কার্য্য সম্বন্ধে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার—হাত এবং মস্তিষ্কের কসরৎও প্রয়োজনীয় বটে। নিম্নলিখিত উপায় অনুসারে কাজ করিলে চারিজনের আন্দাজ পেয় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ক্রীম দিলে পানীয় সরবৎ আরো সুস্বাদু হইবে; কিন্তু উহার ব্যবহার অত্যাবশ্যক নয়।

দুইটী লেবুর খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। ঐ খোসা চারি আউন্স পরিমিত পাউরুটি, চিনি এবং অর্দ্ধ আউন্স পরিমিত জিলেটিনের সঙ্গে একত্র করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা সময়ের জন্য এক পাইট তাজা দুগ্ধে ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তারপরে দুধ না-ফুটা পর্য্যন্ত সমস্তটাকে আগুনের উপর আস্তে আস্তে নাড়িতে হইবে। উহা শেষ হইলে, খোসা ফেলিয়া দিয়া দুধ একটী পাত্রে ঢালিয়া লইতে হইবে এবং আস্তে আস্তে উহাকে শীতল হইতে দিবে—মধ্যে মধ্যে নাড়িতেও হইবে। ইহার পর, লেবুর রস নিংড়াইয়া দিয়াই সমস্ত জিনিষটাকে দুইটী পাত্রে পর্য্যায়ক্রমে ঢালিতে হইবে। যদিও লেবুর (লেমন) পরিবর্ত্তে কমলা ব্যবহার করা যাইতে পারে, তবুও ঠাণ্ডা পানীয় হিসাবে লেবুর উপাদানই সুন্দরতর।

সরিষা

নামকরণ :—সংস্কৃত, সিদ্ধার্থ ; বাঙ্গলা, সরিষা ; রাই-সরিষা ; হিন্দী, রায় রায়ান।

পণ্ডিতপ্রবর সুশ্রুত পিপ্পল্যাদিগণের মধ্যে সরিষার স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। পিপ্পল্যাদিগণভুক্ত ঔষধসমূহ সর্দ্দিনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, অরুচি নিবারক এবং পরিপাক শক্তির সহায়ক ও গুল্ম ও শূলনাশক—সংশোধনীয় ও সংশমনীয় গুণবিশিষ্ট হওয়াতে সরিষা বমনকারকবর্গ মধ্যে একটী প্রধান ঔষধ। নস্য দ্রব্যগণের মধ্যেও সরিষার উল্লেখ দেখা যায়।

বাজারে দুই প্রকার সরিষা পাওয়া যায়। শ্বেত সরিষা ও কৃষ্ণ সরিষা। শ্বেত সরিষা অপেক্ষা কৃষ্ণ সরিষা অধিক তেজস্কর। তজ্জন্য স্থানীয় উত্তেজনার আবশ্যক হইলে কৃষ্ণ সরিষার পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। তরকারী ও চাটনীতে সরিষা এই দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বমন করাইবার আবশ্যক হইলে নিরাপদে সরিষা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সিকি তোলা সরিষা উত্তমরূপে বাটিয়া বড় এক গেলাস গরম জল সহ গলাধঃকরণ করিতে হইবে। ৫।১০ মিনিট পরে যদি বমি না হয়, পুনর্ব্বায় ২।৩ বার ঐরূপ সেবন করিতে পারেন। যদি উহাতেও বমি না হয় তবে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবেন।

সরিষা, বচ লোধ, সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য সিকি তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইবেন। ৩০ গ্রেণ পরিমাণে উক্ত দ্রব্য গরম জলসহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই বমন হইবে। মাদকতায়, বিষপানে, অথবা দুষ্পাচ্য দ্রব্য অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজনে বমন করাইবার আবশ্যকতা হইলে উপরোক্ত দুইটি ব্যবস্থা অতীব সুন্দর ফল প্রদান করিবে। এই ব্যবস্থার একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে রোগীর বমনজনিত কোন প্রকার অবসাদ বোধ হইবে না।

অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অরুচি রোগে সরিষা ঘটিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় :—

সরিষা, জীরক, ভর্জ্জিত হিং, আর্দ্রক ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক সমপরিমাণ লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করণান্তর মিশ্রিত করিবে। প্রাতে ঘোলসহ সিকি তোলা পরিমাণ সেবন করিবে।

বহিঃপ্রয়োগ।

"মাষ্টার্ড প্রয়োগ" কথা সকলেই শুনিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিবরণ বোধ হয় সকলে না জানিতে পারেন। মাষ্টার্ড প্রয়োগ সরিষার পুল্‌টিস্ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন্ কোন্ ব্যাধিতে সরিষার পুল্‌টিস্ কার্য্যকরী বুঝাইবার পূর্ব্বে কি করিয়া পুল্‌টিস্ তৈয়ার করিতে হয় তাহাই বলিব।

সরিষার খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ শীতল জলসহ কর্দ্দমের ন্যায় ঘন করিয়া গুলিতে হইবে। একখানি মোটা কাগজ বা বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া তাহার উপর উক্ত দ্রব্য সমান করিয়া বিছাইয়া লইবে এবং স্থানীয় প্রয়োগ হেতু ব্যবহার করিবে। শিশু বা রমণী, যাহাদিগের

চর্ম্ম অতীব কোমল, তাহাদিগের জন্ম চর্ম্মের উপর পাতলা বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তাহার উপর পুলটিস্ বসাইবে।

যখন দেখিবে, চর্ম্ম লালাভ হইয়াছে, তখন পুল্‌টিস্ উঠাইয়া লইবে। অধিক যন্ত্রণা হইলেই যে পুল্‌টিস্ ভাল হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। ১০।১৫ মিনিট থাকিলেই সাধারণতঃ উত্তমরূপ পুল্‌টিস্ দেওয়া হইল জানিবে। বেলেস্তারার (blister) কথা শুনিয়াছেন? বেলেস্তারাও এই সরিষার পুল্‌টিস মাত্র। কেবলমাত্র ইহা আধঘণ্টা কাল রাখিতে হয়। তাহাতে ফোস্‌কা পড়ে এবং সময়ে সময়ে ঘা শুখাইতে দেরী হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রাতে সরিষার পুল্‌টিস্ দিবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন্ কোন্ রোগে সরিষার পুল্‌টিস্ উপযোগী।

চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও শার্ঙ্গধর এই তিন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই সরিষার পুল্‌টিসের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। পুল্‌টিস্‌কে 'প্রলেপন' বলা যাইতে পারে। ইহাদের মতে জ্বর, বিকার, সন্নিপাত, শ্লৈষ্মিক বিকার, কম্পন, মূর্চ্ছা, অপস্মার, উন্মাদ, স্নায়বিক বেদনা, বাত বেদনা, বেদনাযুক্ত গ্রন্থিস্ফীত, পক্ষাঘাত ইত্যাদিতে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগেও সরিষার প্রলেপনের ব্যবস্থা আছে।

ফুটন্ত জলে সরিষাচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে পা ডুবাইতে পারিলে মস্তিষ্কে রক্তোদ্গমে ও বিকার বা সন্নিপাতে উপকার হয়।

উন্মাদ ও অপস্মারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা পরীক্ষণীয়। নাভিদেশের নিম্ন হইতে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় অংশ সরিষাসিদ্ধ গরম জলে ডুবাইয়া আবরণ করিতে হইবে। এবং মস্তিষ্কে ঠাণ্ডাজলে ভিজান গামছা বা তোয়ালে জড়াইয়া দিবে। ইহাতে রোগী শান্তিলাভ করিবে এবং ত্বরায় ঘুমাইয়া পড়িবে। উপরোক্ত প্রকারে সরিষ সিদ্ধ জলে পা ডুবাইতে পারিলেও ফল পাওয়া যায়।

জ্বরের অবস্থায় অতিরিক্ত বকিলে তলপেটে সরিষার পুল্‌টিস্ দিবে। কলেরা হইলে বা পেট গোঁচাইলেও এই প্রকারে ফল পাওয়া যায়। ঘুংড়ী কাসিতে মেরুদণ্ডের উপর সরিষার পুল্‌টিস্ দিতে হয়। বাত বেদনা ও কোমর বেদনাতে "ভাবপ্রকাশ" গ্রন্থে কেবলমাত্র সরিষার প্রলেপনের ব্যবস্থা দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রে ভারতীয় জেলে

মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতিকে বিভিন্ন দিক হইতে পরীক্ষা করিবার সুবিধা ভারতে যেমন আছে, পৃথিবীর অন্যত্র তাহা দুর্লভ। ভারতের এই বিচিত্রতার মাঝখানে, গভীর সমুদ্রগামী জেলেরা আরো একটী নবীনতর সুর আনয়ন করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ কারখানা ও লোহা-লক্কড়ের যুগের বাহিরে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে—আজ তাই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা দিক আমাদের কাছে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সমুদ্রজাত যে সমস্ত সামগ্রী ভোজ্য হিসাবে আমাদের রসনার তৃপ্তিসাধন করে, তাহার বেশীরভাগই কাহারা উত্তাল তরঙ্গ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া আমাদের মুখের কাছে ধরে—আমরা তাহা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। সমুদ্রে মাছ ধরার হিসাব-নিকাশ আমাদের অনেকেরই নখাগ্রে আছে; কিন্তু যাহারা খনি এবং ফ্যাক্টরীতে বেশী আয়ের লোভ কাটাইয়া পূর্ব্বপুরুষের চিরাচরিত পথ ধরিয়াই চলে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতটুকু? আমরা তাহাদের কাছ হইতে পাই অনেক কিছুই; কিন্তু বিনিময়ে তাহাদের খবর রাখাও আবশ্যক মনে করি না। আজ তাহাদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলিব।

ভারতের "তমালতালিবনরাজিনীলা" সমুদ্র বেলায় তাহাদের বাস। আশ্চর্য্য স্বাবলম্বী মানুষ ইহারা। থাকিবার কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া নৌকা কিংবা ডিঙ্গী এবং জাল পর্য্যন্ত ইহারা নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়া লয়—পরের কোনই তোয়াক্কা রাখে না। সমুদ্রের কোন চিত্র, চার্ট বা নক্সার তাহাদের দরকার পড়ে না; বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতার জোরেই তাহারা বলিতে পারে সমুদ্রের কোন্ তলায় চোরা-পাহাড় আছে, কোথায় সামুদ্রিক হিংস্র জীব ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। যখন চাঁদের আলো চারিদিকে রূপালি আস্তরণ বিছাইয়া দেয়, সমুদ্রের বুকে জোয়ার-ভাটার খেলা চলিতে থাকে, তখনও তাহারা আপনমনে বাস্তব জীবনের কর্ম্ম নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া যাইতেছে। ঠিক কোন্ জায়গায় কখন গেলে কি রকম মাছ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা যেন তাহারা দিব্যচোখে দেখিতে পায়। ভারতের তীরে তীরে এই ধরণের যে সকল জেলে আছে, তাহাদের জীবন নির্ব্বাহ প্রণালী প্রায়ই অভিন্ন ধরণের।

তাহাদের পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধে, দোহারা চেহারা। মাংসপেশীর সুপুষ্টতা দেখিয়া বোধ হয় তাহাদের দাঁড় ও দড়াদড়ী লইয়া কি অসম্ভব পরিশ্রম করিতে হয়। সমুদ্রের হাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রম এই উভয়ের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দেহ শক্তির 'ডাইনামো'র মত হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ ভারতীয় মজুরের মত তাহারা তাহাদের যন্ত্র-পাতিকে পূজা করে—জাল এবং নৌকা তাহাদের অত্যন্ত সম্মানের বস্তু। হইবেই বা না কেন? উহাই কি তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লয় নাই?

মাছধরা-পর্ব্ব শেষ হইলে তাহারা কাঠের রোলারের উপর দিয়া নৌকা গড়াইয়া লইয়া এমন

জায়গায় উহা তুলিয়া রাখে, যেখানে জোয়ারের জল আসিবার আদৌ সম্ভাবনা থাকে না। কোনো জায়গায় ফুটো হইলে কিংবা জল ঝরিতে থাকিলে 'পিচ' দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; পাল সেলাই করা ও ভাঙ্গা দাঁড় বদ্‌লানো সঙ্গে সঙ্গেই চলে। উৎসবের সময় ভারতীয় তরুণীরা যেমন অতীব যত্নের সহিত তাহাদের সিল্কের পোসাকগুলি রৌদ্রে দিয়া ঠিকঠাক করিয়া লয়, সমুদ্রের জেলেরাও তেমনি আগ্রহ সহকারে জাল শুকাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া লয়। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই স্কুলে উপার্জ্জিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির পাঠশালায় তাহাদের যে হাতে-খড়ি হইয়াছে তাহাই অনেক দক্ষ নাবিককেও চমৎকৃত করিয়া দেয়।

তাহারা তাড়ি এবং চুরুট খুব পছন্দ করে। চুরুট অনেক সময় অবিশুদ্ধ কড়া অবস্থায়ই ব্যবহৃত হয় – হাতের কাছে যে পাতা থাকে তাহার মধ্যেই তামাকু ভরা হয় ও চারি ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ করিয়া উহার সরু দিক মুখে লাগাইয়া চুরুট খাওয়াই তাহাদের দস্তুর। সমুদ্রযাত্রায় তাড়িও তাহাদের প্রধান উপকরণ; ইহা না হইলে তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় না। প্রধান খাদ্য হিসাবে ভাত কিন্তু তাহাদের বিশেষ প্রিয় এবং তাহার সঙ্গে একটু লোণা মাছ হইলেই সোণায় সোহাগা হইল। লোণা মাছ কিছু পেঁয়াজ, লঙ্কা ও মসল্লা দিয়া রাঁধিয়া লইলেই তাহাদের প্রধান আহার্য্য তৈয়ার হয়।

ছোটবেলা হইতেই জেলে-শিশুরা তাহাদের মাতাপিতাকে সাহায্য করিতে শিক্ষা করে। তখন অবশ্য তাহাদিগকে সমুদ্রে লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় না। তাহারা তীরে মাছ পৌছিলে উহা কুড়াইয়া একত্র করে এবং যখন রৌদ্রে উহা শুকানো হয় তখন "নিধিরাম সর্দ্দারের" মত পাহারা দিতে থাকে। বড় না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত ছোটখাট কাজ লইয়াই তাহাদের দিন কাটে।

তীরের কাছাকাছি কাজের জন্য যে জালের ব্যবহার হয় তাহা সাধারণতঃ ৩০০ ফিট লম্বা এবং ৬ ফিট চওড়া। জালের উপরের দিককার সীমানায় কাঠের টুক্‌রা কিংবা শুক্‌নো নারিকেল-খণ্ড বাঁধা থাকে জালের ঠিকানা রাখিবার জন্য; নীচের দিকে আবার লৌহ কিংবা পাথরের টুক্‌রা থাকে, নীচের দিকটা মাটীর সঙ্গে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য। যখন জাল তীরের দিকে টানা হয়, তখন উহার দুইটা দিক তেরছা ভাবে জলে ঝুলিতে থাকে।

জালের এক পার্শ্ব একটী রজ্জুর সঙ্গে আবদ্ধ থাকে; রজ্জুর অপর পার্শ্ব তীরে রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অবস্থায় জাল নৌকায় করিয়া তট হইতে অনেক দূরে লইয়া যাওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে উহা সমুদ্রের মধ্যে ছড়াইয়া ফেলা হয়; নৌকাও সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধচক্রের মত পাক খাইয়া তীরের দিকে আসিতে থাকে; যখন জাল সম্পূর্ণরূপে বিছানো শেষ হয়, তখন উহার শেষ-প্রান্তের আবদ্ধ রজ্জু লইয়া একজন লোক তীরের দিকে সাঁতার কাটিয়া আসিতে থাকে।

এইরূপে জালের দুইপ্রান্তই তটস্থ লোকের হাতে থাকে, রজ্জুর মারফৎ দিয়া। তাহারা রজ্জু ধরিয়া উহা জোরসে তীরের দিকে টানিতে থাকে। পনর জোড়া মাংসপেশীবহুল হাত জালকে সজোরে তীরের দিকে টানিতে থাকে; কেননা, মাছ-বোঝাই জাল এখন অত্যন্ত ভারী লাগিবারই কথা। অনেক সময় এই মালের জন্যই জাল বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে এবং জাল ফেলার কাজ আবার গোড়া হইতে সুরু করিতে হয়। অদৃষ্ট

মন্দ হইলে অনেক সময় সামুদ্রিক পাথরের টুক্‌রা কিংবা আগাছা ভিন্ন আর কিছুই জালে আসে না।

এইরূপে যে মাছ পাওয়া যায়, তাহা উক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন হয়; যদি কেহ নৌকা জোগাইয়া থাকে, তাহার ভাগ্যেই বেশীর ভাগ আসিয়া জুটে। বিনিময় প্রথায়ই বিকিকিনি হয়। পরস্পরকে সাহায্য করিবার স্পৃহাও ইহাদের অস্থিমজ্জাগত; নৌকা কিংবা ঘর তৈয়ার করিবার সময় এবং জাল মেরামতের কার্য্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সাহায্য করিয়া থাকে।

মাছ ধরিবার জায়গা সম্বন্ধে ইহাদের মতবাদ চমৎকার রকমের। যদি কেহ আদেশ লঙ্ঘন করিয়া উক্ত স্থলে মাছ ধরিতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে এমন ভাবে সামাজিক বয়কট করা হয় যে, বেচারীর আর অন্যত্র যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না ইহাদের গল্পও আবার তেমনি চিত্তাকর্ষী। অনেক সময়ে, অতল সমুদ্রের দিকে সজল চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া তাহারা বলিতে থাকে, কবে কোন্ অশুভক্ষণে তাহাদের বন্ধু সমুদ্রে জাল খুঁজিয়া আনিতে যাইয়া আর ফিরিয়া আসে নাই! হাঙ্গরের করাল দংষ্ট্রায় কবে কাহার কোথায় জীবনের যবনিকা পড়িয়াছে, তাহা বলিতে বলিতে তাহাদের চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠে।

অতীতের দুঃখের কথা হয়তো এক একবার তাহার মনকে ভারী করিয়া তুলে। সে বলিতে থাকে কি করিয়া তাহার জাল সমুদ্রগামী ষ্টীমারের চাকায় লাগিয়া ছিন্ন হইয়া যায়—আর সেই ছেঁড়া জায়গা মেরামৎ করিবার জন্য তাহার কি দারুণ চেষ্টা! অনেক সময়ে সে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরিতে যাইয়া একসঙ্গে অনেকদিন ধরিয়া প্রবাসেই থাকে, বাড়ী ফিরিবারও সুযোগ পায় না।

* *

যখন মৌসুমী বায়ু বহিতে থাকে, তখন আর গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা চলে না। সজল দক্ষিণ-পশ্চিমে হাওয়া যখন গাছে গাছে পাগলামী সুরু করিয়া দেয় যখন তরঙ্গে তরঙ্গে রুদ্রের তাণ্ডবনৃত্য ঝঙ্কৃত হইয়া ফিরে ও ছেলেদের ক্ষুদ্র নৌকাগুলি তাহার মধ্যে অসহায়ের মত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে—তখন এই অশান্ত শিশুর দল প্রকৃতির সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারিবে না মনে করিয়াই আর তখন সমুদ্রে বাহির হয় না, নিজের কুটীরে বসিয়াই বোধ হয় নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিতে থাকে। বিশ্ব-প্রকৃতির এই খেয়ালের মাঝখানে যতটুকু সুবিধা পাওয়া যায়, সেই অবসর সময়ে তাহারা তীরের কাছে এক একবার মাছ ধরিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।
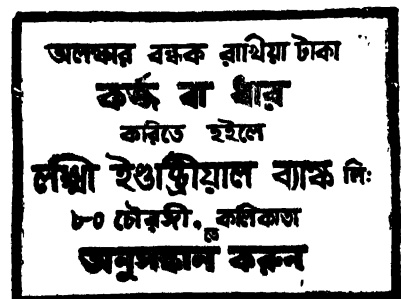
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সমূহে উপনিবেশিকদের জন্য তথ্য সংগ্রহ

ভারতবর্ষ, বর্ম্মা এবং সিংহলের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয় বাসিন্দারা আন্দামান দ্বীপসমূহে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা চলে কিনা, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। কলিকাতার একজন ভদ্রলোক ঐ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আন্দামান পরিভ্রমণ করিয়াও আসিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে দক্ষিণের দিকে খানিকটা জঙ্গলময় ভূভাগ উপনিবেশ স্থাপনের অনুকূল হইতে পারে বটে, কিন্তু বাকী স্থলসমূহ পর্ব্বতময় এবং নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

এই জায়গাটা সমুদ্র এবং বন্দর – উভয়েরই কাছে। আঁকাবাঁকা অনেক রাস্তা দ্বীপের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের অনেক রাস্তা আবার বেশ সুন্দরও বটে। বর্ত্তমানে সমস্ত দক্ষিণ আন্দামানের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা করার প্রস্তাব চলিতেছে। উহার ধারে ধারে গ্রাম বসাইয়া মধ্য আন্দামানকে আরো জনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য।

একদ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপে যাইতে হইলে গভর্ণমেণ্ট-ষ্টীমারে যাইতে হয়। রাত্রে সমুদ্রগামী ষ্টীমার মোটেই নাই, কাজেই দিনের বেলায় খানিকক্ষণ সময় অন্তর অন্তর যখন ষ্টীমার ছাড়ে, তখন উহাতে চাপিয়া বসিতে হয়। মজা এই যে, এই সকল ষ্টীমারে যাতায়াত করিতে ভাড়া আদৌ লাগে না; কিন্তু দ্বীপের মধ্যে চলা-ফেরা করিতে ট্যাক্সি এবং বাসের ভাড়া দিতে হয় এবং তাহা কলিকাতার অনুপাতে একটু বেশী। আন্দামানে নারিকেল, কফি, ইক্ষু, রবার এবং তামাকের চাষ চলিতে পারে। ওখানে জমির অবস্থাই এমন যে, চা-বাগান খুলিতে হইলে লক্ষ টাকার কমে কিছুতেই হইতে পারে না। সর্ব্ব সময়ের জন্য স্থানীয় convict labour বা সাজা প্রাপ্ত মজুর কদাচিৎ মেলে; দৈনিক মজুরও জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই খতম! এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতে কুলী কিংবা মজুর আমদানী করিতে না পারিলে কাজ চালানো কঠিন।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে চীফ্ কমিশনার বাহাদুর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যে উহা আগমনেচ্ছু ঔপনিবেশিকদের পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য বটে। আন্দামানে অনেক সুযোগ এবং সুবিধা আছে; কিন্তু যাহারা ওখানে যাইতে চাহেন তাহাদের অর্থ এবং ব্যক্তিগত উদ্যম দুই ই কাজে খাটাইতে হইবে; নতুবা-কিছুই হইবে না। সুতরাং, যাইবার পূর্ব্বে সমস্ত খুটিনাটির খবর লইয়াই জাহাজে উঠা উচিৎ।

সমস্ত আন্দামান ভরিয়া একপ্রকার হিংস্র (destructive) বাঘড়া গাছ এবং [illegible]

লতা আছে। উহা সমূলে বিনষ্ট করা উচিৎ এবং সেজন্ত অনেক টাকার দরকার।

সমবায় কৃষি সমিতিও দ্বীপে গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, গভর্ণমেন্ট আগত ঔপনিবেশিকদিগকে কোন প্রকার অর্থ কিংবা ঋণ দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন না।

এখানকার আবহাওয়া মালাবার অঞ্চলের মত। গড়ে বৃষ্টিপাত হয় ১১৭ ইঞ্চি (রস্ দ্বীপে) হইতে ১৪০ ইঞ্চি (ভাইপার দ্বীপে); বৎসরের মধ্যে নয় মাসই তুমুল বৃষ্টি হয়! জলের এবং জমির অবস্থা বেশ সন্তোষজনক বটে। যাঁহারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য আসিবেন তাঁহারা নিজেদের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা ভিন্নও জমির চাষ আবাদের এবং উন্নতির খরচ নিজেরাই বহন করিবেন।

আন্দামান সম্বন্ধে অনেকের যে কিস্তুতকিমাকার ধারণা আছে তাহা বদলানো দরকার। আন্দামান মোটেই "দরিদ্রের বেহেস্ত্" নয় যদিও অনেকে মনে করেন যে উক্ত স্থলের আবহাওয়া গরম হইলেও অস্বাস্থ্যকর নহে। আমাদের অনুসন্ধিৎসু বন্ধু তাঁহাদের সঙ্গে সুর মিলাইতে মোটেই প্রস্তুত নহেন। সে জায়গায় অল্প ভূমি লইয়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ভারতবাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। ভারতবাসীদের পক্ষে কিন্তু সেখানে চমৎকার সুবিধা রহিয়াছে;দেশী খৃষ্টানেরাও সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা যায়।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং অন্তান্য যাহারা সেখানে যাইবেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সঙ্গতি থাকা দরকার এবং প্রত্যেক একর ভূমিতে কমপক্ষে দুইশত টাকা ব্যয় করা দরকার। উপরের কথাগুলি আগমনেচ্ছু উপনিবেশিকদের সম্বন্ধেই বলা হইল এবং যাহাদের ২০০০৲ টাকা মূলধন নাই তাহাদের আসা মোটেই সঙ্গত হইবে না। উপনিবেশ স্থাপনের কোন স্কীম কাজে লাগাইতে গেলেই প্রায় ২০।২৫ লক্ষ টাকার দরকার হইয়া পড়িবে।

এস্থলে ভাল নারিকেল জন্মিতে পারে। যদি প্রতি একরে ৬০টী করিয়া গাছ থাকে এবং প্রতি গাছে গড়ে ৫০টি করিয়া নারিকেল ধরে—তাহা হইলে বৎসরে প্রায় ৩০০০ নারিকেল ধরিতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক একরে প্রায় ২০০৲ টাকা লাভ থাকিবে, ৫০ একর জমি থাকিলে লাভের অঙ্ক যাইয়া দাঁড়াইবে ১০০০০৲ টাকার কোঠায়। বর্ম্মাদেশেই সমস্ত নারিকেল রপ্তানী হইতে পারিবে। স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্ম শাক্‌সব্‌জী, ফল, ইক্ষু, ঘাসপাতি, লঙ্কা, আদা, তরমুজ প্রভৃতির চাষ এবং গো-মহিষাদির ব্যবসা করা চলে। চীফ্ কমিশনারের কাছে শোনা গেল যে, কতকগুলি ব্যবসায়ের পথ এখনি উন্মুক্ত রহিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে অন্ততঃ-পক্ষে ২০০০৲ টাকা না হইলে চলিবে না।

আমাদের অনুসন্ধিৎসু বন্ধুর মত এই যে, আন্দামান শিশুদের বাসের উপযোগী নহে। যাহারা আছে, তাহাদের বেশীর ভাগই আবার মিলিটারী কর্ম্মচারীর সন্তান—তাহাদের শিক্ষার অভাব মিলিটারী স্কুলই মিটাইতে পারে ; কাজেই নূতন স্কুল খোলার কোনই সার্থকতা নাই।

ডেপুটি কমিশনার কিংবা চীফ্ কমিশনারের কাছ হইতে থাকিবার লাইসেন্স না লইলে আন্দামানে কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় না। যাহারা লাইসেন্স পায় না, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আন্দামান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

যদি কেহ ওখানে যাইতে চান, তাঁহাদিগকে ভৃত্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে কেন না, আন্দামানে চাকর মিলিবার কোন সম্ভাবনা নাই; হোটেলও নাই যে আহার্য্য দ্রব্য কিনিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আন্দামানে মাছের ব্যবসায়ের জন্ত কিন্তু একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ত ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে ন্যূনপক্ষে ৫০০০০৲ টাকা দরকার। মাছও চমৎকার এবং মাসে আন্দাজ ১০ টন করিয়া কলিকাতা এবং রেঙ্গুনে চালান দেওয়া যাইতে পারে; কাঁকড়া, শামুক এবং ঝিনুকও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে।
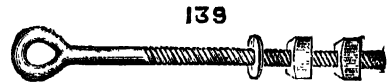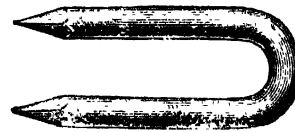
ব্যয়-সঙ্কোচের পরীক্ষা।

ল্যাঙ্কাশায়ারের দারিদ্র্য না সচ্ছলতা?

বিদেশে এবং কোন কোন ইংলিশ কাউন্টিতে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার কারবার সমূহে এবং তদঞ্চলে মানুষের আর কষ্টের সীমা নাই—সেখানে মানুষ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক সত্য কথা নহে। এক পুরুষ আগে যদি এক বছর ব্যাপিয়া ব্যবসায়ে এইরূপ মন্দা থাকিত তাহা হইলে হয়তো দলে দলে শ্রমজীবিরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিত এবং তাহাদের রক্ষার জন্য একটা সংগ্রাহক-সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে হইত। কিন্তু সে-দিন চলিয়া গিয়াছে। যদিও ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমজীবিদের আগের মত ব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, তবুও তাহারা অর্দ্ধাশনে দিন গুজরান করিতেছে বলিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে।

সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ইউরোপের তিনটি বিখ্যাত কেন্দ্র (হামবার্গ, বার্লিন ও আমষ্টার্ডাম) হইতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রস্থ কল-কারখানার মালিক ও শ্রমিকেরা ল্যাঙ্কাশায়ারের দুর্দ্দশার অতিরঞ্জিত বিবরণই পাইয়াছিলেন। ইহা সত্য বটে, যে, এখানকার তন্তু-ব্যবসায়ের অত্যন্ত দুর্দ্দিন যাইতেছে; ১৯৩০ সনে যে তুলায় প্রস্তুত মাল বিদেশে চালান হইয়াছে (সমস্ত উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৮০ অংশ) তাহার অনুপাত ঠিক ৬৫ বৎসর আগেকার মত, যখন যন্ত্রপাতির সংখ্যাও অর্দ্ধেক ছিল এবং উহা বর্ত্তমানের প্রায় অর্দ্ধবেগে চলিত। অনেক জায়গায় দেখা গেল, যে, বিদেশীর ধারণায় যান্ত্রিক যুগ আরম্ভ হইবার পর কোথাও এত বড় দুর্দ্দিন আর দেখা দেয় নাই. স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

অনেক সময় আমরা ভাবিয়া ঠিক পাই না, ব্যবসার এই অবনতির সময় ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়গণ কিরূপে কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া আছে। ইহা একদিন দুইদিন ধরিয়া চলিতেছে না; মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াই চলিতেছে! অনাহার নাই বলিলে মিথ্যাকথা বলা হইবে; কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর। অনেকে মনে করেন, ইহার প্রধান কারণ "ডোল" এবং তাহার জন্যই অনেক পরি-বারের গৃহে এখনো কিছু কিছু করিয়া সাহায্য আসিতেছে। ন্যাশনাল হেল্‌থ ইন্‌সিওরেন্সের টাকাই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী; ট্রেড ইউনিয়ানের বরাদ্দ, বিভিন্ন সমাজ হইতে প্রাপ্ত সাহায্য, সমবায় ব্যবসা ও ব্যয়-সঙ্কোচ প্রভৃতি কারণের জন্যই ইহারা এত আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেও কোনমতে টিকিয়া আছে! আশ্চর্য্য যে, ইহার মধ্যে আবার তাহারা সঞ্চয়ও করিতেছে।

সাধারণ লোকের অবস্থা ভালই

শুক্রবার রাত্রি. কিম্বা শনিবার প্রাতে এবং বিকালে রাস্তায় ও বাজারে বেড়াইতে গেলে দেখা যাইবে, লোকসমূহ আগের মত ব্যস্তভাবে বিকি-কিনি করিতেছে। অনেকের অবস্থাই খারাপ বটে; কিন্তু তাহা তো দেশের সুদিনেও বর্ত্তমান ছিল। সত্য কথা এই যে, ব্যবসার বর্ত্তমান অবস্থাকে সাধারণ জনগণের স্বচ্ছলতার মাপকাঠি ধরিয়া লইলে অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল করা হইবে। ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাহাদের সম্মুখে অনিশ্চিত ভবিষ্যত; সেইজন্য তাহারা বর্ত্তমানে মোটেই যথেচ্ছভাবে খরচ করে না; যাহা নিতান্ত দরকার এবং না হইলে চলিবে না, তাহার জন্যই তাহারা শুধ্ ব্যয় করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ব্যবসার এই দুর্দ্দশার জন্য তাহারা আরো একটু বেশী সতর্ক হইয়াই খরচাদি করিয়া থাকে। তাহারা আগের চেয়ে বেশী আনন্দ লইয়াই আজকাল খেলাধুলা প্রভৃতিতে যোগদান করে এবং ফিল্ম জগতের সস্তা আমোদেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করে। একটি জিনিষ কিন্তু আজকাল বিশেষ করিয়া সকলের নজরে পড়ে — উহা ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমজীবিদের বেশী করিয়া পারিবারিক এবং সামাজিক উৎসবে যোগদান করা। দেখা যায়, তাহারা পূর্ব্বের চেয়ে সুন্দরতর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাহির হয় এবং তাহাদের কথাবার্ত্তাতেও একটি সহজ সংযত ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

সপ্তাহে বেশী, কম যাহাই উপার্জ্জন হউক না কেন, তাহার থেকেও কিছু বাঁচাইবার প্রলোভন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে।

এখন যে সমস্ত অর্থ তাহারা ব্যয় করিতেছে, তাহার কতকাংশ সেই সময়েই বাঁচানো হইয়াছিল —যখন ব্যবসার বাজারে আদৌ ভাঁটা পড়ে নাই, ইহা ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন অবসর প্রাপ্ত শ্রমজীবির অন্তিম ক্রিয়ার সময় আমার সেখানে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল — তিনি প্রায় ১০বৎসর পেন্সন-তালিকা-ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহার সন্তানদিগের জন্য দুইহাজার পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি এবং লাগানী অর্থ (ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট) রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার সন্তানদিগের মধ্যে একজনের মাস ছয় ধরিয়া কোন কাজ কর্ম্ম নাই—কেননা, তাহার মিল, অর্ডার অভাবে বহুদিন হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে – তবুও তাহার অঙ্গে বেশভূষায়,দারিদ্র্যের কোন ছাপ লক্ষিত হইল না। আমাদের অনুসন্ধিৎসু বন্ধুর কাছে তিনি বলিয়াছিলেন, "জানো ভাই, এ রকম অবস্থা তো একটু আধটু সব সময়েই লেগে আছে, আজকাল একটু বেড়ে গেছে বইত' নয়!" আমাদের বন্ধুটীর ঠিক কি মনে হইয়াছিল জানিনা; কিন্তু দেখা গেল শ্রমজীবিদের মানসিক দৃষ্টিকেন্দ্র অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হয়তো ইহার জন্য এডুকেশন অ্যাক্ট অনেকাংশে দায়ী।

সর্ব্বত্রই অর্থ সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক শ্রমজীবি কত-খানি করিয়া ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করে—তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে স্যর জোষিয়া ষ্ট্যাম্পের হিসাবানুসারে, ১৯৩০ সনে নগদ জমা চৌদ্দ মিলিয়ন পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই স্যর এনথ হিল - তিনি ন্যাশনাল এসোসিয়েসন অফ্ বিল্‌ডিং সোসাইটিস্ এর চেয়ারম্যান ছিলেন —তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, ১৯৩০ সনের শেষ দিক দিয়া ফণ্ডে তিন শত ষাট মিলিয়ন পাউণ্ড জমা ছিল এবং তাহা পূর্ব্ব বৎসরের

জমা হইতে আটচল্লিশ লক্ষ মিলিয়ন পাউণ্ড বেশী। তবে, ইহা বলা শক্ত, পূর্ব্বোক্ত জমার কত অংশ শ্রমজীবিদের—বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রমজীবিদের পকেট হইতে আসিয়াছে। উত্তরের দিককার একটী বিল্‌ডিং সোসাইটি (যাহা মজুরদের মধ্যেই কাজ করিতেছিল) টাকা লাগানীর চাপে শেয়ারের সুদ এবং ঋণের হার কমাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অর্থ-সংরক্ষণ।

এইরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও তাহারা কিরূপে টাকা জমায় ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই ব্যবসার দুর্দ্দিনে ল্যাঙ্কাশায়ারের মধ্যে বার্ণলে-সহরের মত কেহ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয় নাই—ইহা নিশ্চিত। এই সহরের অর্দ্ধেক মজুরই ভারতবর্ষ এবং চীনে বস্ত্রাদি রপ্তানী করিয়া টিকিয়া থাকে ; কিন্তু তাহারা ১৯২১ সন হইতে বেকার বসিয়া আছে। তথাপি ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্থানীয় সমবায় সমিতির ২৭৫০০ লোক তাহাদের শেয়ার-মূলধন ২৪০২১১ পাউণ্ড হইতে ১৬৯১২৫ পাউণ্ডে দাঁড় করাইয়াছে ১৯৩০ সনে। সহরের সেভিংস ব্যাঙ্কস্‌এর হিসাব এখনো প্রকাশিত হয় নাই।

কয়েক মাইল দূরস্থিত ব্ল্যাকবার্ণ সহরেও একই অবস্থা। এখানকার মজুররাও বার্ণলে'র মতই সুদূর প্রাচ্যের বাজারের উপর নির্ভর করে এবং তাহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাঙ্কাশায়রের বাণিজ্য প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। এখানেও দুর্দ্দশার সীমা নাই ; তবুও ইহার মধ্যেই আবার সকলে সঞ্চয় করিতেছে! বস্ত্র-শিল্প প্রতিদিন খারাপ হইতে খারাপতর হইয়া উঠিতেছে। আগে যেখানে ১৩০টী মিল কাজ করিত, এখন সেখানে ৭০টী মাত্র মিল চলিতেছে ; বাকীগুলি কোনরকমে গড়াইয়া চলিতেছে। যেগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি খুব বড় এবং শ্রেষ্ঠও বটে। অনেক মিলের যন্ত্রপাতি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিষ বিক্রেতার দোকানে যাইয়া হাজির হইতেছে—রাস্তার দিকে চাহিলে প্রতিদিনই এই দৃশ্য চোখে পড়ে। যে সমস্ত বেকার-যুবক জীবনবীমা করিবার উপযুক্ত তাহাদের সংখ্যা ২৪,৫২৬ এবং তন্মধ্যে ২০,০০০ হাজারই তন্তুবায়শ্রেণীর লোক। সমস্ত লোকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০ জনই নিষ্কর্ম্মা। এখানে বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে (মার্চ্চ ৩, ১৯৩০ হইতে মার্চ্চ ২, ১৯৩১ পর্য্যন্ত) দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয় সমবায় সমিতির শেয়ার-মূলধন ৫৭১৯৮৩ পাউণ্ড হইতে ৫৫৩৩৪১ পাউণ্ডে নামিয়া গিয়াছে। সোসাইটি সেভিংস ব্যাঙ্কেও জমার হিসাব ১৯০৬৩ পাউণ্ড হইতে ১৪২০৫ পাউণ্ডে গিয়া ঠেকিয়াছে। বাইশ হাজার লোকের মধ্যে বেকার সমস্যা যেমন দারুণভাবে দেখা দিয়াছে তাহার তুলনায় এই হ্রাসকে নগণ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাকবার্ণ সেভিংস ব্যাঙ্কের অবস্থা বিশেষ আশাজনক বটে। কেননা, ইহাতে ৩৩৭৩৪০৯ পাউণ্ড জমা আছে। গত ছয় মাসে ব্যবসা যখন ক্রমাগত খারাপের দিকে চলিয়াছে, তখনও পূর্ব্বের বার মাসের তুলনায় ইহার জমার অঙ্ক ১৫০ হাজার পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন হিসাব-পত্রের সুরও ভিন্ন নহে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায় কিরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহার মোটামুটি আভাষ পাওয়া যায় ব্ল্যাক্‌বার্ণ সেভিংস ব্যাঙ্কের অ্যাক্‌চুয়ারীর (হিসাব পরিদর্শক) একটী বিবৃতি হইতে। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে যেখানে লোকে থিয়েটার, বায়স্কোপ, হোটেল প্রভৃতিতে যথেচ্ছভাবে ব্যয়

করিত—এখন আর তাহা করে না; সমস্তই সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে। এক বৎসর আগের সহিত তুলনা করিলেও দেখা যাইবে যে, সহরে থিয়েটার বায়স্কোপের মরশুমের দিন উঠিয়া গিয়াছে—তাহা আর পূর্ব্বের মত নাই। এমন কি, ব্যবসার দুর্দ্দিনের সময়েই ব্যাঙ্কের কাজ আরো বাড়িয়া গিয়াছে—সুদিনের সময় এতটা আদৌ হয় নাই। তাঁহার মতানুসারে ব্যাঙ্কের ইতিহাসে গত ছয়মাসে যত কাজ হইয়াছে, এত কাজ আর কোনদিন হয় নাই। হলিডে' সেভিংস ব্যাঙ্কগুলিও আশাতীত ভাল কাজ করিয়াছে এবং গত বৎসরের ৭৫০০০ হাজার পাউণ্ডের তুলনায় এবার তাহারা ৬৫০০০ পাউণ্ড বিতরণ করিবে। এই অর্থের অনেকাংশই উৎসবের সময় নিঃশেষে ব্যয়িত হয় না; কেননা, ব্যাঙ্ক নোটের নম্বর দেখিয়া প্রমাণিত হয়, যে, উহা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

বোল্টন—যেখানে মিহি বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়—অন্যান্য ল্যাঙ্কাশায়ার সহরের চেয়ে ভালই আছে। ব্যবসা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা গত বৎসর হইতেই আগাইয়া চলিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, এখানকার তাঁতিদের সঞ্চয় বাড়িয়াই চলিয়াছে; এমন কি,বোল্টন পিপ্‌ল্‌স্ সেভিংস ব্যাঙ্ক গতবার মাসে যে কাজ করিয়াছে তাহা কয়েক বছরেও সম্ভবপর হয় নাই। এখানকার হলিডে' ক্লাবগুলির অবস্থাও বেশ সন্তোষজনক। বোল্টন ওয়েকস্ উৎসব জুনের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে যখন আরম্ভ হইবে, তখন তত্রত্য মজুরদের মধ্যে ৬০,০০০ পাউণ্ড বিতরণ করিতে হইবে। গত বৎসর ইহার চেয়ে কয়েক শত পাউণ্ড বেশী বিতরিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহার অনেকাংশ আবার ব্যাঙ্ক, বিল্ডিং সোসাইটি কিংবা সমবায় সমিতিতে ফিরিয়া আসে।

ব্যয়-সঙ্কোচের হিসাব

যদিও ব্যবসার বাজারে ক্রমাগত মন্দা পড়িয়া যাইতেছে, তবুও উপরোক্ত মন্তব্যগুলি অন্যান্য ল্যাঙ্কাশায়ার সহরের প্রতিও প্রযোজ্য বটে। ওয়ারিংটন প্রেসটন্, এবং রথ্‌ডেল হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, যে, জমার হার কয়েকমাস ধরিয়া বাড়িয়াই যাইতেছে—তবুও মনে রাখিতে হইবে, যে আমাদের হিসাব একেবারে সম্পূর্ণ নহে। ল্যাঙ্কাশায়ারের সমবায় সমিতি সমূহ হইতে তত্রত্য শ্রমজীবিদের নাড়ীনক্ষত্র সমস্তই বুঝিতে পারা যায়—তাহারা কিরূপ সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহা জানিবার উহাই প্রকৃষ্ট উপায়। যদিও কো-অপারেটীভ ইউনিয়ন লিমিটেডের (যাহার সহিত স্থানীয় সমিতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) ১৯৩০ সনের হিসাব এখনো প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার খসড়া—যাহা প্রেসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—দেখিলে বোধ হইবে ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সনে ল্যাঙ্কাশায়ারের খনিমহলে এবং বস্ত্রবয়ন অঞ্চলে শেয়ারগত মূলধনে এবং স্মল্ সেভিংস্-এ জমার পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে :—

সমিতির নাম	১৯৩০		১৯২৯	
	শেয়ার-গত মূলধন পাউণ্ড	স্মল্ সেভিংস পাউণ্ড	শেয়ার গত মূলধন পাউণ্ড	স্মল্ সেভিংস পাউণ্ড
বোল্টন	১৩৪৭৬৪৪	৪৪৭১১	১৫৫৬৭২৫	৪৫৯০২
ফার্ণওয়ার্থ	৪২১৪৪৯	৮০২১	৪২৩১৭৮	৮০৫৭
লেই	২৭০৮৭৭	৮৬৯১	২৪০৪৫৮	৮২৫৭
সেণ্ট হেলেনস্	১৬৩৭৬৯	৩৬৮৯	১৫৩৫১৭	৩৫৯৩
বেস্‌উইক,	৫৭০৮৩৮	৫৮৩৯৪	৫৪১৬৭০	৫৮১৭২
ব্ল্যাক্‌লি	১৯৫৩৫২	৭৮৮৪	১৯২২১৬	৭২৫৯
এক্রেস্	৭৪৬৬৪৫	৫১২০৯	৬৯১০২৪	৪৯৪২১
ফেইল্‌স্‌ওয়ার্থ	৪৭৮৪৩১	৩০৬৫২	৪৬২৬৪৯	৩০৭৬১
ম্যান্‌চেষ্টার ও ওয়ালফোর্ড	১০৪৯২১৭	৪৪৩৬৮	৯৬৭৯৪৭	৪১৮৫০
পেণ্ডল্‌টন	৯৬২৪০৮	৭০০৮৮	৯৩৭০৬৯	৬৮৬৬৮
অ্যাক্রিংটন	৩৯৪৪৯০	১০৩০৭	৪১৬৫৮৯	৯৯৫৩
ব্ল্যাকবার্ণ	৫৬০৩৫৬	৭৫২১	৫৮২৭৮৫	১৩৯২৮
বার্ণলে	২৬৯১২৫	১১১১৩	২৪০২১১	১০৮৩৩
দারবেন	৫৫৮৬৯৯	১০৮৭০	৫৬৩৭১৫	১০৭১৪
নেলসন্	২৫৫৪৩৬	১২৩৭৪	২৩৭২৯১	১৪১১৭
প্রেসটন	৯৩৬২১৯	৩২২১৪	৯০৫৯১৫	৩২০২৯
ওল্ড্‌হাম্	১৬০৬৩৭৭	৪০৯৯৭	১৬২২৫৫৫	৪২৪৪১
বেরি	৭৬০৭৪৬	১১৮২৭	৭৬১৫৪৩	১১০৩৩
রথডেল	৮৭৪৩৬৩	১৮৭৪৬	৮৩১৫৮৯	১৬৭৪০

দেখা যাইতেছে যে কোন স্থলে শেয়ার-গত মূলধন ১৯২৯ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে কমিয়া গিয়াছে; কোন কোন জায়গায় বাড়িয়া গিয়াছে। কোন জায়গায় আবার সঞ্চয় বাড়িয়া গিয়াছে, কমিয়াও গিয়াছে আবার। সমস্ত হিসাবটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলে এমন কোন অঙ্ক চোখে পড়িবেনা, যাহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হইবে—অথচ সমস্ত দেশ-জোড়া বেকার সমস্যা ও ব্যবসার বাজারে ১০ বৎসর ধরিয়া দারুণ মন্দা! এই দুর্দ্দিনে কেমন করিয়া অর্থ সঞ্চয় হইতেছে, তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে কি?

———

বেকার বাঙ্গালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ত্তমান অবস্থা

ভারতে আজকাল ৯১টি ব্যাঙ্ক (প্রত্যেকটির মূলধন গড়ে ১লাখের কম নহে) ৮০টি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, প্রায় ৭০০০ ফ্যাক্টরি এবং প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ফ্যাক্টরীর মজুর ও কর্ম্মচারী আছে; কিন্তু ভারতের মত প্রকাণ্ড দেশের বিস্তৃতি ও লোকসংখ্যার দিকে তাকাইলে, যে সকল শ্রমজীবির ব্যবসায় (কলকারখানা ইত্যাদি) এখানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষকে জগতের ৮ম শিল্প-বাণিজ্যের স্থান দিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যৎসামান্য ও নগণ্য বলা যাইতে পারে। ভারতের ৬৮৫ হাজার গ্রাম আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান প্রণালীর শিল্প-বাণিজ্যের কোন খবরই রাখে না। শতকরা ৭১ জন ভারতবাসী আজকাল কৃষিকার্য্য, শতকরা ১০জন গৃহশিল্প এবং মাত্র শতকরা একজন বিস্তৃত আকারে প্রতিষ্ঠিত কার্য্যে শিল্পকার্য্য করে। কিন্তু অধিকাংশ কাজকর্ম্ম বা শিল্পকার্য্যে এখনও সেই পুরাতন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যন্ত্রপাতিতে যে 'সময় ও পরিশ্রম' কত বাঁচাইতে পারা যায়, তাহার তোয়াক্কা বড় কেহ রাখে না। তাহার উপর বুদ্ধিতে হীন না হইলেও অধিকাংশ লোক যে অলস ও অল্পাকাঙ্ক্ষী তাহা অস্বীকার করা চলে না—বিশেষতঃ আমাদের চলিত প্রথাগুলি ইহাদের উদ্যম ও জীবনীশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

বর্ত্তমান জগতের পরিচালক বা হর্ত্তাকর্ত্তা আমেরিকা। ইহার কারণ ভারতবর্ষের মত তথায় অগণিত জাতি এবং জাতিভেদ প্রথা নাই; ইহার যথার্থ কারণ, যদিও আমেরিকা সমগ্র জগতের বিস্তৃতির ৭% ও পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৬জন মাত্র; তথাপি আমেরিকা নিম্নহারে জগতের দ্রব্যসকল উৎপন্ন করিতেছে :—

জগতের শস্যসম্ভার	...	৭৫	% (শতকরা)
,, সূতা	...	৬৬	,,
,, পেট্রোলিয়াম বা কেরোসিন	...	৬৬	,,
,, তামা	...	৫০	,,
,, লোহা	...	৪০	,,
,, শিল্পজাত দ্রব্য	...	৩০	,,
,, গম	...	২৫	,,
,, রেলের লাইন	...	৪১	,,
,, ব্যাঙ্ক	...	৩৫	,,
,, ধন-সম্পত্তি	...	৩৫	,,

আমেরিকা বর্ত্তমান জগতের মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে; তাহার মূলে দেখিতেছি যে আমেরিকাবাসী যে অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে তাদের কৃষিকার্য্য, খনিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন করিতেছে, অদ্যাবধি জগতের কোন জাতি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

মনে করুন, আজ ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়াছে; তাহা হইলে ভবিষ্যতে ২।১ বৎসর বা কতিপয় বৎসরের মধ্যেও কি ভারতবর্ষ আপনাকে বিদেশজাত জিনিসের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়া 'স্বাধীন' বলিয়া কল্পনা করিতে পারিবে? তখন ভারত কি আপনার দুঃখদৈন্যের প্রতিকার অচিরাৎ করিতে পারিবে? শ্রমজীবিদের পরিশ্রমানুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া সকল শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিবে? তখন ভারত কি (supply and demand) সরবরাহ ও চাহিদার অনুপাতে সাধারণ লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায়ের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের আসল অভাব (Bare neessaries) মোচন করিতে পারিবে!

ভারতের সমুদয় কাঁচা মালের (Raw materials) শতকরা ৭৫ % বিদেশে চলিয়া যাইতেছে এবং ঐ সকল কাঁচা মাল হইতে নানারূপ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া পুনরায় ভারতে আসিতেছে।

ভারতে কেবলমাত্র স্থানীয় অভাব মোচনের জন্য শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, ভারতবাসীরা জীবনধারণের খরচপত্র কমাইতে পারে, যে টাকাটা এখন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহাও দেশে রাখিতে পারে ও তদ্বারা সাধারণ লোককে কাজে নিযুক্ত করিতে পারে এবং সর্ব্বোপরি বিদেশে জিনিসপত্রাদি রপ্তানীও করিতে পারে। একই প্রকারের যন্ত্রপাতি শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করিয়া অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কিছু সস্তায় মাল বিক্রয় করিতে পারে। কারণ, কাঁচা মাল ও মজুর ভারতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সস্তায় পাওয়া যায়। কোন জাতির রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের অঙ্ক (Indent) আমদানী দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে তাহার ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া নির্ণীত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা তাহার বিপরীত; ইহাতে স্বভাবতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতের ধনসম্পত্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে—পক্ষান্তরে ভারতে বিদেশের জিনিস মোটে আমদানী না হইলে ভারতবাসী নিজের সম্পূর্ণ অভাব আজ মোচন করিতে অসমর্থ। ইহার এক প্রধান কারণ, ভারতের ধনী সম্প্রদায় সাহসের সহিত কোন বড় ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে একেবারে কুণ্ঠিত।

আমাদের দৈনন্দিন অনেকানেক আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে দেশলাইর ব্যবসা উদাহরণ স্বরূপ লইয়া এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাক। আমরা বহু টাকার দেশলাই বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করিতেছি। ১৯২৭—২৮ সালে আমরা বিদেশ হইতে ৩১,৩৭,০০০ টাকা মূল্যের দেশলাই ভারতবর্ষে আমদানী করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেশলাই প্রস্তুতের প্রকৃতিজ উপাদান সকল অতি সহজে পাওয়া যাইতে পারে; ইহা সত্ত্বেও এত রাশীকৃত অর্থের দেশলাই এখনো বিদেশ হইতে আসিতেছে। সাধারণ বুদ্ধির লোকও বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, যদি আমরা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশলাই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি, তবে ভারতের অভাব মোচন করিয়া আমরা কিছু কিছু বিদেশেও রপ্তানী করিতে পারি।

যদি কোন শিল্প-ব্যবসায়ে কেহ কৃতকার্য্য হইতে ইচ্ছা করে, তবে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে-সকল (Machinery) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, গতানুগতিকের ন্যায় তাহা ধরিয়া থাকিলে চলিবে না; তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক

জগতে যে-সকল হাল-ফ্যাসানের যন্ত্রপাতি বাহির হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করিতে হইবে। তদ্দ্বারা প্রধানতঃ আমরা কল চালাইবার ও মজুরাদির বাবদ খরচ অনেক বাঁচাইতে পারিব, অধিকন্তু এই সকল যন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী বলিয়া যথেষ্ট বেশী মালও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইব।

কোনো শিল্পকার্য্যে সফলকাম হইতে গেলে আমাদিগকে অনেক রকমে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে; যথা—(১) (Capital) মূলধন, (২) (Labour) মজুর, (৩) (Import) আমদানী, (৪) (Raw materials) কাঁচামাল, (৫) (Machines) যন্ত্রপাতি এবং (৬) চাহিদা বা মালের কাটতির সম্ভাবনা। এইগুলির সবই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রথম জিনিষটা অর্থাৎ 'মূলধন' পাওয়া দুঃসাধ্য।

বাংলা প্রেসিডেন্সী বা কলিকাতায় যে সকল গ্রাজুয়েট বা আণ্ডার গ্রাজুয়েট আছে, তাঁহাদের কতক ধনাঢ্য লোকের সন্তান এবং অনেকে হয়ত মধ্যবিত্ত ও গরীবের সন্তান। তাঁহারা যে সকলেই এক হিসাবে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য করার কোন মূলধন নাই, তাহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য ২৫ হইতে ৬০ টাকা মাহিনার জন্য আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিতেছে। পক্ষান্তরে যাঁহারা ধনীর সন্তান তাঁহারা একান্তমনে গবর্ণমেণ্ট বা সেমিগবর্ণমেণ্ট অফিসে একটা বড় পদ লাভ করিয়া আপনার সময় ও পৈত্রিক অর্থ যাহাতে নষ্ট না হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

শিল্পবাণিজ্যে সাধারণ লোকের নেতৃত্বে ফল হইবে না—যাহারা শিক্ষিত ও ধনী তাহাদিগকে নেতৃত্ব লইতে হইবে। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়কে আজ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

ডাক্তার পট্টাবি সীতারামিয়া "খাদি" পত্রিকায় "ভারতে ভাবী সুখের রাজত্ব" সম্বন্ধে কল্পনা করিয়া বলেন—"যখন ভারতে 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য অনুসারে এই সকল বিবেচিত হইবে। যথা—

ভারতের বাহিরে ভারতের উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী বন্ধ করিতে হইবে; বহ্বাড়ম্বর ও চাকচিক্যময় পোষাকপরিচ্ছদ ইত্যাদি বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ করিতে হইবে; তৎপরিবর্ত্তে চরকা ও তাঁতের প্রস্তুত কাপড় চোপড় ব্যবহার করিয়া ভারতের সেই পুরাতন অবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; তন্তুবায় ও জোলার ব্যবসায়ে সহায়তা করিয়া তাহাদের বেকার অবস্থা মোচন ও অন্নের সংস্থান করিতে হইবে। গ্রামের পূর্ণ স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; গ্রামে যে-সকল বিবাদ বিসংবাদ হইবে, তাহা গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে গ্রামবাসীরা নিজেরা মীমাংসা করিবে। গ্রামের পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। শতকরা ৪৭ পারসেণ্ট কর্ষণীয় জমি, যাহা এখন অনাবাদী পড়িয়া থাকে, তাহাতে গ্রামের পুরাতন পুকুর ইত্যাদি খনন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচনের ব্যবস্থা করতঃ চাষাবাদের যথারীতি ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারগণ পুল ব্যতীত স্থানে স্থানে যে সকল খাল ও নালা কর্ত্তন করিয়া গ্রামের লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা মেরামত করিয়া যাহাতে গ্রামে বাহিরের জিনিষ তাড়াতাড়ি সরবরাহ হইতে পারে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা দেশে জল চলাচলের প্রণালী যাহা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই

সকল পুলকে যথেষ্ট লম্বা করিয়া যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে জল চলাচল হইতে পারে এরূপ সুব্যবস্থা করিতে হইবে। মামলা মোকর্দ্দমার কুফল যাহাতে একেবারে তিরোহিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; এবং গৃহশিল্পের পরিমাণ নিশ্চিত করিয়া প্রজাদের জন্য আনুসঙ্গিক শিল্প কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল কাজ দ্বারা ঘৃণিতভাবে মামলা মোকর্দ্দমা মিথ্যা কথার সাহায্যেও চালান অপেক্ষা যে একটা সম্মানের সহিত বেশী উপার্জ্জনের পন্থা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দিতে হইবে। আজ জলকর প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি স্কুলাদি স্থাপনের জন্য যেমন যত্ন ও চেষ্টা চলিতেছে, তেমনি চলচ্চিত্র সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং (travelling Cinema and itinerant libraries) শিক্ষা-প্রদ বিষয়ে ভ্রমণকারী বায়স্কোপ ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি আবশ্যক মনে হয়, তবে বর্ত্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি তুলিয়া দিতে হইবে, কারণ এখন টাউনে শিক্ষালাভ করিতে যাইয়া যেভাবে ছেলেদের স্বাস্থ্যের এবং অর্থের হানি হইতেছে, সে অর্থ জমা থাকিলে সাধারণের ধন বল বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া স্কুল, একটি সমবায় সমিতি, গ্রামের একটী নিজস্ব কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স, জমিজমা বন্ধক রাখা ও ব্যাঙ্কের সুবিধা এবং ধূর্ত্ত মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার স্বাধীন উপায়ের ব্যবস্থা থাকিবে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান গলদ - (ungodely educatin and matrialistic cult) "ঈশ্বরে অনাস্থা ও বাস্তব জগতই মুখ্য পদার্থ," যাহা গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া মানবাত্মাকে কলুষিত করিতেছে, এই চিত্ত-বিকার দূর করিয়া যাহাতে স্বাধীনভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়, এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের জাতিগত রীতিনীতি, তাহাদের দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া সমাজের জীবন গঠিত করিতে হইবে এবং নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইলে সালিসি ব্যবস্থা দ্বারা বিভিন্নজাতির সৌহৃদ্য বা ঐক্য স্থাপনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইতে হইবে।

সকল স্থানে হাঁসপাতাল ও আতুরশালা দেশ জুড়িয়া আবশ্যক মত স্থাপন করিতে হইবে; তৎসঙ্গে যে সকল ঔষধের দ্বারা রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়তা করে, তাহা বিলি ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রজা-স্বত্ব সংশোধিত করিয়া জমির খাজনার ভার হাল্কা করিতে হইবে, এবং এমনভাবে সুবিচারে ট্যাক্স বসাইতে হইবে যাহা গরীব লোকের পক্ষে বহন করা সহজ হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ের ইন্‌সিওরেন্স স্থাপন করিতে পারেন, তবে উত্তম কাজ হইবে, যথা—চাষের, পশুর ও শস্যের বীমা, জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা, সততা ও বিশ্বস্ততার বীমা, দালান কোঠা ও জাহাজের বীমা, দুর্ঘটনা ও চুরি ডাকাতির বীমা ইত্যাদি।

এই প্রকার কার্য্যদ্বারা যদি সমস্ত দেশকে দুঃসময়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার মধ্য দিয়া একটি সমবায় সমিতির সূত্রে আবদ্ধ করা যায় এবং যখন সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে তখন যদি কিছু ২ চাঁদা উক্ত সমিতির হাতে দেয়, তবে সকলেরই দুঃখ অনায়াসে মোচন হইতে পারে। কেহ টাকা ধার দিয়া তখন কাহাকেও

অপমান বা অবজ্ঞা করিতে পারিবে না এবং ঋণ করা একটা হেয় কাজ বিবেচিত হইবে না, কেননা তখন লোক শিক্ষা এরূপ ভাবে দেওয়া হইবে যে ধার করায় কোনো লজ্জার কারণ থাকিবে না, যদি তাহা অচিরাৎ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হয়। শিল্প-ব্যবসায় সম্বন্ধে, প্রত্যেক লোককে কত ঘণ্টা দৈনিক কাজ করিতে হইবে, এবং প্রতিযোগিতা ও কাজের উৎকর্ষ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইন করিয়া বিধি-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের 'কলা বিদ্যা' পুনরায় আপনার প্রাচীন গৌরব লাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইবে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সকলে নিজ নিজ

ভাষায় শিক্ষা ও শাসনের কার্য্য চলিবে, কিন্তু হিন্দিভাষাই ভারতীয় জাতির সাধারণ ভাষা হইবে। সুদীর্ঘকালের কুপ্রথা 'ছুঁৎমার্গ' আইনের এক কলমের ঘায়ে উড়িয়া যাইবে এবং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই যাহাতে ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৈন্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্য-বিভাগে দেশীয় লোকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে; সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা এখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বেকার সমস্যা সমধিক ঘটিয়াছে, তাহা তিরোহিত হইবে। কল-কারখানার সাহায্যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া, (যদিও আপাততঃ তাহাতে উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুতের সম্ভাবনা থাকিবে না) সাধারণ লোককে তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, এবং যাঁহাদের আর্থিক সাহায্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান চলিবে তাঁহারা যেন উপযুক্তরূপে তাহার প্রতিদান পাইতে পারেন, সেরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

সাধারণকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মজুরি বা বেতন দিতে হইবে—তাহার কম হইলে বে-আইনি করা হইবে, এবং যে সকল দরিদ্রের জমিজমা নাই, চাষাবাদের জন্য তাহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে।

প্রতি বৎসর এদেশ হইতে যে কোটি কোটি টাকা বিদেশীয় পণ্য বাবদ চলিয়া যাইতেছে, দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়া নৈতিক চরিত্রের বলে তাহা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে।

তখন জন সমাজকে আর আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া নতশিরে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে না; সমাজের নেতাদিগকে এরূপ ভাবে শক্তি ও সম্মান দেওয়া হইবে যে তাঁহারা তদ্দারা অসাধ্য সাধন করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজে সুফল দেখাইতে পারিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
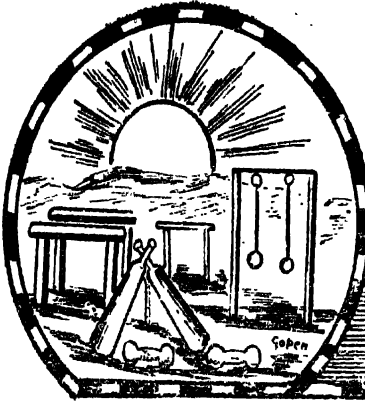
কোন সময়ে মানুষের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা উচিত

পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময়, ব্যবসায়ের উচ্চ-শিখরে দাঁড়াইলে, উহার মায়া আখেরের নাগপাশের মত মানুষকে জড়াইয়া ধরে—আর পলাইবার পথ থাকে না। কিন্তু ন্যায়তঃ, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে অর্থ উপার্জ্জনের পথ হইতে বিরত থাকাই উচিত। যদিও শারিরীক এবং মানসিক শক্তির ষ্টীম ত'নো চলিতে থাকে; কিন্তু তখন ব্যবসায়ের কর্ম্ম করিবার পথ হইতে বিরত থাকিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনেকে ভুলিয়া যায় যে, শুধু ডাল রুটী খাইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না - মানসিক কৃষ্টিরও অনেক দরকার আছে।

কোন্ বয়সে মানুষ কর্ম্মক্লান্ত জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিবে, তাহা প্রত্যেকের জানিয়া রাখা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, করিৎকর্ম্মা লোক অবসর গ্রহণ করিতে বড় ভয় পায় এবং সর্ব্বদাই মনে করে যে, কর্ম্মজগতের বাহিরে তাহার আর কিছুই করিবার নাই। কি রকম করিয়া সময় কাটাইতে হইবে তাহা ভাবিয়াই সে আকুল হয়। তাহার নিজের জন্য, পরিবারের জন্য এবং বন্ধুদের জন্য—এই অবসর যেন অত্যন্ত ভারী হইয়া চাপিয়া পড়িবে! কোনদিন ব্যবসায় জগতের বাহিরের কিছু সে জানে নাই, আজ তাই অবসর জীবন কাটাইবার জন্য মানসিক খোরাকও তাহার আর বেশী অবশিষ্ট নাই, খেলিবার ক্ষমতাও অনেকের শেষ হইয়া গিয়াছে!

মিঃ ডোরিস গ্রেসন বলিয়াছেন, "খেলা" শব্দ দ্বারা শুধু ছুটাছুটি, ঘোড়দৌড়, শিকার করা, গল্‌ফ্‌ কিংবা টেনিস খেলাই যে বুঝাইবে, এমন কোন অর্থ নাই। সমস্তদিন ঘোড়ায় চড়া কিংবা কোর্টে বসে' বসে' থাকাও অপরিসীম বিরক্তিকর। কিন্তু যদি কেহ ৩০ বৎসর ধন ও সম্মানের জন্যে লড়াই করিয়া থাকে, তাহার জন্য আরো অনেক পথ খোলা পড়িয়া থাকিবারই কথা। এমন সমস্ত

বই আছে, যাহা তাঁহার কোনদিন পড়া হয় নাই ; এমন অনেক স্থান দেশ-বিদেশে আছে, যাহা তাঁহার কোনদিন দেখা হয় নাই। একসঙ্গে অবসর, আনন্দ এবং কাজ করিবার খোরাক অন্য কি ভাবে কথনো জুটিতে পারে ?

যাঁহাদের কাজ করিবার শক্তি তথনও পূর্ণ-মাত্রায় অব্যাহত থাকে, তাঁহারা পড়াশুনার চেয়ে অন্য পথ খুঁড়িয়া বাহির করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। যদি একাগ্রচিত্ততা থাকে, তাহা হইলে সঙ্গীত, সাহিত্য, আর্ট কিংবা সিভিক্স—যাহাই হউক না কেন, সবতাতেই চিত্তবিনোদন করা যাইতে পারে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে এতকিছু করিবার থাকিতে মানুষ শুধু রৌপ্যচক্রের ধাঁধায় মুগ্ধ হইয়াই দিনরাত্র কাটাইয়া দেয়। অনেক কৃতী ব্যবসাদার কিছুতেই বুঝিতে চান না যে, তাঁহারা ব্যবসার পক্ষে একেবারে অপরিহার্য্য নহেন। একথাও তাঁহারা সহজে বুঝিতে চান না যে ৫০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা বর্ত্তমান যুগের সহিত ঠিক সমান তালে চলিতে পারিতেছেন না ; সে যুগের প্রগতি যুবকদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যেখানে করিৎকর্ম্মা আপ্ টু ডেট্ যুবকদের দ্বারা ব্যবসা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, সে বিষয়ে তিনি প্রায়ই অন্ধ থাকেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ব্যবসা আরো দ্রুত উন্নতি করিলে, উহা তথন তাঁহার চোখ ফুটাইয়া দিয়া থাকে।

কাজেই ইহা জানা অত্যন্ত দরকার, কথন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে, কথন বা নিজের কাজে যুবকদের সহকর্ম্মী করিয়া লইতে হইবে। খুব বেশী লোকেই অর্থের উপাসনা করিয়া থাকে ; কাজেই অনেকে হয়তো ভাবিতে পারেন—ইহা ক্ষমতার মোহ এবং অভ্যাসবশতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু এই অর্থের মোহ ও তজ্জন্য প্রাণপাত চেষ্টা যথন জীবন সংশয়ের কারণ হয়, তথন আর গত্যন্তর থাকে না বাধ্য হইয়াই তথন গলায় বাধ্যতার শৃঙ্খল পরিতে হয়।

শিশু-পালনে রৌদ্র—

আমাদের দেশে শিশুর সমস্ত গায়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে কিছুকাল শোয়াইয়া রাখার প্রথা আছে। ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে। কিন্তু এই তথ্যের সঠিক কার্য্য ও কারণ না জানা থাকার জন্য অনেক সময় যথেষ্ট ক্ষতি হইবারও আশঙ্কা থাকে। শিশুকে রৌদ্র সেবন করান মন্দ নহে বটে, কিন্তু এই রৌদ্র শিশুর উপযোগী কিনা, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য রাখিতে হয় তাহার চক্ষুর উপরে। রৌদ্র যাহাতে তাহার চোখের উপর না পড়ে তাহার জন্য সতর্ক থাকিতে হয়। কারণ এরূপ হইলে চক্ষুর স্থায়ী পীড়া হইতে পারে। আশা করি, বাংলার মেয়েরা এ বিষয়টি মনে রাখিবেন।

বাজারের শাকসব্জী—

আজকাল কথা উঠিয়াছে তাজা শাকসব্জীতে 'ভাইটামিন' বেশী থাকে। অনেকে আজকাল শাকসব্জী খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাজারে অতি অপরিষ্কার ভাবে মাটীর উপর এই সব শাকসব্জী রাখা হয়। শাকসব্জী সর্ব্বদাই জল শোষণ করিয়া তাজা থাকে। অপরিষ্কার জল ও মাটীর উপর এই সকল থাকা স্বাস্থ্যকর নহে। এই জন্য মাছ বিক্রীর জন্য উঁচু ইটের

যেরূপ ব্যবস্থা আছে, শাকসব্জীর জন্যও আবশ্যক মত ষ্টলের ব্যবস্থা হওয়া চাই। আশা করি দেশবাসী এবং বাজারের কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয় ভাবিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

তেলে ভাজা খাবার—

দরিদ্র দেশবাসী ক্ষুধা নিবারণের জন্য বেগুনী, ফুলুরী ইত্যাদি তেলে ভাজা জিনিষ খায়। অনেকে সখ করিয়াও ঐ সব বেশ আদরের সঙ্গে উপভোগ করেন। হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালাগণ এবং সাধারণ দোকানদারগণ যেরূপ ভাবে এই সব প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, তাহা নিতান্তই আপত্তিজনক। দুঃখের বিষয়, এদিকে দেশবাসীর তেমন খরতর দৃষ্টি আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা—ইহারা এইভাবে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনও করে। আমাদের দেশের বেকার যুবকগণ শিক্ষিত এবং উৎসাহী। তাঁহারা বেশ ভাল ভাবে এই সব তৈয়ার করিলে লোকে তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা অবশ্যই কিনিবে। বাড়ীর মেয়েদের দ্বারা তৈয়ারী করাইয়াও এসব জিনিস বিক্রয় করা চলে। ভাল জিনিস, ধনী দরিদ্র সকলেরই, অন্ততঃ বেকার নর নারীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

সঙ্গীতের উপকারিতা—

বিলাতের এক ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গীতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। যাঁহারা অক্ষুধা, মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগে পীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গীত উত্তম ঔষধি।

বিলাতের ডাক্তার সাইরিল্ হরসফোর্ড্ রয়াল-হাঁসপাতালের একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ইনি যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। ইনি বলেন, যক্ষ্মারোগের পক্ষে সঙ্গীতের তুল্য মহোপকারী ঔধষ আর নাই। যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত মাত্রই যদি রোগী সঙ্গীতাভ্যাস করে, তবে ঐ রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। গায়কেরা নাসিকা দ্বারাই নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, মুখবিবর দ্বারা শ্বাস গ্রহণের অবকাশ হয় না। এইরূপ গ্রহণে শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত জীবাণু সকল শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং যক্ষ্মারোগ বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ব্যতীত গায়কগণ আর একটি উপকারী প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহা গভীর শ্বাস প্রশ্বাস। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বক্ষ বিস্ফারিত হয়। এইরূপ কার্য্যেও যক্ষ্মারোগের জীবাণুর বক্ষমধ্যে অবস্থান কষ্টকর হইয়া থাকে। সঙ্গীতে গলনলীর অগ্রভাগের বিশেষ পরিচালনা হয়। চিকিৎসকেরা বলেন, প্রথমতঃ গলনলীর অগ্রভাগেই যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। সুতরাং সঙ্গীতে ইহার প্রতিষেধক কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সঙ্গীতের ক্ষমতা অতুলনীয়। ডাক্তার হরসফোর্ড বলেন, গির্জ্জার গায়কগণ যে প্রায়ই সবল ও দৃঢ়কায় হয়, সঙ্গীতই উহার একমাত্র কারণ।

সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর বয়সে মেদ বৃদ্ধি হয়—কেন ?

সাধারণতঃ দেখা যায় যে নর এবং নারীর ৪০ বৎসর বয়সের সময় মেদবৃদ্ধি হইতে থাকে। ঐ সময়ে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের শক্তি অনেক কমিয়া যায়; বলিতে গেলে, ঐ গ্ল্যাণ্ডই শরীর পুষ্টির প্রধান পরিপোষক। ইহার প্রধান কাজ এই যে, ইহা আহার্য্য দ্রব্যকে সত্বরেই মানুষের উত্তমে রূপান্তরিত করিয়া দেয় - বয়লারে ষ্টীম যে কাজ করে, ইহারও সেই কাজ। যখন ইহা ঠিকমত কাজ করিতে পারে না তখন আহার্য্য মেদে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে ঐ মেদ-বৃদ্ধি কমাইবার জন্য, গ্ল্যাণ্ডের অসম্পূর্ণতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঐ নীতি অনুসৃত হয়। অনেকে বলেন যে, মার্ম্মোলা প্রেসক্রিপসন্ টেবলেটে ঐ গুণসমূহ নিহিত আছে এবং প্রায় ২২ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহা আদৃত হইতেছে। এই মার্ম্মোলা প্রেসক্রিপসন পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ লেবরেটরী হইতে বাহির হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে শরীরের ওজন কমাইবার ইহাও একটি উপায় বটে। যেখানে নূতন সৌন্দর্য্য, অফুরন্ত যৌবন ও উত্তম ঘুরিয়া ফিরিতেছে - সেইখানেই ইহার কিছু প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষয়শীল গ্ল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-স্বভাব ফিরাইয়া আনা। দিনের পর দিন লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কিরূপে আস্তে-আস্তে নূতন উত্তম সমস্ত দেহে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তাহা কি সকলকে একদিন চমৎকৃত করিয়া দিবে না?

আরও একটি উপায় আছে, যাহাতে দেহের ওজন ও মেদবৃদ্ধি হ্রাস করানো যাইতে পারে। যদি পরিশ্রম করিবার সময় অল্প বায়ু ভিতরে টানিয়া লইয়া উহা বেশী পরিমাণে ত্যাগ করিবার অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলেও শরীরের মেদবৃদ্ধি খুব কমিতে থাকিবে। যাঁহারা এই গ্রীষ্মকালে মেদবৃদ্ধির জন্য কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নবীন থাকিবার উপায়।

নারীদের চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেই বৃদ্ধা সাজিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যদি তাহার পূর্ব্বেই মাথার কেশ শুভ্র হইয়া উঠে, মনে করিতে হইবে যে স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ ঠিকমত চলিতেছে না - দেহযন্ত্রের ফলে, কোথায় যেন মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। দুঃখ, বিরক্তি, অত্যধিক পরিশ্রম, উত্তেজনা, রাত্রি জাগরণ, অখাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে স্নায়ুর কাজ ঠিকমত চলিতে পারে না; মাথার চুল তাই সাদা হইয়া উঠে, অকাল বৃদ্ধত্বের ছাপ তাই ললাটে পড়িয়া যায়।

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য অটুট রাখিতে হইলে সিগারেট খাওয়া আদৌ চলিবে না, সামাজিক

আমোদ-প্রমোদের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে, প্রথম রাত্রিতেই শয়ন করিতে হইবে। যেন, অন্ততঃ পক্ষে আট ঘণ্টা ঘুম হয়। অনাবিল আলো-বাতাস, পরিমিত আহার—তাহার মধ্যে ফল-মূলের পরিমাণ যেন যথেষ্ট থাকে—তাহাই চুলের রঙ ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিবে।

মাথায় যথেষ্ট তেল ব্যবহার করাও যুক্তিসঙ্গত। লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, যাঁহারা মাথায় তেল দেন না, তাঁহারা সচরাচর অল্প বয়সেই বুড়ি সাজিয়া থাকেন। মাথার কেশ কালো রাখিতে হইলে, একটী ছোট স্পঞ্জের সাহায্যে মাথায় তেল দেওয়াই উচিত। দুই হাতের আঙ্গুল চুলের ভিতরে চালাইয়া এমন ভাবে তেল দিতে হইবে যে, সমস্ত মাথা যেন চকমক্ করিতে থাকে। মাথার তেল কয়েক ঘণ্টা এইরূপে থাকা দরকার; যাহা মাথায় শুষিয়া যায় নাই, তাহা মালিশ করিয়া উঠাইয়া ফেলা উচিৎ। তেল চুলের গোড়াকে বেশ একটু উত্তেজিত করিয়া দেয়। চুলের রঙ ঠিক রাখিতে হইলে, ইহার ব্যত্যয় হওয়া চলিবে না।

বীমাতত্ত্বের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বত্ত্বাধিকার প্রমাণ

একজনের পলিসি অপর একজনের হস্তগত হইলেই তাহার স্বত্ত্বাধিকারের দাবী প্রমাণিত হয় না। স্বত্ত্বাধিকার প্রমাণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে পলিসিক্রেতা বা বীমকারীকে উহা লিখিত দলিল দ্বারা কোম্পানীর নিকট জানাইতে হইবে। বীমাকারী নিজহস্তে তাহার ভবিষ্যৎ স্বত্ত্বাধিকারীর নাম লিখিয়া দিবেন। কোম্পানী যখন কাহাকেও কোন দাবীর টাকা দিবেন তখন তাঁহারা অবশ্যই দেখিবেন যে ঠিক লোককেই টাকা দেওয়া হইতেছে, এবং তাঁহাদের আর পুনরায় কাহাকেও উক্ত একই পলিসির জন্য টাকা দিতে হইবে না। কোম্পানী কোন পলিসির স্বত্ত্বাধিকার সম্বন্ধে যদি একাধিক লোকের নিকট হইতে নোটিশ পান, তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার স্বত্ত্বাধিকার প্রমাণ করিতে উপযুক্ত দলিল দেখাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। কোম্পানী সেই সকল দলিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত স্বত্ত্বাধিকারী কে তাহা স্থির করেন। প্রত্যেক দলিল উপযুক্তরূপে ষ্ট্যাম্প করা আছে কি না তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। কারণ উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ব্যতীত যদি কোন দলিলের উপর কেহ কাহাকে টাকা দেয়, তবে যিনি টাকা দিবেন তাহাকেই বাকী ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও আইনানুযায়ী জরিমানার টাকা দিতে হইবে। যিনি অনুপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সত্ত্বেও টাকা

দিয়া থাকেন, রাজস্ব বিভাগ তাহার নিকট হইতেই জরিমানা সহ ষ্ট্যাম্প শুল্কের প্রাপ্য আদায় করেন।

এই নিয়মের কেবলমাত্র দুই স্থলে ব্যতিক্রম হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে, যাহা কেবল অতীত দেনা-পাওনার হিসাব মাত্র, তাহাতে কর্তৃপক্ষ ষ্ট্যাম্প শুল্কের জন্য পীড়াপীড়ি করেন না। দ্বিতীয়তঃ যখন মর্টগেজ ছাড়াইবার পরে পলিসির দাবী প্রথম মালিকের উপর বর্ত্তে তখন উহাকে একই পলিসিক্রেতা জানিয়া ষ্ট্যাম্পের কড়াকড়ি উপেক্ষা করা হয়।

স্বত্বাধিকার প্রমাণে আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা পলিসি অথবা স্বত্বাধিকার প্রমাণ সম্পর্কিত মাঝখানের কোন রসিদ বা দলিল হারাইয়া যাওয়া। অনেক কোম্পানীকে অনেক সময় এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোম্পানী সাধারণতঃ এক বা একাধিক জামীনসহ দাবীদারের নিকট হইতে (Indemnity) লিখাইয়া লন। উক্ত বণ্ডে কখন কিরূপে কোন্ অবস্থায় কোথায় পলিসি বা অন্য দলিল নষ্ট হইল তাহাও সবিস্তারে বর্ণনা করা আবশ্যক।

আর এক অসুবিধা এই যে, কোন কোন সময় বহু বৎসর পরে বীমাকারীর দাবীর টাকা পাওনা হয়; তখন হয়তো দলিলের অথবা বিভিন্ন সময়ের লিখিত নোটীশের কোন লোক মারা গিয়াছে, বা দেউলিয়া হইয়াছে অথবা এমন কোন সুদূর প্রবাসে বাস করিতেছে যে তাহার পক্ষে দাবীর দলিল সম্পূর্ণ করিতে নিজে উপস্থিত হইয়া স্বাক্ষর দেওয়া অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় দাবীর টাকা পাইতে অথবা স্বত্বাধিকার প্রমাণে কয়েক মাস লাগিয়া যায়।

যদি স্বত্বাধিকার প্রমাণে পলিসি ছাড়া অন্য কোন দলিলের কথা উল্লেখ করা হয়, যাহা কোম্পানীর পক্ষে রাখা সম্ভব নহে তাহা হইলে তাহারা উহা প্রয়োজন মত দাখিল করিবার অঙ্গীকার লইয়া বীমাকারীর সলিসিটরের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই সকল প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার ষ্ট্যাম্পযুক্ত দলিলে থাকা আবশ্যক। কিন্তু যদি দলিল অপর একটি কোম্পানীর পলিসি হয়, তবে প্রথম কোম্পানী দ্বিতীয় কোম্পানীকে জানাইবে যে তাঁহারা দ্বিতীয় কোম্পানীর পক্ষে দলিল জমা রাখিলেন।

BONUS OPTIONS

যখন কোম্পানীর উপর কোন Reversionary Bonusএর নগদ মূল্যের দাবী করা হয়, অথবা উক্ত বোনাসের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ প্রিমিয়মের হার কমাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়, এবং কোম্পানীও এসাইন্‌মেন্টের নোটীশ যথারীতি পাইয়া থাকেন তখন দলিলাদি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। একটি বীমায় দাবীর কাল পূর্ণ হইলে যেরূপ ভাবে বীমার তদন্ত করা হয়, সেইরূপ ভাবে এখানেও সন্ধান আবশ্যক। যদি দলিলটি settlement in trust হয় তবে সেই ট্রাষ্টে উপরোক্তরূপ Bonus Optionএর কথা লেখা আছে কি না কোম্পানী তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

পলিসির উপর ধার

'প্রত্যর্পণ মূল্য' বা Surrender Value জন্মিবার পর বীমা কোম্পানী পলিসি বন্ধক রাখিয়া উক্ত মূল্যের শতকরা ৯০।৯৫ এমন কি ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বীমাকারীকে ধার দিয়া থাকেন। এজন্য সকল কোম্পানীই সুদ হিসাব করিয়া লন। কিন্তু পলিসির উপর কর্ম্মচারীর

দাবী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইয়া কোন কোম্পানীই কাহাকেও কর্জ্জ দেন না। পলিসি দাখিল করিতে না পারিলেও সচরাচর কর্জ্জ দেওয়া হয় না। কোম্পানী যদি মনে করেন যে আবেদনকারী পলিসি দেখাইতে না পারিলেও তাহার আবেদনে কোন দুরভিসন্ধি নাই, তথাপি তাহাদিগকে পলিসি দাখিলের জন্ত বাধ্য করিতে হইবে। পলিসি হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে কোন কোন কোম্পানীর বীমাকারীর নিকট শপথ ও প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া পুনরায় পলিসি ইস্যু করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে সেই দ্বিতীয় পলিসির উপর কর্জ্জ গ্রহণে কোন বাধা থাকে না।

উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট

দাবীর সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাহারা কোম্পানীর নিকট পলিসির উত্তরাধিকারীত্বের দাবী প্রমাণ করিয়া রাখেন, তাঁহারা কখনও কখনও কোম্পানীর নিকট উহার সার্টিফিকেট চাহিয়া থাকেন। কোম্পানীগুলি সাধারণতঃ এরূপ কার্য্য পছন্দ করেন না, তথাপি ইহাতে কোন ঝুঁকি বা আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা দ্বারা কোন কোম্পানী প্রতারিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বীমাকারী অথবা তাহার পলিসির উত্তরাধিকারীর খরচে কোম্পানী তাঁহাদের সলিসিটর দিয়া উত্তরাধিকারিত্বের তদন্ত করিবেন এবং দাবী সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইলে একখানি উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন—ইহাতে আপত্তি বা অনিচ্ছার কারণ কি থাকিতে পারে? প্রকৃত পক্ষে কোন কোন কোম্পানী হইতে আজকাল এরূপ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই।

বীমার পলিসি যত দীর্ঘ দিনের হয়, কোম্পানীতেও তত সংরক্ষিত বা reserve তহবিল জমিতে থাকে। বস্তুতঃ এই সংরক্ষিত তহবিলের উপরেই কোম্পানীর হিসাব স্থির হইয়া থাকে। জীবনবীমা আফিসের একচুয়ারীগণ ইহার সাহায্যে কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের গণনা ঠিক রাখেন। একার্য্যে তাঁহাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। (১) কর্জ্জ বা (২) প্রত্যর্পণ মূল্য (৩) Paid up পলিসি (৪) একশ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে পলিসি রূপান্তর (৫) কোম্পানীর পলিসির উপর লাভলোকসানের সাময়িক হিসাব (৬) পলিসির উপর উদ্বৃত্ত বা লাভ বণ্টন।

কর্জ্জ বা প্রত্যর্পণ মূল্য

পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্যের হিসাব স্থির করা কঠিন কাজ নহে। একবার কত করিয়া সুদ ধরা হইবে স্থির হইলে whole term, Limited Payment অথবা এণ্ডাউমেণ্ট বীমার মুদ্রিত হিসাব হইতে সাধারণ পলিসির রিজার্ভ মূল্য ধরা যায়। এইরূপ রিজার্ভ মূল্য হইতে বীমাকারীর বয়স ও পলিসির মিয়াদের তারতম্য অনুযায়ী শতকরা কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। বীমাকারী কোন কারণে যদি আশানুরূপ দীর্ঘায়ু না হন, অথবা পলিসি নাকচ করিয়া দেওয়ার জন্ত বীমাকারীর নিকট হইতে যদি কোম্পানীর খরচের টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তজ্জন্ত এইরূপ টাকা কাটিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এই কমানো মূল্যের সহিত যদি পলিসির উপর কোন reversionary বোনাস পাওনা থাকে তাহা, এবং নগদ বোনাসের পরিবর্ত্তে যদি বীমাকারী তাহার প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া

লইয়া থাকেন তাহা যোগ করা হয়। অল্পকাল স্থায়ী বীমার রিজার্ভ মূল্য কম হয় বলিয়া কোন কোন কোম্পানী সাধারণতঃ whole term পলিসিতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের এক তৃতীয়াংশ এণ্ডাউমেণ্ট পলিসিতে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অর্দ্ধেক প্রত্যর্পণ মূল্য দিয়া থাকে। বৎসরের সুদ পোষাইবার জন্য সাধারণতঃ প্রত্যর্পণ মূল্য শতকরা পাঁচ টাকা বাদ দিয়া কর্জ্জ মূল্য বা Loan value নির্দ্ধারণ করা হয়।

Paid up Policies, Limited payment policy এবং এণ্ডাউমেণ্ট বীমা ব্যতীত অপর সকল প্রকার paid up policyর হিসাব সংস্করণ মূল্য বা reserve valueএর উপর নির্ভর করে। এই সকল প্রকারের বীমায় কোম্পানীর আফিস খরচ বাদে বীমাকারীর নিকট হইতে কিছু কিছু আদায় হইতে থাকায় রিজার্ভ মূল্য হইতে যে টাকা কাটিয়া লওয়া হয় তাহা প্রত্যর্পণ মূল্যের হিসাব অপেক্ষা অনেক কম। Paid up policyতে লাভ দেওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কোম্পানী বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করেন। কোন কোম্পানী বলেন, যে প্রকারের বীমা হউক না কেন, paid up policy সর্ব্বদা বিনা লাভে (without) হইবে। আবার কোন কোন কোম্পানী কেবল মাত্র Limited Payment ও এণ্ডাউমেণ্ট বীমা পলিসির উপর লাভ দিতে চাহেন। আবার কেহ বা ইহা বীমাকারীর ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেন। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে লাভসহ পলিসি অপেক্ষা বিনা লাভের পলিসিতে অধিক টাকা দেওয়া হয়।

পলিসি পরিবর্ত্তন

এক শ্রেণীর পলিসিকে অপর এক শ্রেণীর পলিসিতে নিতে হইলে তাহার প্রিমিয়াম কত হইবে স্থির করিতে পলিসির রিজার্ভ মূল্যই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যের বিষয়। যেমন whole term পলিসিকে কেহ যদি Limited payment policy বা এণ্ডাউমেণ্ট বীমা পলিসি অথবা কম সংখ্যক প্রিমিয়ামের পলিসিতে পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, তবে তাহার প্রিমিয়াম প্রধানতঃ পলিসির রিজার্ভ মূল্যের উপরেই নির্ভর করিবে। পলিসিতে যখন reversionary বোনাস্ অথবা প্রিমিয়ামের সংখ্যা কমাইবার বোনাসের সর্ত্ত থাকে, তখন সাধারণতঃ তাহাদের বর্ত্তমান মূল্য হিসাব করিয়া রিজার্ভ মূল্যের সহিত সেই মূল্য যোগ করিয়া reversionary বোনাস্ প্রভৃতি নাকচ্ করা হয়। এণ্ডাউমেণ্ট বীমার সহিত অবশ্য reversionary Bonus যুক্ত থাকিলে বীমাকারী যদি উহাকে অল্প সংখ্যক প্রিমিয়ামের বীমায় পরিবর্ত্তিত করিতে চান, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আর এ-নিয়ম খাটিবে না। কারণ ইহাতে কোম্পানীর নগদ মূল্যের কোন ক্ষয় বা ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বীমা কোম্পানীর আইনের পঞ্চম ধারায় লিখিত আছে যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে পাঁচ বৎসরে একবার অথবা তাহার কম সময়ের মধ্যে এক বা একাধিক বার একজন একচুয়ারী দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ও লাভ লোকসানের হিসাব করাইতে হইবে। ইহাতে কোম্পানী কি কি প্রকারের বীমা করিয়া থাকেন, তাহাও লিখিতে হইবে। এইরূপ ভ্যালুয়েশন করাইতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যথেষ্ট বিদ্যা, বুদ্ধি, হিসাব ও পরিশ্রমের আবশ্যক। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। তাই হিসাবদক্ষ একচুয়ারী দ্বারা ইহা করাইতে হয়। অধিকাংশ বীমা অফিসেই প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর এই হিসাব করানো হয়।

প্রত্যেক কোম্পানীর একচুয়ারীকে পলিসি ও পলিসির মূল্য সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়ের বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করিতে হয়।

(১) জীবন বীমা, এণ্ডাউমেণ্ট বীমা প্রভৃতির প্রিমিয়ামের হার।

(২) উপরোক্ত দিবসে কোম্পানীর সমুদয় বীমার পরিমাণ। ইহার মধ্যে যেগুলি without profit অথবা with deferred profit অথবা with immediate profit সেগুলি পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে। মোট রিভার্সনারী বোনাসের পরিমাণ; প্রত্যেক বছরে সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়সের বীমাকারীর এবং অধিক বয়সের সংখ্যা প্রভৃতিও জানাইতে হইবে।

(৩) Whole term assuranceএর বোনাসের টাকা বাদ দিয়া বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদে যে টাকা আয় হইতে পারে তাহার হিসাব। পৃথক একটি তালিকায় নির্দ্দিষ্ট বৎসরের জন্য যে সকল পলিসি ইস্যু করা হয়, তাহাদের কাহার কত বৎসরের টাকা আদায় হইয়াছে, এবং কত বৎসরের বাকী, তাহা লিখিতে হইবে।

(৪) এণ্ডাউমেণ্ট বীমার মোট পরিমাণ, এবং কোন্ বৎসরে কত টাকার দাবী পূর্ণ হইবে তাহার হিসাব। রিভর্সনারী বোনাস্, অবিলম্বে লাভের বীমা (immediate profits) বিলম্বে লাভের বীমা এবং বিনালাভের বীমা প্রভৃতির হিসাবও আলাদা ভাবে দিতে হইবে।

(৫) অন্যান্য শ্রেণীর বীমার মোট পরিমাণ এবং উহার বিলম্বে লাভ, অবিলম্বে লাভ, বিনা লাভ বীমার পৃথক হিসাব।

(৬) পঞ্চম দফায় উল্লিখিত প্রত্যেক শ্রেণীর বীমায় বাৎসরিক যে প্রিমিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা।

(৭) ভ্যালুয়েশন বা কোম্পানীর মূল্য নিরূপণ দিনে বিশুদ্ধ এণ্ডাউমেণ্ট পলিসিতে মোট প্রিমিয়াম প্রাপ্তির পরিমাণ। এণ্ডাউমেণ্টের আরম্ভ হইতে ভ্যালুয়েশনের দিন পর্য্যন্তের হিসাব দিতে হইবে।

(৮) বিভিন্ন শ্রেণীর বীমার এনুইটি হিসাব।

(৯) ইন্‌কাম ট্যাক্স বাদ দিয়া জীবন বীমা তহবিলে মোট লাভের যে সাধারণ সুদের হার পাওয়া যায় তাহার তালিকা।

(১০) Whole term endowment প্রভৃতির সর্ব্বনিম্ন প্রত্যর্পণ মূল্যের তালিকা। এই তালিকায় কোন্ হিসাবে অথবা কি পদ্ধতিতে প্রত্যর্পণ মূল্য নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা দেখাইতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত একচুয়ারীকে ভ্যালুয়েশনের পদ্ধতি জানাইতে হইবে; এবং লাভ বণ্টনে whole term এবং এণ্ডাউমেণ্ট বীমা হইতে কিরূপে লাভ আদায় করিয়া বোনাস দেওয়া যায় তাহাও সবিস্তারে উল্লেখ করা আবশ্যক।

পলিসির শ্রেণী বিভাগ

উপরোক্ত তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে যে এক একটি কোম্পানীর সম্পূর্ণ হিসাব ঠিক করা, উহার বোনাস্, প্রিমিয়াম, লাভ প্রভৃতি স্থির করা কত কঠিন ব্যাপার। ইহাতে যেমন কঠোর পরিশ্রম আবশ্যক, তেমনি অনেক খাতাপত্র, বহু হিসাবের স্তূপ পরীক্ষা করিতে হয়। অথচ পাঁচ বৎসরের মধ্যে একবার রিপোর্ট বাহির করিতে না পারিলে কোম্পানীকে বহু টাকা জরিমানা দিতে হয়। তাগিদের তাড়নায় বিব্রত হইয়া একচুয়ারীদিগকে বিশেষ পরিশ্রম ও সতর্কতার সহিত এই সকল রিপোর্ট প্রকাশ করিতে হয়। সাধারণতঃ জীবন বীমা কোম্পানীগুলি তাঁহাদের বার্ষিক অথবা পঞ্চবার্ষিক বিবরণে একচুয়ারীর রিপোর্ট ও হিসাবের সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন; উহা প্রয়োজন মত দেখিয়া লওয়া যায়। এণ্ডাউমেণ্ট বীমা, whole term বীমা প্রভৃতির পলিসিগুলি সংখ্যানুক্রমে সাজানো হয়। বীমাকারীর বীমার প্রথম দিন হইতে অথবা দাবী পূর্ণ হওয়ার সময় হইতে এই তারিখ গণনা করা হয়। অন্যান্য শ্রেণীর পলিসিতে বিভিন্ন শ্রেণীর পলিসি পৃথক ভাবে সংখ্যা বা নম্বর অনুযায়ী রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ শ্রেণী বিভাগের জন্য 'কার্ড প্রথা' বেশ উপকারী। যখনই একখানি পলিসি ইস্যু করা হইবে, তখনই সেই পলিসির নম্বর সম্বলিত একখানি কার্ড রাখিয়া দিবে। ইহার মধ্যে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি থাকিবে। (১) শ্রেণী, (২) সংখ্যা, (৩) তারিখ, (৪) বীমার পরিমাণ, (৫) বীমা ইস্যু করিবার তারিখ, (৬) পলিসির উপর যখন যাহা লাভ দেওয়া হয়, (৭) প্রাপ্য প্রিমিয়ামের সংখ্যা কোন্ প্রণালীতে অর্থাৎ মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক অথবা বাৎসরিক কিস্তিতে বীমাকারী দিতে ইচ্ছা করে। এতদ্ব্যতীত বীমাকারীর নাম জন্ম-তারিখ, বীমার দিনে বয়স কত ছিল, কবে বীমার মিয়াদ পূর্ণ হইবে ইত্যাদিও এই খাতায় লিখিত থাকিবে। ভ্যালুয়েশনের সময় কার্ডগুলি নম্বরানুযায়ী অবশ্যই রাখিবে। তাহা হইলে যখনই উহা প্রয়োজন, তখনই বাহির করা সহজ হইবে।

———

বীমার ইতিহাস

শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বীমাচুক্তি পত্র দ্বারা পণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বীমা সংগ্রাহকগণ কর্তৃক এই ব্যবসা পরিচালন করিয়া ইহাকে বাণিজ্যে পরিণত করিবার প্রয়াসের যে পরিচয় প্রকাশিত করা হইয়াছে ইহাই যে বীমার সর্ব্ব প্রথম প্রারম্ভের পরিচয় তাহা নহে ; কেন না, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কিম্বা তাহারও কথঞ্চিত পূর্ব্বে নর্ম্মাণগণ (Normans) কর্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পূর্ব্বকালীন ইংরাজ জাতিগণের মধ্যে পরস্পরের সাহায্য ও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত সমিতি গঠনপূর্ব্বক ঐ সমুদয় সমিতি দ্বারা অগ্নিবীমার (Fire Insurance) প্রথা প্রচলনের যথেষ্ট প্রমাণ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় এবং এই সকল প্রমাণ হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায় ইহাই অগ্নি বীমার প্রারম্ভ। তবে আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইব না যে চীনদেশবাসীগণের প্রবল সামাজিক বিচার বুদ্ধির ফলে তাহারা বীমার উপকার উপলব্ধি করিয়া বীমা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া, ইউরোপে বীমা প্রথা প্রচলনের প্রায় এক হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে, চীনদেশে বীমা ব্যবসার উপকার উপলব্ধির পরিস্ফুটনের ও তাহার ফলে উহার প্রচলনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

পুরাকালে ইংলণ্ডের বিভিন্ন সমিতিগুলিই একরকম দৈবদুর্ব্বিপাক বীমা কোম্পানীর কার্য্য পরিচালক ছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, যাবতীয় বিপদ আপদে (যথা চুরি ডাকাতি বা গবাদি পশু প্রভৃতির বিনাশ) নিজ নিজ সমিতির সদস্যগণের বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণের সুব্যবস্থা করা হইত। এই প্রথাই Third party insurance এর সূত্রপাত এবং কোন কারণে একে অপরের কোনও ক্ষতিসাধন করিলে ক্ষতিকারীকে সমিতির আইনানুযায়ী যে জরিপানা করা হইত তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইত। বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক ক্ষতির জন্য বিভিন্ন হারে ক্ষতি পূরণের নিয়ম ছিল যথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখের জন্য ৩ শিলিং। বৃদ্ধাঙ্গুলীর জন্য ২০ শিলিং। ত্বকের আভ্যন্তরীণ পাঁজরা ভাঙ্গিলে তজ্জন্য ১০ শিলিং কিন্তু ত্বক ছিঁড়িয়া গিয়া নিম্নস্থিত পাঁজরা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িলে তজ্জন্য ১৫ শিলিং, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালাতিপাতের সহিত ঐ সকল সমিতির (Guilds) অস্তিত্ব ক্রমশঃই লোপ পাইতে থাকে এবং তাহার ফলে বীমার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বিশেষতঃ লণ্ডনের অধিবাসীগণ বিশেষভাবে বোধ করিতে থাকিলেও তদ্বিষয়ে উপযুক্ত কোনও প্রকারের ব্যবস্থা বহুকাল যাবৎ করিয়া উঠা সম্ভবপর হয় নাই।

প্রমাণ স্বরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে ২য় রিচার্ড

(Richard II) এর রাজত্বকালীন বীমাপ্রথা প্রচলনের উদ্দেশ্যে এক আইন পাশ হয় এবং তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল—

"A decree made by the Council of of citizens, for setting into order of the City and to provide, by God's help, against fire."

"First, they advise that all ale houses be forbidden, except those which shall be licensed by the common council of the City Guildhall, excepting those belonging to persons willing to build of stone, that the City may be secure. And that no baker bake either with reeds or strand or stubble, but with wood only,"

"Whoever wishes to build, let him take care as he loveth himself and his goods, that he roof not with reed, nor rush, nor with any manner of litter, but with tile only or shingle or boards, or if it may be, with lead within the City and Portsoken. Also all houses which till now are covered with reed or rush, which can be plastered let them be plastered within eight days, and let those which shall not be so plastered within the term be demolished by the alderman and lawful men of venue"

ইহার পর বীমা সম্বন্ধে প্রথম কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং ঐ সময় এ বিষয়ে যে ব্যবস্থা ছিল তাহাকে ইংরাজী ভাষায় অভিহিত করা হয় "Church briefs" or "King's letters" অর্থাৎ যাজক সম্প্রদায় বা নৃপতি কর্ত্তৃক কোনও সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের উপর শাসন সম্পর্কীয় অনুশাসন পত্র। উহার দ্বারা কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি অগ্নিদাহ হেতু ক্ষতিগ্রস্থ হইলে ঐ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ধর্ম্মমন্দির বা প্রধান প্রাদেশিক কর্ম্মচারী বা বিচারপতিগণের নিকট হইতে সাহায্য স্বরূপ চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিবার অধিকার পাইত। কিন্তু এই প্রকারের অনুশাসন পত্র পাইতে হইলে হয় কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে অথবা বিচার আদালতের পরিচিত কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সুপারিশ পত্র দাখিল করিয়া আবেদন করিতে হইত। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীগণের বা সম্ভ্রান্ত গৃহস্থগণের অতি অল্পই উপকার সাধিত হইত। এবং এই প্রকারের ব্যবস্থার অপব্যবহারেরও যথেষ্ট সুযোগ ঘটিত এবং যাবতীয় প্রকারের অপব্যবহারের ফলে রাণী আনির (Queen Anne) রাজত্বকালে পার্লামেন্টে প্রথম এক আইন পাশ করিয়া ঐ সকল অনুশাসন পত্র প্রদানের প্রণালী সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়মাদির উপায় উদ্ভাবনের পরিচয়ও ইতিহাস হইতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যতদিন জাতীয় চরিত্রের উন্নতি না হয় ততদিন সর্ব্বদেশেই যখনই যে সুযোগের ব্যবস্থা করা হউক না কেন তাহার অপব্যবহার অল্পবিস্তর কিছু না কিছু ঘটিবেই এবং ক্রমশঃ যতই ঐ চরিত্র-গঠনের উন্নতি হইতে থাকে ততই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি ভাবের আচার ব্যবহার চলিলে জাতীয় মঙ্গল সাধন সম্ভব হয় তদ্বিষয়ে লোকেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইতে থাকে। Queen Anne এর আমলে ঐ যে আইন পাশ হয় তদধীনে

যে অনুশাসন পত্র প্রদান করা হইত তাহাতে আদেশ থাকিত যে ধর্ম্মযাজকগণ বা মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক, অগ্নিদাহ হেতু ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য জন্য আবেদনপত্র পাইলেই তাহা আবেদন কারী যে সমিতির সদস্য সেই সমিতিকে জানাইয়া ক্ষতির বিষয়ে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ পাইলে আবেদনকারিগণের পক্ষ হইতে, এমন কি যেস্থলে অগ্নিদাহ ঘটিয়াছে তাহা হইতেও শত শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যাহাতে চাঁদা সংগ্রহ করিবার সুবিধা হয় এবম্বিধ অনুমতি পত্র প্রদান করা হইত। এবং এই প্রকারের যত চাঁদা সংগ্রহ হইত তাহা গচ্ছিত রাখিবার নিমিত্ত ন্যাসরক্ষক (Trustee) নিযুক্ত করিতে হইত এবং এই Trustee কর্ত্তৃক উক্ত চাঁদার টাকা প্রকৃত ক্ষতি-গ্রস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টণ করার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও আইনের অপব্যবহারও যথেষ্ট ঘটিত; অগ্নিবীমা ব্যবসা ভাবে প্রচলিত হইতে থাকিলে পুরাকালের উপরোক্ত ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতির অনুশাসন পত্রের প্রথা ক্রমশই স্থগিত হইতে থাকিলেও উনবিংশতি শতাব্দির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাহার প্রচলন কিছু না কিছু ছিল, এবং তাহারই কিছুকাল পরে উক্ত প্রথা একেবারে স্থগিত হয়।

লণ্ডন নগরীতে অগ্নিবীমা কার্য্য চালাইবার অনন্যসাধারণ অধিকারের জন্য ইংরাজী ১৬৩৫ সালে এবং পুনরায় ১৬৩৮ সালে প্রথম চার্লসের (Charles I; নিকট আবেদন পেশ হইতে থাকে এবং আবেদনকারীকে দায়িত্ব লইতে হইত যে সহরের রাস্তাঘাটে স্থায়ীভাবে অগ্নিদাহ নিবারণের জন্য আবশ্যকীয় সতর্কতার ব্যবস্থার উপায় অবলম্বন করিবেন এবং সেন্ট পল গির্জ্জার পুনর্নির্ম্মাণের জন্য (rebuilding Saint Paul's Cathedral) বাৎসরিক দুইশত পাউণ্ড চাঁদা দিতে থাকিবেন। এই ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে অনুমোদিত হইলেও কোনও আবেদনকারিকে সনন্দ প্রদান করা হয় না এবং ইংরাজি ১৬৬৬ সালে লণ্ডনে যে ভীষণ অগ্নিদাহ ঘটে তাহার ফলে বাধ্য হইয়া দ্বিতীয় চার্লসের (Charles II) রাজত্বকালীন, যাহাতে অগ্নিদাহ হেতু ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া সমগ্র জাতির ধ্বংশের হাত হইতে পরিত্রাণের সুযোগ সম্ভব হয়, এতদকল্পে চেষ্টার প্রারম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

টোমেন বিষের কথা

টোমেন বিষের কথা প্রায়ই শোনা যায়। হয় নিমন্ত্রণ বাড়ীতে, নয় বাজারের যে-সে দোকানে বা হোটেলে আহার করিয়া লোকে অসুখে পড়ে এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায়, রোগীর দেহে টোমেন বিষের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। অনেক সময়েই এই অসুখ গুরুতর হইয়া রোগীকে একেবারে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এবং গ্রীষ্মকালেই টোমেন বিষে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক।

খাবার জিনিষ দূষিত হইলেই তাহার ভিতরে টোমেন বিষের জন্ম হয়। এসব খাবার খাইলে মানুষের পেটের অসুখ হয়। সাধারণতঃ মাংসাহারেই এরূপ পীড়া আত্মপ্রকাশ করে, কারণ এসব ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণীর মাংসের মধ্যে এক রকম রোগ জীবাণুর অস্তিত্ব থাকে। এই মরণের জীবাণুরা শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালেই বেশী স্ফূর্তি লাভ করে।

এই রকম জীবাণু অনেক জাতের আছে। তাহাদের সকলেই অবশ্য সমান ভয়ানক নয়— কাহারও দ্বারা বেশী, আবার কাহারও দ্বারা কম অপকার সাধিত হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদগণ সেই বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুদের মধ্যে যাহারা প্রধান এবং সাংঘাতিক তাহাদের এক এক জাতের এক এক নাম দিয়াছেন। সাধারণতঃ জন্তুদের জীবনকালেই সেই দুষ্ট জীবাণুরা তাহাদের দেহের ভিতর গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষের উদর পূরণের জন্য সেই জীবাণু দূষিত জন্তুরা নিহত হইলে, তাহাদের মাংস খাইয়া মানুষরাও বিপদে পড়ে। গরু, শূকর, বাছুর ও ভেড়ীর মাংসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণুর দ্বারা দূষিত হয়। দুধও সময়ে সময়ে বিষাইয়া উঠে।

অনেকে ভাবিতে পারেন যে, মাংস যখন উনুনের আগুনের তাপে সিদ্ধ করা হয়, তখন তাহার ভিতরকার জীবাণুরা নিশ্চয়ই মরিয়া যায়; তবে তাহাদের দ্বারা কেমন করিয়া মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয়? কিন্তু সকলের জানিয়া রাখা উচিত যে, সাধারণতঃ যতটা তাপে আমরা রান্না করি, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। কারণ জীবাণুরা একেবারে মাংসের ভিতরে ঢুকিয়া আপনাকে যথাসম্ভব নিরাপদে রাখে। তখন আগুনের আঁচ যথেষ্টরূপে তাহার গায়ে লাগিয়া তাহাকে বধ করিয়া আপদ চুকাইয়া দিতে পারে না। অতএব সিদ্ধ মাংস খাইতেছি জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও রোগের আক্রমণ হইতে আমরা মুক্তি পাই না।

এই ভীষণ বিপদ হইতে নিস্তার লাভের উপায় কি? গ্রীষ্মকালে দোকান হইতে মাংস কিনিয়া আনিয়া, প্রথমে "বোরাসিক এসিড" বা এই জাতীয় অন্য কোন বিষ নাশক জিনিষের দ্বারা মাংসকে ধুইয়া পরিস্কার করিয়া ফেলিবেন তারপর উপযুক্ত তাপে মাংসকে সিদ্ধ করিতে হইবে।

Botulinus নামে এক রকম ভীষণ জীবাণু মাংসের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ু ও মেরুদণ্ডকে আক্রমণ করিবার জন্য

তাহাদের একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। এই বিষম জীবাণুরা আশী ডিগ্রী (c) তাপে মারা পড়ে।

সাহেবদের দেখাদেখি অনেকে কোন কোন বিশেষ মাংসের খাবার অল্প বা আধসিদ্ধ করিয়া খান। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে অনেক সময়েই এই নির্ব্বোধ অনুকরণটা আত্মহত্যার মতই ভয়ানক। কারণ মাংসে টোমেন বিষ, অর্থাৎ ক্ষারযুক্ত বস্তু থাকিলে তাঁহারা কিছুতেই আর আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। অনেক বাঙ্গালী আবার টিনের কৌটাবদ্ধ মাংস আহার করিয়া থাকেন। এরকম অকারণ অনুকরণকে আমরা মহাপাপ বলিয়া মনে করি ; কারণ, এই মাংস যদি কৌটা খুলিবার পরেই একেবারে খাইয়া ফেলা না হয়, তবে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাহা নিশ্চয়ই বিষাক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যাহারা কৌটার মাংস খান, তাঁহারা কি এসব তথ্যের সঙ্গে পরিচিত আছেন ?

মাংস রান্না হইয়া গেলেও বিপদের ভয় আছে। উনুন হইতে নামাইয়া মাংস চাপা দিয়া রাখিবেন। নহিলে অদৃশ্য ধূলা বা মাছির দ্বারা বাহিত হইয়া নূতন নূতন রোগ জীবাণুর আবির্ভাব হইবে। বাঙ্গালী চালিত হোটেলগুলিতে বা নিমন্ত্রণ বাড়ীতে খাদ্যপূর্ণ পাত্রে কখনো আবরণ দেওয়া

হয় না। ঐ সকল স্থানে আহার করিলে প্রায়ই যে আমাদের শরীর খারাপ হয়, তাহারও প্রধান কারণ খাদ্য সামগ্রীকে সুরক্ষিত না রাখা।

বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের জন্য অনেক রকম অসুস্থতা হয়, যেমন বমন, উদরাময়, শূল, বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, কম্প, অজ্ঞান হওয়া বা বিষম অবসাদে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়া, প্রভৃতি। তা ছাড়া সময়ে সময়ে চর্ম্মরোগ হইতেও দেখা যায়।

ইহার চিকিৎসা প্রণালী এই—রোগীর যদি বমন না হয়, তবে প্রথমে তাহাকে কোন বমনকারী ঔষধ দিবেন ; এমন কি, পেটের অসুখ হইলেও বমন করাইবার জন্য এক আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল দশ ফোঁটা লডেনাম মিশাইয়া রোগীকে দিবেন। কিছুকালের জন্য কোন খাদ্য সামগ্রী খাইতে দিবেন না। তরল পানীয়, যেমন গরম জল,সোডা ওয়াটার ও দুধ (দুই ভাগ জল মিশাইয়া) অল্প মাত্রায় দিতে পারেন, ডাক্তারী চিকিৎসারও দরকার।

মুদ্রা

শ্রীভবেশ দাশগুপ্ত বি, এ,

মানব সভ্যতার একটী সাধারণ মাপকাঠি মুদ্রা। কোন্ দেশের সভ্যতা কত প্রাচীন তাহা সে দেশের মুদ্রা প্রচলনের প্রাচীনতা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুদ্রার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বেদ, পুরাণ ও মনুসংহিতা প্রভৃতি বৈদিক ভারতের প্রাচীনগ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা হইতেও প্রাচীন ভারতে মুদ্রা ব্যবহারের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবাসীরা বেশ উন্নত জাতি ছিল—তাহারা মুদ্রার ব্যবহার জানিত এবং সেই মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ে দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবহৃত হইত। ইহা হইতে আরও বোঝা যায়, যে, ব্যবসায় বাণিজ্যেও তাহারা বেশ অগ্রসর ছিল।

প্রাচীন ভারতে সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মুদ্রা-প্রচলনের সেই আদিম যুগে অবিমিশ্রভাবে মুদ্রা ব্যবহৃত হইত না, মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না মাটীর চাক্‌তী, কড়ি প্রভৃতিরও প্রচলন ছিল। সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ ক্রয়বিক্রয়ে এই সকল ও বহির্বাণিজ্যে মুদ্রার ব্যবহার হইত। রাজকর উৎপন্ন দ্রব্যের বা পণ্যের নির্দ্দিষ্ট অংশদ্বারা প্রদত্ত হইত। সেই সহজ জীবন-যাত্রার যুগে, মুদ্রার কোন সার্ব্বজনীন ব্যবহার ছিল না।

মুদ্রা তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা মাত্র হিন্দু নরপতির হাতেই ছিল। কিন্তু সেই মুদ্রার ওজন, মূল্য, ধাতু ও খাদের (alloy) পরিমাণের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। মাত্র স্বাধীন রাজাদের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ লোকেও মুদ্রা প্রস্তুত করিত—এবং এই সকল মুদ্রাও পাশাপাশি একসঙ্গে চলিত।

মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নপ্রকার মূল্যের

ও ওজনের মুদ্রা ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল মুদ্রার কোনটাই স্থায়ী হয় নাই। তাহার কারণ স্থায়ী হইবার জন্ম মুদ্রার সে সকল গুণ পুরামাত্রায় ছিল না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা,—তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীগণ সকলেই নিজ নিজ নামে নূতন মুদ্রার প্রচলন করায় তাহাদের আয়তন,ওজন ও গঠন বা মূল্যের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। সেইজন্ম একই শাসনকর্ত্তার সময়ে সেই প্রদেশেই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার মুদ্রা অচল হইয়া যাইত।

১৫৪০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট হইয়া ভারতের নানা হিতকর কার্য্যের সহিত শের শাহই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন টঙ্কা বা তঙ্কার প্রচলন করেন। এই তঙ্কা যে স্থায়ী মুদ্রা হইবার গুণসম্পন্ন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়—কারণ তঙ্কাই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শের শাহ্-এর পর সম্রাট আকবরও সমগ্র ভারতে সার্ব্বজনীন মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সে চেষ্টা আংশিক সফল হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে ভারতে কোন সার্ব্বজনীন বা মূল্যমুদ্রা (standard coin) ছিল না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে আগমনকালে ভারতে নানা ধাতুর ও ওজনের প্রায় ৯০০ শত প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কোম্পানীও ইংরাজী কুঠীতে ব্যবহারের জন্ম নিজের দায়িত্বে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্য্যন্ত কোম্পানী এই মুদ্রাই গ্রহণ করিত। কিন্তু এই সকল মুদ্রার ওজন বা মূল্যের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় ইউরোপের সহিত লেনদেনের হিসাবে কোম্পানীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ম ১৮১৮ সালে কোম্পানী মাদ্রাজে এক ইস্তাহার জারী করেন যে অতঃপর কোম্পানীর দেনা পাওনায় শুধু টাকাই ব্যবহৃত হইবে। অন্ম কোন প্রকার মুদ্রা কোম্পানী গ্রহণ করিবে না। টাকায় ১১ ভাগ রূপা ও ১ ভাগ খাদ (165 gr. silver 15 gr. alloy) থাকিলেই তাহা গ্রহণীয় হইবে।

এই ব্যবস্থায় যে কোম্পানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ ১৭৩৫ সালে, কোম্পানীর আদেশ অনুসারে ভারতে কোম্পানীর অধিকৃত সকল স্থানেই টাকাকেই মুখ্য মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং অন্ম সকল প্রকার মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত টাকার ওজন ও তাহার রূপার ও খাদের ভাগ প্রায় সমানই রহিয়াছে।

১৮৩৫ সালের ঘোষণা অনুসারে কোম্পানীর সকল প্রকার লেন দেন টাকাতেই হইতে থাকে, মোহর বা সভারেণের প্রচলন বন্ধ হইলেও সোণা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্য অনুসারে সভারেণ গৃহীত হইত, কিন্তু ১৮৪১ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় নূতন নূতন স্বর্ণখনি হওয়ায় রূপার অনুপাতে সোণার দাম কমিয়া যায় এবং ব্রিটিশভারতে সভারেণের প্রচলন বন্ধ হইয়া যায় ও উহার মূল্য দশটাকা ধার্য্য হয় এবং টাকাই একমাত্র মুদ্রার স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতেও অসুবিধার অন্ত ছিল না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সে সময় ইউরোপের যে-সকল দেশের সহিত কারবার করিতে হইত সে-সকল দেশে স্বর্ণমুদ্রাই মুখ্যমুদ্রা। সোণার অনুপাতে রৌপ্যের তথা টাকার মূল্য কষিয়া এই সকল দেশের সহিত লেনদেন করিতে হইত। সুতরাং সোণার অনুপাতে রূপার বা

রূপার অনুপাতে সোণার দাম কমিলে বা বাড়িলে ইহাদের সহিত কারবারে বিশেষ অসুবিধা হইত।

যাহা হউক, অধিকতর সোণা আমদানী হইবার ফলে কিছুদিনের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকার মূল্য বাড়িলেও এই অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; কারণ কিছুদিন পরেই কালিফোর্ণিয়ায় নব নব রৌপ্যের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সময়ে (১৮৬৭ ৭০) ইউরোপের অনেক দেশ রৌপ্যমুদ্রা বর্জ্জন করিয়া সোণাই মুখ্যমুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করায় রূপার চাহিদা ঢের কমিয়া যায়—পক্ষান্তরে আমদানী অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় এবং ঐ সকল পরিত্যক্ত মুদ্রার রূপা ভারতবর্ষে আমদানী হইতে থাকে। তাহার ফলে ১৮৭১—১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত সোণার অনুপাতে রূপার মূল্য দ্রুত নামিতে থাকে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ও গবর্ণমেণ্টকে এজন্য বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই গবর্ণমেণ্ট রৌপ্যমুদ্রা বর্জ্জন করিয়া স্বর্ণমুদ্রাই মুখ্য মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু রৌপ্যের তথা টাকার মূল্য প্রতিদিনই দ্রুতগতি নামিতে থাকে এবং ১৮৯২ সালে টাকার মূল্য ১-৩ পেন্সে দাঁড়ায়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রূপার মূল্য কিরূপ নামিয়া গিয়াছিল :—

বৎসর	টাকার মূল্য
১৮৭১	২ শিলিং
১৮৯২	১ " ৩ পেন্স
১৮৯৩	১ " ২॥ "
১৮৯৫	১ " ২॥ "

রূপার ও টাকার মূল্যের এই পড়্তিতে ভারতের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের কোন ক্ষতি না হইলেও বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। কারণ এই সময়ে যে-সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী করিতেছিল তাহাদিগকে বিদেশী পণ্যের মূল্যস্বরূপ ঢের বেশী রৌপ্যমুদ্রা (টাকা) দিতে হইতেছিল এবং রপ্তানীতে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা কম পাউণ্ড পাইতেছিল এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকেও ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ (for Home Charges) পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইতেছিল। ফলে ১৮৭৫—১৮৯৮ সাল পর্য্যন্ত এই ২৩ বৎসরে ভারত গবর্ণমেণ্টকে ১৫৪ কোটি টাকা লোকসান দিতে হয়।

কিন্তু ১৮৯৫ সাল হইতে রূপার দাম আবার ধীরে ধীরে চড়িতে থাকে এবং ১৮৯৮ সালে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই সময়ে রৌপ্যমুদ্রা বর্জ্জন করিয়া স্বর্ণ-মুদ্রাকেই ভারতের মুখ্য মুদ্রারূপে গ্রহণ করিবার জন্য ভারতব্যাপী তুমুল আন্দোলন চলিতে থাকে —কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভারতের বহির্বাণিজ্যে এ অসুবিধা ও ক্ষতির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না—তাঁহারা এই সঙ্কট সম্পূর্ণই উপলব্ধি করিতে-ছিলেন এবং সেইজন্য ভারতে স্বর্ণমুদ্রা মুখ্যমুদ্রারূপে চলিতে পারে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য ফাউলার কমিটি নিয়োজিত হয় (১৮৯৮)। এই কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯০০ সাল হইতে টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স ধার্য্য হয়। অতঃ-পর সোণা বা রূপার আপেক্ষিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানী-কারীগণ ঐ হিসাবেই লেনদেন করিতে থাকেন। ইহাতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইতে থাকে, কারণ সোণা-রূপার বাজার-দরের সঙ্গে সঙ্গে আর প্রতিদিন ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকে উদ্ব্যস্ত হইতে হইত না।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিগত মহা-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নীতির অনুসরণ করায় ভারতের বহির্বাণিজ্য,আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও শিল্প ধীরে ধীরে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়ে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন দেশের সহিত ভার-তের যে কারবার চলে তাহাতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হয়। অর্থাৎ বৈদেশিকরাই প্রায় ভারতের কাছে ঋণী থাকেন। এই টাকার বদলে অন্যান্য দেশ হইতে ভারত সরকারের পক্ষে বিলাতি স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ক্রয় করায় এবং কতক ইংলণ্ডের ব্যয়-নির্ব্বাহক খরচের দরুণ পরিশোধ হইয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে ভারতে রৌপ্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। তাহা ছাড়া ইউরোপের সকল দেশেই মুদ্রা হিসাবে রূপার ব্যবহার ভয়ানক বাড়িয়া যায়; ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রৌপ্যের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং রৌপ্যের মূল্য চড়িতে থাকে। ১৯১৪ সাল হইতে ক্রমাগত চড়িতে চড়িতে ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি প্রতি আউন্স ৪৩ পেন্স। (২ শিলিং ৩ পেন্স), ও ১৮১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭৮ পেন্স পর্য্যন্ত ওঠে। ফলে টাকার মূল্য ২৬ পেন্স রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ টাকায় যে ১৬৫ গ্রেণ রূপা ছিল তাহার মূল্য ২০ পেন্স। এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে গবর্ণমেণ্ট তথা ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে দারুণ লোকসান দিতে হয়।

এই সমস্যার প্রতীকারকল্পে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সালে ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটি নিয়োগ করেন।

ভবিষ্যতে আরো কয়েক বৎসর রৌপ্যের মূল্য বাড়িবে এই বিশ্বাসে ঐ কমিটি টাকার দর ২ শিলিং (২৪ পেন্স) ও মোহরের দর ১০৲ টাকা স্থির করেন। কৃত্রিম উপায়ে টাকার দর (অবশ্য পাউণ্ড বা স্বর্ণের অনুপাতে) বাড়াইয়া দেওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের অনেক সুবিধা হইয়া গেল বটে কিন্তু ইহাতেও ভারতীয় শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে থাকিল এবং গবর্ণমেণ্টও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ফলে ঐ বৎসরেই (১৯২০) এই নীতি প্রত্যাহার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির রৌপ্যের দাম চড়িবে, ইহা অনুমান করা ভুল হইয়াছিল। কারণ যুদ্ধের ঠিক পরেই জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য সব কিছুই অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল। কাজেই রৌপ্যের দাম চড়িবে বা নামিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কমিটি যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে ১৯২১ সালে টাকার মূল্য না চড়িয়া পুনরায় ২ শিলিং এ নামিয়া আসে। কিন্তু ১৯২৩ সালে আবার ১—২½ পেঃ ও ২৪ সালে ১—৪ পেঃ-এ দাঁড়ায়। ১৯২৫ সালের মধ্যভাগ হইতে বাৎসরিক কাল টাকার মূল্য ১—৬ পেঃ-এর কাছাকাছি থাকে। এই সময়ে জগতের আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা পুনর্ব্বার প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিদর্শন এবং প্রয়োজন হইলে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় (১৯২৬)।

এই কমিশন ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা নানাদিক হইতে আলোচনা ও বিচার করিয়া টাকার মূল্য ১৮ পেন্স (১ শিঃ ৬ পেঃ) ধার্য্য করেন (১৯২৭)। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস ব্যবস্থাপক সভার এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং টাকার মূল্য ১৬ পেন্সই যে ভারতের পক্ষে হিতকারী একথাও বলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় ও অধিকাংশের মতে টাকার মূল্য ১৮ পেঃই ধার্য্য হয়

এই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত টাকার মূল্য ১ শিঃ ৫ পেঃ-এ কাছাকাছি রহিয়াছে এবং ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

বাঙ্গলায় পাট ও মালয় উপদ্বীপে রবার

(শ্রীঅযোধ্যানাথ দেব—মালয় উপদ্বীপ)

মিশরীরা তুলার চাষে অপর্য্যাপ্ত লাভ দেখিয়া অন্য ফসলের চাষ কমাইয়া যখন প্রায় ষোল-আনা জমীতেই তুলার চাষ করিতে প্রয়াসী হইল তখন মিশর সরকার ⅓ অংশ জমীর বেশীতে কেহ তুলার চাষ কবিতে পারিবে না'—এই ঘোষণা দ্বারা দেশের সকলকে ঐ কাষ করিতে বাধ্য করিলেন। ষোল আনা জমিতে তুলার চাষ করিলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব উপস্থিত হইয়া দেশে নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিবে ইহা ভাবিয়াই নিশ্চয় মিশর সরকার, মিশরীদিগকে, ঐরূপ ঘোষণা দ্বারা অন্যরূপ কাজ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন! সারা পৃথিবীর নিত্য-প্রয়োজনীয় পাট আমাদের একচেটীয়া সম্পত্তি এবং শিল্প। আমাদের ভাগ্যলিপি ও কর্ম্মধারা ভিন্নরূপ, নয়তো এতবড় একটা এক চেটিয়া পণ্যের মালিক হইয়াও আমরা আজ নিরন্ন, আর উপবাসে আমরাই মরিতেছি—এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যে কোন জিনিষেরই হউক, বাজারে 'চাহিদার' চাইতে 'আমদানী বেশী হইয়া পড়িলেই ঐ পণ্যদ্রব্য তখন দরে সস্তা হইয়া যায়, তবে সোণা, রূপা সম্বন্ধে অবশ্য অন্যকথা।

মালয় উপদ্বীপের প্রধান পণ্যদ্রব্য টিন ও রবার। কিন্তু কয়মাস যাবৎ টিন ও রবারের বাজার খুবই মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। 'খুব-মন্দা' হইলেও এই টিন ও রবারের বাজার যে কখনও বাংলা দেশের পাটের অনুরূপ হইবে না তাহা স্থির নিশ্চিত! কারণ, এই টিন্ ও রবারের মালিক যারা, তারা পণ্য উৎপন্ন ও বাজারে-কাটতির' কায়দা জানে, তারা 'চাহিদা' বুঝিয়া পণ্য উৎপন্ন করে, তাই তারা আমাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় না। তবু এবার টিন ও রবারের অবস্থা যেরূপ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে এরূপ নাকি কেহ কোন দিন দেখে নাই! তাহার ফলে, টিনের প্রায় খনিগুলিই এখন কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। রবার-বাগানেরও অনেক কোম্পানী সম্প্রতি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।* ইহার ফলে এই সব কোম্পানীর কেরাণী ইত্যাদি কর্ম্মচারিদের শতকরা এক পঞ্চমাংশ বা তদ্রূপ বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কাহারও বা একেবারেই চাকরী গিয়াছে।

ইহা শুধু এসিয়াবাসীদের জন্যই নহে, ইউরোপীয়দের জন্যও,—কাজেই এই দুই পণ্য দ্রব্যের অসচ্ছলতার দরুণ এখন এই দেশে ভীষণ বেকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সব রবার-বাগান ও টীনের খনির অনেক কুলীই ভারতবাসী; এখানে কাজ না থাকায় তাহাদের ফিরাইয়া দেশে পাঠান হইয়াছে, কাজেই এখানকার বেকার সমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশেও বেকার সমস্যা বাড়িয়া উঠিবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

যাক্ যা' বলিতেছিলাম, যখনি এসব পণ্যের

---

* সম্প্রতি বিলাতের সর্ব্বপ্রধান টীন ব্যবসায়ী ফেল পড়িয়া যাওয়ায় বহু ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান টলমল্ করিয়া উঠিয়াছে। সম্পাদক—

বাজার মন্দা হইয়া পড়ে তখনি 'প্লান্টার্স এসো সিয়েশন' সভা সমিতি করিয়া সকল কোম্পানী-গুলিকে একমত করিয়া কাজ আংশিক বন্ধ রাখিয়া বাজারের 'চাহিদা' তথা দর বাড়াইয়া তুলে। তবে ভিন্ন সরকার সকল সময়ে সকলের সঙ্গে একমত হয় না—এবারও মালয় দেশের রবারের এ দুর্দ্দশার দিনে যাভা ইত্যাদি স্থানে ওলন্দাজ সরকার Rubber Restrictionএ রাজী হয় নাই,—না হইলেও আমাদের মত এমন মাঠে-মারা আর কেউ যায় না!

পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই পাট উৎপন্ন হয়। অধুনা কোন কোন স্থানে নাকি পাট উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কাজেই পাট যখন আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি,তখন একটু অবহিত হইয়া চলিলেই আমরা যে রকম ইচ্ছা দরে পাট বিক্রী করিতে পারি। ১৩৩২ সনের মত পাটের এত বেশী দাম বোধ হয় গৃহস্থেরা জীবনে একবার মাত্র দেখিয়াছেন; কিন্তু সেই মোহে এবং সেইরূপ লাভের আশায় প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিলে যদি খরিদ্দারদের প্রয়োজন না থাকে তবে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে বৈ কি! খরিদ্দারদের কিনবার গরজ না থাকলে শুধু আমাদের গরজে ত আর চড়া দামে কিনিবে না? কাজেই তখন আমাদের অবস্থা হয়,—'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট'

পাট যারা কলে খাটায়, যারা পাটের পাকা মাল তৈরী করে তাঁদের 'চাহিদা' ও বাজারে 'আমদানী' অনুসারেই তারা দর দিবে। তাহারা সস্তায় মাল পাইলে বেশী দর কেন দিবে?—কাজেই পাট শিল্পের দ্বারা আমাদের লাভবান হইতে হইলে প্রথম আমাদের পাটের পাকা মাল তৈরী করিয়া বিক্রী করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয়, যা কাচা মাল হারে বিক্রী হইবে, আনুমানিক বাজেট করিয়া অর্থাৎ 'চাহিদা' অনুপাতে উৎপন্ন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজনানুসারে পাট উৎপাদনের Restriction করিতে হইবে। তবে কেহ হয়ত বলিবেন, আমরা স্বাধীন দেশের লোক হইলে নিজেদের খুসীমত আইন কানুন করিয়া তাহা বন্ধ করিতে বা বাড়াইতে পারিতাম। ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য সন্দেহ নাই, স্বাধীন দেশে যে-কাজ অতি সহজ, পরাধীন দেশে সে-কাজ অতি কষ্টসাপেক্ষ। তবু নিঃসঙ্কোচে এই কথা বলা চলে যে, যখন সকলের মত নিয়াই আইন প্রণয়ন করিতে হয়, তখন সকলের মত হইলেই ত হইল, আর আইন প্রণয়নের কি দরকার? যখন সকলেই বুঝিলাম যে এই নির্দ্দেশ মত পাট উৎপন্ন করিতে হইবে, তখন সকলের এই যে 'বুঝাটুকু' অর্থাৎ 'সহযোগিতাটুকু' ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় কি?

শুনিয়াছি অনেকে বলিয়া থাকেন 'পাটের মত নগদ ঝকঝকে টাকা এমন আর কিছুতে আনে না। কথাটি আংশিক সত্য হইলেও এই পাটই যে আমাদের নিরন্ন করিয়াছে তাহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। পাট গোলাজাত করিয়া রাখা আমাদের মত দরিদ্র গৃহস্থগণের পোষায় না, রাখিলে চলে না, এবং পাট খাওয়াও চলে না; কিন্তু ধান খাওয়া চলে, বিক্রী করা চলে, বিক্রী না হইলে গোলাজাত করিয়া রাখা চলে। পাটের নগদ টাকা আনা সম্পর্কে আমি একটি মাত্র কথা বলিতে চাই—বাংলা দেশে পর্য্যাপ্ত পাট হয় কিন্তু ব্রহ্মদেশে সামান্য পাটও হয় না; আমরা ত বছর বছর পাটের ঝকঝকে নগদ টাকা পাই,

কিন্তু গত কয় বৎসর যাবৎ আমাদের "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" অর্থাৎ রেঙ্গুনের আতপ ব্যতীত গতি নাই কেন? এই ত ধরুন ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করার প্রস্তাব চলিয়াছে, যদি সত্যিই তাহা হয় আর সরকার "রেঙ্গুনের আতপ" ভারতবর্ষে চালান বন্ধ করিয়া দেন বা যথেচ্ছ মূল্যে বিক্রী করেন, তখন আজকের মত আমাদের এমন অন্নাভাবের দিনে কাহার কৃপাপ্রার্থী হইব?—তাই দেশের সুধীগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, সময় থাকিতে নিরন্ন বাংলার দরিদ্র গৃহস্থগণকে বাঁচাইবার পন্থা খুঁজিয়া শীঘ্র বাহির করুন।—এই ত ১৩৩৮ সনের পাটের দর সকলের চোখের উপর দেখিলেন। দরিদ্র গৃহস্থগণ কোন কোন জায়গার জমিদার হইতে 'কৃষিঋণ' গ্রহণ করিয়া প্রাণপাত করিয়া এই ফসল উৎপন্ন করিলেন, আর আজ পাটের এই অবস্থা! জমীদারের উক্ত কৃষিঋণ ত এমতাবস্থায় আদায় হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু জমীদারকে দেয় খাজনাও বোধ হয় অনেকে দিতে পারিবেন না এবং ইহারই ফলে কত দরিদ্র প্রজার সম্পত্তিও নিলাম হইয়া যাইবে, তখন আমরা পথের ভিখারী—ইহার চেয়ে দুর্দ্দাশা সংসারে আর কি হইতে পারে?

গৃহস্থী করা ও একটি ব্যবসায় করা একই কথা, দু'টাতেই দরকার হয় 'বিজ্ঞতা' ও 'মূলধন'। বাংলার গৃহস্থ আমরা আজন্ম চাষী, কাজেই চাষবাসের বিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কম বেশী আছে; মূলধনও যে যৎকিঞ্চিৎ না ছিল তাহা নহে। কিন্তু আজ সব শেষ হইয়াছে! গৃহস্থের নিজের হাতের টাকায় যখন আর মূলধন কুলাইল না, তখন মহাজনের শরণাপন্ন হইলেন, কাজেই 'কালনেমীর লঙ্কা ভাগের' মতন পাটের আয়ের একাংশ গিয়া রহিল মহাজনের ঘরে। তারপর মহাজনের কাছে যখন অতি উচ্চ সুদেও টাকা ধার পাওয়া যায় না, তখন সহৃদয় জমীদার প্রজাদের প্রতি কৃপা-পরবশে, 'কৃষিঋণ' দিলেন। ফসল হইলে, উপযুক্ত মূল্য পাইলে জমীদারের সেই ঋণ আদায় হইল; অন্যথা সেইদায়ে জমীদারের জমীই বুঝি জমীদারকে ফিরাইয়া দিতে হয়! তার পরের কথা ভাবিতে গেলে আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠে—কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অনেক জায়গার অবস্থা প্রায় তা'র কাছাকাছি! আমার ভয় হয়, যখন মূলধনের অভাবে আমরা এই শতকরা ৭০।৮০ জন চাষী আর গৃহস্থী করিতে পারিব না, তখন এইসব গৃহস্থী ব্যাপার যাইয়া পড়িবে জমীদারদের হাতে, জমীদারও যদি কোনদিন দরিদ্র গৃহস্থের মত অসহায় হইয়া পড়ে তখন এই সব সরকারের 'লিমিটেড কোম্পানী' রূপে পরিণত হইবে, আর আমরা তাহাতে দিন-মজুর হইয়া খাটিব,—এই আজ যেমন হাজার হাজার কুলী, চা-বাগান, কফি-বাগান, রবার-বাগান, টীন ও কয়লার খনিতে খাটিতেছে।

আমার মনে হয়, 'এসোসিয়েশান্' বা 'সোসাইটী' ইত্যাদি গঠন করিয়া যদি অন্য নানা প্রকার কাজ করা সম্ভব হয় তবে 'প্লান্টার্স এসোসিয়েশান" বা তদ্রূপ একটা কিছু গঠন করিয়া বাংলা দেশের পাট Restriction করা যাইতে পারে বা 'যৌথ-কারবার' করিয়া আমরা অন্ততঃ মরণের হাত হইতে বাঁচিতে পারি।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৯ | ৩য় সংখ্যা

সাবান প্রস্তুতের নানারূপ উপাদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাবানের জল কাটান (Salting out)

Saponification ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া গেলে বলা বাহুল্য তখনও সমস্ত জিনিষটাই তরল থাকে। লবণ সংযোগে সাবানকে গ্লিসারীণ থেকে স্বতন্ত্র করিতে হয়। সাবানের মিশ্রনটী (Solution) যখন বেশ ঘন হয়ে আসবে এবং কার্ণিকে করিয়া তুলিলে মিশ্রণের ঘনত্ব বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তখন থেকেই লবণ যোগ করা দরকার। এই পদ্ধতিকে Salting process বলে।

সাধারণ কাপড় কাচা সাবান প্রস্তুতে জল কাটান প্রভৃতি দরকার হয় না। এর পরই শিলিকেট মিশাইতে হয়। উত্তম কাপড় কাচা সাবান এবং গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতে জল কাটান প্রভৃতি করা হয়।

সকল প্রকারের তৈল ও চর্ব্বি থেকে উৎপন্ন সাবানে সম পরিমাণ লবণ লাগে না। কাজেই কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে খুব অল্প মাত্রায় লবণ যোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সাবান স্বতন্ত্রীকৃত হইবে সে-পর্য্যন্ত লবণ যোগ করা চাই। সাবান স্বতন্ত্র হ'য়ে উপরে ভেসে উঠে, কাজেই ভাসমান সাবানের চেহারা দেখেই সাবান স্বতন্ত্রীকৃত হয়েছে কিনা জানা যায়। কোন মতেই মাত্রাতিরিক্ত লবণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। কেননা, তা হলে সাবানে দানা বেঁধে যাবার সম্ভাবনা, এবং দানা বাঁধা সাবানের

মধ্যে চুণ থাকিয়া যাইতে পারে। লবণ প্রয়োগ করিবার সময় উনানের জ্বাল খুব কমাইয়া দিতে হয়। বাজার থেকে কেনা দানাযুক্ত লবণ (Common Salt) ব্যবহার করা উচিত। লবণ প্রয়োগ করিবার সময় কড়ার পদার্থটীকে মৃদু জ্বালে ফুটাইয়া নিতে হইবে। এক দফা লবণ প্রয়োগ করিবার পর সেই লবণ সংযোগের ফলাফল না দেখিয়া তার পরের দফা লবণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। লবণ প্রয়োগ করিলে কড়ার পরিস্কার মিশ্রনটী অপরিস্কার ও ফেণাযুক্ত হইয়া উঠিবে। যখন ঐ ফেণময় সাবান গ্লিসারীণ থেকে স্বতন্ত্র হইয়া চাপ চাপ হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তখন বুঝিতে হইবে লবণের মাত্রা ঠিক হইয়াছে এবং আর লবণ যোগ করিবার দরকার নাই। এমন কি, এই অবস্থা ঘটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই লবণ প্রয়োগ করা বন্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়। বলা বাহুল্য, এ-যাবৎ সমস্তক্ষণই কড়াটী আগুণের উপর বসান ছিল, এখনও তাকে নামাইলে চলিবে না। যে পর্য্যন্ত না সমস্ত সাবান ফেনা বর্জ্জিত হইয়া উপরে জমাট বেঁধে ভাসিয়া উঠে এবং সমস্ত ক্ষার জল নীচে পড়ে যায়, সে পর্য্যন্ত মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হবে। এই সময় নীচের লাই (Lye) বেশ স্বচ্ছ আকার ধারণ করিবে এবং সাবানের মধ্যে ফেনা বা বুদ্ বুদ্ থাকিবে না। যাহা হউক, এইরূপে Salting বা লবণ প্রয়োগ যখন সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যাইবে, তখন কড়াটিকে আগুণ থেকে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাসমান সাবানের চাপগুলি জমাট বেঁধে শক্ত হইয়া উঠিবে। তখন ঐ জমাটবাঁধা শক্ত সাবান কড়া থেকে তুলিয়া নিবে। যদি কলে ও সাবান সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক হইয়া থাকে, তবে ঐ অবস্থায় কড়াইতে দুইটী স্তর হইবে। একটী উপরে সাবানের স্তর, অপরটী সাবানের নিম্নের লালাউ - কলের স্তর।

উপযুক্ত সিদ্ধ ও পরিস্কৃত করণ Boiling (Proper & Purification) সাবান পৃথক করা হইলে উহাতে পুনরায় অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া ফুটাইতে হয়। দরকার হইলে দ্বিতীয় বার লবণ সংযোগে সাবান পরিস্কৃত করিতে হইবে। উপরের সাবান পৃথক করিয়া পুনরায় অল্প পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া পাকাইতে হইবে।

সাবান পরিস্কার, তাম্র বর্ণ, তরল মধুর ন্যায় আকার ধারণ করিলে মন্দ মন্দ জ্বাল দিয়া ঐ সাবান ধীরে ধীরে গাঢ় করিতে হয়। কোন বিশেষ বর্ণের সাবান করিতে হইলে এই সময় সাবানে ঐ বর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়।

শিলিকেট মিশান।

এখন অপর কড়াইতে শিলিকেট মৃদু জ্বালে জল মিশাইবে। সমস্ত সাবান দেওয়া হইলে কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা সমস্ত জিনিষ উত্তম রূপে ঘাটিয়া শিলিকেট মিশাইবে, যখন দেখা যাইবে সাবানের বুদবুদের ভিতর হইতে কেবল বাষ্প নির্গত হইতেছে তখন আগুণ নিভাইয়া দিবে।

তৎপর কাঠের বৈঠা বা শলাকা দ্বারা খুব ঘাটিয়া সাবানকে খুব মিহি বা নির্ম্মল করিয়া লইয়া গরম অবস্থাতেই তাড়াতাড়ি হাতা দ্বারা মাটীর পেয়ালা বা মুচীতে উঠাইতে হয়। পেয়ালা ভরিতে ভরিতে অবশেষে কিছু সাবান ঠাণ্ডা হইয়া পেয়ালায় ভরিবার অযোগ্য হইয়া উঠে। তখন পেয়ালা ভরা ক্ষান্ত করিতে হয়। এই অবশিষ্ট

সাবান যাহা থাকে তাহা পুনরায় সাবান জাল বসাইবার সময় উহাতে দিতে হয়।

ঠাণ্ডা সাবান (Cold process)

যে যে তৈল যে যে পরিমাণে ব্যবহৃত হইবে, তাহা মাপিয়া কড়ায় ঢালিতে হইবে। উহা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া তরল করিতে হইবে। বেশী গরম করিবে না তাহাতে সাবান খারাপ হইবে। আঙ্গুলে ঈষৎ গরম লাগে মত এরূপ গরম হওয়া দরকার।

ব্যোমী দাগের ৩৬ ডিগ্রীর বা টোয়াডেলের ৬৮ ডিগ্রীর সোডালাই ধীরে ধীরে তৈলের সহিত মিশাইতে হইবে॥ মিশাবার কালীন সর্ব্বদা কাঠি দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে। সমস্ত লাই মিশ্রিত হইলে আর আলোড়ন করিবে না। তৈল ও লাই মিশিয়া মধুর ন্যায় তরল আকার হইবে।

পরে শিলিকেট মিশাইতে হইবে। শিলিকেট মিশ্রিত হইলে ছাঁচে ঢালিয়া রাখিবে। যদি কোন রং মিশাইতে হয় তবে শিলিকেট মিশাই-বার সময়ে মিলাইতে হইবে।

নারিকেল ও মহুয়া তৈল দ্বারাই ঠাণ্ডা সাবান তৈরী হয়। বাদাম তৈল ইত্যাদি নিতে হইলে উহার সামান্য নারিকেল বা মহুয়া তৈল সহিত মিশান যাইতে পারে।

ঠাণ্ডা সাবানে লাই ঠাণ্ডা বা ঈষৎ শিলিকেট মিশাইবার সময়ে সাবান কিঞ্চিৎ পাতলা হয়; কিন্তু অল্প সময় মধ্যেই উপযুক্ত রূপ শক্ত হইবে।

ঠাণ্ডা সাবানে সব জিনিষ মিশ্রিত হইলে ঠাণ্ডা জায়গায় ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। ২।১ দিনে সাবান তৈয়ার হইবে।

Soapstone, Chinaclay ইত্যাদি মিশাইতে হইলে শিলিকেট মিশাইবার কালীন মিশাইবে।

Semiboiling Process

পরিমাণ মত জল ও কষ্টিক সোডা সাবান জালের লোহার কড়াইতে নিবে। এখন মৃদু জালে কষ্টিক সোডা জলে গলাইতে হইবে। কষ্টিক গলিয়া গেলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তৈল এক-বারে উহার সহিত মিশাইবে, এবং খুব কড়া জালে পাকাইতে থাকিবে। পাকাইবার সময়ে কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা প্রথম অবস্থায় আলোড়ন করিতে হইবে। যখন উহা পাকিয়া ময়দার আটার ন্যায় হইবে তখন আগুন নিভাইয়া দিবে।

একটী কড়াইতে জল মিশ্রিত শিলিকেট প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সাবান যোগ করিবে। এই সময়ে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া মিশাইতে হইবে এবং মৃদু জালে পাকাইবে। যখন বেশ ঘন হইবে তখন ছাঁচে ঢালিবে। রং বা Soap-stone প্রভৃতি মিশাইতে হইলে শিলিকেট মিশ্রিত কালীন মিশাইবে।

জাল দিবার সময়ে সমস্ত জিনিসগুলি ফুলিয়া উঠে এবং কড়াইর উপর দিয়া পড়িয়া যাইতে পারে। তখন বড় হাতা দ্বারা আলোড়ন করিয়া দিতে হয়, অথবা সামান্য জল ছিটাইয়া দিতে হয়।

সাবান প্রস্তুত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে তরল সাবান দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও ঈষৎ বাদামী বর্ণের হয়। সাবান তৈয়ারী হইলে ইচ্ছা-মত ডেলা বাঁধা বা অন্য যে কোন রকমের ছাঁচে ঢালা যাইতে পারে।

সাবান তপ্ত ও নরম অবস্থায় সুচী বা মাটীর ছাঁচে ফেলিলেই গোলা সাবান প্রস্তুত হয়। "বার" সাবান প্রস্তুত করিতে সাবান তপ্ত ও নরম অবস্থায় কাঠের বা লোহার ফ্রেম (বাক্সের ন্যায়) মধ্যে

ঢালিয়া দিতে হয়। সাবান জমিয়া কঠিন হইলে ফ্রেমের চারি পার্শ্ব খুলিতে হয়। এইরূপে এক-খণ্ড বৃহৎ জমাট সাবান পাওয়া যায়। অতঃপর তারের দ্বারা ঐ বৃহৎ খণ্ডটীকে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীর্ঘকায় টুকরা করা হয়। এই টুকরাকে "বার" বলে।

এই বারগুলি শুষ্ক হইলে কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিতে হয় এবং ঐ টুকরাগুলি বাতাস কিছু শুষ্ক হইবার পর ছাপা কলে ছাপ দিয়া নিতে হয়।

ঢাকাই ও ধোবী সাবান প্রস্তুতে ছাঁচা মুচির সাবান যখন ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যায় তখন মুচী হইতে সাবান তুলিয়া লইয়া করমুল দ্বারা পিটাইয়া ঘসিয়া মসৃণ করিতে হয়।

সাবান পিটান হইয়া গেলে বাহিরে খোলা বাতাসে ফেলিয়া না রাখিয়া প্রয়োজন মত কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

ছাঁচা বা মুচীতে সাবান ভরিবার পূর্ব্বেই মুচী-গুলিতে সোপষ্টোন পাউডার মাখিয়া রাখিতে হয়। নচেৎ সাবান মুচীতে লাগিয়া যায় এবং খুলিতে অসুবিধা হয়।

গোলা সাবান, ডেলা সাবান প্রভৃতি তিন প্রণালীতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বার সোপ, বাক্স সাবান, প্রভৃতি সাধারণতঃ পাকান সাবান ও ঠাণ্ডা সাবানের উভয় প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়।

ঢাকাই সাবান ও ধোবী সাবান সাধারণতঃ Semi-boiling প্রণালীতে প্রস্তুত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলা এবং উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অন্য উপায়ে কাজ করিলেও জলবায়ুর দৌরাত্ম্য থাকিবে—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, কেবল মাত্র সূর্য্যের উত্তাপ নিমক প্রস্তুত করার ব্যাপারে নহে, অন্য রকমে কাজ আরম্ভ করিলেও অনেক বিঘ্ন ঠেলিয়া রাস্তা করিয়া লইতে হইবে। ভূগর্ভে যে লবণের পাহাড় আছে, তাহা অবশ্য আমাদের বিবেচনায় আসে না; কিন্তু অন্যান্য স্থল হইতে লবণ আহরণ করিতে হইলেই সমুদ্র, লোণা হ্রদ এবং ফোয়ারার জল নিমক প্রস্তুতের উপযোগী মত ঘন করিয়া তুলিতে হইবে। যদি সস্তায় দিতে হয় এবং প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে সূর্য্যের তাপের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের মত লোণা মাটী জলে গুলিয়া তাহা হইতে লবণ প্রস্তুত করিতে গেলেও সূর্য্যোত্তাপের উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

উড়িষ্যায় কারখানা খোলার সম্ভাবনা—দক্ষিণ উড়িষ্যায় নিমক কেন্দ্র খোলার একটু আশা আছে বলিয়া মনে হয়। চিল্কা হ্রদের কাছে পূর্ব্বে সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং এখনো উহার দক্ষিণস্থ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত হুমা ফ্যাক্টরীতে ঐরূপে লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরে আলোচনা করিব, এখন সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, উক্ত অঞ্চলে বৎসরে এক হইতে দশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে।

স্থানীয় বাজারের জন্য প্রস্তুতের সম্ভাবনা—বাংলার তীব সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহাতে অনেকে দুঃখিত হইবেন জানি, কেননা,তাঁহাদের অনেকেই বাংলায় এবং উড়িষ্যায় আবার লবণের কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। আমি সেইজন্য ভাবিয়া দেখিয়াছি অন্য কোন উপায়ে এস্থলে লবণ প্রস্তুত করা সম্ভবপর কিনা! লবণাক্ত জলের শক্তি কম থাকায় এবং ঝড়বৃষ্টির উৎপাতের জন্য যদিও খুব বেশী পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে না, তথাপি তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, এসব জায়গায় যে-কোন প্রথা অনুসরণ করা যাউক না কেন, তাহাতে ব্যর্থ মনোরথ হইতে হইবে। বাংলা এবং উড়িষ্যার বাজারগুলি লবণ তৈয়ারী করিবার কেন্দ্র সমূহের কাছেই এবং ইহা একটী আশার কথা বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, চিল্কাহ্রদতটবর্ত্তী পুরীতে পূর্ব্বে সূর্য্যোত্তাপে কিছু কিছু লবণ প্রস্তুত হইলেও শীতকালের বৃষ্টি এবং বায়ুমণ্ডলের শৈত্য উহার প্রধান অন্তরায়। নৌপদে আজকাল বেশ নিমক তৈয়ার হইতেছে; কিন্তু ডিসেম্বর

হইতে মে-মাস পর্য্যন্ত সেখানে বৃষ্টিপাতের বহর ৫" ইঞ্চির বেশী নয়। উত্তর মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরীগুলির ব্যবহৃত লোণা জল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত যে-অবস্থায় থাকে—তাহার সহিত পশ্চিম তীরস্থ কেন্দ্রগুলির তুলনা করাও উচিত হইবে না। যে-প্রমাণ সমূহ এখন আমাদের হাতে আছে তাহাতে বোধ হয় বাংলা এবং বালেশ্বরে লবণের কেন্দ্র খোলা বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না এবং এতৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমি শুধু পথ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। যদি এই ব্যবসায়ে ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বাজার কাছে থাকার জন্য স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার কিছু উপায় হইতে পারে।

অতীতের চেষ্টা-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাংলা এবং উড়িষ্যা তীরে কোন কেন্দ্র খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল কিনা তাহা দেখিতে গিয়া শুধু একটী মাত্র দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাইলাম। তাহাও প্রাথমিক তদন্তের অবস্থা পার হইতে পারে নাই। ১৯১৯ সনে একটী ইউরোপীয় ফার্ম্ম কাঁথিতে লবণ তৈয়ারীর আড্ডা বসাইয়াছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমানে উহার ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই চোখে পড়ে না। যাহারা পূর্ব্বে ঐ কোম্পানীতে কাজ করিতেন এমন লোকের

কাছে এবং স্থানীয় লোকজন জমীদার—যিনি উক্ত ফার্ম্মের কাছ হইতে কণ্ট্রাক্ট পাইয়াছিলেন—আমি উক্ত ইউরোপীয় ফার্ম্ম সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। যতদূর আমি শুনিতে পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হইল যে সূর্য্যোত্তাপে লবণ প্রস্তুত করিয়া কতকটা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইত। বিগত মহাযুদ্ধের শেষ পর্ব্বের দিক দিয়া যখন লবণের দাম খুব চড়িয়া গেল, তখনই এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা; কিন্তু উক্ত ফার্ম্মের প্রতিষ্ঠাতৃগণ এডেনের আমদানী লবণের সঙ্গে টেক্কা দিতে না পারিয়া (কেননা, জাহাজের ভাড়া যুদ্ধের পরে খুব কম হইয়া গেল) ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। লবণ প্রস্তুত কার্য্য কেবল মাত্র ১৫ দিন চলিয়াছিল; কিন্তু লবণ একেবারে সরেস প্রথমশ্রেণীর হইয়াছিল। কিন্তু যাতায়াতের এবং কয়লা খরচ বেশী হওয়ার দরুণ তাহাদের কাজ আর বেশীদিন চলাচল সম্ভবপর হয় নাই। আর একটা বিপদ ছিল, কাঁকড়ার; কাকড়ার দল ঝাঁক বাঁধিয়া কখন যে জাল দিবার পাত্রের নীচে সুযোগ বুঝিয়া গর্ত্ত করিয়া যাইত তাহা আর ঠিক পাওয়া যাইত না। মান্দ্রাজ উপকূলেও ইহার অসদ্ভাব নাই। বাংলার বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য দুইটী কোম্পানী একত্র হইয়া চিল্কাহ্রদের পার্শ্বে কাজ চালানো যাইতে পারে কিনা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। রপ্তানীর অসুবিধার জন্য উক্ত প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল—আর ফলপ্রসূ হয় নাই।

বালেশ্বর জেলার কয়েকজন লোক ১৯২১ সনের শেষ দিক দিয়া চুয়ানী জালা (Straw-filter) এবং জল গরম করিয়া লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দেখা গেল, এরূপে নিমক প্রস্তুত করিলে দাম এত বেশী পড়িয়া যাইবে যে, স্থানীয় বাজারে মোটেই প্রতিযোগিতা করা সম্ভবপর হইবে না। উত্তর-পশ্চিম তীরে আজকাল লবণ প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমার আর জানা নাই।

সাক্ষ্যগুলির প্রমাণ কতদূর—

কাজ চলিবার রেকর্ড কোথাও পাই নাই; কাজেই আমাদের অনুসন্ধানে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছে। সৈকত পল্লীতে যখনই অনুসন্ধানে গিয়াছি, তথাকার লোকেরা মনে করিয়াছে আমরা অনেক জ্বালানি কাষ্ঠ ক্রয় করিব কিংবা বহুতর নৌকা ভাড়া করিব অথবা এমন কোন কাজ করিব যাহাতে তাহাদের স্বার্থের হানি হইতে পারে। তাহাদের উত্তরে অনেক অসঙ্গতিও লক্ষ্য করিয়াছি। পরে যে সমস্ত অঙ্ক খাড়া করিয়াছি তাহা এই সমস্ত কারণের জন্য সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। কোন কাজে সত্য সত্যই হাত দিবার পূর্ব্বে উক্ত অঙ্কগুলির বিশুদ্ধিতার দিকে নজর না দিলে চলিবেনা।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সঙ্ঘ

সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবেদন

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এই দেশের লোকের গড়পড়তা দৈনিক আয় দুই আনা ছয় পাই মাত্র। কিন্তু জার্ম্মেণী, ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে লোকের গড়পড়তা দৈনিক আয় যথাক্রমে দুই টাকা এক আনা চার পাই ও তিন টাকা। আমাদের দেশের এই শোচনীয় দারিদ্র্য হইতেছে আমাদের নানাবিধ দুর্দ্দশার মূল কারণ এবং যথাসম্ভব সত্বর ইহার প্রতিকার করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা যথাসম্ভব সত্বর বৃদ্ধি না করা পর্য্যন্ত উৎপন্ন ধনের সমস্ত যতই ন্যায়সঙ্গত এবং সমানভাবে বণ্টন করা হউক না কেন, তাহা অবস্থার অধিকতর উন্নতিসাধনের পক্ষে ফলপ্রদ হইবে না। বর্ত্তমানে এই দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং শুদ্ধমাত্র কৃষির উন্নতিসাধন করিলেই চলিবে না; পরন্তু তৎসহ কারখানাজাত শিল্প ও সমপ্রকৃতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের (যথা ব্যাঙ্কিং ও ইন্সিওরেন্স) প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষকেরা যথেষ্ট জমি পায় না। অধিকন্তু কুটির শিল্প ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় তাহারা বৎসরের অধিকাংশ সময় অলসভাবে বসিয়া থাকিতে এবং স্বল্প পরিসর ভূমিকর্ষণজাত সামান্য আয় হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর বেকার লোকদের অবস্থা আরও খারাপ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং যে-সব শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশে বর্ত্তমান আছে, শুদ্ধমাত্র সেগুলিকে সাহায্য প্রদান করিলেই চলিবে না। পরন্তু আমাদিগকে লুপ্ত শ্রমশিল্পের পুনরুদ্ধার ও নব নব শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

একটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপন্ন দ্রব্যাদি (এমন কি যদি প্রয়োজন হয় তবে একটু অধিক মূল্য দিয়াও) ক্রয় করিয়া দেশের বর্ত্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করিতে পারি; কিন্তু গোড়াতে একটা অসুবিধা উপস্থিত হয়। অনেক সময় এরূপ হয় যে, যেসব স্বদেশী দ্রব্য পাওয়া যায়, কোন কোন ক্রেতা হয়ত তাহা পাইবার অসুবিধায় ক্রয় করিতে পারেন না। ক্রেতা হয়ত উক্ত স্বদেশী দ্রব্য আদৌ পাওয়া যায় কিনা কিংবা ঐগুলি কোথায় পাওয়া যায় তাহা জানেন না। এরূপ ক্রেতাদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য এবং তদ্দারা স্বদেশী শ্রমশিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য এই সঙ্ঘ (বাই ইণ্ডিয়ান লীগ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই আশা করা যায়, এই সঙ্ঘ স্বদেশী দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক ও ক্রেতাদিগের মধ্যে মিলন ঘটাইতে পারিবে। কোন বিশেষ দ্রব্য কোথায় প্রস্তুত হয় অথবা কোথায় পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে এবং দিতে এই

সঙ্ঘ চেষ্টা করিবে। স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালকবর্গকে, তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া এই সঙ্ঘের সহিত সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত এই সঙ্ঘ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

আজ ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই জাতীয়তা বোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে। এহেন সময়ে ভারতীয় ও "স্বদেশী" হিসাবে স্বদেশী আন্দোলনের জন্মভূমি বাঙ্গলা কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? শ্রদ্ধেয় নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পরিচালনায় প্রবর্ত্তিত 'মেলা' আন্দোলন সেই সময়কার যুবকদিগের চিত্তে যে কিরূপ ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদের প্রবর্ত্তিত আন্দোলন স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কিরূপ অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছিল, সেই যুগের সুখ স্মৃতি আজও আমার মনে জাগরূক আছে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলনের যুগে দেশবাসীকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণের অনুরোধ জানাইয়া পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মর্ম্মস্পর্শী ও ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার কাণে বাজিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর দৃপ্ত আহ্বানে খদ্দর আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে ও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে অধুনা ইহা লক্ষ্য করিয়া আমি অত্যধিক মাত্রায় আনন্দলাভ করিয়াছি। এই আন্দোলনের প্লাবনে সমস্ত বাঙ্গলা দেশ প্লাবিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশের লোক কিরূপ দৃঢ়চিত্ত তাহা যে কেহ বুঝিতে পারিবে। এই সব শক্তিশালী আন্দোলনের কয়েকটীতে আমি আমার যথাসাধ্য কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং আমার যৌবনের সুখ স্বপ্ন আমার জীবন সায়াহ্নে সফল হইতে চলিল দেখিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাঙ্গলাদেশের চিন্তাধারার সহিত আমি সুপরিচিত এবং এই সার্থক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য বাঙ্গলার পুত্রকন্যাগণ কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও আমি জানি।
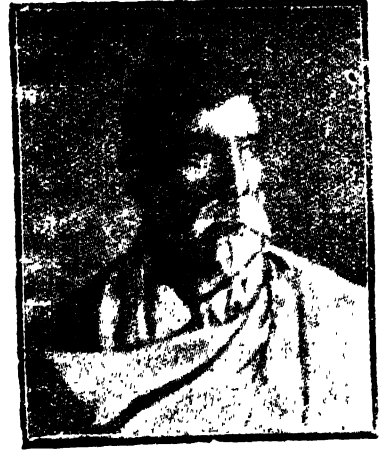
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

এই সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আমি যুবক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে এই আন্দোলনের প্রসারকল্পে এই সঙ্ঘে যোগদান ও আমাদের সহিত সহযোগিতা করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। ভগবান স্বাবলম্বী লোকদের সহায়—ইহা স্মরণ রাখিবেন।

ব্যবসার মূলসূত্র

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—লাভপুর

বেকার সমস্যা সমাজে যতই প্রবল হইয়া উঠিতেছে সংসারের চাপে ততই লোকে চাকরী ছাড়া অন্যভাবে অন্নের চেষ্টা করিতেছে। মনীষীগণের লেখালেখি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে দেশের যুবকগণ এখন চাকরীর মোহ ত্যাগ করিয়া ব্যবসার দিকে ঝোঁক দিতেছে। ব্রাহ্মণ না ভদ্রলোক আর তার আভিজাত্যের বড়াই লইয়া অনাহারে মরিতে প্রস্তুত নহে—ব্রাহ্মণের জুতার দোকান বা ভদ্রলোকের খবরের কাগজ কিংবা কেরোসিন তেল বিক্রী আজ সমাজের চোখে পীড়া জন্মায় না। বহু ভদ্রসন্তান ধার করিয়া বা সম্পত্তি বেচিয়াও দোকান করিয়াছে; কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকের কপালেই ব্যবসাতেও লক্ষ্মী লাভ হইতেছে না। শুধু কিছু মূলধন লইয়া দোকান ফাঁদিলেই যে দোকান খরিদ্দারে ভরিয়া উঠিবে না এই সত্যটুকু অনেকেরই জানা নাই; তাই এত করিয়াও অন্নাভাব ঘুচে না। দোকানে বিক্রী নাই বলিয়া হতাশায় রাজপথে করুণ নেত্রে চাহিলেও সে নেত্র খরিদ্দারদের মনে দয়ার সঞ্চার করিয়া দোকানের বিক্রী বাড়াইবে না। খরিদ্দার আকর্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া দোকান সাজাইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগ গত পঞ্চাশ বৎসর অপেক্ষা বহু আগাইয়া গিয়াছে; যান বাহন, জীবনযাত্রা প্রণালী, চিন্তাধারা সবই বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে—সে ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের দোকান যদি পঞ্চাশ বছরের পূর্ব্বের বেণের দোকানের অনুকরণে একটা ঘরে মাল ঠাসিয়া সাজান যায় তাহা হইলে কি সে দোকান বর্ত্তমান যুগের ক্রেতা আকর্ষণ করিবে? দোকানে কি ভাবে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ান যায় মোটামুটী তাহার আলোচনা করা যাক্। এ বিষয়ে বলিবার এত জিনিস আছে যে তাহা দুই পাঁচটী প্রবন্ধে বলা চলে না বড় বড় বই লিখিতে হয়।

ক্রেতাই দোকানের সম্পত্তি ও বিজ্ঞাপন, ব্যবসাদারকে এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ক্রেতাকে সকল জিনিষ সরবরাহ করা ও খুসী রাখাই বিক্রেতার কাজ; কি ভাবে ক্রেতা জোগাড় করিতে হয়, কি ভাবে তাহার মন জোগাইতে হয়, কি ভাবে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে হয়, সে বিষয়ে পৃথকভাবে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; এখন সংক্ষেপে কি ভাবে দোকানের বিক্রী বাড়ান চলে তাহারই আলোচনা করা যাক্।

১। জিনিষ গুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে তাহার প্রত্যেকটী ক্রেতার চোখে পড়ে। একটী জিনিষ কিনিতে আসিয়া লোভে পড়িয়া ক্রেতা যেন আরো পাঁচটী জিনিষ কেনে। Display বা সাজাবার কায়দা দোকানের একটী বড় জিনিষ। এ বিষয়ে কোল্‌কাতার সাহেবদের দোকান থেকে আমাদের শিখিবার আছে।

২। জিনিষগুলি দেখে পুরান বা দাগী যেন

মনে না হয়—সেটা দোকানের পক্ষে একটা নিন্দার জিনিষ। "যত পচা জিনিষের আড্ডা" লোকের মনে এই ধারণা হলে সে-দোকানে বিক্রীর আশা দুরাশা। প্রত্যেকটী জিনিষই বেশ ঝকঝকে ও চোস্ত থাকা চাই।

৩। "বেশী খরিদ্দার, কিন্তু অল্প লাভ" ব্যবসার মূলমন্ত্র করা উচিৎ। প্রথমেই অত্যধিক লাভের দিকে নজর দিলে পরিণামে ক্ষতি হবেই। 'ও দোকানেও গলাকাটা দাম'—এই বদনাম রটলে বেশী লাভ করিতে গিয়া মাল ভরিয়া রাখিয়া পচাতে হইবে। কম লাভ নিলে ক্রেতা বাড়বেই।

৪। ধৈর্য্য ও সাধুতার সঙ্গে প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হওয়া উচিৎ।

৫। প্রখর স্মরণ শক্তি রাখিতে হবে। কোন্ জিনিষটীর কত দাম অবিলম্বে ক্রেতাকে বলতে হইবে, নইলে খরিদ্দার বিরক্ত হবে। কোন খরিদ্দার কি রকম Standard এর জিনিষ কেনে মনে রাখিতে হইবে, যাতে পরের বারে সেই ক্রেতা এলে তার পছন্দ মত জিনিষ দিতে পারা যায়।

৬। দোকানদারকে চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হবে। দোকানদারের ওপর বিক্রী বহু পরিমাণে নির্ভর করে। দোকানদারের কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, ক্ষিপ্রতা ক্রেতাদের মনে যদি

রেখাপাত কোরতে পারে তা হলেই সে বাঁধা খদ্দের হয়ে যাবে। বাঁধা খদ্দের দোকানের অমূল্য সম্পদ। সংসারের চাপে মানুষ সর্ব্বদাই ভুগছে; হাসি আনন্দ পেলে তার ভাল লাগে—তাই হাসিমুখো লোক সহজেই লোকের মন জয় করে।

৭। কেনার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেনার ওপরই দোকানের লাভ নির্ভর করে; জিনিষ কিনবার সময় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী দোকানদারদের চেয়ে বেশী দামে জিনিষ কেনা হয় তাহলে লাভ আপনি কমে যাবে বা দর চড়ে যাবে।

৮। একদর রাখা উচিৎ। এতে দোকানের মর্য্যাদা বাড়ে। বহু ক্রেতা আছে যারা দাম দর কোরতে ভালবাসে এবং দোকানী যে দাম বলে তার চেয়ে কিছু কম দরে না পেলে জিনিষ কিনতে চায় না—সেটি সেকেলে বেণের বেণেমীর ফলে হয়েছে। সহরে ক্রমশঃ একদর হওয়া ক্রেতাদের মন থেকে এ ভাবটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পাঁড়াগায়ে এখন 'একদরে' দোকান চালান মুস্কিল তবুও 'একদর' করা উচিৎ; প্রথমতঃ এতে কিছু ক্ষতি হলেও যখন ক্রেতা জানবে যে এদের একদর এবং ন্যায্য দর তখন তারা বিশ্বাস করবে। এ বিশ্বাস দোকানের পক্ষে একটী প্রয়োজনীয় সম্পদ।

৯। যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। বিজ্ঞাপনে সাক্ষাৎ ফল না পেলেও পরোক্ষে ফল পাওয়া যাবেই। যেভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা দরকার; এখন শুধু হ্যাণ্ডবিলে বা ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদ-পত্রের খানিকটা অংশ পূরণ করিলেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; নূতন উপায়ে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বিজ্ঞাপন একটী পৃথক আর্ট।

১০। দোকানের সামনে পতাকা কিংবা বড় কাপড় বা কাগজে অল্পকথায় বিজ্ঞাপন দেওয়া ভাল।

১১। গ্রীষ্মে সরবৎ বা শীতে চা, রেডিও, গ্রামোফোন, বিনামূল্যে ওজন করিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা ক্রেতা আকর্ষণ করা যেতে পারে।

১২। মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৩। মধ্যে মধ্যে ক্রেতাদের ক্যাসমেমোকে টিকিট গণ্য করে লটারী করা উচিত, এবং তার ফলাফল সকল ক্রেতাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

১৪। ব্যবসাতে কর্ম্মকেই বড় বলে মেনে নিতে হবে; ভাগ্য এক্ষেত্রে বড় নয়। মোটা-মুটি কয়েকটী জিনিষ লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। পাঠকবর্গ যদি এ বিষয়ে আরো আলোচনা চান পরে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

পুকুরে মাছ ধরা

প্রথম অধ্যায়

শিকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তাহাদের বাসস্থলে তীর্থযাত্রা করাও সব সময়ে সুবিধাজনক নহে; কাজেই নিরীহ মাছের পেছনে বর্শী লইয়া ছুটাই সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বৈচিত্র্য সকল সময়েই মানুষের মনে আনন্দদান করিয়া থাকে; ময়ূর পালকের ফাত্না যখন সিন্ধুবাসিনী অপ্সরাদের মত জলের উপর ভাসিতে থাকে, মাছের টানে টানে ফাত্না জলের উপর যখন অল্প অল্প দুলিতে থাকে—তখন মনের যে অবস্থা হয় তাহা ভাষায় অনির্ব্বচনীয়। ফাত্নাটি ঠিক বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দীঘির অতল রহস্য যেন বারে বারে চোখের সামনে ধরিয়া দিতে থাকে! তীরের এক প্রান্ত হইতে যেমন নিঃশব্দ ইঙ্গিত আসিয়া মূক ভাষায় তাহার মনের কথা তোমার কাছে বলিয়া যায়, ফাত্নার মৃদু কম্পনেও তেমনি তোমার অপরা বন্ধুর ভাষা পরিষ্কার হইয়া তোমার চোখের কাছে ফুটিয়া উঠে! তাহার নিশানের ইঙ্গিত ঠিক মত পড়িতে পারিলেই, কেল্লা ফতে! ঐ দেখ! ফাত্না দুলিয়া উঠিতেছে নয়! কে আবার আঙ্গিনায় এলো? টোপের গন্ধে কি চারিদিক এমনি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে! ঐ যে, ফাত্না আরো দ্রুতবেগে কাঁপিতে সুরু করিয়া দিয়াছে যে, আর তো দেরী করিলে চলিবে না! তাড়াতাড়ি উপরের দিকে ছিপ ঠি মারো! হুড়্-হুড়্ করিয়া রিল হইতে সূতা ছুটীতে লাগিল; কিন্তু অনেক দূর গেল না। মৎস্য মহাশয় বোধ হয় পুরবৃদ্ধ পাতালবাসী নাগরিক, অনেকক্ষণ ধরিয়া তাই যুদ্ধ চলিল; কিন্তু তাহাতে যৌবনের উদ্যম লক্ষিত হইল না। সেকি! আমার বিশ্বস্ত বান্ধবীর এখনো সাক্ষাৎ নাই যে; নাগরিকের উপর পাহারার জোরে কি জলের নীচেও শেষ হয় নাই? ওঃ, ঐ যে! এসো বন্ধু, এসো—দেখিয়া খুব সুখী হইলাম! তাইতো, বোধ হচ্ছে নাগরিক মহাশয় বয়সের দোষে একটু মোটা সোটা হইয়া পড়িয়াছেন; তিনি তাই শীতল সিন্ধুনিবাস ত্যাগ করিতে চাহেন না! তবুও তিনি তীরে আসিলেন, মোটে ৭ পাউণ্ড ওজনে, বদনকম'লও বেঁকানো—দেখ্‌লে হাসি পায়! চাহিয়া দেখা গেল রোহিত নন্দন!

রোহিত মাছ ঠিক রোচ্ মাছের মত ধড়িবাজ! উভয়কে ধরিতে গেলেই সমান কসরৎ ও কৌশলের দরকার হয়! রোচ্ ধরা লণ্ডনের প্রধান আমোদ হইলেও, রোহিত মাছ শিকার করা যেমন আনন্দদায়ক তেমনি আবার কঠিনও বটে! যে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় অ্যাঙ্গলিং ক্লাব ডিনারে বলিয়াছিলেন যে তিনি কিছুই না ধরার চেয়ে ব্যাঙাচি ধরাও পছন্দ করেন, তাহার সহিত আমার মোটেই মতভেদ নাই। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মাছি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া আমি মাছ ধরি নাই। মনে করিতাম, নকল মাছি দিয়া নদীর ট্রাউট্ মাছ ধরাটা কৌশলের চূড়ান্ত! কিন্তু বড় বড় মাছ ধরিতে গেলে, মাছি দিয়া জোড়াতালি দেওয়া আদৌ চলে না; তখন

বিল চক্রের উপর ভরসা করাই ভাল। বিলের উপর দখল রাখা মাছি-নিয়ে কসরৎ করার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন। রোহিত মৎস্য খেলাইয়া তুলিতে অনেক দিক দিয়া বেশী কৌশলের প্রয়োজন হয়। কাজেই, "মাছধরার ছেলে-মানুষি! তা ও আবার বর্শী দিয়া"!—ভাষাটা নেহাৎ গুরুগিরির ভণ্ডামী হয়! যাহারা ২।৩ মাসের জন্য এখানে মাছ ধরিতে আসে, তাহারা মনে করে যে তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ২০।৩০ বৎসরের ভণ্ডদের চেয়ে ঢের বেশী হয়। তাহারা আবার বিজ্ঞের মত বই ও লেখেন, এবং তাহাতে এত ভুল থাকে যে কোনটা ছেড়ে কোনটা বেছে নিই, তাহাও একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়! আমার ইচ্ছা, আপনারা যাহাতে বই'এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের নাম শুনে নাক সিঁট্‌কাতে না থাকেন!

মাছ ধরিবার জন্য সভ্য জগতের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই, লটবহরের বেশী প্রয়োজন নাই। অনেকের ঠাটঠমক লইয়া যাইবার আবার সামর্থ্যও নাই, তবুও আমার এক বন্ধুর ভাষায় ইহাকে "বাদশাহী আমোদ" বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। আমার বন্ধুটি তিনদিনের মধ্যে ৬৭৮ পাউণ্ডের মাছ ধরিয়াছিলেন!

মাছ কোথায় পাওয়া যাইতে পারে, সেই কথাই আমি প্রথমে বলিব—তারপরে ধরিবার উপায় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিব। যে পুকুরের জল কখনো শুকায় না, যেখানে জাল দিয়া মাছ ধরা হয় না, এবং যাহার জল নদী হইতে বাহির হওয়া খাল বহিয়া আসে কিন্তু নদীর উপরকার জলস্রোত সব সময়েই বহিতে থাকে—এমন পুকুরে সব ধরণের রোহিত মৎস্য, সাদা কার্প, হাঙ্গর এবং নানান্‌ রকমের মাছ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কথা আরো পরে বলিব।

আমি বিশেষভাবে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কথাই বলিতেছি; কিন্তু কলিকাতার জলাশয়েও আমি এইরূপ ধরণের মাছ দেখিয়াছি। যেমন কলিকাতার কালাবাউস আমাদের লেবিয়ো কালবাসু ব্যতীত আর কিছুই নহে, তেমনি তাহাদের রোহিত আমাদের লেবিয়ো রোহিত ভিন্ন আর কিছুই নহে। উত্তর ভারতের যে সুন্দর মাছ মিরগা নামে পরিচিত, আমরা তাহাকে চিরদিন মৃগল্‌ নামে জানিয়াছি; সাদা কার্প মাছও উহার সগোত্র বটে। লম্বায় উহা তিন ফিট পর্য্যন্ত হয়, ওজনেও ১৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়ে। উত্তর ভারত এবং বাংলাদেশের কাত্‌লাকে অনেকে কাত্‌লা বুকাননি বলে; আমি ৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নিজে দেখিয়াছি এবং একজন প্রামাণ্য ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে মিউজিয়মের উল্টাদিকের কলিকাতা ময়দানের পুকুরে একটী একুশ পাউণ্ডের কাত্‌লা বর্শী দিয়া ধরা হইয়াছিল।

বাংলাদেশে যাহারা বর্শী দিয়া মাছ ধরেন, তাহারা প্রায়ই ১০ হইতে ২০ পাউণ্ডের মাছ পাইয়া থাকেন—অনেকে ৬০ পাউণ্ডের কাত্‌লাও বর্শীতে গাঁথিয়া তুলেন! তাহারা দুই পাউণ্ডের নীচের মাছের দিকে দৃষ্টিপাত করাও সঙ্গত বোধ করেন না। বর্ম্মা মুল্লুকেও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চেয়ে সুন্দরতর লেবিয়ো অনেক সময় ধরা পড়িয়া থাকে; এক একটীকে প্রায় পাঁচ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। লেবিয়োর মত পরিপুষ্ট মাছের ওজন যে এই দৈর্ঘ্যের অনুপাতে অনেক বাড়িয়া যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বোম্বাই সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ; তবে অনুমিত হয় যে ওখানেও মান্দ্রাজ অঞ্চলের মত লেবিয়ো মিলিয়া থাকে; কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের লেজি সরবরাহ যে বর্ম্মা ও বাংলার চেয়ে কম হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাজেই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুকুরে মাছ ধরার আনন্দে এবং মন্তব্যে যে বাংলা বোম্বাই, বর্ম্মা এবং সিংহলও খুসী হইয়া উঠিবেন তাহা আমি কতকটা অনুমান করিয়া লইতেছি।

পুকুর সম্বন্ধে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উহা যেন কথনো শুকাইয়া না যায়, এবং কথনো যেন উহাতে জাল না ফেলা হয়। দক্ষিণ প্রেসিডেন্সীতে অনেক পুকুর আছে, যাহার জল নদী হইতে আসিয়া থাকে। আমি জল সেচন কার্য্যে নিযুক্ত দীঘিগুলির কথা আদৌ মনে করি নাই; কেননা সারা বৎসর ব্যাপিয়াই উহাদের কার্য্যের আর অন্ত থাকে না! তখন উহাতে বর্শী দিয়া মাছ ধরিবার ফুরসৎ কোথায়? আমি সেই সমস্ত পুকুরের কথাই বরাবর মনে রাখিয়াছি, যাহা পানীয় এবং স্নান করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যেও অনেকগুলি আবার গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়, অনেক গুলি কনট্রাক্ট করিয়া বিক্রী করিয়া ফেলা হয়! যেগুলি এইরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, তাহার মাছ ক্রেতার দল এমনভাবেই ছাকিয়া ফেলেন, যে, মনে হয় কেহ যেন তাহাদিগকে একটী মাছ রাখিয়া গেলেই শূলে চড়াইয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে! একটী ব্যাঙাচি'র ছানাও আর তাহার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না! ইহা ব্যতীত এমন অনেক পুকুর আছে যাহা তমাল দীঘির মতই অতল গভীর—যাহার জলের ভাণ্ডার অফুরন্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ভূ-খোদন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; বাংলাদেশের অনেকগুলিতে আবার স্নানার্থীর জন্য সিঁড়ি বাঁধাইয়া দেওয়া হয় এবং উহা অনেক সময় সমকোণাকার। এরূপ ধরণের এমন অনেক দীঘিও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার এক এক পার্শ্ব প্রায় পোয়া মাইল লম্বা হইবে।

এই পুকুরগুলি সাধারণতঃ মন্দির সংলগ্ন হইয়া থাকে কিংবা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে; তবে অনেকগুলি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক পুকুরে জাল ফেলিতে বারণ করিয়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা থাকে; কেননা, জাল ফেলিলে নীচের ময়লা এবং কর্দ্দমাক্ত জল উপরের দিকে উঠিয়া স্নানার্থী এবং পানার্থী উভয়েরই বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই ধরণের পুকুরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

পুকুর ঠিক করিয়া তারপরে উহার মধ্য হইতে কিরূপে মাছ ধরিতে হইবে—তাহাই বিবেচনা করিতে হয়। মনে করিও না যে, উহা কলের খোসা ছাড়ানো'র মত অতি সহজ ব্যাপার! অনেক সময়ে পুকুরের একধারে সারাদিন বর্শী ফেলিয়া বসিয়া থাকিলেও একটি মাছ ধরিতে পারা যাইবে না; আবার ঠিক সেই পুকুরের 'অন্যত্রই বৃহদাকার মৎস্য পাওয়া যাইতে পারে! কাজেই, মাছের প্রকৃতি এবং চাতুরী সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা থাকা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। সেইজন্য গোড়াতেই আরো কতকগুলি সংবাদ দিয়া মুখবন্দ করিয়া লইতে চাই।

বর্শীর ছিপ্—মাছ ধরিতে গেলে জোরে ছিপ্‌টি মারা দরকার, কাজেই হাল্‌কা ছিপ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক, তাহা না বলিলেও চলে। দশ ফিট লম্বা হইলেই ভাল ছিপ হয়; যদি উহা

হাল্কা হয়, তাহা হইলে এগার ফিট্ করাও চলিতে পারে, কিন্তু উহার বেশী এক ইঞ্চি বাড়ানও যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, তাহা হইলে মাছের টোপে টিপ্ দেওয়া মোটেই নজরে পড়িবে না। দশ ফিট্ই বেশ কার্য্যোপযোগী! ইহার সঙ্গে হাল্কা এবং শক্ত হইলেই সোনায় সোহাগা হইল। মুর (male Bamboo) এবং ফল্দা বাঁশের (Female Bamboo) মাঝামাঝি (সডা) ধরণের যে বাঁশ হয়, তাহা হইতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিপ্ তৈয়ার হইতে পারে। কলিকাতায় ইহার প্রচলন খুব বেশী এবং দেশী জেলেরা উহার সাহায্যেই মাছ ধরিয়া থাকে। গোড়ার দিকে ইহা ১¼ ইঞ্চির বেশী হইবে না, মাথার দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া ইহা ⅛ ইঞ্চি হইবে। অঙ্গে কোণ আভরণ দিবার পূর্ব্বে ইহার ওজন যেন ৮।৯ আউন্সের বেশী না হয়। এ-বিষয়ে বাংলাদেশ সমস্ত ভারতের চাহিদা মিটাইয়া থাকে ; এখানে মুর, ফল্দা এবং সডা—সকলই মিলিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি ছিপ্‌টি মারার উপযোগী শক্ত হওয়া চাই ; কিন্তু বেশী শক্ত হওয়ার দরুণ আবার বড় মাছ খেলাইয়া তুলিবার সময় যেন ভাঙ্গিয়া না যায়, তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কথায় বলে, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়", "নোয়ায় কিন্তু ভাঙ্গে না" ; বর্শী তৈয়ার করিবার সময় এই কথাগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। গোড়ার দিকের আঠারো ইঞ্চি দূর হইতে প্রতি একফুট অন্তর অন্তর রিং বা আংটা রাখিতে হইবে।

বাড়ীতে তুলিয়া রাখিবার সময় উহাকে কখনও কোণের দিকে রাখিয়া দিবে না; কেননা তাহা হইলে বর্শী চির-বাঁকা হইয়াই থাকিবে। মাটি-তেও রাখিবে না, তাহা হইলে পায়ের নীচে পড়িয়া উহা একদিন ফাটিয়া যাইতে পারে। যদিও মাছ খেলাইয়া তুলিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট শক্ত বটে, কিন্তু কোন ভারী জিনিষের ধাক্কা সামলাইবার মত সামর্থ্য ইহার আদৌ নাই। হুইপ্ প্রস্তুতকারকেরা তাহাদের হুইপ্ যেমন যত্নের সহিত ঝুলাইয়া রাখে, তেমনি ভাবে একটী আংটার সহিত উহা ঝুলাইয়া রাখাই সঙ্গত। মাঝে মাঝে ছিপে তেল দেওয়া উচিৎ; সরিষার তেলই সব চেয়ে ভালো। ইহাতে যে কেবল—মাত্র রংএরই উন্নতি সাধন হয় তাহা নহে, পরন্তু ছিপ্‌কে নরম রাখিবার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট সহা-য়তা করিয়া থাকে। বৃষ্টির দিনে ইহার গায়ে অনেক ময়লা জমিয়া থাকে, তখন ইহাকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বর্শীর সুতা—লম্বা সুতার অবশ্যই প্রয়োজন হইবে। মুগা-সিল্ক এর সুতা ই সব চেয়ে ভাল কাজ দেয়; ইহা যেমন হাল্কা, তেমনি শক্ত এবং স্থিতিস্থাপক। ইহা বড় বড় ইউরোপীয়ান এবং ভারতীয় দোকানে, এমনি কি, বাজারে পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশে ইহাকে মুগার সুতা বলে, কিছু পুরু করিয়া লইলেই ইহা দ্বারা সাধারণ কাজ চলিতে পারে। কখনো "হব্‌সার" ব্যবহার করিতে নাই; উহা দেখিলে মাছ হয়তো ভয়েই পলাইবে—বর্শীর সীমানায়ও আসিবে না।

জড়ানো সুতা ভাল কাজ দেয় না—ভারতে মাছ মারিবার জন্য ইংলিশ কিংবা আমেরিকান সুতা ব্যবহার করাও উচিত নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুগার সুতাই উত্তম; প্রত্যেক দিন মাছ ধরার পর সুতার ব্যবহৃত অংশ রৌদ্রে দিয়া পুনরায় উহাকে কাজে নামাইবার পূর্ব্বে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, যে, উহা দিয়া কাজ চলিবে কিনা! লক্ষ্য করিতে হইবে যে সুতাতে যেন রিল আবার ভর্ত্তি না হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় মাছ ধরিবার সময় আবার মাথা চাপ্‌ড়াইতে হইবে।

সুতাকে ওয়াটারপ্রুফ্ করা উচিৎ কিনা তাহাও বিবেচ্য। যদিও উহা খুব আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না, তথাপি যদি কেহ উহার দিকে আকৃষ্ট হন, সেইজন্য নিম্নলিখিত উপায় লিপিবদ্ধ করা হইল। যদি বৃষ্টি কিংবা হিমে না ভিজে, তাহা হইলে ৩।৪ দিনের প্রখর রৌদ্রে উহা শুকাইয়া খর্‌খরে হইয়া উঠিবে।

তারপরে বর্শীর সুতাকে পাকাইয়া লইয়া উহার সঙ্গে একপাত ইট বাঁধিয়া দালানের কোন উচ্চ প্রকোষ্ঠ কিংবা রেলিং হইতে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ করিলে অকেজো পাক আপনা আপনি খুলিয়া আসিতে থাকিবে।

তারপরে ঠাণ্ডা কোপাল বার্ণিশ এবং গোল্ড সাইজ্ মিশ্রণ করিতে হইবে। শেষোক্তটির দশভাগ বেশী কোপাল বার্ণিশ লইলেই ভাল কাজ চলিবে। তারপরে কোন পাত্র এয়ার-টাইট্ করিয়া উহার মধ্যে বর্শীর সুতা কয়েকদিন ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; তার পরে উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)
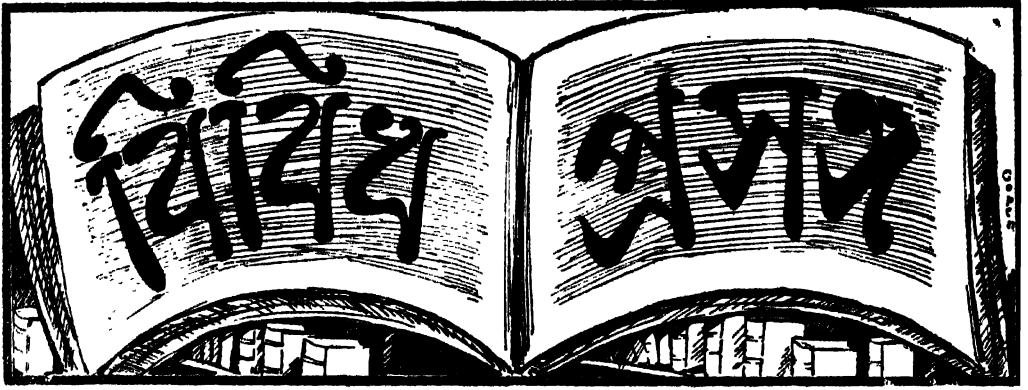
নিষ্কর্ম্মার বছরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন

বিখ্যাত বৃটিশ রস-স্রষ্টা শ্রীযুক্ত পি, জি, ওড্‌হাউস হোলি-উডে কিছু না করিয়াই এক বছরে বিশ হাজার আটশ' পাউণ্ড উপায় করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে বর্ত্তমান জগতে কোন নিষ্কর্ম্মা তাঁহার চেয়ে বেশী উপায় করেন না।

হোলিউড্‌ তাঁহাকে এবং অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থকার এবং নাট্যকারদিগকে বায়স্কোপের সিনিরিয়ো লিখিবার জন্য অনেক টাকা মাহিয়ানা দিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার পর কর্ম্মকর্ত্তাদের হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া নবনিযুক্ত লোকদের কথা মনেই থাকেনা, কিন্তু ক্যাসিয়ার-সাহেব ঠিক সময় মতো তাঁহাদের মাহিয়ানার চেক পাঠাইয়া থাকেন।

মিঃ ওড্‌হাউস্‌ নিজেই এই সমস্ত ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহে ৪০০ পাউণ্ড করিয়া পান; কিন্তু হিসাব খতাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার কিছুই করিতে হয়না। তিনি মেট্রো-গোল্ডউইন মায়ার'এর ষ্টুডিয়োতে একবছর থাকিয়া যে মোটা পাঁচ অঙ্ক মাহিয়ানা পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার নিজের মুখ হইতেই শোনা গিয়াছে, "আমাকে কর্ম্মকর্ত্তারা অনেক টাকা মাহিয়ানা দিয়া বায়স্কোপের গল্প লিখাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা আমার জন্য কাজ খুঁজিয়া দিতে পারিতেন না। বছরের মধ্যে শুধু দুইবার তাঁহারা আমার কাছে অন্য লোকের লেখা সম্পূর্ণ সিনেরিয়ো আনিয়া তাহাতে কথোপকথন সংযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন

"আমি লক্ষ্য করিলাম যে ১৫।১৬ জন লেখক আগেই তাহাতে এক একবার মুন্সিয়ানা করিয়া গিয়াছেন। আমিও কোন জায়গায় কমা, কোন জায়গায় সেমিকোলন' কিংবা দুই একটা শব্দের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়া কাজ সমাপ্ত করিলাম।

"তৎপরে তাঁহারা 'রোসালি' নামক গল্পটা ঠিক করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন—উহাতে আবার সঙ্গীত সংযোগ করিবার ভারও আমার উপর পড়িল। মাস তিনেক পরে কাজ শেষ করিয়া উহা তাঁহাদিগকে ফেরৎ দিলে পর তাঁহারা আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, গানযুক্ত

এখন আর লোকপ্রিয় নহে—কাজেই তাঁহারা উহা ব্যবহার করিবেন না।

"এইরূপে আমি আমার বিশহাজার আটশ' পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়াছি--ইহা এত অসম্ভব যে, ভাবিলেও মাথা ঘুরিয়া আসে!"

পূর্ব্বরাত্রে পুড়িয়া যাওয়া

মিঃ ওড্‌হাউসের মতে, বিখ্যাত বৃটিশ ঔপন্যাসিক তাঁহার বন্ধু রোলাণ্ড পার্টবি'র অভিজ্ঞতা আরও অদ্ভুত। হোলিউডের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি মেরিলিন মিলারের জন্য একটি গল্প লেখেন এবং সকলে তাহা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করেন। পরের দিন সকাল বেলায় যখন তিনি ষ্টুডিয়োতে যাইতেছিলেন তখন পুলিশ তাঁহাকে অবরোধ করিয়া বলিল যে তিনি গত রাত্রে পুড়িয়া গিয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

আমি আজ আর একজন বিখ্যাত জার্ম্মান লেখকের কথা শুনিলাম—তাঁহাকে সপ্তাহে দুই-শত পাউণ্ডে সিনেরিয়ো লিখিতে নিযুক্ত করা হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি কোন কিছুই করেন নাই; কিন্তু সময়মত চেক্ আসায় এইটুকু বুঝা যাইত যে কর্ম্মকর্ত্তারা তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই। এই অবহেলার জন্য ভদ্রলোকটি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া জার্ম্মানীতে চলিয়া যান; কিন্তু যাইবার সময়ে কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই। তাঁহার বিবেকে এইজন্য হয়তো একটু আঘাত লাগিয়াছিল; তিনি তাই আবার একমাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পৌঁছিয়া দেখিলেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিও আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই—কেননা তাঁহার ডেস্কের উপর চারি সপ্তাহের মাহিয়ানা পড়িয়া ছিল!

ভারতের রপ্তানী শুল্ক

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের বিবৃতি

মিঃ জে, আর, রবিনসন্ হাউস্ অফ্ কমন্স-এ স্যার স্যামুয়েল্ হোর্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভারতে কি কি রপ্তানী-শুল্ক বর্ত্তমান আছে এবং তাহার জন্য কাঁচা মালের আমদানী গ্রেট বৃটেনে কমিয়াছে কি বাড়িয়া গিয়াছে। স্যার স্যামুয়েল উত্তরে বলেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে শুধু কাঁচা এবং তৈয়ারী পাট, চাম্‌ড়া এবং চাউলের উপর রপ্তানী শুল্ক বর্ত্তমান আছে।

সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ (স্যর স্যামুয়েল হোর) ভারতীয় ট্যারিফ্ এক্ট-এর (১৮৯৪), তৃতীয় সেডুলের কতকগুলি কাপি সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাতে ট্যাক্সের হার এবং কাঁচা পাট এবং চামড়ার উপর ঐ শুল্ক বসানোর পর হইতে উহার আমদানীতে কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে তাহার একটা হিসাব দেন। নিম্নে তাহা বিবৃত হইল:—

ইউনাইটেড কিংডমে কাঁচা পাট রপ্তানীর হিসাব

বৎসর	টাকা (লক্ষ)	টন
১৯১৬-১৭	৮২১	২৬০২২৭
১৯১৭-১৮	১৬৪	৬৭৭৬৮
১৯১৮-১৯	৬৭১	২২৪১২১
১৯১৯-২০	১৩২৪	৩১০৬৭০
১৯২০-২১	৫২৫	১৩৬০২৩
১৯২১-২২	২৮৭	৯০৮৩৫
১৯২২-২৩	৫৯২	১৫৬১৭৮
১৯২৩-২৪	৪৬২	১৫৬৬৩৫
১৯২৪-২৫	৭২৩	১৭২৭৬০
১৯২৫-২৬	১০৫৭	১৭৪০৪০
১৯২৬-২৭	৬১৪	১৭২৮৮৯
১৯২৭-২৮	৭৬৮	২২২০৭২
১৯২৮-২৯	৭৫৭	২০১৮৩৩
১৯২৯-৩০	৫৫৬	১৬৪৭৫১
১৯৩০-৩১	২২৩	১০৭৯০৯

ইউনাইটেড্ কিংডমে কাঁচা চামড়া (ছাটতি বাদে) রপ্তানীর হিসাব

বৎসর	টাকা (লক্ষ)	টন
১৯১৯-২০	৩২৩	১৮৭৬১
১৯২০-২১	১০৪	৫৮১৬
১৯২১-২২	৩৯	৪০৪৩
১৯২২-২৩	৪৬	৩৬৭২
১৯২৩-২৪	৪০	২৫১৫
১৯২৪-২৫	৪২	২৩৪৫
১৯২৫-২৬	৪৭	৩৮৯৭
১৯২৬-২৭	৩৮	২৪৯৮
১৯২৭-২৮	৬৭	৪৭৬৮
১৯২৮-২৯	৩৯	২৫০৮
১৯২৯-৩০	৩৬	১৫:৬
১৯৩০-৩১	৩৭	২০২২

রুষিয়ায় ভড্‌কা সুরাসার

ভড্‌কা একপ্রকার তপ্ত তরল সুরাসার এবং শতকরা ৪০ ভাগই অ্যালকহল। রুষিয়ার সাধারণ লোক ইহা খাইয়াই মাতলামী করিয়া থাকে। এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য ষ্টেট্ হইতে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহার প্রস্তুত ও বিক্রয় বিষয়ে এখন গভর্ণমেণ্টই সর্ব্বেসর্ব্বা। বিপ্লবের স্মারক-দিনে এবং যে-দিন মাহিয়ানা দেওয়া হয়, তখন ফ্যাক্টরী এবং সৈন্যদের ব্যারাকের কাছে উহার বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীতে তৈয়ার করা ফৌজদারী আইনের আমলে পড়িলেও, মফঃস্বলে চুপি-চুপি অনেক কাজ চলিয়া থাকে।

১৯৩০ সনে ৬:৯৬৫৫০০০ লিটার ভড্‌কা রুষিয়াতে বিক্রয় হইয়াছিল,—তাহার এক তৃতীয়াংশ সহরে, এবং দুই তৃতীয়াংশ মফঃস্বলে। ১৯১৩ সনে কিন্তু ১২৬৭১৩০০০০ লিটার বিক্রয় হইয়াছিল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভড্‌কাকে "পুত্রোভ্‌কা" বলে; উহাকে পূর্ব্বোক্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হয়

নাই। তবু বলিয়া রাখা ভাল, উহার পরিমাণ কয়েক মিলিয়ন লিটারের বেশী হইবে না। সোভিয়েটের কর্ম্মকর্ত্তারা আন্দাজ করেন যে, গত জার্ম্মানযুদ্ধের পূর্ব্বে ভড্‌কা যেমন বিক্রয় হইত, এখনকার পরিমাণ তাহার অর্দ্ধেকের চাইতে একটু কম। মনে রাখিতে হইবে, লোকসংখ্যা আবার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রুষিয়ায় সাধারণ মত এই যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যতটা মাতলামী পরিলক্ষিত হইত, এখন তাহার চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মাতলামীতে "সামোগন" বা গৃহ-প্রস্তুত ভড্‌কা-ও একটু দায়ী বটে—কতখানি, বলা শক্ত।

অন্যান্য জিনিষের ন্যায়, ভড্‌কা—তৈয়ারীও "পাঁচ-বৎসর প্ল্যান" অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের সময় ইহার কাজ একদম বন্ধ ছিল; বলশেভিক্-প্রভুত্বের প্রথম দিক দিয়া ইহার সঙ্গে অন্যান্য মদের তৈয়ারীও বন্ধ করা হইয়াছিল। অন্তর্যুদ্ধের অবসানে যখন নূতন অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হইল, তখন আবার ভড্‌কা'র বিক্রয় সুরু হইল—কিন্তু ললাটে লাইসেন্সের রাজটীকা লইয়া। ইহাতে অ্যালকহলের পরিমাণ বিশ হইতে ত্রিশ, এবং ত্রিশ হইতে চল্লিশে উঠিয়া ঠিক হইয়া আছে—যুদ্ধের আগে উহাই পরিমাণ ছিল। ১৯২৭ সন হইতে ভড্‌কার বিক্রয় একটা বিশেষ সীমায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে।

যাহারা ভড্‌কা পান করে, তাহাদিগকে একটা অপ্রত্যক্ষ সেলামী দিতে যায়, ষ্টেটের কাজে। তাই দেখা যায় যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভড্‌কার যে দাম ছিল—আজ তাহার দাম কয়েকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রতি বোতল ভড্‌কায় এক লিটারের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী ধরে না; কিন্তু উহার দামই চারি রুবল মুদ্রায় যাইয়া ঠেকিয়াছে। ষ্টেট্ হইতে প্রতি লিটার ভড্‌কায় তিন রুবল ৮০ কোপেক করিয়া ট্যাক্স বসান তো হয়ই, কতকগুলি স্থানীয় করও উহার উপর চাপানো আছে। ইহা ব্যতীত সোভিয়েট-ইউনিয়নের লোকেরা বহু পরিমাণ বিয়ার ও মদ উদরস্থ করিয়া থাকে। মদ-বিশেষজ্ঞরা বিয়ারকে নীচু ক্লাশের বলিয়া মনে করেন, উচ্চশ্রেণীর মদ আসিলেও রুষিয়ার লোকেরা সাধারণতঃ নিকৃষ্ট মদ (wine) লইয়াই তাহাদের আড্ডা গুলজার করিয়া তুলিয়া থাকে! ইহাই তাহাদের স্বভাব!

সোভিয়েটের অবাধ-প্রভুত্ব

(ডিক্টেটরসিপ্)

সোভিয়েটের শাসনতন্ত্র স্বরাজের আইন কানুনকে সম্মান দেখাইতে কসুর করে না। কতকগুলি গণতন্ত্রের ফেডারেসন হইতে এই ইউনিয়নের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কাগজ পত্রের শাসন তন্ত্র হইতে বর্ত্তমান কনষ্টিট্যুসনের প্রগতি একটু ভিন্ন ধরণের। রুষিয়ার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং তাহাদের এক্জিকিউটিভ—ষ্ট্যালিন তাহাদের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহাকে একজন উপাধিবিহীন রাজা বলিলেও চলে। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্যেই "জনসাধারণের অবাধ-প্রভুত্ব"

নীতির মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সোস্যালিষ্ট দেশের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যস্থ বিভিন্ন স্বরাজী দেশগুলির কি বিরাট তফাৎ! সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নটা অর্থনৈতিক একতার ভিত্তির উপর গড়া হইয়াছে এবং ইহার প্রত্যেক কার্য্যই সমস্ত দেশের জন্যই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট নিজেই মাল প্রস্তুত এবং বিক্রয় করার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহারাই একমাত্র আমদানী এবং রপ্তানীকারক।

রুষিয়ার কার্য্য সমূহ একটী কমিশনের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে—চলতি ভাষায় উহাকে "গসপ্ল্যান" বলা হয়। ইহার অর্থনৈতিক স্কীমের নাম দেওয়া হইয়াছে, "পাঁচ—বাৎসরিক প্ল্যান এবং উহা ১৯২৮-২৯ হইতে ১৯৩২-৩৩ পর্য্যন্ত চলিবে।

প্রথম যুগে ইহা পৃথিবীর কাছে শুধু উপহাস কুড়াইয়াছিল—এখন সমস্ত দুনিয়া উহার কার্য্যাবলী সসম্ভ্রম বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিতেছে; বাস্তবিক পক্ষে এত বড় আর্থিক প্রচেষ্টা জগতে আর কোন দিন হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে লেখে নাই।

রুষিয়ার সমস্ত ভূভাগ এবং তাহার উৎপাদিকা শক্তি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষন করা হইয়াছে। কয়লা, তেল, পীট এবং জলের শক্তিকে দেশের কারখানা গড়িয়া তুলিবার জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। একটী বিরাট শক্তিপূর্ণ কেন্দ্র (Super Power House) এবং বৈদ্যুতিক সাইনের সুবন্দোবস্ত করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তারা লেনিনের ১৯২০ সালের কাজ আগাইয়া লইয়া চলিয়াছেন। জলের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার এমন প্রচেষ্টা চলিতেছে, যে ইহা সহজেই পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্য বস্তু হইবে। লোহা ও ইস্পাত হইতে কাগজ তৈয়ার করা পর্য্যন্ত এবং সূতা কাটা হইতে ফিল্ম প্রস্তুত করা পর্য্যন্ত—সমস্ত কাজই জলের জোরে চালাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যের সব ওলোট পালোট হইয়া যাইতেছে। ছোট খাটো জমির টুকরোগুলি এক সঙ্গে মিলিয়া বড় বড় ফার্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে এবং কর্ত্তারা আশা করিতেছেন যে ইহাতে দুর্ভিক্ষের অবসান হইবে। এখনো কেহ বলিতে পারে না, কতদিনে এই স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠিবে।

আমরা এখন ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের কথা আলোচনা করিব। তাহার প্রধান শক্তিই হইতেছে আটচল্লিশটী স্বরাজী দেশের সংহতি শক্তিতে এবং তাহার ঐশ্বর্য্যে। এখানে ব্যক্তিত্বের আদর্শ পুরামাত্রায় বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে কতকগুলি দেশে মজুর সম্বন্ধীয় ভালো ভালো আইনকানুন আছে—কতকগুলিতে নাই বলিলেই হয়। ষ্টেট্ হেল্থ ইনসিওরেন্স কিংবা ষ্টেট্ আন্এম্প্লয়মেণ্ট বলিয়া কোন কিছু ইহাদের জানা নাই।

আমেরিকা তিন মিলিয়ন বর্গমাইল ব্যাপিয়া আছে—লোক সংখ্যাও ১২৩ মিলিয়ন। সমস্ত আমেরিকা ও তাহার সাম্রাজ্য লইয়া হিসাব করিলে (আলাস্কা, ফিলিপাইন, হাভাই প্রভৃতি লইয়া) দেখা যাইবে, যে, তাহার পরিমাণ সংখ্যা ৩৭ লক্ষ বর্গমাইল হইবে, লোক সংখ্যাও মোটা মুটি ১৩৭ মিলিয়ন। তাহার ১২৩ মিলিয়ন অধিবাসীন্দার মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু কম লোক ইংলিশ, ওয়েল্শ স্কটিশ এবং আইরিশ বংশ সম্ভূত। খাঁটি ইংলিশ এক চতুর্থাংশের বেশী নহে।

চাপাইতে হয়না। দ্রুত চলনশীল লেন্সের জন্ম এবং সেনসিটিভ্ (যাহা সহজেই ছাপ রাখিতে পারে) ফিল্ম ও প্লেটের জন্য—বর্ষাবাদলের দিনেও ফটো তুলিয়া লওয়া আজকাল সম্ভবপর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুগের টেলিভিসন, রেডিও প্রভৃতি ইহাতে আবার যুগান্তর আনয়ন করিবার আয়োজন করিতেছে।

আমেরিকার ঐশ্বর্য্য

প্রকৃতি দেবী দুই হাত উজাড় করিয়া ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সকে রত্নসম্ভারে সাজাইয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী কয়লা, খনিজ তেল, লোহা, তামা এবং অন্যান্য প্রকৃতিজ দ্রব্যই এখানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার লোকসংখ্যার দিকে হঠাৎ তাকাইলে চমক লাগিয়া যায় বটে; কিন্তু উহার সংখ্যা প্রতিবর্গ মাইলে ৪০ এর বেশী নহে; বিলাতে ৬৮০। গত বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রের প্রধান পাওনাদার হিসাবে, আমেরিকা প্রতি বৎসরে ইউরোপের কাছ হইতে ৫২ মিলিয়ন পাউণ্ড করিয়া পাইতেছে। ট্যারিফ্ দিয়া পৃথিবীর আমদানি আমেরিকাতে কতকটা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, কাজেই জগতের স্বর্ণস্রোত অবাধে আমেরিকার দিকে বহিয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ, তাহার তহবিলে এখন ৯৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ—অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্ণের অর্দ্ধেকাংশ রহিয়া গিয়াছে।

আমরা এখন ফ্রান্সের কথা লইয়া কিছু আলোচনা করিব। ফরাসী সাম্রাজ্যের ১০৪ মিলিয়ন লোকের মধ্যে, ৪১ মিলিয়ন বাস করে ফ্রান্সে—বাকী ৬৩ মিলিয়ন লোক তাহার আফ্রিকা এবং এসিয়ার 'জমিদারীতে' বাস করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফ্রান্সের লোকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে; গৃহের ব্যবসা ঠিক রাখিবার জন্ম তাই তাহারা ইটালীয়ান্, বেল্জিয়ান এবং পোল নিযুক্ত করিতেছে। আফ্রিকার হ্রাসপ্রাপ্ত ইউরোপীয় সৈন্যের স্থান পূরণ করিবার জন্ম দেশী বাহিনীও গড়িয়া উঠিতেছে।

ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে যে-সমস্ত জার্ম্মান উপনিবেশের ভার তাহাদের উপরে পড়িয়াছে, তাহা লইয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল পাঁচ মিলিয়ন বর্গ মাইল হইবে—কেবল আফ্রিকাস্থ 'জমিদারীর' বিস্তারই ৪½ মিলিয়ন বর্গমাইল হইবে। যদিও এই সমস্ত দেশের শাসনকার্য্য সুষ্ঠুরূপেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদিগকে জনবহুল করিয়া তুলিবার উপায় ফ্রান্সের হাতে আদৌ নাই। বিশ্বরাষ্ট্রনৈতিক-সমস্যায় এই বড় কথাটা ভুলিলে চলিবে না, যে, পৃথিবীর একদশমাংশ লোক এমন একটী জাতির অধীনে রহিয়াছে, যাহাদের সংখ্যা ক্রমাগতই কমিয়া যাইতেছে।

সর্ব্বশেষে জাপানের কথা ধরা যাক্। পৃথিবীর

ইতিহাসে জাপানের অভ্যুদয় এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! দুই পুরুষের মধ্যে এই জাতি দ্রুত পাদক্ষেপে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত সমানে উঠিয়া ঠোকাঠুকি করিয়া চলিয়াছে। তাহার নৌ-শক্তি বৃটেন এবং আমেরিকার নীচেই; ১৯১৪ সালে তাহার যে নৌ-বল ছিল, আজ প্রায় তাহার ৫০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

জাপানী সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৯২ মিলিয়ন এবং তাহার মধ্যে ৬৬ মিলিয়ন লোক স্বদেশেই বাস করে। প্রতি বৎসরে তাহার লোকসংখ্যা এক মিলিয়ন করিয়া বাড়িতেছে। এই জন-সংখ্যা বর্ত্তমান দুনিয়ার একটী আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন হিসাবে দাঁড়াইয়াছে। কেননা, জাপানের এত জায়গা নাই যে, এই ক্রম-বর্দ্ধমান জনসমূহের সেখানে ঠাঁই সঙ্কুলান হইতে পারে, তাহার উপর দেশটীও আবার আগ্নেয়গিরি পরিপূর্ণ এবং অনুর্ব্বর। জাপানের বাঁচিবার জন্য আরো জায়গার দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

পৃথিবীর বৃহৎ সাম্রাজ্য সমূহ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচটী সাম্রাজ্য--ভূমণ্ডলের অর্দ্ধেক লোককে নিজেদের তাঁবে রাখিয়াছেন এবং অর্দ্ধ জগতের বেশীর ভাগই বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া নির্ব্বিবাদে বসিয়া আছেন। লোকসংখ্যার হিসাবে সাজাইতে গেলে, প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সোভিয়েট রুসিয়া, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ফ্রান্স এবং জাপান আসিয়া দাঁড়াইবে। অপর যে-দুইটী শক্তিকে বৃহৎ রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মনে করা হয়, তন্মধ্যে জার্ম্মানীর সমস্ত উপনিবেশ ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাহার কাছ হইতে ফেরৎ লওয়া হইয়াছে, ইটালীর আবার উত্তর আফ্রিকাতে যে রাজ্য আছে তাহাকে মরুরাজ বলিলেই ঠিক হয় এখন সেখানে বেশী লোক বাস করে না।

১৯৩০ সনের শেষদিকে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দুইহাজার মিলিয়নের উপরে গিয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ৯৭৬—মিলিয়ন লোক পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি "বৃহৎ সাম্রাজ্যেরই" অধিবাসিন্দা। নীচে উহার একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

১৯৩০ সনের ৫টী বৃহৎ সাম্রাজ্য

	মিলিয়ন
বৃটিশ-সাম্রাজ্য	৪৭৫
সোভিয়েট রুষিয়া	১৬১
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্	১৩৫
ফ্রান্স	১০৪
জাপান	৯২
	৯৬৭
পৃথিবীর অন্য-অংশ···	১০৪৫
সমস্ত জগতের লোক-সংখ্যা···	২০১২

ইতিহাসে লেখা আছে, ইউরোপ এবং এসিয়াতে অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটি-

য়াছে; কিন্তু ইহা লক্ষ করিবার বিষয় যে পরবর্ত্তী সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ অতীত রাজ্যের ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল এই-টুকু সত্য যে, রোমের ভাষা, আইন-কানুন, ধর্ম্ম ও সভ্যতার স্রোত সমস্ত খ্রীষ্টান-জগতের মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রবাহিত হইতেছে।

মণিসাহেব লিখিয়াছেন, যে, প্রাচীন রোমানদের মত বৃটিশেরা সভ্যতার জন্য এত কাজ করিয়াছেন যে, তাহাদের প্রভাব জগতের প্রত্যেক উপকূলে সন্দিত হইয়া ফিরিতেছে। ইহা কি কেবল অস্ত্রবলে সম্ভব? যদি এই সঙ্গে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের কথা ভাবা যায়—কেন না, আমেরিকানরা প্রধানতঃ অবৃটিশ হইলেও তাহারা বৃটিশ আবহাওয়ার (Tradition)ই মানুষ হইয়াছে—তাহা হইলে বোঝা যাইবে, জগৎ সভ্যতায় বৃটিশের দান কতখানি!

বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মোটা মোটা কথা গুলি সহজেই মনে রাখা যাইতে পারে। যেমন, ইহা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশেরও বেশীভাগ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে এবং জগতের মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ অধিবাসিন্দা ইহাদের তাঁবে রহিয়াছে। পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ ৫৩ মিলিয়ন বর্গ মাইল; তন্মধ্যে ১৩০৭ মিলিয়নই বৃটশের অধীনে। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জগতের লোকসংখ্যা ২০১২ মিলিয়ন; কিন্তু তাহার ৪৭৫ মিলিয়নই বৃটিশের তাঁবে আছে। আবার এই ৪৭৫ মিলিয়নের বেশীরভাগই ভারতে, সিংহলে এবং আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশসমূহে বাস করে। যদি আমরা স্বরাজ প্রাপ্ত ডমিনিয়ন গুলির কথা ভাবি, তাহা হইলে নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি চোখে পড়িবে:—

১৯৩০ সনে বৃটীশ-ডমিনিয়নের লোকসংখ্যা

কানাডা	৯,৮০০,০০০
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড	৩০০,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬,৪৫০,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	১,৫২০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,৮৫০,০০০
	১৯,৯২০,০০০

দেখা গেল, বৃটিশ ডমিনিয়নে ২০ মিলিয়নের কিছু কম লোক বাস করে। যদিও তাহাদের দেশের বিস্তার আদৌ কম নহে, তথাপি ৬।০। ষ্টিফেন্ লিকক্ বলিয়াছেন, যে, কানাডা একটী শূন্যগর্ভ দেশ। অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যাও গ্রেটার লণ্ডন হইতে খুব বেশী না হইলেও অনেক প্রসিদ্ধ অষ্ট্রেলিয়ান বলিয়া থাকেন যে, সেখানে ২৩ মিলিয়ন লোক অনায়াসে থাকিতে পারে। অনেকে আবার বলেন যে সেখানে ১৫০ হইতে ২০০ মিলিয়ন লোক থাকিতে, নিউজিল্যাণ্ডের লোকসংখ্যাও ওয়েলসের চেয়ে ঢের কম।

সোভিয়েট রিপাব্লিক (ইউ, এস, এস, আর) বাল্টিক হইতে বেরিঙ্ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহা ইউরোপের ৪,৬০০,০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে ১,৮০০,০০০ বর্গমাইলই অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এসিয়ার ১৭,৪০০,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে ৬,৪০০,০০০ বর্গমাইলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ব্যাপার ছাড়াও দুইটী প্রধান প্রধান বিষয়ে ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে গরমিল রহিয়া গিয়াছে; যেমন, ইহার চতুর্দ্দিকে বরফ এবং স্থল পরিবেষ্টিত এবং ইহার একটী মাত্র রাজনৈতিক সীমা আছে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, লোকসংখ্যা ১৬১ মিলিয়ন এবং তাহার ১২৫ মিলিয়ন ইউরোপে বাস করে। এই বিরাট জন-সংখ্যা বাৎসরিক তিন মিলিয়ন হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে; কাজেই শীঘ্রই ইহা ২০০-র কোঠায় যাইয়া ঠেকিবে।

পরীক্ষিত ফরমুলা

এলুমিনাম এবং ইহার ব্যবহার প্রণালী

নিম্নলিখিত প্রণালীতে এলুমিনাম (Aluminium) দ্রব্যে রং করিতে হয়।

এলুমিনান একটী প্রয়োজনীয় ধাতু, ইহা শীঘ্র নষ্ট হয় না; কিন্তু ইহাতে খুব শীঘ্র ময়লা ধরিয়া যায়। সুতরাং ইহা যাহাতে পরিষ্কার থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত, এবং নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা পরিষ্কার করিতে হয়।

প্রথমে এলুমিনামের দ্রব্য, "কষ্টিক পটাস" (Caustic Potash) এর boiling bath এ ডুবাইবে; এবং কিছু সময় পরে উহা তুলিয়া লইয়া নাইট্রিক এসিডের (Nitric Acid) মধ্যে ডুবাইয়া ধৌত করিয়া লইবে। তারপর উহা শুকাইতে দিবে, এই প্রকারে এলুমিনাম দ্রব্য পরিষ্কার করিলে, ইহার প্রকৃত সাদা রং বাহির হইবে। কিন্তু এই প্রকারে এলুমিনাম পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বে দেখিয়া লইতে হইবে যে, এলুমিনাম দ্রব্যটী প্রকৃত এলুমিনামের কিনা; উহা যদি প্রকৃত এলুমিনামের না হয় অর্থাৎ উহাতে যদি অন্য কোন ধাতু দ্রব্য ভেজাল থাকে তবে উক্ত প্রণালীতে উহা ধৌত করিতে নাই।

যে সমস্ত এলুমিনাম দ্রব্যে ময়লা জন্মিয়া, ধূসর বর্ণ কিংবা অন্য কোন বর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত এলুমিনাম দ্রব্য পরিষ্কার করিতে হইলে, প্রথমে ৩০ ভাগ borax ১,০০০ ভাগ জলে গুলিয়া উহাতে কয়েক ফোটা ammonia মিশ্রিত করতঃ একটী মিক্‌চার প্রস্তুত করিবে, তারপর ঐ মিক্‌চারে এলুমিনাম দ্রব্য ধৌত করিয়া লইবে। ইহাতে এলুমিনাম পরিস্কৃত হয়, এবং ইহার প্রকৃত সাদা রং বাহির হয়।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে এলুমিনাম "Mat Silver" রং করা যায়।

প্রথমে কষ্টিক সোডা (Caustic soda ও Kitchen salt মিশ্রিত করতঃ উহাতে জল দিয়া একটী ১০ per cent সলিউসন প্রস্তুত করিবে, এবং উহা bathএ করিয়া গরম করিবে। তারপর ঐ গরম bath এর মধ্যে এলুমিনামের দ্রব্য প্রায় ১৫ সেকেণ্ড থেকে ২০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিবে। তারপর এলুমিনাম দ্রব্য ঐ bath এর ভিতর হইতে উঠাইয়া লইবে এবং ভাল করিয়া ধৌত করতঃ ব্রুস দ্বারা পরিষ্কার করিবে। তারপর ঐ এলুমিনাম দ্রব্য পুনরায় সেই গরম bath এর ভিতর প্রায় অর্দ্ধ মিনিট রাখিতে হইবে। এই

অর্দ্ধমিনিট পরে তুলিয়া লইয়া ঐ দ্রব্য পুনরায় ধৌত করিতে হইবে এবং Sawdust এর (করাতের গুঁড়া) মধ্যে রাখিয়া শুকাইয়া লইলে, এলুমিনাম দ্রব্যের "Mat Silver" রং হইবে।

এলুমিনাম দ্রব্যে কাল রং করিবার প্রণালী

(১) প্রথমে এলুমিনাম দ্রব্যের উপরিভাগ emery পাউডার কিংবা সূক্ষ্ম emery কাপড় দ্বারা ভাল করিয়া পালিশ করিবে, তারপর উহার উপরে খুব পাতলা করিয়া (thin layer) অলিভ্ তৈল মাখাইয়া এলকোহলের (alcohol) flame এর উপর ধরিয়া গরম করিয়া লইবে; আর যদি এলুমিনামের দ্রব্যটী খুব বড় হয় তবে উহা "চুলার" (oven) উপর হইতে গরম করিয়া লইবে। এই প্রকারে কিছু সময় গরম করিয়া ঐ এলুমিনামের দ্রব্যের উপর পুনরায় অলিভ তৈল (olive oil) লাগাইয়া কিছু সময় পর্য্যন্ত গরম করিলে ঐ দ্রব্যের রং প্রথমে বাদামী বর্ণের হইবে, তারপর উহার রং কাল হইবে। এই প্রকারে উহার বর্ণ যখন কাল হইবে তখন আগুনের উপর থেকে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দিবে এবং উহা ঠাণ্ডা হইলে উলের নেকড়া (woolen rag) কিংবা কোমল চামড়া (soft leather) দ্বারা পুনরায় পালিশ করিতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত ফরমুলা অনুযায়ীও এলুমিনাম দ্রব্যে কাল রং করা যায়। যথা—

white arsenic	১ আউন্স
Sulphate of iron	১ আউন্স
Hydrochloric acid	১২ আউন্স
Water	১২ আউন্স

প্রথমে arsenic এবং iron উপরোক্ত

এসিডের সাহায্যে গালাইয়া একটী সলিউসন প্রস্তুত করিবে। তারপর যে এলুমিনাম দ্রব্যের রং করিতে হইবে, সেই দ্রব্যটী ভাল করিয়া এমারী (emery) পাউডার দ্বারা পালিশ করতঃ ধৌত করিয়া arsenic এবং iron এর সলিউসনের মধ্যে ডুবাইবে, তারপর এলুমিনামের দ্রব্যে যখন বেশ ভাল ভাবে কাল রংটী ধরিয়া যাইবে, তখন উহা ঐ সলিউসনের মধ্য হইতে তুলিয়া উহাতে সূক্ষ্ম করাতের গুঁড়া (saw-dust) এবং lacquer লাগাইয়া শুকাইয়া লইবে, তাহা হইলে কাল রংটী আর নষ্ট হইবে না।

নিম্নলিখিত প্রণালীতেও এলুমিনাম দ্রব্যে রং করা যায়।

প্রথমে যে এলুমিনামের দ্রব্যগুলিতে রং করিতে হইবে, সেইগুলিতে ভাল করিয়া কষ্টিক সোডা লাই' (caustic soda lye) মাখাইবে, অথবা ৩ ভাগ সালফিউরিক এসিড ও ১ ভাগ জল একত্রে একটী এনামেলের পাত্রে করিয়া ১৪০° F থেকে ১৫৮° F ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম করতঃ ঐ তরল পদার্থের ভিতর এলুমিনামের দ্রব্যগুলি ডুবাইবে, তারপর উহা হইতে এলুমিনাম দ্রব্যগুলি উঠাইয়া জল দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিবে এবং ভাল ভাবে শুকাইয়া লইবে। তারপর ঐ এলুমিনাম দ্রব্যগুলি একটী bath এর মধ্যে রাখিবে এবং সেই bath এর ভিতর ১,০০০ ভাগ alcohol (৯০ per cent), ১,৫০ ভাগ antimony, ২৫০ ভাগ chemically pure hydrocloric acid, ১০০ ভাগ manganous nitrate এবং বিশুদ্ধ graphite ধৌত করিয়া ২০ ভাগ দিবে। তারপর ঐ bath টী ৮৬° থেকে ৯৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত গরম করিবে এবং এই প্রকারে গরম করিতে করিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এলুমিনাম দ্রব্যগুলির চারিদিক হইতে ধোঁয়া না বাহির হইবে ততক্ষণ ঐ দ্রব্যগুলি ঠিক ঐ অবস্থায় bath এর ভিতর থাকিবে, কিন্তু bathটী গরম করিতে আরম্ভ করিবার কয়েক সেকেণ্ড পরে bath-এর অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি গরম হইয়া যায় এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেইগুলি হইতে ধোঁয়া বাহির হয়, তখন এলুমিনামের দ্রব্যগুলি কয়লার আগুনের উপর রাখিতে হয়, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না alcohol পুড়িয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এলুমিনামের দ্রব্যগুলি উহার উপর রাখিতে হইবে। তারপর "এলকোহল" পুড়িয়া গেলে যখন আর ধোঁয়া থাকিবে না, তখন ঐ দ্রব্যগুলি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে রাখিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইবে, এবং উহার উপর ক্রস দ্বারা ঘসিবে। এইরূপ করিবার পর এলুমিনামের দ্রব্যগুলি জল দ্বারা ধৌত করতঃ ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে; এবং antimony, manganese এবং graphite একত্রে গালাইয়া, তাহার দ্বারা এলুমিনাম দ্রব্যগুলি মালিস করিবে, তারপর ১,০০০ ভাগ alcohol (৯০ percent) ৫০ ভাগ Sandarac, ১০০ ভাগ Shellac এবং ১০০ ভাগ negrosine (black aniline colour) একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী বার্ণিশ প্রস্তুত করতঃ ঐ এলুমিনামের দ্রব্যগুলিতে লাগাইবে; এবং তাড়াতাড়ি এলুমিনামের দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণভাবে ধৌত করিয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত গরম বাতাসে রাখিয়া শুষ্ক করতঃ অল্প আগুনের সাহায্যে গরম করিয়া নিবে, অবশেষে একখানি cotton rag তরল linseed oil

varnishএ ভিজাইয়া তাহার দ্বারা এলুমিনামের দ্রব্যগুলি ভাল করিয়া ঘসিবে; এবম্বিধপ্রকারে পরিষ্কৃত এলুমিনামের দ্রব্যগুলি দেখিতে প্রায় "ভেল্‌ভেটের" ন্যায় হইবে এবং উহার covering কোন প্রকার জল বাতাসে নষ্ট হইবে না। সুতরাং রন্ধন করিবার পাত্রগুলিতে এই প্রকারে বার্ণিশ লাগাইয়া লইলে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। উপরোক্ত প্রণালীতে পরিষ্কার এলুমিনামের দ্রব্যে নানাবিধ রং করা যায়। কিন্তু প্রথমে উপরোক্ত প্রণালীতে এলুমিনামের দ্রব্যগুলিতে বার্ণিশ না করিয়া রং করিলে সেই রং অধিক দিন স্থায়ী হয় না। এলুমিনামের দ্রব্যের দৃঢ়তা এবং স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করিতে হইলে aluminiumএর সহিত ৪ থেকে ৭ percent এর phosphorus মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। ইহাতে এলুমিনামের specific gravityর বৃদ্ধি হইবে না, অথচ উহার দৃঢ়তা এবং স্থায়ীত্ব বাড়িয়া যাইবে।

দুনিয়ার দেশলাই-ব্যবসা এবং সুইডিস্ ট্রাষ্টের সহিত ইহার সম্পর্ক

দুনিয়াতে দেশলাইয়ের যত চাহিদা আছে, তাহার এক পঞ্চমাংশ একমাত্র সুইডেন হইতে তৈয়ারী হয়। ইহার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাদের কাছে এখন যে-সমস্ত তথ্য আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঠিক করিয়া বলা চলে না যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমূহ কি পরিমাণ সুইডিস্ দেশলাই ব্যবহার করিয়া থাকে ; কেননা, অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় ইহাও সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্ট এবং তাহার ব্রাঞ্চগুলির খপ্পরেই রহিয়া গিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উক্ত কোম্পানী এবং উহার শাখা সমূহ প্রায় ৬০ হইতে ৭০ হাজার লোক নিযুক্ত করিয়া পৃথিবীর ম্যাচের চাহিদার প্রায় ⅔ অংশ পূরণ করিয়া থাকে।

সুইডেনের ট্রাষ্ট

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের বৃহত্তম দুইটী দেশলাই-এর কারখানা—জঙ্কোপিং কোম্পানী এবং ভালকান ম্যাচ্ ওয়ার্কস একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ৪।৫টী কোম্পানী ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত আরো ১১টী কোম্পানী ইহাদের সঙ্ঘের বাহিরে থাকিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে ম্যাচ্ সরবরাহ করিত ; কিন্তু বিরাট প্রতিপত্তিশালী সুইডিস্ ট্রাষ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ইহারা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ১৯১৩ সনে মেসার্স ক্রুগার এণ্ড টল্ কোম্পানীর আইভর্ ক্রুগার সাহেব "ইউনাইটেড্ সুইডিস্ ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী" নামে একটী কোম্পানী স্থাপন করিয়া বাকী ফ্যাক্টরীগুলি নিজের তাঁবে আনেন। এইরূপে সুইডেনের সমস্ত দেশলাইয়ের কারবার দুইটী কোম্পানীর হাতে আসিয়া পড়ে। ১৯১৭ সালে এই দুইটী কোম্পানী মিলিয়া এক হইয়া যায়, এবং মিঃ আইভার ক্রুগার এই যুক্ত-কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ নিযুক্ত হন ; কোম্পানীর মূলধন তখন ছিল ৩,৪০,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উহা বাড়াইয়া ৬,৫০,০০,০০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ৫ মিলিয়ন পাউণ্ডে দাঁড় করানো হয়। তখন ২০ পার্সেণ্ট প্রিমিয়ামে নূতন নূতন অনেক সেয়ারও বিক্রী করা হয়। ১৯২৭ সালে উহার মূলধন বাড়াইয়া ১৯,৫০,০০,০০০ টাকা (১৫ মিলিয়ন পাউণ্ড) করা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশলাই-এর ব্যবসা ট্রাষ্টের হাতে আসিয়াছে। উহা ১৩টী ফ্যাক্টরীর উপর কর্তৃত্ব করা ছাড়াও, কাগজের কল, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী, করাত কল প্রভৃতি নিজেদের হেপাজতে রাখিয়াছে। সুইডেনেই একলক্ষ একর বিস্তৃত বন ইহার তাঁবে রহিয়াছে ; নানান জায়গা হইতে কাঠ কাটিয়া লইবার অধিকারও ইহারা অর্জ্জন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফিনল্যাণ্ড্

কষিয়া, পোলাণ্ড এবং বাল্টিক ভূভাগের অ্যাস্পেন বৃক্ষ কিনিবার জন্ম ইহাদের সত্ত্ব রহিয়া গিয়াছে। ক্লোরেট অব্ পটাস্ এবং ফস্ফরাস্ প্রস্তুত করিবার জন্ম ইহাদের সুইডেনস্থ অ্যালবি এবং ট্রলহট্টন ফ্যাক্টরীগুলিও খুব ছোট নয়। ট্রাষ্টের হাতে সুইডিস্ পাল্প্ কোং'র কর্তৃত্বও রহিয়া গিয়াছে।

ট্রাষ্টের সুইডেনে ম্যাচ্ প্রস্তুত

১৯২৯ সনে ট্রাষ্ট নিজের দেশে ৫১,০০০ মেট্রিক টন ম্যাচ্ প্রস্তুত করিয়াছিল—উহা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় শতকরা ছয় পার্সেণ্ট বেশী; ১৯২৯ সনে ৪৯,০০০ মেট্রিক টন বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছিল—যাহার আনুমানিক মূল্য ৩,৪০,৫৫,০০০ কোটি টাকারও বেশী। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়,যে ৫১,১৯২০ সনের পরে আর এত বেশী মাল বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। নীচের হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কি পরিমাণ দেশলাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া সুইডেনের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে।

প্রতি হাজার টাকা

১ নং

গন্তব্য স্থল	১৯২০	১৯২২	১৯২৪	১৯২৬	১৯২৮
গ্রেট বৃটেন	৩০৪৪০	৩৫৬০	১৫৮৩৮	১৩৯১১	১৫৫৬৮
নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ্	১৯	৪০৯৪	১৯৯১	৩৪৮৩	৪৯৭৬
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	২৬০৯	৪২৯০	২৮৬৪	৩৩৪৪	২৪৬৯
চীন	২৫১	৬২৭	৭৪৮	৬৮৪	২৩২১
নেদারল্যাণ্ড	৩৬৬৪	৩৮১২	২৬২৩	১৬৩৭	১৬৬২
ফ্রান্স	৪৩২	৭৫৬	৭১৪	৩৮১	৯৫৯
গ্রীস	১২৯০	১৬৭৭	১২২৩	৭৫১	৬৭৮
ইউরোপীয় তুরস্ক	২০০	৩৬১	—	—	৩৭৩
অন্যান্য দেশসমূহ	১২৫০৬	১৪১৯৬	৫৬৬	১৬৮৫	৯২৬
মোট	৫১৪১১	৩৩৩৭৩	২৬৫৬৯	২৫৮৭৬	২৯৯৩২
মেট্রিক টন	৩৪৭৫৭	২৪৯৮৯	২৬০৫০	২৬৭৬২	৪৩০৬০

সুইডিস্ ম্যাচ্ ইণ্ডাষ্ট্রি সর্ব্বতোভাবেই তাহার রপ্তানীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ১৯৩০ সালে যাহারা সুইডেনের সেফ্টি ম্যাচ্ আমদানী করিয়াছিল, নিম্নে তাহাদের ব্যবহার প্রাধান্য হিসাবে একটা শ্রেণী বিভাগ করা হইল:—

গ্রেট বৃটেন এবং উপনিবেশ সমূহ	১৬,৭২৩	মেট্রিক টন
চীন	৬,৪২৪	” ”
নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ্	৩,৬২০	” ”
ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্	৩,২৮২	” ”
নেদারল্যাণ্ডস্	২,৫৬০	” ”

অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত

১৯২৩ সনে সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্ট্ আমেরিকা, ইউরোপ এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থলে যে-সমস্ত ফ্যাক্টরী গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং নানারকম সুবিধা ভোগ করিতেছিল—তাহার কিয়দংশ আমেরিকাস্থ দেলবরে সঙ্ঘবদ্ধ ইণ্টারন্যাশন্যাল্ ম্যাচ্ কর্পোরেশনকে হস্তান্তরিত করে। এই কোম্পানীর অধিকাংশ সেয়ারই ট্রাষ্টের হাতে রহিয়া গিয়াছে এবং ইহা ১৫০ ফ্যাক্টরীর উপর কর্তৃত্ব করে। এই ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রায় ৫০ হইতে ৬০ হাজার লোক কাজ করে এবং ইহা কানাডা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচ্যভূখণ্ডের ২৮টী দেশে স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কোম্পানী দুইটীর মূলধনের পরিমাণ দেখিয়া উহার আন্তর্জাতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশী পরিষ্কার ধারণা হইবেনা। মূলধন বাড়াইবার জন্য এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক সুবিধা যথাসম্ভব আদায় করিয়া লইবার জন্য, কোম্পানীর মূলধনের বেশীভাগই "বি"-ক্লাশ সেয়ারে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। সুইডিস্ আইন অনুসারে সুইডিস্ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর বিদেশী ভোটদাতাদের সংখ্যা স্বদেশীদের ½ অংশের বেশী হইতে পারিবে না। লভ্যাংশ প্রত্যেকেই সমানভাবে পায় বটে ; কিন্তু প্রত্যেক সেয়ারে ১০০০ ভোটাংশের বেশী মিলে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীরাই কোম্পানীর মূলধন বেশীরভাগ জোগান দিলেও, সুইডিস অংশীদারগণই কোম্পানীর একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রারম্ভের ৭ বৎসর পরে—১৯১৫ খৃঃ অঃ—সুইডিস্ ম্যাচ্ কোম্পানীর স্থায়ী আমানত হইয়াছে ৬,১৭,৫০,০০০ টাকা অর্থাৎ ৪½ মিলিয়ন পাউণ্ড। ইহার সঙ্গে ইণ্টারন্যাশন্যাল ম্যাচ্ কর্পোরেশন, স্থানীয় ও বিদেশস্থ শাখা কোম্পানীগুলির রিজার্ভও প্রয়োজনমত মূল কোম্পানীর স্থায়ী আমানতের সঙ্গে যোগ হইতে পারিবে। এই বিরাট শক্তি লইয়া কেবল যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অনেককাল ধরিয়া অন্যান্য কোম্পানীর সঙ্গে যুঝিয়া যাওয়া চলে তাহা নহে, পরন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারেও অনেক ক্ষমতা বিস্তার করা সহজেই সম্ভবপর হয়।

ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য

ট্রাষ্টের উদ্দেশ্য, পৃথিবীর বাজার দখল করিয়া লইয়া ইচ্ছানুসারে দামের হ্রাসবৃদ্ধি করা।

ট্রাষ্টের কার্য্যপ্রণালী

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোম্পানীর কর্ত্তারা কিরূপভাবে কাজ করিয়া থাকেন, নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে :—

(১) যেখানে অবস্থা অনুকূল বলিয়া মনে করেন, সেখানে তাহারা সোজাসুজি দেশলাইয়ের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইবার চেষ্টা করেন।

(২) অনেক সময় দেশের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া, কোন কোন গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে এই অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত গভর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করিবার জন্য

তাহারা মাঝে মাঝে অল্প সুদে টাকা ধারও দিয়া থাকেন।

(৩) যেখানে ট্যারিফের জন্য ইহা সম্ভবপর নয়, সেখানে তাহারা নূতন কোম্পানী স্থাপন করেন কিংবা সম্ভবপর হইলে স্থানীয় পুরাতন কোম্পানীগুলিকে নিজেদের তাঁবে আনিতে চেষ্টা করেন। তারপরে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাজার দখল করিবার চেষ্টা করা হয়। উহাতে ব্যর্থমনোরথ হইলে দেশলাইয়ের দাম এমনভাবে কমাইয়া দেওয়া হয়; যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীগুলির অস্তিত্ব লোপ হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকেনা।

পৃথিবীর বিভিন্নাংশে ট্রাষ্টের সুবিধা বা কনসেসন্ আদায়

ট্রাষ্ট যে-সকল গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে নানা রূপ সুবিধা পাইয়াছে, তাহাদের অনেককেই উহারা অল্প সুদে বেশী টাকা ধার দিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন দেশে ট্রাষ্ট কিরূপ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছে, তাহা জানা কৌতূহলপ্রদ হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

গ্রেট বৃটেনে

১নং এর তালিকাদৃষ্টে উপলব্ধি হইবে যে ইংলণ্ডে যে-সমস্ত দিয়াশলাই'য়ের রপ্তানী হয়, তাহার বেশীর ভাগই আবার লণ্ডন মারফৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালান হইয়া যায়। ১৯২৯ সালে রপ্তানীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই লণ্ডনের মারফৎ হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ সুইডিস্ ম্যাচ্ কোম্পানী এবং বৃটেনের শ্রেষ্ঠ কোম্পানী —ব্রায়াণ্ট এণ্ড্ মে লিমিটেড্—অনেক বৎসর ধরিয়া কাঠ এবং কাঁচা মাল ক্রয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিল। ভারতবর্ষ এবং এসিয়ার বিভিন্ন অংশ বাদ দিয়া, ইংলণ্ডে উভয় কোম্পানীর স্বার্থ জড়ীভূত করিয়া একটী চুক্তিপত্র ১৯২৭ সালের ১লা জুলাই করা হয়। এই নূতন কোম্পানীর নাম দেওয়া হয় বৃটিশ ম্যাচ্ কর্পোরেশন লিমিটেড। ৮,১২,৩১,০০০ টাকা অর্থাৎ ছয় মিলিয়ন পাউণ্ড মূলধন লইয়া ইহার কর্ম্মকর্ত্তারা ব্রায়াণ্ট এণ্ড মে লিমিটেডের সমস্ত মালপত্র, জন মাষ্টার্স লিমিটেডের সমস্ত সেয়ার এবং সুইডিস ম্যাচ্ কোম্পানীর বৃটিশ সাম্রাজ্যান্ত কতকাংশ ফ্যাক্টরী করতলগত করিয়া লইয়া কাজ সুরু করিয়া দেন। সুইডিস্ ম্যাচ্ কর্পোরেশন প্রত্যেক সেয়ার বাবদ এক পাউণ্ড দিয়া ১,৮০০,০০০টী সেয়ার ক্রয় করে —ইহা সমস্ত মূলধনের শতকরা ৩০ ভাগ। বাকী ৭০ পার্সেণ্ট সেয়ার ব্রায়াণ্ট এণ্ড্ মে লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব সেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। এইরূপে সমস্ত কর্পোরেশনটি ইহার অধীনস্থ শাখা কোম্পানীগুলির মারফৎ যে কেবল গ্রেট বৃটেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডেই প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রেজিলএর ন্যায় সুদূর দেশের দেশলাইয়ের ব্যবসাও দখল করিয়া বসিয়াছে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অফ্ আমেরিকা

ইণ্টার ন্যাশনাল ম্যাচ্ কর্পোরেশনের শাখা ভালকান্ ম্যাচ্ কোম্পানী সুইডেন হইতে রপ্তানী দেশলাই আমেরিকাতে চালান দিত। ভালকান ম্যাচ কোম্পানী নিজেরা কিছুই প্রস্তুত করিত না। আমদানী দেশলাইয়ের উপর ৮ হইতে ২০ সেণ্ট শুল্ক ধার্য্য হওয়ায় ব্যবসা

ক্রমাগত মন্দা পড়িয়া যায় এবং বাধ্য হইয়া ট্রাষ্ট আমেরিকাতে ফ্যাক্টরী স্থাপন করিবার কথা ভাবিতে থাকেন। একসময়ে গুজব উঠিয়াছিল যে মেসার্স ক্রুগার এণ্ড্ টল্ আমেরিকার ডায়মণ্ড ম্যাচ্ কোম্পানীর অনেক সেয়ার ক্রয় করিয়া লইতেছেন; কিন্তু শেষে উহা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। ১৯৩১ সনের নভেম্বর মাসে ক্রুগার এবং টলের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। তখন আমেরিকার তৃতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানার নাম ছিল ফেডারেল ম্যাচ্ কর্পোরেশন; উহাকে তাহারা, নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ফেডারেল ম্যাচ্ কর্পোরেশন দখল করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রুস্‌বর্গ, বেলকস্ত্, পল ডুলুথ, জোলিয়ে, স্পোকানে অবস্থিত আধুনিক ফ্যাক্টরীগুলিও উহারা স্বকীয় ট্রাষ্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। সমস্ত ফ্যাক্টরীগুলিই "সেফ্‌টি ম্যাচ্" প্রস্তুত করিতে থাকিল বটে; কিন্তু উহা রপ্তানী করিবার ভার রহিল ভালকান্ ম্যাচ কোম্পানীর উপর।

(ক্রমশঃ)

ব্যবসায় ও বাঙ্গালী

বাবুত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় শিক্ষিত বাঙ্গালী দেশের শিল্পব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতেছেন—আর ইহা দেখিয়া অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বাঙ্গলার ডিগ্রীধারী যুবকগণ এরূপ বিশেষ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছেন যে, শিল্প ব্যবসায়ী সমাজের সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার যোগ রহিতেছে না। বাবুদের সন্তান সন্ততিরাও যে কোন ব্যবসায়ীকে "তুমি" সম্বোধন করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না! তাঁহারা ভাবিবার সুযোগ পান না যে, ঐ ব্যবসায়ী তাঁহার চেয়ে অধিকতর মর্য্যাদা সম্পন্ন হইতে পারেন। আধুনিক সভ্যতা, জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করিতে পারুক আর না পারুক জাতিকে অযথা গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছে যথেষ্টই।

একটি প্রকৃতঘটনার কথা বলিতেছি। কোন সময়ে কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি একটী যৌথ ব্যবসায় পরিচালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধান চাল ও কাগজের ব্যবসায় করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমার কোনও বন্ধু অযাচিতভাবে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে পূর্ব্ব হইতে যাহারা এ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, এমন দুই একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর পরামর্শ লইয়া তৎপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভাল। ইহাতে সভাপতি মহাশয় উত্তর করিয়াছিলেন যে, এখানে আমরা এত বড় বড় সব লোক উপস্থিত থাকিতেও ঐ ক্ষুদে দোকানীর পরামর্শ লইতে হইবে, বল কি হে? বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় অলীক গর্ব্বস্ফীত বাবুগণ ২ বৎসরের মধ্যেই যথাসর্ব্বস্ব লোকসান দিয়া এই কারবার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই অহৈতুকী অহঙ্কার আমাদের ব্যবসায়ে বিফলতার একটী প্রধান কারণ আছে।

বাঙ্গালী প্রথমেই বহু আড়ম্বর সহকারে বড় বড় ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়াও অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিশ্রম করাকে আমরা ঘৃণা ও লজ্জাজনক মনে করি, এজন্য কর্ম্মচারী দ্বারা ব্যবসায় ক্ষেত্রের কাজ চালাইয়া আমরা অলীক আত্মসম্মান বজায় রাখিতে চাই। একেত বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না, তারপর এইরূপ ব্যয় বাহুল্য! নূতন কারবার অনেক স্থলেই এই দুই ত্রুটীতে ধ্বংস হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে হইলে, ছোট হইতে বড় হওয়ার চেষ্টা করাই সমীচীন। তাহাতে সফলতা লাভ না হইলেও বিপদের ভয় কম। এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যবসায় করিতে যাওয়াতেই বাঙ্গালীর বহু যৌথ কারবার অকালে ধ্বংস হইয়াছে। ব্যবসায়ের বাহ্যিক জাঁকজমক বজায় রাখিবার দায়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে লালসায় অধিক লাভের চেষ্টা করিতেও দেখিয়াছি। একই বাজারে একই চালের দাম একই সময়ে বাঙ্গালীর দোকান অপেক্ষা মাড়ো-

য়ারী দোকানে অপেক্ষাকৃত অল্প, হয়ত অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

কর্ম্মচারী রাখিলে, সে কাজ করিবে পরের কাজ মনে করিয়া—নিজের কাজ মনে করিয়া যথেষ্ট সচেতন ভাবে কথনও নহে; সুতরাং তাহার কার্য্যে ক্রটী বিচ্যুতি থাকা বহুস্থলেই সম্ভবপর—আর সেক্রটী ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট প্রতিকূল হইয়া থাকে। এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে। বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সমধিক চতুর--ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রভুর কার্য্যে ফাঁকি দিয়া থাকে, ইহা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাও ব্যবসায়ের উন্নতির প্রবল অন্তরায়।

পক্ষান্তরে বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীরা শ্রমদক্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু। আত্মরক্ষার্থে তাঁহারা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে মর্য্যাদা হানি বোধ করেন না। এজন্য ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রসার প্রতিপত্তি সহজেই আয়ত্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ও অল্পতর। তাঁহাদের খাদ্য পরিধেয় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। যে মাড়োয়ারী ব্যবসায় দ্বারা মাসে ৫০।৬০ টাকা উপায় করেন, তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ ও গৃহের আসবাবপত্রের সহিত ৩০।৩৫ টাকা বেতনের বাঙ্গালী কেরাণী বাবুর পরণপরিচ্ছদ ও গৃহসামগ্রীর তুলনা করিয়া দেখিলে, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে। তারপর ধনবান হইলেও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর ব্যয়ের হস্ত যথেষ্ট সংযত থাকে। হইতে পারে ইহা কৃপণতা, কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহা উন্নতিজনক। আর বাঙ্গালীর অর্থনীতি জ্ঞান এসকল বিষয়ে শিথিল বলিয়াই তাঁহারা দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে অক্ষম। জীবন ধারণে ব্যয় বাহুল্যের আবশ্যকতা না থাকায় অবাঙ্গালীরা যেরূপ অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে পারেন, বাঙ্গালী তাহা পারেন না। হিন্দুস্থানী রজক কৌরকার, মজুর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতে কাজ করিতে স্বীকার করিয়াই বাঙ্গলার সমধিক আদৃত হইয়াছে।

একতা অবাঙ্গালীদের আর একটী বিশেষ গুণ। আপদ-বিপদে, অভাব-অনটনে তাঁহারা যে-ভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেন, আমাদের তাহা অনুকরণ করা উচিত। এক মাড়োয়ারী দেউলিয়া হইলেও অন্যান্য মাড়োয়ারী তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ধারে কাপড় দিয়া ব্যবসায় চালাইতে সাহায্য করেন। কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীকে কুত্রাপি এরূপ করিতে দেখা যায়; বাঙ্গালীকে বরং ঈর্ষাপরায়ণই দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই বাঙ্গালী সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকে না। এক সংবাদপত্রে অন্য সংবাদপত্রের কুৎসা কীর্ত্তিত হয়, এক নেতা অন্য নেতাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের এই রেষারেষি সমধিক প্রবল। কোনস্থানে কোন বাঙ্গালী যদি ব্যবসায় দ্বারা দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন আর পাঁচ জন তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ান। একজন একটী ব্যবসা করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে দেখিলে আর পাঁচজন ঠিক তারই আশেপাশে একই ব্যবসায় পাতিয়া বসেন। ছোটখাট ব্যবসায় হিসাবে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে-মোড়ে এমন কি, প্রত্যেক অলিতে গলিতে ডাইংক্লিনিং-এর দোকান, চায়ের দোকান, টেলারিং, রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতির দিকে তাকাইলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। একজনের উপার্জ্জন ৫ জনে কাড়াকাড়ি

করিয়া ভোগ করা অপেক্ষা অন্য নূতন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা যে সমধিক লাভজনক প্রতিযোগী ব্যবসায়ীরা প্রায়ই ইহা ভাবেন না। ইহার ফলে কাহারও ব্যবসা ভাল চলে না। এরূপ স্থলে পরিশেষে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারেন না, এরূপও সময় সময় দেখিয়াছি।

অবাঙ্গালীর আর এক গুণ স্বাবলম্বন বাঙ্গলার যুবকেরা লেখাপড়া শিখিয়া চাকরীর উমেদারী করিতে গিয়া যথেষ্ট অপব্যয় করেন। আর চাকরী না পাওয়া পর্য্যন্ত পরিবারের বা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া দিন কাটাইতে আদৌ সঙ্কুচিত হন না; কিন্তু অবাঙ্গালীরা আত্মরক্ষার্থে সহজে অন্যের উপর নির্ভর করেন না। চাকরী অভাবে বসিয়া থাকা অপেক্ষা, অন্য কোন কার্য্য করিয়া তাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করেন—এরূপ অবস্থায় তাঁহারা প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিণামে তাহাতে সফলকাম হন।

উন্মুখ যৌবনে অনেকের স্কন্ধেই সংসারের চাপ থাকে না, কার্য্যকরী শক্তিও সতেজ থাকে। এই সময়ে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, সহজেই তাহাতে সফলতা লাভ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অমূল্য সময়টাই বাঙ্গলার যুবকেরা দাসত্বের লালসায় অনর্থক অপচয় করেন। শেষে জীবিকা অর্জ্জন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবার পালনের ভার প্রাপ্ত হইলে, অনেককেই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। যে পরিমাণ চেষ্টা চাকরীর জন্য করা হয়, তাহা ব্যবসার জন্য করিলে, বাঙ্গলার যুবকেরা পূর্ব্বাহ্লেই সংসার ভার বহনের সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়া লইতে পারেন।

ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা বলিলেই সাধারণতঃ অর্থাভাবের আপত্তি উত্থাপিত হয়। কিন্তু প্রায় বিনা মূলধনেও যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায় করিয়া লাভবান হওয়া যায়, তাহার বিস্তারিত আলোচনা বহুবার দেখাইয়াছি। বহু অবাঙ্গালী যে নিতান্ত সহায় সম্বলহীন ভাবে এ-দেশে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রসার করিয়া লইতেছেন, ইহাই আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—ইহা আমাদের দেশের একটী প্রবাদ বাক্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা, পার্শী, মাড়োয়ারী প্রভৃতির সম্পদশালিতাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যবসায়ের প্রতি অবহেলার ফলেই, লক্ষ্মীদেবী বাঙ্গলার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, বাঙ্গলার ধনবল শোচনীয়রূপে হ্রাস পাইয়াছে। দেশের অভাব মোচন করিতে হইলে, জাতির অর্থবল বৃদ্ধি করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ইহা বুঝিয়া বাঙ্গালীকে এ-ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে। যে-সকল গুণে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী বাঙ্গলার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে হইবে। বাঙ্গালীর মত প্রতিভাবান জাতির পক্ষে তাহা করা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য নহে; শুধু চাই আন্তরিক আগ্রহ।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে সফলতা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া নিন্দনীয় ঈর্ষা দ্বেষ জাত প্রচার কার্য্য দ্বারা বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণকে পরাজিত করা সম্ভব হইবে না—ইহাতে আমরা যে কেবল তাহাদের সাহায্য সহানুভূতি হইতেই বঞ্চিত হইব তাহা নহে, অধিকন্তু কঠোর আঘাত তাঁহাদিগকে সমধিক একতাবদ্ধ করিবে; তাঁহারা এদেশে অধিকতর প্রতিপত্তিলাভে উত্তেজিত হইবেন। ব্যবসায়েচ্ছু বাঙ্গালীর ভুলিয়া যাওয়া উচিৎ নয় যে, সমগ্র জাতির সাহায্য সহানুভূতি তাঁহাদেরই পশ্চাতে অবিচলিত আছে—ইহা অবশ্যই তাঁহাদের সফলতা লাভের পথে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইবে।

শ্রীকেশবলাল বিদ্যারত্ন

ইন্‌সিওরেন্স ক্ষেত্রে বিক্রয় পটুতা

বিক্রয় পটুতা বা সেল্‌সম্যানসিপ শব্দটা বড় বেশী ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক বিক্রয়ের ব্যাপারেই তিনটি জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—বিক্রেতা কিংবা তাহার প্রতিনিধি, ক্রেতা এবং পণ্যদ্রব্য। বিক্রয়পটুতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই এই তিনটি বিষয়ের কথা আগেই মনে হইবে। ইন্‌সিওরেন্স জগতে যাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ইন্‌সিওরেন্স এজেন্ট একটা সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়া আছেন—আজ তাঁহাদের সম্বন্ধেই কিছু কথা বলিবার ভরসা করি। কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল, যে, আমি যতদূর সম্ভব, বিক্রেতা অর্থাৎ এস্থলে ইনসিওরেন্স কোম্পানী এবং পণ্যদ্রব্য—এস্থলে, ইন্‌সিওরেন্স পলিসি—ইহাদের কথা আজ যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিব ; ক্রেতার কথাও খুব বেশী আলোচনা করিব না। বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবন বীমার ধারা লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করা এবং সেইজন্যই অগ্নি বীমা, নৌ বীমা এবং দুর্ঘটনার বীমা-সম্বন্ধীয় কোন কথার আলোচনাও করিতে চাহি না।

বাস্তবিক পক্ষে, জীবন বীমা এবং অন্যান্য ইনসিওরেন্সের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়া গিয়াছে। জীবন বীমাতে কত টাকা দিতে হইবে তাহা পূর্ব্বাহ্নেই জানা থাকে, মাঝে মাঝে শুধু জমার টাকার অঙ্কে বোনাস্ যোগ হয়। ইহার মধ্যে শুধু অজ্ঞাত থাকে, বীমাকারীর মৃত্যুর তারিখ (ভগবান তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবি করুন!)। বর্ত্তমানযুগের জীবনবীমার পলিসি কেবল যে মৃত্যুর দায়িত্ব ঘাড়ের উপর তুলিয়া লয় তাহা

নহে, উক্ত পলিসি ফলপ্রসূ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রিমিয়ামের ভারও উহাকে বহিতে হয়। অন্যান্য ইন্‌সিওরেন্সের জগতে সব দিকেই বেতাল। কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে, বিপদ বীমার যে প্রিমিয়াম দেওয়া হয়, তাহার পরিবর্ত্তে ঘরে ফিরিয়া আসে যৎসামান্য। অনেক দিন ধরিয়া প্রিমিয়াম দিলেও, তাহা গ্রাহের সীমানায় আসিবার উপযুক্ত হয় না। জীবন-বীমার সংজ্ঞা এবং কার্য্য নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দ্দিষ্ট বৎসর কিংবা জীবন ভরিয়া চলিতে পারে; অন্যদিকে শুধু এক বৎসর কিংবা তাহারও কম সময়ের জন্য কণ্ট্রাক্ট চলিতে পারে।

সাধারণ গুণের তালিকা

আধুনিক ভারত, জীবন বীমা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। আজ ইনসিওরেন্স এজেন্টগণ যে ইমারতের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছেন, কাল তাহা সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিবে বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে। বিক্রয় পটুতাও যে বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতার যুগে একটী বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উহার মনোজ্ঞ বিশেষত্বটুকু সেইভাবেই শিক্ষা করা দরকার যেমন করিয়া আমরা লাল-নীল-পেন্সিল রেখাঙ্কিত নোট বুক মুখস্থ করিয়াছি। শুধু তফাৎ এই, যে, এখানে মুখস্থ করিলে কিংবা ভাবের ঘরে চুরি করিলে চলিবে না—বিশ্বের পাঠশালায় ঠেকিয়া ঠেকিয়া হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা করিতে হইবে। কাহারো কাহারো জন্মগত অধিকার আছে এবং তাঁহারা তাহার জোরেই কার্য্যক্ষেত্রে তড়িৎগতিতে অগ্রসর হইতে পারেন; কিন্তু বেশীর ভাগ লোককেই সমস্ত ব্যবসাটাকেই শিখিয়া আয়ত্বাধীন করিতে হইবে। যাত্রাপথে চলিতে চলিতে পায়ে অনেক কাঁটা বিঁধিবে সত্য; কিন্তু সোজা ও সঠিক পথ ঘুরিতে ঘুরিতেই পরিচিত হইয়া যাইবে। এইরূপে নিজের উপর বিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা জাগ্রত হইয়া উঠিবে। যাহাদের পূর্ব্বের শিক্ষা দীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইনসিওরেন্স জগতের অনুকূল হইয়া গঠিত হয় নাই, তাহাদেরও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কেন না, এমার্সন বলিয়াছেন, "What one man has done another man can do" কিংবা "Nature n.ver sends any man into the planet w.thout confiding his secret to another soul."—একজন মানুষ যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে, অপর একজন কেন তাহা পারিবে না?

অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটী জিনিষের বেশী দরকার—তাহা হইতেছে, কল্পনা বা মনন-শক্তি। আমরা কবিদের মহলে অনধিকার প্রবেশ করিতে চাহি না; কিন্তু ব্যবসা গড়িতে হইলে যে কল্পনার জোর থাকা আবশ্যক, তাহা কবিরাও হয়তো স্বীকার করিবেন। ব্যবসা গড়িবার জন্য এবং নিজের অবস্থা উন্নততর করিবার জন্য চাই অমলিন সঠিক কল্পনা-শক্তি; উহাকে রশ্মি জুড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামাইলেই সত্যিকার কবিত্ব করা হইবে।

অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী এবং বাধাবিঘ্ন

আমার মতে, উৎসাহই বিক্রয়-পটুতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্ধন। ঔপন্যাসিক শরৎবাবুর ভাষায় "কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকাকে টানিয়া লইয়া যায়," তেমনি এজেন্টের জলন্ত উৎসাহ ও তাহার সংস্পৃষ্ট ব্যক্তির মনে-মনে তীব্র উদ্যমের ছোঁয়াচ লাগাইয়া দিয়া যায়, বীমাকর্ম্মীর এইটুকুই প্রথম

লাভ। তাহার পরে বীমাকারী আস্তে আস্তে নিজেই দলে ভিড়িতে থাকিবেন। মানুষের স্বভাব ও মনস্তত্ব সম্বন্ধে যাহার সঠিক জ্ঞান আছে, এবং যিনি ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'ফরওয়ার্ড'—তাহার সুবর্ণ সুযোগ আসিতে বিলম্ব হয় না। বাধাবিপত্তির ধাক্কায় তাহার অগ্রগতির পথ কখনো অবরুদ্ধ হয় না।

এই লাইনে সকলের চেয়ে বেশী প্রতিবন্ধক লইয়া আসে—হতাশা। যে সহজেই নিরুৎসাহ হয়, তাহার এ পথে "প্রবেশ নিষেধ"। এখানে অনন্ত উৎসাহ উত্তম চাই, প্রফুল্লতা এবং আশা চাই—পরাজয়ে চিৎ খাইয়া গেলে চলিবে না, নতুবা এখানে আসা বিফল। বিক্রয়-পটুতার অগ্নিপরীক্ষা হয় বাজার তৈয়ার করাতে এবং যিনি যাহা চাইবেন বলিয়া ভাবেন নাই, তাহার কাছে ঠিক তাহাই বিক্রয় করাতে!

মনোমদ ব্যবহার, বন্ধুবান্ধবকে সাহায্য করা—এইরূপেই বীমাকারীদের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং প্রচুর কাজ আসিতে থাকে। এজেন্টদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্য দিক দিয়া বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত না হইলেও, এই সব গুণের জন্যই তাহাদের মধ্যে অনেকে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকার ব্যবসা করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে কর্ম্মই জাগ্রত-স্বপন, চিন্তা ও ধ্যানের বস্তু। ইহার সঙ্গে যদি কর্ম্মঠ চেহারা, কাজ করিবার স্পৃহা, সহজ বুদ্ধি, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা, উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস থাকে—তাহা হইলেই সোণায় সোহাগা হইল।

ক্যানভাসিং—পূর্ব্বাভাষ

জীবন বীমার এজেন্সী গ্রহণ করিতে হইলে, পূর্ব্বাহ্নেই নিজেকে জানিতে হইবে—এ ঠিক সেই উপনিষদের "আত্মানং বিদ্ধি"র মত। নিজের বিশেষত্বটুকু কাজের কষ্টিপাথরে ঠিক রঙ্ ফলাইয়া তুলিতে পারিবে কিনা, তাহা জানা বিশেষ দরকার। সাহস এবং নিশ্চয় কৃতকার্য্যতার আশাই নিজের পুরস্কার বহন করিয়া লইয়া আসিবে—ভীরু এবং অনিশ্চুক লোকের বীমা জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে নাম করিবার কোনই ভরসা নাই। মুখের মিষ্টি হাসি অনেক সময় বক্তৃতার চেয়েও কার্য্যকরী হয়—সেইজন্যই মনের মালিন্য কিংবা বিষাদের ছায়া যাহাতে মুখের উপর মেঘের মায়া না লইয়া আসে, তাহার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিতে হইবে। আজ যাহা চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করিতে হইতেছে, কাল তাহাই অভ্যাসে পরিণত হইবে; কেন না, মানুষ অভ্যাসের দাস!

(ক্রমশঃ)

একটী অপূর্ব্ব কৌশলময় জুয়াচুরী

কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানী হইতে প্রতারণা-পূর্ব্বক টাকা লইবার অভিযোগে লুই ডুরাণ্ড নামক এক ব্যক্তি লিয়ন্স অ্যাসাইজের বিচারে চারি বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ডুরাণ্ড খুব বেশী রকম কুইনাইন খাইয়া একদিন মৃতব্যক্তির মত পড়িয়া থাকে, তারপরে বাড়ী হইতে একদম চম্পট দেয়। কবর দিবার সময় আসিলে, শবাধারের মধ্যে বালু বোঝাই করিয়া খুব জাঁক জমকের সহিত উহা সমাহিত করা হয়। তারপরে যে মহিলাটিকে টাকার ওয়ারিশ করা হইয়াছিল, সে ইনসিওরেন্স কোম্পানী হইতে টাকা তুলিয়া লয় এবং উভয়ে একটী ফার্ম্ম লইয়া মনের আনন্দে বাস করিতে থাকে। এই সময়ে ডুরাণ্ডকে তাহার কোন বন্ধু চিনিয়া ফেলাতেই সমস্ত বিপদের উদ্ভব হয়।

বিচারের সময় ডুরাণ্ডের কোন প্রতিবেশী সাক্ষ্য প্রদানকালে বলে যে "বিধবা"র কাছে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে যাইয়া তাহাকে অত্যন্ত শোকাকুল অবস্থায় দেখিতে পায়। মহিলাটি ডুরাণ্ডের 'শবের' কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিল, এবং 'মৃতব্যক্তির' হাত তেরছাভাবে তাহার বুকের উপর পড়িয়াছিল। 'মৃতব্যক্তির' মুখে স্বেদবিন্দু লক্ষ্য করিয়া প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মহিলাটি উত্তর দিলেন যে তাহার জেলার প্রথা অনুসারে 'মৃতব্যক্তির' মুখ ইথার দিয়া ধৌত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে বেচারী 'লুলু' বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কাহাকেও নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবার অধিকার দিতেন না। প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি এই ইঙ্গিতের মর্ম্মার্থ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলেন।

ব্যাপারে এমনি মজা হইয়াছিল যে, ডুরাণ্ড নিজেই 'বিধবাটির' এক পুরাতন বন্ধু সাজিয়া কোম্পানী হইতে টাকা তুলিতে গিয়াছিলেন। সমস্ত টাকাই দিয়া দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী প্রাপ্য অর্থ দিবার সময় বিধবাকে নিজের জন্য একটী জীবন বীমা করিবার অনুরোধ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, এই সময়ে তাহার হাসিতে হাসিতে পেট ফাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার সঙ্গিনীরও বিচারে দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

গিরিশ চন্দ্র ভড়

পুরুষের কর্ম্মই তাহার সৌভাগ্যের সোপান। অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা লইয়া আপনাকে অসহায় ভাবিয়া যাহারা কেবল অদৃষ্টের ধিক্কার দেয়, তাহারা চিরদিন পশ্চাতেই পড়িয়া থাকে। আর যাহাদের উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে, বিপদ বাধা উল্লঙ্ঘন করিবার সাহস আছে, জীবন সংগ্রামে তাহারাই অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে। আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া আত্মার অপমান করা আমাদের স্বভাব। কিন্তু যাহারা আর্থিক দৈন্যে আত্মার দৈন্য স্বীকার করে নাই, তাহারাই জীবন সংগ্রামে সাফল্যের সন্ধান পাইয়াছে।

শ্রীযুত গিরিশ চন্দ্র ভড় মহাশয় বাঙ্গলার স্বাবলম্বী, আত্মবিশ্বাসী, সেই সকল বাঙ্গালী সুসন্তানের অন্যতম, যাঁহারা নিজের জীবনের কর্ম্মসাধনা দ্বারা জাতীয় আদর্শ উজ্জ্বল করিয়াছেন, আপনার সাফল্য গৌরবে জাতীয় গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং ব্যর্থতা অথবা সম্পদগর্ব্বে কোনো দিন আত্মহারা হন নাই। সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার এই কৃতীসন্তান হুগলি জিলার জাহিরকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহেশচন্দ্র ভড় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু ভাগ্যবিধাতা পুত্রের অদৃষ্টলিপি অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন। তাই দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও গিরিশচন্দ্রকে দরিদ্রের উপেক্ষিত ও অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে হয় নাই।

বাল্যকালে ভালো শিক্ষালাভের সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। দরিদ্র পিতামাতা এমন নিঃসম্বল ছিলেন, যে স্কুলের বেতন দিবার মত সামর্থ্যও তাঁহাদের ছিল না। কলিকাতা ফ্রী চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে অবৈতনিক ছাত্ররূপে তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সে কঠোর ছাত্রজীবনের দিনগুলির কথা ভুলিবার নয়। কাপড় কাচাইবার পয়সা নাই, বাহির হইতে খাদ্য আনাইয়া খাইবার সামর্থ্য নাই। কাজেই নিজের রজক, পাচক ও ভৃত্যের কাজ তাঁহাকে একাই করিতে হইত। কয়েক বৎসর এইরূপ পরিশ্রমের পরে তাঁহাকে পড়া ছাড়িয়া চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইতে হইল। ঘরে অন্নের সংস্থান ছিল না তাই মাত্র ১৯ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। 'সিটি অব গ্লাসগো' বীমা কোম্পানী তাঁহাকে পনর টাকা মাসিক বেতনে সামান্য কেরাণীরূপে গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁহার বেতন চল্লিশ টাকা হয়। তারপর উহা মাসিক একশত টাকায় পরিণত হয়। এই কোম্পানীটি বর্ত্তমানে স্কটিশ ইউনিয়ন এবং ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালী একবার যে কোনো প্রকার একটি চাকুরী জোগাড় করিয়া বসিয়া খাইতে পাইলে আর পরিশ্রম করিতে চাহে না; অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাঁহাদের নিকট সাগরের মত দুস্তর, ও প্রাচীরের মত দুর্লঙ্ঘ্য। গিরিশ বাবুর মত বহু কর্ম্মচারী তাঁহার আফিসে কাজ করিতেন, কিন্তু কাহারও মনে চাকুরীর উপার্জ্জন ছাড়িয়া নিজের চেষ্টায় ব্যবসা দ্বারা অধিক

উপার্জ্জনের উৎসাহ জাগে নাই; কিন্তু শ্রীযুত ভড় এই স্বল্প উপার্জ্জনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাঁহাকে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছিল—তাই তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যখন আফিসের টেবিলেই ঝুঁকিয়া রহিলেন শ্রীযুত ভড় তখন কেরাণীর কাজ ছাড়িয়া কোম্পানীর এজেন্টরূপে কর্ম্মফল প্রতিষ্ঠার জন্য বাহির হইলেন। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকায়িত আছে না জানিলেও তিনি এইরূপ অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নের সহিত সংগ্রাম

করিয়াই যাঁহাকে জীবন আরম্ভ করিতে হইয়াছে, তিনি কর্ম্মসংগ্রামে ভীত হইলেন না। তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টা ও অসীম অধ্যবসায়ের ফলে প্রথম বৎসর হইতেই এজেন্সী দ্বারা তিনি গড়ে মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। মানুষের উৎসাহ, উদ্যম ও ধৈর্য্য থাকিলে সে যে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে শ্রীযুত ভড় তাঁহার নিজের জীবনের কর্ম্মদ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। অভাব ও অর্থের চিন্তায় তাহারাই ধৈর্য্যহারা হয়, যাহারা দুর্ব্বল ও আত্মপ্রত্যয়হীন। কিন্তু যাহাদের সাহস আছে, শৌর্য্য আছে, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি আছে, তাহারা দুঃখ বিপদে অধীর হয় না। অল্প লইয়াও খুসী থাকিতে পারে না। বীমা জগতে আজ শ্রীযুত ভড়ের নাম সুবিদিত। তাঁহার ৪৫ বৎসর ব্যাপী ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণের ফলে বর্ত্তমানে তিনি সকল স্থানেই সুপরিচিত।

তাঁহার অমায়িক আচরণ ও মাধুর্য্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বে তাঁহাকে সকল স্থানেই জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। যেথানেই যাইতেন সেখানেই জনসাধারণ তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। কার্য্যোপলক্ষে যেখানে তিনি মাঝে মাঝে প্রায়শঃই গমন করিতেন, সেখানকার লোক তাঁহাকে 'সিটি অব গ্লাসগো' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রথম যে সময় তিনি এজেন্ট হইয়াছিলেন, তখন মিঃ কলিন ক্যাম্পবেল গালিলানী কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ভড়ের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং সকলেই জানে ভারতবর্ষে 'সিটি অব গ্লাসগো'র সকল গৌরব এই দুইজন লোকের কর্ম্ম সাধনাতেই সম্ভব হইয়াছে। মিঃ গালিলানী আফিসের কাজ দেখিতেন, এবং শ্রীযুত ভড় বাহিরে ঘুরিয়া কর্ম্ম সংগ্রহ করিতেন তিনি এই কোম্পানীতে কোটি কোটি টাকার কাজ দিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তির জোর, জ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যবহারের ভদ্রতা এতই মনোমুগ্ধকর ছিল যে জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজা, প্রজা ভারতীয় অথবা ইউরোপীয় কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পারিতেন না। শ্রীযুত ভড়ের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকই এরূপ সাহসের সহিত বীমা ব্যবসায়ে অগ্রসর হইয়াছেন। যে কাজে মাসের শেষে পারিশ্রমিকের একটা নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, তাহাতে লিপ্ত হইতে সাধারণ লোকে ভয় পাইত। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত আশা অপেক্ষা বর্ত্তমানের পাওনাই তাহাদের অধিকতর কাম্য ছিল। সকলেই ভাবে কোন দিন হাঁস সোণার ডিম পাড়িবে, সে-আশায় কে বসিয়া থাকে? সোণার ডিম হয়তো সে একেবারেই না পাড়িতে পারে; কিন্তু শ্রীযুত ভড় তাঁহার কর্ম্মসাফল্য দ্বারা ভবিষ্যত এজেন্টগণের অমূলক আশঙ্কা ও অনাবশ্যক সন্দেহ দূর করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ কর্ম্মিকে তিনি দেখাইয়াছেন যে নক্ষত্রলোকে কর্ম্মের তীর পৌছাইতে হইলে, তাঁহারও উর্দ্ধলোকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বীমা জগতে সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল অক্লান্ত সেবার পরে গত ১৯২২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। জীবন-সায়াহ্ন নিরালায় যাপনের জন্ম তিনি পাঁচ শত টাকা মাসিক পেন্সন ও দুই শত টাকা কমিশন গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মসাধনায় সমগ্রজাতি গৌরবান্বিত। দেশীয় কোনো কোম্পানীর সেবার সৌভাগ্য হইলে হয়তো তিনি দেশবাসীর আরও অনেক উপকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যে সময় বীমার

কাজে যোগ দিয়াছিলেন, সে সময় দেশীয় বীমা ব্যবসায় কেবল কল্পনার প্রথম বিকাশের বিষয় ছিল। শ্রীযুত ভড়ের জীবন ভারতীয় বীমা-কর্ম্মিগণের আদর্শ স্থল। তাঁহার সাধনা ও আদর্শ, বীমা-কর্ম্মীগণের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করিবে, নিশ্চিত স্বল্প আরামের সুখ অপেক্ষা অনিশ্চিত কর্ম্মদীপ্ত মহান জীবনে প্রবুদ্ধ করিবে। নৈরাশ্যের অন্ধকারে যিনি হতাশ হইয়াছেন, শ্রীযুত ভড়ের সাফল্য তাঁহার ধ্রুবতারা; নূতন জীবনের সন্ধানে যিনি যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন শ্রীযুত ভড়ের আদর্শ তাহার জীবনের অক্ষয় পাথেয়।

বীমার ইতিহাস

শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংরাজী ১৬৬৭ সালে লণ্ডন নগরীতে অগ্নিবীমা পরিষৎ প্রভৃতি গঠিত হয় এবং এসকল পরিষৎ প্রভৃতির একটিকে লইয়া ইংরাজী ১৬৮১ সালে ডাক্তার বারবণ কর্ত্তৃক পাকাপাকি ভাবে অগ্নিবীমা কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত প্রথম অগ্নিবীমা কোম্পানী স্থাপিত হয়। এই কোম্পানীর নাম হয় "The fire office"। পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ইং ১৬৮২ সালে নগরবাসীগণের পুনঃ পুনঃ দাবী দাওয়ার ফলে লণ্ডন করপোরেসন একটি অগ্নিবীমা বিভাগ সৃষ্টি করেন এবং উক্ত বিভাগ উপরি লিখিত "The fire office" এর তুলনায় অতি নিম্নহারে অগ্নিবীমা পণের হার ধার্য্য করেন। সুরু হইতেই জনসাধারণের যৌথ কারবারের সহিত লণ্ডন করপোরেসনের এইরূপ অযথা ও অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় এবং তাহার ফলে ইং ১৬৮৩ সালে Kings Bench কর্ত্তৃক লণ্ডন করপোরেসনের উক্ত অগ্নিবীমা বিভাগ বন্ধ করিবার আদেশ হয়; কেন না, আদালতের বিচারে ইহাই ধার্য্য হয় যে, লণ্ডন করপোরেসন এই প্রকার অগ্নিবীমা বিভাগ স্থাপন করিয়া ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহার পরেই ১৬৮৪ সালে অগ্নিবীমা কার্য্য পরিচালনার্থ "The Friendly Society" নামে mutual basisএ আরও একটি নূতন কোম্পানী স্থাপিত হয়; কিন্তু হইলে কি হইবে, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ এমনই ভাবে বপন করা হয় যে তাহার ফলে এই উভয় কোম্পানী "The fire office" এবং "The friendly society" অচিরাৎ পটল তুলিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাহার পর হইতেই যে সকল কোম্পানী স্থাপিত হইতে থাকে—তাহাদের অধিকাংশই Composite office,—যাহাকে বাংলা ভাষায় "পাঁচমিশালি" বলিলে অত্যুক্তি হয় না; ঐ সকল কোম্পানীর কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামুদ্রিক বীমা পদ্ধতির ভিতর দিয়াই যে 'জীবন বীমা'র প্রারম্ভ, এ বিষয়ে আর দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই; কিন্তু জীবন বীমার ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, ইহার পরিস্ফুটনের পদ্ধতি অতীব বিলম্বিত এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবে জীবনবীমা কার্য্য পরিচালনার কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। "Annuity" সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে। এমন কি, ষোড়শ শতাব্দীতেও রোমান্‌দিগের (Romans) মধ্যে 'Annuity' প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং রোমসাম্রাজ্যে তৎকালীন ভীষণ কুসীদ বৃত্তির আইনের কবল হইতে মুক্তির উদ্দেশ্যে সাধারণ সওদাগরগণের

মধ্যে এই 'Annuity' কার্য্যের বিশেষ ভাবে প্রচলন ছিল; কেন না, Annuityকে মূলধন সম্বন্ধ ব্যবসা হিসাবে গণ্য করায় তাহাকে ধার বা কর্জ্জ বলিয়া না ধরায় তাহার উপর কোনও সুদের দাবী চলিত না, এবং এই 'Annuity' কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ বা তাহাদের বয়সের প্রতি কোনও লক্ষ্য না রাখিয়াই ইচ্ছানুযায়ী পণের হার নির্ণয় করা হইত। কম সংখ্যক লোকেই Annuity ক্রয় করিত এবং ক্রেতাগণের মধ্যেও উত্তম স্বাস্থ্যবান ও অল্প বয়স্ক যুবকই অধিক থাকায় রাজস্ববিভাগের বিশেষ কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। বর্ত্তমানে যে ভাবে 'Annuity' কার্য্য পরিচালিত হইতেছে—ইহার প্রারম্ভ ইংরাজী ১৮০৮ সাল হইতে, যখন জাতীয় ঋণের শাখা স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট লোক

শ্রীযুক্ত চুনীলাল লাহিড়ী

১৬৮৮ সালে স্বয়ং ইংরাজ সরকার Annuity প্রদান কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রেতার বয়স যাহাই হউক না কেন, তাহার নিজ জীবনের উপর যত টাকারই Annuity হউক না কেন, শতকরা ১৪ টাকা হিসাবে পণ নির্ণয় করা হয়; কিন্তু রাজস্ব-বিভাগের সৌভাগ্য যে সাধারণে এই প্রথার যাবতায় উপকার সম্যক্ উপলব্ধি না করায় অতি সংখ্যানুপাতে মৃত্যুহারের উপর আশ্রয় করিয়া Annuity প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ইং ১৬৯৩ সালে "Panarithmologia" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় যাহাতে যুক্তরাজ্যের জীবন বীমা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যয়-যোগ্য উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ পুস্তকে যে সকল উপদেশের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার

মধ্যে প্রধান হইতেছে এই যে কোন সম্পত্তি বা ব্যবসা আরম্ভ করিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় কর্জ্জদ্বারা তাহা সংগ্রহ করিতে হইলে ঐ দেনা পরিশোধের নিমিত্ত জীবনবীমাই একমাত্র সম্বল।

জীবন বীমার প্রারম্ভে যে সকল চুক্তি পত্র প্রদান করা হইত তাহার প্রায় সকল গুলিই এক বৎসরের জন্য প্রদান করা হইত। ইহাও বর্ত্তমানের 'Short Term Assurance এর ন্যায়; তবে অধুনা এই 'Short Torm Assurance যেমন এক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫।৭।১০ বৎসরের নিমিত্তও প্রদান করা হইয়া থাকে, সর্ব্বপ্রথমে মাত্র এক বৎসরেরই নিমিত্ত উহা প্রদান করা হইত; আর সে-সময়ে যে-সকল চুক্তি পত্র প্রদান করা হইত তাহার অধিকাংশই ঠিক জুয়া খেলার মধ্যে পরিগণিত করা যায়; কেননা, ঠিক যখন লোকে প্রায় আসন্ন মৃত্যু অবস্থায়, তখনই তাহাদিগের জীবনের উপর ঐ প্রকার চুক্তি পত্র যাবতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই প্রকার জাল জুয়াচুরি ক্রমশঃই এত বাড়িয়া যাইতে থাকে যে তাহার ফলে বহুকাল যাবৎ ফরাসী দেশে (France) জীবন-বীমা অবৈধ বলিয়া গণ্য করা হইত, যেহেতু এবম্বিধ জীবন বীমা দ্বারা জাতীয় মঙ্গল সাধন হওয়া দূরে থাক বরং জাতির অনিষ্ট সাধিত হইত বেশী।

দলীল দস্তাবেজ হইতে সংগৃহীত সর্ব্বপ্রথম যে জীবন বীমা চুক্তি প্রদানের পরিচয় জীবন বীমার ইতিহাসে পাওয়া যায় তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, ইং ১৫৮৩ সালে উইলিয়াম্ গিবন্সের জীবনের উপর মাত্র বার মাসের জন্য ঐ চুক্তি পত্র প্রদান করা হয় এবং তিনি ঐ চুক্তি পত্রের তারিখ হইতে ঠিক ৩৪৫ দিবস পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বীমার টাকার দাবী করেন; কিন্তু ঐ দাবী কোম্পানী কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় গোলযোগ ঘটে। কোম্পানী কারণ দর্শায় যে 'এক মাস' ('a month') বলিতে ২৮ দিন বুঝায়; অতএব একবৎসর অতিবাহিত হইবার পর মৃত্যু ঘটিয়াছে বিধায় চুক্তি পত্রানুযায়ী বীমার টাকা দেয় নহে। কিন্তু আদালতে এই যুক্তি গ্রাহ্য না হওয়ায় কোম্পানী দাবীর টাকা দিতে বাধ্য হন। এইরূপ দাবী সম্বন্ধে গোলযোগের সম্ভাবনা যাহাতে না থাকে তদুদ্দেশ্যে ঐ সময় হইতে এবং তাহারও দীর্ঘকাল পর পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে Lloyds অন্যান্য যাবতীয় প্রকারের বীমায় যে প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তদ্রূপে জীবন বীমা চুক্তি পত্রে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক underwriter কে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বীমার টাকা প্রদানের জন্য দায়িত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নাম স্বাক্ষর করেন) তাঁহার নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে হইত।

জীবন বীমার ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম গণনা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান (১) ফরাসীদেশের প্যাসকেল (Pascal) 1623-62 একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং গণিতশাস্ত্রবিৎ (২) হল্যাণ্ড দেশের দে উইট (De witt) 1625-72 একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ন্যায়বিৎ এবং (৩) ডাক্তার হাল্লে (Dr. Halley) ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী এবং গণিতশাস্ত্রবিৎ। এই তিন মহাপুরুষ জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা হইতে সর্ব্ব প্রথমে জীবন বীমার প্রয়োজনীয় যাবতীয় গণনা প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু সে সময়ে জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা বর্ত্তমানের ন্যায় সঠিক রূপে না থাকার জন্য তাঁহাদিগকে এই গণনা কার্য্যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়।

অন্ততঃ ইংলণ্ডে সে সময় জন্ম ও মৃত্যুর কোন তালিকাই রাখা হইত না; কিন্তু অনুসন্ধানের পর Dr. Halley দেখিতে পান যে Silesiaর অন্তর্গত Breslau নগরীতে জন্ম ও মৃত্যুর যে সকল তালিকা রাখা হইত তাহা হইতে মৃতব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ, এবং এই দিবসে তাঁহার কত বয়স এবং তিনি স্ত্রী কি পুরুষ এ সমস্ত বিবরণই পাওয়া যাইত এবং ঐ সমস্ত তালিকা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপর গণনা করিয়া Dr. Halley সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করিয়া দেন যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও বয়সে জীবন বীমার জন্য কি হারে বীমাপণ দেয়, তাহা নির্ণয় করা খুবই সহজসাধ্য হওয়া সম্ভবপর। তাহারও অর্দ্ধশতাব্দী বা আরও কিছুকাল পরে, Dr. Halley যে সমুদয় গণনা করিয়াছিলেন তাহার সমস্ত গুলিকেই আরও বিশুদ্ধ ভাবে গণনাদ্বারা পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ব্রতী হইতে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন যে ২১১টি মাত্র জীবনবীমা কোম্পানী যুক্তরাজ্যে স্থাপিত হয় তাহারা ঐ সকল গণনাদির উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী পণ নির্ণয় পূর্ব্বক ঐ ব্যবসা চালাইতেন। যে ২১১ টি কোম্পানীই তখন থাকুক না কেন তাঁহারা তখনও short term policies এর বাহিরে আর যাইতে চাইতেন না তাহার কারণ যে তাহাতে Gambling এর সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকায় যে যাহাকে ঠকাইতে পারে তাহারই সুবিধা হইবে, এইরূপ অবস্থায় সকলেই তাহাতে পড়িত। কোম্পানীগুলিও সেইজন্য short term policies প্রদান করিতে তৎপর ছিলেন।

ইং ১৭৬২ সালে "The Equitable" নামে একটি কোম্পানী স্থাপিত হয়। এই কোম্পানীই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে গণনা প্রভৃতি দ্বারা বীমাপণ নির্ণয় করিয়া জীবন বীমা চুক্তি পত্র প্রদান করিতে আরম্ভ করেন এবং কোম্পানীই Dr. Halley ও তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে সকল বীমা পণের হার ধার্য্য করিয়া দেন তাহাই অনুসরণ করিয়া কার্য্য পরিচালনা করেন। ইং ১৭৮২ সালে নর্দাম্পটন (Northampton) সহরের জন্ম ও মৃত্যুর তালিকা হইতে যে Mortality Tables প্রস্তুত করা হয় তাহাই অনুসরণ করার ফলে ঐ কোম্পানী কিছুদিন কার্য্য করিবার পর দেখেন যে, যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত Mortality Tables প্রস্তুত করা হয় তাহাতে অনেক ভুল থাকায় তদনুযায়ী যে বীমা পণ নির্ণয় করা হয় তাহার হার অতীব উচ্চ হওয়ায় কোম্পানী দেখিতে পান যে তাহার ফলে অযথা অতিরিক্ত লাভ অর্জ্জন করা হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণে ঐ কোম্পানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বীমা পণের হার অনেক কম করিয়া ফেলিতে থাকেন এবং যে সকল বীমাকারী প্রথম উচ্চহারের বীমা পণ দিয়া বীমাচুক্তি পত্র লইয়াছিলেন, ঐ কোম্পানী তাহাদিগের বীমা চুক্তি পত্রের পরিমাণ হারাহারি ভাবে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় তাঁহাদিগকে আর অভিযোগের কোনও সুযোগ রাখিতে দেন না। ইহাই হইল Reversionary bonus বণ্টনের প্রারম্ভ। গভর্ণমেণ্টও ঠিক এই Northampton Tables এর অনুসরণ করিয়া Annuityর পরিমাণ ধার্য্য করায় দেখিতে পান যে তৎকালীন যত Annuity প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ চারি

হাজার পাউণ্ড করিয়া গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত দেওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছেন এবং ইং ১৮২৮ সালে Northampton Mortality Tables এর অনুসরণ স্থগিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, জাল জুয়াচুরির সুবিধার্থ জীবন বীমা কোম্পানী স্থাপন করা যেন এক হুজুগের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়ে এবং চোর জুয়াচোর ও ঠগদের ইহা এক প্রধান অস্ত্র হইয়া পড়ায় নানা প্রকারের কেলেঙ্কারী ঘটিতে থাকে। তখন বীমা বিষয়ে প্রচার কার্য্য এক রকম ছিলই না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এবং সুযোগ পাইয়াই কেলেঙ্কারী ক্রমশঃই চরম সীমায় উঠিতে থাকে। বীমা ব্যাপারে প্রচার কার্য্য ব্যতীত দোষ সংশোধনের আর কোনও উপায় নাই ইহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া ইং ১৮৪০ সালে "Post Magazine" নামক একখানি বীমা বিষয়ক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, এবং ইহার পরেই ইং ১৮৪৪ সালে ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্য লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একটি আইনও পাশ করা হয় কিন্তু তাহাতেও কোনও বিশেষ সুফল হয় না। কোনও কোনও জীবন বীমা কোম্পানী এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছামত তাহাদের পূর্ব্বতন প্রথা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই কারবার চালাইতে থাকে। ইহার প্রধান উদাহরণ স্বরূপ ইং ১৮৩৮ সালে স্থাপিত "Albert" এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই Albert এর আস্তিত্ত্ব কালীন অন্যান্য ২৬টি কোম্পানী গ্রাস করিয়া পরে নিজেই পটল তুলিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে সর্ব্বসাধারণের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা ভাবিয়া স্থির করাও কঠিন। এই সকল কেলেঙ্কারী ভবিষ্যতে যাহাতে আর না ঘটে তাহারই জন্য চারিদিক আটঘাট বাঁধিয়া ১৮৭০ সালে এক বীমা আইন পাশ করা হয়; কিন্তু তাহাতেও যে জাতীয় দোষ কতটুকু সংশোধন হয় তাহার পরিচয় পৃথক প্রবন্ধে দেওয়া হইবে।

ক্রমশঃ
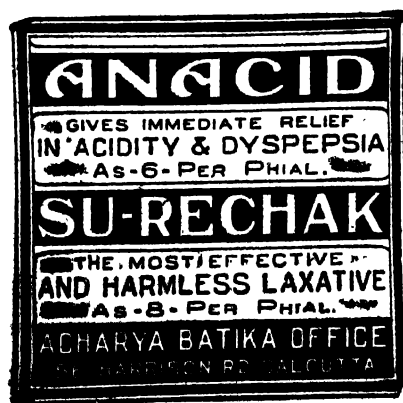
ন্যাশনাল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট

আমরা কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের পঞ্চবিংশ বাৎসরিক রিপোর্ট অডিট্‌ করা রেভেনিউ একাউণ্টস্ এবং ব্যালান্স্ সিট্ দেখিলাম। দেখা গেল যে, কোম্পানী আলোচ্য বর্ষে (১৯৩১) ৮৬১৫টী নূতন জীবন বীমা করাইয়াছেন এবং উহার মূল্য ১, ৬৬,৬৮,২০০, টাকা। এই সংখ্যার মধ্যে মাত্র ৬৮৯৯ টী বীমা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এবং তাহাদের পলিসির মূল্য ১,৩২,৩০,৭২৫ টাকা। বাকীগুলি হয় গ্রহণ করা হয় নাই, কিংবা বীমাকারীদের সর্ত্ত প্রভৃতি পছন্দ হয় নাই, অথবা শীঘ্রই গ্রহণ করা হইবে। আলোচ্য বৎসরে পুনর্বীমা করার দরুণ অর্থাদি বাদ দিলে নূতন বীমার প্রিমিয়াম বাবদ বাৎসরিক নেট্ আয় হইবে ৬,১৭,১৪২—২—০ টাকা।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর জন্য ৬,২০,৭৬৮—৭—০ টাকার দাবী মিটাইতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি এণ্ডাউমেণ্ট এসিওরেন্স মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় (matured) ৫,৫২,৪৮৩—১৩—০ টাকার দাবী হইয়াছে।

জীবন বীমার ফণ্ড্, লগ্নী বা ইনভেষ্টমেণ্ট এবং অন্যান্য রিজার্ভ ফণ্ডে একত্রে ১,৬৩,৩৭,৫৯০-১-৫ টাকা আছে; বৎসরের প্রথম দিক দিয়া উহা ১,৪৭,০৭,০৬৩-১৩-১১ টাকা ছিল। দেখা যাইতেছে যে এক বৎসরে ফণ্ডের পরিমাণ ১৬,৩০,৫২৬—৩—৬ টাকা বেশী হইয়া গিয়াছে। বিক্রয় করিয়া যাহা আদায় হইয়াছে, তাহা ছাড়া সিকিউরিটির কোন লাভ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

ইনকাম্ ট্যাক্স বাদ দিয়া লগ্নী বা ইনভেষ্ট-মেণ্টের সুদ বাবদ মোট ৭,৫১, ১৮৭—১৪ ৯ টাকা আদায় হইয়াছে। জীবন বীমা বিভাগে প্রিমিয়ামের আয়ের তুলনায় establishment বাবদ শতকরা ২৭.৬% খরচ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানীর হেড্ আফিস স্থানান্তরিত হইয়া কলিকাতাস্থ ৭ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে নূতন স্থায়ী ইমারতে আসিয়াছে।

ডাইরেক্টারগণ প্রতি সেয়ারের জন্য ১২৲ টাকা করিয়া ডিভিডেণ্ড দিবার কথা স্থির করিয়াছেন। এবং বীমাকারী, এজেণ্ট, ষ্টাফের কর্ম্মচারীবৃন্দ ব্যবসার সাফল্যের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করায় তাহাদিগকে এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

উক্ত বাৎসরিক সভাতে চেয়ারম্যান মহোদয় রিপোর্ট এবং অ্যাকাউণ্ট গ্রহণ করাইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বলেন,—

ভদ্রমহোদয়গণ

রিপোর্ট এবং অন্যান্য হিসাবপত্র পেশ করিবার পূর্ব্বে আমি আপনাদিগকে বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানীর কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া লইতে চাই। বলা বাহুল্য, আধুনিক সময়ে বর্ত্তমান বৎসরের মত দুর্দ্দিন

ব্যবসার বাজারে শীঘ্র আর দেখা দেয় নাই; কিন্তু তবুও এই সংগ্রামের মধ্যে কোম্পানী যে কার্য্য করিয়াছে, তাহা যে কোন কোম্পানীর পক্ষে প্রশংসার কথা বলিয়াই আমি মনে করি। গত বৎসরের তুলনায় ১৯৩১ সনে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মত কাজ বাড়িয়া গিয়াছে; অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৬% করিয়া বেশী কাজ হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী জনসাধারণের কতদূর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের প্রিমিয়ামের আয় প্রায় ২,৪০,০০০ টাকা বেশী বাড়িয়া গিয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরের দুর্দ্দিনের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত রাখিয়াও লাইফ ফণ্ডের পরিমাণ চারি লক্ষ টাকার মত বেশী দাঁড়াইয়াছে। এই সুযোগে আমি তাই আমাদের এজেন্টবর্গ এবং বাহিরের সজ্ঞগুলিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া লইতেছি।

কোম্পানীর এই উন্নতির মধ্যেও ব্যবসায়ের বর্ত্তমান মন্দাবস্থা আমাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যাহারা সর্ব্বদা টাকা-পয়সা লইয়া কারবার করে তাহাদের কেহই ইহার খপ্পর হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কোম্পানী বীমা-কারীদিগের নিকট হইতে টাকা পাইয়া উহা ষ্টক এবং অন্যান্য সিকিউরিটিতে খাটাইয়া থাকেন। বীমাকারীর দাবী ইহার সুদ হইতেই সাধারণতঃ মেটানো হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে ব্যবসা সর্ব্বদাই ক্যাপিট্যাল ভ্যালুর উঠ্‌তি পড়্‌তির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এইরূপ সিকিউরিটিতে আমাদের বেশীর ভাগ লগ্নী অর্থ সঞ্চিত থাকায় প্রায় ১২½ লক্ষ টাকার ডিপ্রিসিয়েসন হইয়াছে। গত ১০ বৎসরে আমাদের যাহা লোকসান হইয়াছে, এই এক বৎসরেই আমাদের তাহার চেয়ে বেশী ঘাটতি দিতে হইয়াছে। এই ঘাটতি মিটাইবার জন্য বোর্ড ইনভেষ্টমেণ্ট রিসার্ভ ফণ্ড গঠন করিয়া

ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্সের সেক্রেটারী
মিঃ এস্‌, এন্‌ বানার্জ্জী

তাহাতে আবশ্যকীয় অর্থ জমা রাখিতেছেন। এই-জন্য দেখা যাইতেছে যে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর ইনভেষ্টমেণ্ট এইদিক হইতে বাজারের মূল্যের সমান কিংবা কিছু নিম্নে পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মূল্যের তুলনায়—যাহা ডিপ্রিসিয়েসনের অনেকাংশ সামলাইয়া লইয়াছে—পূর্ব্বের মূল্য যে সাধারণ ব্যবস্থার নীচেও ব্যবসার অনেকদূর গড়াইয়া গিয়াছিল তাহা বোর্ড বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এতৎসত্বেও বোর্ড লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী অ্যাক্টের পারমিসিভ ক্লজের সুযোগ ব্যবহার না করিয়া ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর ঠিক যে

অবস্থা ছিল তাহা বর্ণনা করাই উচিত বোধ করিলেন। এইরূপ নন-ভ্যালুয়েশন বৎসরেও বাজারের মূল্যের চেয়ে সিকিউরিটির মূল্য বেশী করিয়া লওয়া সঙ্গতবোধ করিলেন না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে আমাদের অ্যাকাউণ্টে মন্দার বাবদ যে অর্থ দণ্ড দিতে হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ একটু বেশী-ই। ব্যবসার বাজারে অদূর ভবিষ্যতে যে খুব বেশী রকম সুবিধা দেখা দিবে তাহা মনে না করিলেও ডিপ্রিসিয়েসনের বেশীর-ভাগই এখন হিসাবে লিখিয়া লওয়ার মত মনে করা যাইতে পারে। গত দুর্দ্দিনের সময় যে লোকসান হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে যে সামান্য উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা হইতে এবং প্রাপ্য সিকিউরিটি হইতে সময়ে মিটাইয়া লওয়া যাইতে পারে বলিয়া ভরসা করা অন্যায় নহে।

পূর্ব্বোল্লিখিত অসুবিধা ব্যতীত আরো একটী বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। তাহা বীমাকারীদের পলিসির উপর কর্জ্জ লইবার জন্য বেশী পরিমাণে আগ্রহ; ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে বীমাকারীরা অনেকেই নানারূপ বিঘ্নের ভিতর দিয়া চলিতেছেন। বেশী পরিমাণ বীমা প্রত্যর্পণ করার দরুণ (Surrender আমাদের যেমন ক্ষতি হইতেছে তেমনি লোকের আর্থিক অবস্থার কথাও কিছু-কিছু বুঝিতে পারা যাইতেছে। বীমাকারীদের এই অসুবিধা দূরীভূত করিবার কোন

উপায় আছে কিনা তাহা নির্দ্ধারিত করিবার জন্ম লুপ্ত-পলিসি উদ্ধারের নিয়মাবলী আরো সহজ এবং সুগম করিবার কথা বোর্ড ভাবিতেছেন। তাহাদের নির্দ্ধারণ অনুসারে আমরা নূতন স্কীম করিয়া লুপ্ত-পলিসি উদ্ধারের উপায় সহজ করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আশা করা যাইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বীমাকারীরা এই সুযোগ গ্রহণে অবহেলা প্রকাশ করিবেন না।

আমাদের কাজকর্ম্মাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্ম খরচ যথাসাধ্য কমাইয়া রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছি এবং উহা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আদৌ বাড়ান হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে এই দুর্দ্দিনের মধ্যেও বেশী ব্যয় না করিয়া আমরা বেশী ব্যবসা করিয়াছি এবং নূতন একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে অফিস স্থানান্তরিত করিয়াছি।

গত বাৎসরিক সাধারণ মিটিং-এর পর অ্যাকচুয়ারীর যে পঞ্চবার্ষিক হিসাব বাহির হইয়াছে, তাহাতে চলিত বোনাস রাখাই স্থির হইয়াছে। ভবিষ্যতের বোনাস্ সম্বন্ধে কোন কথা এত আগেই জোর করিয়া বলা চলে না, তবে কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন যে ইহার পরবর্ত্তী পঞ্চবার্ষিক হিসাবে বোনাসের হার বাড়ান যাইতে পারিবে। ব্যবসার বাজারে যেরূপ উঠ্‌তি পড়্‌তি লাগিয়াই আছে, তাহাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা আদৌ সাজে না। নূতন বৎসরের গোড়ার দিকেই আমরা ডিপ্রিসিয়েসনের চাপে অত্যন্ত বেগ পাইতেছি বটে; কিন্তু সকলেই আশা করিতেছেন যে ইহা বেশী দিন আর থাকিবে না।

হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের সাফল্য

ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলি ক্রমেই প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে, ইহা সুখের বিষয়। প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, দেশবাসিগণ স্বদেশী জীবন বীমা কোম্পানীরই পরিপোষকতা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এইরূপ স্বাদেশিকতা পূর্ব্বে ছিল না। এখন দেশের লোক এ বিষয়ে অনেক সজাগ হইয়াছেন।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী বিগত বর্ষে এককোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ ঊন চল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকার নূতন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সাড়ে সাত লক্ষ টাকার কাজ বেশী হইয়াছে। হিন্দুস্থান সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান; ইহার সাফল্য স্বদেশী বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচক। এ বৎসরেও হিন্দুস্থান সমস্ত ভারতীয় কোম্পানগুলির মধ্যে নূতন কাজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে; বোম্বাইয়ের ওরিয়েণ্টাল প্রথম।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার জননেতাগণের সমবেত চেষ্টায় হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা হয়। এবার

কোম্পানীর রৌপ্য-জয়ন্তী (silver jubilee) এবং শীঘ্রই নূতন ভ্যালুয়েসন (valuation) হইবে। বিগত ভ্যালুয়েসনের ফলে প্রায় সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছিল এবং পলিসী হোল্ডারগণ অতি উচ্চহারে বোনাস্ পাইয়াছিলেন। আশা করি, এবারে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিলাভ করিবে ও পলিসী হোল্ডারগণ আরও উচ্চহারে বোনাস্ পাইবেন।

'হিন্দুস্থান' বাঙ্গলার গৌরবের জিনিষ; বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের সাফল্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানের শাখা বা এজেন্সী অফিস স্থাপিত আছে। ভারতের বাহিরেও নানাস্থানে হিন্দুস্থানের ব্যবসায় প্রসার লাভ করিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রোপিত বীজ আজ যে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে তাহার সুশীতল ছায়ায় যে কেবল হাজার হাজার ব্যক্তি জীবন বীমার সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহা নয়, কয়েক সহস্র লোক ইহারই আশ্রয়ে স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। হিন্দুস্থান বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের যে বিজয়কেতন স্থাপন করিয়াছে তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়।

হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার

এই উপলক্ষে আমরা হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে

অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার পরিচালনায় হিন্দুস্থান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আশা করি, এই প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

এবারকার পাটের পূর্ব্বাভাষ

পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা সত্যই যদি বেশী জমিতে কৃষকেরা পাট আবাদ করিয়া থাকে তবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামে এ বৎসর যে পাট চাষ করা হইয়াছে সরকার হইতে তাহার একটা আনুমানিক পূর্ব্বাভাষ দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর ১,৮৬১,৩০০ একর জমিতে পাটের আবাদ করা হইয়াছিল; এবার ১,৯০৩,০০০ একর জমি চাষ করা হইয়াছে। একেত বাজারে ৩৲ টাকা ৪৲ টাকা মণ দরে পাট বিকাইতেছে তাহার উপর আবার এ ব্যয় কৃষকদের পক্ষে আরো দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, পাটের দাম তাহা হইলে আরো কমিয়া যাইবে। নীচে পাট চাষের সরকারী বিবরণ দেওয়া হইল :—

যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছে।

জেলার নাম	গত বৎসর	এ বৎসর
চব্বিশ পরগণা	৪৫,০০০	৪২,০০০
নদীয়া	৩১,০০০	২৫,০০০
মুর্শিদাবাদ	১৪,০০০	১৩,২০০
যশোহর	৪৬,০০০	৪৪,১০০
খুলনা	২`,০০০	২০,৫০০
বর্দ্ধমান	২,০০০	১,৬০০
মেদিনীপুর	৪,০০০	৫,০০০
হুগলী	২০,০০০	১৭,৩০০
হাওড়া	৪,০০০	৩,৭০০
রাজসাহী	৬৮,০০০	৫৫,০০০
দিনাজপুর	৪১,০০০	৪২,৭০০
জলপাইগুড়ি	২৬,০০০	২৫,০০০
দার্জ্জিলিং	২,০০০	২,১০০
রংপুর	১৮০,০০০	১৯০,০০০
বগুড়া	৬০,০০০	৬১,০০০
পাবনা	৪৫,৪০০	৫৭,০০০
মালদহ	১৬,০০০	১৭,৫০০
ঢাকা	২১৫,০০০	২২৩,৩০০
ময়মনসিংহ	৪১৫,০০০	৪২০,০০০
ফরিদপুর	১৪৪,০০০	১৪০,০০০
বাখরগঞ্জ	৩০,০০০	২১,৬০০
চট্টগ্রাম	৩০০	৩০০
ত্রিপুরা	১৪০,০০০	১৫৭,৭০০
নোয়াখালি	২৮,০০০	৩২,০০০
কুচ বিহার	১৬,০০০	২০,৯০০
ত্রিপুরা রাজ্য	১০০০	১,১০০
সমস্ত বঙ্গদেশে	১,৬১৩,৭০০	১,৬৩৮,৯০০
বিহার এবং উড়িষ্যা	১৪৮,৮০০	১৫৭,০০০
আসাম	৯৯,৩০০	১০৭,১০০
মোট তিন প্রদেশে	১,৮৬১,৮০০	`,৯০`,০০০

পাটের পূর্ব্বাভাষ সম্বন্ধে বে-সরকারী হিসাব

বেঙ্গল জুট্ গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন:

ডিরেক্টার অফ্ এগ্রিকালচার পাটের চাষ সম্বন্ধে যে ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ফল এই হইয়াছে যে পাটের বাজার ইতিমধ্যেই আরো মন্দা হইয়া উঠিয়াছে; পাটচাষিদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে।

সমস্ত বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি পাটের দামের উপর নির্ভর করে; কাজেই কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরের ভুলপূর্ণ তথ্য যাহাতে লোককে বিপথে চালিত না করে, সেই জন্য জুট্ গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমাদের কমিটি পাট আবাদী অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ড সমূহে একটী সার্কুলার পাঠাইয়াছিলেন। আমরা ২৫০টী বোর্ড হইতে জবাব পাইয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম যে গতবৎসরের তুলনায় এ-বৎসর প্রায় দুই আনা পরিমাণ পাট কম চাষ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমি নিজে পাট আবাদী অঞ্চলে বিস্তর ঘুরিয়াছি; আমার এসোসিয়েশনের কর্ম্মী-

দের রিপোর্ট দেখিলেও অনুমিত হইবে যে এ বৎসরের পাটের চাষ গতবৎসরের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে।

যখন লক্ষ লক্ষ নিরন্ন লোকের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাটের উপর নির্ভর করিতেছে, ত'ন এরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তথ্য সম্বলিত পাটের আনুমানিক হিসাব দেওয়া অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গতবৎসর পাটের পূর্ব্বাভাষে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছিল শেষ-হিসাব দাখিল করিবার সময় উহা হইতে পঞ্চাশ হাজার একর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি ভরসা করি যে সম্মুখের সেপ্টেম্বর মাসে যখন কৃষি-বিভাগ শেষ-হিসাব প্রকাশ করিবেন, তখন একটু সতর্কতা এবং বিবেচনার সহিত কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

কলিকাতাস্থ দালালের দল বাজার খারাপ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও, কৃষকদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে গভর্ণমেণ্টের হিসাব নির্ভুল, তাহা হইলেও এ-বৎসরকার পাটের পরিমাণ ৬৬ লক্ষ বেলের বেশী হইতে পারে না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গত বৎসর মাত্র ৫৬ লক্ষ বেল্ মাল প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু বিক্রয় হইয়াছিল ৬৬ লক্ষ বেল। অর্থাৎ গুদাম হইতে আরো ১০ লক্ষ গাঁট বেল্ কাট্‌তি হইয়া গিয়াছিল। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে পৃথিবীর আর্থিক অবস্থার শীঘ্র উন্নতি হইবে না, তাহা হইলেও এবৎসর ৬৫ লক্ষ বেলের কম বিক্রয় হইবে না বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এবৎসর পাটের যেরূপ চাহিদা হইবে সেই পরিমাণেই কিংবা একটু কম পাট আবাদ হইয়াছে। পাট এই দেশের একচেটিয়া মাল; কাজেই গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে সহজেই মাল আটকাইয়া রাখিয়া উহা বেশী দামে বিক্রয় কর অসম্ভব নহে।

গভর্ণমেণ্ট যখন এ-বিষয়ে সাহায্য করিতে উদাসীন, তখন পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা বিক্রয় করা আদৌ সমীচীন নহে।

পাটের চাষ কমানো সম্বন্ধে যে আন্দোলন চালান হইয়াছে, তাহা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। যদিও ধান্যের দাম কমিয়া যাওয়ায়, এক্সচেঞ্জ্ ডিপ্রিসিয়েসনের জন্য গতবৎসর পাটের দাম অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায়, চীন জাপানের যুদ্ধ হওয়ার সংবাদে এবার লোকে পাট বেশী করিয়া বুনিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিল, তবুও পাট চাষ কমাইবার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বুঝিয়া লোকে পাট চাষ অনেকটা কম করিয়াই করিয়াছে।

কলিকাতার বাজারদর

করগেট ও লোহা

৬ই জুলাই, কলিকাতা

টাটা— প্রতি হন্দর

কড়ি মার্কা ৫।০ হইতে ৬॥০ „

ঐ বেমার্কা ৪।০ „ ৫৲ „

বরগা ৫॥/০ „ ৬॥০ „

এঙ্গেল ৫/০ „ ৬॥ „

বল্ট (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ) ৫॥০ হইতে ৬/

গরাদে ঐ ৫॥০ „ ৬৲

ব্ল্যাক সীট ও প্লেট ৬৵০ „ ১০৲

করগেট টিন (২২গেজ ১২॥০

„ ২৪ গেজ ১১/ „ ১২৲

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৪গেজ) ১৫॥০

কন্টিন্যাণ্টাল :— প্রতি হন্দর

টানা রড ঐ ৫॥০ হইতে ৬৲

করগেট টিন (২৬ গেজ ১৩৷৵০ হইতে ১৮॥০

গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ

১২॥০ হইতে ১৫॥০ ”

কাঁটা তার ১১৲

কন্টিন্যাণ্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান

ইংলিশ— প্রতি হন্দর

টাটার বৃটীশ মালের সমান মাল ও বৃটীশ মালের দাম উপরিউক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ॥০ হইতে ১।০ টাকা অধিক

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১৩৷৵০

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ। ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিঃ ৪৯৪৫

করগেট ও লোহা

৬ই জুলাই, কলিকাতা

করগেট চাদর ২২ গেজ ১১৷৵০ হন্দর

” ” ২৪ ” ১১।/০ ”

” ” ২৬ ” ১৩।০ ”

জয়েষ্ট বা কড়ি ৪॥০ হইতে ৬।৵০

টী বা বরগা ৫।০ ” ৬।৵০

এঙ্গেল ৫।০ ” ৬৵০

(বোল্ট গোলা ৪॥০ ” ৫॥০

” (চৌকা ৪॥০ ” ৫॥/০

কাটা তার ১৮॥০

মটকা ॥৵০ হইতে ১।০ প্রত্যেকটা

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দৈনিক বাজার দর

৬ই জুলাই, কলিকাতা

ব্লক টিন বা রাং ১০৯॥০ প্রতি হন্দর

তামার ইনগট ৩৫॥০ ”

সীসার বাট বি, এম, ছাপ ১৩॥৵০ ”

ঐ দেশীয় ১৩ ”

এ্যাণ্টিমনি ২৮॥৵০ ”

ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট ৯৭॥০ ”

পিতলের চাদর	৪১।০	,,
পিতলের ছড়	৩৬।০	,,
তামার চাদর	৫৫।০	,,
তামার ছড়	৫৫৸০	,,
সীসার চাদর	১৯।/০	,,
দস্তার টালি আমদানী	১২।৵০	,,
ঐ দেশীয়	১১॥৵০	,,
সাদা দস্তা রং	২৸০	,,
সাদা সীসা রং	১৮।৵০	,,
সবুজ রং	১৯৵০	,,

লাল রং	১৯।০	,,
তারপিন তৈল	১৮।৵০	প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল [পাকা]	৯॥০	,,
ঐ ঐ [কাঁচা]	৮৵০	,,
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৬৸০	প্রতি টন
ঐ আমদানী	৯॥৵০	প্রতি পিপা

গোপাল চন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬ এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা

চাউলের দর

৬ই জুলাই, কলিকাতা

দাদখানি		৮৸৹
কাটারি ভোগ	৫।৵৹ হইতে	৫৸৹
বাদসা ভোগ	৫৲	৫।৹
মাজাবাকতুলসী (সরেস)	৫৸৹	৫৸৹
ঐ কোরা	৪।৹	৪৸৹
ঐ আতপ	৫।৹	৫৸৹
ভাসা মাণিক	৪৵৹ ,,	৪।৹
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৸৹ ,,	৪৲
পাটনাই (সরেস)	৩৸৵৹	৪৲
কল্‌মা	৩।৹	৩৸৹
ছাটা বালাম ১নং	৪৸৹ ,,	৫৲
ছাঁচি মোটা	২৸৵৹ ,,	৩৲

বঙ্গলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। ফোন নং কলি: ৩৪২৬।

আটা ও ময়দা

৬ই জুলাই, কলিকাতা

প্রতি মণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫।৹	হইতে	৫।৵৹
সুপার ফাইন	৫৵৹	,,	৫।৹
হাউস হোল্ড	৪৸৹	,,	৪৸৵৹
সুজী	৫৵৹	,,	৫।৹
আটা 'বি'	৪৸৵৹	,,	৫৲
আটা ২নং	৪৸৴৹	,,	৪৸৶৹
আটা 'এস'	৪।৶৹	,,	৪।৴৹
আটা (ক)	৪৲	,,	৪৵৹
আটা ৩নং	৩৲	,,	৩৵৹
পোলার্ড	২৵৹	,,	২।৹
ব্রান	২৲	,,	২৵৹

এই সকল ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দর দেওয়া হইল।

কাশিম ও ইস্‌মাইল, ময়দার দালাল ৫।২ গার্ডেন প্লেস।

চিনির দর

৬ই জুলাই, কলিকাতা

দেশী চিনি

সুখচর	দোবরা	চিনি	১৮।৫
,,	একবরা	,,	১৬৵৫
,,	পেতে	,,	১৬৸৫
,,	চৌফেরা		,,
কোটচাঁদপুর দোবরা		,,	১৮৲৫
,,	একবরা	,,	১৬৵৫
,,	আকরা বা দুলুরা	,,	১০৲৫
,,	গোঁড়	৮।৫	৮৸৫
শান্তিপুর দুলুয়া		১১৲৫	১১।৫
,,	গোঁড়	,,	৮৸৫
মুন্সিগঞ্জ দলুয়া		,,	১১৸৫
,,	মধ্যম আকড়া	,,	১০৲৫
,,	চাঁদি গোঁড়	,,	৯৸৫
,,	কমা লালি	,,	৮।৫

কাণপুর চিনি

কাণপুর দানাদার	১নং	,,	১০৸৵৹
,,	২নং	১০৲	১০৵৹
,,	৩নং	,,	৯৸৹
পিটি	১নং	,,	১।৹
,,	২নং	,,	১০৵৹
,,	৩নং	,,	১০৲
ছাচি ইক্ষুজাত		,,	১১৲৫
কাশীর চিনি			১১৸৹, ১১৸৹

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দাঁ

২ বি, রামকুমার রক্ষিত লেন, বড় বাজার, চিনিপটী।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৯ { ৪র্থ সংখ্যা

সাবান প্রস্তুতের নানারূপ উপাদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাবানে রজন (Rosin) উপাদান ব্যবহার

সাবান প্রস্তুতের শেষ অবস্থায় যখন Strong কষ্টিক লাই ব্যবহার করিবে তখন রজন সাবানের সহিত মিশাইয়া Strong লাই দ্বারা সাবান প্রস্তুত শেষ করিতে হয়; ইহাই উত্তম ব্যবস্থা।

অথবা, রজন কড়াইতে সম্পূর্ণরূপে গলাইয়া তাহাতে তৈল মিশাইবে। কাষ্ঠ শলাকা দ্বারা আলোড়ন করতঃ উভয় উত্তমরূপে মিশাইবে।

এখন লাই মিশাইয়া নিয়মমত সাবান প্রস্তুত করিতে হয়।

১/ মণ তৈলে /৫ সের রজন মিশান বিধেয়। ।০ সের পর্য্যন্ত মিশান যায়। রজন সাবানের রং পরিমাণ অনুসারে হলদে হইলে গাঢ় তাম্রবর্ণ হয়।

সাবান প্রস্তুত কালে বিভিন্ন পরীক্ষা

১। প্রথম অবস্থায় কড়াইর তৈল ও লাইর ক্রিয়ায় সাবান উৎপাদন হইতেছে কিনা।

(ক) তৈল ও লাইর মিশ্রণে ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ হয়। সাবান উৎপাদন আরম্ভ হইলে ঐ বর্ণ গাঢ় এবং ক্রমে তাম্রবর্ণ হয়।

(খ) একখানি কর্ণিতে কড়াইর মাল উঠাইলে উহা হইতে যে তরল পদার্থ গড়াইয়া পড়ে তাহা লক্ষ্য করিতে হয়। সাবান উৎপাদন আরম্ভ হইলে উহা মধুর ন্যায় ও জলের চেয়ে গাঢ় পড়িবে। যদি দেখা যায় উহাতে দানা দানা জিনিষ আছে তবে লাইর শক্তি বেশী হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কতক জল মিশাইবে।

(গ) জিহ্বা দ্বারা কড়াইর পদার্থের আস্বাদ লইতে হয়। যদি ক্ষারের পরিমাণ বেশী থাকে

তাহা হইলে জিহ্বা জ্বালা করে। যদি জিভ্ খুব কম জ্বালা করে তবে সাবান উৎপাদন হইতেছে। যখন জিহ্বা মোটেই জ্বালা করিবে না তখন সমস্ত কষ্টিক সাবানে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ জিহ্বার পরীক্ষা দ্বারা কখন আবার লাই দিতে হইবে ঠিক করিতে হয়।

কখনও দানা হইতে দিবেনা। দানা হইলে জল মিশাইয়া জ্বাল দিলেই উহা সংশোধন হইবে। প্রথম অবস্থায় দানা আরম্ভ হইলে শেষ অবস্থায় সাবান ঠিক করা কঠিন হয়।

২। সাবান পাকের শেষ ঠিক করা।

(ক) জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা!

(খ) কর্ণিতে তরল সাবান উঠাইয়া উহা হইতে গড়াইয়া পড়িতে দিতে হয়। উহা তিন প্রকারে পড়িতে পারে।

(১) অস্বচ্ছ সূতার ন্যায়। উহাতে বুঝা যায় সাবান মধ্যে এখনও অপরিবর্ত্তিত তৈল আছে।

(২) স্বচ্ছ সূতার ন্যায়। ইহাতে বুঝা যায় সাবান ঠিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে।

(৩) স্বচ্ছ সূতার ন্যায়; কিন্তু সূতা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ও সাদা সাদা হইয়া পড়ে। ইহাতে কষ্টিক সোডা বেশী আছে বুঝায়।

(গ) কড়াইর সাবান উঠাইয়া এক ফোঁটা শীতল স্থানে ফেলিতে হয়। যদি সম্পূর্ণ ফোঁটাটী একইরূপে জমিয়া অস্বচ্ছ হয় তবে বুঝিবে তৈল বেশী আছে। যদি ফোঁটাটীর বাহিরের অংশ জমিয়া প্রথম শ্বেতবর্ণ চক্র হইয়া নিয়মিতভাবে মধ্য ভাগ জমিতে থাকে তবে বুঝিবে সাবান ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে। আর চক্র হইয়া অনিয়মিতভাবে মধ্যভাগ জমিয়া যায় তবে কষ্টিক সোডা বেশী আছে।

সাবানের দোষ সংশোধন

জ্বালের কম জন্য সাবান নরম হইলে শিলিকেট পরিমাণের চেয়ে একটু কম ব্যবহার করিলেই উক্ত দোষ সংশোধন হয়। যদি জ্বালের আধিক্যবশতঃ শক্ত হইয়া যায় তবে শিলিকিট অনুপাতের চেয়ে একটু বেশী দিলেই সাবান স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নষ্ট সাবানের প্রতিকার

নষ্ট সাবান উদ্ধার করিতে হইলে, নূতন সাবানের জ্বাল বসাইয়া যখন সাবান তৈয়ার হইবে তখন ঐ নষ্ট সাবান এই নূতন সাবানের মধ্যে দিতে হয় এবং গলিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল দিতে হয়। পরে জ্বাল দিয়া উপযুক্ত ঘন করিতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার সাবানের উপাদান বা ফরমূলা

সাদা সাবান

১। নারিকেল তৈল	।০ সের
বাদাম তৈল	৸০ সের
মহুয়া তৈল	৸০ সের
রেড়ীর তৈল	।০ সের
জল	২/ মণ
কষ্টিক সোডা	।০ সের
শিলিকেট	।০ সের
২। বাদাম তৈল	৸০ সের
মহুয়া তৈল	৸০ সের
রেড়ীর তৈল	।০ সের
সরিষার তৈল	।০ সের
জল	২/ মণ
কষ্টিক সোডা	।০ সের
শিলিকেট	।০ সের

ধোবী সাবান

১। নারিকেল তৈল	॥৫ সের
কষ্টিক সোডা	৴৮ সের
জল	॥০ সের
শিলিকেট	৴৫ সের
সোপ ষ্টোন	৴৫ সের

Transparent Soap

সাবান Transparent বা স্বচ্ছ করিতে হইলে দেখিতে হইবে সাবান প্রকৃত সাবান কিনা, অর্থাৎ সাবানে free alkali আছে কিনা! Free alkali থাকিলে প্রথমে সাবানটী Neutral salt করিতে হইবে অর্থাৎ সাবানের Free alkali উঠাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে যে পরিমাণ সাবান সেই পরিমাণ alcohol তাহাতে দিয়া সাবান জ্বাল দিলে প্রকৃত সাবান alcohol-এর সহিত গলিয়া যাইবে এবং পরে তাহা ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা, কি করিলে যথাসম্ভব কম alcohol দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করা যায়, কেননা alcoholএর দামের গুরুত্বের জন্য সাবানের দাম বাড়িয়া যায়। ইহার জন্য একটী distilling stillএর দরকার। এই Stillএর সহিত একটী Serpentine (বাঁকা নল) সংযুক্ত থাকিবে এবং যে পাত্রে সাবান জ্বাল দিতে হইবে সেই পাত্রের সহিত এই Serpentine নল এমনভাবে সংলগ্ন থাকিবে, যে সমস্ত Alcoholic Vapour এই Serpentine নল দিয়া যাইবে। এখন যদি এই Serpentine নলটী একটী ঠাণ্ডা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দিয়া যায় তাহা হইলে Condensed alcohol পুনরায় ধরা যাইতে পারে। সাবানের সহিত তুল্য ওজনের alcohol মিশাইয়া অল্প উত্তাপ দিয়া তাহা গলাইতে হইবে। যখন সাবান গলিয়া alcohol-এর সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন জ্বাল কমাইতে হইবে; কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে সাবানের সমস্ত impurities নীচে নামিয়া যাইবে এবং তখন সাবান ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া Hot-Houseএ রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। শুকাইয়া গেলে সাবান-গুলির চাকচিক্য কমিয়া যায়। কিন্তু যদি প্রত্যেক Cakeটী একটী বস্ত্রখণ্ড alcoholএ ভিজাইয়া তাহার দ্বারা পালিশ করা যায় তাহা হইলে আবার চাকচিক্য ফিরিয়া আসে।

Formula (a)

Stearic acid		25 Parts
Coconut oil		55 "
Castor oil		20 "
Lye Caustic Soda	(38°B)	50 "
Alcohol	(90°)	60 Parts
Sugar (Crystal)		20 "
Water (Distilled)		20 "
Glycerine	(28°B)	40 "

প্রথমে Stearic acid ও নারিকেল তৈল অল্প উত্তাপে গলাইয়া লইয়া তাহাতে Castor oil ঢালিতে হইবে। যখন উত্তাপ 50°C to 60°C হইবে তখন গলিত তৈলে alcohol মিশ্রিত Sodalye দিয়া Saponify করিতে হইবে। যখন Saponification হইয়া গেল তখন তাহাতে sugar এবং Glycerine, Distilled water অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইতে হইবে। কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে Sugar ও Glycerine মিশ্রিত জল সাবানে ঢালিবার পূর্ব্বে যেন 70°c/80°c উত্তাপ থাকে।

ইহার পর আগুন নিবাইয়া দিতে হইবে এবং যখন সাবানের উত্তাপ কমিয়া 40°c হইবে তখন তাহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইতে হইবে।

Alcohol সাহায্যেই উত্তম Transparent Soap প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু alcohol-এর মূল্যাধিক্য প্রযুক্ত অন্য উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

Formula (B)

Tallow	24	parts
Cocoanut oil	20	,,
Castor oil	30	,,
Lye soda (36°B)	37	,,
Sugar (crystal)	18	,,
water (Distilled)	20	,,
Glycerine (Colourless 28°B)	3	,,
Caustic soda crystal	5	,,

চর্ব্বি ও তৈল একসঙ্গে গলাইয়া লইয়া তাহার পর cold process-এ Saponify করিয়া লইতে হইবে। পরে ২ ঘণ্টা হইতে ৩ ঘণ্টা boil করিতে হইবে। যখন সাবান বেশ ঘন Translucid হইবে অমনি উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে এবং পাত্রটী কম্বল দিয়া ঢাকিতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে যখন সাবান Gilatenous আকার ধারণ করিবে এবং সাবানের উত্তাপ কমিয়া 74°C কাছাকাছি হইবে, তখন চিনি ও Glycerine Distilled wator-এর সহিত মিশাইয়া এবং এই মিশ্রের উত্তাপ এবং সাবানের উত্তাপ সমভাবে আনিয়া সাবানে মিশাইয়া দিতে হইবে; এবং দেখিতে হইবে যে মিশ্রণ কার্য্যটী যেন বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে হয়। মিশান শেষ হইলে crystal soda ভাঙ্গিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে এবং ইহার পর rest নিতে হইবে। যখন এই মিশ্রণ বেশ পরিষ্কার হইবে এবং যখন সাবানটী

তুলিলে দেখা যাইবে যে সাবানটী উপযুক্ত পরিমাণে Solid এবং Transparent হইয়াছে তখন উপরকার ফেনা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে গন্ধ দ্রব্য এবং রং দিতে হইবে, কিন্তু সাবান ঠাণ্ডা হইবার পূর্ব্বে ফেনা তোলা যাইবে না।

Formula (C)

Transparent Soap without Alcohol and Glycerine,

Tallow	27	parts
Cocoanut oil	22	,,
Castor oil	27	,,
Lye caustic soda 38°	42	,,
Sugar crystal	24	,,
Water (Distilled)	26	,,

চর্ব্বি ও তৈল 35°c হইতে 40°c উত্তাপে গলাইয়া লইয়া Saponify করিতে হইবে এবং যখন সাবান বেশ গাঢ় হইয়া যাইবে তখন Hot Water Bath-এ রাখিয়া পূর্ব্বোল্লিখিতভাবে অন্যান্য Operation করিতে হইবে।

Floating Soap

সাবান Floating বা ভাসমান করিতে হইলে উত্তম qualityর সাবান লইয়া টুক্‌রা করিতে হইবে। পরে সেই সাবানের টুক্‌রাগুলি Hot water Bath-এ রাখিয়া যতটা সাবান তাহার অর্দ্ধেক জলে গলাইয়া লইতে হইবে। সাবান গলিয়া গেলে দেখিতে হইবে উত্তাপ ৮০° আছে কিনা এবং এই উত্তাপ থাকিতে থাকিতে হাতার দ্বারা সাবান খুব নাড়িতে হইবে।

এইরূপ ভাবে নাড়িলে সাবানে ফেনা হইয়া তাহার Volume দ্বিগুণ হইবে। এইরূপ অবস্থায় আসিলে জ্বাল বন্ধ করিতে হইবে এবং ইহাতে রং ও গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া আরও একবার নাড়িতে হইবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা এই অবস্থায় রাখিয়া পরে Formaতে ঢালিয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। যখন শুকাইয়া যাইবে তখন ইচ্ছামত কাটিয়া টুক্‌রা করিতে হইবে।

German Floating Soap

Formula

Cocoanut oil	420	parts
Palm oil	30	,,
Rosin (Refined)	50	,,
Tallow	100	,,
Olive oil	120	,,

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি 360 ভাগ Caustic soda at 40°এ সহিত মিশাইয়া Saponify করিতে হইবে এবং Saponify আরম্ভ করিয়া diluled lye দ্বারা ক্রমশ Concentration বাড়াইয়া লইতে হইবে। পরে যখন সাবান হইয়া যায় তখন তাহাতে ৪০০ ভাগ palmitic acid মিশাইয়া দিতে হইবে, তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কড়া হইতে সাবান সহজে ছাড়িয়া যায় ততক্ষণ সাবান জ্বাল দিতে হইবে। তারপর ইচ্ছামত রং ও সুগন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হইবে। Forma তে ঢালিবার পূর্ব্বে গরম সাবানে Bicarbonate of soda (powder) মিশাইয়া দিতে হইবে। ইহা মিশানতে গরম সাবান decompose হইয়া Carbonic acid এবং Carbonate soda হয়। এই carbonic acidএর দরুণ সাবানের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র cavity বা ছিদ্র হয় এবং সাবানের density কমিয়া যায়। সেই জন্য এই সাবান জলে ভাসে।

Bar soap (Gossage)

Gossage-এর Bar Soap-এ যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহা খাঁটী Palm Oil-এর গন্ধ, উহাতে আর কোন প্রকার গন্ধ দেয় না। খাঁটী Palm Oil ছয় ভাগ। caustic Soda ও এক ভাগ Potash lye দিয়া জ্বাল দিয়া ঐ সাবান তৈয়ারী করে; কিন্তু ইহাতে যে Palm Oil ব্যবহার হয় তাহা First quality নয়। নিম্নে জাপানের Expert T. Koizumi-র Transparent Soap এবং Bar Soap-এর Formula দিলাম। ইনি ১৯০৩ সালে কিছু-কালের জন্য Bengal Soap Factory-র Expert ছিলেন, পরে National Soap Factory-রও Expert হইয়াছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত Formnla-য় উপরোক্ত কারখানাতে Transparent Soap ও Bar Soap প্রস্তুত করিতেন।

Transparent Soap

(1)	Tallow	12½ Lbs
	Cocoanut oil	6½ ,,
	Castor oil	6 ,,
	Sugar	2 ,,
	Water	1 ,,
	Alcohol	12 ,,
	Soda 39°b	12 ,,
	Sugar color	2 oz

Sugar color must be made with Boric acid

(2)	Tallow	12½ Lbs
	Cocoanut oil	6½ ,,
	Alcohol	12 ,,
	Castor oil	3 ,,
	Rosin	3 ,,
	Sugar	2 ,,
	Water	1 ,,
	Soda 39 B°	12 ,,

Bar Soap

Tallow	10	maunds
Cocoanut oil	4	,,
Castor oil	2	,,
Silicate	8	Buckets
Water	100	,,
Caustic soda		
	76 78% 3½	maunds

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার দেশলাই ব্যবসা এবং সুইডিস্ ট্রাষ্টের সহিত ইহার সংঘর্ষ

ফ্রান্স

১৯২৭ সনে ফরাসীর ফ্রাঙ্কের মূল্য স্থির রাখিবার জন্য সুইডিস ম্যাচ্ ট্রাষ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ১,৮৭৫,০০০,০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ২০,৮৫,০০,০০০ টাকা ধার দেয়। সিকিউরিটি হিসাবে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ সুইডিস্ ম্যাচ ট্রাষ্টকে ফ্রেঞ্চ ট্রেজারি বণ্ড দেয়, এবং প্রতি বণ্ড ২৫৯্ টাকা মূল্যে ট্রাষ্ট কিনিয়া লয়। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের এই ধার প্রতি বণ্ডে ২৮৮্ দিয়া কিনিয়া লইবার কথা—ট্রাষ্ট ইহাতে মোটামুটি ২,০৮,৫০,০০০ টাকা লাভ করে। এই আর্থিক লাভ ব্যতীত ট্রাষ্ট ফরাসী দেশে ২০ বৎসরের জন্য ম্যাচের একচেটিয়া ব্যবসায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

জার্ম্মাণী

জার্ম্মাণীতে সুইডিস্ ট্রাষ্ট ম্যাচ ব্যবসায়ের শতকরা ৬৫ ভাগই করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে। সমস্ত ব্যবসা-ই পাছে ট্রাষ্টের হাতে যাইয়া পড়ে এই ভয় করিয়া জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সনে একটি আপোষের বন্দোবস্ত করে। উহার মূল সর্ত্তগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

(ক) একটী বিক্রয় সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়া উহার শতকরা ৬৫ অংশ সেয়ার সুইডিস্‌দের হাতে দেওয়া হইল ; বাকী অংশ জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের হাতে রহিল।

(খ) গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত সুইডিস্ ট্রাষ্টের কোন নূতন ফ্যাক্টরী করিবার অধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

(গ) যদি কোন ফ্যাক্টরী কাজ বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে উহা অন্য একটী ফ্যাক্টরী—যাহা দেশলাই প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় নিযুক্ত রহিয়াছে—কিনিয়া লইতে পারিবে। এইরূপে সুইডস্ কোম্পানীর অনেক ফ্যাক্টরী ভবিষ্যতে নিজেদের তাঁবে আনিবার সুবিধা বজায় রহিয়া গেল।

এইরূপ একটা রফা হইয়া গেলেও, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট যাহা ভয় করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহাই হইয়া গেল। ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে সুইডিস্ ট্রাষ্ট দেশলাইয়ের বাজার একচেটিয়া করিয়া লইল ; গবর্ণমেণ্টের টাকার প্রয়োজন পড়ায় ট্রাষ্টের কাছ হইতে তাহারা ৫০ বৎসরে শোধ করিবার অঙ্গীকারে ৩৪,৭০,০০,০০০ টাকা ঋণ স্বীকার করেন।

পোলাণ্ড

১৯৩০ সনের নভেম্বর মাসে ঠিক হইল যে ১৯২৫ সনে সুইডিস্ ম্যাচ্ কোম্পানী এবং ইণ্টার ন্যাশনাল্ কোং যে সুবিধা বা কন্‌সেসন্ ভোগ করিয়াছেন, তাহার আয় হইতে ৯,০০,০০,০০০, টাকা মূল্যের পোলিশ গবর্ণমেণ্ট বণ্ড কিনিয়া লওয়া হউক। সর্ত্তানুসারে সমস্ত টাকা

১৯৩২-৩৩ সনে দিবার কথা ছিল বটে; কিন্তু মেসার্স ক্রুগার এণ্ড টল্ উহা ১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসেই দিয়া দিয়াছেন। ইহার চুক্তি অনুসারে সুইডিস্ ট্রাষ্টের ম্যাচ্ ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইবার অধিকার ১৯৬৫ সন পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

সুইট্জার ল্যাণ্ড

সুইট্জারল্যাণ্ডে কিন্তু সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্টকে আদৌ এই অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু তবুও তাহারা বাজারে আরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ট্রাষ্ট সেখানে যাইয়া আড্ডা বসাইবার পূর্ব্বে, দেশী ম্যাচ ফ্যাক্টরীগুলি বেশী পরিমাণে মাল প্রস্তুত করার দরুণ দারুণ প্রতিযোগিতার মধ্যে কাজ করিতেছিল এবং ম্যাচের দামও তাই অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত কোম্পানী-গুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য ১৮৮৬, ১৯০২, ১৯০৪, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এমন কি, ১৯১৩ সন পর্য্যন্ত, এইরূপে কাজ চলিতেছিল। যুদ্ধের পর সুইডিস্ ম্যাচ ব্যবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। ১৯২৩ সনে সুইডিস্ ট্রাষ্ট উক্ত কোম্পানীগুলি কিনিয়া লইবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন এবং তিনটি ফ্যাক্টরী কিনিয়া লন। উহাদের নাম—

(১) সোঁসা স্থ লা ফাব্রিক্ দ্য আলুমঁস্ ডায়মণ্ড এস, এ। উহা লিয়ন্সে অবস্থিত এবং উহার মূলধন ৩৬৫,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(২) ফাব্রিক সঁয়মে দ্য আলুমঁ্যাস্ ফ্লোরি এস, এ। ইহা ফ্লুরিয়ারে অবস্থিত এবং ইহার মূলধন ২০০,০০০ ফ্রাঙ্ক।

(৩) ফাব্রিক্ দ্য আলুমঁ্যাস্ হানস্ সুমেষ্টাইন এস এ। ইহা ভিমিসে অবস্থিত।

এই সমস্ত ব্যাপারী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সুইডিসদের কোন হাত ছিল না। পরবর্ত্তী বৎসরে সুইস্ এবং সুইডিস ফ্যাক্টরীগুলির কর্ম্মকর্ত্তারা একযোগে মিলিয়া দাম ঠিক রাখিবার জন্য একটী বিক্রয়ের ডিপো খোলার প্রস্তাব করেন। ট্রাষ্টের ফার্ম্ম তিনটি কনফারেন্সে যোগ না দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুইস্ কারখানাকে—উহা জে, এইচ, মোসার, এ, জি'র ফ্যাক্টরী—নিজেদের তাঁবে আনিবার চেষ্টা করেন, এবং কালক্রমে তাহাদের ঐ প্রচেষ্টা সাফল্যলাভও করে। ১৯২৭ সনের ২০শে মে তারিখে দুইদলে সম্মিলিত হইয়া ঠিক করে যে যে-দশটি মাঝারি ফ্যাক্টরী বেশী মালপত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে ট্রাষ্ট কিনিয়া লইয়া বন্ধ করিয়া দিবে। এইরূপে পূর্ব্ব সুইট্জারল্যাণ্ডের সমস্ত ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কেবলমাত্র কন্দেরথলে ৪টী কারখানা চলিতে থাকে। নিম্নলিখিত ৭টী কোম্পানী সুইস্ চাহিদার শতকরা ৮২ ভাগ পূরণ করিয়া থাকে; বাকী ১৮ ভাগ সুইডেন হইতে আসিয়া থাকে:—

(১) মোসিয়েঁ স্ব ল ফাব্রিক দ্য' আলুমঁ্যাস্ 'ডায়মণ্ড', এস এ, লিয়ন ৩৬৫,০০০ ফ্রাঙ্কস্

(২) ফাব্রিক সুইস্ দ্য' আলুমঁ্যাস্ ফ্লুরিয়ের এস, এ ২০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্

(৩) ফাব্রিক দ্য' আলুমঁ্যাস্ হ্যানস্ সুমেষ্টাইন এস, এ, সিম্মিস্ ৫০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্

(৪) জে, এইচ, মোসার, এ, জি, কাণ্ডের ক্রক্ 1,200,000, ফ্রাঙ্কস্

(৫) "কাণ্ড" এ, জি, রাইথেনবাক্ ৩০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্

(৬) সুণ্ডবরেনফাব্রিক কাণ্ডেরগ্রুস্ত্ এ, জি, কাণ্ডের গ্রুস্ত্ ১০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্

(৭) তাইলকাস্ গিসেলার বেঙ্গি এ, জি .০০,০০০ ফ্রাঙ্কস্

ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৪টি ট্রাষ্টের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কের বিখ্যাত গস্ এণ্ড কোং কোপনহাগেনে স্থাপিত হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—তখন উহার সেয়ার ক্যাপিটাল ছিল ২,০০০,০০০ ক্রাউন। ১৯১৩ সনের দিক দিয়া এই কোম্পানী যথেষ্ট মাল প্রস্তুত করিতে থাকে; কিন্তু দারুণ বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য (সুইডিস্ এবং বাল্টিক) ব্যবসায়ে ক্ষতি পড়িতে থাকে। ডেনমার্কের বেশীর ভাগ চাহিদাই রুষিয়া মিটাইবার ভার লইয়াছে।

লিথুয়ানিয়া

১৯৩০ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখের একটী সর্ত্তানুসারে লিথুনিয়ার গভর্ণমেণ্ট সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্টকে ৩৫ বৎসরের জন্য বাজারে একচেটিয়া করিয়া লইবার সুবিধা প্রদান করে। উক্ত সর্ত্তানুসারে ট্রাষ্টের ১,৬৬,৮০,০০০ টাকা মূল্যের গভর্ণমেণ্ট বণ্ড ক্রয় করিতে হয়।

জেকো শ্লোভাকিয়া

সুইট্জারল্যাণ্ডে ম্যাচ রপ্তানী সম্বন্ধে এই ষ্টেটের সঙ্গে সুইডিস ট্রাষ্টের একটি রফা হইয়া গিয়াছে। সুইট্জারল্যাণ্ডে সাধারণতঃ বুক্-ম্যাচেস্ বেশী রপ্তানী হইয়া থাকে—জেকো শ্লোভাকিয়ার সঙ্গে এই ধরণের একটা চুক্তি না হইলে ট্রাষ্টকে অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইত।

তুরস্ক

তুরস্ক গণতন্ত্রের সহিত ও দেশলাই ব্যবসা সম্বন্ধে একটী কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। এতদনুসারে ইণ্টার্ন্যাশনাল্ ম্যাচ্ কর্পোরেশন ২৫ বৎসর অবধি সুবিধা পাওয়ার জন্য রিপাব্লিককে আনুমানিক প্রায় ২,৮০,০০,০০০ টাকা দিবে।

ব্রেজিল

ব্রেজিল এমন একটী দেশ যাহার দেশলাই ব্যবসায় পরোক্ষভাবে সুইডিস্ ট্রাষ্ট দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উহার বৃহৎ তিনটি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী ফায়াট্ লাক্স কোংর অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তাহা নিথ্থেরয়, সাওপলো, এবং সুরিতিবা নামক স্থানে অবস্থিত। বৎসর তিনেক পূর্ব্বে যখন বাজারে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা সুরু হয়, তখন "কিয়া ব্রেজিলেরিয়া দ্য ফস্ফরস্" নামক কোম্পানী ১, ১৬, ৭৬,০০০ টাকা পুঁজি করিয়া লইয়া ২২টী ব্রেজিলের ফ্যাক্টরী কিনিয়া লয় এবং উহার অর্দ্ধেকটারই প্রায় কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। অনেকে বলেন যে, উপরোক্ত কিয়া ব্রেজিলিয়া দ্য ফস্ফরস্ কোং ইণ্টার্ন্যাশনাল ম্যাচ কর্পোরেশনের কথামত চলিয়া থাকে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে সুইডিস্ ট্রাষ্টের আড্ডা ভাল হইয়াই জাঁকিয়া বসিতেছে।

গয়টেমল

এখানে ৬৯,৫০,০০০ টাকা, ঋণ দেওয়ার বিনিময়ে ট্রাষ্ট ৩০ বৎসরের জন্য অবাধ একচেটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিবার অধিকার পাইয়াছে।

জাপান

সুইডিস ম্যাচ্ ট্রাষ্ট জাপানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে ; কেন-না, প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানই একমাত্র শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। জাপানী ব্যবসায়কে কাবু করিবার পূর্ব্বে ট্রাষ্টের ম্যাচের দাম প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতে বিশেষভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাকে জব্দ করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্ট টোকিয়ো ম্যাচ কোং,নিপ্পঙ্ ম্যাচ্ কোং (কোবে), কোকিয়া ম্যাচ্ কোং, কোবায়সি ম্যাচ্ কোং (ওয়াকা) প্রভৃতি নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া ডায়ডো ম্যাচ্ কে, কে, নামে এক নতুন কোং প্রতিষ্ঠা করে—১১,০০০,০০০ ইয়েন্ মূলধন লইয়া। এই নূতন কোম্পানীর আবার আসাহী ম্যাচ্ কোং (কোবে), চুগাই ম্যাচ্ কোং (ওকায়ামা) এবং সিমোৎসু ম্যাচ্ কোং (তাকামাৎসু) সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংস্পৃষ্ট।

ভারতবর্ষ

জাপানীদিগকে ভারতের বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, ট্রাষ্ট ভারতের দেশলাইয়ের কারবার দখল করিয়া লইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন দেশী দেশলাইয়ের

ব্যবসায় সর্বেমাত্র ভারতে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তখন ট্রাষ্ট আর নীরবে থাকা সমীচীন বোধ করিল না—ভারতবর্ষেই ফ্যাক্টরী প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিল। ভারতের নিম্নলিখিত স্থলে তাহারা ইতিপূর্ব্বেই আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছে :—

(১) ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোং, অম্বর নাথ, বোম্বাই।

(২) ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ্ কোং, কলিকাতা।

(৩) আসাম ম্যাচ্ কোম্পানী, আসাম।

(৪) ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ, কোং, রেঙ্গুন, বর্ম্মা।

(৫) সুইডিস্ ম্যাচ্ কোং, পরেল, বোম্বাই।

(৬) মান্দালয় ম্যাচ্ কোং, মান্দালয়, বর্ম্মা।

ইহাদের মধ্যে পরেল এবং মান্দালয়ের কোম্পানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ট্রাষ্ট ইতিমধ্যে আবার বেরিলি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী (বেরিলি) কিনিয়া লইয়াছে। ১৯২৫ সালের দিকে মেসার্স আদমজী দাযুদ্ অ্যাণ্ড্ কোং সঙ্গে ট্রাষ্ট একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করেন - কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতা শেষে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়ে এবং ১৯২৬ সালের ২৭শে অক্টোবর ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগ স্বদেশী ম্যাচ্-শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য প্রটেক্সন্ দেওয়া উচিত কিনা তাহা দেখিবার ভার ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ্ বোর্ডের হাতে ছাড়িয়া দেন। ন্যায়সঙ্গত প্রটেকসন গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে না পাওয়া গেলেও সুইডিস্ ট্রাষ্টের সঙ্গে কিরূপ প্রতিযোগিতা করিতে হইবে এবং শিশু-শিল্পটীর ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে—তাহা ইহা হইতেই কতকটা উপলব্ধি হয়। শক্তিশালী বিদেশী কোম্পানীগুলিই যেখানে ট্রাষ্টের সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—সেখানে অসহায় শিশু-শিল্পটী কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইজন্য এই দেশলাই-ব্যবসায় জীবিত রাখিবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ধরণের আইন পাশ হওয়া উচিত।

সুইডিস্ ম্যাচ্ ট্রাষ্টের বিদেশী কনসেসন্

উপরোল্লিখিত দেশসমূহ ব্যতীত ট্রাষ্ট্ অনেক গভর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিয়াও নানারকম সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে; নীচে একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

(১৯৩১ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত)

দেশের নাম	টাকা	সুদ	'ইস্যু' করার হার
হাঙ্গেরী	১০,০০,৮০,০০০	৫	৯২
রুমানিয়া	৮,৩৪,০০,০০০	৭	১০০
জুগোশ্লাভিয়া	৬,১১,৬০,০০০	৬½	৯
ল্যাটিভিয়া	১,৬৬,৮০,০০	৬	৯২
ইকুয়েডর	৫৫,৬০,০০০	৮	
গ্রীস	১,৩৫,১৩,৫৮০	৬	৯৪
এস্থোনিয়া	৫২,১৫,২৮০	৬	
ফ্রি সিটি অফ্ ডানজিক্	২৮,০০,০০০	৬	৯৩

সুইডিস ম্যাচ ট্রাষ্ট ও তাহার ভবিষ্যৎ

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর ম্যাচের এক-তৃতীয়াংশের ব্যবসাই সুইডিস্ ট্রাষ্টের হাতে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সন হইতে যে খবর মিলিতেছে

তাহাতে অনুমিত হয় যে রুষিয়ার সহিত ট্রাষ্টকে বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। সোভিয়েট কাষ্টমস্ বুরো'র রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে ১৯২৮-২৯ সনে তাহাদের ম্যাচের রপ্তানী দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়া ১৮,০৫০ মেট্রিক টন অর্থাৎ ১,৫০০,০০০ কেসে পরিণত হইয়াছে। ঐ বৎসরেই জার্ম্মাণ ফ্যাক্টরীসমূহও প্রচুর পরিমাণে মাল প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা জগতের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় যে ১৯২৯ সনের অক্টোবর মাসে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ট্রাষ্টকে যে কনসেসন দিয়াছেন, তাহাতে তাহার স্বকীয় বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অক্টোবর নভেম্বর মাসে জার্ম্মাণী রুষিয়া হইতে ৩৪৮৩ মেট্রিক টন আমদানী করে। ১৯২৮-২৯ সনে যে সমস্ত দেশ রুষিয়ার মাল গ্রহণ করিয়াছে তাহার নাম, ও দ্রব্যাদির একটা পরিমাণ দেওয়া হইল :—

জার্ম্মাণী	৩৪৮৩	মেট্রিক	টন
ইউনাইটেড কিংডম	১৮৩৮	”	”
পারস্য	১৬৮৯	”	”
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্	১৪৭৩	”	”
ল্যাটিভিয়া	৭৪৪	”	”
বেলজিয়াম্	৪১৮	”	”
তুরস্ক	৩৯৬	”	”
ইজিপ্ট	৩৭০	”	”
ডেন্‌মার্ক	৫০১	”	”

ভবিষ্যতে রুষিয়া আন্তর্জ্জাতিক দেশলাই ব্যবসায়ের কতটা স্থান অধিকার করিয়া লইবে তাহা বলা শক্ত। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ভাল ম্যাচ প্রস্তুত করিতে হইলে যে আস্পেন কাঠের প্রয়োজন হয় রুষিয়াতে তাহা প্রচুর পরিমাণে মিলে; এমন কি সুইডেনও ঐ কাঠ আমদানী করিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল। তবে ১৯২৯ সন হইতে আর কাঠ রপ্তানী করা হয় না।

পুকুরে মাছ ধরা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রিল্—বড় রিল্ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নয়; ৩ হইতে ৩½ ইঞ্চি ব্যাসের হইলেই ভাল হয়। ইংলিশ কিংবা ইউরোপীয়ান রিল ব্যবহার না ক'রিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করাই ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়; বস্তুতঃ দেশী পিত্তল-নির্ম্মিত রিলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেখিতে শুনিতে উহা 'আহামরি' ধরণের সুন্দর না হইলেও উহা অনেক দিন টিকিবে, দামেও বেশ সস্তা। অধিকাংশ ইউরোপীয়ান এবং সমস্ত ভারতীয় দোকানেই উহার সন্ধান মিলিবে। উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হইবে, মাঝে মাঝে তেলের ছিটে দিয়া উহাকে সচল রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রিলকে ছিপের সঙ্গে রগ্ দিয়া লেপ্টাইয়া বাঁধিতে হইবে, কিংবা কোন ধাতব আংটী দিয়া আটকাইয়া লইতে হইবে। ভারতীয়েরা প্রথম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেও, বোধ হয় দ্বিতীয় পন্থাই শ্রেষ্ঠ। যাহা দিয়াই বাঁধা হউক না কেন, উহাকে শক্ত করিয়া আঁটিবার দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। গোড়া হইতে ছয় ইঞ্চি দূরে রিলের বসিবার স্থান করিতে হইবে।

ফাত্না—ফাত্না এমন ধরণের হওয়া উচিত যে, মাছের একটু সাড়া পাইলেই যেন উহা কাঁপিয়া উঠিতে পারে। শজারুর কাঁটা সুবিধা-জনক নয়। মান্দ্রাজীরা ৪ হইতে ৬ ইঞ্চি পরি-মাপ দীর্ঘ একপ্রকার ঘাসের ডাঁটা ব্যবহার করে এবং উহার উপর বর্শীর সুতা রাখিয়া দুইটাকেই তুলা দিয়া জড়াইয়া ফেলে; ফাতনার ঠিক এক পাশের দিকে এরূপ করা হয়। এইরূপে ফাত্নাটি কার্য্যতঃ বর্শীর সুতার সঙ্গেই লাগান থাকে এবং দরকার পড়িলে উহার জলের গভীরত্বও বাড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, খানিকক্ষণ জলে থাকিয়া ভারী হইলে অনেক সময় ফাত্নায় জলের মাপ বেশী হইতে থাকে। কাজেই উহা ব্যবহার করা সব সময়ে কার্য্যকরী হয় না। অনেকে ময়ূর-পালকের সাদা অংশ দিয়া ফাত্নার কাজ চালান; বলা বাহুল্য যে অংশ ময়ূরের গায়ে লাগিয়া থাকিত তাহা একটু পুরুও বটে; কাজেই হাল্কা ফাত্নার মত কার্য্যকরী না হওয়া অসম্ভব নয়। সেই জন্য উপরোক্ত ময়ূর-পালকের ফাত্নার যে অংশ এক ইঞ্চির ২¼।১৬র বেশী ব্যাস থাকে, তাহা কাটিয়া ফেলিয়া এক ইঞ্চির ২।১৬ অংশ না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যের ভাগকে ৬ ইঞ্চি লম্বা করিয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত। কেন না ২।১৬ ইঞ্চি ভাগ হইলে, উহা কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া দাঁড়াইবে।

ময়ূর-পালকের ফাত্না ঠিক গোল নয়, কতকটা ডিম্বাকৃতি। উপরে যে পরিমাপ দেওয়া গেল তাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত জায়গার; একটী কম্পাস্ দিয়া সহজেই মাপ ঠিক করা যাইতে পারে। ফাত্নার পুরু জায়গা ইঞ্চির ১।১৬

ভাগ কিংবা ১২।১৬ হইবে। এই চুল-চেরা হিসাব দেখিয়া কেহ আমাকে সাইলকের সগোত্র বলিয়া মনে করিবেন না, আশা করি। মাছ ধরার আনন্দ ইহাতে বাড়িবে বই কমিবে না মনে করিয়াই আমি এইরূপ সঠিক হিসাব করিয়া দিতেছি। এক একটা ময়ূর-পালক ৪।৫ ফিট্
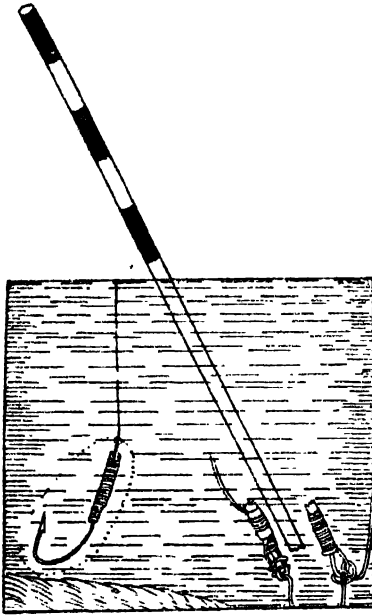
ডিটেকটিভ্ ফাতনা

পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং আমার নির্দ্ধারণ অনুসারে ইহা হইতে ৬ ইঞ্চি পরিমাণ ফাত্না ২।৩ টির বেশী পাওয়া যাইবে না। যদি লেখকের পরিমাপ অনুসারে কাজ করা না যায়, তাহা হইলে উহা হইতে ৬।৭টী ফাত্না সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পালকগুলির দাম খুব বেশী নয়; কাজেই উহা হইতে অনেক ফাত্না তৈয়ার করা যাইবে—কয়েক আনা খরচ পড়িবে মাত্র।

ময়ূর-পালকের রোমগুলি টানিয়া হেঁচ্ড়াইয়া ছাঁটিয়া ফেলা উচিত নয়; সুন্দররূপে কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিলে গায়ের চামড়া উঠিয়া আসিবে না। এরূপ করিলে ফাত্না জলে ডুবিয়া ভারী হইয়া উঠিবে না। তৎপর ফাতনার চিক্কণ দিকটায় সূতা ⅛ ইঞ্চি বাড়াইয়া লইয়া একটী চক্রের মত করিতে হইবে এবং পরে বার্ণিশ করিয়া লইলেই উহা খুব শক্ত হইবে। এই চক্র কিংবা ফাত্নার চোখই ফাত্নাকে বর্শীর সূতার সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া রাখে। অপর পার্শ্বের শেষ দিকটা যাহাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে সেইজন্য উহাকে সাদা রাখাই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু পরের অর্দ্ধ ইঞ্চি জায়গা হিঙ্গুলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। ইহার পরের অর্দ্ধ ইঞ্চি জায়গা আবার সাদা রাখিয়া বাকী অর্দ্ধ ইঞ্চি উজ্জ্বল সিঁদুরবর্ণে রঙাইতে হইবে। সমস্তটা এইরূপে ক্রমাগত লাল ও সাদা রাংিতে এবং করিতে হইবে। ফাত্নাকে এইরূপ দুই বর্ণে রঞ্জিত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে মাছের মৃদু ঠোকরানও চোখের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। ফাত্নার একপার্শ্বে যখন ছোট্ট একটু আবরণ থাকে তখন মাছের সামান্য টানেই উহা একেবারে সোজা হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে—আবরণ দেওয়ার এইটুকু মাত্রই সুবিধা। তবে না দিলেও যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, তাহা আমি বলি না।

এইরূপ ধরণের ফাত্না ঠিক ডিটেকটিভের মত। ইংরাজী ফাত্নার মত ইহার দুই দিকে আবার সূতা জড়ানো থাকে না; কাজেই ইহা সহজেই মাছের খবর উপরে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইহার একদিকে মাত্র সূতা লাগানো থাকে, সেই জন্য সমস্ত ফাত্নাটিকে ছিপটির ঝকি সহিতে হয় না। বস্তুতঃ, দুইপাশ

বেড়িয়া বর্শীর সূতা লইবার কোনই মানে হয় না ; একদিকে সূত শক্ত করিয়া লাগানো থাকিলেই ফাতনা খুলিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না— এবং ডিটেকটিভের কার্য্যও ইহাতে আরো সুবিধাজনক ভাবে হইতে পারে।

ইংরাজী শ্লাইডিং ক্যাপের পরিবর্ত্তে ফাতনায় চক্ষু রাখা সুবিধাজনক কেন, তাহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। ফাতনায় চক্ষুঠিক একপার্শ্বে থাকে ; কিন্তু ক্যাপটি ঠিকমত না লাগা পর্য্যন্ত উহাকে ভিতরের দিকে পড়াইবার জন্য বেগ পাইতে হয়। কাজেই মাছের ঠোঁকরে যেমন দেশী ফাতনায় ৬ ইঞ্চিই জলের উপরে দাঁড়াইয়া উঠে, ইংরাজী ফাতনায় এরূপ স্থলে ৫ ইঞ্চির বেশী চোখে পড়িবে না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ইহা সামান্য ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; কিন্তু কিছুদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইলে দেখা যাইবে যে দেশী প্রণালীতে নির্ম্মিত ফাতনায় সুবিধা কতখানি বেশী।

তারপরে ফাতনা কিরূপে সূতার সঙ্গে পড়াইতে হয়, তাহা এইখানে বলিয়া রাখাই ভালো। প্রথমে যেখানে ফাতনা পড়াইতে হইবে, সেই জায়গায় বর্শীর সূতা দুইভাগ করিয়া ফাতনার চক্ষুর মধ্য দিয়া উহাকে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে ; তারপরে উক্ত প্রবিষ্ট সূত্রগুচ্ছ আরো একটু বেশী করিয়া টানিয়া লইয়া আবার ফাতনার অপর পার্শ্বের মাথা গলাইয়া ভিতরের দিকে টানিয়া নিলেই উহা এমন শক্ত হইবে, যে হাজার টানিলেও আর খুলিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। ফাতনায় জলের মাপ কম বেশী করিবার ইচ্ছা হইলে উক্ত বাঁধন একটা ঢিলা করিয়া লইয়া যথেচ্ছভাবে মাপকাঠিতে স্থান পরিবর্ত্তন করা চলিতে পারিবে। অনেকে বলেন যে এইরূপে মাপের পরিবর্ত্তন করা কেবল যে বিরক্তিজনক তাহা নহে, মাছ লইয়া খেলিতে খেলিতে ফাতনা-চক্ষুর ঐ অংশ কতকটা দুর্ব্বল হইয়াও পড়ে। ইহাতে কিছু সত্য থাকিলেও, সুবিধার তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর। একবার মনোমত করিয়া জলের মাপ ঠিক করিয়া লইয়া ফাতনা বাঁধিলেই বারেবারে উহা বদলাইবার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না।

বর্শী—আমার মনে হয় যে, মাছ মারিবার পক্ষে আইড্ লাইমেরিক বর্শীই সকলের চেয়ে সুবিধাজনক। হুইপড্ বর্শী দিয়া দুই বর্ষা কাটানো অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না ; তবে পোকা প্রভৃতি দিয়া মাছ মারিবার সময় এরূপ ধরণের বর্শী না-হইলেই চলিবে না। কেননা, আইড্ বর্শীতে (eyed hook) আধার গাঁথিবার সময় উহা অনেক সময়েই বর্শীর চোখে ঠেকিয়া যায় এবং উপরে ঠেলিয়া তুলিতে বেগ পাইতে হয়। কিন্তু কোন লেপ বা পেষ্ট দিয়া মাছ ধরিবার সঙ্কল্প করিলে আমি আইড্ বর্শী ব্যবহার করিবারই পরামর্শ দিব। যে-রকম বর্শীই ব্যবহৃত হউক না কেন, সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সূতা এবং বর্শার মেরুদণ্ড যেন এক লাইনে থাকে।

যদি বর্শী সূচি চক্ষু (needle eyed) বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহার ভিতর দিয়া দুই একবার সূতা প্রবেশ করাইয়া লইয়া উপরের দিকে একটী শক্ত বাঁধন দিতে হবে। তৎপরে অব্যবহৃত সূতার অংশ কাটিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিবে। যদি বর্শীর ধাতু চক্ষু (metal eye) আবার নীচের দিকে উল্‌টানো থাকে, তাহা হইলে উপরের দিকে অর্দ্ধবার সূতা জড়াইয়া নীচের দিকে আনিতে

হইবে, এবং তৎপরে আবার উহা উপরের দিকে ঐরূপে লইয়া গিয়া শক্ত গেরো দিলেই কাজ হইবে। অব্যবহৃত অংশ পূর্ব্বের মত কাটিয়া ফেলিলেই উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। যদি ধাতু-চক্ষু আবার উপরের দিকে উল্টানো থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ভাবে না রাখিয়া ঠিক উলটো রকমে সুতা বাঁধিতে হইবে এবং নীচের দিকে বাঁধন শেষ করিয়া অব্যবহৃত অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যাহাই করা হউক না কেন, সূতা এবং বর্শী'র মেরুদণ্ড যেন সর্ব্বদাই এক লাইনে থাকে।

বোঝা চাপাইয়া দিবার আদৌ প্রয়োজনীয়তা নাই। বাস্তবিক যদি ছোট মাছের কোন দৌরাত্ম্য না থাকে, তাহা হইলে উহার কোনই সার্থকতা নাই; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আধার জলে পড়িবামাত্রই ছোট মাছের দল ঝাঁক বাঁধিয়া উহা লইয়া রাগ্‌বি খেলিতে সুরু করিয়া দেয়। বড় বড় মাছও নীচের দিকে ঐরকম ফুটবল খেলে কিনা, খালি চোখে দেখিবার উপায় নাই; কিন্তু যদি অল্পজলের ছোট মাছ প্রথমেই আধারটুকু কাড়িয়া লইয়া থাকে, মৎস্য-শিকারী তাহা না বুঝিতে পারিলে সারাদিনের মধ্যে

লেবিও কালা বাউল

কিছুই ধরিতে পারিবেন না। বর্শী আবার উপরে না তোলা পর্য্যন্ত কিছু বুঝিতেও পারা যাইবে না। এইসব কারণের জন্যই সূতাকে তাড়াতাড়ি জলে ডুবিতে সাহায্য করিবার পক্ষে একটা ভার সঙ্গে দিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। যদি সূতার সঙ্গে ছোট চাকৃতি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আধারটি ঠিক মাটীতে গিয়া ঠেকিল কিনা সে সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিয়া যাইবে, তেমনি ফাত্‌নার কার্য্যকরী ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ, যদি ফাত্‌নার খাড়া থাকাটা সূতায় বাঁধা চাকৃতির উপরেই নির্ভর করে, এবং আধারের উপর না করে, তাহা হইলে সাধারণতঃ
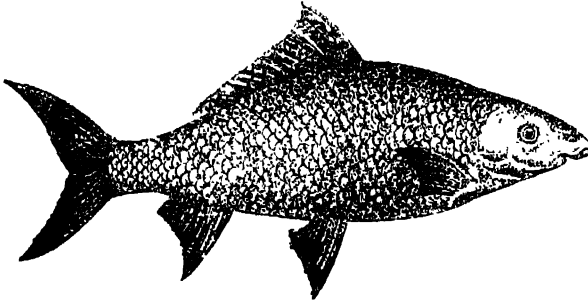
এখানে বর্শী'র আকার সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কতকগুলি কথা বলিব। আমি নিজে ৬নং কিবী দিয়া মাছ মারিতে সুরু করিয়াছিলাম; কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছি যে ১নং লিমেরিক-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ৩নং-এর উপরে যাওয়া কেহই পছন্দ করিবেন না। আমরা তিনমুখো বর্শী, একটার উপর আর একটী বর্শী সাজাইয়াও পরীক্ষা করিয়াছি; কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ১নং লিমেরিকের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী কোনটাই হয় নাই।

আমরা প্রথমে প্রথমে মনে করিতাম যে আধারের জোরেই বর্শী'র সূতা তাড়াতাড়ি জলের নীচে তলাইয়া যাইবে—উহার সঙ্গে কোন ভারী দ্রব্যের

দেখা যাইবে যে আধার এবং ফাত্নার মধ্যে মাছের সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধাটুকু লোপ পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে পেটুক তস্কর নন্দনের মনে হইবে 'মহৎ ভোজ্যং মে সমুপস্থিতম্'—মাছের দলের তখন মহোৎসব সুরু হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে ফাঁকি দিবার জন্যই আমরা লিমেরিক বর্শীর চক্ষুর ভিতর দিয়া একটী নরম সীসার তার বাহির করিয়া লইয়া উহা জড়াইতে জড়াইতে কিছুদূর নীচের দিকে লইয়া যাইয়া আবার উহাকে পূর্ব্বোক্ত উপায়েই উপরের দিকে টানিয়া আনিতাম। ইহাতে ঠিক বর্শীর উপরেই চাপ পড়ে এবং আধারের সংস্থান সম্বন্ধে একটা পুরাপুরি আভাষ উহা হইতেই উপলব্ধি হয়। এই সীসার তার বর্শীতে পরাইবার সময় বিশেষভাবে দেখিতে হইবে যে বর্শীর মুখ যেন উহাতে ছোট হইয়া না আসে; তাহা হইলে বড় বর্শী থাকার সুবিধা উহাতে লোপ পাইয়া যাইবে বর্শীর চোখের ভিতর দিয়া তার আনিবার দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, ইহাতে আর তারের স্থানচ্যুত হইয়া নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না; দ্বিতীয়তঃ বর্শীর ধাতব-চক্ষু (metal eye) অনেক সময় অসম্পূর্ণ ভাবে তৈয়ারী হইলেও, ইহাতে বাঁধন ফস্কাইয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। এই উপায়ে কাজ করিলেই সব দিক রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের মাছ-শিকারীরা দেশী বর্শীই ব্যবহার করিয়া থাকে; ইউরোপীয়ানরাও ইহা খুব পছন্দ করিয়া থাকে। কাতলা মাছ ধরিবার পক্ষে ইহা না হইলেই চলে না—পুকুরের মাছ ধরিবার পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট। ইহা যে কোন ধরণের পাওয়া যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

বঙ্গীয়
যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনের পথ

বাংলা দেশের যুবকদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিত। ইহাদের মধ্যে অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত লোক কোনও রূপে দিন গুজরান করিয়া যাইতেছে, কিন্তু অর্দ্ধ-শিক্ষিত এবং শিক্ষিত লোকদের উপার্জ্জনের রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হওয়ায় সমগ্র দেশ বেকারে ছাইয়া যাইতেছে। দেশের নানা-স্থানে হাতেকলমে কারীগরী শিক্ষার যে সকল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা লইলে এখনও বহু বেকারের উপার্জ্জনের রাস্তা বাহির করা যায়। বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ হইতে এ-সম্বন্ধে কোথায় কিরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফলাফলই বা কি, এই সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকল অভিভাবকদিগেরই এবং শিক্ষার্থী বালক ও যুবকদিগের এই সকল সংবাদ জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে কিরূপ অবস্থায় বালকদিগকে কোন্ লাইনে শিক্ষার জন্য পাঠাইবেন সে সম্বন্ধে সকলেরই একটা জ্ঞান ও ধারণা থাকিতে পারে এবং এই সকল বিদ্যা শিক্ষার জন্য কত খরচ এবং কি কি জিনিষের দরকার ইত্যাদি সব সংবাদই জানিয়া রাখিতে পারেন। আমরা এই সকল সংবাদ বর্ত্তমান শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশ করিতে সুরু করিলাম।

১। বঙ্গদেশের ছাত্রদের পক্ষে শিল্প-বিভাগে যে সুযোগ আছে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।—

(ক) বহুসংখ্যক লোকের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে, শিল্পবিভাগের ডিরেক্টার ও তাঁহার সহকারীদিগের এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, শিল্প-বিভাগে সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে লোক যে কেবল সঠিক সংবাদ জানে না তাহা নহে, পরন্তু এই কার্য্যক্ষেত্র কত বড়, গোড়ায় কিরূপ যোগ্যতা থাকা চাই, কিরূপ বয়সে প্রবেশ করা চাই এবং ইহাতে ভবিষ্যৎ উন্নতি কিরূপ, ইত্যাদি বিষয়েও লোকের মনে গুরুতর ভুল ধারণা আছে। উপযুক্ত সময়ে কাজ আরম্ভ না করার দরুণ অনেক স্থলে সুযোগ নষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকদিগের পক্ষে জীবিকা অর্জ্জনের পথ নির্ব্বাচন করিতে যে সকল খবর জানা দরকার, সেই সকল খবর এই পুস্তিকায় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(খ) জীবিকার জন্য শিল্প কার্য্য অবলম্বন করা হইবে কিনা তাহা অল্পবয়সেই স্থির করিয়া ফেলা খুব বাঞ্ছনীয়। অধিক মেধাবী ছাত্র ছাড়া অন্য সকলের পক্ষে বোধ হয়, শিল্পের দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে।

২। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগর শ্রেণীর বালকদিগের পক্ষে খোলা শ্রমশিল্প বিভাগে লাভজনক কাজ।—

(ক) বয়নবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ।—

যাহারা নিরক্ষর বা সামান্য একটু লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং কোনপ্রকার কাজের জন্য যাহাদের বেশী দক্ষতা বা জ্ঞান নাই, তাহারা বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল অনিপুণ দিন-মজুররূপে রোজগার করিতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা বিশেষরূপে জানা নাই যে, এমন কি গ্রামেও বয়নবিদ্যায় দুই মাসের জন্য সংক্ষিপ্তরূপে শিক্ষা প্রদান করি ার ব্যবস্থা আছে। পরিবারে যাহা আবশ্যক তাহা সরবরাহ করিয়াও একটী শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক প্রতি মাসে প্রায় ২০৲ টাকা (পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ আনুষঙ্গিক কার্য্যে সাহায্য করিলে এমন কি ৩০৲ টাকাও) উপার্জ্জন করিতে পারে। তাঁত, যন্ত্রপাতি ও কাজ চালাইবার খরচা ইত্যাদি বাবদ প্রাথমিক মূলধন প্রায় ৫০৲ টাকা লাগে। জিনিষ বিক্রয় করাটাই কেবল কঠিন, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁতিরা প্রায় সকলেই এবং বিশেষতঃ মফঃস্বলের তাঁতিরা, তাহাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিতে সমর্থ, সুতরাং ইহা খুব বিশেষ কঠিন নহে। তবে ইহাও সত্য যে তাঁতি সম্প্রদায় ছাড়া বাহিরের লোকের পক্ষে হাতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করা সহজ ব্যাপার নহে; তবে কলিকাতার সেণ্ট্রাল সেল ডিপো এইরূপ প্রচেষ্টাগুলিকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া থাকে।

দেশের সকল স্থানে ভ্রমণশীল বিদ্যালয়গুলি এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। ইহার জন্য কোন ফী লাগে না এবং শিক্ষা সময়ে সামান্য ভাতাও পাওয়া যায়। বালকদিগকে জেলা বয়নবিদ্যালয়গুলিতে পাঠাইয়া ঠিক এইরূপ সহজ উপায়ে আরও বিশদভাবে উচ্চতর শ্রেণীর কারিগরী কাজে এক বৎসর কাল শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যদি শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে পাঠান যায়, তবে আরও ভাল হয়। এইস্থানে জুলাই মাসে সেসন আরম্ভ হয়। রেশম বয়ন ও রং করার বিষয়ে এই প্রকার কারিগরী কোর্স বহরমপুরেও আছে। এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে,

(১) জেলার ও ভ্রমণশীল বয়নবিদ্যালয়গুলির ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে তাহাদের নিজেদের বাড়ীতে ছোট খাটো কারখানা স্থাপনে সাহায্য করিবার জন্য মাসিক সমান কিস্তিতে দুই বৎসরে শোধ করিবার কড়ারে বাৎসরিক শতকরা ৬া০ সুদের হারে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) প্রত্যেক জেলা বয়নবিদ্যালয়ে, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে হোষ্টেল আছে।

(৩ ছাত্রদিগকে ৪৲ টাকা করিয়া ২০টি সরকারী বৃত্তি দেওয়া হয় এবং প্রায় সকল স্থলেই জেলা বোর্ডের প্রদত্ত এইরূপ বৃত্তিও উহার সহিত যোগ হইয়া থাকে। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকের পক্ষে জীবনধারণের উপযোগী উপার্জ্জন কষ্টকর এবং বিশেষ করিয়া যে সকল বালক জীবনের অন্য কোন স্তরে কোন উন্নতি করিতে পারে না, উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি তাহাদের মনে ধরিতে পারে। চাষীদিগের অবসর সময়ে কাজ করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ মূল্যবান। সাদাসিধা গ্রাম্য-জীবন যাপন করিয়া মনে আনন্দ লাভ করা, নিজের আয়ে নিজের গৃহে বাস করা, সহরের অস্বাভাবিক নিরানন্দ জীবনযাপনের চেষ্টা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল।

(খ) কারীগরী শ্রেণীতে যন্ত্রপাতির কার্য্যে শিক্ষা লাভ।

যে সকল বালকের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা

আছে কিন্তু ভালরূপ লেখাপড়া জানা নাই তাহাদের পক্ষে শিল্পবিদ্যালয়গুলির কারীগরী শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া বিশেষ উচিত। এইরূপ বিদ্যালয় কতকগুলি জেলা ও সহরে অবস্থিত, যথা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর, বরিশাল ও খুলনা। উহাতে কোন বেতন দিতে হয় না এবং উপযুক্ত ছাত্রদিগকে কয়েকটী বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে, এবং তিন বৎসরের কোর্স শেষ হওয়ার পর পুরস্কার বা লাভের একটা অংশও দেওয়া হয়। পাশ হওয়ার পরে প্রথম অবস্থায় মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা বেতন পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। পরে আরও উন্নতি লাভ করা না করা তাহার কাজের নমুনার উপর নির্ভর করে। কোন পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান কারিগরের পক্ষে কয়েক বৎসরের মধ্যে ৫০৲ টাকা বা তাহার অধিক বেতন পাওয়ার আশা করা অন্যায় হইবে না। ইহা সকলেই জানেন যে গ্রাম্য মিস্ত্রি সকল স্থানেই প্রতিদিন ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা উপার্জ্জন করে। কলিকাতায় বা উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে, কারিগরদিগের শতকরা ৯৫ জনের অধিক লোকই বাংলার বাহির হইতে সংগ্রহ করা হয়; যাহারা বাংলার বাহিরের লোক উহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাসে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

(গ) কারখানায় শিক্ষানবীশ, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

১৪ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে নিম্নলিখিত ব্যবসায়ের যে কোনটীতে শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি করা হয়:—

(১) ছুতারের কাজ।
(২) কামারের কাজ।
(৩) কল-কব্জা লাগান।
(৪) কোঁদাইএর কাজ।
(৫) পিতল ও লোহা ঢালাই।
(৬) ইলেক্‌ট্রিক তার লাগান ও মেরামতের কাজ।

বৎসরের যে কোন সময়ে ভর্ত্তি হওয়া যাইতে পারে। কারিগরদের পুত্রদের দাবী অগ্রগণ্য। এই সকল শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য কোন লেখাপড়া জানা আবশ্যক নহে। ইহা শিখিতে পাঁচ বৎসর লাগে। এইসকল শ্রেণীর ছাত্রদের কোন বেতন দিতে হয় না। অধিকন্তু তাহাদের দক্ষতা অনুসারে মাসে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্র যদি তাহার শিক্ষাকালের সম্পূর্ণ কোর্স সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করে তাহা হইলে, তাহার দ্বারা যাহা আয় হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক তাহাকে দেওয়া হইবে।

৩। অল্প লেখাপড়া জানা বালকদিগের পক্ষে শিল্পবিভাগে লাভজনক কাজ।—

(ক) জুনিয়র শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ।— যে সকল বালক অল্প লেখাপড়া জানে, যথা মধ্যইংরাজী পাশ, অথবা যাহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম মান কি তাহার উপরে পড়িয়াছে, তাহাদিগের জন্য ২ (খ) দফায় বর্ণিত কোন কোন জেলায় সহরের জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পের ক্লাশ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ হইয়া চারি বৎসরের কোর্সের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহা শেষ হইলে উদ্যোগী যুবকের পক্ষে দুই বা তিন জন মিস্ত্রি লইয়া মফঃস্বলে অল্প মূলধনে ছোটখাটো ব্যবসায় আরম্ভ করা সম্ভবপর হইবে। এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, মাসিক ৩৲ টাকা ফী, এবং বহু-

সংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকিবে। যে কোন রকমের শিল্প শিক্ষা দিতে টাকার আবশ্যক এবং সেই কারণে ফী বাবদ কিছু কিছু আদায় করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহা একটী শুভলক্ষণ যে, ভদ্রলোক শ্রেণীর অনেক মেধাবী বালক এই সকল কোর্সে বেশী করিয়া যোগদান করিতেছে। চাকুরী, অর্থাৎ বেতনসহ কাজ পাওয়া আশা করা যায়, কারণ, বর্ত্তমান সময়ে এদেশে মোটরগাড়ী ইত্যাদি নানারূপ যন্ত্রাদির দ্রুত প্রচলন হওয়ায় বহুসংখ্যক প্রকৃত কর্ম্মঠ যন্ত্রের কারিগরের আবশ্যক হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাভিলাষী ও দক্ষ ছাত্রগণ যাহাতে সিনিয়র শিল্পবিদ্যালয়ে উচ্চতর কোর্সে আরও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ বোর্ড অফ এপ্রেনটীসশিপ্ ট্রেণিংএর অধীনে যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ও তৎপরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংএ ডিপ্লোমা পাইতে পারে সে বিষয়েও সুযোগ আছে। জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়গুলিতে এরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে এদেশে প্রচলিত আরও অধিক এবং উচ্চতর কোর্সে শিক্ষা পাইবার জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করিতে পারে।

(খ) অর্ডনান্স টেক্‌নিক্যাল স্কুল, ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরী।—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ মান ও উপরের ক্লাশের, ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যের বালকদিগকে লেখাপড়ার পরীক্ষা ও ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করা হয়। প্রতি বৎসর সাধারণতঃ এপ্রিল মাসে প্রায় ৩০ জন বালককে লওয়া হয় এবং ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়:—

(ক) ধাতুনির্ম্মিত ও কাঠের যন্ত্রপাতিসম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান ও ঐগুলির ব্যবহার।

(খ) ধাতু ও কাঠের কাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা।

(গ) লিঙ্গোয়াফোন প্রণালীতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা।

(ঘ) কারখানায় হাতেকলমে কাজ করিবার পক্ষে আবশ্যকীয় পাটীগণিত শিক্ষা।

(ঙ) কারখানায় হাতেকলমে কাজ করিবার জন্য আবশ্যকীয় নক্‌শা আঁকা ও যন্ত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক ড্রয়িং।

(চ) কলকব্জা খোলা এবং লাগান, যথা, কলকব্জার যন্ত্রপাতি ও মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন ইত্যাদি।

কারখানায় উপস্থিত থাকিবার সময়

সকালে ৮-৪৫ হইতে ১১-৪৫ পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের ক্লাশ।

দুপুরে ১২-৪৫ হইতে ৪-৩০ পর্য্যন্ত হাতে-কলমে কাজ শিখাইবার ক্লাশ।

উহাতে ভর্ত্তি হইতে ২৲ টাকা ফী লাগে এবং যন্ত্রপাতি ও জিনিষপত্রের খরচা বাবদ মাসে ১৲ টাকা করিয়া আদায় করা হয়।

এই বিদ্যালয়টী অতি আধুনিক এবং উচ্চ ধরণের ধাতু ও কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত।

এই দিকে জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধাদি সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় না; কিন্তু ইহা আশা করা যায় যে, উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অধিকাংশ কলিকাতা অঞ্চলে অর্ড-নান্স ফ্যাক্টরীগুলিতে বা ইছাপুরে মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারীং সার্ভিসে বা ইছাপুরে স্মল

আর্ম্‌স ইন্সপেক্টরেট অফিসে বা কাশীপুর ইন্সপেক্টরেট অফ গানস্‌ অফিসে চাকুরী পাইবে। কোর্স শেষ হওয়ার পর ছাত্রদিগের মধ্যে একটী পরীক্ষা লওয়া হয় এবং যাহাদিগকে উপরোক্ত অফিসে নিযুক্ত করা হয়, তাহারা যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্নরূপ দৈনিক হার পাইয়া থাকে (প্রথম অবস্থায় বেতন ৸০ আনা হইতে ১৲)।

টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট উহার নিয়মাবলী ইত্যাদি পাওয়া যাইবে।

(গ) ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরীতে বালকদিগের কারিগরী কাজ শিখিবার ক্লাশ।—উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ মান ও তাহার উপরের ক্লাশে ১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক (অবিবাহিত) বালকদিগকে ইহাতে ভর্ত্তি করা হয়। একটী পরীক্ষা লইবার পর বালকদিগকে নির্ব্বাচিত করা হয়। কারখানায় নিযুক্ত লোকদিগের পুত্রদিগের দাবী অগ্রে বিবেচনা করা হয়। কারখানায় প্রত্যহ ৬ ঘণ্টা করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য হাতেকলমে কাজ শিখিবার কোর্স নির্দ্দিষ্ট এবং প্রত্যহ ২ ঘণ্টা করিয়া চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত শিল্পক্লাশের অধিবেশন হইয়া থাকে। কোর্স সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়। ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে চাকুরী বিভাগের ম্যানেজারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

কারিগরের কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালকদিগের দৈনিক মজুরী ।৵০ আনা হইতে ১৲ পর্য্যন্ত হইতে পারে। সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত না হইলে কোন সার্টিফিকেট্‌ দেওয়া হয় না।

(ঘ) বুট জুতা ও চামড়ার জিনিষ তৈয়ারী-সম্বন্ধে শিক্ষালাভের কোর্স।

ইহা বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্‌টিটিউট্‌এর সহিত সংযুক্ত এবং কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ে উহার ক্লাশ হয়। এই কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে হাতে প্রস্তুত জুতা তৈয়ার করিতে বা জুতার বিভিন্ন অংশ লাগাইতে শিক্ষা দেওয়া। ঐ সঙ্গে জুতা প্রস্তুত করিবার আধুনিক কলসম্বন্ধেও মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হয়।

জুতা প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ প্রণালীটি সাতটী সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) নমুনা কাটা।
(১) চামড়া কাটা।
(৩) আঁট-সাট করা।
(৪) শুক্‌তলা গোড়ালী কাটা।
(৫) কাঠের ফর্ম্মাতে (লাসে) চাপান।
(৬) বিভিন্ন অংশ লাগান।
(৭) ফিনিস করা।

ইহার প্রত্যেকটী বিষয় বক্তৃতাদ্বারা, কাজ দেখাইয়া দিয়া ও হাতেকলমে কাজ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

বক্তৃতা।—প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার এই দুই দিন বক্তৃতা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বক্তৃতা এক ঘণ্টা কালব্যাপী হয়।

কাজ প্রদর্শন।—কিরূপভাবে প্রকৃতপক্ষে কাজ করিতে হয় তাহা বক্তৃতার সহিত দেখাইয়া দেওয়া হয়।

হাতেকলমে কাজ শিক্ষা।—ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একটীর পর একটী করিয়া নানা প্রকারের কাজ শিক্ষা করিতে হয়। কোন ছাত্র যে পর্য্যন্ত না কোন একটী কাজে পারদর্শিতা লাভ করে সে পর্য্যন্ত তাহাকে সেই কাজ ছাড়িয়া তাহার পরের কাজটী আরম্ভ করিতে দেওয়া হয় না।

হাতেকলমে কাজ শিক্ষা দিতে কেবলমাত্র কিরূপভাবে প্রকৃতপক্ষে কাজ করিতে হয় তাহাই

শিখান হইবে না, অধিকন্তু যন্ত্রপাতির যত্নও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা—

(১) প্রার্থীদের স্কুলের শিক্ষা এরূপ থাকা আবশ্যক যাহাতে সাধারণ ইংরাজী বুঝিতে পারে।

(২) স্বাস্থ্যবান ও কর্ম্মঠ হওয়া চাই।

(৩) ছাত্রদের অভিভাবকদিগকে এরূপ টাকাকড়ির ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের কলিকাতায় এক বৎসর থাকা ও থাওয়া চলে।

সেসন্।—আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে সেসন আরম্ভ হয়।

কাজ করিবার সময়।—বর্ত্তমানে, সকালে ১০-৩০ মিনিট হইতে ৩টা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া ইহা পরিবর্ত্তন করা যাইবে।

কোর্স।—এক বৎসরের জন্য কোর্স।—যাহারা পূর্ব্ব হইতেই বুট ও জুতা এবং চামড়ার জিনিষের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে তাহারা একত্রে চাহিলে তাহাদিগের জন্য আরও কম সময়ের কোর্সের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সার্টিফিকেট্।—শিক্ষাকাল সমাপ্ত হইলে শেষ পরীক্ষা পাশ করিবার পর, দক্ষতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

উপস্থিতি।—যত দিন মোট কাজ হইবে কোনও ছাত্র তাহার শতকরা ৭৫ দিনের কম উপস্থিত থাকলে তাহাকে শেষ পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না।

নিয়মানুবর্ত্তিতা।—ছাত্রগণ বিভাগীয় নিয়মাদি পালন করিবে। পাঠে অবহেলা করিলে, উপযুক্ত কারণ বিনা অনুপস্থিত হইলে, অবাধ্যতা প্রকাশ করিলে ও অসৎ আচরণ করিলে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করা যাইতে পারিবে।

ছুটীর দিন।—বেঙ্গল ট্রেণিং ইন্‌ষ্টিটিউটে যে সকল গেজেটেড্ বা স্থানীয় পর্ব্ব উপলক্ষে বন্ধ থাকে, এই বিভাগ সেই সকল দিন বন্ধ থাকিবে।

হষ্টেলের ব্যবস্থা।—এই বিভাগের সংশ্লিষ্ট কোন হষ্টেল নাই। ছাত্রদিগকে তাহাদের নিজেদের থাকা ও আহারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

ভবিষ্যৎ উন্নতি।—এরূপ আশা করা যায় যে, এই শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ অতি অল্প মূলধন লইয়াও বুট, জুতা এবং চামড়ার জিনিষের স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিবে।

কুটীর শিল্পশিক্ষা।—বঙ্গদেশের শিল্পবিভাগ সময় সময় কতকগুলি ছাত্রকে (ক) ছাতা তৈয়ারী ও (২) তামা এবং কাঁসার জিনিষ তৈয়ারী করিতে শিক্ষা প্রদান করেন। যে সকল ছাত্র ছাতা তৈয়ারী শিক্ষা করে তাহাদিগের নিকট হইতে কেবলমাত্র ৫৲ টাকা ফী লওয়া হয়।

ছাত্রদিগকে মৃৎশিল্পে ও ছুরি, কাঁচি তৈয়ারী করিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আমাদের গৃহস্থালী

শ্রীমতী কমলা দেবী

রান্নার জন্য যে জল দরকার তা অনেক বাড়ীতে একটী বালতিতে খোলাই থাকে। কোথাও কোথাও কলসীতে জল থাকে—তার মুখে ঘটী বসান থাকায় জলে কিছু পড়িতে পারে না। যেখানে বালতিতে জল থাকে, তার পাশে একটী ঘটী মাটীতে বসান আছে, যতবার দরকার হচ্ছে, ঘটীকে মাটী থেকে তুলে সেই জলে ডুবিয়ে জল নেওয়া হচ্ছে। ঘটীর তলায় যত ধুলা ও ময়লা সব এক একবারে একটু একটু করে রান্নার জলে গিয়ে জমা হচ্ছে। এই যে রান্নাঘরের অবস্থা, এ প্রায় সব বাড়ীতেই দেখা যাবে—কি গরীবের বাড়ী, আর কি বড়লোকের বাড়ী। যাদের বাড়ীতে হয় তো ৫।৬ হাজার টাকা দামের আসবাবে ড্রইং রুম সাজান, সে সব বাড়ীরও রান্নাঘর এর চেয়ে বেশী কিছু ভাল নয়। যাঁরা বাবুর্চ্চি, খানসামা রাখেন—তাঁদের ঘরে আরও বেশী রকম নোংরামী দেখা যায়।

তারপর ধোঁয়া ও ঝুলের অবস্থা। উনুনে আগুন দেওয়া হ'লে বাড়ীর যেখানে থাক না কেন, তা বেশ টের পাওয়া যাবে। বাড়ীর সব ঘরেই অল্প-বিস্তর ধোঁয়া যাবে। তখন "ওরে, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ কর্" ব'লে গিন্নী চীৎকার করেন, অথচ একটু এ বিষয়ে ভেবে ধোঁয়া বার হবার বন্দোবস্ত করলে আর এ অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। রান্নাঘরে ঝুলের তো কথাই নাই। যখন বৃষ্টি হবে তখন জানালা দিয়ে জলের ছাটের সঙ্গে ঝুলের কতক অংশ তরি-তরকারীতে এসে পড়ে, অথচ এই ঝুল অতি বিষাক্ত জিনিষ।

অবশেষে একটা কথা না ব'লে থাকতে পারছি না, সেটী হচ্ছে ইঁদুর বিড়াল ও কাকের উপদ্রবের কথা। এই ইঁদুর বিড়াল ও কাকের জন্য যে কত বৌ-ঝিকে গালাগালি খেতে হয়, তা এক ভুক্তভোগীই জানেন। "ঐ কাকে থালায় মুখ দিলে, ঐ বোধ হয় রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকেছে দেখ দেখ, ঐ ইঁদুর মাছ নিয়ে গেল" ইত্যাদি

ব'লে চীৎকার সব বাড়ীতেই শুনা যায়। এর থেকে সংসারে কত যে অশান্তির সৃষ্টি করে, তা ভেবে দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়।

এতক্ষণ তো আমাদের রান্নাঘরের যা অবস্থা —তাই বলা হ'লো। এখন কি করলে এর উন্নতি হবে সে বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে। আজকাল কলকাতা সহরে একতালায় রান্নাঘর না করাই ভাল। ছাদে রান্নাঘর করলে অনেক উপকার হবে। তবে যাঁরা কারও বাড়ীতে ভাড়াটে থাকেন, যাঁদের উপরে অন্য লোক বাস করেন—তাঁদের একতলাতেই রান্নাঘর রাখতেই হবে। তাঁদের উচিত যতদূর সাধ্য তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা। যাঁরা নূতন বাড়ী করাচ্ছেন বা যাঁদের সম্পূর্ণ আলাদা একটী বাড়ী আছে, তাঁদের ছাদেই রান্নাঘর করা উচিত। অনেকে বলবেন যে তাতে পরিশ্রম বাড়ে, আর ছাদে জল উঠে না ব'লে নীচে থেকে জল নিয়ে যেতে হয়। আজকাল পল্লীগ্রামে মেয়েদের স্বাস্থ্য সহরবাসিনীদের চেয়ে অনেক ভাল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তারা বেশী পরিশ্রম করে ও ফাঁকার আলো ও পরিষ্কার বাতাসের মধ্যে বেশী থাকতে পায়—এই জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সহরবাসীদের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ—আলস্য, আর ফাঁকায় বাসের অভাব। নানা কারণে আজকাল পল্লীগ্রামের মেয়েরও স্বাস্থ্য আর আগেকার মতন ভাল নাই, এর প্রধান কারণ—ভাল খাওয়ার অভাব। প্রতিদিন রান্নার জন্য এক কলসী কি দু'কলসী জল উপরে নিয়ে গেলে এমন কিছু পরিশ্রম হবে না, যাতে শরীর খারাপ হবে। উল্টে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। আমাদের দিদিমা, ঠাকুরমারা যদি আধক্রোশ পথ গিয়ে ঘড়ায় করে জল এনে রান্না ক'রে থাকতে পারেন—তবে আমরাই বা তা কেন না পারব? যে সব জায়গার কাছে নদী বা পুকুর নাই সেখানে মেয়েদের কূয়া থেকে জল তুলতে হয়, আর তা শুধু রান্নার জন্য নয়, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, স্নান ইত্যাদি সব কাজের জন্যই। তার জায়গায় শুধু রান্নার জল নীচে থেকে ছাদে তুলতে এত কাতর হওয়া কেন?

আজকাল কলকাতা ও মফঃস্বলের অনেক বাড়ীতে টিউবওয়েল হয়েছে। এতে বেশ সুবিধে হয়েছে—পাম্পে করে ছাদে জল নিয়ে যাওয়া যায়। যদি টিউবওয়েলের জল ভাল হয় তবে এইটেই সব চেয়ে ভাল।

কিছুদিন আগে অমৃতবাবুর একটী লেখা পড়েছিলাম, তাতে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে রান্না যত অল্প পরিশ্রমে হয় করতে পারলে ভাল। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের কোনও ব্যায়াম চর্চ্চা যেকালে নাই তখন রান্নার জন্য একটু বেশী পরিশ্রম হলে ভাল হয়। আমরা তো প্রায় বাড়ীর বার হই না, তবু ছাদে রান্নাঘর থাকলে যদি ৫।৬ বার উপর নীচে করা হয় তাতে অনেক গিন্নীর অম্লরোগ অর্দ্ধেক ভাল হয়ে যাবে!

রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি করা দরকার। ভাঁড়ারের এক পাশে তাকে সব হাঁড়ি সাজান থাকলে বেশ ভাল দেখতে হয়, নয় তো ঘরের মেজেতে হাঁড়ি বসান থাকলে দেখতে অতি অশোভন হয়। আর ঘরের সব জায়গা জুড়ে এসব থাকলে অনেক অসুবিধাও হয়। আজকাল হাঁড়ির বদলে বিস্কুটের টিনে অনেকে ডাল, মশলা ইত্যাদি রাখেন। তার চেয়ে আমার মনে হয় মাটীর হাঁড়ি সাজান থাকলে বেশী সুশ্রী হয়। যদি টিন ব্যবহার করতেই হয় তবে একটু সবুজ বা লাল রং কিনে গায়ে মাখিয়ে

রাখলে দেখতেও ভাল হয়, মশিচাও পড়ে না। ঘরের এক কোণে মাটীর জালা (চাল রাখবার জন্য) বসাবার জন্য ও খাবার জলের কলসী রাখবার জন্য একটু উঁচু ক'রে গেঁথে নিলে ভাল হয়। নুন কৌটায় রাখলে বর্ষাকালে বড় জল বার হয়, আর তাতে ঢাকা দিবার অসুবিধা হয়। কাঁচের কিম্বা কড়ির জারে চিনি ও নুন রাখা ভাল। ভাঁড়ার ঘরে ছাদে কড়িতে হুক্ লাগিয়ে রাখা দরকার এতে দড়ির সিকে টাঙ্গান যাবে। আজকাল কলকাতার সিকের ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে। সিকে কুম্‌ড়া, বাতাবীলেবু ইত্যাদি রাখবার সবচেয়ে ভাল উপায়, আর ঘরের জায়গাও জুড়ে থাকে না, দেখতেও ভাল হয়। কুলো, ঝুড়ি, চুপড়ী প্রভৃতি দেওয়ালের গায়ে পেরেক মেরে তাতে আটকে রাখতে হয়। দেওয়ালের উপর একটা আল্‌মারি করলে অনেক দরকার লাগে। দরকার মতন ছোট বা বড় একটি জালের আল্‌মারী রাখলে দুধ, মিষ্টি ও ফল রাখবার জন্য ভাল হয়। পোকা মাকড়, মাছি, আরশুলার উপদ্রব কম হয়। মোটের উপর, ভাঁড়ার ঘরের মেজেতে বেশী জিনিষ না থাকে তা দেখা উচিত, কারণ মেজে যত খালি থাকবে, তাতে ঝাঁট দেওয়া ও মোছার সুবিধা হবে। আর দরকার হলে সেখানে বসে লোকে খাওয়াদাওয়াও করতে পারে; যখন ছাদে রান্না ও ভাঁড়ার ঘর করা হবে, তখন ভাঁড়ার ঘরেই খাওয়ার যায়গা রাখা উচিত। ছাদে রান্নার কতকগুলি অসুবিধা আছে, এক জলের, তার কথা আগেই বলা হয়েছে, আর একটা হচ্ছে মশলা পেষায়। ছাদে মশলা পিষলে নীচে বড় শব্দ হয়, যেন মাথার উপর কে হাতুড়ী মারছে! ছাদে রান্নার ব্যবস্থা থাকলেও নীচে মশলা পিষতে হবে। ভাঁড়ার ঘরের জানালা সম্বন্ধে এইটুকু বলা দরকার যে, অন্ততঃ গুটীকতক বড় জানালা রাখলে ভাল হয় ও রান্নাঘরে যাবার জন্য একটা দরজা।

এখন রান্নাঘরের কথা বলা যাক্। প্রথমে ধোঁয়া বার হবার উপায় করা। চিমনি হচ্ছে ধোঁয়া বার হবার সবচেয়ে ভাল উপায়। আমরা অনেকেই চিমনি যে কি তা জানি না। মোটের উপর চিমনি করে উনুন করলে সেটা দেখতে হবে, যেন ছোট কাটের ঘরের মধ্যে উনুন রয়েছে। তার সামনে দরজা থাকবে, সেটা খুললেই সামনে উনুন রয়েছে দেখা যাবে। তবে উপর দিকে খোলা থাকবে, নয় তো নল দিয়ে ধোঁয়া দেওয়ালের গা দিয়ে উপর দিকে বার হয়ে যাবে। শেষের উপায়টা আরও ভাল। যখন উনুনে আগুন দেওয়া হবে তখন সামনের কাঠের দরজা বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের বাড়ীতে যখন প্রথম এই রকম উনুন করা হয়েছিল তখন রান্না করতে বড় বিরক্ত মনে হতো, ক্রমে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কিছুই অসুবিধা হয় না। চিমনি করে যে উনুন করা হবে, সেটা দাঁড়া উনুন হবে। (যেমন বাবুর্চ্চিরা করে) যে রকম উনুন হলে নিজেদের সুবিধা হয় সেই রকম করলেই ভাল হয়। তবে মাঝারি উনুন যা প্রায়ই মিস্ত্রিরা কলকাতার সব বাড়ীতে করে তা ভাল নয়। এক দাঁড়া উনুন করা ভাল, বসবার জন্য টুল রাখলেই চলে। নয় তো খুব নীচু উনুন, মাটীতে বা পিঁড়িতে বসে তার উপর রান্না করবার সুবিধা হয়। মাঝারি উনুন করলে বসাও যায় না। যেখানে উনুনের সামনে বসে রান্না করা হয় তার দুদিকে দুটী বড় জানালা থাকা দরকার, তা'হলে গায়ের উপর দিয়ে বাতাস যাওয়া ও আগুনের

তাপ লাগে না। এই দুটী জানালা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে হওয়ার চেয়ে উত্তর দক্ষিণে হ'লে বেশী সুবিধা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে জানালা থাকলে সকালে ও বিকালে বড় রদ্দুর আসে, সেই জন্য আরও গরম হয়। ঘরের মাঝামাঝি যায়গায় পূর্ব্বদিকে বা পশ্চিমদিকের দেওয়ালের গায়ে এই চিমনি দিয়ে উনুন করা সব চেয়ে ভাল, তা হ'লে উত্তর দক্ষিণে জানালা করা যায়। রান্নাঘরে দেওয়ালের গায়ে শুধু তাক না করে জাল দেওয়া ছোট আলমারী করতে হবে, এতে মাছভাজা, তরকারী, বাটা মশলা ইত্যাদি রাখা যায়। রান্নাঘরের ভিতর যদি সম্ভব হয় তবে জলের কল ও তার সঙ্গে ১টি চৌবাচ্চা রাখা ভাল। কলকাতার বেশীর ভাগ বাড়ীতেই দোতলায় জল উঠে না, তা ছাদে জল উঠবে কি! আমাদের বাড়ীতে পাম্প থাকায় উপরে জল উঠে সেইজন্য রান্নাঘরে কল থাকায় খুব সুবিধা হয়। রান্নাঘরের একদিকে একটু উঁচু করে গেঁথে নিলে তাতে বাসন রাখা যায়। চিমনি করলেও রান্নাঘরে কিছু ঝুল হয়, সপ্তাহে একদিন করে তা পরিষ্কার করতে হবে। যেখানে যা ময়লা জড় হয় সব ফেলে দিতে হবে। জালের আলমারীর দিকেও নজর রাখতে হবে যেন তার ভিতর কোথাও গর্ত্ত করে ইঁদুর বা আরসুলা না যায়।

ছাদে রান্নাবাড়ার ফলে বাসন মাজাও ছাদে করার অনেক সময় দরকার হয়—কারণ ঝি চাকরেরা প্রত্যেক বার নীচে বাসন নিয়ে গিয়ে মাজতে চায় না। জলের সুবিধা থাকলে ছাদেই বাসন মাজা হতে পারে।

সকালে স্নান করে এসে নীচের পায়খানার পাশের এদোঁপড়া ঘরে ঢুকে রান্না করার চেয়ে, স্নানের পর ছাদে উঠে পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাসে রান্না করতে অনেক ভাল লাগে, এতে ছাদে রান্নার যে সব অসুবিধা তা আর মনে হবে না।

ষ্টার্লিং হইতে রৌপ্যমুদ্রায় রূপান্তর

অনেকেই জানেন যে আমাদের দেশের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রমুখ অনেক ব্যাঙ্ক এবং ওরিয়েণ্টাল, নিউ ইণ্ডিয়া ও এম্পায়ার প্রমুখ অনেকগুলি ইনসিওরেন্স কোম্পানী, বিস্তর ষ্টার্লিং সিকিউরিটি কিনিয়া ছিলেন। বর্ত্তমান বাজারে এই সিকিউরিটি গুলি ষ্টার্লিং হইতে রৌপ্যমুদ্রায় রূপান্তরিত করিলে কেবল যে বিদেশী সিকিউরিটি হইতে স্বদেশী সিকিউরিটিতে উহা পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা নহে, যাহারা জমা রাখিয়াছেন তাহাদেরও ইহাতে প্রচুর লাভ হইবে। দেশের টাকা বিদেশীর করতল হইতে আবার নিজের ঘরে এইরূপে ফিরিয়া আসিলে দেশ সেবকেরা সকলেই যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত ২২া জুলাই শনিবার দিন ৩½ পার্সেণ্ট ভারতীয় ষ্টার্লিং ষ্টকের মূল্য ছিল ৮৩½ পাউণ্ড; ৩½ পার্সেণ্ট ইণ্ডিয়া রুপি পেপারের দাম যথা পূর্ব্বোক্ত সিকিউরিটির তুল্যমূল্য বোম্বাইতে ৬৬।১৪।০ টাকা করিয়া ছিল; কলিকাতায় ছিল ৬৭৲ টাকা করিয়া। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ভারত এবং লণ্ডনের মূল্যের মধ্যে ১৬½ পার্সেণ্ট তফাৎ রহিয়া গিয়াছে। ষ্টার্লিং এর বাজার দাম হিসাবে ইহার অনুপাত অঙ্ক বাহির করিলে দেখা যাইবে যে এই গরমিল ২০ পার্সেণ্ট হিসাবে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ যাহার ৩½ পার্সেণ্ট ষ্টার্লিং পেপার আছে তিনি উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ মূল্য ৩½ পার্সেণ্ট রুপি পেপারে পরিবর্ত্তিত করিলে, ষ্টার্লিং পেপার অপেক্ষা তিনি ২০ পার্সেণ্ট লাভ করিবেন।

এত সুযোগ কদাচিত কাহারো ভাগ্যে আসে। কয়েকমাস আগেও ষ্টার্লিং চিরকুট রুপি চিরকুটের হিসাবে ৮ হইতে ৪ পার্সেণ্ট নিম্নে ছিল; আজ সমস্ত অবস্থাই আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পূর্ব্বে ষ্টার্লিং ষ্টকের আয় রুপি ষ্টকের আয়ের অপেক্ষা বেশী ছিল। কাজেই অনেকেই রুপি

সিকিউরিটির বিনিময়ে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি লইবার গরজ দেখাইতেন। সে সময়ে ইহাকেই "flight from the rupee" নামে অভিহিত করা হইত।

এই সুযোগে আমাদের অনেক কোম্পানীই যে তাহাদের ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে রৌপ্য সিকিউরিটিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবেন, তাহা তাহাদের ব্যালান্স সিট দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয়। কয়েকটি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর তালিকা নিম্ন দেওয়া হইল :—

		কাগজের দাম (face valu)
ওরিয়েণ্টাল	পাউণ্ড	৪,৫১০,০২৫
এম্পায়ার অফ্ ইণ্ডিয়া	,,	১,৪৬১,৪০০
নিউ ইণ্ডিয়া	,,	২৭০,৮১২
এসিয়ান	,,	৮১,০০০
জুপিটার	,,	৪০,০০০
জেনিথ	,,	২২,৪৫০
	পাউণ্ড,	৬,৩৮৫,৭২৭

দেখা যাইতেছে যে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলির প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ sterling stockএ জমা রহিয়াছে এবং ইহার শতকরা ৫০ অংশই ৩ কিংবা ৩½ পার্সেণ্ট ষ্টার্লিং পেপারে পরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে আবার রূপান্তরিত করিলে যদি ১০ পার্সেণ্ট করিয়াও লাভ হয়, তাহা হইলে ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি মোটামুটি ৮০ লক্ষ টাকা লাভ করিবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মোটামুটি এক মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং সিকিউরিটিতে জমা থাকিতে পারে ; উহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে তাহাদের প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে। কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, এবং অন্যান্য পাব্লিক প্রতিষ্ঠানের মোট তিন মিলিয়ন পাউণ্ডের মত জমা থাকিতে পারে। এই সমস্ত কথা ভাবিলে দেখা যাইবে যে মোটামুটি দশ মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং সিকিউরিটি হইতে রুপি সিকিউরিটি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিবে।

মেট্রোপলিটান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কের মামলা

মস্তফর রহমানের ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৭৫৷/০ আনা জরিমানা, অনাদায়ে আরো তিনমাস কারাদণ্ড, রদ করিবার জন্য যে আবেদন পেশ করা হইয়াছিল তাহা নাকচ করিয়া দিয়া, নোয়াখালির সেসন জজ নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন, "মেট্রোপলিটান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের সাধুতা সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কেননা, কোম্পানীর রেজেষ্টারীতে যাহাদের নাম দেখা যায় তাহারা তাহাদের ফীস্ রীতিমত-ভাবে দিয়া দিলেও, কোম্পানী হ'তে ঋণ পাইতে তাহারা কেহই সমর্থ হয় নাই। কোম্পানীর ছাপানো নিয়মকানুন দেখিয়াও বিশেষ কোন ভরসা পাওয়া যাইতেছে না।" ফেণীর সাব-ডিভিসনাল অফিসার মস্তফর রহমানকে ভারতীয়

দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ধারায় অভিযুক্ত করিয়া উপরোক্ত দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, এবং জরিমানার টাকা কালা মিঞা, রাম দয়াল এবং সেকুকে দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

মামলার বিবরণ এই যে আসামী কলিকাতাস্থ মেট্রোপলিটান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ইনস্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহার বাড়ী ফেণী মহকুমাতে একটি অফিস খোলে এবং ঐ অঞ্চলে অনেক ছাপানো হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করে। হ্যাণ্ডবিল পড়িয়া অনেক লোক যথোপযুক্ত প্রবেশ-ফি দিয়া মেম্বারসিপের জন্য আবেদন করে; কোম্পানীর নিয়মানুসারে মেম্বারগণকে অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয় বলিয়া লেখা থাকে। নালিশকারী ব্যক্তিগণও ভর্ত্তি হইবার দক্ষিণা দেয়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদিগকে মেম্বার করিয়া লওয়া হয় না। বলা হইয়াছে, যে আসামীই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়া বসে। এই অভিযোগে আসামী ব্যতীত আরো দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়; কিন্তু তাহারা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। কেবলমাত্র আসামীর উপরোক্ত দণ্ড হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক অর্গানাইজারের হাজত-বাস

কটকের ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন্ জজ্, মিঃ রুবেন আই-সি-এস গত ৬ই মে তারিখে একটী জুয়াচুরীর মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন। আসামীদের মধ্যে একজন, কাশীনাথ পট্টনায়েক, বি-এ এবং অপর জন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট—নাম, বিশ্বনাথ রায়। কটকের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ আয়ার, আই সি-এস, তাহাদিগকে ভারতীয় পেনাল কোডের ৪২০ ধারায় (জুয়াচুরী) দোষী সাব্যস্ত করিয়া উভয়কেই একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, বিশ্বনাথকে আরো ৩০০৲ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে; জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয়মাস সশ্রম হাজত-বাসের হুকুম হইয়াছে। সেসন্ জজ নিম্নতর আদালতের রায়ই বহাল রাখিয়াছেন।

গণ্ডগোলের-সূত্রপাত হয়—একদল উত্তমর্ণ সম্প্রদায়কে লইয়া; উহার রেজেষ্টারীকৃত নাম ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড—পূর্ব্বে উহা ক্রেডিট্ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, কলিকাতা, বলিয়াই পরিচিত ছিল। উড়িষ্যাতে বিশ্বনাথ ছিলেন উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং কাশীনাথ তাঁহার অধীনে কাজ করিত।

নিয়ম ছিল, যদি কোন ঋণ প্রার্থী আর দুইজন লোককে জোগাড় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সামান্য প্রবেশ-মূল্য এবং প্রার্থী-ফি দিয়াই অনেক টাকা ধার পাইতে পারিবেন। এই সম্পর্কে জজ্ তাঁহার অর্ডার দিবার সময় বলেন, "মূল নিয়মগুলি পাঠ করিলে মনে হইবে যে তিনজন লোক ঋণের উদ্দেশ্যে যদি দরখাস্ত পেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যিনি ফি দিবেন, তিনি কিছুকাল সময় উত্তীর্ণ হইলে পর নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা কর্জ্জ পাইবেন। কিন্তু সমস্ত নিয়মগুলি ভালরূপে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ৮০০০ দরখাস্তকারী লোক না হইলে কর্জ্জ দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।"

জজ্ সাহেব আরো বলেন যে এই ব্যবসায়ে, স্কীমের চটক্‌দার দিকগুলিই শুধু বিজ্ঞাপনে জাহির করা হইত এবং যে-সমস্ত কঠিন সর্ত্ত ছিল তাহা আদৌ বাহির করা হইত না কিংবা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহা মোলায়েম করিয়া বুঝান হইত। রায়ের শেষের দিকে তিনি বলেন যে এই সমস্ত ব্যবসায়ের ভিত্তি জঘন্য জুয়াচুরীর উপরই স্থাপিত।

আসামীরা দরখাস্তকারীদের নিকট হইতে টাকা লইয়াছেন বটে, কিন্তু যে-সমস্ত সর্ত্তে টাকা ধার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বিশদভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন নাই। প্রাদেশিক ভাষায় নিয়ম কানুনগুলি অনূদিত করা হইয়াছিল, কিন্তু সত্যিকার ব্যাপারগুলি ওলোট-পালোট করিয়া লোকের মনে অন্যরূপ ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করাও হইয়াছিল। ঋণপ্রার্থীদিগকে আবার ইংরাজী সর্ত্তে সহি করিতে হইত, যেন তাহারা সমস্ত নিয়মগুলি বুঝিতে পারিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তদনুসারেই চালিত হইবে।

এই ব্যাপারে কলিকাতার বিদ্যাসাগর

কলেজের কমার্সের অধ্যাপক মিঃ দত্তকে সাক্ষী মান্য করা হইয়াছিল। তিনি বলেন যে কোম্পানী ঋণ-প্রার্থীদিগের নিকটে নিয়মকানুনগুলি বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহে। সেসন্ জজ্ এই সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "ব্যাঙ্ক অনেক জায়গা জুড়িয়া কাজ করিতেছে, অনেক শ্রেণীর লোকই ইহার খপ্পরে পড়িয়া থাকে। যাহারা সকলের চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত তাহারাও প্রবেশ মূল্য এবং প্রার্থী-ফি দিয়া ইহার সীমানায় প্রবেশ করিয়াছে। সহজেই বোঝা যায়, কি অভাবের তাড়নায় তাহারা ইহার মুষ্টির ভিতরে আসিয়াছে এবং হয়তো কত কষ্ট করিয়া তাহারা তাহাদের ফি-প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছে—তারপরে টাকা দেওয়া শেষ হইলে মাসের পর মাস ধরিয়া প্রার্থিত ঋণের জন্য তাহারা সাগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু টাকা আসে নাই। ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা এই অঞ্চলে ব্যাঙ্কের চার্জ্জে রহিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, প্রার্থীদিগের নিকটে নিয়মাবলী বুঝাইয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন!

ভুয়া ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে প্রতারণার অদ্ভুত ফন্দী

কাশীনাথ মহাদেব রাউ পাতিল নামে বোম্বাই এর জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু জনসাধারণের নিকট হইতে প্রায় ৫০ হইতে ৬০ হাজার টাকা প্রতারণা দ্বারা আত্মসাৎ করে। বোম্বাই-এর পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, টি, জাঙ্গলওয়ালার নিকট তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, কাশীনাথ সকলকে বলিয়া বেড়াইত যে 'দাদার' নামক স্থানে তাহার খুব বড় ব্যাঙ্কের ব্যবসায় আছে; ইহা বলিয়া সে ব্যবসায়ী, ধনী, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলকেই কর্জ্জ দিবার প্রতিশ্রুতি দিত। তারপর যথাসময় কর্জ্জ গ্রহণের জামীনস্বরূপ অলঙ্কার বা জমিজমার দলিল লইয়া পলায়ন করিত। কেবলমাত্র বোম্বাই সহরেই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র আবদ্ধ ছিল না, সে নিজের খেয়াল খুসী মত যেখানে সেখানে যাইয়া এইরূপ করিত। সে সাধারণতঃ কর্জ্জগৃহীতার নিকট হইতে জামীনের দলিল বা অলঙ্কার লইয়া তাঁহাকে বলিয়া যাইত যে 'দাদারে' গিয়া সে টাকা পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু তাহার পরে আর তার খোঁজ মিলিত না। জনৈক ভদ্রলোক এইরূপে প্রতারিত হইয়া কাশীনাথের নামে মামলা করে। উহাতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি অনুসন্ধানে তাহার এইরূপ আরও আটটি প্রতারণার কাহিনী ধরা পড়িয়াছে। এখনও বিচার শেষ হয় নাই।

ফরাসী ব্যাঙ্কারের জুয়াচুরি

ফেলিক্স অডোইন নামে ফ্রান্সের একজন কোম্পানী পরিচালক সম্প্রতি নানাস্থানে প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড দেনা রাখিয়া উধাও হইয়াছেন। তিনি গৃহ-নির্ম্মাণের ও অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় পরিচালন করিতেন এবং অনেকগুলি বণ্ড ইস্যু করিয়াছিলেন। এখন জানা গিয়াছে সেগুলি সবই জাল। একটি ব্যাঙ্ক এই লোকটির ইস্যু-করা কুড়ি হাজার পাউণ্ডের বণ্ড খরিদ করিয়াছিল। অডোইন সব সময়েই খুব বড়লোকের চালে চলাফেরা করিতেন।

সল্নিয়ার নামে আর একটি লোক একটি ব্যাঙ্ক চালায় বলিয়া নিজের পরিচয় দিত এবং বলিত সে নিজেই একজন ব্যাঙ্কার। কিন্তু

আসলে তাহার প্রধান কাজ ছিল একখানি পত্রিকা লইয়া। এই পত্রিকার আফিস রিউ বয়সি ডি এঙ্গলেস্-এ অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রকাশ। দলনিয়ার উপরোক্ত কাগজখানির খারাপ, অচল সেয়ারগুলি বাজারে চালাইত। নিজের কাজের জন্য মক্কেলের টাকা খরচের অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে; মোট তছরূপের পরিমাণ ১৬ হাজার পাউণ্ড। পুলিশ যখন তাহার নগদ তহবিলের বাক্স খোলে তখন তাহাতে মাত্র ২১ শিলিং পাওয়া গিয়াছিল।

ব্যাঙ্ক তছরূপ

কুমিল্লার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে আনুমানিক এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সরাইয়া লইবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র পাল, বি-এল (ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী), মণীন্দ্র চন্দ্র দেব এম-এ, বি-এল, স্থানীয় কলেজের গণিতাধ্যাপক, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চন্দ্র লাহা (অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জমিদার) এবং ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কুমিল্লা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আফিস হইতে কিছু কাগজপত্র পুলিশ হস্তগত করিয়াছে; এখানেও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দেব ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র পাল, গিরীন্দ্র মোহন লাহা, মণীন্দ্রচন্দ্র দেব এবং সুরেশ চন্দ্র ঘোষকে যথাক্রমে ১৫,০০০৲, ৭৫০০৲, ৭৫০০৲ এবং ২০০০৲ টাকার জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

রংপুর আর্ব্বান ব্যাঙ্ক

রংপুরের আর্ব্বান ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে যাহারা ধৃত হইয়াছিলেন, জজ্ সাহেব রায়ে তাহাদিগের মধ্যে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এল, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, শ্রীযুক্ত সতীশ দাস এবং অডিটর্ শ্রীযুক্ত মুরারী বর্ম্মন ও যোগেশ চাকীকে মুক্তি দিয়াছেন। কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের কেরাণী শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত ৪৭৭(এ) ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে (হিসাব-পত্রাদি জাল করা) নয় মাসের কারাদণ্ডে এবং ২০০৲ টাকা জরিমানা দিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার

বোম্বাইয়ের চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪ই জুলাই তারিখে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার চারিজন ডিরেক্টারকে একটী মামলা হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ১৯১৯ সালে ব্যাঙ্ক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৫০০০০৲ হাজার টাকার কমিশন কম করিয়া লেখার জন্য মিঃ শ্যামদাসনি উপরোক্ত চারিজন ডিরেক্টারকে ষড়যন্ত্র, ক্রিমিন্যাল ব্রিচ্ অফ্ ট্রাষ্ট এবং দুষ্কর্ম্মে সাহায্য করার জন্য অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। উহা প্রমাণিত করিতে না পারায় তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন।

ব্যাঙ্কে সিঁদেল

ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করিবার অভিযোগে দুই জন ডাকাতকে ধৃত করিলে তাহারা বলে যে তাহারা কেবল সেই সব ব্যাঙ্কেই চুরি করিয়া থাকে—যেগুলি সিঁদ কাটার জন্য ইনসিওর গ্রহণ করিয়া থাকে।

পাঞ্জাব জমিদার ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে মামলা

লায়ালপুর পাঞ্জাব জমিদার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চারিজন ডিরেক্টর, উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ এস, গোলাব সিংহ এবং তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ এবং দলিলপত্রাদি জাল করিবার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। মিঃ গোলাব সিংহের পুত্রও ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯,৪৭৭, ৪০৭ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অদ্য প্রাতঃকালে পুলিশ ব্যাঙ্কে হানা দিয়াছিল, কিন্তু ক্যাসিয়ারের অনুপস্থিতির জন্য খানাতল্লাস করিতে পারে নাই। ৮ই আগষ্ট শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। উভয় আসামী জামীনে খালাস পাইয়াছেন।

স্বরাজ-ব্যাঙ্ক

স্বরাজ ব্যাঙ্কের স্বনামধন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর যামিনীমোহন ঘোষ ১৯৩০ সালের Balance sheet, summary of capital এবং List of Shareholders যথাসময়ে জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ২০০ ্ টাকা জরিমানা করেন; কিন্তু আদালত হইতে তিনি আর বাহির হইতে পারেন নাই। আসানশোলের হাকিমের পরওয়ানার বলে তাঁহাকে পুলিশের হেফাজতে আসানশোল যাইতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটি মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরাই সর্ব্বপ্রথম স্বরাজ ব্যাঙ্কের ভূত ভবিষ্যৎ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম।

শিল্পসম্মিলনী ব্যাঙ্ক

"শিল্প সম্মিলনী ব্যাঙ্ক" ষড়যন্ত্র মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের ফতেপুর শাখার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোলাম কুরিয়া দণ্ডবিধির ৪২০ এবং ১২০(খ) ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপর কয়েকজন স্থানীয় এজেণ্ট মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বরিশালের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক ও মোহিনী-মোহন দত্ত এবং বারদীর ব্রহ্মপ্রসন্ন নাগ ২০০ টাকার জামীনে মুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ঐ অবস্থায়ই পলায়ন করেন; তাঁহারা ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ছিলেন। জামীনগুলির জন্য মোক্তার যোগেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী, বিধুভূষন দত্ত এবং খন্দকার ছালেম দায়ী ছিলেন। তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, "শিল্প সম্মিলনী ব্যাঙ্ক লিমিটেড" এই নামে কলিকাতায় একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। ঐ ব্যক্তিগণ ষড়যন্ত্র দ্বারা বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার বহু ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনা করিয়া ৩৬,০০০ টাকা স্থানীয় এজেণ্ট মারফৎ আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।
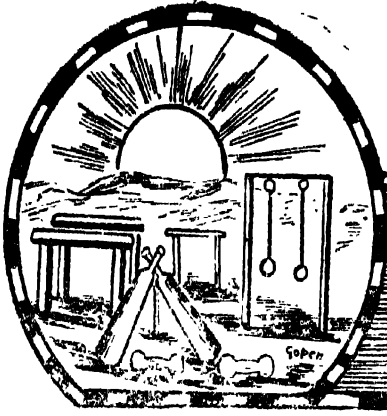
ভিটামিন

সম্প্রতি ইংলণ্ডে বোম্বাইর আলফন্‌সো আমে কি পরিমাণ ভিটামিন আছে তাহার পরীক্ষা ইংলণ্ডে হইয়াছে। আম এদেশের ফল, উহার কি গুণ আছে দুঃখের বিষয় তাহা পরীক্ষা করিবার মত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এদেশে নাই তজ্জন্য আমাদিগকে বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। সম্প্রতি কলিকাতায় যে রকফেলার ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীর খাদ্য-দ্রব্য, এদেশের শাকসব্জী যদি পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে আমাদিগকে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে আলফোন্‌সো আমে ক ও গ খাদ্যপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। ইহাতে যে ভিটামিন আছে তাহা স্কার্ভি রোগ-নিবারক এবং উহাতে "ক" ভিটামিন বর্ত্তমান। এই ভিটামিন সংক্রামক রোগ নিবারক। মাখন, দুগ্ধ, ডিম্ব, কড্‌লিভার তৈল প্রভৃতিতেও ঐ খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান এবং উহাদিগেরও ঐ প্রকার রোগ-নিবারক শক্তি আছে। আলফোন্‌সো আমে আপেল অপেক্ষা ৬ গুণ অধিক "গ" খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান। আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রে আমের নানাগুণের কথা দেখা যায়। 'ভাবপ্রকাশ' নামক চিকিৎসা পুস্তকে পাকা আম সেবনে মোটা হওয়া যায় ও সবল করে বলিয়া লেখা আছে। আলফোন্‌সো আমে যে পরিমাণ "গ" খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান উহার খোসাতেও ঐ পরিমাণ "গ" খাদ্যপ্রাণ আছে। পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যে বোম্বাইর কাওয়াসজি পাটেল আম ও "পেড্রিয়া" আমে ভিটামিনের মাত্রা "আলফোন্‌সো" আম অপেক্ষা কম।

দেখা গিয়াছে, কোনও জীবকে "ক" খাদ্য-প্রাণ যথা মাখন বা কোনও প্রকার জান্তব চর্ব্বি খাইতে না দিলে উহাদের চক্ষুর রোগ হয় এবং ক্রমে উহারা অন্ধ হয়। যে সকল জন্তুর ঐ প্রকার চক্ষুর রোগ হইয়াছে তাহাদিগকে রোগের প্রথমা-

বস্থায় মাখনাদি খাইতে দিলে উহাদের চক্ষু রোগ আরাম হয়। আরও পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে কোনও কোনও ফলে এবং হরিদ্রাবর্ণ সব্জীতে, সবুজ বর্ণের শাক ও পাতায় "ক" ভিটামিন আছে। এই সকল খাদ্য না খাইলে কেবল যে চক্ষুর রোগ হয় তাহা নহে, শরীরের কোন কোন অংশ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে সংক্রামক রোগই প্রধান। এই সকল চক্ষুরোগ নিবারক ভিটামিনকে "ক" ভিটামিন বলা হয়। এই খাদ্যপ্রাণ সেবনে সর্দ্দি রোগ, গলার রোগ এবং ফুসফুসের রোগ নিবারণ করে। শরীরে এই খাদ্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে।

বাল্যকালে এই সকল খাদ্যপ্রাণ প্রচুর সেবনেও অধিক বয়সে সংক্রামক রোগ নিবারণ করিবার শক্তি বজায় থাকে। হরিদ্রাবর্ণের শাক সব্জী ও ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কমলা লেবু ও কুমড়ার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন্ খাদ্যপ্রাণে কি উপকার হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

"ক" খাদ্যপ্রাণ—

ইহা সেবনে চক্ষুর দীপ্তি বাড়ে ও জীবন দীর্ঘ হয়। ইহা প্রধানতঃ দুগ্ধ, মাখন, জান্তব চর্ব্বি ও হরিদ্রাবর্ণের শাকসব্জীতে বর্ত্তমান। ইহা আমাদিগকে চক্ষুর রোগ ও অন্ধতা হইতে রক্ষা করে। ইহা চর্ব্বিতে দ্রবণীয়।

"খ" খাদ্যপ্রাণ—

ইহা সেবনে আমাদিগের স্নায়ু সবল হয়। ইহা প্রধানতঃ খোসা সহ গমে, ভুষিতে এবং আছাটা চাউলে বর্ত্তমান। ইহা সেবনে বেরি-বেরি রোগ হয় না। ইহা জলে দ্রবণীয়।

"গ" খাদ্যপ্রাণ—

ইহা প্রধানতঃ লেবুতে এবং ঐ জাতীয় ফলে বর্ত্তমান। ইহা সেবনে স্কার্ভি রোগ হয় না। ইহা জলে দ্রবণীয়।

"ঘ" খাদ্যপ্রাণ—

ইহা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ সূর্য্যালোকে ও কড-লিভার তৈলে বর্ত্তমান। ইহা সেবনে যক্ষ্মা রোগ এবং শিশুদের রিকেট রোগ হয় না। ইহা আমাদিগের অস্থি গঠন করে ও দন্ত শক্ত করে।

"ঙ" খাদ্যপ্রাণ—

সন্তান জন্মে সাহায্য করে। ইহা প্রধানতঃ অঙ্কুরসহ গম হইতে যে তৈল বাহির হয় তাহাতে, সবুজ লেটুশ শাকে বর্ত্তমান এবং ইহা সন্তান-হীনতা দুর করে।

"ক" খাদ্যপ্রাণ প্রথমে জান্তব চর্ব্বিতেই বাহির হয়। ইহা প্রথমে, দুগ্ধ, ডিম্ব, কডলিভার তৈল ও চর্ব্বিতে পাওয়া যায়। শাক সব্জীতে ইহা বর্ত্তমান কিনা সে সম্বন্ধে পরে অনুসন্ধানে দেখা যায়, যে ইহা হরিদ্রাভ ভুট্টায়, গমের অঙ্কুরে, বাঁধা কপিতে আছে। ইহা শিশুর শরীর বর্দ্ধনে সাহায্য করে। বর্ত্তমান সময়ে জানা গিয়াছে যে ইহা নানা প্রকার শাক সব্জীতে বর্ত্তমান।

পালং শাকে ইহা ৬১ ভাগ বর্ত্তমান, গাজরে ২৫ হইতে ৭০ ভাগ, কুমড়া ও রাঙ্গা আলুতে ৪ হইতে ১০ ভাগ বর্ত্তমান। ইহা কলা, খেজুর ও বিলাতী বেগুনে বর্ত্তমান। মেদহীন মাংস, যথা, মুরগী ও হরিণের মাংসে অর্দ্ধভাগ বর্ত্তমান; কিন্তু যকৃতে ৫ হইতে ১৪০ ভাগ বর্ত্তমান। জন্তু কি ভাবে এবং কোন জিনিষ আহার করিয়াছে তাহারই উপর যকৃতে ইহার পরিমাণ নির্ভর করে। ডিম্বে ১৫ হইতে ২০ ভাগ, দুগ্ধে ২ ভাগ, জমান দুগ্ধে ৪ ভাগ ও জলীয় ভাগহীন দুগ্ধে, ১৬ ভাগ বর্ত্তমান। মাখনে ৩০ হইতে ৫০ ভাগ এবং কডলিভার অয়েলে ১৫০ হইতে ২০০ ভাগ বর্ত্তমান।

টোটকা

বিছার কামড়ের ঔষধ

১। আমরুল শাক বাটিয়া প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

২। শ্বেত আকন্দের শিকড় বাটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারণ হয়।

৩। তেঁতুলের বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারণ হয়।

৪। বকুলের বীজ হুকার জলে বাটিয়া দিলে অথবা আমড়া পাতার রস লাগাইলে জ্বালা নিবারণ হয়।

৫। গাব ভেরেণ্ডার আঠা লাগাইলে বিছার কামড় এবং মৌমাছি ও ভীমরুলের কামড়ের জ্বালা একেবারে জুড়াইয়া যায়।

সর্পাঘাতের ঔষধ

রোগীকে অনতিবিলম্বে থানকুনি (কেহ কেহ ঠুনিমানকুনিও বলে) যাহা বাজারেও সময় সময় বিক্রী হয় এবং যাহা দ্বারা মেয়েরা শুক্ত পাক করে ঐ গাছ তুলিয়া পাতা, ডগা এবং মূল ভাল ধৌত করিয়া পাটায় ছেঁচিয়া আধ পোয়া তিন

ছটাক পরিমাণ রস খাওয়াইতে হইবে। এক আধটুকু বেশীকমিতে কোন ক্ষতি নাই। এরূপ ২।১ বার খাওয়াইলেই রোগী আরোগ্য হইবে। আর যদি রোগীকে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা হইলে ঐ গাছেরই লম্বা ২টী ডগা রোগীর দুই কাণ দিয়া যতদূর যায় প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং রোগীর হাত পা ধরিয়া রাখিতে হয়, নতুবা আস্তরণ করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ঐ রূপে কাণে ঐ ডগা প্রবেশ করাইলে কিছু সময়ের মধ্যেই রোগীর জ্ঞান হইবে এবং জ্ঞান হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রস খাওয়াইতে হইবে। ইহাতেই রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহা অতি সহজসাধ্য এবং ব্যবহারেও কোন আশঙ্কার কারণ নাই। ইহার ফল ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বিছার কামড়ের ঔষধ

১। বিছা বা বোল্‌তা জাতীয় কোন কীট পতঙ্গ কামড়ালে, দষ্ট স্থানে ওল বা কচুর ডাঁটা কেটে ঘষে দিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা বন্ধ হয়।

২। ছোট পেঁয়াজ বাটিয়া তাহার রস লাগাইলে অথবা সরিষার তৈলের সহিত ধূনা ফেলাইয়া লাগাইলেও যন্ত্রণা যায়।

আধ-কপালের ঔষধ

১। একটি পাতিলেবুর উপর পুরু করিয়া গোবর লেপিয়া ঘুঁটের আগুনে পুড়াইতে হইবে। লেবুটি বেশ সিদ্ধ হইলে আগুন হইতে বাহির করিয়া, টোকা মারিয়া লেবুর উপরকার গোবরের ছাই ফেলিয়া দিতে হইবে; তারপর,লেবুর ভিতরে যে শাঁস থাকিবে তাহা গলিয়া যাইবে, সেই গলা শাঁস লইয়া যে দিকের কপালে ব্যথা হইবে সেই দিকে লাগাইতে হইবে।

এই ঔষধ ব্যবহার করিবার কালে গরম জলে কিছুক্ষণের জন্য হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া পরে মোজা ব্যবহার করিলে অত্যন্ত উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ ২।১ দিন লাগাইলেই ভাল হইয়া যাইবে।

২। হরিণের শিং, রক্তচন্দন সহ ঘসিয়া লাগাইলে খুব শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

৩। শিমুল তুলা পুড়াইয়া তাহার ধূম নাক দিয়া টানিলে উপকার পাওয়া যায়।

৪। প্রাতঃকালে রক্তচন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত সামান্য পরিমাণ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আধ কপালের ব্যথার উপশম হয়; দুই চারি দিন ক্রমাগত লাগাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

৫। প্রাতে স্নান করিয়া মুসুরীর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও উপশম হয়।

৬। অমৃতাঞ্জন মলম ঘষিয়া দিলে উপশম হয়—ইহা বাজারে সর্ব্বত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস্

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কস্-এর নাম আজ সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। ১২ বৎসর পূর্ব্বে একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক কেমন করিয়া রিক্ত হস্তে একাকী এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন আজ তাহার জন্ম কথা বলিব।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বসু পূর্ব্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তগৃহের সন্তান। বাল্যকাল হইতেই ধীর, শান্ত এবং মেধাবী বলিয়া তিনি সকলের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সমাপ্তির পর ফলিত রসায়ন শাস্ত্রে এবং কারখানা পরিচালনায় ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তিনি জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপে হাতে কলমে নানারূপ শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

তিনি আমেরিকার ষ্ট্রাস্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি হইতে বি-এস্-সি এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে এম্-এস্-সি পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃতকার্য্যতার পরিচয় পাইয়া গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজা তাঁহাকে উচ্চ বেতন Industrial Chemist-এর পদ প্রদান করেন। কিন্তু একে পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তাহাতে আবার কেমিষ্ট এবং তাহার উপর আবার সুবৃহৎ নেটীভ্ ষ্টেটের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী—এই ত্র্যহস্পর্শ যোগ তাঁহার চাকুরীর পথে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিল এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে অচিরাৎ তিনি ভারতরক্ষা আইনের (Defence of India Act) কবলে নিপতিত হইলেন এবং পাঁচ বৎসরের উপর অন্তরীণ (Interned) হইয়া রহিলেন।

আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা অন্তরীণ হইয়া কেহ গীতাভাষ্য, কেহ শঙ্করভাষ্য, কেহ আত্মজীবনী এবং কেহবা ঐতিহাসিক তথ্য লিখিয়াছেন, আর সুরেন্দ্র বাবু এই সুদীর্ঘ কাল অন্তরীণ অবস্থায় থাকিয়া কেবল রাসায়নিক গবেষণায় কাল কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার গবেষণায় একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল। Industrial Chemistry বা ব্যবহারিক রসায়ন বিদ্যা-শিক্ষার জন্যই তিনি বিদেশে গিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল এই যে অধীত এবং অর্জ্জিত বিদ্যার সাহায্যে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া কোনও একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিবেন। দেশে ফিরিয়া কারখানা স্থাপনের উপযোগী অর্থের সংস্থানের জন্য নিলেন নেটীভ্ ষ্টেটে চাকুরী; কিন্তু "ভারতরক্ষা আইন" সে পথে কাঁটা দিল, এবং তাঁহাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া নিয়া জেলের নিভৃত কক্ষে খাঁচার পাখী করিয়া রাখিল। তিনি বুঝিলেন যে এই খাঁচা হইতে বাহির হইলেও আর তাঁহার ভাগ্যে কোনও নেটীভ্ ষ্টেট বা তদনুরূপ বৃহদাশ্রয়ে কোনও চাকুরী মিলিবে না। তাঁহার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য তিনি বাছিয়া বাছিয়া এমন একটী শিল্পের গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন

যাহা অতি সামান্য ভাবে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়াও আরম্ভ করা যায়।

সে-সময় বর্ষাতি কোট, এবং Rainproof বস্ত্রাদি সবই বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইত এবং ত্রিপলও (Tarpaulin) বহুল পরিমাণে বিদেশ হইতে আসিত। দুই তিনটী ইউরোপীয় ফার্ম্ম এদেশে ত্রিপল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ত্রিপলই বিদেশ হইতে আমদানী হইত এবং এই বর্ষাতি বস্ত্রাদি ও ত্রিপলের বাবদ এদেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত। কি পরিমাণ

প্রবাসে শিক্ষার্থী সুরেন্দ্রমোহন

টাকার বর্ষাতি ও ত্রিপল এদেশে আমদানী হয় তাহার কয়েক বৎসরের বিবরণ এইখানে প্রদত্ত হইল।

গত পাঁচ বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যত টাকার ওয়াটারপ্রুফের দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব :—

১৯২৬-২৭ সালে	১১,৬৫,৬০৫ টাকা
১৯২৭-২৮ „	১২,৭৪,৮২২ „
১৯২৮-২৯ „	১৪,০৬,০৮১ „
১৯২৯-৩০ „	১৫,৬৫,৫৯৩ „
১৯৩০-৩১ „	১১,৫৯,৭২৫ „

ইহা ছাড়া কেবলমাত্র রবারের তৈয়ারী যে সকল কোট এবং ওয়াটারপ্রুফের দ্রব্যাদি গত কয়েক বৎসর হইতে অসম্ভবরূপে এদেশে আমদানী হইতেছে তাহার হিসাব উপরোক্ত অঙ্কের মধ্যে দেওয়া হয় নাই। কমার্সিয়াল ডিপার্টমেণ্ট হইতে আমদানীর যে statistics বাহির হয় তাহার মধ্যে রবার কোট কিম্বা রবারের ওয়াটারপ্রুফ দ্রব্যাদির কোনও স্বতন্ত্র হিসাব দেওয়া হয় না। Manufactured Rubber goods বা "রবার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি" এই হেডিং দিয়া হিসাব বাহির করা হয়। রবারের কোট এবং রবার নির্ম্মিত ওয়াটারপ্রুফের দ্রব্যাদিও উপরোক্ত "রবার নির্ম্মিত দ্রব্যাদির" হেডিং এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং রবারের কোট এবং ওয়াটারপ্রুফ দ্রব্যাদি কত টাকার আমদানী হইতেছে তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। তবে যাঁহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন তাঁহাদের অনুমান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত যত টাকার ওয়াটারপ্রুফ এদেশে আমদানী হইতেছে, রবারের নির্ম্মিত ওয়াটারপ্রুফের আমদানী তাহার অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। সুতরাং এই বাবদ আরও ১৪।১৫ লক্ষ টাকা যে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই আমদানীর পরিমাণ

দেখিয়া মনে হয় যে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস এর ন্যায় আরও অনেকগুলি ওয়াটারপ্রুফ-এর কারখানা স্থাপিত হইলে দেশের অভাব মিটিতে পারে।

দেশব্যাপী কাজ কারবারের প্রসার, নানাদেশে পর্য্যটন, সর্ব্বত্র চলাফেরা এবং সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাতি কোট, ছাতা, বস্ত্রাদি এবং জল বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ওয়াটার প্রুফ্ এবং ত্রিপলের ব্যবহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সুরেন্দ্র বাবু কারাকক্ষে বসিয়া এই শিল্পে হাত দিবার মনস্থ করেন এবং পাঁচ বৎসর নির্জ্জন কারাবাসে বসিয়া waterproofs সম্বন্ধে নানারূপ রাসায়নিক গবেষণায় নিবিষ্ট ছিলেন। দেশে যে সকল Raincoat এবং Waterproof ব্যবহৃত হয় তাহার প্রধান দোষ গুলি এই :—

১। Raincoat এবং waterproof গুলি এরূপ মাল মসলা দ্বারা প্রস্তুত হয়, যাহার ফলে ইহা অত্যন্ত ভারী হইয়া যায়। এইজন্য waterproof বহিতে অনেকের অসোয়াস্তি এবং কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। এমনও দেখা যায়, ভারী ওয়াটারপ্রুফ্ হইলে লোকে বৃষ্টিতে ভিজিতেও রাজী, তথাপি একটা কোট কাঁধে ফেলিয়া কিম্বা হাতে ঝুলাইয়া লইতে রাজী নয়।

২। সাধারণতঃ ওয়াটারপ্রুফগুলি non-porous বা ছিদ্র রহিত বলিয়া উহা গায়ে দিলে হাওয়া চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; তাহার ফলে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে এবং অচিরাৎ সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায়। শরীরে যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করা হয় তাহা এরূপ মাল মসলার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া দরকার, যাহাতে গায়ের হাওয়া চলাচল একেবারে রোধ হইয়া না যায়। তাহা না হইলে শরীর অচিরে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং অত্যধিক গরম বোধ হয়। বাজার প্রচলিত ওয়াটার প্রুফের দোষ এই যে, ইহা শরীরের Ventilation বা বায়ু চলাচল একেবারে রোধ করিয়া দেয়। এইজন্য এই সকল ওয়াটারপ্রুফ্ পরিলেই সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠে এবং শরীর এত গরম বোধ হয় যে ওয়াটার প্রুফ খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই লোকে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

৩। যাহারা এই দুইটী দোষ এড়াইয়া ওয়াটার প্রুফ করিতে চায় তাহাদের বর্ষাতি কোট আবার rainproof-ই হয় না। অর্থাৎ এই সকল বর্ষাতিতে বৃষ্টির জল রোধ হয় না। বৃষ্টি পড়িলেই সাধারণ কাপড়ের ন্যায় ভিজিয়া ভিতরে জল যায়।

৪। বাজার প্রচলিত সাধারণ বর্ষাতিগুলি এরূপ মালমসলায় প্রস্তুত যে আমাদের দেশের অসহ্য গরমে উহা অনেক সময় গলিয়া gummy and sticky অর্থাৎ আঠা আঠা ও চট্‌চটে হইয়া যায়।

এইজন্য সুরেন্দ্র বাবু ৫ বৎসর ধরিয়া নির্জ্জন কারাকক্ষে যে রাসায়নিক গবেষণা করিলেন তাহার মূল লক্ষ্য হইল এই যে,—

১। সাধারণ কাপড়কে এরূপ রাসায়নিক পদ্ধতির মধ্য দিয়া তৈরী করিব, যাহাতে উহা একেবারে rainproof এবং waterproof হইবে, অথচ এই সকল রাসায়নিক মিশ্রণের জন্য কাপড়ের ওজন বাড়িবে না।

২। বর্ষাতিগুলির porosity বা ছিদ্রতা এবং Ventilation বা বায়ু চলাচল বন্ধ হইবে না।

৩। আমাদের দেশের অসহ্য গরমেও বর্ষাতিগুলি যেন ঘামিয়া আঠা আঠা বা চট্‌চটে

না হয়। দীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি যে সকল মাল মসলার সাহায্যে এবং যে process বা পদ্ধতি অনুসারে waterproof তৈরী করিলেন তাহাতে উপরোক্ত গুণগুলি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইল; এই পদ্ধতির তিনি নামকরণ করিলেন "Duck-Back Process" এই নামকরণের মধ্যেও সুরেন বাবুর একটু বিশেষত্ব আছে। Duck Back Process এর বাংলা করিলে মানে হয় "হংস পৃষ্ঠ পদ্ধতি।"

১। হাঁসের পৃষ্ঠদেশে বৃষ্টি পড়িলে জল তখনই গড়াইয়া পড়িয়া যায়, একটুও ভিতরে ঢুকিতে পারে না।

২। হাঁসের পৃষ্ঠ দেশের পাখাগুলি সচ্ছিদ্র; সুতরাং তাহার ভিতর দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারে।

৩। ইহার পাখাগুলি এত হাল্কা যে ইংরাজীতে কোনও জিনিষকে হাল্কা বলিতে গেলে বলা হয় "light as feather" অথবা "feather weight"

৪। হাজার গরমেও হাঁসের পাখ্না চট্‌চটে হয় না।

হাঁসের পাখ্না এবং পৃষ্ঠদেশের মত গুণ সকল সুরেন্দ্র বাবুর বর্ষাতিতে আছে বলিয়াই বোধ হয় তিনি ইহার নাম করণ করিয়াছেন Duck-Back Process.

কারাকক্ষের মধ্যে এই সকল রাসায়নিক তথ্যের আবিষ্কার ত' হইল, কিন্তু সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল এইরূপে আবদ্ধ থাকায় যখন তিনি মুক্তি পাইলেন তখন মূলধন ত' দূরের কথা নিজের জীবিকার্জ্জনেরই তাঁহার কোন সংস্থান ছিল না। বর্ত্তমান গান্ধীযুগের পর লোকে রাজনৈতিক কারণে বন্দী হইলে যেমন দেশের সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান পায়, তখনকার দিনে রাজনৈতিক দাগীদিগকে লোকে মনে মনে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিলেও তাহাদের সহিত বাহিরে কোনও সংস্রব রাখিতে সাহস পাইত না। তখনকার দিনে ইঁহারা ছিলেন রাজনৈতিক অস্পৃশ্যশ্রেণী", কাজেই দেশের গুণীদিগের নিকট হইতে এই কাজের জন্য যে তিনি কোনও সাহায্য পাইবেন সে-আশাও সুদূরপরাহত ছিল। সুতরাং একাকী অসহায় অবস্থায় এবং একরূপ বিনা সম্বলে তিনি বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ্ ওয়ার্কস্ স্থাপন করিলেন এবং "জয়মা" বলিয়া তরী ভাসাইয়া দিলেন।

লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুষ্ঠানটী অতি ক্ষুদ্রাকারে আরম্ভ হইল। প্রারম্ভে লোকজন রাখিয়া ধুমধাক্কা করার সঙ্গতি এবং সামর্থ্য ছিল না; তাই সুরেনবাবু নিজের ভাইদের এই কাজে নিয়োগ করিলেন এবং হাতে-কলমে তাঁহাদের শিক্ষা দিয়া দক্ষ কারিগর করিয়া তুলিলেন। এইসময় প্রথম কয়েক বৎসর ধরিয়া ইঁহারা সকল ভাইতে মিলিয়া প্রত্যহ ১৬ হইতে ১৮ ঘণ্টাকাল দৈনিক পরিশ্রম করিতেন। পরিশ্রমের পুরস্কার আছেই।

"উদ্যোগীনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।"

যাহারা উদ্যোগী পুরুষসিংহ, লক্ষ্মী তাহাদেরই করায়ত্ত হ'ন; আর যারা কাপুরুষ তাহারাই কেবল বলে যে কপালে না থাকিলে লক্ষ্মীলাভ বা ধনলাভ হয় না।

সুরেন্দ্রবাবু ভাইদের সঙ্গে লইয়া বিপুল উৎসাহ, উদ্যম এবং অধ্যবসায়সহকারে কারখানার পিছনে দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং তাহার ফলও অচিরাৎ ফলিতে সুরু হইল।

দেখিতে দেখিতে ভারতীয় সৈন্য বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট এবং সকল প্রভিন্সিয়াল গভর্ণমেণ্টে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ্ ওয়ার্কসের প্রস্তুত দ্রব্যাদি তাহাদের গুণ এবং সস্তা দামের জন্য আদৃত হইতে আরম্ভ হইল এবং জনসাধারণও আগ্রহের সহিত এই কারখানার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে ফ্যাক্টরীর আকার এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি আশাতীতরূপে বাড়িয়া উঠিল। এইবার জিনিষ কাটাইবার সমস্যা উপস্থিত হইল।

স্বদেশী দ্রব্য প্রচার এবং প্রসারের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে সেলিং এজেন্সীর অভাব। এ বিষয়ে "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" অনেক সংখ্যায় আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর সেসব বিষয়ের পুনরুক্তি করিতে চাহি না। যে সকল দোকানদার এতকাল বিদেশী জিনিষের কারবার করিয়া আসিতেছে তাহারাই স্বদেশী জিনিষের কাটতির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান হয়। বর্ষাতি Manufacturors বা কারখানার মালিকগণ স্বভাবতঃই যাহারা বর্ষাতি ও ওয়াটারপ্রুফাদি বেচে তাহাদের দোকানেই মাল কাটাইবার জন্য যায় এবং বিদেশী জিনিষের সঙ্গে সঙ্গে দেশী জিনিষ কাটাইবার জন্যেও নানারূপ অনুনয় বিনয় করে এবং শেষে ধাপ্পা দিয়া পড়ে। পাইকারেরাও তখন তাহাদের পাইয়া বসে এবং কমিশনাদির বাবদ তাহাদের শেষ রক্তবিন্দু চুষিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। এত করিয়াও মালিকেরা অচিরাৎ বুঝিতে পারেন যে বিদেশী মালের পাইকারগণ তাঁহাদের মাল কাটানো ত'

দূরের কথা, বরং তাঁহাদের মালের বিরুদ্ধেই প্রচার কার্য্য চালাইতেছে।

১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে এই দীর্ঘকালের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এই শোচনীয় অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইলেও কারখানার মালিকদিগের মাল কাটাইবার রাস্তা এতটুকুও পরিষ্কার হয় নাই, কিম্বা কোনও ভাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এখনও মালিকদিগকে from the field to the market অর্থাৎ গাছে পাড়া হইতে তলায় কুড়ানো পর্য্যন্ত সমস্ত কাজেরই ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হয়।

সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাল কাটাইবার পথে যখন এই পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্ন দেখিতে পাইলেন, তখন There should be no Alps in my way-এই মহদ্বাক্য স্মরণ করিয়া নিজেই নিজের রাস্তা করিতে লাগিয়া গেলেন। যে-সকল পাইকারেরা তাঁহার মাল কাটাইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছিল তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল যে অচিরাৎ কলিকাতার স্থানে স্থানে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্এর দোকান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপে দেখিতে দেখিতে চৌরঙ্গী, কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফের "শো রুম" ও দোকান স্থাপিত হইয়া গেল; এই সকল দোকানের আশাতীত সাফল্য দেখিয়া সুরেনবাবু সুদূর বোম্বাই ও রেঙ্গুনেও বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের "শো-রুম" ও দোকান স্থাপন করিলেন। আজ ভারতের আরও নানাস্থানে তাঁহাদের এইরূপ নিজস্ব দোকান স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের নাম আজ সমগ্র বৃটীশ ভারতে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে।

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের বিশেষত্ব এই যে এই ফ্যাক্টরীতে ওয়াটারপ্রুফ করার জন্য যে-সকল বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় অধিকাংশই ভারতীয় কাপড়ের কলে প্রস্তুত। জীবনের

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্এর প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন বসু

প্রারম্ভেই যিনি রাজবন্দী হইয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল জেলে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দেশী কাপড়ের ওয়াটারপ্রুফ করার জন্য আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রবাবু আমাদের বলিয়াছিলেন যে এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর তিনি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজের ভাল ভাল কাপড়ের কলের মালিকদের কাছে গিয়া নানারূপ যুক্তিতর্ক দেখাইয়া এবং স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়া তাঁহার ফরমাইস মত কাপড় প্রস্তুত করার জন্য প্রবুদ্ধ করিয়া থাকেন। এইজন্য কোন কোন জায়গায় তাঁহাকে মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। এইরূপ নীরব সাধনা এবং

আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এখন ভারতীয় কলের মালিকগণ তাঁহার ফরমাইস মত নানারূপ ওয়াটারপ্রুফের উপযোগী কাপড় তৈয়ারী করিতেছেন—তাই বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের নানারূপ ভ্যারাইটী আজ বাজারে বাহির হইয়া ক্রেতা-দিগকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা বলিয়াছি যে উচ্চ-শ্রেণীর ওয়াটারপ্রুফে রবারের নাম গন্ধ থাকে না, সুতরাং তাহা ঘামিয়া আঠা আঠা বা চটচটে হয় না। সুরেন্দ্রবাবু রবারবিহীন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে ওয়াটারপ্রুফ করিয়াছেন তাহাই ভারতে সর্ব্বপ্রথম সফল প্রচেষ্টা। কিন্তু এইরূপ ওয়াটারপ্রুফের দাম বেশী এবং সঙ্গতিপন্ন লোকেরাই এই সকল জিনিষ কিনিতে পারেন। এইজন্য আগাগোড়া রবারের ওয়াটারপ্রুফ অতি সস্তা দামে বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং দাম সস্তা বলিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে উহা হু হু শব্দে বিক্রয় হইতেছে।

এই economic drain age বা আর্থিক সেচ-প্রবাহ রোধ করিতে হইলে শুধু সঙ্গতিপন্ন ক্রেতাদিগকে লইয়া থাকিলেই চলিবে না, জনসাধারণের অভাব মিটাইবার জন্যেও চেষ্টা করিতে হইবে। বেল্‌জিয়ান্ cutglass এর

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস-এর কারখানা

No. 1.—(a) Office, (b) Chemical Proofing Dept.   No. 2.—Tailoring Dept. & Despatching Dept.   No. 3.—Canvas Proofing Dept. & Boiler House.
No. 4—Taping Dept. & Oil Cloth Dept.   No. 5—Rubber Proofing Dept. & Rubber Goods.

নির্ম্মিত ডিক্যাণ্টার, জলাধার, পানীয় জলের গ্লাস ইত্যাদির এক একটির দাম ৮৷১০৲ টাকা হইতে ৪০৷৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল মূল্যবান গ্লাস কেবলমাত্র ধনীরা এবং আই, সি, এস্-রাই কিনিতে পারেন! আর ঐ যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ৵০ আনা, দশ পয়সা দামের সস্তা জাপানী ও জার্ম্মান গ্লাস ফেরীওয়ালারা ফেরী করিয়া বেড়াইতেছে, উহার খরিদ্দার দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব, আপামর সাধারণ লোক। বেলজিয়ান outglass-এর খরিদ্দার ইহাদের তুলনায় মুষ্টিমের বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুতরাং ঐরূপ cut glass এর বাবদ এদেশ হইতে বছরে লাখ টাকা বিদেশে গেলে সস্তা দামের জার্ম্মাণ ও জাপানী গ্লাসের বাবদ বহু লক্ষ টাকা তাহাদের দেশে চলিয়া যায়। দেশের আর্থিক দৈন্যের দিক হইতে তাই সস্তা দামের জিনিষকে উপেক্ষা করিলে মহাভুল করা হইবে।

গ্লাসের ব্যবসা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ওয়াটার প্রুফের বেলায়ও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য। দামী কাপড়ের উপর মূল্যবান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ওয়াটার প্রুফের বাবদ যত টাকা বিদেশে যাইতেছে, সস্তা দামের রবারের কোটের বাবদ তাহাপেক্ষা বহু লক্ষ টাকা বিদেশে প্রেরিত হইতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং দেশের আর্থিক সেচ্ প্রবাহ রোধ করিতে হইলে এ-দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন।

আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে এ-বিষয় সুরেন্দ্র বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি সকল রকমের রবারের কোট ও বস্ত্রাদি তৈয়ারী করিবার জন্য বিদেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি আনাইয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপ এবং আমেরিকায় নানা কারখানা দেখিবার জন্য পুনরায় বিদেশে গিয়াছিলেন। আমরা এই সব যন্ত্রপাতি দেখিয়া আসিয়াছি। ইহা খাটানো হইলে রবারের বস্ত্রাদি প্রস্তুত আরম্ভ হইবে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠানটীও ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া ক্যানভাসকে ওয়াটার প্রুফ করার জন্য,—যাহাকে চলিত ভাষায় ত্রিপল বলা হয়—ইঁহাদের কারখানায় যে-সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাহা একেবারে আধুনিকতম এবং দ্রব্যাদিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়। ত্রিপল তৈয়ারীর যে-সকল স্বদেশী, বিদেশী কারখানা এদেশে আছে, তাহা মান্ধাতার আমল হইতে মামুলি প্রথায় পরিচালিত হয়। ক্যান্‌ভাসের উপর ব্রাশ্ দিয়া তেল ও রঙ টানিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সাধারণতঃ এইসকল ত্রিপল তৈয়ারী হয়; ইহাতে জিনিষও যেমন মোটা হয় তেমনি অল্প কয়েকখানি ত্রিপল প্রস্তুত করিতে বহু সময় লাগিয়া যায়। সুরেন্দ্র বাবুদের কারখানায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই সকল ব্যাপারই কলে প্রস্তুত হয়।

প্রতিদিন ৬০০০ হইতে ৮০০০ গজের যে-কোনও রকমের Canvass এই সকল কলে ওয়াটার প্রুফ হইয়া সাইজ মত কাটা, শেলাই, বোতাম লাগানো ইত্যাদি সব প্রক্রিয়াই কলে প্রস্তুত হইয়া ডেলিভারী প্রদত্ত হইতে পারে। ভারতের সমুদয় State রেলওয়েতেই প্রতি বৎসর এই কারখানা হইতে নির্ম্মিত লক্ষ লক্ষ গজ ত্রিপল বিক্রীত হইয়া থাকে। এইরূপ সুসজ্জিত কলকারখানা ভারতের আর কোথায়ও এ-পর্য্যন্ত ত্রিপল নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই।

এই ওয়াটারপ্রুফের কারখানার দ্রব্যাদি জোগান দিবার জন্য আরও যে কয়েকটী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজ পাইতেছে তাহাদের কথাও উল্লেখযোগ্য।

১। প্রথমতঃ কাপড়ের কলগুলি ওয়াটার-প্রুফের কাজের জন্য নূতন ধরণের বস্ত্র সরবরাহ করিতেছে এবং তদ্বারা নূতন এক শ্রেণীর কারিগর প্রতিপালিত হইতেছে।

২। ওয়াটারপ্রুফ কোটে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে শিংয়ের এবং অন্যান্য দ্রব্যের বোতামের প্রয়োজন হয়। ঢাকার শিংয়ের বোতামের কারখানাগুলি এজন্য প্রচুর পরিমাণে কাজ পাইতেছে।

৩। ত্রিপল, ক্যানভাস্ ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য পিতলের আইলেট, হুক্, দড়ী, সুতলী ইত্যাদির প্রয়োজন বলিয়া এইসকল ব্যবসায়ীরাও অর্থোপার্জ্জন করিতেছে।

৪। ওয়াটারপ্রুফ কোটের Belt বা কোমর বন্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে Buckles (চলিত কথায় যাহাকে বগ্‌লস্ বলে) দরকার হয়। ভবানীপুরের পিতল এবং নিকেলের কারীগরগণ এই সকল জিনিষ জোগান দিয়া দু'পয়সা আয় করিতেছে।

৫। ওয়াটারপ্রুফ বস্ত্রাদি কাটাই, শেলাই ইত্যাদির জন্য অনেক দর্জ্জীর অন্নের সংস্থান হইতেছে।

এইরূপে একটী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জোগান দিবার জন্য ছোট বড় আরও অনেক শিল্পানুষ্ঠান লাভবান হইতেছে এবং এইরূপেই দেশ ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

আজ বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস-এর Duck Back ওয়াটারপ্রুফ, হোল্‌ডল্, ছাতা, অয়েলক্লথ, ক্যানভ্যাস্, ত্রিপল ইত্যাদির চাহিদা ভারতের সর্ব্বত্র, সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং দিন দিন উহার চাহিদা বাড়িতেছে। গত বৎসর মহাত্মা গান্ধী ও মদন-মোহন যখন Round Table Conference-এ যোগদান করার জন্য বিলাত যান তখন তাঁহাদের নিজেদের ও দলবলের ব্যবহারের জন্য বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস-এর প্রস্তুত দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রকৃত ভাল জিনিষের আদর সকলেই করিয়া থাকে। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও বহুসংখ্যক ইউরোপীয়ান, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ বৎসরের পর বৎসর ব্যবহার করিতেছেন এবং দিন দিন ইঁহাদের ইউরোপীয় খরিদ্দার বাড়িয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা এবং বোম্বাইয়ের ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ী মহলে বেঙ্গল ওয়াটার-প্রুফের কাটতি আশ্চর্য্যরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ—বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ গুণে এবং দামে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। ইঁহাদের ওয়াটারপ্রুফ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বিদেশগামী জাহাজসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের পাইলট্ কোট সবই এখান হইতে খরিদ করিতেছেন। জাহাজে ক্রমাগত দিনের পর দিন জল বৃষ্টির মধ্যে যাহাদিগকে পাইলট্ কোট পরিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাদের কোট যদি ভালরূপে ওয়াটারপ্রুফ না হয় তবে সে কোট ব্যবহারের কোনও সার্থকতা নাই। সুতরাং বিদেশাগত জাহাজসমূহের কর্ম্মচারীগণ যখন এই স্বদেশী কারখানা হইতে তাঁহাদের পাইলট্ কোট খরিদ করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে দামের তুলনায় ইহা বিদেশী

ওয়াটার প্রুফ অপেক্ষা নিঃসংশয়রূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহারা এইরূপ অর্ডার দিতেছেন। আজ বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস পৃথিবীর নানাদেশ এবং জাতির জাহাজী কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে পাইলট্ কোটের অর্ডার পাইতেছেন।

ইহাদের আনীত নূতন কল কব্জাদি ফিট্ করা হইলে রবারের বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য নানারূপ রবারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ হইবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবারের ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া আমরা লিখিয়াছিলাম "The world now moves on Rubber" ফলতঃ, সাইকেল, মোটরকার, গাড়ীর টায়ার, টিউব বেলুন, ফুটবল, জুতা, খেলনা ইত্যাদির কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় —It is the age of Rubber। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় ভগবানের দয়ায় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙ্গালী পরিচালিত এই বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়াকস একদিন ভারতের একটী প্রধান রবার ইণ্ডাষ্ট্রীর কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বারো বৎসর পূর্ব্বে সহায়সম্বলহীন এক বাঙ্গালী যুবক দীর্ঘকাল কারা যন্ত্রণা ভোগ করার পর মুক্ত হইয়া, একাকী, অসহায় অবস্থায়, একরূপ রিক্ত হস্তে, লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ক্ষুদ্র কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাই আজ স্বদেশবাসীর স্নেহবারি সিঞ্চনে এবং অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তারকরতঃ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার ছায়ায় বসিয়া বহুলোক আরাম বিরাম ভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছে। সুরেন্দ্রমোহনের অল্প কয়েক বৎসরের প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা যে কয়েকটী গুণ লক্ষ্য করিতেছি তাহা এই:—

১। কোনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে এবং তাহাকে বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে চাই Expert knowledge. অর্থাৎ, সেই শিল্পটীর সম্বন্ধে দেশ বিদেশে যাইয়া সকল তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতঃ তাহার আগাগোড়া হদীস্ নিয়া সে বিষয়ে একেবারে Expert বা ওস্তাদ্ হওয়া চাই- নচেৎ ভুঁই-ফোড়ী বিদ্যা লইয়া যাহারা কল কারখানা করিতে যায় তাহাদের কারখানার দরজার উপর বিধাতা অলক্ষ্যে লিখিয়া দেন Infantile Death; অর্থাৎ ইহাদের শৈশব মৃত্যু অবধারিত।

২। কারখানার পশ্চাতে দিনরাত লাগিয়া থাকা চাই। তনু, ধন, মন সব উহাতে ঢালিয়া দেওয়া চাই, তবেই সাফল্য লাভ হয়।

৩। কারবারে যেরূপ সাধুতা থাকা দরকার তাহা থাকা চাই, নচেৎ কারবার টিকিবে না।

৪। তারপর থাকা চাই বিপুল উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায় এবং বুকভরা আশা। কারবার করিতে গেলে কখনও সাঁতার, কখনও ডুব ত' আছেই—ইংরাজীতে যাহাকে sinking and swimming বলে। নিরাশায় যখন দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন কবির মরণজয়ী গান গাইবার শক্তি থাকা চাই—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে
যদি পণ করে থাকিস্
সে পণ তোর রবেই রবে।"

সুরেন্দ্রমোহন গায়ক কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এই গান মূর্ত্ত হইয়া

উঠিয়াছে এবং তাহার ধ্বনি তাঁহার কারিগর, সঙ্গী এবং সহচরদিগকে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

আজ ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকদিগের নিকট বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এবং বাঙ্গালীর পরিচালিত একটী সফল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়া আমরা আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি। বাঙ্গালী কিছু না, বাঙ্গালী কেবল গোলাম এবং গোলামী করিতেই জানে, তাহাদের মধ্যে কোনও ব্যবসাবুদ্ধি নাই, কোনও সৃজন শক্তি নাই, এই সব দিনরাত শুনিয়া শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল ;— আজ বাংলার বাইরের চ্যাং ব্যাঙ্গেরাও—যাহাদের প্রধান উপজীবিকা এক কাপড়ের কল ছাড়া কেবল বিদেশী জিনিষের দালালী এবং ফড়িয়া-গিরি করা—তাহারাও মুরুব্বীয়ানার সুরে বলিতে সুরু করিয়াছে যে বাঙ্গালী কেবল চাকুরী করিতেই জানে ; ব্যবসা বোঝে না। বাঙ্গলার গড্ডালিকাপ্রবাহী যুবকেরাও এই সব মরণ সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া নিস্তেজ এবং মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

আজ তাহাদের বলি, বাংলা দেশ এবং ভারতবর্ষ হইতে Alfred Huges এবং Jones এর ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারবার উঠাইয়া দিয়াছে এই অধম বাঙ্গালী শিল্পীরা। সেই যে স্বদেশী যুগে আর্য্য ফ্যাক্টরী, বসাক ফ্যাক্টরী, স্বরাজ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি ষ্টীল ট্রাঙ্কের ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইল, তাহাই বিদেশাগত ষ্টীল ট্রাঙ্কের মৃত্যু সূচনা করিয়াছিল ; আজ বিদেশী ষ্টীল ট্রাঙ্ক কোনও দেশী লোক ছোঁয় না এবং পায়ও না। ধোবী সাবান এবং টয়লেট সাবানের গোড়া পত্তন ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই বাংলা দেশের বাঙ্গালীরাই করিয়াছে এবং আজও সমগ্র ভারতের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্য অটুট রাখিয়াছে। কাপড়ের কলের সম্বন্ধেও আজ মোহিনী মিল ভারতের যে কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মিলের সহিত দামে এবং গুণে প্রতিযোগিতা করিতেছে এবং ধীরে ধীরে বঙ্গলক্ষ্মীর পাশে ঢাকেশ্বরী, বঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি অনেক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আজ বিবেকানন্দের মাভৈঃ বাণী স্মরণ করিয়া তাঁহারই অমর ভাষায় বলি—

প্যাট্, তুইও ওদেরি মতন মানুষ! ভয় ভাব্না ঝেড়ে ফেলে ওদের মত মেরুদণ্ডটা খাড়া ক'রে একবার দাঁড়া ত! তোর মধ্যেও যে সেই ব্রহ্মের অসীম শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে!

আজ বাঙ্গলার যুবকদিগকে বলি অর্থাভাবের দোহাই দিও না, জগতে রিক্তহস্তে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার ফাঁদিয়া গিয়াছেন এমন লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টান্ত আছে। সহায়, সম্বল এবং সুপারিশের কথা তুলিও না, সহায়সম্বলহীন একাকী, অসহায় অবস্থায় কারবার পত্তন করিয়া শেষে লক্ষপতি হইয়া গিয়াছেন এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত স্বদেশে বিদেশে, আনাচে কানাচে পড়িয়া আছে। মনের উপর মোহের এবং জড়তার যে কঠিন আবরণ পড়িয়াছে আগে সিংহবিক্রমে তাহা ছেদন কর, তারপর অদম্য আশা, উৎসাহ এবং অধ্যবসায় লইয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়, কূল পাইবেই পাইবে। আর মরণ সঙ্গীত শুনিও না। বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির জয়ধ্বনি কর। কিপলিং এর ভাষা রূপান্তরিত করিয়া বল— who lives in India if Bengal dies.— বাঙ্গালী যদি মরে তবে ভারতে বাঁচিবে কে?

ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে মিঃ এ, সি. সেনের অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

লাইফ ইন্সিওরেন্স এজেন্সী লওয়া না লওয়া ঠিক করিয়া এজেন্টকে বৎসরে একটী উপযুক্ত কোম্পানী বাছিয়া লইতে হইবে।

উত্তম বিশ্বাসযোগ্য ইন্সিওরেন্স পলিসি দিতে পারিলে, লোকে যে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবে তাহা নহে—ইহা দ্বারা কর্ম্মীর ব্যবসায় বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভাল কোম্পানীর মানে এই নয় যে উহাকে পুরাতন কিংবা শ্রেষ্ঠ কোম্পানী হইতেই হইবে; যাহার ভিত্তি সুদৃঢ়, কার্য্যস্রোত সঠিক খাদে প্রবাহিত হয়,—তাহাকেই ভাল কোম্পানী বলা যাইতে পারে। সকল কোম্পানীই একদিন নূতন ছিল; আজ যাহাদের রিসার্ভ ফাণ্ড দেখিয়া বিস্ময় লাগে, তাহারাও একদিন নূতন ছিল, এবং দৃঢ়ভিত্তির উপরই এই বিরাট ইমারৎ গড়িয়া তুলিয়াছে।

ইহার পর লাইফ ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, নিজের এবং অপর কোম্পানীর পলিসির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানিতে হইবে—কেননা, বাজারে এই সমস্ত কোম্পানীর প্রতিনিধির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই চলিতে হইবে। অন্ততঃপক্ষে, এই সম্বন্ধে কার্য্যকরী জ্ঞান (working knowledge) থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যাহাদের জীবন বীমা বিভাগের কূটতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু পড়াশুনা আছে, তাহাদের পক্ষে বীমাকারীদিগকে বুঝানো

যেমন সহজ, পলিসি সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি কথার উত্তর দেওয়াও তেমন চিন্তাকর্ষী হয়। বীমা সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করাই সমীচীন—উহাই ক্রমে অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পরিপক্ক হইয়া উঠিবে। ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা—প্রত্যেক বীমা কর্ম্মীরই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। এইজন্য যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাগজে বীমা বিষয়ে ভাল প্রবন্ধাদি বাহির হয় তাহার দুই একখানার গ্রাহক হওয়া উচিৎ। বছরে এই বাবদ যে সামান্য কয়েকটী টাকা খরচ হয় তাহা দ্বারা কাজ শিক্ষা এবং সংগ্রহের পক্ষে অশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের এজেন্টরা এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট খরচ করে বলিয়া তাহারা অনেক বেশী কাজ সংগ্রহ করিতে পারে। আর আমাদের দেশের লোকেরা এই সকল বিষয়ের জন্য একটী টাকা খরচ করিতেও নারাজ। এইরূপ penny wise and pound foolish পদ্ধতি অবলম্বন করায় তাহাদের আয় আর বাড়ে না এবং আশা ভরসাও ছোট হইয়া যায়।

কর্ম্মপ্রণালী

ক্যান্‌ভাসিংএর প্রথম সোপান হইতেছে,
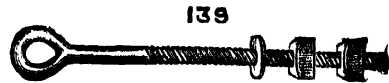
ইন্সিওরকারীর দর্শনলাভ করা এবং কার্য্যকলাপে তাহার কৌতূহল সজাগ করিয়া তোলা। যদি কোনও প্রার্থীর নিকট যাইবার পূর্ব্বে তাহার অবস্থা, অভ্যাস, খেয়াল, বংশের বিবরণ এবং আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে কাজ করাইবার রাস্তা সহজেই ধরা যায়। তাহার প্রয়োজন মিটাইবার উপস্থিত পলিসি যে হঠাৎ খামখেয়ালীভাবে ত্যক্ত হইবে, এমন কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। সকল বীমাকারীর অবস্থা এবং মনেরভাব এক প্রকার নহে, ইন্সিওরেন্সের দিকে অনেকে আবার নেকনজরেও চাহিয়া থাকেন; কাজেই উপযুক্ত সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলে কাজের বোঝা অনেক হাল্কা হইয়া আসে।

সাক্ষাৎ

মোলাকাৎ করিবার সময় মুখভারী করিয়া দেখা করিলে, কাজের বাধা বাড়িয়াই আসিবে—কমিবে না। চেহারা সুশ্রী না হইলে সৌন্দর্য্যের দৈন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে; কেন না, মুখোমুখি কথাবার্ত্তা বলিবার সময় মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চেহারার বিশেষত্ব অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ব্যবসার বাজারে ষ্টাইল, পরিচ্ছন্নতা, হাবভাব প্রভৃতি যে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা ভুক্তভোগীরা একবাক্যে স্বীকার করিবেন বলিয়া ভরসা করি।

কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যান্‌ভাসার কেবল যে তাহার ব্যবসায়-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারই নিজের নখাগ্রে রাখিবেন তাহা নহে; যে-সকল সাধারণ সংবাদাদি মানুষকে আনন্দ দিয়া থাকে—তাহার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয়। বীমাকারীর সঙ্গে একমাত্র ব্যবসা-সংক্রান্ত আলাপই যে হইবে, তাহা কেহ হলফ্ করিয়া বলিতে পারে না; কাজেই এরূপস্থলে বোকা বনিয়া যাওয়া আদৌ শোভন হয় না। ভাল কথা-শিল্পী বীমাকারীকে নিজের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারেন। দেখা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময়, যখন বীমাকারী প্রফুল্লমনে থাকেন এবং কোন কাজের তাগিদে বিশেষ তাড়াতাড়ি করিতেছেন না। যখন এজেণ্ট এবং বীমাকারী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত থাকে না, তখনই বীমার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার প্রকৃষ্ট সময়। অনেক সময়ে প্রথম মোলাকাৎ হইতেই প্রস্তাবের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার আভাষ পাওয়া যায়। কোন কৌতূহলপূর্ণ ব্যাপারে কথাবার্ত্তা চলিলে পর, বীমার কথা উত্থাপন করাই সঙ্গততর; কেন না, তখন ভাবী বীমাকারী সহজেই তাহার কথায় কর্ণপাত করিবেন। একবার বিশ্বাস জন্মিলে পরের সোপানগুলি উত্তীর্ণ করা বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না। যদি বীমাকারী নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু না-হন, তাহা হইলে সব সময়েই কাজের কথা মনে রাখিতে হইবে; কেন না, সময় অতি মূল্যবান। কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়াও মনকে তাহার অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, বীমাকর্ম্মীদের তাহা থাকা উচিত। অতীতের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার আলো দিয়াই ভবিষ্যতের অন্ধকারে পথ চিনিতে হইবে।

বীমাকারী তৈয়ার

নূতন নূতন বীমাকারী পাওয়ার উপরই

ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে। চতুর এবং দক্ষ কর্ম্মী সকল সময়েই তাহার চক্ষু-কর্ণ সতর্ক রাখিবেন। প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা, সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করা প্রভৃতি হইতেই অনেক সময় ভাবী বীমা-কারীর সংবাদ পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট চাকুরে এবং ডাইরেক্টরীর লিষ্ট খুঁজিলেও অনেক সময় ভাল কাজ দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারে পর্য্যবেক্ষণ শক্তির খুব বেশী রকম প্রয়োজনীয়তা আছে—কাজের বেলায় তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। কর্ম্মজগতে এবং ব্যক্তিগত জীবনে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের ছায়া পড়ে, তাহার প্রভাবও সামান্য নহে। জন্ম-মৃত্যু, উন্নতি-অবনতি, উন্নততর আবাসে স্থানান্তরিত হওয়া প্রভৃতি হইতেও অনেক সময়ে কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও যতই বাড়িতে থাকে ততই বীমাকারীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ছোট সহরে কিংবা পাড়াগাঁয়ে সোজাসুজি বীমাকারী খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে অনুভূত না হইলেও, বড় বড় সহরে উহার যথেষ্ট দরকার হয়। ব্যক্তিগত আলাপ যেখানে সর্ত্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বেশী না-থাকিলে কার্য্যে দেরী হইবার সম্ভাবনাই ষোল আনা। কোন স্থলে যদি একজন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি বিধবা এবং

শিশুদের জন্ম কোন প্রকার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে না পারিয়া থাকেন তবে সেখানে পুরাদমে ক্যানভাসিং চালাইবার সুযোগ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। পলিসির টাকা তাড়াতাড়ি মিটাইয়া দিলেও কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, প্রথম বীমাকর্ম্মী যেখানে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না, সেখানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই কাজ আদায় করিতে পারেন।

বীমাকারীর তালিকা

প্রত্যেক এজেণ্ট ভাবী বীমাকারীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। তাহাদের কোন পরিচিত ব্যক্তির জীবনবীমা করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহাও তাহাদের কাছ হইতে জানিয়া লওয়া যাইতে পারে। বন্ধুর রিপোর্ট লিখিবার সময় কোম্পানীর নাম আগেই বীমাকারীর বন্ধুদের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিবে, বিশ্বাসও জন্মিতে থাকিবে। তখন সুযোগ বুঝিয়া, এজেণ্ট তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কাজের গোড়া পত্তন করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা করা যায়। একটী জীবন বীমা সম্পর্কিত লোকদের কাছ হইতে তাহাদের অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সংবাদও পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রণালীতে কাজ করিলে, ভাবী বীমাকারীর সংখ্যা অন্ততঃপক্ষে পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা—অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। নিজের ডায়েরীর তালিকায় ভাবী বীমাকারীর সংখ্যা এইরূপে রোজই বাড়ানো চলিতে পারিবে। সুদক্ষ ক্যান্‌ভাসাররা সকলের সঙ্গে এমনভাবে কথা-বার্ত্তা চালাইতে থাকেন যে, তাহারা অনেক সময়ে ইহা হইতেই নিজেদের কর্ম্মের সন্ধান খুঁজিয়া পান। সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়, উহা আপনা হইতেই সব সময়ে আসিয়া হাজির হয় না। অনেক পরিবারের বাৎসরিক আয় ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে; যদি তাহারা জীবন বীমার কর্ম্মধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিতে হইবে।

পুরাতন পলিসি হোল্‌ডার

অনেক সময়ে পুরাতন বীমাকারীদিগের নিকট হইতে ভবিষ্যতে আরো কাজ পাওয়া যায়। ঠিক সময়ে তাহাদের কাছে হাজির হওয়াই উচিৎ। এজেণ্ট এবং কোম্পানীকে তাহারা ভাল করিয়াই চেনেন, কাজেই তাহাদের কাছে পুরাতন কথার জাবর কাটিবার আর দরকার হয় না।

বাহির হইতে অনেক লোককে কাঠ-খোট্টা গম্ভীর বেরসিক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহাদিগকে ঠিকমত বাগাইয়া লইতে পারিলে সকলের চেয়ে ভাল কাজ আদায় হইতে পারে। মানুষের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে; কাজেই বাহির দেখিয়া ভয় পাইবার কোনই কারণ নাই। অনেক সময়ে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, সুদক্ষ এজেণ্টের মধ্যে অনেকেই এইরূপ লোককে ঘাঁটাইয়া বিশেষ আমোদ উপলব্ধি করেন—ইহাই হয় তো তাহাদের কাছে প্রকৃত জয়ের আনন্দ পরিবেশন করিয়া থাকে। তার্কিক বীমাকারীকে লইয়া একটু বিপদে পড়িতে হয় বটে, কিন্তু এজেণ্ট সেজন্য অস্বস্তি বোধ করিলে ভুল করিবেন—কথায় বার্ত্তায় হাবভাবে উষ্মাপ্রকাশ করাও উচিৎ হইবে না।

অনেক সময় দেখা যায়, যে ভাবী বীমাকারীর লাইফ্ ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। এইরূপ স্থলে এজেন্ট তাহার চিন্তা প্রণালীকে নিজের খাদে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিবেন। বীমাকর্ম্মীর কথায় তাহার মনে কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে কিনা কিংবা তাহার মনে কিসের আন্দোলন চলিতেছে—তাহা আন্দাজ করিয়া এজেন্ট উপযুক্ত কথা বলিবেন, কিংবা চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিবেন। কথাবার্ত্তায় দখল না থাকিলে কখনও সত্যিকার বীমাকর্ম্মী হওয়া যায় না।

জোর করিয়া কিংবা অন্যায় রকমে কাহারো ঘাড়ে পলিসি চাপাইয়া দিলে অনেক সময়েই দেখা যায় যে পলিসি নষ্ট (lapse) হইয়া আসিতেছে। উহাতে এজেন্টেরও আয় নাই, কোম্পানীরও কোন সুনাম নাই। প্রিমিয়াম যাহাতে ঠিকমত সময়ে দেওয়া হয়, তাহার দিকে যেমন এজেন্টের দৃষ্টি থাকিবে, তেমনি পলিসি যাহাতে স্থগিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন এজেন্টই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না কিংবা বাড়াইয়া কিছু বলিবেন না; নতুবা বীমাকারী মনে করিতে পারেন যে তাহাকে অন্যায় রকমে প্রলোভিত করা হইয়াছে। ইহা এজেন্ট কিংবা কোম্পানী—কাহারো স্বার্থের অনুকূল নহে। বীমার সমস্ত ব্যাপার যাহাতে আরশীর মত স্বচ্ছ হইয়া বীমাকারীর চোখের উপর ভাসিয়া উঠে, তাহার জন্য যত্ন লওয়া উচিৎ। (ক্রমশঃ)

পোষ্টাল ইন্‌সিওরেন্স সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট স্যার নীলরতন সরকার ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে ১৯৩২ সনের ২২শে জুন তারিখে যে চিঠি দিয়াছেন, নীচে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল :—

"ভারত গভর্ণমেণ্ট যে পোষ্টাল ইন্‌সিওরেন্সে প্রত্যেক পলিসির বাবদ বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমা গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, আমি ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউন্সিল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া উগার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। কা ন্সিলের সিদ্ধান্ত এই যে,এরূপ করিলে গভর্ণমেণ্ট এবং বাহিরের কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হইবে এবং উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য হয়তো পাব্লিক রেভেনিয়ুর উপর হস্তক্ষেপ করিবেন, বাহিরের কোম্পানীগুলিও ব্যয় বাহুল্য ক রিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে স্বদেশী কোম্পানীগুলির অত্যন্ত ক্ষতি হইবে বলিয়াই আমি কাউন্সিলের নির্দ্দেশানুসারে গভর্ণমেণ্টকে এই পথ হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

গ্রেট বৃটেনেও গভর্ণমেণ্ট এই পন্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কোন অজানা কারণে ইহা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। জাপানে পোষ্টাল ইন্‌সিওরেন্স আছে বটে, কিন্তু উহা কেবলমাত্র ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌সিওরেন্স ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। বাহিরের কোম্পানীগুলিই সাধারণ বীমার কাজ সুন্দররূপে চালাইতেছে।

কাউন্সিল অবগত আছেন যে কোন কোন দেশে, যেমন অষ্ট্রেলিয়াতে, গভর্ণমেণ্ট বাহিরের কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সেখানে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মক্ষেত্র জীবনবীমা বিভাগে আদৌ নহে ; কাজেই যেখানে বাহিরের কোম্পানীগুলিই ভালরূপে কাজ চালাইতেছে, সেখানে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারতবর্ষে গ্রেট বৃটেনের মত ন্যাশনাল হেল্‌থ্‌ ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতি করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে ; কাউন্সিল গভর্ণমেণ্টকে সেই দিকে কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। জীবনবীমার কাজ বাহিরের কোম্পানীগুলিই ভালরূপে করিতে পারিবে।

এই সব কারণের জন্যই ইহা আশা করা অন্যায় নহে যে, গভর্ণমেণ্ট পোষ্টাল ইনসিওরেন্স সম্বন্ধে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে আর কাজ করিবেন না।

সার নীলরতনের এই প্রতিবাদ অত্যন্ত সমীচীন ও সময়োচিত হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন বিভাগেই জনসাধারণের সহিত গভর্ণমেণ্টে প্রতিযোগিতা করা কিম্বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে উপস্থি হওয়া উচিত নহে। তাহাতে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা

টিকিতে পারে না। অথচ এই সকল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের যাহাতে অনিষ্ট বা ক্ষতি হয় এরূপ কোনও কাজ করার গভর্ণমেণ্টের কোনও ন্যায়-সঙ্গত কারণ নাই। কোনও নূতন লাভজনক ব্যবসায়ে যখন লোকে টাকা ফেলিতে ইতস্তত: করে তখন সেই ব্যবসায়ের প্রতি লোককে আকৃষ্ট করার জন্য অনেক সময় গভর্ণমেণ্ট নিজেই সেই সকল ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়া জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। তারপর যখন লোকে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করিতে থাকে তখন গভর্ণমেণ্ট হাত গুটাইয়া লন এবং অপর কোনও ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করার কথা ভাবিতে থাকেন। এই সকল ব্যাপারের মূলে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে এই যে, যে সকল ব্যবসার

নূতন এবং অপরীক্ষিত বলিয়া লোকে সহজে তাহাতে টাকা খাটাইতে চাহে না গভর্ণমেণ্ট হাতে কলমে সেই সকল ব্যবসা চালাইয়া লোকের ভয় ভাঙ্গাইয়া দেন এবং ধনীদিগকে সেই সব ব্যবসায় প্রতি আকৃষ্ট করেন।

বর্ত্তমান কালে ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে এই যুক্তি খাটে না। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশী কোম্পানী বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা চালাইতেছেন এবং বছর বছর অনেক নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট যদি ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বীমা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন তবে লোকে গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া প্রাইভেট্ পার্টির আপিশে কেন আর বীমা করিতে আসিবে।

এমনিই ত' পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেণ্টের কেহই প্রাইভেট বীমা কোম্পানীতে বীমা করে না; সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও প্রায় সকলেই পোষ্ট্যাল ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করে; তাহার উপর যদি জনসাধারণের মধ্যেও গভর্ণমেণ্ট বীমার চেষ্টায় ঘুরিতে থাকেন তবে অনেক প্রাইভেট কোম্পানীর পক্ষে কাজ পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

প্রাইভেট কোম্পানীর সহিত গভর্ণমেণ্টের টক্কর দিতে যাবার প্রধান আপত্তি এই যে, গভর্ণমেণ্টের methods বা কার্য্যপদ্ধতি wasteful methods বা অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্যতায় পূর্ণ। গভর্ণমেণ্ট যেখানে দুই টাকা খরচ করেন প্রাইভেট পার্টি সেখানে দুই টাকা খরচ করিয়া তাহাপেক্ষা অনেক ভাল ফল আদায় করে। আর গভর্ণমেণ্ট এই যে টাকা খরচ করেন, তাহা অনেক সময় হয়ত public revenue বা সরকারী রাজস্ব ভাঙ্গিয়া খরচ করেন। এইরূপে সরকারী রাজস্ব ভাঙ্গিয়া দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী গুলির ক্ষতি করায় তাঁহাদের ন্যায়ত ধর্ম্মতঃ কোনও অধিকার নাই কিংবা কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টার ফলে প্রাইভেট কোম্পানী সমূহের যদি আয় কমিয়া যায় তবে তাহার ফলে আয়কর ষ্টাম্প এবং অন্যান্য indirect taxation বাবদ ইহাদের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়া যাইতেছিল সে আয়ও গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট কমিয়া যাইবে যাহার তুলনায় পোষ্ট্যাল ইন্সিওরেন্সের আয় নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে।

আমরা সময় থাকিতে দেশের সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে গভর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং গভর্ণমেণ্টকে এই ব্যবস্থার পরিণাম ফল সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

—

ভারতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানী-গুলির কাজের পরিমাণ

সমস্ত দেশব্যাপী আর্থিক দুরবস্থা সত্ত্বেও ভারতীয় ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি প্রভূত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্নোক্ত কোম্পানীগুলি যত কার্য্য গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাহার আধুনিকতম একটী বিবরণ নীচে সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। গত বৎসরের তুলনায় এবারকার কার্য্যের পরিমাণ মোটের উপর সন্তোষজনক।

কোম্পানীর নাম	বৎসরের শেষ তারিখ	ব্যবসার পরিমাণ টাকা	কোম্পানীর নাম	বৎসরের শেষ তারিখ	ব্যবসার পরিমাণ টাকা
ওরিয়েণ্টাল	৩১-১২-৩১	৫,৩৪,৬০,৯৫৪	ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৩১,৫৩,২৫০
হিন্দুস্থান কো-			জে'নথ	৩১-১২-৩১	২১,৫০,০০০
অপারেটিভ	৫০-৪ ৩২	১,৪১,৩৯,২৫০	ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	৩১-১২-৩১	১৮,৫৬,০০১
ন্যাশনাল	৩১-১২-৩১	১,৩২,৩০,৭২৫	গ্রেট ইণ্ডিয়া	৩১ ১২-৩১	১৭,১৮,২৫৫
এম্পায়ার	২৯-২-৩২	১,০৫,২৭,০৭১	জুপিটার জেনারেল	৩০ ৬-৩১	১৫,০৭,৫০০
নিউ ইণ্ডিয়া	৩১-৩-৩২	৮৮,৩৭,২৫০	ইউনিক্	৩১-৫-৩১	১৪,০৬,০০০
ভারত	৩১-১২-৩১	৭৯,২৮,৫৪৭	কমন ওয়েলথ	৩০-৪-৩২	১০,৫৪,০০০
লক্ষ্মী	৩০-৪-৩২	৭০ ৮১,৭৫০	পিপ্ল্স	৩১-১২-৩১	৯,২০,১১৪
বম্বে মিউচুয়াল	৩১-১২-৩১	৬৮,৫৭,০০০	ট্রপিক্যাল	৩১-১২-৩১	৯,০৩,০০০
বম্বে লাইফ্	৩১-১২-৩১	৫৮,৬৬,৩০০	কলিকাতা	৩১-১২-৩১	৭,২৯,৮৫০
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড			ইণ্ডিয়ান গ্লোব	৩১-১২-৩১	৭,১৩,০০০
প্রুডেন্সিয়াল	৩১-১২-৩১	৫০,৪০,৬৬৬	ভেনাস্	৩১-৩-৩২	৬,৭৯,৩২৫
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৪৬,২৫,৭৫০	হিন্দু মিউচুয়াল	৩১-১২-৩১	৫,০৫,০০০
এসিয়ান	৩১-.২-৩১	৪০,১৭,০০০	ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৪,৪৫,৫০০
মেট্রোপলিটান	৩১-১২-৩১	৩৯,৮৪,৭৭৫	সাউথ ইণ্ডিয়ান		
জেনারেল এসিওরেন্স	৩১-১২-৩১	৩১,৬৬,৫০০	জেনারেল	৩১-১২-৩১	৪,১৯,৫০০

সূচীপত্র

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩৮ { ৫ম সংখ্যা

বাংলা ও উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় সরকারী তদন্তের রিপোর্ট

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অধ্যায়

স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা

বিক্রয় করিবার দামের উপর চালানী (Transport) খরচের প্রভাব--ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টের ৪৯ পৃষ্ঠার হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও লবণ তৈয়ারীর ex-works খরচ মোটামুটি প্রতি টনে ৮৲ টাকা অর্থাৎ ১০০ মণে ২৯।৴০ করিয়া পড়ে এবং ex-ship খরচ বাবদ প্রতি টনে ১৮৲ অর্থাৎ ১০০ মণে ৬৬৲ এবং 'এফ, ও, আর'এ (রেলওয়ে চার্জ্জ ফ্রি) প্রতি টনে ২৩-৯-১ পাই অর্থাৎ ৮৫০ টাকা করিয়া প্রতি ১০০ মণে পড়ে। তথাপি ভাড়া, আনা-নেওয়া ও গুদামজাত করার জন্য কিছু টাকা বেশী ধরিয়া রাখা আবশ্যক। লবণ তৈয়ারীতে যতটা না হউক, আনা-নেওয়া প্রভৃতি কার্য্য বিক্রয়-দামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, বাংলা এবং উড়িষ্যা তীরের লবণ তৈয়ারী করা পশ্চিম ভারতের কেন্দ্রগুলির চেয়ে বেশী ব্যয়সাধ্য হইবে, তথাপি বাজার নিকটে থাকার জন্য সমুদ্র-পথে আগত লবণের সঙ্গে ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা অন্যায় নহে।

বার্তায়াতের সুবিধা কম

পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, যদিও বাজার কাছেই অবস্থিত বটে, কিন্তু সেখানে মাল পৌঁছানোর সুবিধা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ইহা ঠিক যে, ফ্যাক্টরীগুলি সমুদ্রের ধারেই রাখিতে হইবে; কিন্তু সেই জায়গা হইতে রেল লাইন ১০ হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত থাকিবে এবং এতখানি রাস্তা গরুর গাড়ী কিংবা নৌকা দিয়াই অতিক্রম করিতে হইবে, 'শাস্ত্র পন্থা বিস্তৃতে'। সুন্দরবন অঞ্চল বাদ দিয়া যদি দেশের তীরভাগের অন্য কোথাও লবণের ঘাঁটি বসাইতে হয়, তাহা হইলে উহা কাঁথির বেশী উত্তরে ঠেলিয়া নেওয়া আদৌ সমীচীন হইবে না। কেননা, যতই উত্তরে যাওয়া যাইবে ততই জলে লবণের শক্তির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। তীর হইতে কাঁথির রেল-লাইন ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। গরুর গাড়ীতে জিনিষ পাঠাইতে হইলে প্রতিমণ লবণে প্রত্যেক মাইলে ২ পাই করিয়া আনুমানিক ব্যয় হইবে; কাজেই অনেক দূরে এইরূপে লবণ চালান দেওয়ার কল্পনা করা হাস্যকর। কিন্তু উড়িষ্যা-সৈকত ঘেঁসিয়া কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে (তীর হইতে ১—১০ মাইলের মধ্যেই) তাহাতে রেলের চেয়ে অনেক সুবিধায় লবণ চালান দেওয়া যাইতে পারে। কাঁথির কাছাকাছি যে-সমস্ত লবণের আড্ডা গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা প্রথমে ছোট ছোট দেশী নৌকায় (যাহা অন্ততঃ পক্ষে ৫০ মণ ভার সহিতে পারে) করিয়া লবণ এই খালে পাঠাইবে; সেখানে ৩০০।৪০০ মণের পাল্লা লইতে পারে—এমন নৌকায় পূর্ব্বোক্ত মালসমূহ বোঝাই করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠানো যাইতে পারে। বালেশ্বর এবং কটক জেলার সীমান্তে ফ্যাক্টরী থাকিলে, উহার দূরত্ব সহজেই কমাইয়া কয়েক শত গজের মধ্যে আনা যায়।

দেশী নৌকা এবং ষ্টীমারে চালান দেওয়ার খরচ

লবণ তৈয়ারীর জন্য যে-কোন পন্থাই অবলম্বন করা যাউক না কেন, উহার ব্যবসায়ে দেশী নৌকাগুলির সাহায্য না লইলেই চলিবে না। আমি সেইজন্য ইহার আনুমানিক ব্যয়ের একটা হিসাব বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি। লোকের একটা ধারণা আছে যে, যেহেতু দেশী নৌকার খরচ কম, মজুরের পারিশ্রমিকও বেশী নহে এবং দেখিতেও খুব সুশ্রী নয়—কাজেই উহা ব্যবহার করা অর্থের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক হইবারই কথা। কিন্তু আমার হিসাবানুসারে উহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। বিভিন্ন সূত্রে আমি যে-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা পরিশিষ্টের ৫ম এবং ৬ষ্ঠ নম্বরে দেখা যাইতে পারে। নীচে বুঝিবার সুবিধার জন্য একটা অঙ্কের তালিকা দেওয়া হইল :—

	প্রতি মাইলে মণপ্রতি ভাড়া—পাই হিসাবে
১। বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর প্রদত্ত হিসাব	০·১০
২। ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীস,বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাব (খুব সুবিধা অবস্থায়)	০·১৫
৩। ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীস,বেঙ্গল কর্ত্তৃক প্রদত্ত হিসাব (অসুবিধাজনক অবস্থায়)	০·৩৩
৪। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কর্ত্তৃক প্রদত্ত চাউল চালানী দেওয়ার হিসাব	০·৬

প্রতি ম ইলে মণপ্রতি
ভাড়া—পাই হিসাবে

৫। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড ফর রিভার্স – লবণের কোটেশন ০.৪

৬। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন এণ্ড রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড ফর রিভার্স – কয়লার কোটেশন ০.২৭

শেষোক্ত অঙ্কগুলি ব্যতীত অপর কোটেশন-সমূহ, ৩০০।৪০০ মণবাহী দেশী নৌকার চালানী-খরচের প্রতি প্রযোজ্য। নিম্নের তালিকা হইতে ৫০ হইতে ১০০ মণবাহী দেশী নৌকার চালানী খরচের পরিমাণ আন্দাজ করা যাইবে।

১। ডাইরেক্টার অফ ইণ্ডাষ্ট্রীস,বেঙ্গল কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব ০.৯

২। ১৯১৮-১৯ সালের কাঁথির লবণ প্রস্তুতকারীদের চুক্তির হিসাব অনুসারে ০.৮

৩। পুনর্ভাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের চুক্তিতে চিল্কা হ্রদের চলিত রেট ০.৩৪

৪। একবারের চালানী-চুক্তির চলিত রেট (চিল্কা হ্রদে) .৬৮

৫। কটকের সল্ট এণ্ড একসাইজ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রদত্ত হিসাবানুসারে ০.৮৭

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপরোক্ত অঙ্কসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তফাৎ খুব বেশী রহিয়া গিয়াছে; দৈনিক মাইলে তাই গড়পড়তার হিসাব করা একটা সমস্যার ব্যাপার বটে। মনে রাখিতে হইবে, দেশী নৌকায় মাল পত্রাদি স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে জলবায়ু স্রোত, সময়ানুসারে নৌকা ভাড়ার হ্রাসবৃদ্ধি এবং উহা কতদিন নিয়োজিত করিয়া রাখা যাইতে পারিবে, প্রভৃতি সর্ব্বদাই হিসাবে আনিতে হইবে। একমাত্র সঠিক ভাড়ার তালিকা দিয়াছেন 'ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন এণ্ড রেলওয়ে কোং। লবণ এবং কয়লা চালানীতে যথাক্রমে ০.৪ এবং ০.২৭ পাই করিয়া তাঁহারা কোটেশন দিলেও, স্মরণ রাখিতে হইবে উহা বড় বড় ষ্টীমারের পক্ষেই প্রযোজ্য।

দেশী নৌকায় চালান দেওয়ার খরচ

হিসাবের তারতম্যের জন্য একটা সঠিক অঙ্ক দেওয়া সম্ভবপর না হইলেও, নৌকার মাল্লা-মাঝিদিগকে ক্রমাগত কাজে বহাল রাখিবার সম্ভাবনা দেখাইলে চালানী খরচ কিছু কমিতে পারে। আমি মনে করি যে তবুও বড় নৌকায় মাল স্থানান্তরিত করিতে গেলে প্রতি মণে মাইল হিসাবে ০.৩৫ পাই'য়ের কম পড়িবে না; ছোট নৌকার মাঝি-মাল্লারা ০.৬ পাই সম্ভবতঃ হাঁকিয়া বসিয়া থাকিবে।

রেল এবং সমুদ্রপথের চালানীর তুলনা

সাধারণতঃ লোকের ধারণা আছে যে, লবণ স্থানান্তরিত করিবার ব্যয় নৌকার চেয়ে রেলে বেশী এবং রেলে প্রতি মাইলে মণ প্রতি ০.৩৮ পাই হইতে ০.১ পাই করিয়া পড়ে। এডেন হইতে ষ্টীমার বোঝাই করিয়া মাল আনিতে গেলে গড়ে ০.০১৬ পাই করিয়াও পড়ে না। কাজেই বাংলার নিকটত্ব যে প্রকৃত কার্য্যারম্ভের সময় বিশেষ কোন সুবিধা দিবে, তাহা মনে হয় না। একখানি বড় দেশী নৌকায় লবণ লইতে এক মাইলে যাহা ব্যয় হইবে কিংবা ছোট নৌকায় অর্দ্ধ মাইলে যাহা চার্জ্জ করিবে এডেন হইতে আগত যে-কোন নৌকা তাহা আরো বিশ মাইল বেশীদূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে।

চালানী দিবার খরচ পরীক্ষার আবশ্যকতা

আমার অঙ্কগুলি পরীক্ষিত নহে, সুতরাং সঠিক না হওয়াও বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। ইহার হিসাব যেমন কমান যাইতে পারে তেমনি আবার অঙ্কের বৃদ্ধি হওয়াও সম্ভব। কাজেই যাহারা এই ব্যবসায়ে হাত দিবেন তাহারা প্রথমেই লবণ স্থানান্তরিত করিবার হিসাব নিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইবেন। কেন না, উহার উপরই প্রতিযোগিতার দাম অনেকাংশে নির্ভর করে।

অগভীর জলপথের অসুবিধা

যদিও সৈকত-ভুমি ভেদ করিয়া অনেক নদ-নদী দিকে দিকে বহিয়া গিয়াছে, তবুও তাহাদের অধিকাংশই এত অগভীর যে বৎসরের কয়েক মাস মাত্র উহা দিয়া ছোট নৌকা চলাচল করিতে পারে। উপরোক্ত অঙ্কগুলি হইতে দেখা গিয়াছে যে, ছোট নৌকা দিয়া কাজ চালানো কিরূপ ব্যয়-সাধ্য। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যার স্থানে স্থানে সৈকত হইতে কিছু দূরেই বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া রাখা হয় - বড় বড় নৌকা ভাসাইবার জন্য। এই জন্য প্রায়ই সমুদ্র হইতে বাঁধ ঠেলিয়া নৌকা চালান সম্ভবপর হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। নানা-দিক হইতেই অনেক বাধা বিপত্তি রহিয়া গিয়াছে; কাজেই নূতন ব্যবসায়ীকে লবণ তৈয়ারীর কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে বিশেষভাবে উপরোক্ত কথাগুলি প্রণিধান করিয়া কাজে হাত দিতে অনুরোধ করি।

চতুর্থ অধ্যায়

ভ্যাকুয়াম্ ইভাপোরেশন কল দিয়া লবণ তৈয়ার করা চলিতে পারে কি না তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সোজা কথায়, এইরূপে লবণ প্রস্তুত করিতে গেলে লোণা জল ভ্যাকুয়াম' এর (বাতাস শূন্য) নীচে রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে হইবে; কিন্তু এইরূপে যে সামান্য ছোট ছোট লবণের দানা প্রস্তুত হইবে তাহাকে কলিকাতার বাজারের জন্য আর গুড়া করিতে কিংবা মিলে ফেলিতে হইবে না।

বেশী লবণযুক্ত জল সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা

এই প্রকার যন্ত্রে কাজ চালাইতে হইলে সব সময়েই বেশী লোণা জলের দরকার পড়িবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যে সমস্ত বিবরণ দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে, যে খুব সুবিধাজনক অবস্থায়ও পূর্ব্বোত্তর তীরে বছরের মধ্যে চারি মাসের বেশী ঘন লোণা জল মিলিবার ভরসা নাই। এই চারি মাসের মধ্যেও আবার ঝড়বাদলের দৌরাত্ম্যে কাজের অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, কাজেই লোণা জল ধরিয়া রাখিবার জন্য সুচারুরূপে বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাধারণ লবণাক্ত জল হইতে এই উপায়ে (ভ্যাকুয়াম্ উপায়ে) লবণ প্রস্তুত করার সম্ভাবনা আদৌ নাই; কেননা বাজারে আমদানী অন্যান্য লবণের সঙ্গে টক্কর দিয়া ইহা দাঁড়াইতে মোটেই সমর্থ হইবে না। জ্বালানী কয়লা কিংবা কাষ্ঠের দাম লবণের দামের উপর উঠিয়া না গেলেও সমান সমান হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ শক্তির লোণা জল বছরের মধ্যে কয়েক মাস মাত্র এই স্থানসমূহে পাওয়া যাইবে।

পর্য্যবেক্ষণ

উপরোক্ত কল চালাইতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নিপুণ লোকের প্রয়োজন

অত্যাবশ্যক। কেবল যে উচ্চতর পরিদর্শক মণ্ডলীকেই (সুপিরিয়র সুপারভাইসিং ষ্টাফ) উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে তাহা নহে, যিনি সমস্ত কল-কারখানার দায়িত্ব লইবেন তাঁহাকেও সিফ্ট্ সমূহের পুরাপুরি জ্ঞান লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; মাহিয়ানাও বেশী দিতে হইবে। বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারিমাসের বেশী কাজ চলিবে না, কাজেই বাকী আট মাসের জন্য সমস্ত কর্মচারীকে বসাইয়া রাখিতে কিংবা কাজের যোগান দিতে কম বেগ পাইতে হইবে না। সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে- যদি এইরূপে লবণ তৈয়ার করাই সাব্যস্ত হয়—অন্ততঃপক্ষে প্রথম দুই বৎসরের জন্য ইউরোপ কিংবা আমেরিকা হইতে সুদক্ষ কর্মচারী আমদানী করিতে হইবে; এবং চারিমাসের জন্য তাহাদিগকে অনেক উচ্চহারে বেতন দিতে হইবে।

মোদ্দা খরচ, ডিপ্রিসিয়েসান্ এবং ইন্টারেষ্ট

এইরূপ ধরণের যন্ত্রপাতির দাম আমি এখনো জানিতে পারি নাই; তবে অনুমান হয় যে উহা দেড়লক্ষ টাকার কাছাকাছি যাইয়া দাঁড়াইবে। কলিকাতার কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডব্লিউ জে, অ্যালকক্ সাহেব ট্যারিফ্ বোর্ডের (রিপোর্ট অফ ইণ্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ড অন সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী—লিখিত প্রমাণাবলী, পৃঃ ৩:৬) কাছে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ ফ্যাক্টরী খাড়া করিতে মোটামুটি ২২লক্ষ টাকা লাগিবে; এবং তাহা দৈনিক ১০০ টন লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। কাজ চালানো গোছের খুব ছোট যন্ত্র লইলেও যে, আটলক্ষ টাকার বেশী কম লাগিবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে বড় যন্ত্রপাতির চল্তি খরচা ছোট প্ল্যাণ্টের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম হইবে! চারি মাসের ডিপ্রিসিয়েসনের জন্য দশ পার্সেণ্ট ধরিয়া রাখিতে হইবে; বাকী আট মাস জলীয় আব্হাওয়ার দেশে পড়িয়া থাকার জন্যও কিছু ডিপ্রিসিয়েসন হইবে। কাজেই সমস্ত বৎসরের ডিপ্রিসিয়েসন বা খারাপ হওয়ার খরচা চারি মাসের লবণ তৈয়ারী ব্যয়ের উপর ধরিতে হইবে! উপরোক্ত মন্তব্যগুলি সুদ চার্জ্জ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বটে।

(ক্রমশঃ)

টোম্যাটো

[শ্রীসুরথ কুমার সরকার]
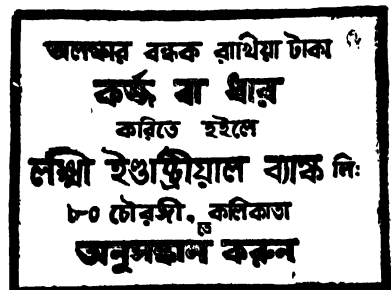
বর্ত্তমান ভিটামিন-বায়ুগ্রস্ত সম্প্রদায়ের কল্যাণে টোম্যাটো একটী বাজার চল্‌তি ফসল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। টোম্যাটোতে ভিটামিনের আধিক্য সম্বন্ধে সভ্যজগৎ যতদিন অজ্ঞ ছিলেন ততদিন অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে ইহার আদর ছিল—কেবল সুখাদ্য চাটনীরূপে; তাই ব্যবসায়ীর নিকট ইহার বিশেষ মূল্য ছিল না। কিন্তু যেদিন রাসায়নিকগণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্র হইল যে কাঁচা বা অর্দ্ধপক্ক টোম্যাটোতে মানুষের জীবনীশক্তির অনেকখানি বর্ত্তমান আছে, সেই দিন হইতে বাজারে ইহার চাহিদা প্রায় আলু পটোলের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

টোম্যাটোর আবাদ অতি সহজে সকল প্রকার মাটিতে ও সকল দেশেই করা যাইতে পারে। তবে সামান্য বালুমিশ্রিত এঁটেল মাটিতে ইহার আবাদ সর্ব্বোত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয়।

যাঁহারা ব্যবসায় হিসাবে টোম্যাটোর আবাদ করিতে চাহেন তাঁহারা নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দিষ্ট জমির পাইট করিতে চেষ্টা করিবেন। অন্যথায় তাঁহাদের আশানুরূপ লাভ না'ও হইতে পারে।

মাঘ বা ফাল্গুন মাসে নির্দ্দিষ্ট জমিখানি ভাল করিয়া চষিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে চৈত্র মাসের শেষে ঐ জমিতে বিঘা প্রতি ৪ গাড়ি হিসাবে পঁচা গোময় ছড়াইয়া তাহার উপরে প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করিয়া মোট তিন বার চাষ দিতে হইবে। শেষবার চাষ দেওয়ার পরে দুই একবার মই টানিয়া জমিখানি সমান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। আষাঢ় মাসের প্রথমে ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি উপড়াইয়া ফেলিয়া জমিতে বাই লাঙ্গলে খুব পাতলাভাবে একটী চাষ দিয়া রাখিলে বর্ষার জলের অধিকাংশ জমিতেই বসিয়া যাইবে। টোম্যাটোর আবাদে ক্ষেত্রে ছড়ান সারের সামান্য মাত্র উগ্রতা থাকিলেও ফসলের ক্ষতি হয়, আবার জমিতে সার না দিলেও ফসল ভাল হয় না। এই জন্যই জমিতে সার দেওয়ার পরে প্রদত্ত সারের তীব্রতা বৃষ্টির জল বসাইয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বেশী জোরের মাটি হইলে অধিকাংশ ফল ফাটিয়া ও পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বীজতলা ফেলিয়া

অথবা বীজ অল্প হইলে গামলা বা কাঠের বাক্সে করিয়া টোম্যাটোর চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। টোম্যাটোর বীজতলায় মাটি ঈষৎ বালুকাময় হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ইহার খোসা অত্যন্ত পাতলা। এই জন্য কড়া মাটিতে বীজ বপন করিলে সমস্ত বীজ পচিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। বালুকা-মিশ্রিত মাটিতে যতই জল দেওয়া যাউক, মাটির উপরিভাগে অধিকক্ষণ জল দাঁড়ায় না, সমস্ত জল অতি অল্পকাল মধ্যেই মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। উপরের মাটি সরস থাকিলেও স্যাঁৎসেঁতে হয় না। কিন্তু এঁটেল মাটিতে জল সিঞ্চন করিলে উহা শুষ্ক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে বলিয়া মাটি কাদা হইয়া উঠে এবং শুকাইবার কালে উহার মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া যায় ও একেবারে নীরস হইয়া পড়ে। আবার, কেবল বালি মাটির বীজ তলায় জল সিঞ্চন করিলেও উহাতে মাটি ভিজা থাকে না, অথবা থাকিলেও তাহা রৌদ্রের উত্তাপে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়। ফলে বীজগুলি হয় পচিয়া নষ্ট হয়, না হয় তো জলে ভিজিয়া তৎপরেই একেবারে শুষ্ক হওয়ার ফলে উহার উৎপাদিকাশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

৪ ভরি টোম্যাটোর বীজের বীজতলা প্রস্তুত করিতে হইলে উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন তিন হাত চওড়া ও ৮ হাত দীর্ঘ একখণ্ড জমি নির্ব্বাচন করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। তৎপরে নির্দ্দিষ্ট স্থানটুকু ৩।৪ বার কোপাইয়া সমস্ত মাটি ধূলার ন্যায় গুঁড়া করিতে হইবে। ঘাসের মূল, কাঁকর, সুড়কী, পাথর প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া হস্তদ্বারা জমির মধ্যস্থল হইতে চতুঃপার্শ্বে ক্রমশঃ ঢালু করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে জমির চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত চওড়া ও সাত অঙ্গুলী গভীর করিয়া একটী নর্দ্দামা কাটিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এই নর্দ্দামা দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবার পথ থাকিলে বীজতলায় আর জল দাঁড়াইবার আশঙ্কা থাকে না।

বীজতলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলে দুইদিন অপেক্ষা করিয়া বীজ বপন করা উচিত। কারণ যে কোনও ক্ষেত্র বীজতলা প্রস্তুত হইলেই দলে দলে পিপীলিকা আসিয়া তাহার সর্ব্বত্র আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, আহার্য্য না পাইলে দুইএকদিনের মধ্যেই ইহারা ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবামাত্র বীজ বপন করিলে ইহারা সেই বীজগুলি খাইয়া শেষ না করিয়া ক্ষেত্র ত্যাগ করে না। বিশেষতঃ টোম্যাটো, লঙ্কা, বেগুণ, কপি, চীনাবাদাম প্রভৃতির বীজ ইহাদের প্রিয় খাদ্য। সুতরাং দুই তিন দিন অপেক্ষা না করিয়া জমি প্রস্তুত হইবামাত্রই তাহাতে বীজ বপন করিলে তাহা হইতে চারার আশা করা একেবারেই বৃথা হইবে।

প্রতি বিঘায় ৪ ভরি বীজের চারার প্রয়োজন হয়। টোম্যাটোর এ-দেশীয় বীজ হইতে জাত চারাগুলি সুফলপ্রসূ হয় না বলিয়া আমেরিকার বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করা উচিত। সাধারণতঃ দেশী বীজের চারার ফলগুলি পানিয়াল অথবা আমলকীর আকারের হয়, কিন্তু আমেরিকার বীজের চারার ফলগুলি এক একটা আপেলের আকারের এবং কোনও কোনও শ্রেণী বেলের আকারেরও হইয়া থাকে।

বীজ বপন করিবার পরের দিন বৈকালে সমস্ত বীজতলা সামান্য জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি নামমাত্র মাটির নীচে বপন করা বিধি বলিয়া জলের ছিটা পাইলে উহার কতকগুলি মাটির উপরে ভাসিয়া উঠিবে। তৎ-

ক্ষণাৎ সেগুলিকে সামান্য পরিমাণে ঘুঁটের ছাই মিশ্রিত মিহীমাটি ছড়াইয়া দিয়া ঢাকিয়া পুনরায় সামান্য জলের ছিটাদ্বারা উহা ভিজাইতে হইবে।

চারা বাহির হইলে আর জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। কারণ টোম্যাটোর কচি চারায় জল সিঞ্চন করিলে উহাদের অধিকাংশই মরিয়া যায়। তবে বৃষ্টির জলে ইহাদের তেমন ক্ষতি করে না।

চারাগুলি ৩।৪টী করিয়া পাতা বাহির হইলে রোপণের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমিতে দুই একবার চাষ দিয়াও ৩.৪ বার মই টানিয়া ঘাস ও অন্যান্য জঙ্গল পরিস্কার করিয়া লইতে হইবে। এই সময়ে জমিতে একবার মাত্র চাষ দিলে চলিতে পারে, কিন্তু মই ৩।৪ বারই দিতে হইবে। কারণ, বারবার মই টানিয়া জমির মাটি শক্ত করিয়া বসাইয়া না দিলে বৃষ্টির জল চারার গোড়ায় বসিয়া চারাগুলিকে মারিয়া ফেলিতে পারে। টোম্যাটোর গাছ কোনও সময়েই অধিক জল সহ্য করিতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে, রংপুরে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশী টোম্যাটো বারমাস জন্মে। উহার গাছগুলি সঁ্যাৎসেঁতে মাটিতেই সুস্থ থাকে ও বৃষ্টি পাইলে সতেজে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমেরিকান্ টোম্যাটোকে বারমেসে করিতে চেষ্টা করিয়া সেখানেও বিফল হইয়াছি।

ক্ষেত্রে চাষ ও মই দেওয়া হইলে দেড় হস্ত অন্তর দড়ি ধরিয়া সারি টানিয়া লইয়া তাহার উপরে প্রতি দেড় হস্ত অন্তর একটি করিয়া চারা রোপণ করিতে হইবে। চারাগুলি বৈকালে রোপণ করাই প্রশস্ত। চারা উঠাইবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বীজতলায় জল সিঞ্চন করিয়া রাখিলে চারা উঠাইবার সময় উহার শিকড় ছিঁড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না।

রোপণের পূর্ব্বে প্রত্যেকটী চারার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজন মত গর্ত্ত করিয়া তাহাতে এক ছটাক পরিমাণ পাতলা গোবর গোলা জল ঢালিয়া দিয়া চারাটীকে রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়। অন্যথায় চারাটী মুমূর্ষু অবস্থায় মাটিতে কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িতে পারে। টোম্যাটোর চারার গায়ে মাটি লাগিলে স্পৃষ্ট স্থান পচিয়া উঠে।

রোপণের পরে সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর মনে হইলে চারার গোড়ায় মাঝে মাঝে সামান্য পরিমাণে জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। চারাগুলি বেশ সবল হইয়া উঠিলে আর জল ব্যবহার করা বিধেয় নহে। এই সময়ে চারার মূলে কোনও আঘাত না দিয়া উহার চারি পার্শ্বের মাটি নিড়ানী দ্বারা খুড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন। হঠাৎ কোনও চারায় আঘাত লাগিলে তাহাতে তৎক্ষণাৎ সামান্য পরিমাণে জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য।

চারাগুলি ১০ ১২ অঙ্গুলী উচ্চ হইলে উহাদের গোড়ায় ৪ অঙ্গুলী পরিমাণ উচ্চ ও ৮ অঙ্গুলী চওড়া করিয়া মাটি দিতে হইবে। মাটি উভয় সারির মধ্যস্থল হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চারাগুলি এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইলে একবার মাত্র জল সিঞ্চন করা বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় জল সিঞ্চন করিলে চারাগুলির গোড়ায় মাটি আলগা হইয়া যায় বলিয়া উহারা সহজেই একদিকে হেলিয়া পড়ে। ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই উহাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া থাকে।

এই সময় হইতে টোম্যাটোর গাছে ফল ধরিয়া পাকিতে আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে আর অধিক যাতায়াত করিবার প্রয়োজন নাই। ফল পাকিতে আরম্ভ হইলে প্রত্যহ পাকা ফলগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সেই সময়ে কোনও ফলে পোকা ধরিয়াছে, দেখিতে পাইলে সেই ফলটী লইয়া দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে; তবে সাধারণতঃ টোম্যাটোতে পোকা ধরিতে দেখা যায় না।

টোম্যাটোর চাষে বিঘাপ্রতি ৪০৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

———

পুকুরে মাছ ধরা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাছ ধরিবার চার

চাউল সিদ্ধ করিয়া লইয়া, উহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতে হইবে। তার পরে উহাকে কারি-ষ্টোনে (Curry-stone) গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার দুই অংশ লও। তারপরে কাফি বেরির মত করিয়া চীনে-বাদাম জাতীয় কোন পদার্থকে অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া লও এবং পরে ইহা সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ কর। ইহারও শুধু একটী অংশ লও। ধনে'কেও ঐভাবে অর্দ্ধসিদ্ধ ও চূর্ণ করিয়া সিকিভাগ লও। এই সমুদয় দ্রব্যকে একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া উহার রঙ ও ঘনত্ব একপ্রকার না-হওয়া পর্য্যন্ত খুব করিয়া নাড়িতে হইবে।

মাছের আধার

মাছ গন্ধের জন্য বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়; কাজেই আধারের উপাদানের সঙ্গে ধনে দিতে হয়। মৎস্য মহাশয়েরা বোধ হয় মনে করেন যে পুকুরের একপার্শ্বে কোথাও বোধ হয় ফলারের আয়োজন হইয়াছে। অর্দ্ধসিদ্ধ বাদামের গন্ধও পেটুক মাছকে কম লালায়িত করে বলিয়া মনে হয় না। বাংলা দেশে আধারের নানান রকমের নাম আছে। অনেক সময়ে উহার মধ্যে পচা পনীর, অ্যানিসিড্ কিংবা অ্যাসাফিটিডা দিয়া গন্ধ বৃদ্ধি করিয়া তোলা হয়। অনেক সময়ে আবার ইহার সঙ্গে লাল পিপড়ের ডিম দিয়া দেওয়া হয়—মাছের পক্ষে ইহা বড় মারাত্মক রকমের প্রলোভন। আধারের মূলে থাকিবে রুটির টুক্‌রা; কিন্তু দেখিতে হইবে ইহার মধ্যে যেন উপরকার শক্ত চাক্‌লা কিংবা গমের ময়দা না থাকে। ইহাকে জলের সঙ্গে খুব ভাল করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে—সমস্ত জিনিষটা মিশ্রণের পর মাঝামাঝি ধরণের শক্ত হইলেই চলিবে। ইচ্ছা করিলে ইহার সঙ্গে ঘি কিংবা মধু অথবা লাল পিপড়ের ডিম মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পিপড়ের বাসা সাধারণতঃ আমগাছেই পাওয়া যায়; অনেক সময়ে উহা আবার বাজারেও বিক্রয় হয়। এক আনার কিনিলেই সারাদিন মাছ ধরিবার উপযুক্ত ডিম পাওয়া যাইবে। বাজারে যে খুলি (fried oil cake) কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাও ভাতের সঙ্গে চূর্ণ করিয়া মিলাইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। বোয়াল কিংবা ঐ শ্রেণীর মাছ ব্যতীত তাজা আধারে কোন ফললাভ হয় না।

পোকার আধার দিয়াও লোবিয়ো ধরা যাইতে পারে। ইহা দুই রকমের হইতে পারে; যথা সাদা কিংবা ঈষৎ শুভ্রবর্ণের এবং কালো। অনেক সময় পিপড়ার ডিমেরও যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে। চিংড়িমাছের উপরকার খোসা ছাড়াইয়াও অনেক জায়গায় ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। যে

আধারই ব্যবহার করা যাউক না কেন, বড়শির সমুদয় অংশ যেন ঢাকিয়া দেওয়া হয়। আধার ফেলিবার পূর্ব্বে মাছ কাছে আনিবার চেষ্টা করা দরকার। সেইজন্য ভুষি কিংবা চাউলের কুঁড়া জলের মধ্যে ভাল করিয়া ভিজাইয়া মাঝে মাঝে মুঠি মুঠি বড়শীর কাছে ফেলিতে হইবে। বড়শীর যে দিকটা তীরের কাছে, সেইদিকে ফেলাই ভাল; কেননা, উহাতে মাছকে বড়শী ঠেলিয়া আসিতে হইবে। উহা বিশেষ লাভের কথা বটে। যদি কাহারো কোন পুকুরে নিয়মিত ভাবে মাছ ধরিবার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে সকালে-বিকালে মাছ ধরিবার জায়গায় উহা ছাড়াইলে সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি।

মাছ ধরিবার জায়গা

যে জায়গায় মাছ ধরিতে হইবে, তাহার জলের মধ্যে যাহাতে আগাছা এবং অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি না থাকে, তাহার দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে। যদি কেহ কোন পুকুরে নিয়মিতরূপে মাছ ধরিবার জন্য যান, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বাহ্ণেই একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া জলস্থ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। ছিপের ডোরে যে সীসা দেওয়া থাকে, তাহা দিয়া জলের গভীরত্ব ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবং ফাত্‌নাও তদনুসারে বড়শীর সূতার সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া মাছ ধরিতে হইবে। মৎস্য-শিকারের জন্য যে জায়গা বসিবার জন্য ঠিক করিয়া লওয়া হয়, সেই জায়গাতেই রোজ রোজ বসিতে হইবে। কেননা, জলের নীচে যে মাছ থাকে, তাহারা কোথায় গেলে ভাল আধার পাইবে, তাহা অভিজ্ঞতার জোরেই চিনিয়া রাখে।

জোরে ছিপটি মারার জন্য অনেক সময় বড়শীর টোপ মাটিতে পড়িয়া যায়। উহাও সর্ব্বদাই তাহাদের ভোজ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই মাছ খুঁজিবার জন্য মিনিটে মিনিটে জায়গা বদলাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, মাছই স্বেচ্ছায় আসিয়া বড়শীতে ধরা দিবে। কেবলমাত্র টোপের রঙ জলের রঙ হতে প্রভেদ হওয়ার জন্য নহে, চার ফেলার জন্যও মাছের দৃষ্টি বড়শীর দিকে আকৃষ্ট না হইয়া পারিবে না। সুন্দর দৃশ্য ও মনোমদ গন্ধ মাছকে ভুলাইতে খুব সাহায্য করিতে থাকে; এ ঠিক সেই বড়লোকের বাড়ীর বিয়েতে কাঙালী ভোজনের মত। হুড়মুড় করিয়া সব থার্ডক্লাশ প্যাসেঞ্জারের মত আপনা আপনি আসিয়া হাজির হইবে। প্রথমেই মৎস্যশিশুর দল ভীড় করিয়া আসিয়া হাজির হইবে; তোমাদের হয়তো মনে হইবে, কি আপদ! কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

ছোট ছোট মাছ দল বাঁধিয়া আসিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেই, বৃদ্ধ মৎস্যের মহলে সোরগোল পড়িয়া যায়, তাহারা ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসে। টোপ লোভনীয় বোধ হইলে তাহারা ছোট মাছকে তাড়াইয়া দিয়া, নিজেরাই ভোজন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়! প্রথমে যখন তাড়াতাড়ি ঠোকরের উপর ঠোকর পড়িতে থাকে, তখন বোঝা যায়, কোন অশান্ত পেটুক মৎস্যশিশু সুগন্ধযুক্ত আধার গিলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার পরেই যখন দেখা যায় যে হঠাৎ টোপ ঠোকরানো বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং পরমুহূর্ত্তেই আবার ঠোকরানো শুরু হইয়া গিয়াছে, তখন বোঝা যায় যে কোন সতর্ক বৃদ্ধ মৎস্য ছেলেদের তাড়াইয়া দিয়া নিজেরই আহার সংস্থানের জন্য আসিয়া হাজির হইয়াছে। তার

পরে মাছ ধরিবার পালা সুরু হয় ; মাছও বুলডগ কুকুরের মত নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে রোহিত নন্দন জলের উপরে ভাসিতেছে ও মুখ দিয়া বুদ্বুদ ছাড়িতেছে। তাহা দেখিয়া ফাতনায় জলের পরিমাপ কমাইয়া দিলে বোকামীর চূড়ান্ত হইবে। কেননা, মাছ এরূপ অবস্থায় শুধু খেলাচ্ছলেই জলের উপর ভাসিয়া উঠে ; তারপরে নিজেদের কাজের জন্য আবার জলের নীচে ডুব দেয়। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, টোপ যেন সব সময়েই তলার দিকে থাকে।

কামড়ানো ও ঠোকরানো

প্রথমে যে রোহিত মাছটীকে তুমি ধরিবে, তাহার মুখ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই জলের তলের দিকে টোপ দেখিবার তাৎপর্য্য সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে। ট্রাউট, ডেস্ কিংবা রোচ মাছের মত ইহার মুখ বাহিরের দিকে বিস্তৃত নয় ; উহা একটু ভিতরের দিকেই থাকে। মুখের সামনে পুরু ঠোঁটের মত যে পাতলা একটা পর্দা থাকে, তাহা দিয়াই রোহিত মৎস্য প্রথমে আধার টোক্‌রাইতে থাকে ; গিলিবার পূর্ব্বে ঠোঁট দিয়া আধার চাপিয়া ধরাই ইহাদের দস্তর। এই কারণের জন্যই রোহিত মাছের ঠোকরাইবার ধরণ কতকটা মৌলিক রকমের। সাদা কার্প মাছেরও এই বিশেষত্ব আছে, কিন্তু তাহা রোহিত মাছের মত এতটা পরিস্কার ভাবে চোখে পড়ে না।

অনেক মাছের মুখবিবর আবার খুব বড়ও নয় ; কাজেই কয়েকবার জোরে ঠোকর দেওয়ার পরই যখন সমস্ত ফাত্‌নাটি হঠাৎ জলের নীচে চলিয়া যায়, তখন মনে করিতে হইবে যে মাছ টোপ গলাধঃকরণ করিয়া পলাইবার চেষ্টায় আছে। তখন ছিপ্‌টি মারিবার প্রকৃত সময়। সাধারণ রকমের মুখবিশিষ্ট মাছ এইরূপেই ঠোকরাইয়া থাকে। রোহিত মাছের ঠোকরাইবার ধরণ কিন্তু কতকটা স্বতন্ত্র রকমের ; পূর্ব্বোক্ত প্রথায় সাধারণতঃ অলিভ্ কার্প মাছই টোপ গিলিয়া থাকে। এই সকল মাছ রোহিত এবং সাদা কার্পের মতই বেশী জলে থাকে ; কাজেই ঠোকরাইবার ধরণ দেখিয়া কোন্‌টা অলিভ্ কার্প এবং রোহিত তাহা কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে। এই ঠোকরাইবার নমুনার প্রভেদের ওপর ছিপটি মারার প্রকৃত সময় এবং মাছ ধরার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

রোহিত মাছের টোপ গিলিয়া যাওয়া অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। নীচে তাহাদের ঠোকরাইবার ষ্টাইল সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লিপিবদ্ধ হইল ; কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল যে তাহাদের এই পদ্ধতি অনেক সময় প্রাকৃতিক অবস্থা এবং মাছের আকারের উপর নির্ভর করে – দিনের মধ্যে অনেক রকম ষ্টাইলে ঠোকরাইবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে সেইজন্য আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

অনেক সময় ফাত নাটি আস্তে আস্তে জলের উপরে ও নীচে ওঠা নামা করিতে থাকিবে ; উহা একেবারে জলের নীচে চলিয়া গেলে তখনও ছিপটি মারিবার সময় উপস্থিত হয় না। কিন্তু তারপরেই যখন খুব তাড়াতাড়ি ফাত্‌নাটী জলে ডুবিতে ও উঠিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট খাটো ঝকি বড়শীর গায়ে আসিয়া লাগে, সেই মুহূর্ত্তেই জোরে ছিপটি মারা দরকার। কেননা, এরূপ শুভমুহূর্ত্ত বারে বারে আসে না। কাজেই এরূপ সময়ে বড়শীর ঢিলা সূতো গুছাইয়া লইয়া ছিপ ঠিক করিয়া লইয়া সময়মত ছিপটি মারিবার

জন্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহাতে ফাত্না সাধারণতঃ এক ইঞ্চির ⅛ ভাগ কিংবা ১/১৬ ভাগ জলের নীচে যাইয়া থাকে। ইহাই সতর্ক এবং সাহসী ঠোকরের একটী চূড়ান্ত নমুনা; কাজেই এ শুভ অবসর কখনও হারাইতে দেওয়া উচিৎ হয় না। রোহিত মাছের মুখ খুব বড় নয়; কাজেই আধার ঠোঁটে চাপিয়া গিলিবার সময়ই ছিপটি মারা দরকার। তা ছাড়াও ময়দা জাতীয় নরম কোন পদার্থের আধার হইলে, উহা মাছের মুখে বেশীক্ষণ অখণ্ড অবস্থায় থাকিতে পারে না। কাজেই কখন মাছের মুখে আধারটি থাকিবে ইহা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপটি মারিতে হইবে। অনেক সময় মৎস্য শিকারীরা এই কথাটা ঠিক ভাবে উপলব্ধি করেন না; এবং শুভ-মুহূর্ত্ত চলিয়া গেলে শেষে হা-হুতাশ করিতে থাকেন। যে-সময়ে ৩।৪ বার ঠোকর দিতে দেখা যায়, ঠিক সেই সেকেণ্ডেই বড়শী ঘুরাইয়া টানে তুলিতে হইবে। ইহার পরে যদি দেখিতে পাও যে আবার আস্তে আস্তে ঠোকরানো শুরু হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তোমার একটী সুবর্ণ-সুযোগ হেলায় চলিয়া গেল। কিছুদিন বড়শী লইয়া অভ্যাস করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিপটি মারা অভ্যাস হইয়া আসিবে।

এতদ্ব্যতীত আর একটী বিঘ্ন আছে, তাহা মাছ ধরিবার সময় ভুলিয়া গেলে চলিবে না। অনেক সময়, ঠিক মুহূর্ত্তে ছিপটি মারিয়া মাছ ধরিতে সফল না হইলে নিজের উপর বিশ্বাস কমিয়া যায়, কিংবা শিকারী মাছে টান দিবার সময়টি কিছু অদল বদল করিয়া লন। ইহা কখনো করিতে নাই। কেননা, তোমার ছিপটি মারা ঠিক সময়ে দেওয়া হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে মাছও কম চালাক নহে। এই বাধা-বিঘ্নই মাছ শিকারের পক্ষে প্রচুর আনন্দের খোরাক জোগাইয়া থাকে। সমালোচকের চক্ষু লইয়া মাছের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে, সতর্ক দৃষ্টি ও শক্ত হাত লইয়া কাজ করিলে দেখা যাইবে যে একবার গুরুভার একটী পদার্থ বশড়ীতে আটকাইয়া গিয়াছে। কাজেই নিজের উপর কখনো বিশ্বাস হারাইতে নাই।

উপরে যে সতর্ক বাণী উচ্চারিত করা হইল তাহা জোরে ঠোকরানো সম্বন্ধে। কিন্তু মাছ মাঝে মাঝে এমন আস্তে আস্তে খামখেয়ালী ভাবে ঠোকরায় যে ফাত্নার গায়ে বিভিন্ন রকম রঙের সমাবেশ না থাকিলে উহা নজরেই পড়িত না। যে-ঋদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অন্যান্য স্থলে সহজেই ছিপটি মারা যাইত, তাহা এমন অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয় যে চোখে প্রায় দূরবীণ লাগাইবার মত বন্দোবস্ত করিতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ শিকারী সহজেই বুঝিতে পারেন যে উভয়ক্ষেত্রে মূলনীতি একই ধরণের; মাছের ছোট ছোট ঠোকরানি যখন তাড়াতাড়ি চলে, তখনই বড়শী তুলিবার প্রকৃষ্ট সময়।

অনেক সময় ফাতনার মৃদু কম্পন সহজে চোখে পড়ে না; উহা অনেক সময় আবার মাছের ঠোকরে তেরছা হইয়া জলে ভাসিতে থাকে। এই তেরছা অবস্থায় যতই সামান্য হউক না কেন, কিছুক্ষণ থাকিলেই মনে করিতে হইবে যে কেহ টোপ চুরি করিয়া খাইতে আসিয়াছে। তখন যদি এই অবস্থাতেই দু' একবার মৃদু কম্পন উপলব্ধি করো, তবে ছিপটী মারিতে আর দ্বিধা করিওনা। দেখা যাইতেছে, জোরে ও আস্তে আস্তে ঠোকর দেওয়ার মূলনীতি একই; কাজেই মৎস্যশিকারীর বড়শী টানিয়া তুলিবার অবলম্বিত প্রথাও ভিন্ন হইবে বলিয়া

আশা করা যায় না। ফাতনার তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়াই ছিপটি মারিবার সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

অনেক সময় লক্ষ্য করা গিয়াছে, ফাতনাতে কেবল যে কম্পন লক্ষিত হয়, তাহা নহে; মাঝে মাঝে উহা প্রায় কিংবা একেবারেই জলের নীচে ডুবিয়া যায়, যদি ফাত্‌না ধীরে ধীরে জলের নীচে ডুবিয়া যায়, তাহা হইলে বড়শী কখনো তুলিতে নাই; কিন্তু যদি উহা তাড়াতাড়ি চোখের অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে দেরী করা আবার বোকামীর চূড়ান্ত হইবে। মাছ যে ইহাতে ধরা পড়িবেই, এমন কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু এরূপস্থলে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া ছিপটি মারাই উচিত। অনেক সময়ে ইহাতে অলিভ কার্প কিংবা রোহিতমৎস্যও ধরা পড়িতে পারে।

অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ফাত্‌না অনেক সময় জলের উপর একেবারে সমান্তরাল ভাবে ভাসিতে থাকে। তাহাতে বোঝা যাইবে যে বড়শীর আধার কোন পেটুক মাছ সাবাড় করিয়া দিতেছে, কাজেই ফাতনা জলের মধ্যে একটুও না ডুবিয়া সোজাসুজি জলের উপর ভাসিতেছে। তখন আধার মাছের মুখের মধ্যে রহিয়াছে মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপটি মারিতে হইবে। তবে বলিয়া রাখা ভাল যে, এরূপ অবস্থা মৎস্য শিকারীর ভাগ্যে কদাচ জুটিয়া থাকে। অনেক সময় আবার ফাতনা আস্তে আস্তে কাত হইয়া জলের উপর ঠিক খাড়া হইয়া উঠে এবং একটু পরে জলের প্রায় এক ইঞ্চির ১/৬ অংশ তলে ডুবিয়া যায়। জলে কোনরূপ আন্দোলন থাকিলে, ইহা প্রায়ই চোখে পড়ে না। এই প্রকারে অনেক ভাল ভাল মাছ ধরা পড়িয়া থাকে।

কিন্তু বাধ্য না হইলে, সাধারণতঃ এরূপ ঠোকরের উপর নির্ভর করিয়া ছিপটি মারিতে নাই। রোহিত মৎস্য বড় আস্তে আস্তে টোপ গিলিয়া থাকে; কাজেই দ্রুত ঠোকরের জন্য প্রথমে ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করিতে হইবে। অনেক সময় ফাতনার মৃদু কম্পন ও বড়শী টানিয়া তুলিবার সময়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকে। অনেক সময় আবার দীর্ঘ ঘণ্টাও অতিবাহিত হইয়া যায়। এক একবার আবার মাছ আসিয়াই বড়শীতে টান দিতে থাকে।

চিংড়ি মাছের ঠোকরাইবার কায়দা হইতে অন্যান্য মাছের প্রভেদ আছে। ঝটকা টান না দিয়া, চিংড়ি মাছ আস্তে আস্তে বড়শী টানিয়া লয়; তাহার লম্বা হাতে আধার তুলিয়া লইয়া মুখের ভিতর পুরিয়া থাকে। কাজেই ফাতনাও আস্তে আস্তে ডুবিতে এবং উঠা নামা করিতে থাকে। অনেক সময় ফাতনাটী সমানে জলের তলদেশে প্রবেশ করিতে থাকে; কিন্তু সর্ব্বদাই আস্তে আস্তে, কখনো উহাতে হেঁচকা টান লক্ষিত হয় না।

কাঁকড়াও অনেক সময় আধার লইয়া টানা টানি করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার গতিবিধি আরও স্থবিরের মত। যতই তলের দিকে উহা যাইতে থাকে ততই উহার গতির বেগ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে।

ছোট মাছের ঠোক্‌রানোর একটু বিশেষত্ব আছে; কিন্তু তাহা উপলব্ধি করা সহজ নহে। রোহিত এবং সাদা কার্প মাছের অপোগণ্ড শিশুদের ঠোক্‌রানো বড়দের চেয়ে খুব বেশী তফাৎ নয়। শুধু দেখা গিয়াছে যে, তাহারা বড়দের মত সতর্কভাবে আদৌ ঠোকরায় না। চেলা এবং ২।১ ইঞ্চি লম্বা আকারের কার্প-

শিশুদের কামড়ানো সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অল্প জলে তাহাদের বিশেষত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তাহারা আধার দেখিলেই হুড়মুড় করিয়া সবাই উহার কাছে যাইয়া পড়ে এবং টুকরা বাহির করিয়া লইয়া মুখে ফেলিতে থাকে। তাহাদের গতিবিধি দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা শরীরের ধাক্কা দিয়াই টোপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গলাধঃকরণ করিবে; কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে টোপের গায়ে ছোট ছোট দংশনক্ষতও রহিয়া গিয়াছে। জলের মধ্যে নগ্ন পায়ে দাঁড়াইলেই তাহাদের মৃদু ঠোকরানো অনুভূত হইবে। ফাতনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে তাহাদের কামড়ে উহা ক্রমাগত চর্কীর মত একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে ঘুরিতেছে; কিন্তু তলাইবার কোন লক্ষণই উহাতে প্রকাশ পাইতেছে না। তাহাদের লাফালাফিতে বড় বড় মাছের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়, এইটুকুই পরম লাভের কথা বটে।

একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাইবে না; তবে যখন বড় মাছের ঠোকরাণো-পর্ব্ব শেষ হইয়া যায়, তখন চিংড়িমাছের আবার আবির্ভাব হইয়া থাকে। চিংড়িমাছ প্রভৃতির লোলুপ দৃষ্টি হইতে টোপ বাঁচাইতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা নেহাৎ প্রয়োজনীয়:—

মুরগীর নাড়ীভুঁড়ি লইয়া উহা একটী ইটে জড়াইয়া লইয়া উহার সঙ্গে দড়ি বাঁধিতে হইবে। তারপরে যে জায়গায় মাছ ধরা হইতেছে সেখান হইতে অন্ততঃ পক্ষে তিনগজ দূরে এবং তীর হইতে প্রায় একগজ দূরে উহা ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতেই ছোট ছোট মাছ সারাদিন ব্যাপৃত থাকিবার খোরাক পাইবে; তোমারও টোপ কিংবা বড় মাছের জন্য অন্য কোন প্রকার হাঙ্গামা পোহাইতে হইবে না।

তবে অনেক সময় ফড়িঙ লইয়া বড় বিপদে পড়িতে হয়। মেয়ে ফড়িঙগুলাই বিশেষ জ্বালাতন করিয়া থাকে; ফাতনার উপর ডিম পাড়িবার সময় উহারা এত বেশী নড়াচড়া করিয়া থাকে, ফাতনার কম্পন দেখিয়া মনে হয় যে
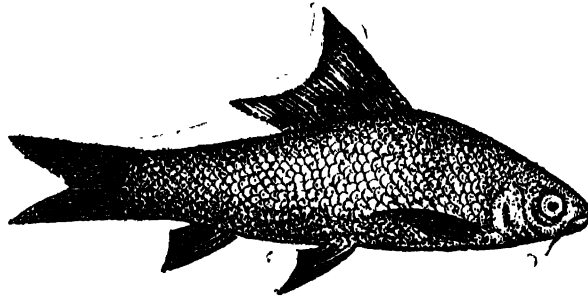
রোহিত জাতীয় মৎস্য।

বড় বড় রোহিত এবং সাদা কার্প মাছ আসিলে উহারা কেবল যে ছোট ছোট মাছ-গুলিকে তাড়াইয়া দিয়া থাকে তাহা নহে, চিংড়ি এবং কাঁকড়াদেরও আর সেখানে থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। চিংড়ি এবং বড় মাছকে

মাছেই বুঝি ঠোকরাণো সুরু করিয়া দিয়াছে। ধেড়ে ফড়িঙও আশে পাশে উড়িতে উড়িতে যখন ছিপের মাথায় যাইয়া বসিয়া পড়ে, তখনও বিরক্তিটা কম হয় না। কিন্তু কথায় বলে, "যাহা আরাম করা যায় না, তাহা সহ্য করিতেই হইবে।"

(ক্রমশঃ)

সাবান প্রস্তুতের ফরমুলা ও উপাদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী ১৩৩৫ সালে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" লিখিয়া ছিলাম। এক্ষণে সাবানের কার্য্য বাড়িয়াছে দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। পাঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে ইহার বিস্তৃতির জন্ম বাকী যাহা যাহা বলিবার ছিল প্রবন্ধটী পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া এক্ষণে সন্নিবেশিত করিতেছি। সাবানের সহিত শিলিকেট অব সোডা ব্যবহৃত হয়। Bengal Silicate Works নামে আমি এই শিলিকেটের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফ্যাক্টরী করিয়াছি। আমার শিলিকেট বিদেশী শিলিকেট হইতে গুণে ন্যূন নহে। দামে হন্দর প্রতি আড়াই টাকা সস্তা।

শিলিকেট কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় তাহার বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি। কেবল, বালি গলান বাজারে চলিত শিলিকেট ব্যবহার করিবেন না। ইহাতে সাবান শক্ত হয় ও কিছু দিন বাদে ফাটিয়া যায়। যতদূর শিলিকেট লৌহ শূন্য হয় ততই ভাল। বালিতে স্বভাবতঃ কিছু পরিমাণ লৌহ থাকে। তাহা অভিজ্ঞ রাসায়নিক (Chemist) দিয়া যতদূর সম্ভব সরাইয়া আমরা শিলিকেট প্রস্তুত করি। আমাদের দেখাদেখি অনেক কেমিক্যাল ওয়ার্কস শিলিকেট ব্যবসাতে নামিয়াছিলেন; কিন্তু সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। আমাদের M. Sc. পাশ করা রাসায়নিকের শিলিকেট প্রস্তুতে বহুদিনের অভিজ্ঞতা আছে ও যাহাতে দিন দিন উন্নতি হয় তাহার জন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ চেষ্টিত আছেন। অনেকেই বিলাতী শিলিকেটের ন্যায় সাদা স্বচ্ছ(Transparent) মাল চাহেন; অথচ বেশী দরে কিনিতে চাহেন না— সস্তায় মাল চাহেন। প্রতিযোগিতায় আমাদেরও খরিদ্দার রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া সস্তা দামের মাল অল্প অল্প প্রস্তুত করিতে হয়। যতদিন দেশের লোক স্বদেশী উৎকৃষ্ট শিলিকেটের ব্যবহারের ফল হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না ততদিন কষ্ট পাইতে হইবে।

বিলাতে Silicate গ্যাস্ বা বিজলীর উত্তাপে প্রস্তুত হয়। এখানে গ্যাস্ বা বিজলীতে করিতে অনেক খরচ পড়ে। আমরা কয়লার জালে প্রস্তুত করি ও ফিল্টার করিয়া Transparent করিয়া দিতে পারি যদি দর বেশী পাই। সেখানে শীতপ্রধান দেশ, এইখানে গরম দেশ, শিলিকেট যত বেশী কাল রাখিবেন ততই তিতিয়া শুভ্রবর্ণ হইবে—যেমন নদীর জল হয়। বিলাতের শিলিকেট এখানে আসিয়া বাজারে যাইতে অন্ততঃ ৪ মাস কাল সময় লাগে। আমাদের শিলিকেটও মিশাইলে বিদেশীয় মতন সাদা হয় ও কিছুকাল রাখিলে মোটা হয়।

বিলাতী বা বিদেশী শিলিকেট যে উপাদানে প্রস্তুত হয়, সেই সব উপাদানেই আমরা প্রস্তুত করি, কেবল উপরোক্ত কারণের জন্য একটু চক্ষুতে তফাৎ বোধ হয়। Analysis করিলে কোন পার্থক্য বা তফাৎ পাইবেন না।

সিলিকেট অব সোডা ব্যবহারের প্রণালী

অনেকে সিলিকেট কিরূপে, কখন মিশাইলে বেশী মিশাইতে পারা যাইবে তাহা জানেন না। সাবান প্রস্তুতকারীদের সাবানের সস্তা পড়তা করিবার জন্য এই বিষয় লিখিলাম।

অনেকের ধারণা ছিল যে শীতকালে ঠাণ্ডা প্রণালী বা cold processএর সাবান বিলাতী বা বিদেশী শিলিকেটেই ভাল হয় তাহা আমরা বাগমারীর প্রত্যেক সাবান কারখানার মালিক-দিগকে আমার রাসায়নিক ম্যানেজারবাবু দেখাইয়া দিয়াছেন যে সেটী ভুল ধারণা। এক্ষণে তাহারা আমাদের দেশী শিলিকেটেই কার্য্য চালাইতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা অন্য দেশী সাধারণ বালী গলান শিলিকেট ব্যবহার করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই সেইজন্য এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুখের বিষয় যে এইটী আমরা দূর করিতে পারিয়াছি উৎকৃষ্ট। গুণের সাবান প্রস্তুতে ১নং শিলিকেট ব্যবহার করা উচিত। সাধারণ কাপড় কাচা ঢেলা সাবানের ২নং মাল ব্যবহার করিবেন। দেশের লোককে ও ধোপাদিগকে সস্তায় সাবান দিবার জন্য এবং বিদেশী washing soap এর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ১নং শিলিকেট সাবানে ব্যবহার করা উচিত।

যখন তৈলের দর চড়িবে তখন শিলিকেট ব্যবহার ভিন্ন সাবানের পড়তা কম করিবায় আর কোন উপায় নাই।

চীনে মাটী (China clay) বা soap stone এর দর প্রতি মণ দুই টাকা হইতে ২॥• টাকা; কিন্তু ইহাতে washing quality কিছুই নাই। শিলিকেট সোডা থাকিবার জন্য ধোলাইয়ের সাহায্য করে ও দামী Caustic soda ব্যবহার কম করাইয়া দেয় ও সেই কারণে পড়তাও কম পড়ে।

শিলিকেট মিশ্রিত করিবার প্রণালী

১। পাকান সাবান (soap by boiling process)

শিলিকেটের সমান পরিমাণ জল লইবে। প্রথমে জল গরম করিবে। অতঃপর উক্ত গরম জলে শিলিকেট দিবে, দিবার সময় অনবরত নাড়িতে হয়। তবেই উহা সহজে জলের সহিত মিশ্রিত হইবে। সমভাগ জল ও শিলিকেট একত্র মিশ্রিত করিলে উহা ৪০ ডিগ্রী "বমি" হয়।

জল ও শিলিকেট সম পরিমাণ হওয়া আবশ্যক। শিলিকেট অপেক্ষা জল ঈষৎ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যেন কম না হয়।

কদাপি ঠাণ্ডা জলে শিলিকেট মিশাইবে না। ঠাণ্ডা জলে শিলিকেট গলে না, নীচে জমাট বাঁধিয়া যায়।

সর্ব্বদা জল মিশ্রিত শিলিকেট সাবানে মিশাইবে। কদাচ জলে না গলাইয়া শিলিকেট সাবানে মিশাইবে না। তাহাতে সাবান বেশী শক্ত হইবে। শিলিকেট জলের সহিত উত্তমরূপে

মিশ্রিত হইলে, উক্ত জল মিশ্রিত শিলিকেট সাবানে মিশাইবে। সাবানে মিশ্রিত করিবার সময় জল মিশ্রিত শিলিকেট গরম থাকা দরকার। কখনও ঠাণ্ডা অবস্থায় মিশাইবে না। সাবানও গরম, সুতরাং তরল থাকা চাই। কাষ্ঠ ফলাকা দ্বারা উত্তমরূপে ঘাঁটিয়া শিলিকেট মিশাইয়া দিতে হয়। ভালরূপ না ঘাঁটিলে সাবান ও শিলিকেট একত্র মিশ্রিত হইবে না; সাবানে ঢেলা বাঁধিতে পারে।

সাবান সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারী হইলে জল-মিশ্রিত শিলিকেট মিশাইবে। সাবান সম্পূর্ণরূপে পাক না হওয়া পর্য্যন্ত শিলিকেট মিশাইবেনা। মিশাইবার সময় উভয় গরম থাকা চাই। ঠাণ্ডা থাকিলে মিশ্রিত হয় না। একটি গরম ও অপরটী ঠাণ্ডা থাকিলে, সাবানে ছোট ছোট ঢেলা বাঁধে।

গরম জলে শিলিকেট গলাইবার সময় এবং জল মিশ্রিত শিলিকেট সাবানে মিশাইবার কালীন উহা কাষ্ঠ ফলক দ্বারা উত্তমরূপে ঘাঁটিতে হইবে।

ঠাণ্ডা সাবান (SOAP BY COLD PROCESS)

তৈল ও কষ্টিক লাই উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে উহাতে জল-মিশ্রিত শিলিকেট মিশাইবে। মিশাইবার সময়ে ঘুঁটিয়া ভালরূপ মিশ্রিত করিয়া দিবে। পরে ঠাণ্ডা প্রণালীতে সাবান প্রস্তুত প্রণালীর মত রাখিয়া দিবে।

১ মণ তৈলের সাবানে ১ হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত শিলিকেট মিশ্রিত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ ৫ হইতে ১০ সের মিশান হয়।

৯ প্রকার শিলিকেট আছে। তন্মধ্যে মাত্র ২ রকম শিলিকেটই সাবানে ব্যবহার হয়। অন্য শিলিকেট ব্যবহারে সাবানে নানারূপ দোষ হয়, এবং কিছুদিন পরে সাবান খারাপ হয়।

সাবান ও শিলিকেট প্রস্তুতে অভিজ্ঞ কেমিষ্ট দ্বারা বিদেশী প্রণালীতে আমরা সাবানে ব্যবহারের উপযোগী দুই রকম শিলিকেটই মাত্র তৈয়ার করি।

আমাদের শিলিকেট সর্ব্ব বিষয়ে বিদেশী শিলিকেটের সমকক্ষ। আমাদের শিলিকেটের বিশেষত্ব এই যে, উপরোক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিলে সাবানে তৈয়ারি খরচ কম পড়ে, এবং সাবান ভাল হয়।

বাগমারীর বিখ্যাত সাবান কারখানাগুলি আমাদের শিলিকেট ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেন।

সাবানের FORMULA

পাকান সাবান (semiboiling process)

১। মহুয়া তৈল — ১৩৷৷০ সাড়ে তের সের
তিল তৈল — ৬ ছয় সের
কষ্টিক সোডা — ৩ সের ১০ ছটাক
জল ২০ সের
শিলিকেট অফ সোডা ৫ সের

২। নারিকেলের তৈল ১০ সের
বাদাম তৈল — ১ সের ৪ ছটাক
কষ্টিক সোডা — ২ সের
জল — ১০ সের
শিলিকেট — ৩ সের

৩। নারিকেল তৈল ১১ সের
কষ্টিক সোডা — ২ সের
জল — ১০ সের
শিলিকেট — ৩ সের

৪। নারিকেল — ৮ সের
তিল তৈল — ১০ সের
কষ্টিক সোডা — ৩ সের ৮ ছটাক
জল — ২০ সের
শিলিকেট — ২৷৷০ সের

৫। তিল তৈল — ২ সের
বাদাম তৈল — ৫ সের
কষ্টিক সোডা — ১ সের
জল — ৭ সের
শিলিকেট — ১ সের

ঠাণ্ডা সাবান (cold process)

১। নারিকেল তৈল — ১০ সের
কষ্টিক সোডা লাই
৩৮ ডিগ্রী বমি — ৫ সের
শিলিকেট — ২॥০ সের

২। নারিকেল তৈল — ১০ সের
তিল তৈল — ২ সের
কষ্টিক সোডা লাই
৩৮ ডিগ্রী বমি— ২॥০ সের

৩। নারিকেল তৈল — ৯ সের
বাদাম তৈল — ১ সের
কষ্টিক সোডা লাই
৩৮ ডিগ্রী বমি — ৫ সের
শিলিকেট — ৩ সের

৪। নারিকেল তৈল — ৫ সের
তিল তৈল — ৫ সের
কষ্টিক সোডা লাই
৩৬ ডিগ্রী বমি — ৫ সের
শিলিকেট — ২॥০ সের

৫। নারিকেল তৈল — ৮ সের
বাদাম তৈল — ২ সের
কষ্টিক সোডা লাই
৩৬ ডিগ্রী বমি —(Baume) ৫ সের
শিলিকেট — ৩ সের

উপরোক্ত formulaতে chinaclay, soap stone প্রভৃতি মিশাইতে পারা যায়। উহা মিশাইলে তৈয়ারি সাবান সামান্য নরম রাখিয়া মিশাইবে। নতুবা সাবান বেশী শক্ত হইবে।

Chinaclay, soap stone প্রভৃতি ১ সের তৈলে ২ ছটাক হিসাবে মিশাইতে হইবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ নহে এমন বালকদিগের পক্ষে লাভজনক কাজ।

(ক) আমিনের কার্য্য শিক্ষা।—ম্যাট্রিকুলেশন অপেক্ষা কিছু কম যোগ্যতাবিশিষ্ট বালকগণ আমিনের কোর্স সহজেই লইতে পারে। বয়স কিন্তু ১৬ বৎসরের অধিক হওয়া আবশ্যক, কারণ আমিনদের বাহিরে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় তাহা কেবলমাত্র কষ্টসহিষ্ণু যুবকগণই সহ্য করিতে পারে। উহার কোর্স আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে আরম্ভ হয় এবং এক বৎসর কাল স্থায়ী। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতীতে, বেঙ্গল সার্ভে স্কুলে, বর্দ্ধমানে, রংপুরে, পাবনায় ও রাজসাহীতে উহা শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুল ফী খুব কম (মাসে ১।৹ টাকা হইতে ৩৲ টাকা) এবং অন্যান্য বড় বড় সহরের তুলনায়, থাকিবার খরচও খুব বেশী নহে। প্রতিযোগিতা হয় বলিয়া ময়নামতীতে আমিন ক্লাশে ভর্ত্তি হওয়া কিছু কষ্টকর। ময়নামতী বঙ্গদেশের একটী খুব ভাল স্বাস্থ্যজনক স্থান এবং পাহাড়ের উপরে বাস অতীব আনন্দদায়ক। কোর্স শেষ হইলে জমিদারীতে, মিউনিসিপ্যালিটীতে, জেলা বোর্ডে, পূর্ত্ত বিভাগে, গভর্ণমেণ্টের জমি বন্দোবস্ত বিষয়ক বিভাগ ইত্যাদিতে চাকুরী পাওয়া যায় এবং এ-পর্য্যন্ত চাকুরী পাইতে ছাত্রদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই।

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আমিনের কোর্স শেষ করে তাহারা সার্ভে ফাইনাল কোর্সে আরও এক বৎসর শিক্ষালাভ করিতে পারে; ইহা কুমিল্লার অন্তর্গত। ময়নামতীতে ঠিক পূজার পরেই আরম্ভ হয়। উহাতে পড়িবার ফী প্রতিমাসে ৫৲টাকা লাগে এবং হোষ্টেলে থাকিবার খরচ মাসে ১১৲ টাকা পড়ে। এই কোর্স যাহারা সমাপ্ত করে তাহারা ল্যাণ্ড একুইজিসন, পার্টিশন, কালেক্টরীর সেটেলমেণ্ট ও খাসমহল বিভাগে, গভর্ণমেণ্ট ট্রেভার্স, বন, পূর্ত্তকর ও সেস্ বিভাগে, আদালতের কমিশনাররূপে, রেলওয়েতে, চা বাগানে, কয়লা, তৈল ও ম্যাঙ্গানিজ খনিতে, ভূ-তত্ত্ববিদ্ সার্ভেয়ারের অধীনে, জমিদারীতে, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ ইত্যাদিতে চাকুরী প্রাপ্ত হয় এবং মাসে গড়পড়তা ৫০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষীয় কয়লার খনিবিষয়ক আইনের ৩৮ নিয়মের অনুসারে, বেঙ্গল সার্ভে স্কুল, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভারতবর্ষীয় খনিবিষয়ক আইন অনুযায়ী গঠিত বোর্ড অফ্ একজামিনার্স কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই অনুমোদনের সর্ত্ত অনুসারে সার্ভে

ফাইনাল সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিগণ মাটীর নীচে জরিপের কার্য্য হাতেকলমে কাজ করিয়া ৬ মাস অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর, ১০ দফায় উল্লিখিত সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেটের জন্য বোর্ডের পরীক্ষা দিতে অধিকারী হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য খনি জরিপ বিষয়ে আরও একটী বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা আছে। সার্ভে ফাইনাল পাশ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রায় ৮ জনকে (দুইজন মাসিক ২০্ টাকা হিসাবে বৃত্তিসহ) ৬ মাস শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার জন্য বাংলার কয়লার খনিসমূহে প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা স্থগিত আছে।

বেঙ্গল সার্ভে স্কুলে জেলা কাননগুদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হয়; কিন্তু ঐ চাকুরীতে কেবল বিভাগীয় কমিশনারদের ৮ জন মনোনীত ব্যক্তিদিগকেই লওয়া হয়। এই দিক দিয়া বেঙ্গল সার্ভে স্কুলে ভর্ত্তি হইতে হইলে পদপ্রার্থীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ হওয়া ও কমিশনার সাহেবের মনোনয়ন পাওয়া আবশ্যক। কোর্স নভেম্বর মাসে আরম্ভ হয়; ঐ সময়ে, মাসিক ২০্ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয় এবং কোর্স শেষ হইলে তাহারা মাসিক ৭৫্—১৬০্ টাকা বেতনে জেলা কাননগুর পদে নিযুক্ত হয়।

সাব-ওভারসিয়ারী শিক্ষা

যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে নাই তাহাদের জন্য ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী ও বর্দ্ধমানে সাব-ওভারসিয়ারী কোর্স খোলা আছে। কিন্তু

এই কোর্সে, ম্যাট্রিকুলেশন ও তাহার অধিক যোগ্যতাবিশিষ্ট বালকগণ এরূপ সংখ্যায় প্রবেশ করে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ নহে এমন বালকগণ ইহাতে, বিশেষতঃ ঢাকার আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্ত্তি হইতে, বিশেষ বেগ পায়। জুলাই মাসের প্রথম ভাগে সেসন আরম্ভ হয় এবং ভর্ত্তি-প্রার্থীগণকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির না হইলেও পূর্ব্বেই দরখাস্ত করিতে হয়। বেতন ১৷৷৹ হইতে ৬৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং থাকিবার জন্য যে হোষ্টেল দেওয়া হয় তাহাতে অধিকাংশ স্থলে মাসিক প্রায় ১৩৲ টাকা খরচ লাগে। পাঠ্যাবস্থায় কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। দুই বৎসরের কোর্সের পর সাব-ওভারসিয়ারী পাশ ব্যক্তিরা জেলা বোর্ডে, মিউনিসিপ্যালিটিতে ও জমিদারীতে চাকুরী প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ কন্‌ট্রাক্টারের অধীনে কাজ করে এবং পরে নিজেরাই ঐ কাজ করে। প্রথম অবস্থায় চাকুরীতে মাসিক প্রায় ৪০৲ টাকা বেতন পাওয়া যাইতে পারে এবং কন্‌ট্রাক্টরের অধীনে চাকুরীতে বেতনের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই।

সাব-ওভারসিয়ার ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছাত্রগণ ঢাকা আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে আরও দুই বৎসরের জন্য ওভারসিয়ারী কোর্স পড়িতে পারে। বেতন প্রতি মাসে ৭৲ টাকা। কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। কোর্স শেষ হইলে ও পরীক্ষা পাশ করিলে তাহারা ওভারসিয়ার পরীক্ষা বোর্ডের ওভারসিয়ারী সার্টিফিকেট পাইতে পারে এবং জেলা বোর্ডে, মিউনিসি-প্যালিটিতে, জমিদারীতে ও অন্যত্র মাসিক ৫০৲ টাকা বা তদ্রূপ বেতনে আরম্ভ হয় এমন চাকুরী পাইতে পারে; অথবা তাহারা কন্‌ট্রাক্টারের অধীনে কাজ করিতে পারে এবং কালে নিজেরাই কন্‌ট্রাক্টর হইতে পারে। ইহার পরিবর্ত্তে যদি পূর্ত্তকর স্বাস্থ্য-বিভাগ, সেচ বিভাগে বা অপর কোন সুপরিচিত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মে আরও এক বৎসরের জন্য হাতেকলমে কাজ শিক্ষা করে (এই বিষয়টী স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষেরা ব্যবস্থা করিয়া দেন) তাহা হইলে কৃতী ছাত্র পূর্ত্তকর বিভাগের, ওভার-সিয়ারের উচ্চ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয় এবং ভাল ধরণের চাকুরী পাইবার যোগ্য হয়, যথা মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে আরম্ভ পূর্ত্তকর বিভাগের সাবর্ডিনেট ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস। বর্ত্তমানে খুব কম লোকই আছে যাহারা চাকুরী পায় নাই এবং ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের পক্ষে ইহা একটী অতি ভাল পথ।

ঢাকায় রমনার খোলা মাঠে আসানুল্লা ইঞ্জি-নিয়ারিং স্কুল অবস্থিত। এই প্রদেশে যে সকল শিল্প বিদ্যালয় আছে তাহাদের মধ্যে ইহা একটী অতি সুসজ্জিত বিদ্যালয়। এখানকার ছাত্রাবাসে প্রায় ২৮০ জনের ভালভাবে থাকিবার স্থান আছে। ছাত্রদিগকে সাক্ষাতে আহ্বান করিয়া নির্ব্বাচিত করিবার পর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেসন আরম্ভ হয়; কিন্তু ভর্ত্তির দরখাস্ত জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে গ্রহণ করা হয়। প্রিন্সিপালের নিকট দরখাস্ত করিলে (দরখাস্তের) ফরম পাওয়া যায়। প্রত্যেক ছাত্রকেই এক মাসের বেতনের তুল্য ভর্ত্তির ফিস্ ও সাবধানতার জন্য (caution money) ৫৲ টাকা জমা দিতে হইবে। পরীক্ষার ফলদৃষ্টে প্রতি বৎসরই বিভিন্ন শ্রেণীতে বহুসংখ্যক বৃত্তি, বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ, পুরস্কার ও মেডেল দেওয়া হয়।

একটী কাজ সংগ্রহ করিয়া দিবার সমিতি আছে। এই সমিতি ছাত্রদিগকে তাহাদের পাঠ

শেষ হইবার পর কাজ যোগাড় করিতে সাহায্য করে।

কয়লার খনিসমূহে খনি সম্বন্ধে শিক্ষা

যাহারা পূর্ব্ব হইতেই কয়লার খনিতে কাজ করিতেছে তাহাদের জন্য পূর্ণ "কোর্স" উন্মুক্ত। ইহা শেষ করিতে তিন বৎসর প্রয়োজন এবং বাংলাদেশে রাণীগঞ্জ ও সীতারামপুরে উহা শিক্ষা করা যাইতে পারে।

পাঠ্য তালিকা (Syllabus)

প্রথম বৎসর—(১) গণিত এবং
(২) প্রাথমিক বিজ্ঞান।

২য় বৎসর—(১) প্রাথমিক যন্ত্রবিদ্যা (Mechanics)
(২) মেকানিকাল ড্রইং (যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক অঙ্কণ),
(৩) প্রাথমিক খনি জরিপ,
(৪) পদার্থ বিদ্যা ও
(৫) বয়লার্স ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

৩য় বৎসর—(১) কয়লার খনি-বিদ্যার মূলসূত্র সকল;
(২) কয়লার খনিসংক্রান্ত মেকানিকাল ও ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং
(৩) জরিপ।

প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার নাম রেজেষ্টারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৎসরের লেকচারের জন্য মাইনিং লেকচারারকে ৫৲ টাকা ফিস দিতে হইবে। তৃতীয় বৎসরের জন্য ফিস ১০৲ দশ টাকা। এই সমস্ত ফিস আর ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেকচারার সমস্ত কোর্সের ক্লাশের বন্দোবস্ত করিবেন। যাহাতে ক্লাশের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা যাইতে পারে, সে জন্য ছাত্রদের প্রথম সাক্ষাতেই ভর্ত্তি হওয়া কর্ত্তব্য।

শিক্ষার কোর্স প্রায় জুন মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হয় এবং পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি শেষ হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে পরীক্ষা হয়; যে সকল পরীক্ষার্থী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য্যতার উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। লেকচারার বিবেচনা করিলে তিন বৎসর কোর্সের যে কোন সময়ে ছাত্র ভর্ত্তি হইতে পারে কিন্তু যে সকল পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের কোর্স কৃতকার্য্যতার সঙ্গে শেষ করিতে না পারে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না।

নূতন কয়লার খনিবিষয়ক আইন অনুযায়ী সকল কয়লার খনির সার্ভেয়ারদের, সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক। এই নিয়মের জন্য কয়লার খনির সার্ভেয়ারদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এই কাজের বেতন অতি শীঘ্রই আরও বেশী হইবে। এই সমস্ত ক্লাশে সার্ভেয়ারের সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং যাহারা এই সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারে তাহাদের পক্ষে লাভজনক কাজ পাওয়া বিশেষ কঠিন হয় না।

বেঙ্গল সার্ভে স্কুলের যে সমস্ত ছাত্র ঐ সমস্ত শ্রেণীর সার্ভে পরীক্ষা পাশ করে এবং যাহাদের সার্টিফিকেটে খনি জরিপের জন্য পৃষ্ঠলিপি করা থাকে, তাহারা কয়লার খনি-সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিতে পারে।

কয়লার খনির সার্ভেয়াররূপে কাজ করিতে ইচ্ছা না করিলেও যে সকল ব্যক্তির খনির কার্য্যসম্বন্ধে সার্টিফিকেট এবং অভিজ্ঞতা থাকে তাহারা শ্রমিক জগতে কদর অনেক বেশী পায়।

কিন্তু নানা রকমের কার্পেট প্রস্তুতের প্রণালী সবিস্তারে বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কার্পেট শিল্পের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই ইহার অবতারণা। বিলাতে কার্পেট শিল্প অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ড) পঁয়তাল্লিশটি কারখানায় নিয়মিত ভাবে কার্পেট উৎপন্ন হইত। ঐ বৎসর ছিয়াশী লক্ষ দুই হাজার নয়শত গজ কার্পেট এবং র‍্যাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। উহার মূল্য ছিল পনর লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত চব্বিশ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুইকোটি ত্রিশলক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশ' ষাট টাকা।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটের আদর দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। প্রতিবৎসর বহুটাকা মূল্যের কার্পেট বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হয়। এইরূপ রাশি রাশি টাকা প্রতিনিয়তই দেশ হইতে বাহির হইয়া গিয়া দেশ ক্রমশঃই নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে—আমরা ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেছি না।

অনেকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য দেশবাসীকে বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিতেছেন। বলিতেছেন বিলাতি বর্জ্জন কর।

এই সব লোকের উদ্দেশ্য খুব সাধু সন্দেহ নাই এবং তাঁহাদের উপদেশগুলিও শুনিতে বেশ সরল। কিন্তু উপদেশের যথার্থ মূল্য কতটুকু তাহা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

উপদেশ দিবার সময় অনেকেই ভুলিয়া যান যে যাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহারা সাধারণ সংসারী মানুষ মাত্র—দেবতা নয়—গন্ধর্ব্ব নয়, এমন কি মহাপুরুষ বা সাধুসন্ন্যাসীও নয়। তাঁহারা বিস্মৃত হন, যে হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন—একজন; লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও একজন গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন কিনা সন্দেহ। দরিদ্র পিতা, পুত্রের জন্য ভাল জামা কাপড় কিনিয়া দিতে না পারিয়া তাহার নিকট ভাল কাপড় জামা পরিবার অপকারিতা সম্বন্ধে যতই তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করুন না কেন, তাহাতে পুত্রের ভাল জামা কাপড় পরিবার লোভ এতটুকু কমিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। ত্যাগের ধর্ম্ম খুব গৌরবের সন্দেহ নাই। সর্ব্ববিষয়ে সংযম অভ্যাস করা খুবই ভাল—ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা পালন করিতে পারে কয়জন? ইহা পালন করিবার মত শক্তি আছে কয়জনের? সত্য কথা বলিতে কি লাখে একজনও আমরা এরূপ লোক দেখিতে পাই না। কাজেই আমাদের "পূর্ব্ব-পুরুষগণ কত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা বিলাসিতাকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতেন; জুতা পায় না দিয়াও তাঁহাদের দিন বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গিয়াছে, অতএব আমাদের জুতা না হইলে চলিবে না কেন?" ইত্যাদি সহস্র সহস্র সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ বর্ষণ করিলেও তাহা "বেণা বনে মুক্তা ছড়ান"রই ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমরা বলি স্রোতের মুখে বালির বাঁধ বাঁধিয়া লাভ নাই; উহাতে অনর্থক শক্তিক্ষয় হইবে মাত্র; বরং স্রোতকে ভিন্ন পথে প্রধাবিত করিয়া উহার ধ্বংসকরী শক্তিকে সৃষ্টির উপাদানে পরিণত করিতে পারিলে তাহাতেই কিছু মঙ্গল হইবে। একমাত্র "বিলাতি বর্জ্জনেই" ভারতের মুক্তি নাই—ভারতের মুক্তি "স্বদেশী অর্জ্জনে।" বিশেষতঃ স্বদেশী অর্জ্জন করিতে না পারিলে বিলাতি বর্জ্জন করিব কেমন করিয়া? "জুতা পরিবই। বিদেশী কিনিতেছি স্বদেশী নাই বলিয়া।

স্বদেশী পাইলে বিদেশী পরিত্যাগ করিব ; কিন্তু স্বদেশী কিনিতে পাওয়া না গেলে শত শত বার বিদেশী বর্জ্জন করিতে বলিলেও সে কথায় লোকে কর্ণপাত করিবে না। কেননা জুতার আমার প্রয়োজন ; উহা আমার চাই-ই।"—ইহাই জনসাধারণের মনোবৃত্তি। ইহাতে রাগ রোষ করিতে পারেন—গালমন্দ দিতে পারেন—তাহাদিগকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারেন—কিন্তু ইহাতে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না ;—তাহাদের চিরন্তন মনোবৃত্তি অটুট ও অব্যাহতই রহিয়া যাইবে।

তাই বলি তাহাদিগকে বিদেশী জুতা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেওয়ার পণ্ডশ্রম করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে স্বদেশী জুতা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করাটাই অধিকতর কার্য্যকর ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আমি বার বার জুতার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু জুতা বা কোন বস্তু-বিশেষের কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। সাধারণভাবে সমস্ত পণ্যের কথাই আমি বলিতে চাই।

ভারতবর্ষে যে আদৌ কার্পেট প্রস্তুত হয় না, তাহা নহে। এ দেশের কারাগারে ও অন্যান্য স্থানে কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে ; তবে এ দেশের লোকের তাহাতে লাভ নাই। ঐ শিল্পটী সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিকের হাতে। আমাদের দেশের লোকের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বিলাতি এবং অর্দ্ধ-বিলাতি কার্পেটে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। উহার কবল হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে এ দেশেই কার্পেট শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। বলিবেন—"ইহার পথে অন্তরায় অনেক।" অন্তরায় ত থাকিবেই। কিন্তু সে অন্তরায় অতিক্রম করিতে হইবে। উন্নতির পথ কুসুমাস্তৃত নহে—উহা বিঘ্নবহুল—এ কথা ত আবহমান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও চলিয়া আসিতেছে যে Where there is a will, there is a way.—ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

লিনোলিয়াম্

ইণ্ডিয়া রবারের সহিত গ্রাউণ্ড কর্ক বা কর্কের গুঁড়া জমাইয়া, ঐ জমান পদার্থকে রোলারের চাপে পিষিয়া উহাকে কাগজের মত পাতলা পাতে পরিণত করিতে হয়। ঐ পাত শুকাইয়া গেলেই লিনোলিয়াম তৈয়ারি হইয়া গেল। লিনোলিয়াম জলে ভিজিলেও উহাতে জল বসে না, কেননা উহা ওয়াটার প্রুফ্। সকল প্রকার মেজে ঢাকিবার কাপড়ের মধ্যে লিনোলিয়ামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রবার ও কর্ক জমাইয়া লিনোলিয়াম তৈয়ারি করিতে হয় একথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু কেবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট লিনোলিয়াম্ তৈয়ারি করিবার জন্যই ঐ দুইটী পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তিসির তৈল, কাঠের গুঁড়া, খড়ি, পিচ্ প্রভৃতি গালাইয়াও রাশি রাশি লিনোলিয়াম তৈয়ারি হইতেছে। এইগুলি নিকৃষ্ট ধরণের জিনিস বলিয়া, ইহাদের দামও অপেক্ষাকৃত অল্প। লিনোলিয়ামের চাহিদা নিতান্ত অল্প নহে। আজকাল প্রায় সকল দোকানেই দেখিতে পাওয়া যায়, মেজেগুলি উহার দ্বারা মোড়া রহিয়াছে। অন্য কোথাও না থাকিলেও চায়ের দোকান ও সেকরার দোকানে ইহা থাকিবেই। ইহা দেখিতে খুবই সুশ্রী, সহজে ইহাতে স্যাঁতা লাগিতে পারে না—অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তার তুলনায় ইহার মূল্য খুব কম বলিয়া, সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে পছন্দ করে।

অয়েল ক্লথ

শক্ত শণের সূতার ক্যান্ভাস্ দিয়া ইহা তৈয়ারী হইয়া থাকে। খুব মজবুত এবং সুদৃশ্য অয়েল ক্লথের কাপড় প্রস্তুত করিতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয় এবং ইহাতে অনেক সময় লাগে।

ক্যান্ভাসের গায় নিম্নলিখিত ভাবে পেণ্ট লাগাইয়া অয়েল ক্লথ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

প্রথমে ক্যানভাসটীকে একটী ফ্রেমের উপর শক্ত করিয়া আঁটিয়া দাও। ইহার কোন স্থান যেন কোঁচ্কাইয়া না থাকে বা কোন দিক টানিলে যেন আল্‌গা হইয়া না যায়।

তাহার পর ইহার উপর সমান করিয়া এক পর্দ্দা মাড় লাগাইয়া দাও এবং উহা ভিজা থাকিতে থাকিতেই পিউমিস্ ষ্টোন্ (Pumice stone) দিয়া ঘর্ষণ কর। সূতার ফাঁকে ফাঁকে সাইজ প্রবেশ করিয়া ক্যান্ভাসের সমস্ত ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া দিবে এবং পিউমিস্ ষ্টোন্ দিয়া ঘর্ষণ করার দরুণ ক্ষেত্রটীর উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে মসৃণ হইয়া যাইবে।

তৎপরে একটী ভাল কর্ণিকের সাহায্যে (Trowel) এক পর্দ্দা পেণ্ট লাগাইয়া দাও এবং উহা শুকাইয়া গেলে এরূপ ভাবে আরও দুই পর্দ্দা পেণ্ট লাগাও; এখন উহাকে অয়েল ক্লথ্ বলা যায়। ইহাকে চিত্রিত করিতে হইলে তাহাও এই সময় করিতে হইবে। সচরচার কাঠের ব্লকের সাহায্যেই ইহার উপর ছবি ছাপিয়া দেওয়া হয়। নানা রঙের ছবি আঁকিতে হইলে প্রত্যেক রঙের জন্য ব্লক ব্যবহার করিতে হইবে।

মোটামুটি ইহাই অয়েল ক্লথ প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি। ক্যানভাস্ প্রস্তুত করার কথা ছাড়িয়া দিলে তাহার পরের প্রক্রিয়াগুলি খুব দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে যথেষ্ট অভ্যাসের প্রয়োজন করে। কাঠের পালিশ করিয়া যাঁহারা হাত পাকাইয়াছেন তাঁহারা চেষ্টা করিলে অনায়াসে ইহাতে যথেষ্ট লাভ করিতে পারেন।

জুতার কালি

১। এক পাউণ্ড মৌচাকের মোম, ৬ আউন্স নরম সাবান, ¼ পাউণ্ড আইভরি ব্লাক, এক আউন্স প্রুসিয়ান ব্লু, দুই আউন্স তিসির তেল এবং আধ পাইণ্ট তারপিন তেলের সহিত মিশাইবে। এই সকল উত্তমরূপে মিশ্রিত করার পরে একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। ব্যবহারের সময় চামড়ার উপর অল্প একটু লাগাইয়া একটি নরম ব্রাস বা রবার দিয়া ঘষিয়া লইবে।

২। উত্তমরূপে চূর্ণ করা হাড়ের কয়লা, তিসির তেল, লাল চিনি বা চিটা গুড়, ভিনিগার এবং সালফিউরিক এসিড দিয়া একটি মিকশ্চার করিবে। চামড়া পালিশ বা চক্‌চকে করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

পিতল ও কাঁসার ময়লা নিবারণ

(১) ময়লা জিনিসের উপর লিকর এমোনিয়া দিয়া উহা শুক্‌না বালি দিয়া ঘসিলেই পিতল ও কাঁসার জিনিস পরিষ্কার হইবে।

(২) ব্রাস দিয়া বাসনের উপর মিউরিয়াটিক এসিড প্রয়োগ করিবে।

সূতার কাপড় চাঁপার রং করিবার উপায়

কাপড়খানি প্রথমে হীরাকস (sulphate of iron) মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া পরে চুণের জলে ভিজাইলেই চাঁপাফুলের মত রং হইবে।

রুটি তৈরীর বেকিং পাউডার

২ পাউণ্ড ক্রীম অব টার্টার, এক পাউণ্ড সোডা বাই কার্ব উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহা ভাল-ভাবে ছাঁকিয়া লইবে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে পুনরায় উহা গুঁড়া করিবে। তারপর প্রয়োজনমত এক পাউণ্ড ময়দায় দুই বা তিন চামচ গুঁড়া দিবে।

কৃত্রিম তৈলাক্ত পাথর

উত্তমরূপে চূর্ণ করা বালির সহিত অল্প পরিমাণ গলিত লাক্ষা মিশাইবে, তৎপরে উক্ত মিশ্রিত দ্রব্য গরম করিবে, এবং গরম অবস্থাতেই ছাঁচে ঢালিয়া উহাতে খুব চাপ দিবে। তারপর ঠাণ্ডা হইলেই উহা পাথরের মত হইবে। হাতুড়ি দিয়া পিটাইলেও ভাঙ্গিবে না। চাপ দিবার জন্য বই-বাঁধা দপ্তরীদের চাপযন্ত্রের মত কোন যন্ত্র হইলেই চলিবে।

যদি কোন বাক্সের মধ্যে ঢালা হয় তবে গরম শিরীষ ও শুক্‌না লাল সীসা দিয়া উহা ঢালিতে হইবে। ধার করিবার সময় পাথর যাহাতে শক্ত হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য উপযুক্ত পরিমাণ তেল ব্যবহার করিবে। ভেসিলিন অথবা অর্দ্ধেক লার্ড এবং অর্দ্ধেক প্যারাফিন ইহার পক্ষে উপযুক্ত। পাথরের জন্য সাধারণতঃ ভারী পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে পাম, অলিভ, সুইট অয়েল প্রভৃতি মিশাইয়া লইতে হয়।

ক্যানভাসের জুতার সাদা পেষ্ট

তামাকের নল নির্ম্মাণের কিছু সাদা মাটি (pipe clay) চাঁছিয়া একটা প্লেটের উপর রাখিবে। তাহাতে কিছু অক্সালিক এসিড যোগ করিবে, পরে সামান্য নীল মিশাইয়া গরম জল ঢালিতে থাকিবে। যখন 'পেষ্ট' টি প্রয়োজনানুযায়ী কাদার ন্যায় হইবে, তখন উহা একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে। যদি দেখা যায় যে পেষ্ট খুব সাদা হয় নাই তবে অক্সালিক এসিড গুলিয়া যাইবার পরে অল্প কিছু buffball চাঁছিয়া উহার সহিত মিশাইয়া দিবে।

এই পেষ্ট প্রথমে জুতার উপর ঘষিয়া দিবে, শুকাইয়া গেলে আবার ঘষিয়া উঠাইবে। তারপর খুব আস্তে তাহার উপর ব্রাস দিবে।

কৃত্রিম শ্লেট

এক কোয়ার্ট মেথিলেটেড স্পিরিটে ৪ আউন্স গলিত লাক্ষা মিশাইয়া ১½ আউন্স flour emery, ২ আউন্স আইভরি ব্লাক, এবং এক আউন্স ultramarine blue চূর্ণ করিবে। এই সলিউশন ব্যবহারের পূর্ব্বে বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া লইবে। উহা একখানি প্লেট বা থালায় ঢালিয়া লইয়া একটি ব্রাস দিয়া কার্ডবোর্ডের উপর লেপিয়া দিবে। কার্ডবোর্ডের গাত্র যদি সচ্ছিদ্র (porous) হয় তবে প্রথমে পাতলা করিয়া এক পোঁচ সলিউসন লাগাইবে।

পাতিহাঁসের চাষ

ভারতের অনেক স্থানেই পাতি হাঁস বিক্রীত হইয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই পাতি হাঁস ও হাঁসের ডিম খাইয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি রকম করিয়া পাতিহাঁসের চাষ করিতে হয়, কি ভাবে পাতি-হাঁস পালিতে ও পুষিতে হয়, তাহা আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না। তাহার ফলে এ দেশের হাঁস আকারেও বড় হয় না এবং বেশী দিন বাঁচেও না।

যে সমস্ত ইউরোপায় মফঃস্বলে থাকেন তাঁহাদিগকে খাদ্যের জন্য অনেক পরিমাণে মুর্গী ও হাঁসের মাংসের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই তাঁহারা আপনাপন বাসায় অনেক মোরগ মুর্গী ও হাঁস পুষিয়া থাকেন। পাঁড়াগায়ে ছোট আকারের পাতিহাস সংখ্যায় অনেক পাওয়া যায় এবং উহার মূল্যও সস্তা; কিন্তু তাই বলিয়া এই ছোট জাতীয় হাঁসকে বড় করিবার চেষ্টা করা অন্যায় নহে। ভারতে হাঁসের বংশ বৃদ্ধি ও উহা পালন করা আদৌ কঠিন কাজ নহে; ভারতের অধিকাংশ স্থলে নদী, পুকুর প্রভৃতি থাকায় ইহাদিগকে পোষাও অতি সহজসাধ্য। হাঁসের জন্য ঘর তৈয়ারী করিতেও অধিক খরচ পড়ে না; হাঁসের খাদ্য শস্য কেনাও সস্তা; কাজেই পাতিহাঁসের চাষের পক্ষে ভারতবর্ষই অতি প্রকৃষ্ট স্থান।

সাঁতার দিতে পারে এইরূপ যে কোনও জলাশয়ে হাস বড় হইতে পারে। যে জলাশয়ে স্রোত বহে, হাঁসের পক্ষে সেইরূপ জলাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। তবে গ্রীষ্মকালে জল শুষ্ক না হয়, এরূপ পুষ্করিণীতেও হাঁস বৃদ্ধি পায়। এমন কি যেখানে নদী কিংবা পুকুর নাই, সেখানেও হাঁস বাড়িতে পারে, যদি উহাদের স্নানের জন্য বড় চৌবাচ্চার ব্যবস্থা করা যায়। চৌবাচ্চার জল দিনের মধ্যে তিনবার করিয়া বদলান প্রয়োজন। হাঁসের চাষ করিলে সে টাকা বৃথা যায় না। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট এক জোড়া হাঁস ৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা জোড়ায় কিনিলেও এক বৎসরে তাহার চতুর্গুণ দাম উঠিয়া যায়।

পাতিহাঁসের ঘর ও উঠান

কোন পুকুরের ধারে পাতিহাঁসের জন্য ঘর প্রস্তুত করিতে হয়। উঁচু জমিতে ঘর প্রস্তুত করা দরকার। পুষ্করিণীতে ঘন ঘন সাঁতার
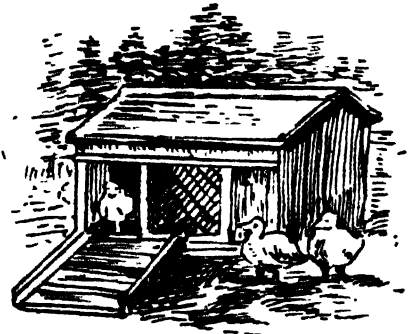
হাঁসের ঘর

কাটিতে না পারিলে পাতিহাঁসেরা কখনই ডিম পাড়ে না।

পাকা কিংবা কাঁচা খড়ের ঘর হইলেই যথেষ্ট। বার ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া এবং আট ফুট উচ্চ ঘরে ২৪টি বড় বড় পাতিহাঁস থাকিতে পারে। পাতিহাঁসেরা বড় শীঘ্র শীঘ্র ঘর অপরিষ্কার করিয়া ফেলে, কাজেই বেশী-সংখ্যক হাঁস একত্র না রাখাই ভাল। প্রশস্ত ঘর ও প্রচুর বায়ু হাঁসের পক্ষে নিতান্ত দরকার; যাহাতে ঘর পরিষ্কার থাকে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাতিহাঁসের সহিত মোরগ কিংবা অন্য পাখী রাখিবে না।

বাংলা দেশের পক্ষে ঘরখানি দক্ষিণ-মুখো হওয়া দরকার এবং তারের দরজা থাকা দরকার। ঘরের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দেওয়াল থাকিবে, তবে দেওয়াল ও ছাদের মধ্যে অন্ততঃ একফুট ফাঁক থাকা দরকার। তারের জালদ্বারা এই ফাঁক এমন ভাবে আবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে অন্য কোন প্রাণী কিংবা চোর প্রবেশ করিতে না পারে। ঘরের মেঝে সীমেণ্ট দিয়া করাই ভাল এবং দরজার দিকে ঢালু হইলে ধৌত করিয়া জল বাহির করিবার সুবিধা হয় এবং শীঘ্র উহা শুষ্ক হইয়া যায়। ঘরের মেঝেতে পরিষ্কার বালু ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর নরম —শুষ্ক ঘাস ছড়াইয়া দিলে হাঁসগুলির বিশ্রাম করার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

উঠান—পাতিহাঁসের ঘরের সম্মুখের কিয়দংশ তারের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে। ২০×২৪ ফুট পরিমিত ঘেরা উঠান ২৪টি

পাতিহাঁসের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বেড়াইবার পক্ষে যথেষ্ট। বেড়ার তার ৬ ফুট উচ্চ হওয়া দরকার। বেড়ার উপরটাও তার দিয়া ছাইয়া দিতে হইবে। তাহা না করিলে চিল, কাক প্রভৃতি পাতিহাঁসের বাচ্চা ও ডিমগুলি লইয়া যায়। পাতিহাঁসেরা পুকুরে যাইবার পূর্ব্বে বাচ্চাগুলিকে উঠানে রাখিতে হইবে। অতি প্রত্যুষেই পাতিহাঁসগুলিকে উঠানে ছাড়িয়া দেওয়া দরকার। বেলা ১০টা পর্য্যন্ত তাহারা উঠানে খাইয়া তারপর পুকুরে যাইবে। উঠানও বালি কিংবা মাটী দিয়া এরূপ ভাবে শক্ত এবং ঢালু করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকারে জল জমিতে না পারে।

পুষ্করিণী—পাতিহাঁসদের জন্য যদি পুষ্করিণী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উঠানের মধ্যে ছোট খাট একটি জলাশয় খনন করিয়া দিবে। এরূপ ক্ষেত্রে উঠানের আকার ২৫ ফুট প্রশস্ত ও ১২৫ ফুট চওয়া দরকার। ২৪টি হাঁসের পক্ষে এরূপ উঠান যথেষ্ট এবং এরূপ উঠানে ১২ ফুট লম্বা ও ৬ ফুট চওড়া এবং ৩ ফুট গভীর পুকুর অনায়াসে খনন করা যাইতে পারে। পুকুরের একপার্শ্ব ঢালু হইলে হাঁসেরা অনায়াসে পুকুরে উঠা নামা করিতে এবং বেড়াইতে পারে। এইরূপ পুকুর পরিষ্কার জল দিয়া ভর্ত্তি করিতে হয় এবং প্রতি সপ্তাহে জল বদলাইয়া নূতন জল দিতে হয়। পুকুর হইতে একটি নালা কাটিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার। কারণ সেই নাল দিয়া ময়লা জল উঠান হইতে বহু দূরে চলিয়া যাইবে। ময়লা জল কখনও উঠানে থাকিতে দিবে না; সপ্তাহে একবার ইহা নালা দিয়া বাহির করিয়া দিয়া আবার নূতন জলে ভর্ত্তি করিয়া দিবে; নচেৎ হাঁসগুলি অসুস্থ হইয়া মারা যাইবে। কিন্তু এই ময়লা জল চাষের জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। হাঁসের মলমিশ্রিত এই জল চাষের জমিতে দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উঠানের মধ্যে যে পুকুর তৈয়ারী করা হইবে, তাহার নীচে প্রচুর পরিমাণে শ্যাওলা,পাথরের কুচি এবং শামুক রাখিলে হাঁসের খাদ্যেরও জোগাড় হইবে।

নানা জাতীয় পাতিহাঁস

চালা—বড় বড় হাঁসেদের বৃষ্টি বাদলের সময় কোন চালার নীচে দাঁড়াইবার দরকার হয় না;

ইহারা বর্ষার জলধারা মাথা পাতিয়া লইতে পারে, কিন্তু দ্বিপ্রহরের রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। যদি উঠানে কোন গাছ, পালা,বা ঝোপ না থাকে, তাহা হইলে উঠানের উপর কোন একটা চালা (shade) তুলিয়া দিতে হইবে। উঠানে আম, কাঁঠাল অথবা অন্য কোন প্রকার গাছ পালা, লতা গুল্ম রোপণ করা ভাল, তাহাতে উহারা ছায়া পায়। নেবু কিংবা নিম গাছ কাছাকাছি রোপণ করিলেও বেশ ছায়া হয়।

নানাজাতীয় পাতিহাঁস

নানাজাতীয় পাঁতিহাঁস আছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি দেখিতে খুব সুন্দর বটে; কিন্তু তাহারা মানুষের কোন কাজে লাগে না। এ স্থলে প্রধান প্রধান সাত প্রকার হাঁসের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে, ভারতবর্ষে ইহাদের চাষ করা যাইতে পারে।

আলেস্‌বেরী হাঁস—আলেস্‌বেরী

আলেস্‌বেরী হাঁস

ইংলণ্ডের অন্তর্গত একটি সহর। এখানে প্রভূত পরিমাণে পাঁতিহাঁসের চাষ হইয়া থাকে, এজন্য তত্রত্য হাঁসকে আলেস্‌বেরী হাঁস বলে। আলেস্‌বেরী হাঁসের ডানা একেবারে দুধের মত সাদা, ইহার পা কমলা লেবুর রংয়ের, মত রং, কিন্তু রৌদ্র লাগিলে ইহাদের ঠোঁট হল্‌দে রংয়ের হইয়া যায়। এই জাতীয় হাঁসের আকার লম্বা ও চ্যাপ্টা এবং পালকগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট। আলেস্‌বেরী হাঁস খাইতে অতি সুস্বাদু। হাঁস সাধারণতঃ ওজনে ৭ পাউণ্ড (৩।০ সের) ও হংসীরা ওজনে ৬ (৩ সের) পাউণ্ড
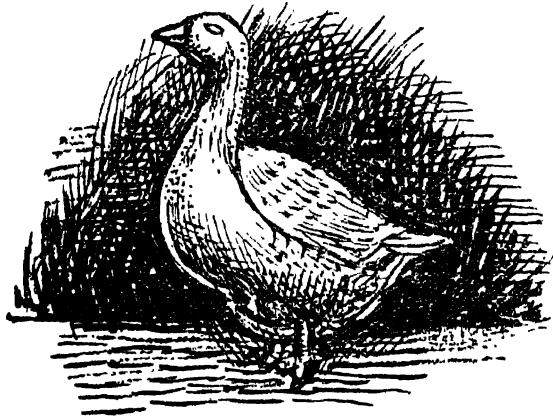
পরিচ্ছন্নতা—হাঁসদের খাদ্য, ঘর, উঠান ও জলাধার যেন অতি পরিষ্কার অবস্থায় রাখা হয়; নচেৎ হাঁসেরা বাড়ে না, শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া মারা যায়। বাড়ী ও উঠান প্রত্যহ ঝাঁট দিয়া সাফ করিয়া দিতে হইবে। রোজ না পারিলে হাঁসেদের ঘর সপ্তাহে অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। উঠানের মাটী বৎসরে দুইবার খুঁড়িয়া ওলট পালট করিয়া দিতে হইবে। ঘরের মেজেয় খড় বা ঘাস প্রত্যেক সপ্তাহান্তর বদলাইয়া দিতে হইবে এবং মেজেতে ফিনাইল ছড়াইয়া দিতে হইবে।

হয়। কোন কোন হাঁস ওজনে অবশ্য ইহা অপেক্ষা বেশী হইয়া থাকে। একবার প্রদর্শনীতে ২০ পাউণ্ডেরও বেশী ওজনের এই জাতীয় এক জোড়া পাতিহাঁস দেখান হইয়াছিল। খুব মোটা হংসীর ডিম বেশ বলকারক হয় না। গর্ভ উৎপাদনের জন্য ১২ হইতে ১৪ মাস বয়সের হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, অথচ কর্ম্মঠ হংসই ভাল। আলেস্‌বেরী হাঁস অতি

পিকিনের হাঁস

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এক একটা হাঁস ইংলণ্ডে ৭ শিলিং হইতে ২১ শিলিং পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হয়। এই জাতীয় প্রথমশ্রেণীর হাঁস ২১ শিলিং এর কমে পাওয়া যায় না; আবার কোন হাঁসের প্রত্যেকটি ৩ পাউণ্ড মূল্যেও বিক্রীত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে কোন কোন জাতীয় হাঁস ৩ পাউণ্ড হইতে ২০ পাউণ্ড দরে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি বিক্রীত হয়।

কিন্তু এদেশে—৫—১০৲ টাকা মূল্যে অতি উত্তম পাতিহাঁস পাওয়া যাইতে পারে।

পিকিনের হাঁস—পিকিনের হাঁস দুধের সরের ন্যায় সাদা এবং আকারে আলেস্‌বেরী হাঁসেরই ন্যায়। প্রথমতঃ এই হাঁস চীনদেশে জন্মগ্রহণ করে, তারপর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইহার চাষ হয়। পিকিনের হাঁসের পীতবর্ণের ঠোঁট এবং পা এবং আলেস্‌বেরীর পাতিহাঁস অপেক্ষা আকারে ইহা স্বতন্ত্র। ইংলণ্ডের মোরগের ন্যায় ইহার পালক সকল আলগা। খাইতে এই হাঁস তত সুস্বাদু নহে; তবে আলেস্‌বেরীর পাতিহাঁস অপেক্ষা ইহা অপেক্ষাকৃত ভাল ডিম পাড়ে।

একটি হাঁসের ওজন ৭ প্রায় পাউণ্ড এবং পাতিহংসীর ৬ পাউণ্ড। তবে অনেক হাঁসের ওজন এত হয় না। পিকিনের হাঁস আলেস্‌বেরীর হাঁসের চেয়ে অধিক কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী এবং সহজে পোষ মানে। ইংলণ্ডে এক জোড়া পিকিনের হাঁসের মূল্য ১৫—২৫ শিলিং এবং প্রথম শ্রেণীর পিকিন হাঁসের মূল্য ২—২৩ পাউণ্ড এদেশে ৫—১০, টাকা দিলে ভাল হাঁস পাওয়া যাইতে পারে।

রাওয়েন—যত প্রকার পাতিহাঁস আছে, তন্মধ্যে রাওয়েনের পাতিহাঁস সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং দেখিতে সুন্দর। ইংলণ্ডে এই হাঁসের বহুল চাষ হয়। ইহার মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু।
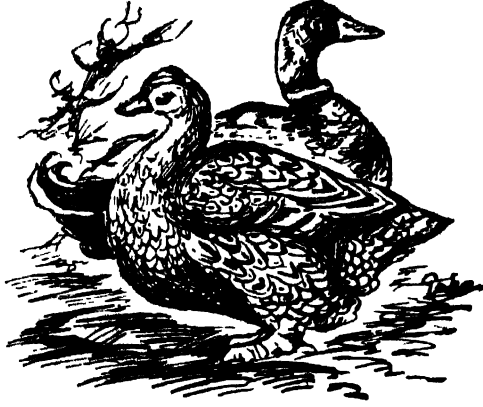
রাওয়েন্

রাওয়েন হাঁসের মাথা ও পিঠ ঝক্‌ঝকে সবুজ বর্ণের, গলায় চারিদিকে সাদা গোলাকার দাগ। বুকটা মদের রংয়ের ন্যায়। পায়ের রং কমলা লেবুর রংয়ের ন্যায়, এবং ঠোঁট সবুজাভ পীত
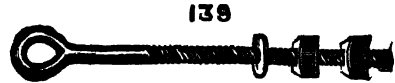
বর্ণের। শরীরের নিম্নভাগটা—ধূসর বর্ণের এবং মাথার নীল ও সাদা রেখা থাকায় ইহা অতি সুন্দর দেখায়।

পাতিহংসী হংসের স্থায় না হইলেও দেখিতে তুল্য সুন্দরী; ইহারা আলেস্‌বেরী হাঁসেরই স্থায় পুরা মূল্যে বিক্রীত হয়; প্রদর্শনীতে কোন হাঁসের প্রত্যেকটি ১০—১৫ পাউণ্ড মূল্যেও বিক্রীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ৫—১০৲ টাকা মূল্যে ভাল হাঁস কিনিতে পাওয়া যায়।

ইহার আকার আলেস্‌বেরীর হাঁসের মত। পিকিন হাঁসের চাষ ইংলণ্ডে যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে। ভারতবর্ষে এই জাতীয় হাঁস অধিক নাই। ইংলণ্ডে এই জাতীয় যে হাঁস পাওয়া যায়, তাহা আমেরিকার হাঁসের স্থায় দেখিতে সুন্দর, আকারে বড় হয়। ভারতবর্ষে ভাল হাঁস ৫—১০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। যদি ইংলণ্ড হইতে কেহ এই হাঁস

কায়ুগা
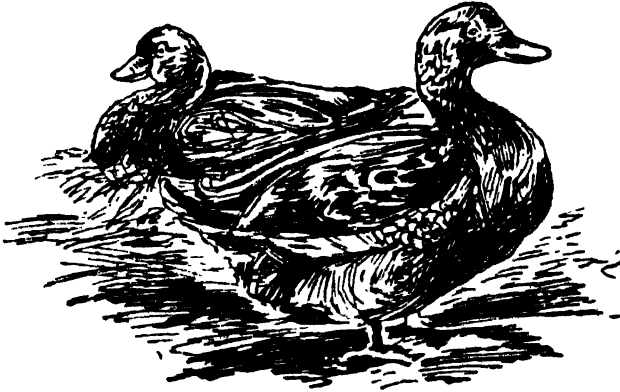
কায়ুগা হাঁস—কায়ুগা হাঁসের আমেরিকা দেশে জন্ম বলিয়া কথিত হয়। অনেকের বিশ্বাস রাওয়েন, আলেস্‌বেরী ও ভারতীয় কালা হাঁস এই তিন জাতীয় হাঁসের সংমিশ্রণে ইহার জন্ম হইয়াছে। এই জাতীয় হাঁসও যে দেখিতে অতি সুন্দর ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই হাঁস কাল, তবে কায়ুগা হাঁসের মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে ও ডানায় চক্‌চকে সবুজ আভা আছে। ইহার মাথা বড় ও গোলাকার, ঠোঁট চওড়া ও চ্যাপ্টা এবং কাল ঝুলের মত রং বিশিষ্ট, পদদ্বয় ও পদতলের রং ও ঝুলের মত কালো। কায়ুগা হাঁস খুব ডিম পাড়ে, ইহার মাংস খাইতে অতি সুস্বাদু।

ভারতে আমদানী করে, তাহা হইলে ভারতে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে।

মাস্‌কভি হাঁস

মাস্‌কভি হাঁস দক্ষিণ আমেরিকায় জাত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা বহুল পরিমাণে দেখা যায়। কাজেই উহার বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা বড় জাতীয় হাঁস; হংসী অপেক্ষা হাঁস অত্যন্ত বড়; ওজনে হাঁস ৭—৯ পাউণ্ড,আর হংসী ৪—৫ পাউণ্ড পর্যন্ত। মাস্‌কভি হাঁস মোটামুটি মন্দ ডিম পাড়ে না, খাইতেও সুস্বাদু। পরিণত

বয়সে ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়; কিন্তু আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা বাড়ে না।

সাদা, কালা, সাদা ও কালা রং মিশ্রিত, সাদা ও হলদে অথবা ধূসর প্রভৃতি নানা বর্ণের ঝগড়াটে; কাজেই অন্যান্য হাঁসেরা তাহাদের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হয়। যদি পুরুষ গুলিকে স্বতন্ত্র রাখা যায়, তাহা হইলে তাহারা বেশ ঠাণ্ডা থাকে।
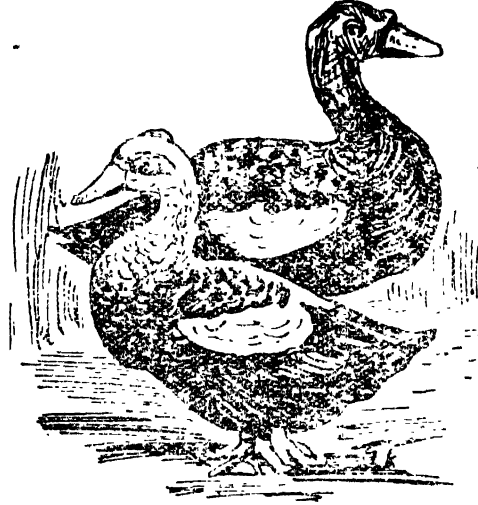
মাস্‌কভি

মাস্‌কভি হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। ৫-১০ টাকা দিলে এই জাতীয় হাঁস ভারতের যে কোন অংশে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যে গুলি

ভারতীয় রানার

রানার জাতীয় হাঁসকে অনেকে ভারতীয় হাঁস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তবে
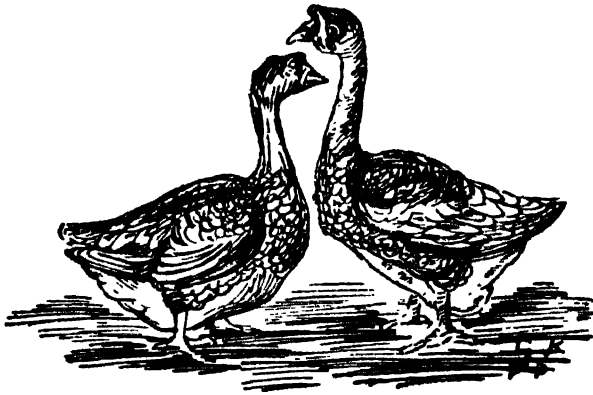
ভারতীয় "রানার"

একেবারে সাদা সে গুলি দেখিতে অতি সুন্দর; এই হাঁসের মধ্যে পুরুষ হাঁস গুলি অত্যন্ত

কেহ কেহ আবার বলেন যে পিকিনের হাঁস ও ভারতীয় সাধারণ পাতি হংসীর সংমিশ্রণে ইহার

উৎপত্তি। কলিকাতায় এইজাতীয় কিছু পাতিহংসী আছে। লোকে ইহাদিগকে "বোম্বাই হাঁস" বলে।

ভারতীয় রানার আলেস্‌বেরী অথবা পিকিনের হাঁসের চেয়ে আকারে ছোট এবং ইহার শরীর লম্বা ও গোলাকার, গলা লম্বা; পাগুলি খুব দৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ এবং সোজা হইয়া চলে। ইহারা দৌড়াইয়া চলে বলিয়া ইহাদিগকে "রানার" বলে। ইহারা প্রচুর পরিমাণে ডিম পাড়ে। ভাল রানার ৩—৫, টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

অরপিংটন্

এই হাঁস দুই প্রকার। (১) ঈষৎ পীতাভ (২) নীলবর্ণ। ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং অর্থকরী হাঁস! ইহারা ভয়ানক পরিশ্রমী

তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং অতি সহজে পোষ মানে। ইংলণ্ডের অরপিংটন নামক স্থানের মিঃ উইলিয়ম্ কুক্, আলেস্‌বেরী, ইণ্ডিয়ান রানার, রাওয়েন ও কায়ুগা হাঁসের সংমিশ্রণে এই হাঁস উৎপন্ন করেন। অরপিংটন হাঁস আকারে আলেস্‌বেরী ও পিকিংএর

অরপিংটন

হাঁসের মত। ইহারা খুব খাইতে পারে এবং এক গামলা জল হইলেই সন্তুষ্ট থাকে। ভারতবর্ষে ইহাদের কতকগুলি নমুনা আনা হইয়াছে। ইহারা ইংলণ্ডে আলেস্‌বেরী ও পিকিংএর হাঁসের ন্যায় দরে বিক্রীত হয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে যে সাত প্রকারের ভাল প তিহংসী পাওয়া যায়, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কোন জাতীয় হংস হংসীর সংমিশ্রণে কিরূপ হাঁস উৎপন্ন হয়, এইবার তাহা বলা যাইতেছে। আলেস্‌বেরীহংস ও পিকিংএর হংসীর সংমিশ্রণে খুব বড়, বলবান হংসীর সৃষ্টি হয়, এবং তাহারা ভাল ডিম পাড়ে। ইহা দের রং, রাওয়েন এবং আলেস্‌বেরী, অথবা পিকিংএর হাসের মিশ্রিত রং হয়।

পিকিংএর হাঁস ও আলেস্‌বেরী হংসীর এবং আলেস্‌বেরী হংস ও পিকিএের হংসীর সংমিশ্রণে খুব বড় সুস্বাদু হাঁস উৎপন্ন হয়। ইহাদের কাহারও আকার আলেস্‌বেরী হাঁসের ন্যায় এবং কাহারও বা পিকিংএর হাঁসের ন্যায় হয়।

(ক্রমশঃ)

পাটের সমস্যা

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া পাটের সমস্যা আরো তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে—সভা-সমিতিতে কাউন্সিলে, মহাজনের বৈঠকে ইহা লইয়া বিপুল বিতর্ক উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে অনেক দিন পর্য্যন্ত হইবেও। বাংলার পাটের ঐশ্বর্য্য একদিন বাংলার কৃষাণদের ঘরে ঘরে অন্ন বস্ত্র বিলাইয়া যাইত, আজ তাহাদের ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে! মেষ্টন অ্যাওয়ার্ডের কৃপায় পাট শুল্কের সমস্ত অর্থ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লইতেছেন; ইউরোপীয়ান কলের মালিকরা তাহাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে কোটি কোটি টাকা জমাইয়াছেন। কিন্তু যে নিঃস্ব অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাংলার কৃষকেরা ভারত গবর্ণমেণ্টকে সচল রাখিয়াছে ও পাট কলওয়ালাদের রাজপ্রাসাদ গড়িয়া দিতেছে, আজ তাহাদের স্থান কোথায়? দেশ-জোড়া এই দুর্ভিক্ষের সময় কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সত্য বটে যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অভিধানে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দেশের অধিবাসীদিগকে এই নিরন্ন কৃষকদের কথা আর বেশীদিন ভুলিয়া থাকিলে কি সত্যিকার মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হইবে না?

যে সংহতি শক্তির অভাবে বাংলার কৃষকেরা মহাজন, দেশী ও বিদেশী কলওয়ালাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছে, আজ কড়াহাতে তাহার অবসান করিয়া দিতে হইবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যথিত দৃষ্টি একবার তাহাদের দুঃখ দৈন্যের দিকে পড়িয়াছিল; তিনি একটী দেশী বোর্ডের হাতে সমস্ত পাটের ব্যবসা কেন্দ্রীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হইলে মিলওয়ালাদের ইচ্ছানুরূপ মূল্য হাঁকিবার সম্ভাবনা লোপ পাইত। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে। "কথার চোটে" অনেক "কেল্লা ফতে" হইয়াছে, প্ল্যাটফর্ম্ম বক্তৃতাতেও তুবড়ী অনেক ফুটিয়াছে—কিন্তু বাঙালী কৃষকদের অবস্থা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং'ই রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের একবেলার জায়গায় দুইবেলা আহার জোটে নাই।

এই সময়ে ইউরোপীয় কলওয়ালারা ঢিলে দুই পাখী মারিবার এক চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জের কথাই ধরুন। এখানে প্রায় ৪০টী পাটের আফিস এবং এজেন্সী আছে; তথায় বেশীর ভাগই ইউরোপীয়ানদের, ১০টী মারওয়াড়ীদের, শুধু ২।৩ টী বাঙ্গালীদের। ইউরোপীয়ানদের প্রায় সকলেই এসোসিয়েসন মিলস্ নামক সমিতির প্রতিনিধি, মাড়োয়ারীরা উহার সংশ্রবে আসা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। যুদ্ধের শেষ দিক দিয়া অনেক ছালা ও চট্ জমা রহিয়া গিয়াছিল; তারপরে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া সস্তায় মাল তৈয়ার করিয়া পৃথিবীর ব্যবসায় কেন্দ্রগুলি—যুদ্ধের ফাঁকে যাহা অন্যান্য দেশের হাতে চলিয়া গিয়াছিল—তাহা পুনরায় অধিকার করিয়া

লইবার জন্য দেশেদেশে প্রতিযোগিতা সুরু হয়। সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া মালপত্রের, নানারূপ দ্রব্যসম্ভারের বন্যা বহিয়া চলিল—কিন্তু কিনিবার লোক খুব কম দাঁড়াইল। আর্থিক দুরবস্থা, ব্যবসায়ে মন্দা, পৃথিবীব্যাপী টারিফ্-সংগ্রাম প্রভৃতি কারণে মাল জমিয়াই যাইতে লাগিল; কিন্তু উৎপন্নের অনুপাতে ক্রেতা বেশী জুটিল না!

এই দুর্দ্দিনে যাহারা শুধু পাট আবাদের উপরই জীবিকার সংস্থান করিতে চাহে, তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইণ্ডিয়ান জুট্ মিল্‌স্ এসোসিয়েসন তাই ঠিক করিলেন যে তাঁহারা পূর্ব্বের মত ৬০ ঘণ্টা কাজ না করিয়া মাত্র ৪০ ঘণ্টা মিল চালাইবেন। ইহার ফল এই হইবে, যে, জিনিষ কম প্রস্তুত হইতে থাকিবে এবং বাজারে উহার দামও চড়া থাকিবে। সকলের চেয়ে সর্ব্বনেশে কথা এই যে, মিলওয়ালা-দের হাতে অনেক পাট মজুদ রহিয়া গিয়াছে; যদি তাহারা আর পাট ক্রয় না করেন তাহা হইলে কেবলমাত্র যে পাটের বাজারই নষ্ট হইবে তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় কৃষকদেরও সর্ব্ব-স্বান্ত হইতে হইবে। ইণ্ডিয়ান জুট্ মিল্‌স্ এসোসিয়েসন চাহেন, যে, তাহাদের মত নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য ভারতীয় কলের মালিকরাও পাট ক্রয় বন্ধ করুক, ৪০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করুক এবং তাহাদের মূলনীতি-গুলি মানিয়া চলুক!

যে-সমস্ত ভারতীয় কলের মালিকগণ ইউ-রোপীয়ান সমিতির তাঁবে আসেন নাই, তাঁহারা ১০৫ ঘণ্টা করিয়া কাজ চালাইতেছেন। এইরূপে তাঁহারা ইউরোপীয় মিলওয়ালাদের দাম বাড়াই-বার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদিগের ক্ষতি করিয়া আবার ১০৫ ঘণ্টাই কাজ করাইতেছেন। এই কারণের জন্যই উভয় পক্ষের মধ্যে একটা রেষারেষি ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-সমস্ত মিল্ এসোসিয়েসনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহারা বলে যে কাজের সময় আরো কমাইয়া দিলেই যে বাজারের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে তাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। সত্যি কথা এই যে, সমিতির অন্তর্ভুক্ত কলওয়ালারা সম্মুখ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে ভরসা পান না বলিয়াই এইরূপে এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

গত বৎসর সমিতি-বহির্ভূত মিলওয়ালারা পাট ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই পাটের বাজার বজায় ছিল; নতুবা পাটের বাজারের সঙ্গে-সঙ্গেই কৃষকদেরও চোখে অন্ধকার দেখিতে হইত। সকল কলের মালিকরা একজোট হইয়া যদি কাজের সময় কমাইয়া দেন, তাহা হইলে দেশের হাহাকার বাড়িবে বই কমিবে না; কৃষকদের দুরবস্থা আরো বাড়িয়াই চলিবে। সমিতির বাহিরের কলওয়ালারা মনে করেন যে ইউরোপীয়ানদের দাবীর চালের মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। যদি তাহাদের হাতেই কিস্তিমাৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে দরিদ্র এবং নিরন্ন বাংলার কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয় হইবে, কলওয়ালারা দাম ইচ্ছামত কমাইতে পারিবে, ভারতে এবং বহির্ভারতে তাহাদের একচেটিয়া প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তাহারা অনেক বছর

ধরিয়া ব্যবসা করিয়া রিজার্ভ ফণ্ডে যে কোটি-কোটি টাকা জমাইয়াছেন, তাহাতে ৮।১০ বৎসর ব্যাপি ব্যবসায়ের দুর্দ্দিন তাঁহারা অনায়াসেই কাটাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নবগঠিত ভারতীয় কলওয়ালারা আজ কয়েক বৎসর মাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের রিজার্ভ ফণ্ড ইত্যাদি উঁহাদের তুলনায় একরূপ কিছুই হয় নাই। যদি ইউরোপীয় কলওয়ালাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সময়ের বহর কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতীয়েরা তো টিকিয়া থাকিতেই পারিবে না, কৃষকদেরও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কোন প্রকার আইন কিংবা অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়, তাহা হইলে উহা বাংলার কৃষকদিগের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই হওয়া উচিৎ। পাট আবাদের জমি কমাইয়া দেওয়া, দাম নির্দ্ধারণ করা, পাটের গুণানুযায়ী তারতম্য নির্দ্ধারণ করা, কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ এবং শিক্ষিত করিয়া তোলাই উহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। নচেৎ কেবল মিলওয়ালাদের স্বার্থের কথা ভাবিতে গেলে দেশব্যাপী এই দুঃখদুর্দ্দিন জনিত অশান্তি কেবলই বাড়িয়া চলিবে। মিলওয়ালারা বহু কাল ধরিয়া লাখ

লাখ টাকা লাভ খাইয়াছে এবং রিজার্ভ গঠন করিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র কৃষক কেবল পেটে খাইয়াই পাট উৎপন্ন করিয়া দিয়াছে। বহু-কালের অর্জ্জিত রিজার্ভের বলে ইহারা এরূপ পাঁচ দশটা দুর্বৎসর হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু এরূপ দুর্বৎসর আরও কিছুদিন থাকিলে কৃষক ও শ্রমজীবির আর অস্তিত্বই থাকিবে না।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাট চাষের অবস্থা

গত আগষ্ট মাসে পাটের অবস্থা সম্বন্ধে জেলা কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে নিম্নলিখিত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন :—

২৪ পরগণা—পাটের সাধারণ অবস্থা ভাল। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় পাটের পক্ষে আরও ভাল হইয়াছে। ব্যারাকপুর অঞ্চলে পাট প্রায় ৫ ফুট এবং বসিরহাট অঞ্চলে ৫-৭ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। শস্যের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। ব্যারাকপুরে পাট "জাগ" দেওয়ার জলের অভাব ঘটিয়াছে।

নদীয়া—আবহাওয়া পাটের অনুকূল। শস্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। এখনও 'নিড়ান' চলিতেছে। পাটকাটা আরম্ভ হয় নাই। পাট "জাগ" দেওয়ার জল যথেষ্ট রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ—শস্য খুব ভাল হইয়াছে। আবহাওয়াও পাট বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। সদর মহকুমা অঞ্চলে কিছু পাট পোকায় কাটিয়াছে। গাছগুলি ৪-৬ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে; এখনও কাটা আরম্ভ হয় নাই। "জাগ" দেওয়ার জলও প্রচুর রহিয়াছে।

যশোহর—পাটের অবস্থা সন্তোষজনক। ফসল প্রায় পাঁচ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। এখনও কাটা আরম্ভ হয় নাই। "জাগ" দেওয়ার জল প্রচুর রহিয়াছে।

খুলনা—পাট ৫-৫৷০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। অল্প পরিমাণে কাটা আরম্ভ হইয়াছে। "জাগ" দেওয়ার জলেরও অভাব নাই। মোটের উপর পাটের অবস্থা ভাল।

বর্দ্ধমান—আবহাওয়া পাটের অনুকূল। ফসলের অবস্থাও সন্তোষজনক। গাছ ৩-৫ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। এখনও কাটা আরম্ভ হয় নাই।

মেদিনীপুর—পাটের অবস্থা ভাল। বৃদ্ধি সন্তোষজনক। আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন।

হুগলী—পাটের বৃদ্ধি মোটেই সন্তোষজনক নহে। এখনও ৩-৪ ফুটের বেশী উঁচু হয় নাই। "জাগ" দেওয়ার জল প্রচুর রহিয়াছে। আবহাওয়া অনুকূল। এখনও পাট কাটা সুরু হয় নাই।

রাজসাহী—আবহাওয়া অনুকূল। ফসলের অবস্থা ভাল। শস্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। সদর মহকুমা ছাড়া সর্ব্বত্রই "জাগ" দেওয়ার জলের খুব অভাব। দুই আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে। পাট ৫-৭ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে।

দিনাজপুর—পাটের সাধারণ অবস্থা ভাল। শস্যের কোন ক্ষতি হয় নাই। ৩-৪ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। "জাগ" দেওয়ার" জলের খুব অভাব। কোন কোন স্থানে পাট কাটা সুরু হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি—আবহাওয়া অনুকূল। পাটের অবস্থা ও বৃদ্ধি সন্তোষজনক। চাকলাজাত অঞ্চলে পাটের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। আলিপুর ডুয়ার্স অঞ্চলে "জাগ" দেওয়ার জল প্রচুর, কিন্তু সদরে জলের খুব অভাব। ৫-৭ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে।

দার্জ্জিলিং—শস্যের অবস্থা ভাল। "জাগ" দেওয়ার জল প্রচুর রহিয়াছে। এখনও কাটা আরম্ভ হয় নাই।

রঙ্গপুর—৪-১০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। "জাগ" দেওয়ার জল প্রচুর রহিয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ নদীর অঞ্চলে শস্যের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। দুই আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে।

বগুড়া—বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পাট ভাল হইয়াছে। আধাআধি পাট কাটা হইয়াছে, কিন্তু "জাগ" দিবার জলের খুব অভাব। এখন বৃষ্টির প্রয়োজন।

পাবন—সিরাজগঞ্জ মহকুমায় পাট ভাল হয় নাই। সদরে বেশ ভালই হইয়াছে। পাট সাড়ে পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে আধাআধি পাট কাটা হইয়াছে। সদরে চার আনা পাট কাটা হইয়াছে।

মালদহ—পাটের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। অল্প পরিমাণ কাটা হইয়াছে। "জাগ" দেওয়ার জলের অভাব।

ঢাকা—পাটের অবস্থা ভাল, বৃদ্ধি সন্তোষজনক। শিলাবৃষ্টিতে শস্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছে। "জাগ" দেওয়ার জলের অভাব; গাছগুলি প্রায় সাত ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। দশ আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে। প্রচুর বৃষ্টি হইতেছে।

মৈমনসিংহ - জামালপুর অঞ্চল ছাড়া সর্ব্বত্রই ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক। জামালপুর অঞ্চলে শস্তের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। পাট ৩-৭ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। জামালপুর এবং টাঙ্গাইল ব্যতীত কোথায়ও "জাগ" দেওয়ার জলের অভাব নাই। টাঙ্গাইল অঞ্চল ছাড়া সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইতেছে। প্রায় আধাআধি পাট কাটা হইয়াছে।

ফরিদপুর—পাটের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। পোকায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। নীচু অঞ্চলে "জাগ" দেওয়ার জলের অভাব নাই, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে জলের খুব অভাব। গাছগুলি প্রায় ৬ ফুট উঁচু হইয়াছে। গোয়ালন্দ অঞ্চলে ৫ ফুটের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। পাঁচ আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ—আবহাওয়া অনুকূল। পাটের অবস্থা সন্তোষজনক, কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। গাছগুলি সাড়ে পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু হইয়াছে। চারি আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে। "জাগ" দেওয়ার জলও প্রচুর।

ত্রিপুরা—বন্যা ও পোকায় শস্তের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর অবস্থা ভাল। সাত আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে।

নোয়াখালি—আবহাওয়া অনুকূল। পাট ৪-৫ ফুট আন্দাজ উঁচু হইয়াছে। উচ্চ ভূমিতে "জাগ" দেওয়ার জলের খুব অভাব। পাট কাটা সুরু হইয়াছে।

কুচবিহার—অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য কোন কোন স্থানে গাছগুলি বড় হইতে পারে নাই। মোটের উপর ৬—৭৷৷৹ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। এক আনা পরিমাণ পাট কাটা হইয়াছে। "জাগ" দিবার জল প্রচুর রহিয়াছে।

স্বাধীন ত্রিপুরা—পাট কাটা আরম্ভ হয় নাই। গাছ ৩—৯ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু হইয়াছে। সাধারণ অবস্থা ভাল "জাগ" দিবার জলের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয়।

ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটে মিঃ এ, সি, সেনের অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চাটুকারিতা

মনে রাখিতে হইবে, খোসামুদি এবং ক্যান্‌ভাসিং এক জিনিষ নহে। সসম্মান ব্যবহারে, সৌহার্দ্দ্যে, সংবাদে, চরিত্রের সৌকুমার্য্যে, এবং কাজের ভার লইবার স্পৃহা দিয়া মানুষকে যে-ভাবে বশীভূত করা যায়, চাটুকারিতায় তাহার কিছুই হয় না। জোর করিয়া কাহারো ঘাড়ে একটী পলিসি চাপাইয়া দিলে, ভবিষ্যতের একশ'টার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। একটী কেস্ না পাওয়া দুঃখের কথা বটে ; কিন্তু ভাবী বীমাকারীর মনে যদি কোন খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হয়, তাহা ব্যবসাকে অনেক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে। ব্যবসার মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য সকলেই প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

সর্ব্বক্ষণব্যাপী এজেন্সী
(whole-time Agency)

অন্য কোন ব্যবসার লোক যদি এজেন্টের সময়ের উপর ভাগ-বাটোয়ারার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে বীমাজগতে ভাল কাজ করিবার পক্ষে প্রকাণ্ড অন্তরায় উপস্থিত হইবে। আজকাল প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা তাহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়া একটী

ব্যবসা খাড়া করিয়া থাকেন; এজেন্সীর সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। লাইফ ইনসিওরেন্সকর্ম্মী যদি এক সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধি হইয়া ব্যবসা করিতে থাকেন কিংবা অগ্নি ও সামুদ্রিক বীমা লইয়াও ঘাটাঘাটি করিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি অক্লান্তকর্ম্মা এবং একটী মাত্র কোম্পানীর সঙ্গে আবদ্ধ প্রতিনিধির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পারিবেন না: বাস্তবিক দেখা যায়, যে, যিনি একটী মাত্র কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব করিয়া উহার উন্নতির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন, লোকের চক্ষে তাহার স্থান অনেক উপরে। অন্যান্য বিভাগের ন্যায়, অধ্যবসায় না থাকিলে এক্ষেত্রেও উন্নতিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সমস্ত সময় এই ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন, তাঁহাদের কমিশনের তালিকায় জমার অঙ্ক শুধু যোগ হইয়াই যায় না—পূরণ হইয়াই চলে।

অনেকে সুদিনের মুখ দেখিলেই অলস হইয়া পড়েন; তখন মনে হয় যে নূতন বীমাকারী যোগাড় করা আর সম্ভবপর নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কোন সহর কিংবা জেলাকে ভালরূপে অর্গানাইজ করিতে পারিলে, ভাবী বীমাকারীর সংখ্যা আবার নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইতে থাকে। অনেক ভালো ইনসিওরেন্স এজেন্ট নূতন আফিস করিয়া নিজেদের ব্যবসা মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন—কেননা, লোকে আত্মপ্রেরণায় ইনসিওরেন্স আফিসে বীমা করিতে বড় বেশী আসে না। নিজে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করিয়া এবং বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা আরো বাড়াইয়া তুলিয়া যে কাজ করিতে পারা যায়, অন্যের দ্বারা তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। ফলে, তাহার নিজের ব্যবসার বাজারেও ভাটা সুরু হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা

অন্য কোম্পানীর একজন প্রতিনিধির মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া মোটেই বিবেচকের কার্য্য নহে—উহাতে সমস্ত লাইফ ইনসিওরেন্স সম্বন্ধেই একটী প্রতিকূল ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়। এরূপস্থলে, অপর আর একটী সুযোগের জন্য অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। প্রতিহিংসা লইবার জন্য অন্য কোম্পানীর নিন্দা করিয়া নিজের সুবিধার সংস্থান করিয়া লওয়া কেবল যে জঘন্য তাহা নহে—উহা কোন কোম্পানীর পক্ষেই সুবিধার কথা নহে। ইহাতে কেবল একটী পিশাচ-চক্রের (vicious circle) সৃষ্টি হয়।

কোম্পানীর দায়িত্ব

এই বিপুল প্রতিযোগিতার ফলে, কোম্পানীর স্থিতি এবং উন্নতি কেবলমাত্র এজেন্টের কর্ত্তব্যের উপর নির্ভর করেনা—সঙ্ঘবদ্ধতা, কার্য্যবিভাগ, শৃঙ্খলা, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। কার্য্য প্রণালীতে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি থাকা চাই, কর্ম্মীদিগের মনে বিশ্বাস স্থায়ী রাখিবার উপযুক্ত কুশলতা চাই, অত্যাধুনিক সংবাদ এবং বিশেষ জ্ঞানে তাহাদিগকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা চাই। তাহাদের সত্যিকার বাধাবিঘ্ন এবং ক্লেশ মোচন করিয়া নূতন আলো ও পথের নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার। লোকে যেমন পূর্ব্বের চেয়ে বেশী করিয়া লাইফ ইনসিওরেন্সের সংবাদ রাখে, তেমনি তাহারা আবার আগের চেয়ে বড় দরের সমালোচকও হইয়াছে; তাহারা জানে, কোন্ কোম্পানীতে গেলে ঠিক মনের মত জীবন বীমাটী লওয়া যাইতে পারিবে। কাজেই

কোম্পানীর ব্যবসার খাতিরেই তাহার প্রতিনিধিদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুবিধা ও সুযোগ দিতে হইবে—নতুবা ব্যবসায় বেশী উন্নতি করিতে পারিবে না। নূতন কোম্পানীর প্রতিও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য—তাহা এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল।

সার্কুলার

এজেন্টদিগকে অত্যাধুনিক মহলের সঙ্গে সর্ব্বদা সম্পর্কিত রাখিবার জন্য, মাঝে মাঝে সার্কুলার দিয়া সজাগ করিয়া রাখিতে হইবে। দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন বীমাকর্ম্মীরা কোম্পানীর বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়া থাকেন—দেওয়াই দস্তুর। সার্কুলারগুলি এমন ভাবে লিখিত হওয়া উচিৎ যে উহা প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে সহযোগিতার ভাব জাগাইয়া তুলে এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানকে সজাগ করিয়া দেয়। মামুলিধরণের সার্কুলার দিয়া বিশেষ কোন কাজ হয় না। কোম্পানীর কর্ম্মী কিংবা জনসাধারণ—যাহাকে উদ্দেশ করিয়াই সার্কুলার লেখা হউক না কেন, উহাতে রচনার দক্ষতা তো চাইই, মানব-চরিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকাও একান্ত আবশ্যক। সভাঁজ বিজ্ঞপ্তি (folders or leaflets) যদি সুন্দর রকমে রচনা করিয়া পোষ্টে কিংবা অন্য কোন উপায়ে বিলি করা যায়, তাহা হইলেও অনেক কাজ হয়, কর্ম্মীদেরও অনেক সুবিধা হয়। ইহার সঙ্গে যদি ব্যক্তিগত চিঠি কিংবা

মনোমদ স্মারকলিপি পাঠানো যায়, তাহা হইলে আরো ভাল হয়।

বিজ্ঞাপন

কর্ম্মীরা যে অঞ্চলে কাজ করেন, সেখানকার ঘরে ঘরে যাহাতে কোম্পানীর নাম এবং তাহার চিত্তাকর্ষী প্রস্তাবগুলি প্রচারিত হয়, তাহার জন্য বিজ্ঞাপন বিলি করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন কোম্পানীর সুনাম বিস্তার করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে—উহাকে "লিখিত বিক্রয়পটুতা" বিশেষণে অভিহিত করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারো সঙ্গে মোলাকাৎ করা সম্ভবপর নহে, সেখানে কোম্পানীর হইয়া বিজ্ঞাপনগুলিই তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিতে থাকে ও বীমাকর্ম্মীদিগের ভাবী কার্য্যের রাস্তা সুগম করিয়া দেয়। সুন্দররূপে রচিত হইয়াও যদি বিজ্ঞাপনে লোকের মনে কোনরূপ কৌতুহল জাগ্রত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়; যদি উহা পড়িয়া কেহ কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করে—বলিতে হইবে, তখনই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে।

সহযোগিতা

যাহারা কোম্পানীর মাথায় থাকিয়া কোম্পানীকে চালাইতেছেন তাহাদের সঙ্গে এবং বীমা-কর্ম্মীদিগের সঙ্গে সহযোগিতা না থাকিলে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা অসম্ভব। হকি কিংবা ফুটবল খেলিতে টীমের খেলোয়াড়গণ যেমন এক মন প্রাণ এবং উদ্দেশ্য লইয়া খেলিতে থাকে, বীমা জগতেও ঠিক তেমনি সহযোগিতা না থাকিলে কাজ চলিতে পারে না। এজেন্টগণ বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া রাস্তা করিয়া লইতে হয়; কাজেই তাঁহাদের মতামতের অনেক মূল্য আছে। যদি তাঁহাদের কোন নির্দ্দেশ কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ মানিয়া লইতে না পারেন, তাহা হইলে উহাকে সহানুভূতির অভাব বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে; অনেক সময়ে তাহাদের নির্দ্দেশ যখন অ্যাক্‌চুয়ারীর সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়, তখন অ্যাক্‌চুয়ারীকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হয় না। এতদ্ব্যতীত, কোন মূল সর্ত্তের বিরুদ্ধগামী সুবিধা ও সুযোগ বীমাকর্ম্মীদিগকে দেওয়া উচিত হয় না—অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করা হয়।

মাঝে মাঝে কোম্পানীর আফিসে এজেন্টদের কন্‌ফারেন্স হইলে অনেক অমূলক ধারণা দূর করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। ইনস্পেক্টারগণও দুই পক্ষের সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক আফিসই তাহাদের কর্ম্মীদিগকে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিয়া থাকেন; প্রিমিয়াম এবং ব্যয়ের হিসাব দেখিয়াই উহা নির্দ্ধারণ করা হয়। ভাল কোম্পানী কিন্তু ব্যবসার খাতিরে অবৈতনিক প্রণালীতে কাজ করিবার জন্য এজেন্টদিগকে প্ররোচিত করিবেন না; উহা অত্যন্ত অদূর-দর্শিতার পরিচায়ক হইবে। অনেক কাজ আসিলে বাস্তবিক কিছুই হয় না—ভাল কাজ আসা চাই। সেইজন্য বলিতেছি, কোম্পানী কিংবা তাহার প্রতিনিধি, কেহই দিগ্বিজয়ী হইতে চেষ্টা করিবেন না। ভাল ব্যবসা গড়িয়া তুলিলে, উহা আপনি মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে।

বীমার ভবিষ্যৎ

ভারতে জীবন বীমা কেবলমাত্র শৈশবকাল উত্তীর্ণ হইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ইনসিওরেন্স করিয়া লাভবান হইয়াছে—ভবিষ্যতেও কোটি কোটি লোক লাভবান হইবে। অনেক আশার আলোক দেখাইয়া দিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করি। ভারতের ঘরে ঘরে পতিহীনা বিধবার কোন সম্বল না থাকিলে অপোগণ্ড শিশু সন্তান লইয়া কিরূপ বিপদগ্রস্থ হইতে হয়, তাহাও প্রবাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইনসিওরেন্স বিভাগ তাহার ভরণ পোষণ ও শিশুদের মানুষ

Mr. A. C. Sen.

ভারতীয় জীবন বীমার আফিসসমূহ আজকাল খুব ভাল কাজ করিতেছে এবং অতীতের যে সমস্ত কুসংস্কার এবং বদ্ধমূল ধারণা ইহার প্রথম প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, আজ তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হইয়াছে। যে সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক চোখে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন - ইনসিওরেন্স লাইন তাহাদিগকে করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা লোককে সঞ্চয়ী করে, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া তুলে এবং বৃদ্ধবয়সে স্থায়ী আয় দিয়া যায়। যে ইহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহাকে আর জীবিকা সংস্থানের জন্য ভাবিতে হইবে না।

———

জীবন-বীমায় মৃত্যু-হার।

[শ্রীযোগেশ দত্ত চৌধুরী]

মানুষ সমস্ত জীবন বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ম্যাদে জীবন বীমা করিয়া থাকে। বীমা চুক্তির ম্যাদ অন্তে বীমাকারী মরিলে কোম্পানীর বার্ষিক চাঁদা—(Premium) পাওয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং বীমাকারীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ওয়ারীশ চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা পাওয়ার অধিকারী হয়। এরূপ অবস্থায় কিরূপ বীমার চুক্তিতে কোন্ বয়সে কত টাকা বার্ষিক চাঁদা দাবী করা হইবে - তাহা নির্দ্ধারণের জন্য প্রত্যেক বয়সের বীমাকারীদের কি হারে মৃত্যু হইয়া আসিতেছে—তাহা জানা দরকার। যতদিন পর্য্যন্ত এই অভিজ্ঞতালব্ধ এবং নিরাপদে গ্রহণযোগ্য মৃত্যুর হার জানিবার পথ ছিল না ততদিন প্রত্যেক কোম্পানীকে ভয়ে ভয়ে বেশী হারে বার্ষিক চাঁদা দাবী করিতে হইত। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে অধিকাংশ কোম্পানী আজও যে-হারে বার্ষিক চাঁদা দাবী করিতেছে—তাহা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী এবং বীমাকারীর স্বার্থ-বিরোধী।

আজ বীমা-ব্যবসায় এমন একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে—ইচ্ছা করিলে পরিচালন-খরচ বাদে প্রত্যেক বয়সের লোকের কোন্ চুক্তির পেছনে কত টাকা নির্দ্দিষ্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে রক্ষা করিয়া গেলে নিরূপিত মৃত্যু-হার স্বীকার করিয়া তাহাদের চুক্তির সম্পূর্ণ টাকা দেওয়ার পরও অবশিষ্ট লোকের চুক্তি মিটাইবার মত টাকা ম্যাদ অন্তে তহবিল জমা হইবে—তাহার একটা নিরাপদে নির্ভরযোগ্য হিসাব করা যায়। এই অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর হার স্বীকার করিয়া প্রত্যেক চুক্তির পেছনে হিসাবমত যত টাকা উচিত তাহা নিয়মিত ভাবে থাকিয়া যাইতেছে কিনা এবিষয়ে অনধিক ৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া হিসাব করার মত ব্যবস্থা বর্ত্তমান জীবন-বীমা আইন অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানীরই করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ (Actuary) দ্বারা এই প্রকার হিসাব প্রকাশ করার নাম ভ্যালুয়েশন্ (valuation) বা বীমা-চুক্তিগুলির সাময়িক মূল্য নির্দ্ধারণ।

ভবিষ্যতে প্রত্যেক বয়সের একটা নির্দ্দিষ্ট মৃত্যুহার এবং একটা নির্দ্দিষ্ট নিরাপদ চক্রবৃদ্ধি সুদ কল্পনা করিয়া সেই সিদ্ধান্তের উপর সাধারণতঃ ভ্যালুয়েশনের গণনা চলিতে থাকে। স্বভাবতঃ বীমাকারীদের ভিতর যে হারে মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইতেছে ভ্যালুয়েশনে তার চেয়ে কম হার ধরিলে কোনও কোম্পানী স্বচ্ছল প্রতিপন্ন হওয়া স্বত্ত্বেও তাহাকে প্রকৃত পক্ষে স্বচ্ছল বলিয়া ধরিয়া লওয়া খুব নিরাপদ নহে। সেই প্রকার ভবিষ্যতে যে সুদ অর্জ্জন করা হইবে তার চেয়ে বেশী সুদ অর্জ্জনের কল্পনা করিয়া ভ্যালুয়েশন করিলে—বর্ত্তমান বীমা তহবিল সমস্তগুলি বীমাচুক্তির পিছনে যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে

কোম্পানী অচল হওয়ার সম্ভাবনা। জনসাধারণ দূরের কথা, অধিকাংশ বীমার দালাল এবিষয়ে জ্ঞান না থাকার জন্য শুধু ভ্যালুয়েশনের বড় বড় উদ্বৃত্তটাকা (surplus) এবং তদ্দ্বারা ঘোষণাকৃত বার্ষিক বোনাসের (bonus) পরিমাণ দেখিয়াই সাধারণতঃ নিজেদের কোম্পানী নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ করিয়া বসেন—ফলে বাজারে ছলে, বলে কৌশলে কেবল মাত্র বোনাসের প্রপাগাণ্ডাই চলিতেছে; যে ভ্যালুয়েশনের উপর বোনাস নির্ভর করে তাহার মাপকাঠির প্রতি কেহই লক্ষ্য করে না, কিম্বা প্রিমিয়ামের কম বেশীর উপর বোনাস সৃষ্টি কতটা নির্ভর করে তাহাও কাহারও দেখার ততটা খেয়াল হয় না।

কোম্পানীর তহবিলে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা থাকাবস্থায় ভ্যালুয়েশন আরম্ভ হয়। যিনি ভ্যালুয়েশন করেন তিনি পান কতকগুলি পলিসিতে বীমাকারীর বয়স, বীমা-সর্ত্ত এবং প্রত্যেকটী চুক্তির তারিখ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় হয়—ঐ চুক্তিগুলির পিছনে হিসাব মত কত টাকা থাকা দরকার। কিন্তু এই যে টাকার অঙ্কটা হিসাব করিয়া বাহির করা হইবে—উহার পরিমাণ নির্ভর করিতেছে সম্পূর্ণ হিসাবের দুইটি মাপকাঠির উপর। এই মাপকাঠি হইতেছে—১। কোম্পানীর বীমাকারীদের ভিতর কি হারে মৃত্যু ঘটিতেছে তাহা অনুমান করা, এবং ২। কোম্পানীর বীমা তহবিল কোনও প্রকারে নষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ দাদনের ভিতর দিয়াও নিশ্চিত কম পক্ষে কত হারে সুদ অর্জ্জন করা হইবে তাহাও অনুমান করা। এই দুইটী অনুমানকেই স্থির সিদ্ধান্ত বা মাপকাঠি মানিয়া লইয়া তার উপর হিসাব চলিতে থাকে। কোম্পানীর স্বচ্ছলতা বিবেচনা করিতে গিয়া প্রথমেই বিচার করা দরকার এই মাপকাঠির কোন গলদ আছে কিনা! ভ্যালুয়েশনের সময় উদ্বৃত্ত টাকা (surplus) কমই দেখান বা বেশীই দেখান হউক তাহাতে বীমা তহবিল ঠিক সমানই থাকে। কারণ উহা কোনও সিদ্ধান্ত মানিতে প্রস্তুত নহে। যেহেতু উহা থাকে কোম্পানীর সিন্দুকে—নগদ বা দাদন-পত্রের দলিল ভাবে অর্থাৎ সোজা গণনার বিংশীভূত জিনিষরূপে।

ভ্যালুয়েশনের দশ রকম দুর্ব্বলতার কারণ এবং সমস্ত মাপকাঠি আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া কেবলমাত্র মৃত্যুহার বিষয়ে যাহা সাধারণভাবে জানা দরকার তাঁহাই প্রকাশ করিব। বীমাকারীর মৃত্যুহার প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক বয়সের লোকের পক্ষে সমান নহে—ইহা বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে। ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে জীবনবীমার প্রচলন আছে। সেখানে প্রত্যেক বয়সের বীমাকারী-দিগকে পৃথক পৃথক ধরিয়া তাদের মৃত্যুর একটা গড় বাহির করার চেষ্টা একাধিকবার হইয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক বারের গণনার ফল কতকটা এক রকম হওয়ায়—তদ্দ্বারা নিরাপদে নির্ভরযোগ্য মৃত্যুর চার্ট পাওয়া গিয়াছে।

গত ১৯১২ সনে "ভারতীয় বীমা আইন"এর (Life Insurance Companies Act of 1912) পর হইতে অনধিক পাঁচবৎসর অন্তর একবার করিয়া ভ্যালুয়েশন করিতে হয়।—ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যু বিষয়ে ভারতীয় কোম্পানীগুলির কোনও অভিজ্ঞতালব্ধ চার্ট না থাকিলেও কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বীমা ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞ একচুয়ারীগণ ভারতীয় বীমাকারীগণের মৃত্যুবিষয়ে অনুসন্ধানের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের ভ্যালুয়েশনের সময় গ্রহণ

করা হইয়া আসিতেছিল।—ঐ সময়ে দেখা যায়—প্রত্যেক বয়সের ভারতীয় বীমাকারীগণের মৃত্যুর হার তাহাদের চেয়ে ৬।৭ বৎসর বেশী বয়স্ক ইংরেজ বীমাকারীদের মৃত্যুহারের অনুরূপ। কাজেই তাহাদের মতে আমাদের দেশের বীমাকারীদের বয়সের সঙ্গে ৬।৭ বৎসর যোগ করিয়া এই নূতন বয়সকেই খাঁটী বয়স মনে করিয়া ইংরেজদের দেশে বীমাকারীদের মৃত্যু বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুহার ভ্যালুয়েশনের সময় গ্রহণ করা চলে। এই ৬।৭ বৎসর প্রত্যেক বয়সের সঙ্গে যোগ করাকে বীমার ভাষায়—ইংরাজীতে "6 or 7 years rating up" করা বলে।

উপরের সিদ্ধান্তই আমাদের একমাত্র ভরসার জিনিষ নহে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মৃত্যুবিষয়ক অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যুর চার্ট বাহির করিয়া লইতে পারি। আমাদের দেশে ৩০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ৫।৬টী পুরাতন ও সুদৃঢ় জীবন বীমা কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে বোম্বে সহরে তিনটী যথাক্রমে ১৮৭১, ১৭৭৪ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা দেশে একটা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এবং পাঞ্জাবে একটী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইঁহারা সমবেতভাবে তাঁহাদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর চার্ট বাহির করিয়া লইলে তাহাকেই ভারতীয় বীমাকারীদের মৃত্যুহার বিষয়ক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য চার্ট ভাবে গ্রহণ করা চলে। ভারত গবর্ণমেন্টের বীমা বিভাগ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি বিদেশী কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় কোম্পানীকে রক্ষার চেষ্টা না করিয়া গবর্ণমেন্ট একচুয়ারী সময় ও সুযোগ হইলে বিদেশী কোম্পানীর সহায়তা করিতেও কুণ্ঠিত নহে। ভারতীয় অর্থে পুষ্ট কর্ম্মচারীর ২৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট যাঁহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা Mr. Meikleএর "ব্লু বুক" (Blue Book) খানাকে বিদেশী কোম্পানীর প্রচার পুস্তিকা ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিবেন না।—যাক্ ইহা পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্য।

সুখের বিষয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কোম্পানী নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর হার বাহির করিয়া লইতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার ফল এবং কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজ একচুয়ারীগণের অনুসন্ধানের ফল একই রূপ দাঁড়াইয়াছে। কাজেই প্রকৃত বয়সের সঙ্গে ৬।৭ বৎসর যোগ করার পর ইংরেজ বীমাকারীদের মৃত্যু-চার্ট ভ্যালুয়েশনের সময় ব্যবহার করিলে—তদ্দ্বারা ভারতীয় বীমাকারীদের সঠিক মৃত্যুহারই ধরা হইবে। উভয় পরীক্ষার এক—British Table of Mortality Om oa Hm With 6 or 7 years rating up—দ্বারা যে প্রকৃত ভারতীয় বীমাকারীর মৃত্যুহার পাওয়া যায়—ইহার বিরুদ্ধে আর তর্ক চলে না।

এখন দেখা যাক্—ভারতীয় কোম্পানীগুলির ভিতর কেহ ভ্যালুয়েশনের সময় ঐ সিদ্ধান্ত অবহেলা করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মৃত্যুচার্ট ব্যবহার করিয়াছেন কিনা এবং ভারত গবর্ণমেন্টের একচুয়ারী এই দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত ঐ কোম্পানীগুলির অনুকূলে ভ্যালু-য়েশনের মিথ্যা মাপকাঠি - বার্ষিক গবর্ণমেন্ট রিপোর্টের ভিতর প্রচার করিয়াছেন কিনা! এই হিসাবে বাংলা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় দুইটি কোম্পানীকেই এই দিক দিয়া অপরাপর কোম্পানী অপেক্ষা দুর্ব্বল মৃত্যুর চার্ট ব্যবহার করিতে

দেখিয়াছি। উহারা ১৯০৬ এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এবং বেশ বড় কোম্পানী বলিয়াই বাজারে পরিচিত। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ মৃত্যুর স্বতন্ত্র চার্ট দেশের সম্মুখে ধরিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত অন্যান্য কোম্পানীগুলির মত পূর্ব্বের দুইটি অনুসন্ধানের ফলে ভারতীয় বীমাকারীদের যে মৃত্যুহার স্বীকৃত হইয়াছে তার চেয়ে কম মৃত্যুহার ধরিয়া দুর্ব্বল ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের স্বচ্ছলতার পরীক্ষা না দিলেই ভাল হইত। যাক্ তাঁহারা এবিষয়ে মিথ্যা প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। বরং ভারত গবর্ণমেণ্টের একচুয়ারী সাহেব (Actuary to the Govt of India) তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টের ভিতর দিয়া সে কাজটা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

উপরের লিখিত কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনও বিষয় প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু জীবন-বীমায় মৃত্যুহার বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া সর্ব্বত্র প্রকৃত মৃত্যুহার বিষয়ক সিদ্ধান্ত পালন করা হইতেছে কিনা তাহাই মাত্র পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি গবর্ণমেণ্ট একচুয়ারী সাহেবের সঙ্গে কি পত্র ব্যবহার করিয়াছি এবং কি উত্তর পাইয়াছি বা প্রত্যুত্তর দিয়াছি তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করাও সঙ্গত বোধ করি না। যাঁহারা বীমা-বিষয়ে বিশেষ সংবাদ রাখেন তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। বিরুদ্ধ-সমালোচনা দ্বারা ভারতীয় কোম্পানীর বিপক্ষে কিছু প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে।— ভারতীয় কোম্পানীসমূহের পরিচালকদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে শুধু বোনাস্ বৃদ্ধির জন্য উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা যেন কোম্পানীকে দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করেন। কোম্পানীকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বোনাস্ যদি দুই টাকা কম হয় বা আদৌ না হয় তাহাতেই বা আপত্তি কি? বোনাসের ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ করিয়াও যদি শক্তির দিক দিয়া পিছাইয়া যাইতে হয় তবে—অন্যায় প্রতিযোগিতার লোভ ত্যাগ করিয়া-কাজ কমই হউক আর বেশীই হউক—শক্তির দিক দিয়া কোম্পানীগুলিকে প্রতিযোগিতায় নামিতে হইবে। মৃত্যুবিষয়ক চার্ট ব্যবহারের সামান্য তারতম্য দ্বারা কোম্পানীর খুব গুরুতর ক্ষতি যদিও না হয় তবু উহা দ্বারা পরিচালকশক্তির একটা বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যাহা বাস্তবিক ভয়ের জিনিষ।

———

ওরিয়েণ্টালের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী হেন্‌রী রোয়েন রবার্টস্

দারিদ্র্যের চরমসীমা হইতে মানুষ কিরূপে উন্নতির শিখরে আরোহন করিতে পারে হেন্‌রী রোয়েন রবার্টসের জীবনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। কৈশোর হইতেই সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বড় হইতে হইয়াছে। তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় এবং বিপুল কর্ম্মশীলতার যদি অভাব হইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনও আমাদের বাঙালী যুবকদের মত নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু কথায় বলে, "যাহাদের সঙ্কল্প আছে, তাহাদের জন্য পথও আছে"। দারিদ্র্যের কষ্টিপাথরের মধ্যেও যাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প সোণার মতই ফুটিয়া উঠে, পৃথিবীর কোন বাধাই তাহার প্রগতির পথ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। রবার্টস এত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের পথ করিয়া লইতে পারিয়াছেন বলিয়া আজ তিনি বীমা মহলে সম্মানের আসন পাইয়াছেন। এই অবস্থায় উঠিবার জন্য তাঁহাকে যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহাই তাঁহার কপালে সাফল্যের জয়-টীকা পরাইয়া দিয়াছে।

তিনি কোন ছোট কাজকে কোন দিন ঘৃণার চোখে দেখেন নাই, কোন কাজকে অবহেলা করেন নাই; কেন না, এই সব ছোট খাটো কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিলে এবং তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তবে বড় কাজ পাবার সুযোগ ও অধিকার হয়। মাইকেল এঞ্জেলো সত্যই বলিয়াছেন, "It is through the trifles that a man is known." মানুষকে বিচার করিতে হইলে ছোট খাটো কাজ দিয়া বিচার করাই উচিৎ; কেন না, বড় বড় কাজ অনেকে হাততালির লোভেও করিয়া থাকে।

হেন্‌রী রোয়েন রবার্টস।

যেখানে হাততালির কোন সম্ভাবনা নাই, অথচ বাধা বিঘ্ন খুব বেশী, সেইখানেই মনুষ্যত্বের অগ্নি-পরীক্ষা হয়। রবার্টসের জীবনে এরূপ পরীক্ষা অনেকবার আসিয়াছে।

১৮৮০ খৃঃ অঃ ১৪ই জুলাই রবার্টস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের ছয় বৎসর

পরে তাঁহার পিতা বিধবা স্ত্রী, ৪টী পুত্র এবং একটী কন্যা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। শৈশবেই এইরূপে তাহার সংগ্রাম আরম্ভ হইল; তিনি বম্বে এডুকেশন সোসাইটির স্কুল সমূহে পাঠাভ্যাস করিলেও, অভাবের তাড়নায় ১৬ বৎসর বয়সের সময়েই তাঁহাকে স্কুল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন চেষ্টার পর একটী সওদাগরী অফিসে সামান্য একটী চাকুরী জুটিল; কিন্তু ঐ চাকুরী লইয়া থাকা তাঁহার বেশীদিন পোষাইল না।

ওরিয়েণ্টাল লাইফ অফিসে তাঁহার বড় ভ্রাতা এসিষ্টাণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন; রবার্টসও ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ৬ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত কোম্পানীতে সামান্য একটী অনুলেখকগিরির (Copyist) কার্য্য পাইয়া সেখানে পেটের দায়ে কপিইষ্টের কাজ করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু অবসর সময় নানারূপ অধ্যয়নের দ্বারা তিনি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ক্রমে উচ্চতন কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রপোজাল ডিপার্টমেণ্টের চার্জ্জে নিযুক্ত করিলেন। কার্য্যদক্ষতায় গুণে তিনি শীঘ্রই তখনকার কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ আর, প্যাটারসন্ ব্রাউনের নজরে পড়িয়া যান। ব্রাউন সাহেব তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালোরে প্রথম চীফ্ এজেণ্ট করিয়া পাঠান। তিনি সাত বৎসর ধরিয়া এই এজেন্সীর উন্নতির জন্য যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই উহা এখন একটী উন্নতিশীল ব্রাঞ্চে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কলিকাতায় যে সমস্ত ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী এ-যাবত কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের তিনজনই বাঙ্গালোরে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন।

১৯১২ সনে মিঃ রবার্টস্ বাঙ্গালোর হইতে কলিকাতায় দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইয়া আসেন। পরলোক গত মিঃ এইচ, ডি, ডাটা ১৯১৮ সনে যুক্তপ্রদেশের সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, মিঃ রবার্টস এলাহাবাদস্থ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হন। ১৯২০ সনে মিঃ রবার্টস কলিকাতায় আবার ব্র্যাঞ্চ সেক্রেটারীর পদে যোগদান করেন; কিন্তু প্রায় দুই বৎসর পরেই আবার তাঁহাকে বর্ম্মাতে প্রেরণ করা হয়। ১৯২৬ সনে তাঁহার অত্যন্ত অসুখ হওয়ায় তিনি দীর্ঘকালের ছুটী লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু ছুটী ফুরাইয়া গেলে আবার তাঁহাকে যুক্তপ্রদেশস্থ এলাহাবাদ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা এলাহাবাদের চেয়ে লক্ষ্ণৌকে সুবিধাজনক কেন্দ্র মনে করিয়া, ঐ স্থলেই শাখা-কেন্দ্রটীকে স্থানান্তরিত করেন।

১৯২৮ সনে উক্তস্থলে একটী বিরাট সৌধ নির্ম্মিত হইলে, মিঃ রবার্টস্ কোম্পানীর এলাহাবাদস্থ শাখা লক্ষ্ণৌতে স্থানান্তরিত করেন এবং তদবধি লক্ষ্ণৌ ব্রাঞ্চের কাজ বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিতে থাকেন। বর্ত্তমান ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওরিয়েণ্টালের কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী মিঃ কৃষ্ণ স্বামীয়ার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গেলে বাঙ্গলা দেশের ন্যায় বৃহৎ শাখা আপিসের ভার কাহার উপর ন্যস্ত হইবে ইহা লইয়া বীমা মহলে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিয়াছিল। শেষে কর্ত্তৃপক্ষ লক্ষ্ণৌ হইতে পুনরায় মিঃ রবার্টস্‌কেই এই দায়ীত্বপূর্ণপদে পুনরায় টানিয়া আনিলেন।

মিঃ রবার্টস্ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সপরিবারে বিলাতে চলিয়া যাইবার সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পেন্সন প্রভৃতিও স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু Retire করিয়া পেন্সন নিবার মুখেও যখন কর্ত্তব্যের ডাক আসিল তখন রবার্টস্ ইতস্ততঃ করিলেন না, কিম্বা কোনওরূপ ওজর আপত্তি দেখাইলেন না। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া এখানকার বাস উঠাইয়া দিয়া বিলাতে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য সমুদয় আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ বিলাতে শিক্ষালাভ করিতেছে; তাহারাও পিতামাতাকে দেখাব জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল; চারিদিকের সকল আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ স্বামীয়ারের হঠাৎ মৃত্যুতে যে পর্য্যন্ত বাঙ্গলার শাখা আপিসের স্থায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করার পাকা বন্দোবস্ত করিতে না পারেন সেই পর্য্যন্ত বাঙ্গলা আপিশের দায়ীত্বভার লইবার জন্য তাঁহাকেই কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ অনুরোধ জানাইয়া পাঠাইলেন। শত অসুবিধা সত্ত্বেও রবার্টস্ একবারও খুঁত খুঁত করিলেন না কিম্বা তাঁহার সব ব্যবস্থা উল্টাইয়া যাওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কোনও অভিযোগ জানাইলেন না। সব ওলট পালট করিয়া দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার জীবনের উন্নতির মূলে আমরা এই এক সূত্র দেখিতে পাই। কর্ত্তৃপক্ষ যখনই তাঁহাকে যে-কোনও স্থানে যে-কোনও কাজে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, যুদ্ধের সৈনিকের ন্যায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন এবং তাঁহার সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য

সেই কাজ সুসিদ্ধ করার জন্য নিয়োগ করিয়াছেন। কখনও কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করেন নাই; কোনওরূপ বাধা, বিঘ্ন, ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে বিব্রত করেন নাই; বীরের ন্যায় নিঃশব্দে সকল বাধা ও বিঘ্নের মুখে অগ্রসর হইয়াছেন এবং কাজ হাসিল করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। কর্ম্মজীবনে নিয়মানুবর্ত্তিতার এবং বাধ্যতার তিনি যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার উন্নতির এক প্রধান সোপান বলিয়া মনে হয়। সৈনিক জীবনের ন্যায় তাঁহার আদর্শ ছিল—

"Ours is to do and die
Ours is not to reason why"

রবার্টস তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনে এই আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাই ১৫৲ টাকার কপিইষ্টরূপে যে ওরিয়েণ্টালে একটা "মাছিমারা কেরাণীর ন্যায়" তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই ওরিয়েণ্টালের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র এবং শাখা আপিস সমূহের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বপদ লাভ করিয়া মোটা পেন্সনে জীবনের অবশিষ্ট কাল বিলাতে বাস করার মত অবস্থা রচনা করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

রবার্টসের খুব উচ্চ শিক্ষা ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাড়পত্র ছিল না, তিনি অতি কষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ অবধি উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অভাবের তাড়নায় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ

কর্মার পূর্ব্বেই উদরান্নের জন্য কাজের ধান্দায় বাহির হইতে হইয়াছিল। কোনও বড় লোক আত্মীয় স্বজন তাঁহার ছিল না কিম্বা সুপারিশ করারও কেহ ছিল না।

কাজেই ১৫৲ টাকার কপিইষ্ট রূপে তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর নিজের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে কেমন করিয়া ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আজ বাংলা দেশের বহু বেকার যুবক অন্য কোনও কাজ না পাইয়া ইন্‌সিওরেন্সের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। একাজে যে মধু আছে এবং যাহারা সন্ধান জানে এবং সামর্থ্য রাখে তাহারা যে মধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিতে পারে তাহা আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন সফল বীমাকর্ম্মীর জীবন চরিত প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছি। আজ আবার রবার্টসের জীবনী দ্বারা দেখাইলাম।

যাঁহারা বীমার কাজটাকে একটা ফাউয়ের মত হাতে লইয়াছেন, অর্থাৎ দশকর্ম্ম করিব, আর তার সঙ্গে সঙ্গে বীমারও একটা এজেন্সী নিয়া রাখা যাক্, কি জানি যদি কখনও কোনও বন্ধুবান্ধবকে দিয়া একটা বীমা করাইতে পারি তা' হ'লে ফাঁক-তালে একটা মোটা কমিশন পাওয়া যাবে—এই রকম ফাউয়ের ভিতর দিয়া যাঁহারা দাঁও মারার আশা করিয়া আছেন তাঁহাদিগকে বলি যে অর্থ লাভ এত সহজে হয় না। বহু পরিশ্রম এবং সাধ্য সাধনা করিতে পারিলে তবে কমলা প্রসন্না হন। যাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে প্রতিজ্ঞার বল আছে এবং অসাধ্য সাধন করিবার দুর্জ্জয় সংকল্প আছে তাঁহারাই কেবল এই সব লাইনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। এইরূপ সংকল্প নিয়া যাঁহারা বীমার কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন তাঁহাদিগকে রবার্টসের জীবনী মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তুমি কি অতি সামান্য অবস্থায় জীবন আরম্ভ করিয়াছ? তাহাতে আপশোষ নাই! এডিসন এবং এণ্ড্রু কার্নেজী হইতে আরম্ভ করিয়া বহুলোক এমনি অতি সামান্য, অতি নগণ্য ভাবেই জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; তারপর তাঁহাদের অসাধারণ উন্নতিতে জগত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কে জানে তোমাদের কাহার মধ্যে ভগবান কিসের বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন! তোমরা শুধু জল, আলো এবং অনুকূল হাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া এই বীজকে অঙ্কুরিত এবং বিকশিত করিয়া তোল, দেখিবে উহাই একদিন মহীরুহে পরিণত হইয়া শত শত লোককে ছায়া দান করিবে।

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেড

আমরা হিন্দু মিউচুয়ালের ৩১ সালের একখানি বার্ষিক রিপোর্ট ও ব্যালান্স সিট পাইয়াছি। ১৮৯১ সালে হিন্দু মিউচুয়াল গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্ম প্রভিডেন্ট ফণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে উহা যথারীতি বীমা কোম্পানীতে (Regular Insurance) পরিণত হইয়াছে। হিন্দু মিউচুয়াল একণে ৪১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। প্রাচীন বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে হিন্দু মিউচুয়াল এই হিসাবে অন্যতম।

আমরা এই কোম্পানীর গত ৩ বৎসরের তুলনামূলক কতকগুলি হিসাব প্রকাশ করিলাম।

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১
মোট আয়ের পরিমাণ	১,৩৭,২৯৪৲	১,৪৮,০০৬৲	১,৫৫,১৪৭৲
মোট ব্যয়ের পরিমাণ	৪২,৩৫০৲	৪১,০৩৬৲	৩৯,১৩৫৲

এই তিন বৎসরের আয় ব্যয়ের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রতি বৎসর আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গেলেও ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগতই কমানো হইয়াছে। এইরূপে আয়ের পরিমাণ ২৯ সাল অপেক্ষা ৩১ সালে ১৮ হাজার টাকার উপর বাড়িলেও ব্যয়ের পরিমাণ ২৯ সাল অপেক্ষা ৩১ সালে ৫ হাজার টাকার উপর কমানো হইয়াছে। অর্থাৎ এই আয় বাড়াইতে শতকরা মাত্র ২৮ পারসেণ্ট খরচ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর আয়ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

মোট মজুদ বীমার পরিমাণ	২৬,৪৩,০৪৮৲
আলোচ্য বর্ষের নূতন কাজের পরিমাণ	৫,০৫,০০০৲
মোট প্রিমিয়াম	১,২৯,৭৭৩৲
মোট বীমা তহবিল	৪,৩০,৭৭৪৲
মোট আয়	১,৫৫,১৪৭৲
মোট ব্যয়	৩৯,১৩৩৲
আলোচ্য বর্ষে দাবীর পরিমাণ	৬৬,৬০১৲

অতঃপর কোম্পানীর কাজের পরিমাণ এবং অবস্থা সম্পর্কে গত তিন বৎসরের একটি তুলনা-মূলক সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

বর্ষ শেষ, ৩১শে ডিসেম্বর	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২
বৎসরের প্রথমে হস্তে স্থিত তহবিল	৪,০৪,৯৯৫৲	৪,১০,৩৩৫৲	৪,২৫,৪৯৬৲	৪,৩০,৭৭৪৲
মোট প্রিমিয়ম আয়	১,১৮,২৬৭৲	১,২৭,৭৫৯৲	১,২৯,৭৭৩৲	
এজেণ্টদিগকে কমিশন দেওয়া হয়	১৮,২৬০৲	১৬,১৮০৲	১৪,৩৫৬৲	
প্রিমিয়ম আয়ের শতকরা কত ভাগ দেওয়া হইয়াছে	১৫·৪	১২·৬	১১·০	

দাবীর পরিমাণ	৭০,৮৬৬৲	৭৬,৯৩৬৲	৬৬,৬০১৲
পলিসি প্রত্যর্পণের পরিমাণ	৪,৪৬০৲	১,২০৭৲	৫,২২৭৲
কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার মোট ব্যয়	৪৪,৪৭২৲	৪২,১০৯৲	৩৯,২৩৮৲
প্রিমিয়ম আয়ের শতকরা কত ভাগ খরচ হইয়াছে	৩৭'৬	৩২'৯	৩০'২

আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৩৮৯খানা পলিসির উপর ৫,০৫,০০০৲ টাকার বীমা ইস্থ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মৃত্যু অন্তে দেয় পলিসির বাবদ এক লক্ষ টাকা এবং বাকী মেয়াদী বীমায় ইস্থ করা হইয়াছে। কোম্পানীর দিক দিয়া দেখিতে গেলে মৃত্যু অন্তে দেয় পলিসির সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। এই হিসাবে হিন্দু মিউচুয়ালের এইরূপ পলিসির সংখ্যার অনুপাত মন্দ হয় নাই।

বাতিল পলিসি

আলোচ্য বর্ষে ৪,৬৭,০০০৲ টাকার ৩৬৩খানা পলিসি প্রিমিয়মের টাকা না দিবার জন্য বাতিল হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৩,৪৯৭৫০৲ টাকা মূল্যের ৩০৮ খানা পলিসি বাতিল হইয়াছিল। ৩০ সাল অপেক্ষা ৩১ সালে নষ্ট পলিসির সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৫,০৫,০০০৲ টাকার কাজ সংগ্রহ হইলেও পূর্ব্ব সংগৃহীত কাজের মধ্য হইতে ৪,৬৭,০০০৲ টাকার কাজ নষ্ট এবং বাতিল হইয়া যাওয়া খুব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। জগদ্ব্যাপী দুর্দ্দশা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দুরবস্থাই ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী হইলেও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ রিপোর্টের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চীফ এজেন্টরা ইহার জন্য কম দায়ী নহেন।

প্রিমিয়ম চালাইবার ক্ষমতা নাই এরূপ লোকের জীবন সংগ্রহ করিয়া আনা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাতে এজেন্ট, কোম্পানী অথবা বীমাকারী কেহই স্থায়ীভাবে লাভবান্ হন না। যে সামান্য কিছু প্রিমিয়ম এবং কমিশন কোম্পানী এবং এজেন্ট যথাক্রমে পান, তার বিনিময়ে যে হয়রাণী এবং ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় তাহা কম নহে। আর বীমাকারীর ত' যোলআনাই লোকসান। এত টাকার পলিসি বাতিল হইয়া যাওয়া কোম্পানীর পক্ষে খুব দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। তবে তাঁহারা এই চীফ এজেন্সী বাতিল করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং আগামী বর্ষে বাতিল পলিসির সংখ্যার অনুপাতও কম হইবে আশা করা যায়। তাহা ছাড়া কতকগুলি পলিসি আবার পুনর্জ্জীবিত হইবে বলিয়া আশা করি। আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ২৪০০০৲ টাকা মূল্যের ২২ খানা পলিসি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর ১৯, ৫০০৲ টাকা মূল্যের ১৫খানা পলিসি পুনরুদ্ধার করা হইয়াছিল। ৩০ সাল অপেক্ষা ৩১ সাল আরও কঠিন দুর্ব্বৎসর থাকা সত্ত্বেও নষ্ট পলিসি উদ্ধারের সংখ্যা বাড়িয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে প্রোপাগ্যাণ্ডা হইয়াছে তাহার কুফল নিবারিত হইলে আগামী বৎসর হইতে নষ্ট পলিসি উদ্ধারের সংখ্যার অনুপাত আরও যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

দাবীর টাকা

আলোচ্য বর্ষে দাবীর পরিমাণ হইয়াছিল ৬৬, ৬০১৲ টাকা; ৩০ সালে দাবীর পরিমাণ হইয়াছিল ৩৪,০২০।/৩ টাকা; গত দুই বৎসরে দাবীর পরিমাণ মোট দাড়াইয়াছিল ১,০০,৬২১।/৩ টাকায়। এই টাকার মধ্যে আলোচ্য বর্ষে ৬৬,০৫১ টাকার দাবী মিটানো হইয়া গিয়াছে, বাকী মাত্র ৩১,৫৭০।/৩ টাকার দাবী মিটাইতে আছে। এই দাবীর টাকা মিটাইবার তৎপরতার উপরেই বীমা-কোম্পানীর ক্রেডিট ও সুনাম নির্ভর করে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে হিন্দুমিউচুয়্যাল এবারে তাঁহাদের খ্যাতি ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

কোম্পানীর ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট বা লগ্নী

কোম্পানীর মোট লগ্নীর পরিমাণ ৫,২৩,৪৪৮৶০ টাকা। তন্মধ্যে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতেই ৩,৩৪,৭০০৲ টাকা খাটিতেছে। যে সকল বন্ধকী জমি কোম্পানীর হাতে অসিয়াছে তাহাতে ৮৬,০০০৲ টাকা আবদ্ধ আছে। পলিসি বন্ধকের উপর ৯৩,৫৬৯/৯ টাকা ধারে খাটিতেছে এবং মর্টগেজ রাখিয়া ৮,৩০০৲ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। এই লগ্নীর বিবরণ হইতে দেখা যায় যে কোম্পানীর হস্তেস্থিত মোট টাকার প্রায় ⅗ অংশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতেই খাটানো হইতেছে। নিরাপদ এবং নির্ভাবনার দিক হইতে (Safety and security) বিচার করিতে গেলে এই সব সিকিউরিটিতে টাকা খাটানো যে নিরাপদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একমাত্র ভয় যা সে depreciationএর; অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজের বাজার পড়িয়া গেলে (যুদ্ধের পর হইতে এতকাল যাবত কম সুদের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর বাজার দর কেবল পড়িয়াই আসিতেছে) কোম্পানীর Assetsএর ভ্যালুয়েশনও কমিয়া যায়। এইজন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে কোম্পানীর যত বেশী টাকা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে খাটিতেছে তাহাদের ভ্যালুয়েশন রিপোর্টেও তত বেশী ঘাটতি বাহির হইয়াছে। এই ঘাটতি মিটাইবার জন্য অনেক কোম্পানী রিজার্ভফণ্ড

গঠনের ন্যায় Shares Equalisation fund, Investment Reserve fund ইত্যাদি নানা নামে এক এক স্বতন্ত্র ফাণ্ড গঠন করতঃ সেই টাকার দ্বারা ভ্যালুয়েশনের ঘাটতি মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষের রিপোর্টে দেখিতেছি হিন্দুমিউচুয়্যালও এক ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট রিজার্ভফণ্ড করিয়াছেন এবং তাহাতে ১,০৮,২৬৮।০ টাকা জমা দেখাইয়াছেন।

আমাদের ব্যক্তিগত মত এই যে, গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর বাজার দর ওঠানামাজনিত ভ্যালুয়েশনের এই যে ঘাট্‌তি ও বাড়্‌তি ইহাতে কোনও কোম্পানীর কিছুমাত্রও যায় আসে না, যতক্ষণ সেই কোম্পানীকে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বাজারে বেচিয়া দাবীর টাকা অথবা অন্য দেনা শোধ করিতে না হয়। যে কোম্পানীকে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বেচিয়া দেনার টাকা দিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে অবশ্য সিকিউরিটীর বাজার দর বেশী পড়িয়া যাওয়া একেবারে মারাত্মক ব্যাপার। কিন্তু যাহাদের তাহা করার কোনও দরকার নাই—তাহাদের পক্ষে এই ভ্যালুয়েশনের ঘাট্‌তি বাড়তি একটা Paper Calculation বা কাগুজে জল্পনা মাত্র। পক্ষান্তরে সিকিউরিটীর বাজার দর হাজার নামিয়া গেলেও, তাহার যে সুদ, তাহা চিরকাল অটুট ও অনড় থাকে। এই সুদের আর কোনও হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; সুতরাং এই সুদ জনিত যে আয় তাহার উপর কোম্পানী একান্তমনে নির্ভর করিতে পারেন, যাহা আর কোনও সেয়ারের উপর করিতে পারেন না।

তবে গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে সমুদয় টাকা আবদ্ধ করার বিপক্ষে প্রধান আপত্তি এই যে ইহাতে আর কোনও জাতীয় অনুষ্ঠান তাহা হইলে আর মাথা খাড়া করিতে পারে না। অথচ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ট্রাম, রাস্তাঘাট, ইলেক্‌ট্রিসিটি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী সমূহের প্রিমিয়াম-লব্ধ আয়ের জন্যই হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও উঠিতেছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে সুদের হার এত অসম্ভব কম, যে সব টাকা ইহাতে আবদ্ধ করিলে কোম্পানীর পক্ষে ভাল বোনাস দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, অথচ বীমা জগতে এখন সর্ব্বত্রই বোনাস্ দিবার জন্য একটা Craze বা পাগলামি পড়িয়া গিয়াছে। কে কত বোনাস্ দিতেছে তাহা দেখিয়াই লোকে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই সকল কোম্পানীতেই বীমা করিতেছে। থাক এ-বিষয়ে উভয় পক্ষে এত কথা বলিবার আছে যে, সে-সব আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়। ভবিষ্যতে তাহার ইচ্ছা রহিল। আমরা হিন্দু মিউচুয়্যালের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে বলি।

মরগেজের দেনা বাবদ কোম্পানীর হাতে যে জমি আসিয়াছে তাহাতে কোম্পানীর ৮৬০০০৲ টাকা আবদ্ধ হইয়া আছে। এই টাকার বাবদ কোম্পানী কোনও সুদ বা রিটার্ণ পাইতেছেন কিনা তাহা কোথাও উল্লেখ দেখিলাম না। অথচ এতগুলি টাকা দীর্ঘকাল যদি অমনি পড়িয়া থাকে তবে তাহা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে। আমাদের মতে এই জমি বিক্রয় করিয়া টাকা উদ্ধার করাই সমীচীন; অথবা জমির উন্নতি সাধন করিলে (development scheme) যদি ভাল দামে উহা বিক্রয় করা যায় তবে তাহা করাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক এ বিষয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ঘোষণা

কলিকাতা কর্পোরেশন বিজ্ঞপ্তি

(১)

[পাকা বাড়ী এবং বস্তিগুলির মালিকদের ভোট দিবার অধিকার]

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা এতদ্‌সম্পর্কিত রেজিষ্টারে নাম লিপিবদ্ধ রাখিবেন তাহাদের পক্ষেও ১৯২৩, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯২৩ সালের ৩ বেঙ্গল এক্ট) কার্য্যকরী হইবে।

(১) ১৯৩১, এপ্রিল হইতে ১৯৩২, মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে কোন ছয় মাসের মধ্যে যে-কোন সম্পূর্ণ বা আংশিক বাটীর ভাড়াটীয়া যিনি মাসিক ২৫৲ বা তদূর্দ্ধ ভাড়া দিয়াছেন।

(২) গত বৎসরে (এপ্রিল, ১৯৩১ হইতে মার্চ্চ ১৯৩২ পর্য্যন্ত) একাদিক্রমে ছয় মাসের জন্য বস্তী মধ্যস্থ যে কোন খোলার বাড়ীর মালিক যিনি উক্ত বৎসরে এই কারণে অন্ততঃ ১২৲ কর প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্‌সম্পর্কে যে রেজিষ্টার প্রস্তুত হইবে তাহাতে নাম ভর্ত্তির জন্য উল্লিখিত দাবী সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে। উক্ত আবেদন ১৯৩২, ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছাইতে হইবে। উক্ত রেজিষ্টারে যাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে, ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে তাহারা ভোট দিতে পারিবেন।

(২)

[যুক্ত পরিবার, বডি কর্পোরেটস্, ফার্ম্ম, কোম্পানী ইত্যাদির ভোট দিবার অধিকার]

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯২৩ সালের বেঙ্গল এক্ট ৩) অনুসারে নির্ব্বাচন তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে, এবং এতদ্‌সম্পর্কে উক্ত আইনের ২০ ও ২৪ ধারা মতে ভোটদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। যে সকল যুক্ত পরিবার, বডি কর্পোরেটস্, ফার্ম্মস্, কোম্পানী বা ব্যক্তি সমষ্টির কোন প্রতিষ্ঠান, যাহারা উক্ত আইনের ১০ অধ্যায় মতে কর বা ১১ ও ১২ অধ্যায় মতে ১৯৩১-৩২ বৎসরে ১২৲ বা তদূর্দ্ধ লাইসেন্স ট্যাক্স দিয়াছেন তাহারা যদি ১৯৩২,১৫ই সেপ্টেম্বর মধ্যে কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারের নিকট উক্ত কারণে ভোটদাতা হিসাবে তাহাদের কোন প্রতিনিধির নাম রেজেষ্ট্রী করিবার জন্য আবেদন করেন, তবে তালিকা নির্ব্বাচনের কার্য্য সহজ সাধ্য হইবে। জানান যাইতেছে যে,উক্ত নাম রেজিষ্ট্রেশন ব্যতীত কাহারও ভোটদানের অধিকার থাকিবে না।

জে, সি, মুখার্জ্জী

চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,

২রা আগষ্ট, ১৯৩২।

ইহাদের মোট টাকার প্রায় ⅔ ভাগ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে আবদ্ধ আছে ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই সব সিকিউরিটীর বাজার দর শতকরা প্রায় ৫২% টাকা পড়িয়া যায়। অথচ এই সময় ভ্যালুয়েশন করিলে কোম্পানীর assetsএর মূল্যও প্রায় ঐরূপ কমিয়া যায়। ইহা কাগুজে হিসাব (Paper Calculation) হইলেও বীমা মহলে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ ভ্যালুয়েশনের তারিখ পিছাইয়া দিবার জন্য অথবা গত পাঁচ বৎসরের সিকিউরিটী সমূহের বাজার দরের একটা গড় করিয়া (average of 5 years) তাহার উপর ভ্যালুয়েশন করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। শুধু হিন্দু মিউচুয়্যাল কেন, ভারতের অতি প্রাচীন এবং বর্দ্ধিষ্ণু প্রথম শ্রেণীর অনেক কোম্পানীও (যাঁহাদের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে বিস্তর টাকা খাটিতেছে) দরখাস্ত করিয়াছিলেন। Indian Life Assurance offices Association এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট এক যুক্তিপূর্ণ আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী রথের চাকা সহজে নড়ে না। কোম্পানী অনেক দিন যাবত গভর্ণমেণ্টের উত্তরের অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু বাৎসরিক রিপোর্ট জুনের মধ্যে কোম্পানীর আইনতঃ বাহির করা চাই বলিয়া এইরূপ অসম্ভব ঘাটতির ভ্যালুয়েশন ধরিয়াই এই বার্ষিক রিপোর্ট বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর এই সব সিকিউরিটির বাজার দর শতকরা প্রায় ১৫৲ টাকা চড়িয়া যাওয়ায় কোম্পানীর assetsএর মূল্যও রিপোর্টে প্রকাশিত মূল্য অপেক্ষা যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি একচুয়ারীর নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে Surplus বা বাড়তি জমা দেখা গিয়াছে। এই ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমোদিত হইয়া আসিলে বীমাকারীদিগের নিকট উহা পাঠাইবেন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়া দিয়াছেন। আশা করি আমাদেরও এক কপি পাঠাইতে ভুলিবেন না।

বাংলা দেশে বীমার কথা জনসাধারণ যখন জানিত না, সেই অন্ধকার যুগে, ৪১ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মিউচুয়্যাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া নানা ঝড়, ঝঞ্ঝা, বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কত বিধবাকে বিপদের সময় দাবীর টাকা দিয়া এই কোম্পানী সাহায্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার বর্ত্তমান কর্ণধার ও সেক্রেটারী মিঃ পি, সি, রায় এম, এ, বি, এল বহুদিন হইতে বীমা জগতে সুপরিচিত; তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুও কার্য্যদক্ষ লোক। ইঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে হিন্দু মিউচুয়্যালের দিন দিন উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

আর একটী কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিতেছি। বার্ষিক রিপোর্টের অনেক জায়গায় ছাপার ভুল দেখিলাম। ইহা মারাত্মক না হইলেও রিপোর্টে বেশী ছাপার ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে, তাহাতে কোম্পানীর প্রেষ্টীজ্ নষ্ট হয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩৩৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পুকুরে মাছ ধরা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অনেক সময় মিরগেল্ মাছ ধরিবার সময় ভাগ্যক্রমে আবার কাতলা আসিয়াও পড়িয়া থাকে; কিন্তু কাতলা কদাচিৎ টোপ ঠোক্রাইয়া থাকে; জোরে কামড়ানো তাহার অভ্যাসের বাহিরে। কাতলার মুখবিবর বেশ বড়; আধারের কাছে ঘেঁসিয়া জল শুষিয়া লইবার সময়, মাঝে মাঝে টোপশুদ্ধ বড়শী তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া যায়। তখন যদি তীব্রবেগে ছিপ টি মারা যায়, তাহা হইলে অনেক সময় কাতলা মাছও ধরা পড়িয়া থাকে।

কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যদি কাত্লা মাছ ধরাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্য একটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ফাত্নাটিকে বড়শীর সূতো বাড়িয়া এত উপরে তুলিতে হইবে যে তোমার টোপটি ঠিক মাটীর উপর পড়িয়া যায় এবং ফাতনাটিও ঠিক জলের উপর ভাসিতে থাকে। তারপরে খুব আস্তে হুইলের সূতা গুছানো শেষ কর। পূর্ব্বে যেমন ফাত্না হইতে আধার পর্য্যন্ত বড়শীর সূতোটা সোজাসুজি ভাবে ঝুলিতেছিল, এখন উহা ছিপের দিকে তেরছা ভাবে বাঁকা হইয়া আসিবে। এতদ্ব্যতীত তোমার সর্ব্বসমেত তিনটি বড়শীরও প্রয়োজন হইবে; উপরে যে দুইটী বড়শী থাকিবে তাহাতে আধার দেওয়া থাকিবে, নীচেরটায় কিছুই থাকিবে না। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে উহার আশেপাশে চালের কুঁড়া ছিটাইতে হইবে; কেননা, কাত্লা মাছ উহা

খুব পছন্দ করিয়া থাকে। জলের ওপরে ঘূর্ণীর মত আন্দোলন উঠিলেই বুঝিতে পারিবে যে কোন কাত্‌লা মাছ আসিয়া হাজির হইয়াছে। কাত্‌লার অবস্থা দেখিয়া যদি বুঝিতে পার যে বড়শীতে চাপ পড়িয়াছে, অমনি প্রাণপণ জোরে ছিপটা মারিতে হইবে।

রোহিত এবং সাদা কার্প মাছের সম্বন্ধে আরো দুই একটি কথা বলিতে চাই। কোন মাচার উপর না বসিয়া জলের সমান্তরাল ভাবে তীরে বসিলে মাছের গতিবিধি কতকটা স্পষ্টভাবে চোখে ধরা পড়ে। সকল সময়েই ছিপের জন্য একটী মৃত্তিকাপ্রোথিত আশ্রয় রাখিতে হইবে; উহা তীর হইতে কয়েক ফিট দূরে থাকিবে। খাঁজ-কাটা লাঠি কিংবা "Y" আকৃতি বিশিষ্ট কোন বৃক্ষের শাখা দিয়া কাজ চলে। লোহার ডাণ্ডার মাথা ক্রুশের মত কিংবা খোঁড়া লোকের বগলে দিবার লাঠির মত করিয়া লইলেই সব চেয়ে ভাল হয়; তাহা হইলে আর গাছের ডাল খুঁজিবার জন্য নানান জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। এরূপ দণ্ডের মাথার অংশ জল হইতে আঠার ইঞ্চির বেশী উপরে থাকিবে না।

মৎস্য বাহিনী তোমাকে জলের ধারে দেখিয়া যে ভয় পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবিও না। সাধারণতঃ জলের রঙ্‌ এমন ধরণেরই থাকে যে মাছ হাজার চেষ্টা করিলেও ৩।৪ ফিট জলের নীচু হইতে তোমাকে দেখিতে পাইবে না। মাছের আবার স্থানীয় জায়গা হইতে নড়িয়া চড়িয়া বেশী দূর যাইবার অভ্যাস নাই। যদি হঠাৎ তোমার আধার কোন প্রকারে খসিয়া পড়িয়া যায়, মাছ ঠিক সেই জায়গাতেই আবার তোমার আধারের লোভে আসিয়া হাজির হইবে। দুই এক গজ এদিক-ওদিক দূরে আধার থাকিলেও পূর্ব্বের জায়গা আর একবার পরখ্‌ করিয়া দেখিয়া যাইবে। তাহারা আধারে স্বয় পাইবার পাত্র নোটেই নয়; আধারের যে সমস্ত ছোট ছোট টুক্‌রা বিভিন্ন হলে ছিটকাইয়া পড়ে, তাহার দিকেই তাহাদের বেশ নজর থাকে। যদি তাহারা না ঠোক্‌রায় তাহা হইলে টোপ্‌ একবার উঠাইয়া লইয়া আবার ধীরে ধীরে জলে নামাইয়া দিলেও অনেক সময় মাছের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তোমার যে দিন মনে হইবে যে মাছের ঠোক্‌রাইবার বিজ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, তাহার পরদিনই তুমি তোমার নিজের হাতের কসরৎ দেখিয়াই অবাক হইয়া যাইবে। মাছের আধার লইবার বিশেষত্ব খুব ভাবিয়া চিন্তিয়াই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি; তবু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই বিজ্ঞান কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কাত্‌লার কাছ ঘেঁসিয়া বুদ্‌বুদ উঠিতেছে, তখন মনে করিতে হইবে যে তোমার টোপের কাছে মাছের পায়তারা চলিতেছে। রোহিত মাছ একসঙ্গে অনেক ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ তুলে; মিরগেল মাছ মধ্যম আকারের দুই একটি বুদ্‌বুদের বেশী সাধারণতঃ তুলে না। কাত্‌লা মাছ একটা বুদ্‌বুদ তুলিবে, কিন্তু আকারে উহা অত্যন্ত বড়।

মাছ উপরে তোলা

রোহিত মাছকে উপরে তুলিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের একটী জাল চাই। এসব মাছ সাধারণতঃ খুব ভারী হইয়া থাকে; কাজেই জাল ধরিয়া তুলিবার জায়গা যাহাতে বেশ শক্ত হয়, তাহার দিকে খুব দৃষ্টি দিতে হইবে। মাছের নীচে জাল গড়াইয়া দিয়া তাহার পর উহাকে

উপরের দিকে টানিয়া তুলিলেই হইল। জালের নীচের দিকে একখণ্ড পাথর ফেলিয়া দিয়া তারপরে মাছ জালের মধ্যে পুরিলেই ভাল হয়; কেননা, উহাতে জালের তলদেশ ভালরূপে বিস্তৃত হয় এবং মাছও সুবিধামত উহাতে আটকানো চলে। কিন্তু বড় মাছ তুলিবার সময়, জলের মধ্যে সঙ্গের ভৃত্য কিংবা অপর কাহাকেও নামাইয়া দিলেই ভাল হয়। মাছকে খেলাইয়া পরিশ্রান্ত করিবার পর উহাকে উপরে ধরিয়া আনিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। বেশীর ভাগ মাছই অবশেষে ঠাণ্ডা মেজাজে তীরে আসিতে বাধ্য হয়।

বড় মাছ তীরে উঠিলেই তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দেয়। তাহাকে হত্যা না করা পর্য্যন্ত বড়শী খুলিতে চেষ্টা করিও না, কেন না, অনেক সময় উহাতে বড়শী অঙ্গুলে কি বা শরীরের অন্য কোথাও বিঁধিয়া যাইতে পারে। ইংরেজেরা সাধারণতঃ ঘুষী মারিয়া কি বা মাথায় আঘাত করিয়া মাছ মারিয়া থাকে, অনেকে চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াও হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু মৎস্যের পার্শ্বদেশে আঘাত করিয়া উহার ব্লাডার ফাঁসাইয়া দিলে, সহজেই মাছ মরিয়া যায়।

গভীরতা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, কত গভীর জলে মাছ মারা যাইতে পারে? উহা কখনো আড়াই ফিট তিন ফিটের কম হওয়া উচিত নহে, কেননা বড় মাছ খুব কম জলে কদাচিৎ আসে। আসিলেও আবার তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে বেশী জলে অদৃশ্য হইয়া যায়। ৩, ৪, ৫ কিংবা ৬ ফিট গভীর জল পর্য্যন্ত যদি ছিপ দিয়া লাগাল পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেখানে বড় মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিন্তু কখনো ছিপ হইতে অনেক বেশী দূরে টোপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার প্রয়াস পাইও না; কারণ উহাতে ফাতনার গতিবিধি দেখাও যেমনি কষ্টকর, তেমনি মাছ টানিয়া তোলাও এক ভীষণ ব্যাপার।

সময়

আমার মনে হয় যে মার্চ্চ হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্তই মাছ ধরিবার প্রকৃষ্ট সময়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিবাসীরা মে-জুন মাসে মাছ ধরা খুব পছন্দ করিয়া থাকে; কলিকাতায় আবার মে হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ বৃষ্টির দিন, মাছ ধরিবার প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া অনেকে মনে করেন। গরমের দিনে, বিশেষতঃ যখন বৃষ্টি বাদল নামিতে থাকে, তখন মাছের দল খাদ্যানুসন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে খুব পেটুক মাছ ছাড়া আর কেহ ঝড়ঝঞ্ঝা এবং ঘন বৃষ্টিতে আশ্রয় ছাড়িয়া খাদ্যানুসন্ধানে বাহির হয় না।

রোহিত মৎস্য ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমানে ঠোকরাইতে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু যদি ঋতুর কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে ভোর ৭৷৮টা হইতে বেলা ১২টা কিংবা ১টা পর্য্যন্ত এবং বিকালে ৪—৫টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্তই উহাদের উদর পূর্ত্তি করিবার লোভ বাড়িয়া থাকে। যখন চোখের প্রাণপণ দৃষ্টিশক্তি দিয়াও ফাত্‌নার প্রবল আন্দোলন অনুভূত হয় না, তখনই যেন বড় বড় 'লাজুক' মাছের আবির্ভাব হইতে থাকে। আমি ফাতনার গায়ে উজ্জ্বল পেণ্ট দিয়া কাজ চালাইতে চাহিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক দূরের ফাত্‌না আদৌ দৃষ্টি-গোচর হয় না।

অনেক জায়গায়, যেমন কলিকাতায়, রাত্রি-কালেও মাছ ধরা হইয়া থাকে। দিনের হট্টগোল যখন মিলাইয়া আসিতে থাকে, চারিদিক নিশুতি নিঝুম—এইসময় বড় বড় মাছের দল খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়া থাকে। প্রায়ই সন্ধ্যার পরেই ভাল মাছ ধরা পড়িয়া থাকে। একটি মোটামুটি শক্তিশালী এসিটিলিন সাইকেল বাতি ফাতনার উপর ফেলিয়া মাছের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

আরও একটা কথা এই সঙ্গে বলা দরকার বোধ করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মাছের খেলা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলে ; একটি হার না মানা পর্য্যন্ত ইহার আর শেষ হয় না। যদি তুমি সতর্কভাবে মাছ খেলাইয়া তুলিতে না পার, মাছের নিকটে আসিবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়। আমরা তিনজনে একসঙ্গে মাছ ধরিয়াছি ; প্রত্যেকের মধ্যে ৮।১০ ফিটের বেশী ব্যবধান ছিল না। আমার দুই পার্শ্বের সহচরেরা যখন মাছ খেলাইয়া তুলিতেছিল তখন আমার বড়শীতেও মাছের ঠোকরানি সুরু হইয়া গিয়াছে। একা একা মাছ মারার চেয়ে আমি একজন সঙ্গী ঢের বেশী পছন্দ করি। যে সমস্ত আধার মাছে ঠোকর দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং যাহা অসময়ে ছিপটি মারার জন্য চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে, তাহার প্রত্যেকটি টুকরাই মাছকে প্রলুব্ধ করিয়া বড়শীর কাছে লইয়া আসে। যে মাছ একবার টোপ চুরী করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে সে যে দ্বিতীয়বার তোমার ছিপটি খাইবার ভয়েই
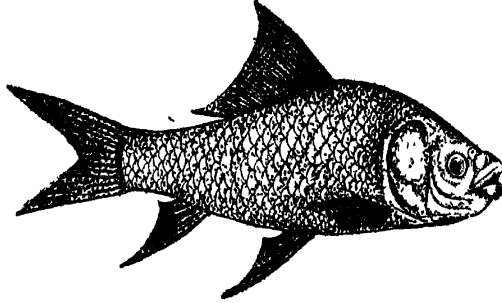
এক জাতীয় কাত্‌লা মাছ।

তাহা হইলে উহাকে হারাইবার সম্ভাবনাই বেশী। অনেক সময় দেখা যায়, যে, মাছ বড়শীবিদ্ধ হইয়াই পুকুরের মধ্যের দিকে ছুটিতে থাকে। এই ধরণের বড় মাছ খেলাইয়া তুলিতে পারাই মৎস্য শিকারীর প্রধান কৃতিত্ব এবং আনন্দ।

যদি কয়েকজনে মিলিয়া মাছ ধরিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে একসঙ্গে বসিয়া মাছ ধরাই সুবিধাজনক। কেননা, ইহাতে প্রচুর সংখ্যক আর কাছে ভিড়িবে না, তাহা কখনো মনে করিও না। যদি কোন বড় মাছ এরূপ স্থলে ধরা পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রভাবে একটু দূরের মল্লক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে।

কচ্ছপ

অনেক পুকুরে কচ্ছপের সংখ্যা খুব বেশী। তাহারা আবার মাছের মতই কায়দা মাফিক ভাবে ঠোকরাইতে থাকে। কিন্তু বড়শীতে একবার

বিঁধিয়া গেলেই কোন্‌টা মাছ আর কোন্‌টা কচ্ছপ তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। কেননা, কচ্ছপ একবার বড়শী গিলিয়া ফেলিলে আর দিগ্বিদিক জ্ঞান করে না—একেবারে ভোঁ করিয়া সোজা তলের দিকে নামিতে থাকে। তখন জোর করিয়া উহাকে টানিয়া তুলিতে হয়। কালো উদর যুক্ত কচ্ছপের শরীর দিয়া মিউনিসিপ্যাল ড্রেনের মত দুর্গন্ধ বাহির হয় ; হলদে রঙের কচ্ছপ দিয়া কিন্তু আহার্য্য প্রস্তুত হইতে পারে। শুভ্র উদরযুক্ত কচ্ছপ আরো চমৎকার।

চিংড়ি

চিংড়ি মাছ অনেক সময়ে বিরক্ত করিয়া থাকে। টোপ জলের নীচে তলাইয়া যাইবা মাত্রই তাহাদের চুরী করিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে। পূর্ব্বে তাহাদের ঠোকরাইবার যে বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতেই তাহাদিগকে চিনিয়া লওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইবে না। কলিকাতায় আমি অনেক লোককে চিংড়ি মাছ ধরিতে দেখিয়াছি। তাহারা রোচ্ হুকের মত আকারের বড়শীতে চিংড়ির টুকরা দিয়া টোপ্ গাঁথিয়া জলে ফেলিয়া থাকে। বড়শী এত ছোট থাকে যে চিংড়ি মাছ উহা পাইয়াই গিলিয়া ফেলে এবং তখন ছিপটি মারা হয়। কিছু সময় দেওয়ার পর যখন দেখা যায় যে ফাত্‌না ডুবিয়া একদিকে সরিয়া যাইতেছে, তখনই বড়শী টানিয়া তুলিবার প্রকৃষ্ট সময়। যদি আরো ছোট বড়শী ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ফল আরো ভাল হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের লক্ষ্য, চিংড়ি মাছ ধরা নহে ; উহা তাড়াইবার জন্য ফন্দী বাহির করা মাত্র। পূর্ব্বেই মুর্গীর নাড়ীভুঁড়ি জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিবার জন্য যাহা বলিয়াছি, সেই অনুসারে কাজ করিলেই চিংড়ির দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে বলিয়া আমি মনে করি।

চারের কথা

ময়দা-জাতীয় উপাদান হইতে যে টোপ্ প্রস্তুত হয়, তাহা যেমন সহজ, সুন্দর এবং কার্য্যকরী, তদ্রূপ আর কিছুই নহে। অনেক সময়ে চীনে-বাদাম জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় না ; কাজেই আমি নিম্নলিখিত আরো কয়েকটী উপাদান সংযোগে আধার প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

দুই অংশ সূক্ষ্ম সিদ্ধ চাউল চূর্ণ ও ধনেকে অর্দ্ধসিদ্ধ এবং চূর্ণ করিয়া উহার এক অংশ। এতৎসঙ্গে কুঁড়া সংযোগ করিয়া সমস্ত আধারটি যাহাতে কতকটা শক্ত হইয়া উঠে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কলিকাতার মৎস্য-শিকারীরা আধার কিংবা চার প্রস্তুত করিতে খুব ওস্তাদ। তাহারা সাধারণতঃ সরিষার খলিকে চূর্ণ করিয়া লইয়া উহার সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি মিশ্রণ করিয়া থাকে—

মেথি	៸১ সের
একাঙ্গী	៸১
তুম্বুল	៸॥৹
কালো সরিষা	៸।৹
কুঁড়া	៸৹ ছটাক

এই সমস্ত জিনিষকে তাওয়ায় কিংবা বিস্তৃত-মুখ মাটীর পাত্রে করিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যখন হাওয়া আসিবার দিকেরও ৮।১০ হাত দূর হইতে ইহার গন্ধ পাওয়া যাইবে, তখন ইহা নামাইয়া লইয়া সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ কর। তাহার পরে সমস্ত জিনিষটাকে খইলের সঙ্গে মিশ্রিত কর। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার কর :—

উহার বড় এক কিংবা দুই চামচে লইয়া, ৬ হইতে ৮ মুঠো পুকুরের তীরস্থ কাদা লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কবুতরের ডিমের মত করিতে হইবে। তুমি যেখানে বড়শী ফেলিবে তাহার কাছাকাছি ইহার ডজনখানেক ডিম ফেলিয়া দাও। যেখানে এই ডিমগুলি পড়িবে, তাহারও এক ফুট কিংবা এক হাত আগে বড়শীটি পড়া চাই।

অনেক সময় দেশী মদের সঙ্গে চাউলের কুঁড়া এবং অন্যান্য উপাদান মিশ্রণ করিতে হয়; ইহাও ভালই বটে। অনেকের মতে মৌরী দিয়াও বেশ ভাল কাজ হয়। অনেকে পূতিগন্ধময় জিনিষ দিয়াও কাজ চালাইতে চান এবং সেইজন্য পচা পনীর, আলু, কেঁচো প্রভৃতি কুঁড়া ও কাদা ইত্যাদির সঙ্গে মিশাইয়া থাকেন। আমি কিন্তু উহা আদৌ পছন্দ করি না। এতদ্ভিন্ন পুকুরের পানীয় জল আমি এইরূপে দূষিত হওয়া সমীচীন মনে করিতে পারি না।

টোপ।

চাউলের গুঁড়ার সঙ্গে কিছু জল মিশাইয়া লও; উহাকে দুইটী কিংবা বেশী পানের পাতার মধ্যে রাখিয়া আগুনে তাপ দিতে (bake) হইবে। যে পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষটা শক্ত এবং আঠালো না হয় তখন পর্য্যন্ত ঐরূপে জ্বাল দিতে হইবে। তার পরে এক চিম্‌টি পরিমাণ উপাদান উহা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া আঙ্গুলে-আঙ্গুলে ডলিয়া একটী কেঁচোর মত মোটা কর। উহা দিয়া বড়শীর মুখটা এবং উপরের দিকের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া দিয়া চারের কিছুদূরে পুরোভাগে বড়শী ফেলিয়া দাও। যখন এইরূপে মাছের ঠোকরের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে, তখন ৫।১০ মিনিট অন্তর-অন্তর ছোট ছোট ভিজে কুঁড়ার বল ফাত্‌নার কাছে ফেলিবে। ইহাতে কেবলমাত্র মাছ যে কাছে আসিবে তাহা নহে, পরন্তু জল ঘোলা হওয়ার জন্য বড়শীর সূতা ও ছিপ্ মাছের চোখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে না।

কেঁচো, পিপ্‌ড়ার ডিম প্রভৃতি দিয়াও টোপ তৈয়ার হইতে পারে। পনীর কিংবা সম্ভব হইলে তাহার পরিবর্ত্তে পিপ্‌ড়ের ডিম এবং একটু ঘি রুটির সঙ্গে মিশাইয়া লইলে মাছের পক্ষে লোভনীয় টোপ প্রস্তুত হয়। ছোট চিংড়ি দিয়াও অনেক সময়ে কাজ চালানো হয়। যে সমস্ত ময়দার পিষ্টক ভাপ দিলে আঠালো ধরণের হয়, তাহা দিয়াও টোপ্ বানানো চলিতে পারে।

"আরা" এবং "ঝিমা" উপায়ে মাছ-ধরা।

বাংলা দেশে এইরূপে মাছ ধরা খুব প্রচলিত আছে। বাঙালীরা মনে করে যে "আরা" উপায়ে কাত্‌লা মাছ ধরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট (অনেকের মতে একমাত্র) পন্থা। একটী বাঁশের গিঁট বা সংযোগ স্থান চিরিয়া ঝাড়ুদারের ঝাটার মত করিতে হইবে; তার পরে উহার একপার্শ্বের সংযোগ স্থলের ভিতরে একটী পাতলা বাঁশ প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। তার পরে এই "ঝাটার" মধ্যে চার ভরিয়া লইয়া, বাঁশের বিচ্ছিন্ন অংশগুলির শেষভাগ উল্টাইয়া আনিয়া বাঁশের চারিদিকে বাঁধিতে হইবে; আকারটি ঠিক যেন ছোট ফুটবলের মত হয়। তার পরে উহার লম্বা বাড়ানো পার্শ্বটা জলের নীচে ডুবাইয়া দিতে হয়; বড়শীর সূতোতে ২।৩টী শূন্য কাত্‌লা-বড়শী গাঁথিয়া, উহাকে "আরার" কাছাকাছি ফেলিতে হইবে। জলের উপরে যে বাঁশের অংশটুকু থাকে তাহা এবং কাত্‌লার মৃদু

কম্পন হইতেই কাত্‌লা মাছের আগমনের কথা জানিতে পারা যাইবে। তার পরে সময় বুঝিয়া ছিপ্‌টি মারিলেই হইল।

যে সমস্ত পুকুরে বেশী জল নাই, সেখানে "ঝিমা" উপায়ে মাছ ধরা এক প্রকার অব্যর্থ ফলদায়ক। যদি মাচান হইতে মাছ ধরা যায়, তাহা হইলে উহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। চারদিকে চার ছড়াইয়া ফেলিয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হয়; তার পরে তিনটে বড়শীর একটীতে বড় আধার গাঁথিয়া লইয়া অন্ততঃপক্ষে ২০ গজ আল্‌গা সুতা নিজের কাছে রাখিয়া বড়শী জলে ফেলিবে। বড়শীর সুতায় টান পড়িলেই মাছের আবির্ভাব সংবাদ মৎস্য-শিকারীর কাছে পৌঁছিয়া যাইবে। সুযোগ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপ টা মারিবে; এরূপ ধরণে মাছ মারিতে গেলে ফাতনার আর প্রয়োজন হয় না। "আরা" এবং "ঝিমা" প্রথায় মাছ মারা কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তিজনক।

সাজ-সরঞ্জাম।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্তসার এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এক সপ্তাহ মাছ ধরিবার জন্য যে সমুদয় দ্রব্যাদি প্রয়োজনীয়, এখানে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

একটা দশ ফিট লম্বা হাল্কা বাঁশের ছিপ্ একটা রিল, ২।• হইতে ৩ ইঞ্চি ব্যাস তিনটি ফাত্‌না।

৩০ কিংবা ৪০ গজ মুগা নির্ম্মিত বড়শীর সুতো।

দুই ডজন বেয়ার আইড লিমেরিক, ১নং বড়শী।

এক ডজন কাত্‌লার বড়শী, দেশী প্রস্তুত।

তিন ডজন লম্বা স্যালমন সুতা।

নরম সীসার তার, ২।৩ গজ।

একটী সীসক গোলক, বড়শী ডুবাইবার জন্য।

একটা মাছ ধরিয়া উঠাইবার জাল।

আধার।

চার।

একটী ছুরি কিংবা কাঁচি।

(ক্রমশঃ)

সাবানের রাজা লেভারহুমের জীবনী

এইবার Lord Leverhulmeএর জীবনী লিখিয়া এই প্রবন্ধটী শেষ করিতে চাই। আশা করি আমাদের দেশের যুবকদিগের চক্ষুরুন্মীলন হইবে ও তাঁহারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টের চাকরী, হাকিমী, জজিয়তী, ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং বা শেষে কেরাণীগিরি ইত্যাদির লোভ ছাড়িয়া ব্যবসাতে মন দিবেন। সকলেই জানেন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"।

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৫১ শকাব্দে বোল্টন সহরে William Hesketh Lever জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একজন সামান্য মুদী ছিলেন। ইঁহাকে বিশেষ কোন শিক্ষা দিতে পারেন নাই। সুতরাং ১৫ বৎসর বয়সে ইনি একটী মুদির দোকানে সপ্তাহে এক শিলিং বা বার আনা বেতনে কার্য্যে ভর্ত্তি হন। ইঁহার কার্য্য ছিল মোটা সাবান কাটিয়া কাগজে প্যাক করিয়া বিক্রয় করা। এইরূপে ছয় বৎসর তিনি অপর দোকানে ও শেষে তাঁহার পিতার দোকানে চাকরী করেন। তিনি দোকানের মালিকের পুত্র হইয়াও তাঁহার পিতার দোকানের অন্যান্য চাকরের সহিত একত্রে পান ও ভোজন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। সাবান বিক্রীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি সাবান বিক্রী করিবার জন্য Commercial travellerএর কার্য্য করিতে সুরু করেন। প্রথমে একদিন সাড়ে তিন ঘটিকার মধ্যে তাঁহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত খরিদ্দারের দোকান বেড়ান হইয়া গিয়াছিল। অলসতা করিয়া বাটীতে বা কোন Restaurantএ সময় কাটাইতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তখন তিনি আর কিছু মাইল দূরের দোকান বেড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করাতে তাঁহার খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এইরূপ ভাবে কমিশনে কার্য্য করিয়া তিনি ৪০০০ চারি হাজার পাউণ্ড বা ৬০০০০৲ টাকা ৫।৬ বৎসরে সংগ্রহ করেন। ঐ নূতন স্থানে Wigan সহরে একটী Grocers Shop বা বড় মুদিখানা বিক্রয় ছিল; তাহা ৪০০০ পাউণ্ড দিয়া খরিদ করিলেন।

যখন মুদিখানা হইতে যথেষ্ট টাকা আয় হইতে ছিল তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে কমিশন লইয়া পরের সাবান বিক্রী করা অপেক্ষা নিজে কেন একটী ছোট সাবানের কারখানা করি না? এইরূপে প্রথমে তিনি পরের কারখানাতে Advance দিয়া নিজ ব্যয়ে সাবান প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। £50 বিজ্ঞাপনে খরচ কবিলেন,পরে সাবানের অর্ডার খুব আসিতে লাগিল। সাবান বিক্রয়ও হইল, কিন্তু খরিদ্দারেরা সাবানগুলি ফেরত পাঠাইল, কেননা সাবান কিছুকাল থাকিবার পর উহা হইতে বিশ্রী গন্ধ বাহির হইতে লাগিল।

সাধারণ লোক এ ক্ষেত্রে হতাশ হইয়া পড়ে। তিনি কিন্তু আদৌ হতাশ হইলেন না। অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিসে সাবানের এই দোষটী যায়। এমন সময় একদিন একটী স্ত্রীলোক খরিদ্দার যাহার ব্যবসা Dyeing & Cleaning

তাঁহার দোকানে আসিয়া বলিল যে তিনি সেই দুর্গন্ধযুক্ত সাবান (Stinking Soap) যত দিতে পারেন সবই লইবেন। এই স্ত্রীলোকটী সর্ব্বপ্রকার কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে এই সাবানে কাপড় খুব উৎকৃষ্ট পরিস্কার হয় বলিয়া সমস্ত গুদামের ফেরৎ মাল খরিদ করিয়া লইলেন ও বলিয়া গেলেন যে আপনি যদি এই দুর্গন্ধটী সরাইতে পারেন তাহা হইলে আপনার সাবান জগৎ জুড়িয়া বিক্রয় হইবে।

এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া একজন Chemist এর সাহায্যে তিনি সহজেই এই দোষের কারণ বাহির করিলেন। বাতাসে Oxygenএর সহিত সাবান তৈলের রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়াতে সাবানে দুর্গন্ধ হইয়াছিল। পরে এই দোষটী সারাইয়া দিলে সাবানের খুব কাটতি হইতে লাগিল।

এই সময়ে Washington সহরে Soap Boilers দের একটী কারখানা বিক্রয়ার্থ থাকে। তাহার মালিকের সহিত দুইশত পাউণ্ড বাৎসরিক ভাড়াতে এই কারখানাটী লইয়া নিজ ব্যয়ে সাবানের তিনি ব্যবসা বৃদ্ধি করেন। সাবানের ব্যবসায়ের মূলধনের জন্ম নিজের মুদিখানাটী (যাহা চারি হাজার পাউণ্ডে খরিদ করিয়াছিলেন) ২৭০০০ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন।

১৮৮৩ সালে লেভারহুম্ তাঁহার সাবানের quality perfect করেন ও এই কারখানাতে সপ্তাহে ২০ টন মাল প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বেকার মত নিজে খরিদ্দারের দ্বারে দ্বারে যাইয়া বিক্রয় করিয়া সাবানের কাটতি বাড়ান। তিনি এরূপ দ্রুত উন্নতি করিতে থাকেন যে যখন অন্য সাবানের কারখানাগুলি মাল সরবরাহ করিতে তিন মাস দেরী করিতেছিল ও যোগাইতে পারিতেছিল না তখন তিনি এক বৎসর বাদে তাঁহার কারখানা হইতে সপ্তাহে ১৫০ টন মাল প্রস্তুত করিয়া সকল গ্রাহকের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দ্বিতীয় বৎসরে হাজার হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিলেন।

এক্ষণে তিনি একদিন ভাবিলেন যে এই অর্থ উপার্জ্জন কি তাঁহার নিজের পরিশ্রমের ফল? তিনি মুদিখানা দোকান করিয়া ও কমিশনে সাবান বিক্রী করিয়া যেরূপ ও যতটুকু পরিশ্রম করিতেন ইহাতে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। যাহা রোজগার করেন তাহাতে তাঁহার এত টাকা লাভ একা লওয়া উচিত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—এই লভ্যের টাকা তোমরা পাইতে হক্‌দার। ইহা শুনিয়া সকল কর্ম্মচারীই আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও বলিল—যদি তাহাই হয়, তবে আপনি অন্যত্র একটী নূতন স্থানে নূতন ভাবে বড় একটী কারখানা করিয়া দিউন; এই টাকাতে ও আপনার টাকা দিয়া, আমরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আপনার কার্য্যে সহায়তা করিব। তাহাতে আপনিও লাভবান্ হইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে।

এইরূপে আশ্বাসিত হইবার পর লেভার সাহেব কারখানার যায়গা খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী পরিত্যক্ত Pottery Factory দেখিলেন, আর সেইটী তিনি খরিদ করিলেন। সেইখানেই এক্ষণে জগৎ বিখ্যাত Port Sunlight Soap Factory অবস্থিত। এই Factoryতে লেভার যখন বৎসরে 50000 পাউণ্ড লাভ করিতেছিলেন তখনও তিনি বাৎসরিক 35 পাউণ্ড ভাড়াটীয়া বাটীতে বাস করিতেন। তিনি আমাদের আধুনিক ব্যবসাদারের ন্যায় হঠাৎ বড় বাড়ী ও জুড়ী গাড়ী করেন নাই। তিনি বলেন যে তাঁহার উন্নতির কারণ হইতেছেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহার চা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে কার্য্যে পাঠাইতেন ও দিবাভাগে কারখানাতে তাঁহার কার্য্যের সাহায্য করিতেন। তিনি জীবনে একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে—

Without her Grace and influence I doubt if there would have been a Port Sunlight or a firm of Lever Brothers.

তিনি আরও বলিয়াছেন—

Prudence is a great virtue, But a man must have the courage of his faith and his will if he is to get ahead.

It was intended by our Creator that we should work and it is only by work that we maintain our health; for there is no other way of being either healthy or happy."

"A man who would expect to receive benefits and make no extra effort would only be like a man sitting with Comrades in a boat and letting the other men pull the oars, he putting no weight into his own oar."

"You cannot in the whole of humanity find that we have all of us been endowed with exactly the same balance of health and strength and mental and physical fitness of power. We are all unequal."

There is no one who is strong in all directions. I find some people are afraid that if they meet what, We in England call the rank and file,—you

are the rank and I am the file - then when they meet after wards in business th re would be a loss of disc'pline. I have found it so. I have never found that it makes for anything but good."

Lord Leverhulme এর উপরোক্ত maxim গুলি আমি বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিলাম না কারণ ইহাতে force কমিয়া যাইবে ও হয়ত আমি তাঁহার ঠিক মনের ভাব বাঙ্গালাতে ফুটাইতে পারিব না। Lord Leverhulm ৭০ বৎসর বয়সেও ৪॥০ ঘটিকার সময় শীতপ্রধান দেশে উঠেন ও চা পান করিয়া কার্য্যে বাহির হয়েন। তিনি বলেন ইহা না করিলে কেমন করিয়া ৪০০০০ লোককে খাটাইয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবেন ?

তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইকে আফ্রিকা হইতে আনাইয়া লেভারসাহেব Lever Prothers নামে firm খুলেন যাহার মূলধন ১৩,০০০০ পাউণ্ড। ইহার ভিতর ১৬৯০০০ পাউণ্ড workman দিগকে dividendএ ও ৫৬০০০০ পাউণ্ড Shareএ দিয়াছেন। Mr. Lever ১৯১১ সালে Baronet হন, ১৯১৭ সালে ব্যারণ হন ও ১৯২১ সালে Viscount হইয়াছেন। Viscount Burnham এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"If ever there was a man who has deserved the title of 'Merchant Prince of the Napoleonic pattern', he is the man".

Lord Leverhulm কর্ম্ম যোগীর অবতার। তিনি বিশ্বাস করেন কর্ম্ম দ্বারায় মানুষ উন্নত হইতে পারে ও সেইজন্য ৭৮ বৎসর বয়সেও অতিশয় উদ্যমের সহিত কর্ম্ম করিয়াছেন। তিনি বহু টাকা তাঁহার স্ত্রীর স্মরণার্থে দান করিয়াছেন।

অতএব হে নব্য বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা কর্ম্মবীর হও, কর্ম্মের সাধনা কর, কর্ম্মই হইতেছে জীবন—চা খাইয়া, গল্প করিয়া, থিয়েটার দেখিয়া হো হো করিয়া ফুটবল খেলা দেখিয়া না বেড়াইয়া কোন শিল্প বা ব্যবসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অচিরে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভে সমর্থ হইবে এই আমার আশা ও বিনীত নিবেদন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাতের কাজ

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ বিশ্বাস

এম্‌ব্রয়ডারি কাজ আজকাল সহরের প্রায় প্রত্যেক ঘরের মেয়েরাই কিছু না কিছু জানেন। এ কাজটির আজকাল খুব বেশী প্রচলন হইলেও, সুদূর পল্লীগ্রামে এখনও তত বেশী প্রচলিত হয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ শিক্ষা দিবার লোকের অভাব। আমি নিজে অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, কোন একজন বৌ হয় ত এমব্রয়ডারি বা অপর কোন কাজ জানেন; কিন্তু তিনি তার জন্য এত বেশী গর্ব্ব অনুভব করেন যে তত্রত্য সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে মিশেন না, বা যদিও মিশেন তো শিখিতে ইচ্ছুক মেয়েদের সংস্পর্শে আসিলেই নানা কাজের অছিলায় তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইতে চান। এইজন্য এ-সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে আমার সহিত পত্র ব্যবহার করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি। এম্‌ব্রয়ডারি কাজে সাধারণতঃ একটী কাপড় আঁটিবার ফ্রেম, রেশম, ও একখানি ছোট ধারাল কাঁচি আবশ্যক। অনেকে বিনা ফ্রেমেও কাজ করেন, কিন্তু ফ্রেম হইলে অনেক সুবিধা হয়। ফ্রেমে কাপড়টিকে টান করিয়া ধরিয়া রাখে - কোন অংশ কুচকাইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না।

রেশম আবার অনেক প্রকার আছে—দেশী, সিবনী, D.M.C, Eastern Dyeing ইত্যাদি; যে কাজে যিনি যে রেশম পছন্দ করিবেন তাহাতেই হইবে; এমব্রয়ডারি কাজে সাধারণতঃ দুই প্রকার সেলাইয়ের আবশ্যক হয় ফ্ল্যাট ষ্টিচ্‌ (flat stitch) ও ব্যাক্‌ ষ্টিচ্‌ (back stitch) আরও অনেক প্রকারের সেলাই আছে সেগুলি না জানিলেও চলে।

এম্‌ব্রয়ডারি কাজে ড্রইং জানিলে বিশেষ সুবিধা হয়, নতুবা কাগজে আঁকা Design (ডিজাইন্‌) কাপড়ে তুলিবার সময় বড় মুস্কিল হয়। সাধারণতঃ অনেকেই কাপড়ের উপর

কার্ব্বণ দিয়া ডিজাইন তোলেন; কিন্তু ভেলভেট সাটিন বা কাল কাপড়ের উপর কার্ব্বণ দিয়া ডিজাইন তোলা যায় না। এক, tracing paperএ হয়; কিন্তু তাহা অতি ব্যয়সাপেক্ষ। ইহার একটি সহজ নিয়ম আছে। একটি কাগজের উপর Tracing Paper দিয়া ডিজাইনটি তুলিয়া লইতে হইবে—তারপর সেই চিত্রিত লাইন গুলিকে মোটা ছুঁচ ফুটাইয়া ফুটাইয়া ছিদ্রযুক্ত করুন, ছিঁড়িয়া দিবার সুবিধার জন্য যেমন কোন রসিদ বা বিলের মাঝখানে থাকে। এইবার ওই কাগজটা যাহার উপর চিত্র তুলিতে হইবে তাহার উপর সোজাভাবে রাখিতে হইবে। চিত্রটি উপরে থাকিবে; কাগজটা যাহাতে নড়িয়া না যায় সে জন্য চারি কোণে চারিটী পিন কাপড়ের সহিত আঁটিয়া দিন। এইবার ফুল-খড়ির গুঁড়া একটু ন্যাকড়া করিয়া লইয়া ওই ছিদ্রযুক্ত লাইনগুলির উপর ঘসিয়া যান, পরে কাগজটি তুলিয়া ফেলিলে বিন্দু দ্বারা চিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে দেখিবেন। এইবার পরিষ্কার পাতলা গঁদের আঠায় ফুল-খড়ি ঘসিয়া চন্দনের মত করুন; তারপর তুলি বা অপর কিছুর সাহায্যে ঐ গঁদে-গোলা খড়ি দ্বারা বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করিয়া দিন; তাহা হইলেই চিত্র অঙ্কিত হইল এবং ঐ রেখা হাতে রগড়াইলেও উঠিবে না।

কাপড়টি প্রথমতঃ ফ্রেমে আঁটিয়া বেশ টান করিয়া লইতে হয়। তারপর ছুঁচে দেড় হাতের বেশী রেশম পরাইলে বুনিতে অসুবিধা হয়; সাধারণতঃ ফুল-পাতা যাহা কিছু flat stitchএ, ও ফুল পাতার ডাঁটাগুলি back stitchএ করিতে হয়। প্রত্যেক ছুঁচের ফোঁড়াগুলি খুব কাছে কাছে হওয়া চাই, যাহাতে রেশমগুলি গায়ে গায়ে পড়ে। যদি কাপড়ের একদিকে কাজ করিবার দরকার হয় তাহা হইলে ছুঁচ যে দিক দিয়া নামিবে ঠিক সেই দিক দিয়াই উঠিবে। অর্থাৎ ছুঁচ নামিবার সময় কাপড়ের যে গর্ত্তটির ভিতর দিয়া গেল, পুনরায় উঠিবার সময় ঠিক তাহার পার্শ্বেই একটি গর্ত্ত করিয়া উপরে উঠিবে। যদি দুদিকে সমান কাজের আবশ্যক হয় তাহা হইলে ছুঁচ যেদিক দিয়া নামিবে তাহার উল্টা দিক দিয়া উঠিবে। এই ভাবে রুমাল প্রভৃতিতে ফুল তুলিতে হয়। ফুলের পাপড়ী বা পাতা প্রত্যেক জিনিষটার মাঝখানে একটি কাল্পনিক লাইন দিয়া দু'ভাগে ভাগ করিয়া লইলে সেলাইয়ের সুবিধা হয়।

সেলাইকে সর্ব্বদা হেলাইয়া অর্থাৎ বাঁকা করিয়া করিবেন। Flat stitch সোজা হইলে দেখিতে খারাপ হয়। Flat stitch সাধারণ সেলাই-ই, কেবল বাঁকাভাবে সেলাই হইবে। Back stitchএ সেলাই ছুঁচের পিছন দিকে অগ্রসর হইবে। মনে করুন ক, খ, গ, ঘ, চারিটি বিন্দু আছে। প্রথম ক-বিন্দু ফুড়িয়া ছুঁচ তুলিয়া খ-বিন্দুর মধ্য দিয়া নামাইয়া দিলেন। পরে ক ও খ-র ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে ছুঁচ তুলিয়া গ-বিন্দুর মধ্য দিয়া দিন; আবার ছুঁচ খ গ-র মধ্যবর্ত্তী স্থানে উঠিয়া ঘ-বিন্দুতে নামিবে। এইভাবে সেলাই করিবার সময় ছুঁচ রেশমের ডান দিক বা বাম দিক যে দিক দিয়া উঠিবে সর্ব্বদা ঠিক সেই একদিক দিয়াই উঠিবে নামিবে।

এইরূপে সেলাই সর্ব্বদা যাহাতে এক রকম হয়। তাহার দিকে নজর রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ যতদিন যাইবে এ কাজের প্রত্যেক সেলাইটি নিখুঁত ও সুন্দর হইবে। প্রথম প্রথম লতা, পাতা, ফুল ইত্যাদি সহজ কাজ আরম্ভ করা উচিত। পরে এই ছুঁচের দ্বারাই ভাল ভাল landscape ছবি পর্য্যন্ত তৈরী করা যায়। Embroidery কাজ করিতে করিতে সুবিধা ও

সৌন্দর্য্যবোধ অনুযায়ী সেলাইএর ইতর বিশেষ আপনা হইতে আয়ত্ত হইয়া যায়।

এ-কাজে খুব বেশী ধৈর্য্যের দরকার। চঞ্চল প্রকৃতিতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজ করা কঠিন। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হয় সেজন্য সর্ব্বদা পিঠের শিরদাঁড়া সোজা রাখিয়া কাজ করা উচিত ও রাত্রিতে ছুঁচের কাজ একেবারে না করাই ভাল, কারণ ইহাতে অল্পদিনে চোখের দোষ হইতে পারে। ছুঁচের কাজ এক কালিন বসিয়া কতক্ষণ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছুই বলা যায় না। এটা যার যার স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এক নাগাড়ে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছুঁচের কাজ করিয়াও ক্লান্তি অনুভব করি নাই। তবে যখনই কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করা যায় বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখনকার মত এ-কাজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

হাতের কাজ ময়লা হইয়া গেলে অনেক সময় তাহা দেখিতে অতি কুৎসিত হয়। তাহাকে নিম্নলিখিত উপায়ে পরিষ্কার করা যায় ;—

ফুটন্ত জলে কিছু ভাল কাপড়-কাচা সাবান দিয়া সাবানটাকে একেবারে গলাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে ওই ফেনা সমেত জল নামাইয়া তাহাতে ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া তাহার উষ্ণতা দূর করিতে হইবে। এইবার এই জলে হাতের কাজ-করা কাপড়টি তাড়াতাড়ি ধৌত করিয়া পরে একবার ঈষৎ গরম জলে ও বার দুই ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিতে হইবে। কাপড়টিকে কোন কারণে যেন নিঙ্‌ড়ান না হয়। কোঁচকান স্থানগুলি হাতে সোজা করিয়া দিয়া শুক্‌না কাপড় উপর-নীচে দিয়া চাপিয়া যতটা জল পারা যায় ঝরাইয়া দিতে হইবে। পরে ঐ কাপড় ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাইতে হইবে। ইহাতে যদি উহার উজ্জ্বলতা কিছু কমিয়া যায়, তাহা হইলে পৌণে দুই পাইণ্ট জলে মাঝারি চামচের এক চামচ এসেটিক এসিড মিশাইয়া ওই জলে ধৌত করিয়া লইলে আবার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আসিবে।

তুলার কাজ

এ কাজ করিতে হইলে বেঙ্গল কেমিক্যালের এক প্যাকেট এমব্রয়ডারি কটন (পাট করা তুলা) ও একখানি ধারাল, মুখ ছুঁচাল ছোট কাঁচির আবশ্যক তুলার সাধারণতঃ হাঁস খরগোস, বা কুকুর দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা দেখিতে তত সুন্দর হয় না। এমব্রয়ডারি কাজের দ্বারা যদি Back ground (জমি) তৈয়ার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে খুব সুন্দর হয়। মনে করুন, তুলার হাঁস করিতে হইবে। Back groundএ রেশম দিয়া যদি জল ও জলের ধারে যেরূপ গাছ পালা জন্মে সেইরূপ দু'চারটি গাছ করিয়া সেই জলের উপর হাঁস বসান যায়, তাহা হইলে হাঁসের চেয়ে ইহা দেখিতে অতি সুশ্রী হয়।

সাধারণতঃ বক, হাঁস, খরগোস, কুকুর, পাখী ইত্যাদি তুলার করিতে পারা যায়। প্রথমে যাহা করিতে হইবে তাহা একটি কাগজে আঁকিয়া লউন। এইবার শুধু ছাপটিকে রাখিয়া কাগজের সমস্ত অংশ কাটিয়া ফেলুন। তারপর চিত্রযুক্ত কাগজটি গঁদের আটা দিয়া তুলার উপর বসাইয়া কিছুক্ষণ শুকাইতে দিন। পরে কাঁচি দিয়া কাগজের মাপে তুলাটিকে কাটিয়া ফেলুন। তাহা হইলে তুলার ছবি হইল। পাখীর ডানাগুলি আলাদা করিয়া তুলার কাটিয়া লইয়া পূর্ব্বের ছবির উপর আঠা দিয়া বসাইতে হইবে। এ

কাজে যাঁহার যত সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিবে তাঁহার ছবি তত সুন্দর হইবে। সাধারণ ভাবে পাখীর ডানা, চোখ, পা ইত্যাদি যেরূপ আকৃতির হয়, ঠিক সেইরূপ আকৃতিতে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী এগুলি তুলায় কাটিতে হইবে ও যথাস্থানে বসাইতে হইবে। চোখ উজ্জ্বল ফুকো দানা বা পাথরে পোকার ডানা কাটিয়া যে কাজে যে জিনিষের চক্ষু করিলে মানানসই হইবে সেই স্থানে সেই জিনিষ দিয়া চোখ করিতে হইবে।

ঝিনুকের কাজ

এ কাজে সমুদ্রের ছোট ঝিনুক ও শিরিসের আঠার আবশ্যক। ফুল, পাতা যাহা করিতে হইবে তাহা কাপড়ে আঁকিয়া লইতে হইবে। তারপর ন্যাকড়ার টুক্‌রা দ্বারা মটরের ন্যায় ছোট ছোট বল তৈয়ারি করুন। এইবার এক একখানি ঝিনুক চিৎ করিয়া তাহার গর্ত্তের ভিতর একটু শিরিসের আঠা দিয়া তাহার উপর একটি ন্যাকড়ার বল বসাইয়া ঝিনুকখানি উপুড় করিয়া মাটিতে চাপিয়া ধরুন—যেন ন্যাকড়ার কোন অংশ বাহির হইয়া না থাকে। এইবার ঝিনুকখানি চিৎ করিয়া উহার উপরে অর্থাৎ গর্ত্তের ভিতরকার ন্যাকড়ার বলের উপরে পুনরায় শিরিসের আঠা দিয়া যেখানে ফুল হইবে তাহার এক একটী পাপড়ির উপর বসাইয়া দিন। এইরূপে পাঁচ ছয়খানি ঝিনুকে ফুলের আকার অনুযায়ী এক একটি ফুল হইবে। কুঁড়িগুলি এক একখানা ঝিনুকের হইবে। বাদবাকী লতা-পাতা যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা রেশম কিম্বা পুঁতি দ্বারা করিতে হইবে। ঝিনুকে ফুল ও ফুলের কুঁড়ি ভিন্ন আর কিছু করিতে পারা যায় বলিয়া আমার বোধ হয় না।

যাহাদের এ-কাজ কিছু জানা আছে তাঁহারা ইহা হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। নূতন শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর ইহার অধিক কিছু জানিতে হইলে বা নমুনার আবশ্যক হইলে পাঁচ পয়সার টিকিট সহ ' Co বিশ্বাস ব্রাদার্স, আলম-বাজার"—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিনা পারিশ্রমিকে আমি সাধ্যমত সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকি। আজকাল অনেক কাজই মেসিনে হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা হাতের কাজের ন্যায় এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না।

———

চিনির কথা

[শ্রীসুরেশ চৌধুরী]

(১)

ভারতবর্ষে কিছুদিন হইল চিনির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে চিনির সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একথা প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এ আলোচনা চিনি সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ (expert) তাঁহাদের জন্য নয়। যাঁহারা চিনির রসাস্বাদন করা ছাড়া চিনি সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ খোঁজ খবর রাখেন না, আলোচনা সাধারণভাবে তাঁহাদেরই জন্য।

ইক্ষু, শর্করা, গুড় ভারতবর্ষের নিজস্ব জিনিষ। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী এই মধুর রস উপভোগ করিতেছে। ভারতের ইক্ষুক্ষেত্র "ইক্ষুচ্ছায় নিষাদিত্যঃ" কৃষকবালকদিগের কলহাস্যে যখন প্রথম মুখরিত হইয়াছিল, তখন অনেক দেশেই ইক্ষু যে এক অজ্ঞাত বস্তু ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুগার শর্করারই অপভ্রংশ। সে অতীত গৌরবের স্পর্দ্ধা করিয়া এখন বিশেষ কোন লাভ নাই। ইক্ষু শর্করার অবস্থা কি, এবং শর্করা বা চিনির ব্যবসায়ে ভারতের স্থান এখন কোথায় আমরা তাহারই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বেশী দিনের কথা নয়, বোধ হয় ৬০।৭০ বৎসর পুর্ব্বেও ভারতের প্রয়োজনীয় চিনি ভারতবাসীরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া খাইত। ভারতের অনেক স্থানে চিনি প্রস্তুত হইত এবং অনেক স্থানের চিনি সুবিখ্যাত ছিল। কাশীর চিনি, গাজীপুরী চিনির নাম এখনও আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে নামের চিনি সেখানে আর তা প্রস্তুত হয় না। বাঙ্গলা দেশেরও অনেক স্থানেই চিনি প্রস্তুত হইত, তাহার ইতিহাস এখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই। কোটচাঁদপুরের চিনির নাম অনেকেই জানেন। উত্তরবঙ্গে ই-বি রেলওয়ের জামালগঞ্জ ও দমদমা (বর্ত্তমান পাঁচবিবি) এই দুই স্থানের চিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এই দুই স্থানের চিনির শেষ কারখানা দেখিয়াছে এবং তাহার প্রস্তুত চিনি উপভোগ করিয়াছে, ঐ অঞ্চলে এখনও এরকম লোক জীবিত আছে। দমদমা গ্রামে যাঁহাদের একাধিক চিনির কারখানা ছিল, তাঁহাদের বাড়ীর নাম ছিল 'বড়বাড়ী'। সে বৃহৎ বসত বাড়ী এখন জঙ্গলাকীর্ণ; বংশধরটি এক মাড়োয়ারীর দোকানে ১০।১২ টাকা মাহিয়ানায় কাজ করিত, কয়েক বৎসর পুর্ব্বে শুনিয়াছি। জামালগঞ্জেরও প্রায় ঐ অবস্থা। চিনির ব্যবসায়ে উভয় স্থানই বেশ সমৃদ্ধ ছিল। এখন আর সে সমৃদ্ধি নাই ; সর্ব্বত্র যে হাহাকার, সেখানেও ঘরে ঘরে সেই হাহাকার। ভারতের অনেক স্থানেই ঐ রকম চিনি প্রস্তুত হইত এবং এখন অনেক স্থানের অবস্থাই প্রায় ঐ রকম। দক্ষিণ বিহার,

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও দেখিয়াছি ঐ একই অবস্থা।

বিদেশী চিনি আসিয়া যখন ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, তখন সেই প্রতিযোগিতা-মূলক আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার মত কেহ দাঁড়াইল না। রাজশক্তি রক্ষা করিল না; প্রজাশক্তি যেমন ঘুমাইয়া ছিল তেমনি ঘুমাইয়া রহিল। বিদেশীয় চিনি ক্রমে ক্রমে ভারতের বাজার দখল করিয়া ফেলিল। বিদেশী চিনির আমদানী যতই বাড়িতে লাগিল, ভারতীয় চিনির কারখানাগুলি ততই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে বাঙ্গলার চিনির কারখানাগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। ভারতের অধিকাংশ শিল্পবাণিজ্যের অতীত কাহিনী যা, চিনিরও ঠিক তাই; সে সম্বন্ধে আমাদের অদৃষ্ট-লিপির কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে, অনেক বৎসরে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের যত চিনির প্রয়োজন, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চিনি আমরা ব্যবহার করি, তাহার প্রায় সমস্তই এখন বিদেশ হইতে আসে; সামান্য কিছু এখনও ভারতে প্রস্তুত হয় মাত্র। এইটুকু যে আছে তাহার কারণ এই যে, ভারতের মাটির হইতে আরম্ভ করিয়া সব জিনিষেরই কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকিবার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে।

মোট আমদানী

বর্ত্তমান সময়ে ভারতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় দুই

কোটি তিয়াত্তর লক্ষ সতের হাজার মণ চিনি আমদানী হইয়া থাকে। এই প্রায় তিন কোটী মণ চিনির মূল্য হিসাব করিয়া যত টাকা হয়, তত কোটী টাকা আমরা প্রতি বৎসর বিদেশীর হাতে তুলিয়া দেই ; এবং প্রতিদিন ভোরের চায়ের টেবিল হইতে আরম্ভ করিয়া 'শ্রাদ্ধ-বাসর' পর্য্যন্ত এই চিনি নিশ্চিন্ত মনে, বহাল তবিয়তে, সানন্দে আমরা গলাধঃকরণ করি। এই হতভাগ্য দেশের লোক দরিদ্র হইবে না তো দরিদ্র হইবে কাহারা ?

প্রয়োজনের পরিমাণ

প্রতি বৎসর আমরা যে পরিমাণ চিনি সব রকমে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া লইব। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর গড় পড়তায়,—

বিদেশ হইতে আমদানী ... ১০ লক্ষ টন
ভারতের কয়েকটি কারখানায় প্রস্তুত
(কারখানা স্বদেশী নয়)... ১ লক্ষ টন
ভারতে দেশী প্রথায়
প্রস্তুত ... ... প্রায় ২ — ২॥ লক্ষ টন
— ——— —
প্রায় ১৩॥০ লক্ষ টন

সর্ব্বপ্রকারে আমরা প্রায় এই সাড়ে তের লক্ষ টন চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি। ২৭/০ মণের কিছু বেশীতে এক টন হয়। মণের হিসাবে ধরিলে প্রায় তিন কোটী আটষট্টি লক্ষ আটাত্তর হাজার মণ হয়, অর্থাৎ প্রায় পৌণে চার কোটী মণ। এই পরিমাণ চিনির দ্বারা আমাদের রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। এর উপর আবার গুড় ত' আছেই। তার পরিমাণ আরও অনেক বেশী। আমরা নানা রকমে প্রতি বৎসর ছয় কোটী বিরাশী লক্ষ বিরানব্বই হাজার অর্থাৎ প্রায় ৭কোটী মণ গুড় ব্যবহার করি। আমরা চিনি যা ব্যবহার করি তার দ্বিগুণ গুড় ব্যবহার করি। গুড় এখনও বিদেশ হইতে আমদানী হওয়া আরম্ভ হয় নাই , সামান্য কিছু হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে পরে বলিব।

এখন দেখা গেল যে, প্রতি বৎসর গড়ে আমাদের প্রায় ১৩॥০ সাড়ে তের লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন। এর মধ্যে ভারতে যে কয়েকটি চিনির কারখানা আছে, তাহাতে প্রস্তুত হয় প্রায় ১ এক লক্ষ টন ; আর প্রায় ২ দুই লক্ষ হইতে ২॥ আড়াই লক্ষ টন (আমরা ২॥০ আড়াই লক্ষ টনই ধরিয়া লইয়াছি) প্রস্তুত হয় প্রধানতঃ রোহিলখণ্ডে উত্তর পশ্চিম ভারতে। ভারতের অন্য কোন প্রদেশে এখন আর উল্লেখ করার মত চিনি কোথায়ও প্রস্তুত হয় না। বাঙ্গালা দেশে তো হয়ই না। যাহোক আমাদের প্রয়োজনীয় এই ১৩॥০ সাড়ে তের লক্ষ টন চিনির মধ্যে, দেশী প্রথায় আড়াই লক্ষ, ভারতীয় কলের একলক্ষ, এই সাড়ে তিন লক্ষ বাদে অবশিষ্ট ১০ লক্ষ টন চিনি আমরা বিদেশ হইতে—ভারতের বাহির হইতে—আমদানি করি ; অথবা অন্য রকম ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বিদেশী বণিকেরা এই দশ লক্ষ টন চিনি ভারতের বাজারে আনিয়া প্রতি বৎসর উপস্থিত করে এবং আমরা তাহা আমাদের প্রয়োজন মত খরিদ করি।

অল্প মূলধনে চিনি প্রস্তুতের হিসাব

সংবাদপত্রে আমার প্রবন্ধ দেখিয়া যাঁহারা আমাকে পত্র দিতেছেন, তাঁহাদের জানাইতেছি যে, অয়েল ইঞ্জিন বা মোটর সহ দেড় ফুট সেনট্রিফিউগাল মেসিনে প্রত্যেকবারে ৩০ সের

দানাদার ইক্ষু, খেজুর বা তাল গুড় ঢালিলে ১০।১২ মিনিটের মধ্যে ১০ হইতে ১৬ সের চিনি প্রস্তুত হয়। বাকী গুড় হইতে মাত ও চিটা পাওয়া যায়; পুনরায় ঐ চিটাকে পাকাইয়া ২নং বাদামি রংয়ের চিনি প্রস্তুত করা যায়, নতুবা উহা তামাক প্রস্তুতাদিতে ব্যবহার হয়। উক্ত সেন্ট্রিফিউগাল মেসিনে দৈনিক ৮ ঘণ্টায় এক টাকার তৈল বা মিটারের খরচ পড়ে। ইঞ্জিন চালক একটি লোকের দৈনিক বেতন এক টাকা, গুড় ভাঙ্গা, মেসিনে ঢালা চিনি বাহির করা ইত্যাদি ২টী লোকের আট আনা হিসাবে এক টাকা খরচ পড়ে। দৈনিক ২০ মণ গুড় খরচ ৪৲ হিঃ ৮০৲, ঘর ভাড়া ইত্যাদি খরচ এক টাকা। দৈনিক মোট খরচ ৮৪৲ টাকা। ২০ মণ গুড়ে দৈনিক অন্যূন ৯ মণ চিনি প্রস্তুত হইবে, চিনি বিক্রী ৯৲ টাকা হিসাবে ৮১৲ টাকা, বাকী ১১ মণ চিটা (যদি ২নং চিনি প্রস্তুত করিতে না পারা যায়) প্রতি মণ এক টাকা হিসাবে এগার টাকা, মোট ৯২৲ টাকা। খরচ মোট ৮৪৲ টাকা বাদে দৈনিক আয় ৮৲। কিন্তু গুড় খরিদ ৪৲ টাকার কমে হইতে পারে। চিনি বিক্রয় ৯৲ টাকার বেশী হইতে পারে, এবং ২০ মণ গুড় হইতে ৯ মণের অধিক চিনি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

আবার বেল প্রসেসে ইক্ষু রস হইতে দানাদার চিনি প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহাতে অধিকতর লাভ ও চিনিও বেশী সাদা হয়।

পি, এন, পাল, এ, এস, টি, এ, সুগার স্পেসিয়েলিষ্ট।

(বঙ্গবাণী)

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গীয়
মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৪৫ সালের ২১এ আষাঢ় নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালীর সংলগ্ন এলঙ্গি গ্রামে একটি খ্যাতিসম্পন্ন পূতকীর্ত্তি ব্রাহ্মণবংশে স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতদঞ্চলের তৎকালীন স্বনামধন্য পুরুষ ৺কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পিতা ও ৺নবকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পিতামহ এবং অদূরবর্ত্তী মুড়াগাছা নিবাসী ৺রামানন্দ ভৌমিক মহাশয়ের দুহিতা স্বর্গীয়া ভগবতী দেবী তাঁহার জননী ছিলেন। পিতামহ নবকিশোর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন কুমারখালীর রেশম কুঠীর সুদক্ষ দেওয়ান এবং পিতা কৃষ্ণলাল তৎকালীন

মর্য্যাদাসম্পন্ন বঙ্গীয় পুলিশবিভাগের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত মোহিনীমোহনের মাতৃকুল ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৌজন্যে ব্রাহ্মণসমাজে নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

মোহিনী মোহনের পাঁচ ভ্রাতা ও এক ভগ্নী ছিলেন এবং মোহিনীমোহনই তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার ২২ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ এবং ২৭ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয় এবং এই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই একটা বৃহৎ পরিবারের ভার বিষয়ানভিজ্ঞ যুবক মোহিনী মোহনের স্কন্ধে নিপতিত হয়।

পঠদ্দশায় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি অসাধারণ মেধা ও চরিত্রবলে তৎকালীন ছাত্রসমাজে একটি উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া পরিচিত হয়েন। তিনি পরীক্ষায়—কি স্কুলে কি কলেজে— প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন

যৌবনে মোহিনী মোহন।

মোহিনী মিলের কারখানার দৃশ্য।

নাই। সেকালের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা, জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষায় তিনি প্রথমস্থান অধিকার করিয়া তৎকালীন বিদ্বৎ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

মোহিনীমোহন যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে বিশেষ আদরণীয় ও অর্থকরী হইলেও সংসারক্ষেত্রে এই নবপ্রবিষ্ট যুবক তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যার উপযুক্ত অন্য কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মের জন্য অপেক্ষা করিতে সমর্থ না হইয়া ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে এই কুষ্টিয়া মহকুমায় সর্ব্বপ্রথম আঠার টাকা বেতনের একটি কেরাণীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু জ্ঞান ও শক্তি অপ্রতিহত। যতই সামান্যক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হউক না কেন, তাহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। মোহিনীমোহন এই সামান্য কার্য্যে অল্পকাল মধ্যেই যে প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিলেন, তাহাতেই তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী কুষ্টিয়ার তৎকালীন সবডিভিশানাল ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরবর্ত্তী কালে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর আলেকজেণ্ডার ম্যাকেঞ্জি এবং স্যর ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার মোহিনীমোহনের চরিত্র, জ্ঞান ও কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া, বদলির সময়ে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে এবং পরে বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট উপযুক্ত ও সম্মানিত পদ প্রদান করেন। পরে মোহিনীমোহন তাঁহাদেরই পরামর্শ ও উৎসাহে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েন এবং ঐ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বিচারাসন অলঙ্কৃত করেন।

মোহিনীমোহনের ঘটনাবহুল কর্ম্মজীবনে তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা, নির্ভীকচিত্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মোহিনীমোহন যখন নোয়াখালীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন সরকারী তহবিল আত্মসাৎ করার অপরাধে তত্রত্য দেওয়ানী আদালতের জনৈক কর্ম্মচারী এবং কালেক্টারীর সেরেস্তাদার অভিযুক্ত হয়েন। বিচারভার মোহিনীমোহনের উপর অর্পিত হয় এবং কালেক্টর সাহেব আসামীদ্বয়কে শাস্তি দিবার জন্য মোহিনীমোহনকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা, ন্যায়পরায়ণ মোহিনীমোহন কালেক্টর সাহেবের বিরাগভয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ উপস্থাপিত হইল, তাহাতে তিনি তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে না পারায় উপরিতন কর্ম্মচারীর অনুজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দৃঢ়চিত্তে ন্যায়বিচার করিয়া আসামীদ্বয়কে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় যদিও কালেক্টর সাহেবের রোষবহ্নিতে পড়িয়া মোহিনীমোহনকে কিছুকাল বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক মোহিনীমোহন তাহাতে কিছুমাত্র কাতর বা অবনমিত হন নাই। এই উপলক্ষে কালেক্টার সাহেবের সহিত মোহিনীমোহনের যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়, তাহা ক্রমে কমিশনার ও পরে বঙ্গের লাট বাহাদুরের গোচরে আনীত হয়। ফলে মোহিনীমোহনের শীঘ্রই বেতন-বৃদ্ধি হয় এবং পক্ষান্তরে কালেক্টার সাহেব কোনও জেলার ভারপ্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়েন।

ন্যায়নিষ্ঠ মোহিনীমোহন কর্ম্মজীবনের কঠোর কর্ত্তব্য কিরূপ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত সমাপন করিতেন তৎসম্বন্ধে আর একটী ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে কোনও গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কতকগুলি আসামীর বিচার-

ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। আসামীগণের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল তাহাতে তিনি তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার অনুকূলে বিবেকের অনুমোদন পাইলেন না; কাজেই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন। অব্যবহিত পরেই কমিশনার সাহেব তাঁহার অফিস্ পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার এই বিচারফলের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া প্রকাশ্য আদালতে নির্ভিকচিত্তে বলিয়া উঠিলেন:—"Do you think Mr……I have sold my conscience for money ?" এইরূপে মোহিনীমোহন তাঁহার কর্ম্মজীবনে অসংখ্য ঘটনায় যে সৎসাহস, ন্যায়-পরায়ণতা, বিচারবৈশিষ্ট্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, জনপ্রিয়তা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কর্ম্মজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সত্য ও ন্যায় মোহিনীমোহনের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে মন বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়ে। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত মোহিনী-মোহন স্বীয় পুত্রকেও বিপন্ন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মোহিনীমোহন তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ও তাহার সমবয়স্ক একটী বাঙ্গালী ছাত্রসহ ভাবুয়া মহকুমায় অবস্থানকালে তাঁহার জনৈক দুষ্টমতি পদাতিক ঐ ছাত্রটীকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটী বাবুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া কোনও এক ব্যক্তির পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া লয়। পরে মোহিনী-মোহন ঐ বিষয় শুনিবামাত্র অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারীকে ডাকাইলেন এবং তাহার সম্মুখে ঐ পদাতিক, ছাত্র ও পুত্রকে উপস্থিত করাইয়া বলিলেন, "ইহারা তোমার পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে থানায় অথবা আদালতে অভিযোগ করিয়া ইহাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি বিধান কর।" বলা বাহুল্য, মোহিনীমোহনের এই ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল এবং এই ব্যাপারটী আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিল না।

মোহিনীমোহন রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করেন। তাঁহার তৎকালীন পেস্কার এখনও জীবিত থাকিয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। মোহিনীমোহনের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তিনি স্বতঃই বলিয়া থাকেন—"আমি বহু হাকিমের অধীনে চাকুরী করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠ, তেজস্বী অথচ কোমল হৃদয় হাকিম কখনও দেখি নাই। তিনি দণ্ড দিবার সময়ে আসামীকে বলিতেন—"দেখ, বাবা, তুমি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহা আমি নিশ্চয় জানি না; প্রকৃত ঘটনা অবশ্য একমাত্র ভগবান জানেন। কিন্তু, তোমার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে তাহা তোমার দোষই প্রমাণ করিতেছে। অতএব, আইন অনুসারে বাধ্য হইয়া তোমাকে দণ্ড দিতে হইতেছে। এজন্য আমি দুঃখিত।"

মোহিনীমোহন কৃতিত্ব ও সম্মানের সহিত কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর পেন্‌সন্ ভোগ করেন। সাধারণতঃ অবসর গ্রহণ ও পেন্‌সন্ ভোগ নিষ্ক্রীয়তাসূচক হইলেও কর্ম্মী মোহিনীমোহনের এই বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ অবসরকাল একটা যৌবনসুলভ উদ্যম ও অক্লান্ত কর্ম্মের মধ্যেই

অতিবাহিত হইয়াছে। স্বদেশ হিতৈষণার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই মহদুদ্দেশ্য সাধন কল্পে কুষ্টিয়া সহরে তাঁহার বর্ত্তমান আবাস সংস্থাপন করিলেন এবং একটা কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরেই বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে একটা প্রবল আন্দোলন দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যখন দেশের খ্যাতনামা বাগ্মী ও নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সভা আহ্বান ও বক্তৃতাপ্রদান করিয়া সমগ্র দেশ মুখরিত করিতেছিলেন, যখন ভাবুক জনসাধারণ দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বিদেশজাত পণ্যের পরিহার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কর্ম্মী মোহিনীমোহন তাঁহার এই কুষ্টিয়ার আবাসে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া সেই চিন্তাকে একটা আকার দিয়া মূর্ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি অবিলম্বেই ক্ষুদ্র আয়োজনে একটা কাপড়ের কল সংস্থাপন করিলেন। মোহিনীমোহনের নাম হইতেই উত্তরকালে কলের নাম **"মোহিনী মিল"** রাখা হইয়াছিল। দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকে একটা নূতন আকার দিবার জন্য কি অকৃত্রিম অনুরাগ একজন সরকারী কর্ম্মচারীর হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং তাঁহারই দেশাত্মবোধের পরিকল্পনা, সর্ব্বস্ব নিয়োগ এবং কর্ম্ম প্রচেষ্টার ফলে একটা অতি সামান্য গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান হইতে কি একটা বিরাট সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানের সমুদ্ভব হইয়াছে তাহারই মূর্ত্ত ইতিহাস এই "মোহিনী মিল।" (ক্রমশঃ)

ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার উপায়

বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা এবং উন্নতির ইমারৎ ব্যবসা বাণিজ্যকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। আলানাস্কারের মত স্বপ্নবিলাসী ভাবুকেরাও বোধ হয় কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই, যে স্থানকালের অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য অল্পসময়ের মধ্যেই পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইয়া হাজির হইবে। আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে এবং মূল্যে—পৃথিবীর একজাতির শ্রমের ফল অন্য জাতি ভোগ করিতে পারে। দেশীয় শ্রমজাত শিল্পের জন্য নূতন নূতন বাজার খোঁজা এবং পুরাতনগুলির চাহিদা আগের মতই মিটাইয়া যাওয়ায় পৃথিবীর দেশগুলির ভৌগলিক সীমা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটী নূতন মহাদেশের সৃষ্টি হইতেছে এবং সকলের মধ্যেই বাণিজ্যগত প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। এইরূপে এক জাতির উচ্ছিষ্ট বা প্রাচুর্য্য (surplus) অপর জাতির অভাব মিটাইতেছে।

সেকালের লোকেরা বাণিজ্যকে হর্ণ অফ্ প্লেন্টি ("অক্ষয় শৃঙ্গ") দ্বারা রূপায়িত করিয়া বুঝাইত। ফিনিসিয়ান, আরব এবং মিশর বাসীদের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ জগতে প্রচলিত আছে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা কেবল "মুদ্রা" বুঝাইত না—তাহাদের ঐশ্বর্য্য বলিতে বহু পুরুষের সঞ্চিত গজদন্ত তাহাদের মাড়ি, বহুমূল্য মসলা, ধাতব দ্রব্য শিল্পের বস্ত্রাদি প্রভৃতি বুঝাইত। প্রাচীনকালের বণিকেরা উন্মুক্ত সমুদ্রে তাহাদের নৌকা ভাসাইতে ভয় পাইত না; ব্রিটেনের পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত তাহাদের অবাধ গতি ছিল; তাহাদের স্থল-বাণিজ্য বাহিনীও মাইল-কে মাইল লম্বাভাবে একই ফাইলে "গিরি নদী কান্তার" ভেদ করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার দুস্তর মরুভূমিতে পাড়ি জমাইত। এই সমস্ত সৈনিক-সওদাগরের তাঁবু, অশ্ব,তৈজসপত্র প্রভৃতির বর্ণনায় প্রাচীন কালের লেখকেরা মুখর হইয়াছেন।

অনেক যুগ আগে, বাইবেলোক্ত ইসায়া টায়ার অঞ্চলের লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যে তাহারা বণিক-সম্রাট এবং তাহাদের পণ্যবাহক পৃথিবীতে সম্মানিত। বাণিজ্যের স্পৃহা থাকার জন্যই ফিনিশীয় লোকেরা এত সভ্য এবং শক্তিশালী হইয়াছিল যে তাহাদের তাঁবে অনেক নৌকা এবং সৈন্যবল ছিল—এমন কি, ইস্রাইলের রাজারাও ফিনিশীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা গর্ব্বের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। যখন সোলেমন তাঁহার মন্দির গড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি টায়ারের রাজা হিরামের কাছে "চতুর কর্ম্মদক্ষ" লোক এবং নানাবিধ উপাদানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের দিকে চাহিলেই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে মনুষ্যের কল্যাণ এবং উন্নতি ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে!

আমাদের পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য

যে সমস্ত আবিষ্কার এক প্রকার যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে বলিলেই হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই উদ্ভব ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের ফলে। যে ভাসমান রাজপ্রাসাদ বিশাল সমুদ্র মন্থন করিয়া চলিয়াছে, লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া যে ট্রেণ বিদ্যুতের মত হু-হু বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, যে বিদ্যুন্মালা পৃথিবীকে সহস্রশিখায় আলোকজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে—এমন কি, টেলিফোনের তারে তারে স্বর-কম্পন পর্য্যন্ত যে ব্যবসার চাহিদাতেই সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। যদি কোন জাতির বাণিজ্য একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়—তবে পৃথিবীতে তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। আমরা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাবের অঙ্ক দিয়া পাঠকের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দিতে চাহিনা, শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে গ্রেট ব্রিটেনে রোজ একহাজার মিলিয়ন ষ্টার্লিং এর উপর ব্যবসা হয় এবং তাহা অতিক্রান্ত হইয়াও যায়।

অনেকে মনে করেন যে জিনিষপত্র ফ্রি-আমদানি হওয়াতে গ্রেট-ব্রিটেনের উৎপাদিকা শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে; যদি শুল্কের বহর আমদানী মালের উপর কিছু উচ্চহারে থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসার বাজার আরো একটু সরগরম থাকিত। ফ্রি ট্রেডের গণ্ডগোল লইয়া ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহল এবং ব্যবসায়ীর বাজারে ভয়ানক সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। যদিও জিনিষ পত্র ফ্রি আমদানী হওয়াতে কোন কোন ব্যবসার অনিষ্ট হইয়াছে, তবুও বলা যাইতে পারে যে ইহার দ্বারা অধিক সংখ্যক লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুইটি জাতি (জার্ম্মাণী এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স অফ্ আমেরিকা) শুল্ক রক্ষা করিয়াও নানান অসুবিধা ভোগ করিতেছে। বিলাতে ট্যারিফ ওয়াল দিয়া কোন বিশেষ শিল্পকে ঠেকাইয়া রাখিবার প্রচেষ্টায় সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য দেশেও সেই শিল্পের উপরকার ট্যাক্স কমাইয়া কিংবা উঠাইয়া দিবার উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। এই মতদ্বৈধতা বুঝাইয়া দেয় যে জাতীয় জীবনের কার্য্যকরী দিকগুলি এখানো সতেজ রহিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর হইতে বর্ত্তমানের কাজ যাহাতে আরো বেশী হয়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হওয়া চাই এবং এই উদ্যমে সামান্য ব্যবসায়ীর দানও অপরিসীম মনে করিতে হইবে। জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে তাহাকেও সব্যসাচীর তুল্য না হইলে চলিবে না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, যে, মানুষ ব্যবসা ও তাহার খুটিনাটি বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও, বহির্ব্যাপারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার খেই অনেক সময়ই হারাইয়া ফেলে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া হইবে। অনেকে ব্যবসায়ের এই দিকটা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে চাহেন এবং বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান দেশের অবস্থায় তাহা একটী স্বাস্থ্যকর লক্ষণও বটে। উপরে উঠিবার পথ সব সময়ই পড়িয়া আছে; কিন্তু তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু চাই, পড়াশুনা করা চাই, চেষ্টা এবং উদ্যম চাই। সর্ব্বোপরি একটী জিনিষ দরকার, তাহা এই যে, বহির্জ্জগতের যে-সমস্ত ছোটখাট জিনিষ সাধারণ মানুষের চোখ এড়াইয়া যায়, তাহার দিকে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অভিজ্ঞতার সীমা আরও বাড়াইতে হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই কৃত-কার্য্যতার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

কিন্তু তাহার জন্য শক্ত মানুষ হওয়া চাই—গোটা মানুষ, উদ্যমের ডাইনামো, অফুরন্ত সঙ্কল্পের উৎস! যে লোকটি সর্ব্ব-জিনিষই বন্ধুত্বের দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পারে, কোন জিনিষকেই তাচ্ছিল্য করে না কিংবা কোন কার্য্যই সম্মানহানিকর বলিয়া বিবেচনা করে না—তাহার জন্য উন্মুক্ত রাজপথ পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান—ব্যবসার বাজারে যাঁহারা শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহাদের কাছে আমার অনেক কথা হয়তো আদৌ নূতন ঠেকিবে না; কিন্তু তাহাদের মতের সহিত আমার মতের সামঞ্জস্য বুঝা যাইবে যে, কঠোর জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় আমরা একইরূপ ফললাভ করিয়াছি এবং একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

কিরূপে ব্যবসা আরম্ভ করা যাইতে পারে

ব্যবসা আরম্ভ করিবার গোড়ার দিকেই স্মরণ রাখা উচিত, কত টাকা মূলধন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। যত টাকা ব্যয় হইতে পারে, তাহাও বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি মূলধন নিজের হয়, ভালই; নতুবা অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়। হয়ত এক এক সময়ে সুদ দিবার তাগিদ আসে, কিন্তু হাতে অর্থ আদৌ থাকে না—ঋণ শোধ করিবার সময় হইয়া আসে, অথচ তখন কর্জ্জের টাকা মিটাইয়া দেওয়া একরূপ অসম্ভব। যদি ঋণ করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে সেরূপ স্থলে পাওনাদারের সঙ্গে এমনভাবে চুক্তি করা উচিত, যে, কর্জ্জের টাকার সুদ একটা নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত দিতে হইবে, তৎপরে বাকী টাকা সুদসহ থোকে থোকে (ইন্‌ষ্টলমেণ্ট) দিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। থোক-চুক্তির টাকা এবং সুদ ঠিক সময় মত পাওনাদারের হাতে দিলে, তিনি হঠাৎ খামখেয়ালীভাবে সমস্ত টাকা চাহিয়া ঋণ-গ্রহীতাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন না বলিয়াই ভরসা করা যায়। যাহাকে ব্যবসা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঋণের টাকা মিটাইবার সমস্যায় পড়িতে হয়, তাহার তুল্য দুর্ভাগা আর নাই—অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তায় তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলে। এরূপ অবস্থায় ব্যবসা করার চেয়ে অন্যের চাকুরী স্বীকার করা হাজার গুণে শ্রেয়ঃ।

ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইলে, মূলধন ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত পুঁজি থাকা দরকার। যখন মালপত্র লইয়া কারবার করিতে হয়, তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্কীমও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, আনুমানিক হিসাবেও অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। কাজেই, মূলধন যে কেবলমাত্র জিনিষপত্র ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে, তাহা নহে—হাতে এমন অর্থও অবশিষ্ট থাকা দরকার যাহাতে চাহিদার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই জিনিষপত্র গুদাম জাত করিয়া রাখা চলে। চাহিদার সময়েও অনেক অপ্রয়োজনীয় মালপত্র রাখিবার দরকার হইয়া পড়ে।

মালপত্রাদি আসা-মাত্র বিক্রয় হওয়া খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; কাজেই ব্যবসা নিজের পায়ে কিংবা নিজের আয়ে না দাঁড়ানো পর্য্যন্ত হাতে কিছু অর্থ মজুত থাকা নেহাৎ প্রয়োজনীয়—নতুবা প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা কষ্টকর। মূলধনের উপরে খুব বেশী অর্থ হাতে থাকা আবার আদৌ সমীচীন নহে; কেননা, তাহাতে অকেজো অর্থের উপর সুদই দিতে হয়, কিন্তু ঐ অর্থ ব্যবসার কোন কাজে লাগে না; পরন্তু নূতন ব্যবসায়ের আয় ঐ সুদ দিতে-দিতেই

ব্যয়িত হইতে থাকে। ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্যবসা-প্রবেশার্থীর এই কথা গোড়াতেই স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে, নতুবা জীবনযুদ্ধে পরাজয় অবধারিত—যতদিন কোন নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া না যায়, ততদিন পরের ধাপে পা ফেলা আদৌ উচিত হইবে না।

যেখানে ব্যবসার গোড়াপত্তন করিতে হইবে, তাহা সুবিধামত জায়গায় অবস্থিত হওয়া দরকার। মনে রাখিতে হইবে, ক্রেতারা দোকানে সাধারণতঃ দুইটি কারণে আসিয়া থাকে ; এক, যখন অন্যত্র প্রয়োজনীয় জিনিষটী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিংবা যখন দোকান-ঘরটী মনোমত করিয়া সাজান যায়, তখন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দিক হইতে দেখিয়া যদি দোকান ঘর ঠিক করিতে হয়, তাহা হইলে উহা নজরে পড়িবার মত স্থলে করাই উচিত। শুধু তাহাই নহে, উহা সুসজ্জিত এবং রাস্তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিকটাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক ষ্ট্রীটেই দুইটী করিয়া পার্শ্ব আছে, তাহার একটী দিক অপর দিকের চেয়ে ব্যবসার হিসাবে নিশ্চয়ই সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ব্যবসা-প্রবেশার্থীর পক্ষে ইহা সমস্যার মত লাগিতে পারে বটে; কাহারো কাহারো কাছে ইহা সমস্যার মত না-লাগিলেও, ঠিক জায়গাটী খুঁজিয়া বাহির করা সমস্যা জনক হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির খুব দরকার হয়; তখন রাস্তা দিয়া কেবল হাঁটিয়া গেলে চলে না; সমস্ত জিনিষ-গুলিই বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কোনটী ঠিক জায়গা হইতে পারে আবিষ্কার করিতে গেলেই নজরে পড়িয়া যাইবে, যে, রাস্তার কর্ম্মমুখর দিকগুলিতে "বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে" খুব কমই লেখা রহিয়াছে। অন্ত দিকে হয়তো অনেক জায়গায়ই খালি পড়িয়া রহিয়া গিয়াছে।

প্রথম ব্যবসায়ীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত, যে, তিনি যেন পরিচিত কারবারীর সহিতই ব্যবসার লেন-দেন সুরু করেন এবং কর্ম্মকেন্দ্র ছাড়িয়া যেন অন্যত্র না যান। অনেক সময়ে বড় বড় নগরের সহরতলিতে দেখা যায়, যে, অনেক রাস্তা জনশূন্য রহিয়াছে কিন্তু তাহার পার্শ্বস্থ প্রধান রাস্তাগুলি জনবহুল ও কর্ম্মমুখর।

একটী নূতন ব্যবসা আরম্ভ করা কিংবা একটী গোটা ব্যবসা কিনিয়া নেওয়া—দুইটির মধ্যে কোনটী কাম্য, তাহা বলা শক্ত। যেখানে দেখা যায় যে একটী নাম-করা ব্যবসা কিনিয়া লইলেই লাভ হইতে থাকিবে, তখন উহা হস্তান্তরিত করিয়া নিজে লইলে ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে দেখা যায়, যে, উক্ত ব্যবসায়ীর সুনামের উপর নির্ভর করিবার সম্ভাবনা নাই তখন নূতন ব্যবসা আরম্ভ করাই সমীচীন।

পুরাণো ফার্ম্ম কিনিবার সময় ক্রেতা নিজেই কিংবা এজেন্টের সাহায্যে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন। এজেন্ট গ্রামোফোনের মত বিক্রেতার কথার প্রতিধ্বনিই করিয়া থাকে এবং সময়-সময় উক্ত ফার্ম্মের সুবিধা-সমূহের একটু অতিরঞ্জিত বিবরণ ক্রেতার কাছে দিয়া থাকে। বিক্রেতার বাড়াইয়া বলিবার স্পৃহা সম্বন্ধে লণ্ডনের কোন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত চাতুরীর সংবাদ প্রকাশিত হইয়া ছিল;—

"যে মহিলাটি দোকান খরিদ করিবার মানসে গিয়াছিলেন, তিনি সঙ্গী দালাল ব্যতীত অপর একটী লোককেও দোকানে দেখিয়াছিলেন। বাহির হইতে দেখিয়া বোধ হইল যে দোকানটীতে প্রচুর মালপত্র আছে; দালাল বলিয়াছিল যে দোকানে সপ্তাহে প্রায় আট পাউণ্ডের লেন-দেন হয়। তিনি তাই গোটা ব্যবসাটাকে বার পাউণ্ড সাত সিলিং এবং ছয় পেন্স দিয়া কিনিয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গেল, বিস্কুটের টিনগুলি কার্ডবোর্ড বাক্স ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং উহাতে কিছুই নাই; চিনির প্যাকেটগুলিও শূন্য। যাহাকে দূর হইতে কোকের প্যাকেটের মত দেখাইতেছিল, তাহাও কাগজ-মণ্ডিত কাষ্ঠখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমস্ত দোকান ঘাটিয়া মহিলাটী কেবলমাত্র ভাঙ্গা বোতলে খানকতক মিষ্টসামগ্রী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম দিনের বিক্রয়ের পরিমাণ হইল ২½ পেন্স। যখন তিনি দোকানের দাম চুকাইয়া দেন তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে দোকান ভাড়া বাকী নাই; কিন্তু পরে দেখা গেল, উহাও সত্য নহে।"

যে ফার্ম্ম কিছুদিনের পুরাণো হইয়াছে, যাহা হইতে স্বত্বাধিকারীর দস্তুরমত আয় হইতে থাকে এবং আয়ের অনুপাতে বেশী মূলধনের প্রয়োজন

হয় না, —তাহা অনেক দিক দিয়া লোভনীয় বটে। কিন্তু উক্ত ব্যবসাদারের সুনাম কিনিয়া লইবার সময় বাজারের অবস্থা এবং বিশেষ করিয়া যে জিনিষ কিনিয়া লওয়া হইতেছে তাহার সঠিক খবর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। অনেকে বলেন এবং তাহা হয়তো ঠিকই বটে, যে, ক্রেতা সুনামের জন্য যে অর্থ দিতে চাহেন, তাহাই দোকানের উপযুক্ত মূল্য। সমস্ত দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে একটী ভাল ফার্ম্মের সুনামের মূল্য, এক বৎসরের নেট্ লাভ হওয়াই ন্যায়-সঙ্গত।

কোন ফার্ম্ম কিনিতে গেলে, সাধারণ নিয়মানুযায়ী উহার মালপত্র ক্রেতার হস্তেই ন্যস্ত হইয়া থাকে। যেদিন ফার্ম্ম হস্তান্তরিত হইবে, সেইদিন প্রত্যেক জিনিষটীকে তালিকাভুক্ত করিয়া লইয়া একটী দাম ধরিতে হইবে। সমস্ত জিনিষের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দাম ধরিয়া উহা কিনিয়া নেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে ; এক একটী করিয়া জিনিষ পরখ করিয়া লইয়া দাম ধরাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। কেন-না, ফার্ম্মে এমন অনেক জিনিষপত্র থাকিতে পারে যাহার চাহিদা বাজারে এক কালে খুব বেশী ছিল, কিন্তু আধুনিক সময়ে তাহা নিতান্ত 'সেকেলে' হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত জিনিষ একেবারেই বাদ দিতে হইবে কিংবা নিতান্ত অল্পমূল্যে তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

ক্রয়ের টাকা দিবার পূর্ব্বে ট্যাক্স, গ্যাস এবং

জলের বিলের হিসাব চুকাইয়া নেওয়া উচিত। ফার্ম্মের নূতন মালিক পুরাতন গ্রাহক এবং আড়তদারদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ কারবার চালাইবার ভরসা রাখেন; কাজেই ফার্ম্ম হাতে লইয়াই উহার হস্তান্তর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে একটী নোটিস দিতে হইবে:—

দি সেণ্ট্রাল এম্পোরিয়াম
৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিয় মহাশয়গণ

আমি এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে সেনট্রাল এম্পোরিয়ামের পূর্ব্ব সত্বাধিকারী রাধাবিনোদ পাল মহোদয় অসুস্থতা নিবন্ধন ব্যবসাক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করায় আমি উপরোক্ত ফার্ম্মের ভার গহণ করিয়াছি। ইহার সমস্ত দায়িত্ব এবং জিনিষপত্র এখন হইতে আমিই লইলাম। আমি ভরসা করিতেছি, যে, এই কার্ম্মের পৃষ্ঠপোষকবর্গের সহানুভূতি হইতে আমিও বঞ্চিত হইব না। আমরা বিশেষ মনোযোগ এবং যত্নসহকারে গ্রাহকবর্গের সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকি। ইতি নিবেদক।

গোপানাথ দেবকুমার

স্বাক্ষর

ফার্ম্ম খরিদ করার পর নিজেও যেমন এইরূপ পত্র দিবেন, তেমনি পূর্ব্ব সত্বাধিকারীর নিকট হইতেও নিম্নলিখিত মত পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া ফার্ম্মের পৃষ্ঠপোষকবর্গের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

প্রিয় মহাশয়গণ

আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন এবং অসুস্থতার জন্য আমি উপরোক্ত কার্ম্ম ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। মেসার্স গোপানাথ দেবকুমার এণ্ড কোং ………তারিখ হইতে আমার ফার্ম্মের সমস্ত দায়িত্ব এবং জিনিষপত্রাদি গ্রহণ করিবেন। আপনারা অতীতে আমার সাফল্য কামনায় যতটুকু অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আজ ধন্যবাদ দিতেছি; ভরসা করি, আমার উত্তরাধিকারীগণও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবেন না। ইতি নিবেদক।

বংশবদ

রাধাবিনোদ পাল

প্রায়ই দেখা যায় যে বাঁধা-খরিদ্দারের কাছে ফার্ম্মের অনেক টাকা পাওনা থাকে। ক্রেতা ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অর্থ নিজের নামে আনিতে পারেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিসাব-বহি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে হইবে, যে, সাবেকী বিক্রী ঋণের ভারও তাহার ঘাড়ে যেন চাপিয়া না পড়ে। এরূপ স্থলে তাহার অনেক ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক। কোন ফার্ম্মের মালিক যদি দূরদর্শী হন, তিনি ক্রেতার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া এই বকেয়া ঋণ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেন—ক্রেতাকে তাহার পরিশ্রমের জন্য আদায়ের পঞ্চম, ষষ্ঠ, কিংবা সার্দ্ধ সপ্তভাগ দিতে পারেন। ক্রেতাও মালিকের কাছে এতৎ-সম্বন্ধে রীতিমত খবরাখবর দিতে থাকিবেন।

চলতি ফার্ম্ম লওয়া কিংবা দোকান নিজে করা—এই দুইটির মধ্যে একটী ঠিক করিয়া লইয়া জমিদার কিংবা তাহার এজেণ্টের সহিত মোলাকাৎ করা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ ঘরভাড়া লইলে তাহা কয়েক বৎসরের জন্যই লইতে হয়—কাজেই উহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সাবেক হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া লইতে হইবে। যদি কিনিতেই হয়, তাহা হইলেও মালিকের

সঙ্গে এই মর্ম্মে চুক্তি করিয়া লইতে হয়; যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য ক্রেতা দোকান-ঘর সম্পর্কিত কোন ঋণের জন্য দায়ী না হ'ন। যদি ঘরটী জমিদার কিংবা তাঁহার কোন এজেণ্টের কাছ হইতে লইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কাছ হইতে নিম্নলিখিতরূপ একটী পত্র লইতে হইবে :—

শ্রীযুক্ত... মহাশয়ের বরাবরেষু—

এতদ্দ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আপনার প্রার্থিত দোকান ঘরের জন্য—যাহা...... ষ্ট্রীটে অবস্থিত আছে—আপনাকে পূর্ব্বের কোন দাবী-দাওয়া মিটাইতে হইবে না। ট্যাক্স, কারেণ্ট, গ্যাস ও জলের বিল্ আপনি ঘর-ভাড়া লইবার সময় হইতেই কেবল দিতে থাকিবেন; পূর্ব্বের কোন দাবী-দাওয়া থাকিলেও আমি তাহা মিটাইবার ভার লইলাম।
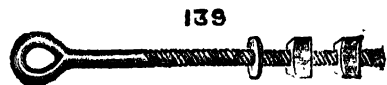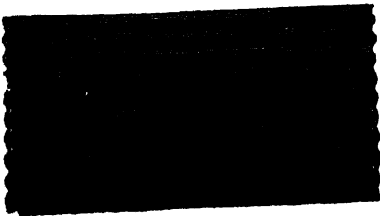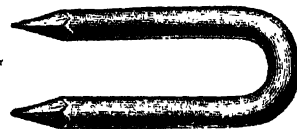
স্বাঃ

জমিদার কিংবা তদীয় এজেণ্ট

তাং......

ঋণভার পীড়িত ভারতের কৃষক*

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

বর্ত্তমান জগতে ঋণ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক দেশই সমর ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক ঋণ, বাণিজ্য ঋণ, জাতীয়-ঋণ— কোন না কোন একটা ঋণে বিশেষ ভাবে নিপীড়িত।

ভারতেরও জাতীয়-ঋণ আছে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা এখনও তত মারাত্মক হইয়া উঠে নাই। এই জাতীয়-ঋণের একটা বড় অংশ লাভজনক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তি দ্বারা— যেমন রেলপথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে—তাহা সংরক্ষিত আছে। তবে একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় ঋণের একটা অংশ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য গ্রহণ করিয়া উহার ভার ভারতবাসীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রকার ঋণগ্রহণে দেশবাসীর সম্মতি লওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই, এবং ইহার সহায়তায় তাঁহারা যে কোন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এমন নয়,—অর্থাৎ এই সকল ঋণ ভারতবাসীর কোন উপকারে আসে নাই। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে, এবং বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের আয় হইতে তাহার অনেক পরিমাণ পরিশোধ করাও হইয়া গিয়াছে।

ঋণগ্রস্ত ভারতীয় কৃষক

সে যাহা হউক, এই জাতীয়-ঋণের কথা আজ আমি এখানে বলিব না। আজ আমি যে ঋণের কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব, তাহা ভারতীয় কৃষকের ঋণ সম্পর্কে। ইহাই আজ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল এবং বড় সমস্যা। ইহার সম্যক্ সমাধানের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড; অথচ এখানে কৃষকেরাই আজ সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব। কোটী কোটী কৃষকের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঋণ একত্র হইয়া আজ তাহাদের সমগ্র ঋণের ভার যেরূপ গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে তাহা উপেক্ষা করা এখন আর কোন মতেই সমীচীন হইবে না। ঋণের এই ভয়াবহ পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার ভারে কৃষক আজ মাথা তুলিতে পারিতেছে না,—জগতের যাবতীয় সুখ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া শুধু মরণের পথেই তাহারা অগ্রসর হইতেছে। কৃষকদের এই দুর্দ্দশার প্রতীকার বিধান চেষ্টায় আর কালবিলম্ব

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।

করা চলে না; ইহার পর হয়তো প্রতীকারের পন্থাও দুর্গম হইয়া পড়িবে।

গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য

কৃষকদের এই ঋণ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হইলে উহাদের,—শুধু উহাদের কেন, দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির সকল চেষ্টাই যে শোচনীয় অবস্থা বৃটিশ শাসনের ব্যর্থতারই একটি প্রধান পরিচয়। গবর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যের ফলে কৃষকেরা তিলে তিলে অবনতি-সোপানের নিম্নতর স্তরে নামিয়া যাইতেছে। কোটী কোটী কৃষক লইয়া ভারতের জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহাদের জীবন-মরণের সহিত এই ঋণ-সমস্যা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ইহার সমা-

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

ব্যর্থ হইবে, তাহা আপনারা সকলেই স্বীকার করিবেন। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত এই সমস্যা সমাধান করিবার জন্য তেমন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, এবং তাঁহারা এই সমস্যাকে সম্যক্‌রূপে এখনও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। ভারতীয় কৃষকের এই ধানের পথে অনেক বিঘ্ন আছে; সেই বিঘ্ন-গুলিকে আমি ছোট করিয়া দেখিতে বলিব না। কিন্তু যত বিঘ্নই থাকুক, এবং সমস্যা যত জটীলই হউক, এই সমস্যা সমাধানের উপকরণ খুঁজিতেই হইবে। সকল কাজেরই একটা সূচনা আবশ্যক। আপনাদের সকলের চেষ্টায় এই সমস্যা সমাধানের

সূচনা হইবে এই আশাতেই এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কৃষি-ঋণের তাৎপর্য্য

কৃষকদের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে উক্ত ঋণ বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ব্যবসায়ীদের অবিদিত নাই যে, সকল সময়ে বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে কারবার চালাইবার জন্য ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক। সে ঋণ ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে নয়—এই ঋণের টাকা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হয় এবং তাহা হইতে যে লাভ হয়, তাহা দ্বারাই ঋণের সুদ আসল বাবদ সকল প্রকার দাবী মটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। কেবল মাত্র কৃষিকার্য্যের জন্য যদি কৃষক ঋণ গ্রহণ করিত তবে সে ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের উপায় তাহার ক্ষেত্র-ফসলেরই উপর নির্ভর করিত; এবং পরিশোধযোগ্য ঋণ গ্রহণ করায় সে অকারণ দেনার ভারে নিপীড়িত হইত না।

এ-বিষয়ে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের জন্য নানাপ্রকার খরচ করিতে হয়; যথা, সার ও বীজ খরিদ, হাল লাঙ্গল গরু কেনা, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং চাষবাসের কাজে সাহায্যকারীর মজুরী দেওয়া ইত্যাদি। চাষের কয়েক মাস পরে যখন শস্য বিক্রয় হয় তখনই কৃষকেরা তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য পাইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খরচের টাকা অনেক কৃষকেরই থাকে না। এ-জন্য যদি ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে ঋণ সাধারণতঃ কৃষকের পক্ষে মারাত্মক হয় না, কারণ এ-ঋণ কৃষকের পারিবারিক অভাবের জন্য নয়। উৎপন্ন ফসলের মূল্য হইতেই এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করা চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত নূতন জমি ক্রয়, পুরাতন জমির উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে যদি তাহাকে আরও ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তবে তাহাও তাহার বাৎসরিক আয় হইতে ক্রমে ক্রমে সুদ সমেত পরিশোধিত হইতে পারে। এ-প্রকার ঋণও কৃষকদিগকে মধ্যে মধ্যে করিতে হয়, এবং ইহার জন্যও তাহাদের বিপদগ্রস্ত হইবার কথা নয়।

বিবিধ প্রয়োজনে ঋণ

কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদিগের ঋণ কেবল মাত্র এই পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এ দেশের কৃষকেরা উক্ত প্রকার কৃষিকার্য্য ব্যতীত আরও বহুবিধ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে; কৃষি-কার্য্যের জন্য সংগৃহীত ঋণ তাহার অংশ বিশেষ মাত্র। সামাজিক নানারূপ অনুষ্ঠানের জন্য (যথা পুত্র-কন্যার বিবাহ, পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি) এ দেশীয় কৃষকদিগের অনেক অর্থব্যয় হয়; এতদ্ব্যতীত রোগের চিকিৎসা, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতির ব্যয় ত' আছেই। প্রকৃত কৃষিকার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা চাষের আয় হইতেই পরিশোধ করা চলে। কিন্তু কোন আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য যে-সকল ঋণ করা হয় তাহা দ্বারা আয়বৃদ্ধির সহায়তা করা হয় না বলিয়া এক হিসাবে তাহা লোকসানেরই সামিল। এই ঋণের টাকা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা চাষীর নিয়মিত আয়ের সংস্থানের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রেই চাষীদের এই আয়ের সংস্থান অতি সামান্য বলিয়া এ দেনা সমষ্টি-দেনার পরিমাণ পরিশোধের সাধ্যাতীত রূপে বাড়াইয়া দেয় এবং ফলে চাষীদের ঋণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ঋণের দায়ে কৃষকদের আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইবার ফলে তাহাদের কাজের উৎসাহও কমিয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আয়ের হ্রাস পাইয়া ঋণভার সমধিক দুঃসহ করিয়া তুলে। এই "কৃষি ঋণ" ও "কৃষকের ঋণ"-এর পার্থক্য আমাদের দেশের চাষীরা বুঝে না, এবং তাহারা যখন কোনও উদ্দেশ্যে টাকা ধার করে তখন এই দুই প্রকার ঋণের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, সেই প্রভেদ অনুসারে ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে বলিয়াই তাহাদের জীবন ক্রমবর্দ্ধিত ঋণভারে দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে।

ব্যবসায়ী যেমন কারবারের ঋণ তাহার নিজ পারিবারিক হিসাব হইতে পৃথক রাখে, কৃষক তাহা করে না। সে তাহার কৃষিঋণ এবং নিজ প্রয়োজনের ঋণ একত্র করিয়া এমন জালে জড়াইয়া পড়ে যে তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যে কৃষি-ঋণের বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিব, তাহার অর্থে কৃষকের কৃষিকার্য্য সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য কার্য্যে আবশ্যকীয়—এই উভয় প্রকার ঋণের সমষ্টিই বুঝিতে হইবে। এ-সম্বন্ধে আমার এত বিস্তারিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 'কৃষিঋণ' ও 'কৃষকের ঋণ' এই দুই প্রকার ঋণ মূলগতভাবে পৃথক হইলেও ঋণগ্রস্ত কৃষকের পক্ষে ইহারা তুল্য দায়িত্ব সৃষ্টি করিয়া যে সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য আমরা যেন একটিকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত না করি।

ঋণের আকৃতি ও প্রকৃতি

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটীর রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মপ্রদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষে চাষীরা সর্ব্বসমেত ৯০০ কোটী টাকা পরিমাণ ঋণের দায়ে আবদ্ধ। এই মোট দেনার কত অংশের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের চাষীরা দায়ী, বিভিন্ন প্রদেশের গড় পড়তা প্রতি চাষীর দেনার পরিমাণ কত, এবং আবাদা জমির প্রতি 'একর' হিসাবেই বা বিভিন্ন প্রদেশের চাষীর ঋণের আয়তন কিরূপ—সে সম্বন্ধে আমি একটি হিসাব দিতেছি। ইহা হইতেই কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হইবে :—

প্রদেশ	মোট ঋণের পরিমাণ	চাষীপ্রতি গড়পড়তা ঋণ	আবাদী জমির প্রতি 'একরে' ঋণ
আসাম	২২ কোটী	৩১৲	৩৭৲
বাঙ্গলা	১০০ „	৩১৲	৪৩৲
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫ „	৫১৲	৬৭৲
বোম্বাই	৮১ „	৪৯৲	২৫৲
মধ্য প্রদেশ	২৬ „	৩০৲	১৪৲
মাদ্রাজ	১৫০ „	৪০৲	৪৪৲
পাঞ্জাব	১৩৫ „	৯২৲	৫০৲
যুক্ত প্রদেশ	১২৪ „	৩৬৲	৩৬৲

এই হিসাব হইতে আপনারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে, মোট ঋণ কিম্বা গড়পরতা প্রতি চাষীর ঋণ, কিম্বা আবাদী জমির 'একর' প্রতি ঋণ—ইহাদের যে কোনও দিক হইতেই দেখা যাক্ না কেন, বাঙ্গালী চাষীর অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের চাষীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু বাস্তবিকই তাহা নহে। কারণ বিভিন্ন প্রদেশের জনপ্রতি এবং 'একর' প্রতি ঋণের তুলনা হইতেই চাষীদের অবস্থার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না; তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ এবং আয়ের অঙ্ক প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার, নতুবা তুলনামূলক অবস্থা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কারণ, দেনাদারের ঋণের বোঝা বহিবার ক্ষমতা কতখানি আছে তাহা বুঝিতে হইলে তাহার সম্পত্তি ও আয়ের হিসাবের দিকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই অনুপাতে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে নিকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হয়। অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলা দেশে 'একর' জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী নহে; এবং এখানে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অধিক আশা করি একথা আপনাদের অবিদিত নাই। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রদেশে কৃষিকার্য্য-নিরত প্রত্যেক ১০০ শত লোকের আবাদী জমির পরিমাণ কত তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্টে প্রকাশিত এক তালিকা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আপনাদের অবগতির জন্য আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি :—

বোম্বাই	১২১৫ একর;	বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৯ একর
পাঞ্জাব	৯১৮ „	আসাম	২৯৬ „
মধ্যপ্রদেশ	৮৪৮ „	যুক্তপ্রদেশ	২৫১ „
মাদ্রাজ	৪৯ „	বাঙ্গলা	৩১২ „

কিন্তু জমির আয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে—চাষী ছাড়াও এমন অনেক লোক আছে তাহাদের সকলকেই যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশে গড়-

পরতায় প্রতি চাষীর মাত্র ০.৫৭ একর জমির উপর নির্ভর করিতে হয়। জন প্রতি আবাদী জমির এত অল্প পরিমাণ আর অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় না। এ-সম্বন্ধে আমি আর একটি তালিকা দিতেছি। তাহা হইতে আপনারা স্পষ্টই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বাই	২.০১	বিহার ও উড়িষ্যা	০.৮২
পাঞ্জাব	১.৮০	যুক্তপ্রদেশ	০.২
মাদ্রাজ	১.১৪		

ইহা হইতে আপনারা কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদের অবস্থা খুবই উন্নত। বাস্তবিক তাহা নহে; সমগ্র ভারতেই আজ কৃষি সম্প্রদায় ঋণে আপাদমস্তক জড়িত। বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট যে প্রস্তাব করিব, তাহা এই প্রদেশের প্রতি বিশেষরূপে প্রযোজ্য। অধিকন্তু বাঙ্গলার কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে আমি যেরূপভাবে দেখিয়াছি, অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে সেরূপ সুযোগ আমার হয় নাই।

বাঙ্গালী চাষীর ঋণ

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেই পুনরায় কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি তদন্ত করিয়া হিসাব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী চাষীর ঋণের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ১০০ কোটী টাকা হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে যে আর কোনও সন্ধান করা হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু সেই সমস্ত তদন্ত কোনও কোনও বিশেষ জেলার কৃষকদের অবস্থা নির্ণয় বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র প্রদেশের পক্ষে ব্যাঙ্কিং কমিটীর তদন্তকেই সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান

প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই কমিটীকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া সকল স্থানের সঠিক সংবাদ তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। প্রধানতঃ এই কারণে এবং তৎপূর্ব্বে নির্ভরযোগ্য কোন অনুসন্ধান বিবরণীর অভাব হেতু তাঁহারা বাঙ্গলার চাষীদের ঋণের পরিমাণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে হয়ত অনেকেরই মনে সন্দেহ থাকিতে পারে। বিশেষতঃ মেজর জ্যাক্, মিঃ মোমিন এবং মিষ্টার ষ্ট্যাক্সি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী তদন্তকারীদের হিসাবের সহিত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটীর হিসাবের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মেজর জ্যাক্ ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এই ৪।৫ বৎসর ফরিদপুর জেলায় অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত জেলার চাষী পরিবারগুলির গড়পড়তা দেনা ৫৫৲ টাকা। এই অনুসন্ধান সম্পর্কে তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ফরিদপুর জেলার চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৫৫টী পরিবার সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত। তদনুসারে ঋণগ্রস্ত চাষী পরিবারগুলির গড়পড়তা দেনার পরিমাণ ১২০৲ নির্দ্ধারিত হয়। মেজর জ্যাক তাঁহার হিসাবে প্রতি পরিবারে ৫ জন লোক আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি ১৯২৯ সালে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে প্রতি চাষী পরিবারের ঋণ ১৬০৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চাষীদের মধ্যে কত জনের ঋণ নাই তাহার হিসাব তাঁহারা দেন নাই। কুড়ি বৎসরের মধ্যে পরিবার প্রতি ঋণ ৫৫৲ টাকা হইতে বাড়িয়া ১৬০৲ হইয়াছে, ইহা খুবই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যদিও মেজর জ্যাকের হিসাবের সহিত ব্যাঙ্কিং কমিটীর হিসাবের বিলক্ষণ পার্থক্য রহিয়াছে এবং যদিও তাঁহারা সময়াভাবে খুব বিশদভাবে তদন্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ—তথাপি আমার মনে হয় যে, উক্ত কমিটী তদন্ত করিবার সময় যে সমস্ত অনুসন্ধান প্রণালী অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

অনুসন্ধান কালে ব্যাঙ্কিং কমিটী রেজেষ্টারী দলিলের গড়পড়তা মেয়াদ ৬ বৎসর ধরিয়া এবং সমবায় ঋণদান সমিতির খাতাপত্র দেখিয়া চাষীদের ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে যে এক প্রশস্ত পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া কমিটী গড়পড়তা ঋণের পরিমাণ ১৬০৲ টাকা ধরিয়া ১৯২১ সালের লোকসংখ্যা হিসাবে চাষীদের মোট ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটী টাকা স্থির করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর গত ১০ বৎসরে লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, এবং তাহা ধরিলে মোট পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। সে যা হউক, মোট দেনার একেবারে যথাযথ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই বড় কথা নহে; আসল কথা এই যে, বর্ত্তমান নিদারুণ ঋণের ভার বিপুল ও অসহনীয়। এই বিপুল সঞ্চিত ঋণভার কি ভাবে ক্রমশঃ লঘু করা যায় এবং ভবিষ্যৎ ঋণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়।

চাষীদের গড়পড়তা আয়

এই দুর্ব্বিসহ ভারের লাঘব করা অনেক পরিমাণে চাষীদের আয়ের উপর নির্ভর করে।

এখন দেখা যাক, আমাদের দেশের চাষীদের আয় কিরূপ !

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটীর রিপোর্ট হইতে প্রকাশ পায় যে, ১৯২৮ সালের বাজার দর অনুসারে সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ১২০০ কোটী টাকা মূল্যের কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া কুটীর শিল্প প্রভৃতি নানা উপায়ে চাষীদের আরও অতিরিক্ত শতকরা ২০৲ টাকা আয় হয়, এরূপ ধরিয়া লইলে ভারতবর্ষের চাষীদের গড়পড়তা আয় দাঁড়ায় ৪২৲ টাকা। ১৯২৮ সালের পর জিনিষ পত্রের দাম যেরূপ কমিয়াছে এবং ১৯২১ সালের পর লোক সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিলে গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। সে যাহা হউক, যদি আমরা ধরিয়াই লই যে, আয় কমে নাই, তাহা হইলেও সমস্যার গুরুত্বের হ্রাস হয় না ; কারণ কম পক্ষে শতকরা ১৮৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরিলেও মোট ৯০০ কোটী টাকা দেনার সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬২ কোটী টাকা। অর্থাৎ জনপ্রতি ৯৲ টাকা। ৪২৲ টাকা আয় হইতে যদি ৯৲ টাকা চলিয়া যায় তাহা হইলে চাষীদের গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ ৩৩৲ টাকা হয়—অর্থাৎ প্রতি মাসে ২৸৹। এই টাকা হইতে তাহাকে সংসারের সমস্ত খরচ মিটাইতে হইবে এবং জমির খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি দিতে হইবে। ইহা হইতেই চাষীদের দুরবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যদি চাষীরা তাহাদের ঋণের সুদ ও আসল কিছুই শোধ করিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চাষীদের মোট দেনার পরিমাণ যে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ।

যত্র আয় তত্র ব্যয়

কেবল মাত্র বাঙ্গালী চাষীদের আয়ের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটী উহাদের আয় জনপ্রতি ৮৪৲ টাকা দেখাইয়াছেন। এই সঙ্গে তাঁহারা আরও একটি হিসাব দিয়াছেন যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও চাষীদের বাৎসরিক ব্যয় জনপ্রতি ৮৪৲ টাকা ; অর্থাৎ যত্র আয় তত্র ব্যয়। কিন্তু এই খরচের হিসাবে জনপ্রতি দেনা ৩১৲ টাকার আসল কিংবা সুদ পরিশোধের বিষয় বিবেচিত হয় নাই। উল্লিখিত আয়-ব্যয়ের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া লইলে দেখা যায় যে, কৃষকের পক্ষে ঋণমুক্ত হওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তারপর সুবৎসর চিরদিন থাকে না ; অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, রোগ শোক, দৈবদুর্ব্বিপাক—এগুলি ত' লাগিয়াই আছে। শস্যের মূল্য হ্রাসের দরুণও তাহাদের আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। এই কারণেও চাষীদিগের অনেক সময়েই বাধ্য হইয়া নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হয়,- পুরাতন ঋণ শোধ করা ত' দূরের কথা !

মহাজনের গ্রাস

এমন অবস্থায় ক্রমে ঋণের দায়ে কৃষিজীবীদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া মহাজনদের হাতে গিয়া পড়ে ; একজন হয় জমির মালিক, আর একজন হয় পথের কাঙ্গাল। কিন্তু ভূমি গেলেও ক্ষুধা যায় না, তাই নিঃস্ব-রা আবার বর্গাদার হইয়া জমিতে লাঙ্গল চালায়, কিন্তু 'পরের জমি', এই মর্ম্মান্তিক ভাব তাহাদের মন হইতে যায় না ; তাই কৃষি কার্য্যেও একাগ্রতা, আগ্রহ, উন্নতি করিবার ইচ্ছা আসে না। ফলে, ফসলও তেমন ফলে না ; অভাবে ঋণের দায় বাড়িয়াই চলে।

(ক্রমশঃ)

বীমার ইতিহাস

শ্রীচুণীলাল লাহিড়ী

(আষাঢ়মাসের অবশিষ্টাংশ)

ইং ১৮৭০ সালের এবং তৎপরবর্ত্তী ১৯০৯ সালের বীমা আইনাধীনে কি ফলাফল ঘটিয়াছে উহার আলোচনার পূর্ব্বে বীমা সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যাই সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য মনে করিয়া উক্ত আইনের বিশদ আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত রাখা হইল। বিভিন্ন দেশে জীবন বীমা ব্যতিরেকে অন্যান্য যাবতীয় প্রকারের বীমার যেরূপ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা দেশে জীবন বীমা ব্যতীত ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের বীমার প্রচলন নাই বলিলেই চলিতে পারে। অতএব ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের বীমা বিষয়ের আলোচনা না করিয়া শুধু জীবন বীমারই ইতিহাস আলোচনা সর্ব্বপ্রথম সমাধা করিবার উদ্দেশ্যেই ব্রতী হওয়া সমীচীন মনে করিয়া এই প্রবন্ধে জীবন বীমারই ইতিহাস আলোচনা করা হইতেছে।

বীমা বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে এবং এই ব্যবসায়ে যাহারা ব্রতী তাঁহাদিগের নিকট 'Casualty Insurance' বলিতে কি বুঝায় বিশেষভাবে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন নাই; কিন্তু তত্রাপি বীমার ইতিহাস সম্বন্ধে সকল বিষয়ই যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা, 'Casualty Insurance'এর সহিত জীবন বীমার কি সম্বন্ধ, ইহা জানিতে ইচ্ছা করিবেন।

'Casualty' বলিতে কি বুঝায়? অভিধানে ইহার অর্থ দেখা যায় "দৈব, দুর্ঘটনা, দুর্দ্দৈব দৈবদুর্বিপাক"। যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমন 'Casualty'তেও একটা ধারাবাহিক বিধি মানিয়া লইতে হইবে এবং সে বিধি হইতেছে এই যে, ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, এই বিশ্ব সংসারে যাহা কিছুর অস্তিত্ব দেখা যায় বা যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে ঐ সকল অস্তিত্ব বা ঘটন হইতেছে তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ইহার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া শুধু যে কঠিন তাহা নয়, এমন কি উহা দেওয়াই হয় ত অসম্ভব এবং ইহা কেবল মানিয়াই লইতে হইবে। যদি ইহা অস্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে বহুকালের অভিজ্ঞতার বলে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহার সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিতে হয় এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে অতীত ঘটনাবলী হইতে যুক্তি তর্ক দ্বারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা স্থিরীকৃত করা হয় তাহার সমস্তই বৃথা ও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া গণ্য করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হয়। অতএব জীবন বীমায় দৈবদুর্বিপাকের উপরোক্ত নিয়ম যে অপরিহার্য্য তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। দৈবদুর্বিপাকের এই নিয়ম যদি অপরিহার্য্য বিধায় অখণ্ডনীয় বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতি সমীক্ষাই প্রকৃতির নিয়ম উদ্ঘাটনে যে সহায়কই হইয়া থাকে ইহা বলাই বাহুল্য।

জড়জগতের কার্য্যকারণভাব অতি সহজেই অনুমেয় এবং ধারাবাহিকরূপে ফলাফলের ইতি-বৃত্তান্ত হইতে জড়জগতের সমস্ত সমস্যারই সমাধান অতীব সহজসাধ্য। কিন্তু যখনই মানব জীবনের সমস্যার অন্তর্ভুক্ত হইতে হয় তখনই বিভিন্ন প্রকারের জটিল প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক হইয়া পড়ে।

যে কোনও বিষয়েই হউক না কেন, তাহার সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলেই বহু প্রকারের কারণ বিচার করা আবশ্যক; কিন্তু কার্য্যতঃ অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় কারণ ব্যতীত বাকি যে সকল গুলিকেই তাচ্ছিল্য করা হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলিই তথ্য নির্ণয়ে সময় সময় বিশেষ সহায়কই হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে কি হারে মৃত্যু ঘটিয়া আসিতেছে তৎসম্বন্ধে তালিকা প্রস্তুত করণার্থে মৃত্যুকালীন বয়সই একটি অত্যাবশ্যকীয় দৃষ্টি বিষয় বলিয়াই গণ্য করা হইয়া থাকে এবং মৃত ব্যক্তি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাও একটি বিশেষ দৃষ্টি বিষয় এবং সম্ভবতঃ মৃতব্যক্তির পেশা ও বাসস্থানের উপরেও কিছু দৃষ্টি রাখিয়া ঐ তালিকায় মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কারণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে যাহাদের প্রভাব আদৌ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না, অথচ সে গুলিকে হিসাবের মধ্যেই ধরা হয় না। অতএব সম্পূর্ণ সঠিকভাবে কোনও পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে যে সকল দলীল দস্তাবেজের উপর নির্ভর করা ভিন্ন গতি নাই তাহাদেরও সমস্তগুলিই সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়া চাই; কিন্তু মানবজ্ঞানে দেখা যায় যে, সাধারণতঃ ঐ সকল ব্যাপারে একেবারে সঠিক অঙ্ক না ধরিয়া কাছাকাছি মোট যে অঙ্ক পাই তাহাই হিসাবে গণ্য করিয়া লওয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে কিছু না কিছু ভুল থাকিয়া যাওয়াই সম্ভব এবং এই প্রকারের ভুলভ্রান্তি যাহাতে না ঘটিতে পারে তৎসম্বন্ধে যাবতীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া 'Law of Casualty'র অনুসরণ করা হইয়া

থাকে, তত্রাপি একেবারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

উনবিংশতিতম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন বিভিন্ন সমিতি বা সম্প্রদায়ের সদস্যগণের মধ্যে পীড়াগ্রস্থ অবস্থায় সাহায্যের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল 'Friendly Societies' স্থাপিত হয় তাহা হইতেই যে আধুনিক 'Casualty Insurance'এর উৎপত্তি, ইতিহাস হইতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য ঐ সকল পুরাতন 'Friendly Societies' গুলির অনেকেই এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য্যও করিয়া আসিতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, বাষ্প যন্ত্রের সাহায্যে জগদ্ব্যাপী রেল হওয়ায় যাতায়াতের যেমন সুবিধা হইয়াছে, দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুর্ঘটনার সংখ্যাও ক্রমশঃই তদ্রূপ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং তৎসহ ঐরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের যাহাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয় তাহারও প্রয়োজনীয়তা ও দাবী বাড়িয়াই চলিয়াছে। 'Common Law'এর অনুসরণ করিয়া এ বিষয়ে সর্ব্বত্র ক্ষতিপূরণের আশানুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থা বহুকাল যাবৎ সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। দৈবদুর্ব্বিপাক বা দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু ঘটিলে বা কোনও শ্রমজীবী তাহার কার্য্যাবস্থায় আহত হইলে, তাহাদিগের আশ্রিত ব্যক্তিগণ আইনতঃ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিত না। সর্ব্বপ্রথম ইং ১৮৭৬ সালের 'Fatal Accidents Act'এর বলে Railway Accidents জনিত ক্ষতিপূরণের অভাব, অভিযোগ ও অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা হয়। ইহার পর ইং ১৮৬৪ সালে ঐ আইনকে

আরও দৃঢ়তর করা হয় এবং উহাকে 'Lord Campbells Act' এই নামে অভিহিত করা হয়। Workmenদিগের অসুবিধা দুরীকরণার্থে প্রথমে ইং ১৮৯০ সালে 'Employers' Liability Act' পাশ হয় এবং তাহার পর যে সকল 'Workmen's Compensation Acts, পাশ হয়, তাহার সর্ব্বপ্রথমটি ইং ১৮৯৭ সালে এবং যদিও সর্ব্বশেষটি না বলা যায় অন্ততঃ শেষটি পাশ হয় ইং ১৯২৩ সালে।

ইং উনবিংশতিতম শতাব্দীর মধ্যভাগে মাত্র Railway accidents সংক্রান্ত ব্যাপার বিধানের নিমিত্ত Personal Accidents Insuranceএর উৎপত্তি এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক কার্য্যোন্নতির সহিত 'Combined Sickness and Accident' Policy প্রদান সুরু হয়। কিন্তু 'Permanent Sickness Policy', উহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং Friendly Societies' Sickness Insurance হইতে ইহার উৎপত্তি।

যদিও গত শতাধিক বৎসরের মধ্যেই Fidelity guarantee, Burglary, Plate glass, Motor car প্রভৃতি যাবতীয় প্রকারের বীমার উৎপত্তি, তবুও একথা বলা যাইতে পারে যে ঐ সকল বিভিন্ন প্রকারের অধিকাংশগুলিরও প্রারম্ভ গত ৫০ বৎসরের মধ্যে। আমাদিগের দেশে এই সকল বিভিন্ন প্রকারের বীমার প্রচলন এখনও তেমন বাড়িয়া চলে নাই যে যাহার বিশদ আলোচনায় কোনও প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে; তবে এ কথা সত্য যে বীমা কার্য্যের প্রসার এখনও বিস্তীর্ণ এবং ব্যক্তিগত জীবনে ও বাণিজ্য রাজ্যে ইহার দ্বারা যে কত উপকার সাধিত হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন হইলেও অতি সহজেই অনুমেয়। যত বিভিন্ন প্রকারের বীমাই হউক না কেন তাহাদের সমস্তই কতকগুলি যে মূল কারণের অধীন, পুরাতন ইতিহাস হইতে তাহাদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই সকল মূল

কারণের আলোচনাই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সর্ব্বপ্রকার সাধারণ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নির্ব্বাহে যে মূল সূত্র মানিয়া চলা হয় তাহার মর্ম্ম হইতেছে "Let the buyer beware" অর্থাৎ ক্রেতা নিজে সাবধান হও। বাণিজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে, ইং ১৮৯৩ সালের "Sale of goods Act" এর একটি সর্ত্ত দ্বারা উপরোক্ত মূল সূত্রের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হয়। "Sale of goods Act" এর যে সর্ত্তের উল্লেখ করা হইতেছে তাহার মর্ম্ম এই যে, ক্রেতা প্রকাশ্যভাবেই হউক কিম্বা আভাষের দ্বারাই হউক, যখনই বিক্রেতাকে জানাইয়া দিবে যে কি কার্য্য বা ব্যবহারের নিমিত্ত উক্ত বাণিজ্য দ্রব্যের প্রয়োজন - বিক্রেতার পক্ষে তখনই ইহা স্বীকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লইতেই হইবে যে ঐ সকল বাণিজ্য দ্রব্য ক্রেতার প্রয়োজনীয় কার্য্য বা ব্যবহারের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে উপযুক্ত হওয়াই চাই "Where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for such purpose." বিক্রেতার পক্ষে তাহার বাণিজ্য দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য

সম্বন্ধে ঐ সর্ত্ত পালন করিবামাত্র তাহার সমস্ত দায়িত্বের অবসান হইবে। ক্রেতার প্রয়োজনীয় কার্য্য বা ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণতঃ যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে বিক্রেতার বাণিজ্য দ্রব্য যদি তদপেক্ষা হীন না হয় তাহা হইলে তাহার বাণিজ্য দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য অন্য হিসাবে হীন হইলেও বিক্রেতার পক্ষে ক্রেতার নিকট তাহা প্রকাশ করিবার বাধ্যবাধকতা কিছুই নাই। বীমা বিষয়ে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের বিচার অতীব সুক্ষ্ম; কেননা যাবতীয় বীমা কার্য্য নির্ব্বাহের মূলসূত্র হইতেছে "The utmost good faith" (uberrimae fides)। কিন্তু এই "good faith" পরস্পরানুবর্ত্তী হওয়া চাই অর্থাৎ বীমা কোম্পানী (insurer) যেমন সর্ব্বদাই ইহা মানিয়া চলিতে বাধ্য, বীমা চুক্তিপত্র প্রদানের পূর্ব্বে বীমা প্রস্তাব কারীকেও সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে যে তিনিও ইহা সম্পূর্ণ মানিয়া চলিতে বাধ্য এবং যতদিন যাবত বীমা চুক্তিপত্র বহাল থাকিবে ততদিন উভয় পক্ষকেই এই মূলসূত্র মানিয়া চলিতে হইবে। এই মূলসূত্রানুযায়ী বীমা কোম্পানীর প্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য এই যে বীমাকারী যে চুক্তিপত্র

গ্রহণেচ্ছু তাহার যাবতীয় সর্ত্ত তিনি যাহাতে সম্যক্ অনুধাবন করিতে সক্ষম হন তদুদ্দেশ্যে বীমা কোম্পানী বীমা চুক্তিপত্রের সমস্ত সর্ত্তগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবেন। অগ্নি বীমা প্রচলনের প্রারম্ভে বীমা প্রস্তাব পত্রের (Proposal form) মধ্যেই বীমা চুক্তিপত্রের যাবতীয় সর্ত্তের উল্লেখ করার প্রথা ছিল এবং এইরূপ প্রথা যে প্রশংসনীয় ইহা বলাই বাহুল্য; যেহেতু ঐরূপ ক্ষেত্রে বীমাকারীর পক্ষে অভিযোগের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। যাহা হউক উক্ত প্রথা যে সকল বীমা কোম্পানীই অনুসরণ করেন তাহা নহে। ২১১ টী জীবন বীমা কোম্পানীর Proposal form এ তাহাদের Policyর সমস্ত সর্ত্ত (Conditions) মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। অগ্নি বীমা কোম্পানীর মধ্যে খুব কম সংখ্যক কোম্পানীরই Cover noteএর পৃষ্ঠভাগে তাহাদের policy conditions মুদ্রিত থাকিতে দেখা যায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর Prospectusএর policy Conditions সমস্তই মুদ্রিত করা হইতে দেখা যায়। প্রধান কথা এই যে বীমাকারী যেন কখনও এ কথা না ভাবিতে পারেন, যে তিনি যদিও এক প্রকারের বীমার জন্যই আবেদন করিয়াছেন কোম্পানী কর্ত্তৃক তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকারের বীমা চুক্তিপত্র প্রদান করা হইয়াছে; অর্থাৎ বীমাকারী যদি হাঙ্গামা হুল্লাকালীন তাঁহার কোন ক্ষতি হইলে ঐ ক্ষতি পূরণ যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য আবেদন করিয়া থাকেন, সে ক্ষেত্রে কোম্পানী কর্ত্তৃক হাঙ্গামা হুল্লাকালীন মাত্র অগ্নিদাহ তাহাকে অগ্নি বীমা চুক্তিপত্র প্রদান করা হইলে উহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে "good faith" এই মূলসূত্রের অনুসরণ করা হয় নাই। অথবা যেমন motor car accidents এর বাবদ বীমার আবেদন করিলে আবেদনকারীকে যদি Third party liabilityর জন্য বীমা চুক্তি পত্র প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রেও ঐ একই কথা অর্থাৎ "good faith"এর পরিচয় পাওয়া যাইবে না। যেমন বীমা কোম্পানীর পক্ষে এই "good faith"এর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া চাই—বীমাকারীর পক্ষেও বিশেষ আবশ্যক যে তিনি সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিবেন যে অত্যাবশ্যকীয় সমুদয় বিষয় বা ঘটনা যাহা বিচার করিয়া কোম্পানী তাহার দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝিয়া তদনুযায়ী বীমাপণ ধার্য্য করা হইবে তাহা সমস্তই তিনি কোম্পানীর নিকট বিবৃত করিতে বাধ্য; নচেৎ, বীমাকারীর পক্ষেও ঐ "good faith"এর পরিচয়ের অভাব হইবে। মাত্র বীমা প্রস্তাব পত্রের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর মূল শব্দানুরূপ দিলেই যে বীমা প্রস্তাবকারীর সমস্ত দায়িত্ব শেষ হইবে তাহা মনে করা ভুল। উত্তরগুলি এরূপ হওয়া চাই যে তাহা হইতে সমস্ত বিষয় কোম্পানী যেন সম্যক অবগত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

বীমারাজ্যের খবর

গত ১লা আগষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের" চীফ এজেন্সীর কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ন্যূনাধিক সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর চীফ এজেন্সীর কাজ করিয়া ভূপতিবাবু বীমার কাজে হাত পাকাইয়াছেন এবং "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টকে"ও এদেশে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতঃপর "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" "ইকুইটেবলের" মিঃ বি, মুখার্জ্জীকে জেনারেল সেক্রেটারী করিয়া কলিকাতায় ব্রাঞ্চ অফিস স্থাপন করিলেন এবং হেয়ার ষ্ট্রীটে বৃহত্তর বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্সের বর্ত্তমান কর্ণধার শ্রীযুক্ত জে-সি-দাসও এককালে ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের এজেন্সী করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উহার spade work বা মাটী কোপাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। আজ মিঃ বি-মুখার্জ্জীর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্টের কাজ বাংলা দেশে দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাদের প্রচেষ্টার ফলে জমি তৈয়ারী এবং গাছ লাগানো হইয়াছিল তাহাদিগকে ভুলিতে পারি না। সম্প্রতি "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্সে" ভূপতিবাবু যোগদান করায় আমাদের আশা হইতেছে যে এবার ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কর্ত্তৃপক্ষ একটু চাঙ্গা হইয়াছেন। নচেৎ যে কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, যোগেশ সেন, কুমুদশঙ্কর রায়, রাজাউর রহমান খাঁ, এবং রায় বাহাদুর ভূধরদাস প্রমুখ খ্যাতনামা লোক রহিয়াছেন, তাহার নাম লোকে শুনিতে পায় না কেন?

গত ১৯২৯ সালে এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আজ প্রায় ৪ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু ইহার নামই সাধারণের মধ্যে আজিও জাহির হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে "মেট্রোপলিট্যান" প্রথম বৎসরে পদার্পণ করিয়াই ৪০ লক্ষ টাকার পলিসি ইস্যু করিয়াছে এবং নিউ ইণ্ডিয়ার প্রথম বৎসরের কাজের রেকর্ড অতিক্রম করতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সমসাময়িক কোম্পানীসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; এজন্য তাঁহাদিগকে যে ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে, তাহাও আশাতীত কম—অর্থাৎ মাত্র ৭৫ পারসেণ্ট।

অথচ ডিরেক্টর বোর্ডের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার বোর্ডের ডিরেক্টরগণ সকলেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইঁহাদের ত্রুটীর মধ্যে যাহা নজরে পড়ে, সে শুধু—publicity বা প্রচারের অভাব। সোণার তাল মাটীতে পোঁতা থাকিলেও কেহ জানিতে পারে না, যে পর্য্যন্ত কেহ সে কথা ঢাকে ঢোলে সকলকে জানাইয়া না দেয়। ভাল বোর্ড হইলেই কাজ আসে না; ভাল লোক চাই এবং Publicity ও Propaganda চাই। যাহারা তাহা করে, তাহাদের কাজও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার ভাল দুইজন বীমাকর্ম্মীকে গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবার তাহার Infant le Marasmus হইতে মুক্তি পাইবে। প্রিয়দর্শন ডাক্তার কুমুদশঙ্কর থাকিতে এমন Pedegreeওয়ালা কোম্পানীর Infantile Marasmus হয় কেন?

* *

গত ১০ই আগষ্ট তারিখে ওরিয়েণ্টালের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ রবার্টস্‌এর অবসর গ্রহণ উপলক্ষে ইম্পিরিয়াল রেস্তঁরাতে এক চা পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। বাহিরের নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বীমা সম্বন্ধীয় কাগজ "ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইন্যান্স রিভিউ," "ব্যবসা ও বাণিজ্য" এবং "জীবন বীমা"র সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণস্বামীয়ারের হঠাৎ মৃত্যুর পর মিঃ রবার্টস্‌ তাঁহার স্থলে অল্প কয়েক মাসের জন্য কাজ করিতে আসিয়াছিলেন; এই পদের স্থায়ী সেক্রেটারী মিঃ এস, এস, নাজির কলিকাতায় আসায় মিঃ রবার্টস্‌ অবসর গ্রহণ করেন। মিঃ নাজিরও এই বিদায় অভিনন্দনে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ রবার্টস্‌ অত্যল্পকালের জন্য কলিকাতায় ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা তাঁহার আলাপ ব্যবহার এবং আন্তরিক সরলতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার জীবনের যে রোমাঞ্চকর ইতিহাস আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন তাহাই প্রবন্ধাকারে আমরা গত ভাদ্র মাসে প্রকাশ করিয়াছি। অনেক বীমা কর্ম্মী এই প্রবন্ধপাঠে উপকৃত হইয়া এইরূপ লোকের জীবনী প্রকাশের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপ একজন লোকের বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করায় শ্রীযুক্ত স্বামীনাথন্‌ এবং বাবু জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ কর্ম্মচারীগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

* * *

মিঃ রবার্টস্‌এর অভিনন্দনের বিবরণের মধ্যে সহযোগী "জীবন বীমা" শ্রীযুক্ত স্বামীনাথন্‌ এবং জিতেন্দ্রবাবু উভয়কেই ওরিয়েণ্টালের ব্র্যাঞ্চ সেক্রেটারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—এই কথা বীমা কাগজ সংসৃষ্ট জনৈক "ব্রাদার" আমাদের দেখাইলেন। আমরা দেখিলাম "জীবন বীমা" স্বামীনাথন্‌কে "ওরিয়েণ্টালের কলিকাতা শাখার এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী এবং জিতেনবাবুকে "এসিষ্ট্যাণ্ট ব্র্যাঞ্চ সেক্রেটারী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা ছিদ্রান্বেষী বন্ধুকে বলিলাম যে বর্ণনার ভাবার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন না কি?—যদিও সে পার্থক্যটা অনেকটা "Tweedledam and Tweedldee"র মত।

* * *

নিউ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার লাইফ বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার এস, সি, রায় ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। অল্প কয়েক মাসের জন্য ইউরোপে গেলেও তিনি যে বিশেষ কাজের জন্য ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বীমা জগতে Official Secrets Act না থাকিলেও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে আমরা তাঁহার হঠাৎ ইউরোপ যাত্রার রহস্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে তাঁহার এই বিদেশ ভ্রমণের ফল শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আশ্বাস পাওয়ায় আমরা আপাততঃ সব চাপিয়া রাখিলাম। কিন্তু বেশী দিন চাপিতে গেলে পেট ফাঁপা জনিত দুই চারিটী

উদ্গার হয়ত বাহির হইতে পারে—এ আশঙ্কা আমাদের আছে, ইহা বন্ধুকে জানাইয়া রাখিলাম।

*		*		*

বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় বাংলার দিকে দিকে আজকাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট ফণ্ড গজাইয়া উঠিতেছে; কারণ, লোকে দেখিতেছে যে জগদ্ব্যাপী এই মন্দার দিনে একমাত্র বীমা কোম্পানীগুলিই বেশ হালুক্ চালুক করিতেছে, সুতরাং যে কেহ সর্ব্ব নিম্ন গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে সেই একটা বীমা কোম্পানী খুলিয়া বসিতেছে। একজন প্রসিদ্ধ বীমাবিদ লিখিয়াছেন—"Insurance is not a beggar's business. অর্থাৎ ভিখারীর পক্ষে বীমা কোম্পানী খোলা বিড়ম্বনা মাত্র। কোনও একজন ধনীকে ফুঁসলাইয়া বা শতকরা ১০।১২ টাকা কমিশনের প্রলোভন দেখাইয়া সেয়ার বিক্রয় করত: কোনও রকমে গভর্ণমেণ্ট ডিপজিটের টাকাটা জোগাড় করিতে পারিলেই এই সকল টুম্বকপ্রাণী কোম্পানী (Mushroom Companies) মনে করে যে ব্যস, এইবার ত' কেল্লা মার্ দিয়া। তারপর খবরের কাগজে লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন দিবার পালা। এও এক মুফতি বারবার।

খবরের কাগজ ওয়ালারা বিজ্ঞাপনের আশায় হা করিয়া বসিয়া আছে—ছয় মাস বা এক বছরের কন্‌ট্রাক্ট একখানা পাইলেই তাহারা মহাখুসী; বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক পিটানো সুরু হইল এবং এইরূপে কোম্পানীর কাজ আসিতেও সুরু হইল। কিন্তু শত শত কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ফলে যত জোরে বিজ্ঞাপন এবং write-up বাহির হয়, তত জোরে কাজ আসে না, সুতরাং বিজ্ঞাপনের টাকা দেওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে। যে সকল ঘাগী এবং দাগী আসামীরা এইরূপ কোম্পানী স্থাপন করিতেছে তাহারা সর্ব্বাগ্রে কাগজ ওয়ালাদের বড় বড় বিজ্ঞাপন এবং রাস্তা ঘাটে প্রাচীরপত্র আঁটিয়া সার্কাস কোম্পানীর ন্যায় প্রোপাগ্যাণ্ডা সুরু করে। তাহাদের মতলবই এই যে, ৬ মাসের মধ্যে বিলের পাই পয়সাটাও কাহাকেও দিবে না—কেবল বিল সরকারকে হয়রাণ করিয়া ফিরাইবে। তারপর কাগজ ওয়ালাদের চক্ষু ফোটে এবং তাহারা ছোট আদালতের নিমন্ত্রণ পাঠাইতে সুরু করিলেই ইহারাও পাততাড়ি গুটাইতে আরম্ভ করে।

সম্প্রতি এইরূপ নূতন প্রতিষ্ঠিত একটি বীমা কোম্পানীর অবস্থা টল্‌মল্ করিতেছে। শুনিলাম দেনার টাকার বাবদ তাহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নামে কয়েকটা ওয়ারেণ্ট ঝুলিতেছে এবং বাবুটি, থুড়ি 'মিষ্টার"—এখন পালাইয়া বেড়াইতেছেন। পেঁচার ন্যায় work day গুলিতে তিনি অন্ধকার বিবরে লুকাইয়া থাকেন, আর রবিবারে যেদিন বেলিফ আফিস ও আদালত বন্ধ থাকে সেই দিন তিনি আফিসে দেখা দেন। যতদিন ছোট আদালত ও ব্যাঙ্কশাল্ কোর্টের নিমন্ত্রণ পত্র আসে নাই ততদিন তাঁহার কায়দা ছিল,—একজন ব্যূঢ়বক্ষ, বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু, মহাবাহু বিশিষ্ট পেন্সনী মিলিটারী পালোয়ানকে আফিসের দরজায় বসাইয়া রাখিতেন; কোনও বিল সরকার, দারোয়ান বা বাবুর এই দরজা অতিক্রম করিয়া আফিসের ভিতর যাইবার উপায় ছিল না। বিলগুলি আসিলে দরওয়ান তাহা নিয়া আফিসের পিওনের মাং কর্ত্তার কাছে পাঠাইয়া দিত এবং যথা সময়ে টাকা দিবার তারিখ পিছাইয়া দিয়া বিলের কভার বা মোড়কগুলি বিল সরকারদের ফিরাইয়া দেওয়া হইত। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক একখানা কভারের গায়ে

এইরূপ তারিখ এতবার বদলানো হইয়াছে যে উহা ঠিক নামাবলীর ছাপের মত দেখাইত। ইদানীং আফিসের বাবুরাও মাহিয়ানা পাইবার জন্য আফিসের মধ্যে তুমুল সোরগোল বাধাইতে ছিল। মিষ্টারটী প্রিটোরিয়ান গার্ডের সাহায্যে ইহাদের হাতে mobbed হওয়ার লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইতেছিলেন, কিন্তু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইতে সুরু হওয়ায় একেবারে গা ঢাকা দিয়াছেন।

যেরূপ অবস্থা তাহাতে যদি শীঘ্রই ইহার কর্তৃত্বভার কোনও উপযুক্ত লোকের হাতে ন্যস্ত না হয় এবং ইহার পরিচালনার ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত না হয় তবে অবিলম্বে ইহাকে লালবাতি জ্বালাইতে হইবে।

* * *

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, যে এইরূপ আর একটী "টুনুকপ্রাণী" অবাঙ্গালী রেগুলার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ভাঁড় শূন্য হইয়া ঠন্ ঠন্ করিতেছে এবং কোম্পানী চিৎ হইবার উপক্রম করিতেছে। প্রথম হাহাকার উঠিয়াছে কাগজওয়ালাদের মধ্যে; কারণ তাদের বিলের তাড়ায় দপ্তর ভারী হইয়াছে, কিন্তু তহবিলে পাই পয়সাও উসুল হয় নাই। তবে তাহাদের সওয়া ঘাড়, এবং এরূপ গবুচা প্রায় তাহাদের লাগিয়াই আছে; সুতরাং সেজন্য কোনও আপ-শোষ নাই; কিন্তু দুঃখ হইতেছে—বাঙ্গালী ব্র্যাঞ্চ সেক্রেটারীটির জন্য। তিনি কলিকাতার কোনও বনিয়াদী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। চোলে পড়িয়া মোটা টাকার paidup সেয়ার কিনিয়া মোটা মাহিয়ানায় সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। আজ প্রায় বছরখানেকের মধ্যে মাহিয়ানার টাকা ত' পানই নি, উপরন্তু এখন সেয়ারের টাকাও জলে যাইতে বসিয়াছে। তিনি এখন মাথা চাপ্‌ড়াইয়া বলিতেছেন যে আমার তেলও গেল থলিও যায়!

* * *

স্বদেশী যুগের স্থাপিত কোনও পুরাতন প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর অবস্থা "এখন তখন" হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত ও শঙ্কিত হইলাম। গত কয়েক বৎসর হইতে কোম্পানীর ফাণ্ডের ডিফিসিটের জন্য সরকারী একচুয়ারী কর্তৃপক্ষের মাথায় ডাণ্ডস্ মারিতে-ছিলেন এবং কোম্পানীকে লিকুইডেশনে পাঠাইবার ভয় দেখাইতেছিলেন। গত বৎসর কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বহুবৎসরের ব্যালান্স সীট আমাদের দেখাইয়াছিলেন; আমরা দেখিলাম যে কোম্পানীর কোনও মারাত্মক ব্যাধি নাই। কেবল প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আমলে যে দেনা ইহাদের ঘাড়ে ছিল, সেইটাই বলবৎ হইয়া আছে। আমরা তখন দেখিয়াছিলাম যে যদি কোনও ধনী বা সিণ্ডিকেট এই টাকাটা জমা দিয়া দেন এবং নূতন ব্যবস্থাদি প্রচলনের জন্য কিছু খরচ করেন তবে সর্ব্ব সাকুল্যে এক লাখ টাকা ফেলিলেই এই পুরাতন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পা-নীটি (যাহার প্রিমিয়াম আয় এখনও বৎসরে প্রায় লক্ষাধিক টাকা) আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। গত বৎসর আমরা ইঁহাদের জন্য একজন ধনী ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে termsএর বনিবনাও না হওয়ায় আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। এবার শুনিতেছি যে কর্তৃপক্ষ সমুদয় ভার একেবারে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কোনও কোনও লোকের সহিত কথাবার্ত্তাও নাকি চলিতেছে। পুরাতন অথচ ভাল বীমা কোম্পানী পাওয়া দুর্ঘট; ইহার স্থায়ী প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণও কম নহে।

দেশেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা টাকা খাটাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজিয়া পান না। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যখন সমুদয় কর্ত্তৃত্বভার ছাড়িয়া দিয়াও কোম্পানীটিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন ধনীদের অগ্রসর হওয়া উচিত। একটা নূতন বীমা কোম্পানী গড়িয়া তোলা Herculean task ; ইহা প্রচুর সময়, শক্তি ও সামর্থ্য সাপেক্ষ ; উপরন্তু একই জীবন বীমার ক্ষেত্রে শত শত দেশী কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য কাজ পাওয়াও দুর্ঘট ; এই জন্য নূতন বীমা কোম্পানীর অন্ততঃ প্রথম দশবৎসর কাটিয়া না গেলে তাহার আঁতুড় ঘরের ফাঁড়া কাটিবে কিনা বলা শক্ত।

এই সকল নানা দিক বিবেচনা করিয়া যে বয়স ২৪।২৫ বছর কোম্পানীর হইয়াছে এবং বীমা-ক্ষেত্রে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উপরন্তু যাহার বাৎসরিক প্রিমিয়াম আয় লাখ টাকার মতন, সেরূপ কোম্পানীর পিছনে টাকা লাগানো আমাদের বিবেচনায় বিপজ্জনক মনে হয় না। এইরূপে বিপদাপন্ন দেশী কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষীর চেষ্টা করা উচিত ; নচেৎ একটী বীমা কোম্পানী পটল তুলিলে দেশের মধ্যে বীমা কোম্পানীর মড়ক লাগিয়া যাইবে এবং তাহাতে দেশের যে ভয়াবহ ক্ষতি হইবে, তাহা ভাবিলেও শরীর আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠে।

* * *

এই প্রসঙ্গে আমরা Insurance Institute এর কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে তাঁহাদের দায়ীত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই সংঘের উৎপত্তি ; কিন্তু তাঁহাদের চোখের সামনে কয়েকটা কোম্পানী হাবুডুবু খাইতেছে দেখিয়াও যদি তাঁহারা তাঁহাদের এ ব্যাপারে "কিছু করার নাই" বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, এবং শুধু চটক্‌দার গুজব শুনিয়াই ক্ষান্ত থাকেন তবে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছেন সেই উদ্দেশ্যের গুড়েই বালী পড়িবে। আমাদের বীমা কর্ম্মীরা দেশের সর্ব্বত্র বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায় যে ১৯১২ সালের Insurance Act পাশ হইবার পর কেবলমাত্র জীবন বীমা করে এরূপ কোনও কোম্পানী আজিও ফেল পড়ে নাই। সরকারী একচুয়ারী তাহাদের এই উক্তির সাক্ষ্য দিতেছেন। এই উক্তির বলেই দেশীয় বীমা কোম্পানীর উপর দেশের লোকের বিশ্বাস ও আস্থা আজিও অটুট আছে। তাই দেশী বীমা কোম্পানীর কাজও এরূপ অসম্ভব ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

আজ যদি বীমা কোম্পানী একবার ফেল পড়িতে সুরু করে তবে দেশীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় বীমা কোম্পানীর উপরও লোকে বিশ্বাস ও আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। ব্যাঙ্ক ও বীমা উভয়ই জন-সমাজের বিশ্বাসের প্রতীক, ইংরাজীতে যাহাকে Credit Institutions বলে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, মহাজন ব্যাঙ্ক, কো অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকটি দেশী ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার জন্যই বাংলা দেশের লোকে দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে চায় না এবং একমাত্র এই কারণেই সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা দেশে একটা ব্যাঙ্কের মত ব্যাঙ্ক আজিও গড়িয়া উঠিতে পারিল না। লোকের বিশ্বাস বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক চালাইতে অক্ষম এবং অপটু। কিন্তু বীমার ব্যাপারে Act পাশ হবার পর হইতে কোনও কোম্পানী ফেল না পড়ায় দেশী বীমা কোম্পানীর প্রতি লোকের বিশ্বাস ও ভরসা নষ্ট হয় নাই। দেশের লোকের এই বিশ্বাস ও

ভরসাই দেশীয় বীমা কোম্পানীর অদ্ভুত সাফল্যের প্রধান সেতু। এই বিশ্বাস ও ভরসা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাই আমরা বীমা-সংঘের কর্ম্মকর্ত্তাদের এ বিষয়ে একটু অবহিত হইতে বলিতেছি।

যদি তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং মিলিত চেষ্টায় এই জাতীয় বিপদ ও কলঙ্কের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যায়, তবে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি। ব্যষ্টি মরিলে সমষ্টি বাঁচিবে না—এ কথা যেন মনে থাকে। বিদেশী বীমা কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তারা বগল বাজাইবার জন্য উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের দালালেরা এখুনি মুখে মুখে প্রচণ্ডবেগে প্রচার সুরু করিয়াছে। এসব দেখিয়া শুনিয়াও এই কয়েকটী বিপন্ন কোম্পানীকে রক্ষা করার জন্য যদি কাহারও প্রাণ ব্যথিত না হয় তবে বুঝিব যে আমাদের মধ্যে এখনও সে দরদ জাগে নাই যাহার ফলে একটা জীবন্ত সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলা দেশে বীমার ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং দেশের সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিলে আমাদের খুব বিশ্বাস যে এই সকল বিপন্ন কোম্পানীকে রক্ষা করা যায়

* * *

গত ১৯৩১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটীর যে পঞ্চবর্ষ শেষ হইয়াছে তাহার ভ্যালুয়েশন ফলে কোম্পানী লাভসহ আজীবন বীমায় হাজার করা বার্ষিক ২৬৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায়—হাজার করা বার্ষিক ২১৲ টাকা বোনাস ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে এরূপ বোনাস ঘোষণা করিতে পারা কোম্পানীর কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশস্থ প্রতিনিধি মিঃ দস্তিদার ও মিঃ গুহকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

• • •

স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন শুনিলাম মেট্রোপলিটানে যোগ দিয়াছেন। হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র মজুমদারের সহিত একত্রে বহুকাল যাবত তিনি বেঙ্গল মার্ক্যাণ্টাইলে কাজ করিয়াছেন এবং ইহার এজেন্সী অরগ্যানিজেশন কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। এতকাল যাবৎ যে কোম্পানীকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন—পরিণত বয়সে সেই নিজস্ব কোম্পানী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় আমরা তাঁহার জন্য বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

* * *

মেট্রোপলিট্যানের সচ্চিদানন্দ বাবু বাংলা-দেশের বহু নির্য্যাতিত দেশ সেবককে বুকে করিয়া লইয়াছেন এবং মোটা মাহিয়ানা দিয়া তাহাদিগকে নানারূপ দেশীয় অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছেন। মাদারীপুরের নির্য্যাতিত কর্ম্মী বিখ্যাত স্বদেশ সেবক এবং আমাদের প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন বিশ্বাস, বহুকালের নির্য্যাতিত কর্ম্মী অমর ভায়া, ভূতপূর্ব্ব স্বরাজী মালসী হেমন্ত সরকার, ডাক্তার নলিনাক্ষ্য সান্ন্যাল, স্বদেশীবক্তা সুরেন সেন প্রভৃতি অনেক স্বদেশ সেবককে সচ্চিদানন্দ বাবু—পক্ষপুটে রাখিয়া তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল কর্ম্মীর যোগাযোগ উভয় পক্ষের কল্যাণপ্রসূ হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

* * *

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানীর লক্ষাধিক টাকা ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং এজেন্টদিগের আমলে ঢাকুরিয়ার এক জমিতে বহুকাল যাবত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য কোম্পানীর নামে নানা দুর্নাম রটিয়াছিল এবং বহু লোকের নিকট কোম্পানীকে কৈফিয়ৎ দিতে হইত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কোম্পানীর নিকট হইতে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এক লক্ষ ষোল হাজার টাকায় ঐ জমি কিনিয়া লইতেছেন এবং অতি শীঘ্রই এই টাকার আদান প্রদান হইয়া যাইবে। এই টাকাটা ফেরৎ পাইলে কোম্পানীর বুকের উপর হইতে এক জগদ্দল পাথর নামিয়া যাইবে। প্রফুল্ল বাবুর কৃতিত্ব ও কপাল জোর দুইই আছে। কারণ তাঁহার হাতে কোম্পানীর কার্য্যভার আসার পর হইতে বেঙ্গল ইনসিওরেন্স আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে।

* * *

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট হলে ডাক্তার এস্. সি. রায় তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করেন। ইনসিওরেন্স ওয়ার্লডের শ্রীযুক্ত এস্. সি, রায়, ইন্‌সিওরেন্স হেরাল্ডের শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, জীবন বীমার শ্রীযুক্ত ভূপতি মোহন সেন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও ভিন্ন ভিন্ন বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার রায় গ্রুপ ইন্‌সিওরেন্সর এবং বিল্ডিং সোসাইটীর ক্রিয়াকলাপ ও পরিচালন পদ্ধতি সম্বন্ধে ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীতে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য জানিয়া আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে এক বর্ণনা প্রদান করেন। ইহার মধ্যে জানিবার এবং শুনিবার অনেক কথা আছে বলিয়া স্থির হইয়াছে যে ডাক্তার রায় এবিষয়ে শীঘ্রই ইনষ্টিটিউটে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

* * *

মিঃ আই, বি, সেনের নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ও বোম্বে লাইফের কলিকাতাস্থ শাখা আফিস আগামী ১লা অক্টোবর ২৯নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে উঠিয়া গিয়া ১০নং ক্লাইভ রোডে স্থানান্তরিত হইবে। ২২ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১০ সালে গ্রে ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে মাসিক ৬৲ ছয় টাকা ঘর ভাড়া করিয়া যে ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্টের জন্ম হইয়াছিল আজ তাহা সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি অফিসাঞ্চলের কেন্দ্র স্থানে কোম্পানীর আফিস স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। হালখাতা এবং নবগৃহ প্রবেশের সময় বন্ধুবান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া মিষ্ট মুখ করাইতে হয়। আশা করি ইন্দুবাবু তাহা ভুলিয়া যান নাই, কারণ, প্রচারের দিক হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য অনেক।

* * *

Western India Insurance Coy of Satara সম্প্রতি ২নং চার্চ লেনে ঠিক ছোট আদালতের সম্মুখে তাঁহাদের ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন এবং বীমা-রাজ্যের সুপরিচিত মি, এস, সি, দাস বি, এ, কে ব্র্যাঞ্চ আফিসের চার্জ্জে রাখিয়াছেন। মিঃ দাস ১৯২১ সালে বি, এ, পাশ করিয়া ইন্‌সিওরেন্স লাইনে সাধারণ এজেণ্টরূপে প্রবেশ করেন এবং কয়েক বৎসর যাবত নর্থবৃটীশ, গ্রেট ইষ্টার্ণ এবং ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় বীমা কোম্পানী সমূহের

এজেন্সী গ্রহণ করতঃ বীমার কাজে হাত পাকান্ এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অতঃপর দেশ জুড়িয়া স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সাফল্যের জন্য যে প্রচার চলিতেছে তাহার প্রভাবেই মিঃ দাশ বিদেশী কোম্পানীর সংশ্রব পরিত্যাগ করতঃ দেশী বীমা কোম্পানীতে যোগ দিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই কোম্পানীর বিশেষত্বাদির পরিচয় প্রদান করিব ইচ্ছা রহিল।

* * *

সম্প্রতি অন্ধ্র ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। সেদিন সভ্যদের Club Day ছিল। সেখানে সভ্যদের সম্বোধন করিয়া তিনি যখন কয়েকটী কথা বলিতেছিলেন তখন আমরা লক্ষ্য করিলাম স্বদেশ প্রেমে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। এই স্বদেশপ্রেমের আগুন সকলের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হউক এবং বিদেশীয় মোহ পুড়াইয়া খাক্ করিয়া দিক্ ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। জগত জুড়িয়া রব উঠিয়াছে নিজের দেশের জিনিষ কেনো ; আমরাই কি বলিয়া বেড়াইব যে বিদেশী পণ্য কেনো ? আর নিজের দেশকে জাহান্নমে দাও !

* * *

আমরা শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম যে প্রভাত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর মিঃ বি, বি, দত্ত সম্প্রতি তাঁহার কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন এবং শীঘ্রই বোম্বাই হইতে লোক আসিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবে।

ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিমিটেডের

চীফ্ এজেণ্টের কীর্ত্তি

পত্রান্তরে প্রকাশ যে ইউনাইটেড্ এসিওরেন্স লিমিটেডের ঢাকার চীফ্ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ রায়, এ, কে, ঘোষাল এবং এম্ রায়, নামক তিন জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারানুযায়ী দুইজন পলিসি হোল্ডারের টাকা প্রতারণা করিয়া আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ আনিত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ মহকুমার হাকিম মিঃ এ, সি, হার্ট্‌লীর এজলাসে উক্ত মামলা বিচারাধীন আছে। আসামীগণের মধ্যে ফণী রায় উপস্থিত জামীনে মুক্ত আছে। অপর দুইজন আসামীকে ধরিবার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। পুলিশ বিশেষ অনুসন্ধান করিতেছে।

বাঙ্গলায় সার্কাসের ব্যবসা

শ্রীগুণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েক বৎসরের মধ্যে থিয়েটার ও বায়স্কোপ এদেশে অভূতপূর্ব্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতার মত নগরে, যে স্থানে বারো লক্ষ লোকের বাস, তথায় পাঁচটি দেশীয় থিয়েটার (অর্থাৎ বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত) নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। দুইটী বিলাতী থিয়েটার, একটী চীনা থিয়েটার ও দুইটী পার্শি থিয়েটার (অর্থাৎ অ-বাঙ্গালী কিন্তু ভারতীয়) প্রায় নিয়মিত ভাবেই সহরবাসীকে আমোদ প্রমোদ দান করিয়া আসিতেছে। দেশীয় থিয়েটারগুলির দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ সাজ-সজ্জা, ও অভিনয়-ভঙ্গি আজ উন্নত ধরণের বলিয়াই পরিগণিত। বাঙ্গলার নাট্য সাহিত্যের বিকাশের ধারাও আজ জগতের কোনও সুসভ্য জাতির নাট্য সাহিত্যের বিকাশের তুলনায় হেয় নহে—একথা আজ আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। অপরাপর বিষয়—যথা, রঙ্গমঞ্চের চারু-কলা-শিল্পের বিকাশ, যাহা অধিকাংশই নির্ভর করে জাতির আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর—তাহার তুলনায় বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ যদি হীন হয় সেজন্য দায়ী বাঙ্গালীর আর্থিক দৈন্য। বঙ্গবাসীর মস্তিষ্কের দৈন্যের অপবাদ কেহ দিতেপারিবে না—তাই আজ বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্মেষের যুগে বাঙ্গলায় নাট্যসাহিত্য তথা রঙ্গমঞ্চেরও উন্নতি ও প্রসার হইতেছে।

থিয়েটারের পরেই বায়স্কোপ। বর্ত্তমানে কলিকাতায় আঠাশটি বায়স্কোপ চলিতেছে। তন্মধ্যে চৌদ্দটিই এই ম্যাডান কোম্পানীর, অপর গুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। এতদ্ভিন্ন অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত কয়েকটী দেশীয় ফিলম্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বৃটিশ ডোমিনিয়ান ফিলম্ কোং লিঃ ও ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস কোং লিঃ। অরোরা সিনেমা কোম্পানীও বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত অন্যতম বায়স্কোপ কোম্পানী। অধুনা এই কোম্পানীটিও দেশীয় ছবি প্রদর্শন করিয়া বেশ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন ও লোকপ্রিয় হইয়াছেন।

সার্কাস

কিন্তু ইহা থাকা সত্বেও কেন যে অপর একটি প্রধান আমোদ প্রমোদের প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমি সার্কাসের কথা বলিতেছি। বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী দ্বারা পরি-

চালিত কোন সার্কাস নাই। ইহার কারণ কি? তবে কি বাঙ্গালী এ-রসে রসজ্ঞ নহে? না— এ কথা বাঙ্গালীর পরম শত্রুর মুখেও শোভা পায় না। কেননা, প্রতি বৎসর শীতকালে এই কলিকাতায় তিন চারিটী প্রথম শ্রেণীর বিদেশী সার্কাস আসিয়া থাকে।

গত ১৯২৮ সালের কথাই ধরা যাক। কার্লে´কারস্ গ্র্যাণ্ড সার্কাস, সেলার্স´ রয়াল সার্কাস, জয়ল্যাণ্ড কার্নি´ভ্যাল, ম্যানিলা কার্নি´ভ্যাল—এই চারিটি কোম্পানী কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর ইহারা সর্ব্বসমেত এই গরীব বাঙ্গালীর পকেট হইতে কত টাকা লুটিয়া নিয়া গেছেন, তার খবর কেহ রাখেন কি? আমরা আনুমানিক হিসাব দিতেছি। কার্লে´-কারস সার্কাস ১॥০ দেড় লক্ষ টাকা, সেলার্স´ সার্কাস এক লক্ষ টাকা, জয়ল্যাণ্ড, কার্নিভ্যাল— কোন কারণ বশতঃ ইহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; ম্যানিলা কার্নিভ্যাল ২ দুই লক্ষ টাকা। মোট ৪॥০ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। এক শীত ঋতুতে বাঙ্গালী ৪॥০ লক্ষ টাকার সার্কাস দেখিয়াছে। কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী হিসাবে বা লভ্যাংশের উপস্বত্ব ভোগ হিসাবে ইহার একটী পয়সাও বাঙালীর ঘরে আসে নাই। ত— কেমন করিয়া বলি—বাঙ্গালী সার্কাস ভালবা—, না—বা এ রসে বঞ্চিত?

বাঙ্গালীর ব্যর্থতার কারণ

তবে কি বুঝিব—(১) বাঙ্গালীর শরীর দুর্ব্বল, (২) বাঙ্গালী জাতিগতভাবে ললিত-কলার (fine arts) অধিকতর অনুশীলন-প্রিয়—এই দুই কারণে কষ্টসাধ্য সার্কাসের ক্রিয়ায় অনুরক্ত নহে? অর্থাৎ

সার্কাস জিনিষটা কষ্টসাধ্য আমোদ প্রমোদ বলিয়া বাঙ্গালী ইহার আলোচনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করে? কেননা বাঙ্গালী শারীরিক হিসাবে দুর্ব্বল। এ কারণ একেবারে অবৈজ্ঞানিক নহে। তবে কেহ কেহ বলেন,—এ অকৃতকার্য্যতা বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত নহে—বরং মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত। কেননা, বাঙ্গালী দুই একটী সম্প্রদায় যাহারা সার্কাসের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে কম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে। শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বাঙ্গালী অপর কোন জাতির খেলোয়ারগণের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখা যায় নাই। অভাব দেখা গিয়াছে শুধু তাহার মানসিক সাহসিকতার এবং তাহার চরিত্রের tenacityর বা কোন কিছুতে লাগিয়া থাকার শক্তির অভাবের; তাহা ছাড়া সার্কাস অনেকটা বিপদসঙ্কুল, থিয়েটার বায়স্কোপ তাহা নহে।

ব্যবসায় হিসাবে সার্কাস

সার্কাস যে শুধু শারীরিক অনুশীলনগত (Physical Arts) আমোদ-প্রমোদ তাহা নহে। জাতীয় জীবনে ইহার একটা অর্থকরী দিকও আছে। সার্কাস বর্ত্তমানকালে থিয়েটার বায়স্কোপের ন্যায় অর্থাগমের অন্যতম পন্থা। বরং অল্প বয়সের মধ্যে এত অধিক অর্থোপার্জ্জন থিয়েটার কিংবা বায়স্কোপ কোন কোম্পানী দ্বারাই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালীর আর্থিক দুরবস্থার কথা ভাবিতে গেলে বলা যায়, বেকার-সমস্যা দেশে যেরূপ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এমন একটী প্রতিষ্ঠান উপেক্ষিত হওয়া জাতীয়ভাবে বাঙ্গালীর একটা ব্যর্থতা।

বাংলা দেশে এ-যাবত যে-সকল সার্কাসের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল এইখানে তাহার একটা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল।

স্বর্গীয় নবগোপাল মিত্র প্রথমে ন্যাশনাল সার্কাস আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ হরিমোহন রায়ের চিড়িয়াখানায় খোলেন। ইহার কিছুদিন পরে শিমলানিবাসী যোগেন বাবু এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলার সার্কাসের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি দীর্ঘ পনর বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বহস্তে ঘোড়া, বাঁদর ও কুকুরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহার কুকুরের গাড়ী, বানর কোচম্যান, বানর সহিস আজিও মনে পড়ে। যোগেন বাবুই প্রথমে বাঙ্গালীর মেয়েকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে লম্ফন, কুর্দ্দন ও ডিগবাজী খাওয়া শিখাইয়াছিলেন। ইনিই গোলাপ, বসন্ত ও বাণা নামে তিনটী বাঙ্গালী মেয়েকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা অনেক বিদেশী সার্কাসে দেখা যায় না। ইহারই দলের বিখ্যাত খেলোয়াড়গণের মধ্যে পান্নালাল বর্দ্ধন বিখ্যাত প্যারিস একজিবিসন প্রত্যাগত—চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, জাভা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু বিলাতি সার্কাস দলে যথা ফিলিস, ওয়ারেণ, হারমষ্টন্ ইত্যাদিতে খেলা দেখাইয়াছিলেন; ইহার সমকক্ষ ট্রিপল্‌বারের খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত কোন সার্কাসে দেখা যায় না। এই দলের বনমালী কুণ্ড বিখ্যাত রোমান রিঙ্গে ও লোহার গোলার খেলোয়াড় ছিলেন। ইহার এক একটা বাহু এক একটী তাকিয়ার ন্যায় ছিল। সদাই (খগেন) ঘোটক পৃষ্ঠে ক্রীড়া করিতেন। অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী—ট্রেপিজের খেলা দেখাইতেন; বিশ্বনাথ শ্রীমানি—ইনি প্রসিদ্ধ জাগলিং পিরামিড ও লিপিং বোর্ডের খেলা দেখাইতেন। ইনি এক্ষণে এলাহাবাদে জুয়েলারী দোকান করিয়াছেন। বেণীবাবুও ট্রিপলবার ও অন্যান্য খেলা

দেখাইতেন। তিনিও এখন জীবিত আছেন। অন্ততঃ ইণ্ডিয়া সার্কাস উঠিয়া যাইবার দশ বৎসর পরে প্রিয়নাথ বসু কর্ত্তৃক গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কনক ভট্টাচার্য্য

কাশিমবাজারের পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এক সময় একটী সার্কাস পার্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত কনক ভট্টাচার্য্য ছিলেন মহারাজার একজন প্রিয়পাত্র। কনকবাবু একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন ও উত্তম পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। এইজন্য মহারাজা তাঁহাকে ভালবাসিতেন। পরে মহারাজের অর্থে কনকবাবুর পরিচালনায় একটী সার্কাস পার্টি গঠিত হয়—গ্রেট মারহাট্টা সার্কাস। মহারাষ্ট্র দেশায় একটী ছোট সার্কাস বহরমপুরে আসিয়া অচল হইয়া পড়ায় কনকবাবু তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং দলটিকে অর্থ সাহায্য করিয়া নবভাবে গঠন করিয়া তোলেন। কনক বাবু স্বয়ং চরিত্রবান্ লোক ছিলেন, কর্ম্মক্ষমতাও তাঁহার কম ছিল না। এই কোম্পানী প্রথম কলিকাতা ময়দানে, পরে খুলনা, যশোহর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে খেলা দেখাইয়া ঢাকায় গমন করেন। এই স্থানেই কোম্পানীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কারণ—কনকবাবুর কয়েকটী কলিকাতা বাসী বন্ধু, যাঁহারা কোম্পানীতে কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা কোম্পানীটাকে ভুল পথে চালিত করেন—তাহাতেই কোম্পানীর ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হয়। সে ক্ষতির আর পূরণ করিয়া ওঠা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর কনকবাবু 'দেবল সার্কাসে' যোগদান করেন এবং বাটাভিয়ায় গমন করেন।

প্রায় দশ বার বৎসর তথায় কার্য্য করার পর কনকবাবু তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রয়াল সার্কাস

অনুমান ১৯১০'১১ সালে বাগবাজারে একটী সার্কাস পার্টি গঠিত হয়—নাম রয়াল সার্কাস। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিহর মুখার্জ্জি। উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভ্রাতৃগণ, শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখার্জ্জি (ম্যানেজার) এবং মিঃ বিধুভূষণ দে। ইঁহাদের কোন পশুশালা ছিল না। এই কোম্পানীর একটি সুশিক্ষিতা বাঙ্গালী বালিকার সিঁড়ির ক্রীড়া বড়ই চিত্তাকর্ষক ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খেলা দেখাইয়া ইঁহারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কোম্পানীটী বড় না হইলেও খুব শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি দলটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কারণ—বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। ইঁহাদের প্রতিভা ছিল, শিক্ষা ছিল, নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল,—ছিল না শুধু অর্থকরী বুদ্ধি। এই দলের কেহই ব্যবসায় বুঝিতেন না।

আগাসীর সার্কাস

'আগাসীর সার্কাসের' নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন প্রফেসর ত্র্যম্বক আগাসী—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। অনুমান ১৯০৫।৬ সালে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। সহরে কিছুদিন খেলা দেখাইবার পর বাঙ্গলার মফঃস্বলে খেলা দেখাইয়া বেড়ান ও বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইহার দলের কয়েকটী সুশিক্ষিত হস্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দলে বহু বাঙ্গালী খেলোয়াড় ছিলেন। প্রফেসর আগাসী বাঙ্গলা-দেশ হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু শেষে আর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যান নাই—অনুমান ১৯২০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর কয়েকটী বাঙ্গালী খেলোয়াড় দ্বারা কোম্পানীটি নূতনভাবে পরিচালিত হয়। ইহাঁদের মধ্যে খুলনা জেলাবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ম্যানেজার। রমেশবাবু স্বয়ং উপযুক্ত লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছুদিন কোম্পানীর খেলা শুধু কলিকাতার আশেপাশেই বদ্ধ রাখায় অর্থাভাবহেতু কোম্পানী অচল হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দূরদেশ ভ্রমণ করার সৎসাহস ইহাঁদের ছিল না।

রমণ মুখার্জ্জি

বাঙ্গলার অন্যতম গৌরব ও ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বারের খেলোয়াড় বহুবাজারের মলঙ্গা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণ মুখার্জ্জির নাম এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমণবাবুর ন্যায় খেলোয়াড় আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইনি অনুমান ১৯১২।১৩ সালে একটী পার্টি গঠন করেন। কিছুদিন ক্রীড়াপ্রদর্শনের পর দল ভাঙ্গিয়া যায়। পুনরায় তিনি ১৯২৩।২৪ সালে আর একটি দল গঠন করেন। উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য অভাবে এই দলও অচল হইয়া পড়ে। কোম্পানীসহ দূরদেশ ভ্রমণ করিতে ইঁহারও সৎসাহস ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে বহুবার ভারতের বাহিরে গমন করিয়াছেন এবং বহুদেশে ক্রীড়া-প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। পরে তিনি রিং লিং সার্কাসে যোগদান করেন। এই রিংলিং সার্কাস ময়মনসিংহের মিঃ এন, কে গুহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালী মহিলা খেলোয়াড়

বাঙলা দেশের মাটী উর্ব্বরা। এ দেশের জলহাওয়ারও একটা এমন গুণ আছে যে, এদেশে কিছুই অসম্ভব নহে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে যুগে কোন বাঙ্গালীর মেয়ের প্রকাশ্য সার্কাস রিংএ অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বঙ্গদেশ সে অভাবও পূরণ করিয়াছে। সার্কাস জগতে সে গৌরবের পাত্রী—প্রথম বাঙ্গালী মহিলা খেলোয়াড় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। ইহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙ্গালীর মেয়ে সার্কাস খেলায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করা নহে, সুশীলাসুন্দরীর কৃতিত্ব—তাহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তির ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন-ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কেহ কেহ বলেন, সুশীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে, হিংস্র ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইতে সর্ব্বপ্রথম মেয়ে খেলোয়াড়। অবশ্য মহারাষ্ট্র দেশীয় বহু মহিলা বহুদিন হইতে সার্কাস খেলায় অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন; কিন্তু বন্য ব্যাঘ্র লইয়া প্রকাশ্য সার্কাসে খেলা দেখাইয়া কেহ যশস্বিনী হইতে পারে নাই। শ্রীমতী সুশীলা কলিকাতার সোণাগাছি অঞ্চলের অধিবাসিনী। সুশীলার দুইপুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র হীরেন্দ্রনাথ নিউ বেঙ্গল সার্কাসের পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।

প্রথম বাঙ্গালী সার্কাস

আমরা এ যাবৎ বাঙলার বহু সার্কাস প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিলাম এবং বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালীর অর্থব্যয়, চেষ্টা, উদ্যম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিয়াছি। সর্ব্বপ্রথম বাঙলায় সার্কাস প্রবর্ত্তন করেন শ্রীযুক্ত নবগোপাল দত্ত। ইহার পরই উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ পালের নাম। ইনি তখনকার দিনে একজন সুদক্ষ পশু-শিক্ষক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী, জানোয়ার বশ করিতে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যশের ভাগী হইতে পারেন নাই এবং জানোয়ারের খেলা দেখাইতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী। ইহার একটী সম্প্রদায় ছিল—নাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। সে অতি বহু দিনের কথা—কোন্ সময় এই সার্কাস গঠিত হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। এই "গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস"ই এদেশের নিয়মানুগ দ্বিতীয়

বাঙ্গালী সার্কাস; নবগোপাল বাবুর সম্প্রদায় বাঙ্গলার প্রথম সার্কাস। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ পালের নিকট হইতেই মতিলাল বসু মহাশয় সম্প্রদায়টি ক্রয় করিয়া নিয়া "বোসের সার্কাস" প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্তব্য

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সার্কাস পার্টি এদেশে উদ্ভব হইয়াছে, আমরা এস্থলে সে সকলের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কিন্তু চিন্তার বিষয়, এ সকল সম্প্রদায় টিকিয়া থাকে নাই কেন? অনুসন্ধানে জানা যায় প্রথম কারণ:—বাঙ্গালীর অর্থাভাব।

দ্বিতীয় কারণ:—বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। এই দুইটী কারণ হইতেছে বাঙ্গালার বিভিন্নক্ষেত্রে বহু প্রতিষ্ঠানের পতনের মূল। বাঙ্গলার কোন ব্যবসায় অর্থাভাবে অচল হইয়া পড়িলে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কেন? কারণ বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় ব্যাঙ্ক নাই। যে জাতির ধনভাণ্ডার নামে কোন জিনিষ নাই—পশ্চাতে অর্থসাহায্যের কোন ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান নাই, তাঁহাদের ব্যবসায়ের দক্ষতা থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ অভাবে "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"-বৎ সমুদয় আকাঙ্ক্ষা চির অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবস্থা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল,

যাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে জমি বন্দোবস্তের সুযোগ লইয়াই বাঙ্গালীর সমাজ একদা জমীদারবর্গকে তাহার ভারকেন্দ্র করিয়া আপন সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিবে—তাঁহাদের স্বপ্ন আজ টুটিয়া গিয়াছে। আজ চাষী বাঙ্গালীর ভাল করিয়া অন্ন জোটে না—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী চাকুরীর উমেদারী করিয়া আপনার সমগ্র শক্তির অপচয় করিতেছে—জমীদার সম্প্রদায়ের একদল দেনার বহর বাড়াইতেছেন—অপর দল কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া নিশ্চিন্ত মনে সুদ রোজগার করিতেছেন। বাঙ্গলায় শিল্প ব্যবসা গড়িবে কে?

ইহার ফলে বাঙ্গলায় যে মূলধনের অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থানচ্যুতির তাহাই হইল দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণ বাঙ্গলার প্রথম

ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের দরুণ স্বদেশী ব্যবসা ও শিল্পোন্নতির পক্ষে বিপরীত আবহাওয়ার সৃষ্টি।

কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীর দুরদৃষ্টের শেষ কথা নয়। আবহাওয়ার পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। স্বল্প মূলধন লইয়াও ব্যবসা চলিতে পারে, ব্যবসার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। হয়ত এত বিঘ্ন সত্ত্বেও বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসা ক্ষেত্রে অল্প স্থান করিয়া লওয়া অসম্ভব হইত না। কিন্তু তাহাতেও বাদ সাধিয়াছে বাঙ্গালীর শিক্ষা। ইংরেজের সংস্পর্শ, ইংরেজী শিক্ষালাভ ও চাকুরীর প্রলোভন, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে ব্যবসা হইতে একেবারে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে বাঙ্গলার ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালী যে শোচনীয় দুর্দ্দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহা মাত্র কয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইবে।

কলিকাতা বন্দর হইতে বাঙ্গলার যে মাল রপ্তানী হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক বার্ষিক আমদানী-রপ্তানী বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; এই বিবরণীর ১৯৩০-৩১ সংখ্যায় রপ্তানীর যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা হইতে মূল্য-প্রাচুর্য্যের ক্রমিক অনুসারে কয়েকটী মাল বাছিয়া লইয়া নিম্নে একটী তালিকা সন্নিবেশিত করা হইল।

দ্রব্য—	রপ্তানী মাল সমূহের সম্পূর্ণ মূল্যের শতাংশ হিসাব
পাট নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পণ্য...	৩৯'৪৫
চা	১৮'১৪
কাঁচা পাট ...	১৫'৪৪
কাঁচা ও পাকা চাম্ড়া...	৪'১২
মোট	৭৭'১৫

স্থান-চ্যুতির পরিচয়

বাঙ্গালীর রপ্তানী ব্যবসায়ে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত মালগুলি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ কলিকাতা বন্দর হইতে যে পরিমাণ মাল রপ্তানী হয়, তাহার সম্পূর্ণ মূল্যের তিন চতুর্থাংশই আদায় হয় মাত্র এই চারিটি পণ্য হইতে। কিন্তু এই বৃহৎ ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান নাই বলিলেই চলে। কলিকাতা হইতে যাহারা পাটনির্ম্মিত মাল রপ্তানী করে তাহারা অধিকাংশ স্থলেই ইংরেজ, দু'চারজন দেশীয় বণিক যাহারা এই ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে

তাহারাও অ-বাঙ্গালী। কাঁচাপাট রপ্তানীর ব্যবসাও ইংরেজ এবং অ-বাঙ্গালীর মধ্যে অ-সমভাবে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলার আভ্যন্তরীণ পাট-ব্যবসায়ে বা সরবরাহের মধ্যেও বাঙ্গালী স্বল্পপরিসর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কলিকাতার রপ্তানীকারক ইংরেজ বা অবাঙ্গালী ফার্ম্মগুলি মফঃস্বল বন্দরগুলিতেও স্ব স্ব এজেন্ট নিয়োগ করিয়া পাট খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে। বাঙ্গালী যে কয়জন আড়ৎদার রহিয়াছে তাহারাও অনেক স্থলেই কমিশন বন্দোবস্তে কারবার চালাইতেছে, ব্যবসায়ের লাভালাভে তাহারা অংশীদার নয়। কলিকাতায় স্বাধীনভাবে যে পরিমাণ পাট বিক্রয় হইতেছে বাঙ্গলার সমগ্র পাটচাষের তুলনায় তাহা নিতান্তই তুচ্ছ। এক হাটখোলাতেই তাহদের সহিত সাক্ষাৎ মিলিবে

এই ত' গেল বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান রপ্তানীমালের হিসাব। তারপর চা'এর ব্যবসায়েও বাঙ্গালীর এমনি দুরবস্থার ছবিই চোখে পড়িবে। বাঙ্গালী 'চা' বাগান গড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত উৎপন্ন মালের বিক্রয় ব্যবস্থা করিতেছে মাত্র চারিটি ইংরেজ ফার্ম্ম। এই কয়টী ফার্ম্মের মারফতে বাঙ্গালীর চা বিক্রয় হইতেছে—আর সেজন্য কমিশন রোজগার করিয়া লইতেছে তাহারাই।

কলিকাতার চামড়া ব্যবসা চালাইতেছে কতিপয় পশ্চিমা মুসলমান। সম্প্রতি উত্তর বঙ্গের তামাক ব্যবসাও বে-হাত হইতে বসিয়াছে। রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে বর্ম্মীজ তামাক ব্যবসায়ীদের প্রতি বৎসর নিয়মিত আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

শুধু রপ্তানী ব্যবসাই নয়, আমদানী ব্যবসায়েও আজ বাঙ্গালীর হীনাবস্থাই প্রতীয়মান হইবে। বাঙ্গলায় যে সকল পণ্য আমদানী হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বস্ত্র আমদানীর মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই বস্ত্র আমদানীর ব্যাপার যে প্রায় অ-বাঙ্গালীর হাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শুধু বিদেশী বস্ত্রই নয়, এমন কি বোম্বাই আমেদাবাদ মিলেরও যে সকল বস্ত্র বাঙ্গলায় আমদানী হয়, তাহারও এজেন্সী প্রায় অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরাই পাইয়া থাকে। এক খুচরা বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ, তাহাই মাত্র আংশিক পরিমাণে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর হাতে আসিতেছে।

আমদানী মালের বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যেও বাঙ্গালী মাথা ঢুকিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালীর ব্যবসা-পদ্ধতি ও ব্যবসায়ী-বর্গের যোগাযোগের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কলিকাতায় যে সকল অবাঙ্গালী আমদানীকারক রহিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে যাহারা ধারে মাল লইতে পারে, তাহাদের পক্ষেই সহজে ব্যবসা সম্ভব হইতে পারে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর নিকট যে সকল সাক্ষী মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মফঃস্বলে এই প্রকার ধারের সুবিধা কেবল আমদানীকারকবর্গের স্বজাতীয় ব্যবসায়ীগণই লইয়া থাকে। বলাবাহুল্য বাঙ্গলার ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর হীনবাস্থার ইহাও অন্যতম কারণ।

ব্যবসায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পথ

বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে তাহার অন্তরায়গুলি অপসারিত হইতে

পারে, সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। যে যে পন্থা অবলম্বন করিলে এ বিষয়ে বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল :—

(১) **ব্যাঙ্ক-সংস্কার**—অর্থাভাব-জনিত যে অসুবিধা, তাহা দূর করিতে হইলে চাই ব্যাঙ্ক-সংস্কার। বাঙ্গলায় নিছক বাণিজ্যপোষক ব্যাঙ্ক এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। বিস্তর লোন অফিস আছে বটে, কিন্তু তাহারা বর্ত্তমানে কেবল জমি বন্ধকী কারবার চালাইতেছে বলিলেই চলে। ব্যবসার টাকা যোগাইবার জন্য ভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্ক দরকার, যে ব্যাঙ্ক রেলওয়ে, চালান রসিদ বা গুদাম রসিদের উপর টাকা ধার দিতে প্রস্তুত থাকিবে। বলা বাহুল্য, এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাঙ্ক-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে লাইসেন্স প্রাপ্ত গুদাম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এমতাবস্থায় তাহার মালের উপর ভর করিয়াই টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। ইদানীং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটী যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে এই সকল প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছে।

(২) **বিদেশী ব্যবসায়ীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন**—বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর এখন দেশ-বিদেশে মাথা ঢুঁড়িতে হইবে। বিদেশে ফ্যাক্টরীওয়ালার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া বিভিন্ন কলকব্জা ইত্যাদির ব্যবসায়ের 'এজেন্সী' সংগ্রহ করিবার চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা চালাইবার পথ এখন তাহার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

(৩) **সঙ্ঘবদ্ধতা**—এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্যই বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। একান্ত নিভৃতে বর্ত্তমান দুনিয়ার সহিত যোগাযোগ না রাখিয়া ব্যবসা করা আজকাল বাঙ্গালীর পক্ষে শুধু দুঃসাধ্যই নয়, এমন কি তাহা এখন সকলের পক্ষেই অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্যবসা বাণিজ্য আন্তর্জ্জাতিক শক্তিপ্রবাহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই শক্তিপ্রবাহ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া কোন ব্যবসায়ীই আজ নিরাপদ বোধ করিতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করিতে বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটা শক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় মাত্র একটি বণিক-সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছে—তাহার নাম 'বেঙ্গল ন্যাশ্‌নাল চেম্বার অব কমার্স'। এই বণিক-সঙ্ঘকে আশ্রয় করিয়াই আরও অনেক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাতে প্রধান এবং শাখা-সঙ্ঘ সবগুলির মধ্যেই শক্তি সঞ্চারিত হইবে। এই সঙ্ঘ সকলের মধ্য দিয়া মফঃস্বলের ব্যবসায়িগণও বিশ্ব-প্রবাহের সহিত আপনাদের যোগাযোগ সৃষ্টি করিতে পারিবে। শুধু তাই নয়, এই সঙ্ঘশক্তির মধ্য দিয়া ব্যবসায়িগণ আপনাদের অনেক সুবিধা করিয়া লইতে পারিবেন। ব্যাঙ্ক-সংস্কারের ব্যাপারেই হউক বা আর যে কোন প্রকারেই হউক শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ব্যবসায়ীর যেটুকু সুবিধা করিয়া লওয়া সম্ভব, সঙ্ঘের মধ্য দিয়াই তাহার জন্য ক্রমাগত দাবী পেশ করিতে হইবে। সম্মিলিত বাঙ্গালী ব্যবসায়িগণ আজ যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে তাহার অসুবিধা অপসারণের জন্যও শক্তিপ্রয়োগ করিতে শিখিবে।

ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গ

ডাঃ তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য।

ম্যালেরিয়ার কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। অস্থিচর্ম্ম সার প্লীহা-যকৃৎ স্ফীতোদর বাঙ্গালী আজ তাহারই কবলে দিন দিন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার প্রতি গৃহেই ম্যালেরিয়ার রাজত্ব।

কি কুক্ষণে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া আসিল। শস্যশ্যামলা বাঙ্গলার প্রতি গ্রাম আজ এই ব্যাধির দ্বারা শ্মশানে পরিণত। বিনা চিকিৎসায়, এবং বিনা পথ্যে কতলোক যে পল্লীকুটীরে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ যদি বাঙ্গলার ধনী ও শিক্ষিতের দল গ্রাম ত্যাগ না করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেন, তবে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়ার রাজত্ব কিছুতেই বাড়িত না।

বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া প্রতীকার সমিতি প্রতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আবশ্যকতা বোধ করিবার মত লোক গ্রামে খুবই কম দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক জলবায়ু যতদিন না ফিরিয়া আসিবে ততদিন বাঙ্গালীর পরিত্রাণ নাই।

ম্যালেরিয়ার সময় মশারির মধ্যে শয়ন, সুখাদ্য, সুপেয়, উন্মুক্ত বায়ু সেবন, ব্যায়াম প্রভৃতি শরীর রক্ষার নিয়ম সাধারণের জানা থাকিলেও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ভাল করার জন্য কয়জন মন দিয়া থাকেন? যে গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি আছে সেখানে গ্রাম্য স্বাস্থ্য হয়ত একটু ভাল, কিন্তু বাকীগুলির অবস্থা খুবই খারাপ নয় কি? এস্থলে গ্রাম্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের অবতারণা করিব।

১। প্রতি গৃহস্থের বাটীর চারিদিকে নিম গাছ ও তুলসী গাছ লাগাইলে বাড়ীতে ম্যালেরিয়া কম হইবে। অবস্থা ভাল হইলে ইউক্যালিপটাস্ গাছ লাগাইতে পারা যায়। অন্যান্য আবর্জ্জনা দূর করাই শ্রেয়ঃ।

২। খানা ডোবা ভর্ত্তি করিয়া ফেলা, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ম্যালেরিয়া বিষবাহী মশককুল ধ্বংস করা কতটা সম্ভব জানি না; কিন্তু সক্ষম, হইলে ম্যালেরিয়ার মশককুল ধ্বংস না হইলেও কিছু পরিমাণে কমিবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

৩। পচা জলে কেরোসিন তেল ঢালিয়া মশক নিবারণ ব্যয়-সাপেক্ষ। এস্থলে প্যারিসগ্রীণ দুই আউন্স পরিমাণ রাস্তার ধূলার সহিত মিশাইয়া ১ কাঠা পরিমাণ দূষিত জলে দেওয়া চলে; ইহা স্বল্প ব্যয়সাধ্য, বড় বড় ডাক্তারখানায় ইহা পাওয়া যায়।

৪। ম্যালেরিয়া জ্বরে ও বিজ্বরে অবস্থায় যে কুইনাইন খাইবার ব্যবস্থা আছে তাহা ফলপ্রদ, কিন্তু সময়ে সময়ে অপব্যবহারের ফলে তাহা শরীর বিষাক্ত করিয়া অন্য রোগ উৎপন্ন করিতে সক্ষম ইহা দেশের অধিকাংশ লোকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এরূপস্থলে দেশীয় ঔষধের মধ্যে যে সকল পাচন প্রভৃতি বাহির হইয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা

গ্রামের ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে উপকার সাধিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটীর উপাদানই নিমের ছাল, শিউলিপাতা নিসিন্দা, ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কট্‌কী প্রভৃতির কাথ বিশেষ। গ্রাম্য লোকের এগুলির কোনটীরই অভাব নাই। তাঁহারা অনায়াসে উপরোক্ত ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটী সিকি তোলা পরিমাণে একসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া প্রত্যহ জ্বরে ব্যবহার করিতে পারেন। বিজ্বর অবস্থায় প্রাতে ২।৪ টী করিয়া তুলসীপাতা চিবাইয়া খাইলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়। এগুলি বিশেষ পরীক্ষিত ও সুফলপ্রদ।

এই সকল দেশীয় ভেষজের পরীক্ষা আজিও হয় নাই—অথচ বাঙ্গালী কুইনাইনের প্রতীক্ষায় সাগরপারে চাহিয়া রহিয়াছে।

৫। ম্যালেরিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্বে নিসিন্দা পত্রের রস নাসিকামধ্যে নস্যের ন্যায় আকর্ষণ করিলে জ্বররোধ হয়; ইহা সুপরীক্ষিত।

পাবনার প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রমদাপ্রসন্ন বিশ্বাস মহাশয়ের আবিষ্কৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ "ওসিমাম্" তুলসীপাতা হইতে প্রস্তুত; ম্যালেরিয়ায়, এমন কি কালাজ্বরেও উপকারী। *

দরিদ্র বাঙ্গালী মাত্রের উপকারার্থে উপরোক্ত বিধান গুলি কার্য্যকরী হইবে আশা করি।

* আমরা কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে ওসিমাম ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য ফল দেখিয়াছি। হ্যারিসন রোডের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিক্রেতা L. V. Mitra কোম্পানীর দোকানে এই ঔষধ পাওয়া যায়; মূল্য মাত্র ৵১০ পয়সা ড্রাম—সম্পাদক।

টোটকা

আগুনে পোড়ায়

(১) লঙ্কার পাতা বাটিয়া পোড়া জায়গায় প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

(২) কলা ও আলু একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বেশ ফল হয়।

(৩) ইক্ষু-গুড়, রেড়ীর তৈল ও চুণের জল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও জ্বালা নিবারিত হয় ও ঘা আরোগ্য হয়।

(৪) খড়ের ঘরের পুরাতন খড় (যাহা নাড়িলে নিজেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হয়) আগুনে পোড়াইয়া, তাহাতে পাকা বেগুন পাতার চূর্ণ মিশাইয়া মধু সহ প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল দর্শে।

(৫) মসিনার তৈল ও মধু একত্র মিশাইয়া তাহাতে হরিতকীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পোড়া ঘা শুষ্ক হয়।

(৬) আগুনে পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ নদীতীরের বালু জল সহ তুলিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

সর্ব্বপ্রকার ঘায়ে

এক ছটাক আলকাতরায় /২ সের গরম জল মিশাইয়া প্রত্যহ ক্ষতস্থান ধৌত করিলে সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়।

আধকপালী মাথা ব্যথায়

গোলমরিচ ১০টা, শ্বেত চন্দন ১ তোলা, অশ্বগন্ধার শিকড় ৭৷৷০ তোলা, দারুচিনি ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগ দুগ্ধে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিতে হয়।

আমাশয়

খয়ের /০ আনা, কালজীরা ভাজার চূর্ণ ।০ তোলা, কুরচীর ছাল সিদ্ধ জল /৵০ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ দিনে ২।৩ বার সেবন করিলে পেটের ব্যথা ও আমাশয় আরোগ্য হয়।

প্রসবান্তে পেটের ব্যথায়

১ তোলা সোরা /০ ছটাক জলে ভিজাইয়া একখানি পরিষ্কার নেকড়া তাহাতে ডুবাইয়া সেই নেকড়াখানা নীচের পেটের উপর বসাইয়া দিলে নিশ্চয়ই উপকার হয়।

পেটের ব্যথায়

(২) যবক্ষার চূর্ণ ৫ রতি, সোরা ২ রতি একত্র করিয়া মধু সহ খাইতে দিলেও বেশ ফল হয়।

চুণের জল, কর্পূর ও যোয়ানের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া খাইলে বেশ ফল হয়।

বহুমূত্র

কাল জামের আঁটীর ভিতরের শাঁস ।০ তোলা, যজ্ঞডুমুরের বীজ চূর্ণ ৵০ আনা ও শোধিত অহিফেন ২ রতি একত্র মিশাইয়া কাঁচা আমলকীর রসে ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ২টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর গরম দুগ্ধ সহ খাইতে হইবে।

হৃদ্রোগে

অর্জ্জুন ছালের চূর্ণ ।০ তোলা, জটামাংসী ।০ তোলা ও বাসক ছালের চূর্ণ ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া গরম দুগ্ধ ও মধু সহ অথবা গরম দুগ্ধ ও হরিণের সিং চূর্ণ (পুট পাকে) একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

শোথে

কুলেখাড়ার ক্ষীর ॥০ তোলা, যবক্ষার /০ আনা ও পুনর্ণবার চূর্ণ ১০ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া বেলের পাতার রস গরম করিয়া তাহাতে ঐ মিশ্রিত চূর্ণ দিয়া সৈন্ধব লবণ সহ খাইবে; যদি সহ্য না হয় তবে কুলেখাড়ার ক্ষীর ।০ তোলা পরিমাণ লইতে হইবে।

ক্ষীণ শুক্রে

সিদ্ধিচূর্ণ ১, মৃগনাভি ১, বাবলার ছালের চূর্ণ ২, আরবী গঁদ ১, আলকুশী বীজ চূর্ণ ৪ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া আরবী গঁদের জলে কাবাব চিনির চূর্ণ ৵০ আনা দিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিতে হইবে। (২) চড়ুই পক্ষীর মাংস ঘৃতে ভাজিয়া খাইলেও বেশ ফল হয়।

কলার চাষ

শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত।

কলার চাষে যেরূপ লাভবান হওয়া যায় সেরূপ বোধ হয় আর কোন চাষে হওয়া যায় না। ইহাতে অপরাপর জিনিষের চাষ অপেক্ষা শ্রম লাগে কম এবং পয়সাও খরচ হয় অল্প। কৃষি-কর্ম্মে অনভিজ্ঞ লোকও এই চাষ করিলে ফল-লাভে হতাশ হইবেন না; অর্থাৎ অন্য চাষের মত এর চাষ অকালে নষ্ট হয় না বা মরিয়া যায় না।

বন্যাপ্লাবিত ভূমিতে কলাগাছ জন্মে না। পলিমাটীতেই উৎকৃষ্ট কলাগাছ জন্মে। শক্ত লাল মাটীতে কলার আবাদ হয় না; তবে প্রভূত পরিমাণে সার দিয়া জমী হাল্‌কা করতঃ জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে কলাগাছ জন্মিতে পারে। পুষ্করিণী দীর্ঘিকা প্রভৃতির চারি ধারে নূতন তোলামাটীতেও বেশ কলা হয়। কলা সাধারণতঃ দোআঁশ মাটীতে ভাল জন্মে; যে সব জমী স্বভাবতঃই আর্দ্র, সেইখানেই ইহার বেশী বিস্তার হয়। অত্যন্ত শুষ্ক ও ঠাণ্ডা দেশে কলা হয় না। যে জমি ভিজা থাকে, কিন্তু জল দাঁড়ায় না, সেই জমিই কলার চাষের উৎকৃষ্ট জমি। বেলে মাটিতে কলার চাষ হয় না।

নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ভিজা ও নোনা মাটীতে জন্মে, তবে সমুদ্র ধারের বেলে মাটিতেও নারিকেল গাছ জন্মে।

কলা গাছের তেওর সংগ্রহ করিতে হয়। ইহার রোপণ প্রথা :—

আট হাত অন্তর দুই হাত খাই,
কলা রো'ও গে চাষা ভাই;
তিনশ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক্‌গে চাষী খাটে শুয়ে।
যদি না কাট চাষী ভাই পাত,
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত। (খনা)

আমাদের দেশে ৮০ হাত দৈর্ঘ্য ও ৮০ হাত প্রস্থ পরিমিত জমীকে এক বিঘা বলে। ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া কলাগাছ রোপণ করা উচিত।

এক বিঘা জমীতে ১০টা করিয়া লাইন হইবে ১০×১০—১০০ ঝাড় হইবে। প্রতি ঝাড়ে ৩টা করিয়া গাছ রাখিলে এক বিঘা জমিতে ৩০০ কান্দি বা ছড়া কলা পাওয়া যাইবে। জমি প্রথমে ভাল করিয়া কর্ষণ করিয়া প্রতি ৮ হাত অন্তর কোদাল ও খোন্তার সাহায্যে ২ হাত গভীর করিয়া একটা গর্ত্ত করিবে। গর্ত্তে কলার চারা বা তেওর কোন কোন স্থানে বড় গাছও বসান হইয়া থাকে।

ঢাকার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জে কলার চাষ উল্লেখ-যোগ্য। তথায় জমি চাষ করিয়া ৬ হাত অন্তর চারা রোপণ করে। তাহারা একটা গাছের একটা মাত্র চারা রাখিয়া অন্য চারা উঠাইয়া অন্যত্র বসায়। বৈশাখ মাসে চারা বসাইলে পরবর্ত্তী বর্ষে ঐ গাছে কলা ধরে। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে মূল হইতে ৪।৫টা চারা উঠে। যে চারাটা ফলবান গাছের সহিত রাখিয়া দেয়, তাহার মাথা কাটিয়া মুগুর দ্বারা পিটাইয়া ওই চারা বাড়িতে দেয় না। ইহাকে খাসি করা বলে। খাসি করার ফলে ৫ ফুট উচ্চ মোটা গাছে ৩ ফুট কান্দি কলা হইতে প্রায় দেখা যায়। কলা পাকিলেই গাছ তুলিয়া অন্য ফসল বসাইতে হয়। আবার পরে ফসল কাটিয়া কলা বসান উচিত। কলার জমিতে প্রতি মাসে চাষ বা কোদাল দ্বারা জমি কোপান উচিত। কলা বাগানে আগাছা জন্মাইলে কলা ছোট হয়। কলা বাগান একই ক্ষেতে দীর্ঘদিন থাকিলে ও কলা পাকিলে ঐ গাছের মাথা তুলিয়া না ফেলিলে উত্তম জাতীয় কলাও ছোট হইয়া থাকে। এ কারণে কলাগাছের এঁটে বা মাথা কখনও বাগানে রাখিবে না।

কলাগাছের ফল, ফুল অর্থাৎ মোচা, পাতা এবং গুড়ি অর্থাৎ থোড় পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়; আবার উহার 'পেটো'গুলোও মাঝে মাঝে বাজারে বিক্রয় হয়। যাঁহারা কৃষিকর্ম্মে অল্প শ্রমে ও ব্যয়ে অধিক লাভবান হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা কলার চাষ অনায়াসে করিতে পারেন।

উই নিবারণের উপায়

মাটিতে যে উইর জন্ম হয় এবং যাহাতে গোলাপ গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে সেই উইর বিনাশ সাধন করিতে হইলে :—

(১) ।/৮ সের জলের সহিত ১ তোলা রসকর্পূর মিশাইতে হইবে। ইহা উগ্র বিষ; সুতরাং খুব সাবধানেই উহা রাখা কর্ত্তব্য। মিশ্রিত করিয়া মাটিতে যেখানে উই আছে, সেখানে দিতে হইবে মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলে ইহাতে বাগানের বা ঘরের ভিতরের উইর উৎপাত কমিয়া যাইবে।

(২) ।/১ সের জলে এক পোয়া লবণ মিশাইয়া ঐ জল অথবা তুঁতের জল কিংবা কেরোসিন তৈল জমির উপক্রুত স্থানে ঢালিয়া দিলেও উই মরিয়া যাইবে।

(৩) এক বালতি জলে এক কি দেড় চামচ সালফেট অব এমোনিয়া গুলিয়া লইবেন। মনে রাখিবেন, উহার মাত্রা যেন বেশী না হয়; মাত্রা বেশী হইলেই গাছ ধলিয়া যাইবে। গুলিয়া গোলাপ গাছে ছিটাইয়া দিলে গাছের উই এবং পোকা মারা যাইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে গাছও সতেজ হইয়া উঠিবে। ইহাতে জমির সারের কাজও হইবে।

(৪) ১ ভাগ তুঁতের জলের সহিত ৪ ভাগ বিশুদ্ধ জল মিশাইয়া পিচকারীর সাহায্যে গাছে ছিটাইয়া দিলেও উহা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(৫) ঘরের মেঝেতে উইর উৎপাত বৃদ্ধি পাইলে প্রাগুক্ত ১ নং ও ২ নং এর প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলেই উইর দৌরাত্ম্য নিবারিত হইবে। অধিকন্তু তামাক পাতা ভিজান জল, তুঁতের জল এবং চূণের জলও ব্যবহার করিতে পারেন।

(৬) টিনের ঘরের চালে বা বেড়ায় উই ধরিলে, প্রথমে কেরোসিন তৈল, পরে লবণ জল ও তুঁতের জল মাখাইয়া অবশেষে আলকাতরা লাগাইয়া দিবেন। এরূপ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই উই নষ্ট হইয়া যাইবে। বৎসরে এরূপ ২।৩ বার করিবেন। তাহা হইলে আর উই ধরার আশঙ্কা থাকিবে না।

(৭) কপাট, জানালা প্রভৃতিতে উইর উৎপাত হইলে, লবণ জল ও তুঁতের জল মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইবেন। পরিশেষে ক্রিয়োজোট তৈল দ্বারা প্রলেপ দিলে, উই ও ঘুণে ধরিবার আর কোনই আশঙ্কা থাকে না।

(৮) ঘরের খুঁটী লাগাইবার পূর্ব্বে উক্ত খুঁটীর গোড়ায় প্রথমে লবণ ও তুঁতের জল মিশাইয়া পরে আলকাতরা লাগাইয়া শুকাইবেন। ইহার পর খুঁটী লাগান কর্ত্তব্য।

দি ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিমিটেড

কেবল মাত্র প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর কাজ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে মিঃ ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহী যুবক ইউনাইটেড এসিওরেন্স লিমিটেড প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অল্পকালের মধ্যেই প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর কাজ সংগ্রহে তাঁহারা এতদূর সাফল্য লাভ করেন যে প্রভিডেণ্ট কোম্পানীকে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহারা রেগুলার ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে পরিণত করিয়াছেন এবং ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট নূতন আফিস স্থাপন করতঃ কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, এই অত্যল্পকালের মধ্যেই কোম্পানী তাহার অংশীদিগকে ১৯৩১ সনের জন্য শতকরা ১২॥০ টাকা হারে ডিভিডেণ্ট দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের সিকিউরিটী ডিপজিট দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাবীর বীমা ইস্যু করিতে সুরু করিয়াছেন। কোম্পানীর মূলধন ২০ হাজার টাকা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ লক্ষ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। বহুদর্শী এবং বিচক্ষণ বাঙ্গালী একচুয়ারী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল মহাশয় ইঁহাদের প্রিমিয়ামের হার প্রভৃতি বাঁধিয়া দিয়াছেন, এবং আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে তিনিই এখন হইতে ইউনাইটেড এসিওরেন্সের কন্‌সাল্‌টিং একচুয়ারী রূপে কাজ করিবেন। ইঁহাদের ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্‌সিওরেন্স বিভাগের প্ল্যানগুলি শুনিলাম বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ একচুয়ারী মিঃ জি, এস, ম্যারাথে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এইরূপ দুইজন বিচক্ষণ এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একচুয়ারীর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে যে সকল ইন্‌সিওরেন্স প্ল্যান পরিকল্পিত ও রচিত হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ থাকিতে পারে না।
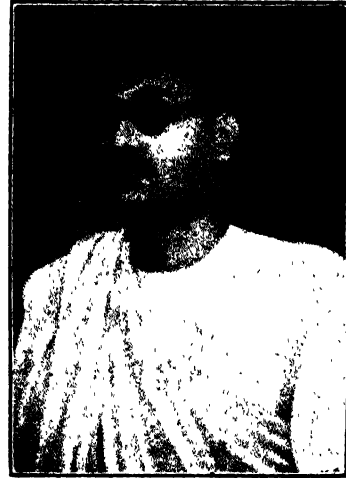
মিঃ ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী।

বীমা এবং প্রভিডেণ্ট কোম্পানী সমূহের প্রথম বৎসরে নানা কারণে এত ব্যয় বাহুল্য হয় যে লাভ ত' দূরের কথা, অনেক সময় সেণ্ট পার্ সেণ্টই খরচ হইয়া যায়। কিন্তু ইউনাইটেড এসিওরেন্স প্রথম বৎসরেই তাহার অংশীদিগকে শতকরা ১২॥০ টাকা ডিভিডেণ্ড দেওয়ায় কোম্পানীর পরিচালকবর্গের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা কোম্পানীর কর্ণধার মিঃ ইউ, এন, ব্যানার্জ্জী ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্ম্মীদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বঙ্গীয় যুবকদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

৫। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে শিল্পবিভাগে যে সকল লাভজনক কাজ খোলা আছে তাহার বিবরণ ;—

যে সকল ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে কিন্তু তাহার বেশী কিছু পড়ে নাই তাহাদের উপযোগী নিম্নলিখিত কয়েকটা কোর্স সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে :—

(১) সাব্‌-ওভারসিয়ারী এবং ওভারসিয়ারী কোর্স—

(২) আমিন এবং সার্ভে ফাইনাল ক্লাশ—

অন্যান্য যেগুলি খোলা আছে নিম্নে তাহার সম্বন্ধে বলা হইল।

(ক) শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ে বয়নের উচ্চতর কোর্সে শিক্ষা।—এই কোর্স জুলাই মাসে আরম্ভ হয় এবং তিন বৎসরের জন্য। কোন ছাত্রকে বেতন দিতে হয় না ; কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার ভর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাবধানতার জন্য (caution fee) ১০৲ দশ টাকা জমা দিতে হইবে। শিক্ষা শেষ হইলে এই টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভর্ত্তির জন্য সমস্ত দরখাস্তই জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পরই) নিম্নলিখিত বিষয়গুলিসহ শ্রীরামপুর সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের নিকট করিতে হইবে :—

(১) পিতা অথবা অভিভাবকের নাম, ঠিকানা এবং পেশা।

(২) জাতি এবং ধর্ম্ম।

(৩) দরখাস্তকারীর স্বাস্থ্য ভাল এই মর্ম্মে ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

(৪) কতদূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছে তাহা।

(৫) হেডমাষ্টার অথবা প্রিন্সিপাল প্রদত্ত নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট।

(৬) সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থিত দরখাস্তকারীর বয়সের সার্টিফিকেট।

সেসন আরম্ভ হওয়ার অতি অল্পদিন পরেই একটা বিশেষ পরীক্ষা লওয়া হয়, উহার ফল দৃষ্টে ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মাসিক ১৫৲ টাকার ৬টী বৃত্তি দেওয়া হয়। ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে ১ম বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ৫টি ও ৩য় বার্ষিক শ্রেণীতে ২য় বার্ষিক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ৪টী মাসিক ১৫৲ টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়। এইগুলির মধ্যে ১ম বার্ষিক শ্রেণীর ২টী ও ২য় ও ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ১টী করিয়া বৃত্তি মুসলমানদের জন্য রিজার্ভ থাকিবে।

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ছাত্রদের জন্য পৃথক পৃথক হোষ্টেল আছে, প্রত্যেকটী একজন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। ছাত্রদিগকে বিনা খরচায় চিকিৎসা করা হয়। হোষ্টেলের

প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে সিটের ভাড়ার দরুণ মাসে এক টাকা করিয়া লওয়া হয়। খাওয়ার বন্দোবস্ত ছাত্রেরা নিজেরাই করিয়া লয়, তাহাতে কোন মাসে ১২৲ টাকা, কোন মাসে ১৪৲ টাকার মত খরচ পড়ে।

বর্ত্তমান কাজের রীতি অনুসারে ছাত্রেরা নিজেরাই সূতা প্রদান করে এবং তাহাদের তৈয়ারী মাল তাহারাই নেয়; ইহাতে তাহাদের মাসে অন্যূন ৫৲ টাকা অতিরিক্ত আয় হয়। যদি পদ খালি থাকে তবে দুইজন ছাত্রকে তাহাদের কোর্স শেষ হইলে. মাসিক ৩০৲ টাকা ভাতায় ছাত্র-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হয়। যে সকল ছাত্র তিন বৎসরের কোর্সের শেষে পরীক্ষায় পাশ করে তাহারা "সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ের

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞাপন

পূজার সময়ে পরিষ্কার জল সরবরাহের ইস্তাহার

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আগামী দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা এবং কালীপূজা উপলক্ষে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পরিষ্কার জল সরবরাহ করা হইবে :—

৺দুর্গাপূজা :—৬ই, ৭ই, ৮ই এবং ৯ই অক্টোবর ১৯৩২।

১। হাই প্রেসার বা কলে বেশী জোর থাকিবে প্রাতে ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩॥০ হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।

২। হাই মিডিয়াম প্রেসার বা কলে মাঝারী রকমের জোর থাকিবে প্রাতে ১০টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।

৩। লো মিডিয়াম প্রেসার বা কলে কম জোর থাকিবে, মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৩॥০টা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ১১টা হইতে প্রত্যুষে ৫টা পর্য্যন্ত।

চেৎলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, দেব লেন এবং মাণিকতলাস্থিত টিউবওয়েল সমূহ প্রত্যহ প্রাতে ৫টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন ৩॥০টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করিবে। কালী লেন স্থিত টিউবওয়েল উপরোক্ত পূজার দিনগুলিতে প্রত্যুষে ৫টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করিবে।

৺লক্ষ্মীপূজা :— ৩ই অক্টোবর ১৯৩২।

১। হাই প্রেসার বা কলে বেশী জোর থাকিবে প্রাতে ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ন ৩॥০ হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।

২। হাই মিডিয়াম প্রেসার বা কলে মাঝারী গোছের জোর থাকিবে, রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।

৩। লো মিডিয়াম প্রেসার বা কলে কম জোর থাকিবে প্রাতে ১০টা হইতে অপরাহ্ন ৩॥০টা পর্য্যন্ত, পরে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ১১টা হইতে প্রত্যুষে ৫টা পর্য্যন্ত।

চেৎলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, দেব লেন এবং মাণিকতলাস্থিত টিউবওয়েল সমূহ হাই প্রেসার এবং হাই মিডিয়াম প্রেসার সময়ে জল সরবরাহ করিবে। কালী লেন স্থিত টিউবওয়েল প্রাতে ৫টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত জল দিবে।

৺কালীপূজা :—২৮শে অক্টোবর, ১৯৩২।

১। হাই প্রেসার বা কলে বেশী জোর থাকিবে প্রাতে ৫॥০টা হইতে ১০॥০টা পর্য্যন্ত, অপরাহ্ন ৩॥০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।

২। হাই মিডিয়াম প্রেসার বা কলে মাঝারী গোছের জোর থাকিবে, রাত্রি ৯টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত।

৩। লো মিডিয়াম প্রেসার বা কলে কম জোর থাকিবে প্রাতে ১০॥০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩॥০টা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত এবং ভোর রাত্রি ১টা হইতে প্রত্যূষে ৫॥০টা পর্য্যন্ত।

চেৎলা, খিদিরপুর গার্ডেনরীচ, দেব লেন এবং মাণিকতলাস্থিত টিউবওয়েল সমূহ হাই প্রেসার ও হাই মিডিয়াম প্রেসার সময়ে জল সরবরাহ করিবে। কালী লেনস্থিত টিউবওয়েল ২৪ ঘণ্টাই জল সরবরাহ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—কাশীপুরে সর্ব্বক্ষণই জল সরবরাহ চলিবে, কেবলমাত্র রাত্রিতে মিডিয়াম প্রেসারের সময় জলের জোগান কম হইবে।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৬শে সেপ্টেম্বর—১৯৩২

এস, সি, চক্রবর্ত্তী
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
ওয়াটার ওয়ার্কস।

এসোসিয়েট” এই উপাধির একখানা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়। উহাতে বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ও বঙ্গদেশের ডিরেক্টার অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীর স্বাক্ষর থাকে।

কাজ পাইবার প্রধান ক্ষেত্রগুলি নিম্নে বিবৃত করা হইল।

(১) বয়ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকুরী,

(২) বস্ত্রশিল্পের ডিমন্‌ষ্ট্রেটরের চাকুরী,

(৩) জেলে বস্ত্রশিল্প ওভারসিয়ারের চাকুরী,

(৪) বস্ত্রশিল্পের অরগানাইজারের চাকুরী,

(৫) কার্পাস শিল্প, বয়ন কারখানা এবং পাটের কলে চাকুরী,

(৬) বস্ত্র ব্যবসায়ীর দোকানে সহকারী পদে চাকুরী,

(৭) রংএর কারিগরের চাকুরী,

(৮) তাঁত নির্ম্মাতা।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও কয়েকজন পুরাতন ছাত্র তাহাদের নিজেদের কারখানা খুলিয়াছে অথবা কাপড় বিক্রয়ের, হাতে চালিত তাঁতের যন্ত্রপাতির, তাঁত প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসায় খুলিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে যাহারা মিলে চাকুরী লইয়াছে অথবা নিজেরাই ব্যবসায় খুলিয়াছে তাহারাই সবচেয়ে ভাল করিয়াছে। এই সমস্ত যুবক কি পরিমাণ পারিশ্রমিক পায় সে সম্বন্ধে আভাস দিতে হইলে ইহা বলা যায় যে, কতক পাশ করা ছাত্র এখন মাসে ৬০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা এবং তাহারও বেশী রোজগার করিতেছে। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সমালোচনা

Jessore Comb and Celluloid Works

আমরা সম্প্রতি Jessore Comb and Celluloid Works হইতে একখানি টুথ ব্রাশ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা Real White Bristles অর্থাৎ শূকরের ঘাড়ের সাদা রেঁায়া দিয়া তৈরী। আমরা বহুকাল হইতে টুথ ব্রাশ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে Smith, Kent, Swastica, Prophylactic ইত্যাদি বিখ্যাত টুথ ব্রাশ হইতে এই টুথ ব্রাশ কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

জার্ম্মাণী এবং জাপান হইতে অতি সস্তাদামে টুথ ব্রাশ আমদানী হয়। এই সকল টুথ ব্রাশ ব্যবহারে Anthrax বিষ শরীরে ঢুকিবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। তাহা ছাড়া এই সকল টুথ ব্রাশে কখনও শূকরের রেঁায়া ব্যবহার হয় না। কারণ উহা অত্যন্ত দামী এবং দুষ্প্রাপ্য। এই জন্য গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি যে কোনও জানোয়ারের রেঁায়া দিয়া এই সকল টুথ ব্রাশ নির্ম্মিত হয়। চুলগুলি আবার এমন ভাবে বাঁধা হয় যে ব্রাশের উপর একটু জোরে আঙ্গুল বুলাইলেই কিম্বা চুলগুলি ধরিয়া একটু নাড়াচাড়া করিলেই ঝুর্ ঝুর্ করিয়া চুলগুলি উঠিয়া আসিতে থাকে। যশোহরের এই টুথ ব্রাশের Bristles গুলি ধরিয়া আমরা বিস্তর টানা হ্যাঁচড়া করিয়া দেখিলাম, কিন্তু একটী রেঁায়াও উঠিয়া আসিল না। ব্রাশের গায়ে যশোহরের ফ্যাক্টরীর ছাপ না থাকিলে কাহারও বলিবার সাহস হইত না যে এই উৎকৃষ্ট A। ক্লাশের ব্রাশ কোনও দেশীয় কারখানার তৈরী।

আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে একমাত্র বোম্বাই সহরে সম্প্রতি একটী প্রথম শ্রেণীর টুথ ব্রাশ তৈরী হইতেছে। যশোহরের এই ফ্যাক্টরী ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়। ফ্যাক্টরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ দিন দিন নূতন নূতন জিনিষ তৈরী করিয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছেন এবং ইহাদের ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র যে **"Quality"** তাহা কদাচ ইঁহারা ত্যাগ করেন নাই। এই জন্যই তাঁহাদের মাল কাটাইবার জন্য এযাবৎ কোথায়ও বিজ্ঞাপন দিতে হয় না। পাইকাররা নগদ দাম দিয়াই কারখানার সব মাল আগাম কিনিয়া লয়। আমরা ইঁহাদিগের ক্রমোন্নতিতে বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

শূকরের সাদা ও কালো উভয় রকমের কুচির জন্য ইঁহারা বিশেষ উদ্গ্রীব আছেন; কারণ বাজারে ইহার জোগান অত্যন্ত কম। আমাদের

গ্রাহকগণ যদি ইঁহাদের নিকট শূকরের কুচি সরবরাহ করিতে পারেন তবে উপযুক্ত মূল্যে ইঁহারা প্রচুর পরিমাণে কিনিতে প্রস্তুত আছেন।

রবার সলিউসন

প্রাপ্তিস্থান :—

দি ইয়ং বেঙ্গল রবার সলিউসন লিমিটেড।

২২নং পার্ক লেন, কলিকাতা

ফোন ১১২৮ পার্ক

আমরা উক্ত আফিস হইতে রবার সলিউসনের একটী টিউব পাইয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে এই রবার সলিউসন জনৈক বাঙ্গালীই প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা ব্যবহার করিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম যে বিদেশাগত রবার সলিউসন হইতে ইহা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে আর বিদেশী রবার সলিউসন ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। ৪নং খিলাত বাবুর লেনে শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী বসুর নিকট এজেন্সী এবং পাইকারীর দরাদি জানিতে পারিবেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩৩৯ { ৭ম সংখ্যা

ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার উপায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যবসার জন্য কোন নূতন জায়গা লইলে, উহা এক বছরের চুক্তিতে লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রকাশ থাকা উচিত যে বাড়ীর লিজ সাত বৎসর, চৌদ্দ বৎসর কিংবা একুশ বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারিবে—চুক্তির এক বৎসর সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে। অনেক সময় লিজ্ একুশ বৎসর পর্য্যন্ত লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাত বৎসর কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে পুনরায় লীজ্ বাড়ানো উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এইরূপ সর্ত্ত কাগজ পত্রে লিখিয়া লওয়া উচিত।

সাবধানী ভাড়াটে জল এবং ড্রেণের অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ইহাও দেখিবেন, যে, কোন জায়গায় ভয়ানকভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আছে কিনা—যাহা না সারাইয়া লইলে কোন কাজই চলিবে না। বিক্রেতা কিন্তু চুক্তি-পত্রে সাধারণতঃ লিখাইয়া লন যে বাড়ী যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই হস্তান্তরিত হইবে। কাজেই নূতন লোকের বিশেষভাবে দেখিয়া লওয়া দরকার, তাহাকে যেন অনেক টাকা মেরামতের জন্য খাট্‌তি দিতে না হয়। ড্রেণ এবং ছাদও দেখিয়া লইতে হইবে, কেননা তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে জমিদার কিছুই হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন না।

ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজ সজ্জার দাম একজন অভিজ্ঞ এপ্রেইসার দ্বারা ঠিক করাইয়া লইতে হইবে। উহা ক্রীত মূল্যে তুলিয়া লওয়া আদৌ বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, কেননা মালিক

উহা সরাইয়া লইয়াও কোন কাজ করিতে পারিবেন না। দেয়ালের গাঁথনীর সঙ্গে যে-সমস্ত আসবাব লাগানো আছে এবং যাহা সহজে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর নয়—তাহা যথাসম্ভব সস্তাদামেই লইতে চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা, ভাড়াটে যখন ঘর ছাড়িয়া দিবেন,তখন উহা পুনরায় আবার জমিদারেরই সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইবে। সাধারণতঃ, ক্রীত মূল্য এবং নীলামের দামের মাঝামাঝি একটা মূল্য ধরিয়া লওয়াই ন্যায়সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমরা এই অধ্যায়ে কতকগুলি সর্ত্তের নমুনা দিতেছি। প্রথম ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে বলিয়া ভরসা করা যায়। প্রথমটি এক বৎসরের ভাড়াটের প্রতি প্রযোজ্য এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ইহাতে বন্ধনের নাগপাশ আদৌ কঠিন নহে এবং তাহার সীমান্ত সঙ্কীর্ণ বটে। যদি তিন বছরের চুক্তিতে দোকান লওয়া যায়, তাহা হইলে ভাড়াটে ব্যক্তির ইন্‌সিওরেন্স প্রভৃতি করিবার কড়ার দিতে হয়। এই ধরণের অঙ্গীকার পত্রে ভাড়াটের পক্ষ হইতে একটা সর্ত্ত লিখাইয়া লওয়া উচিৎ যে, নির্দ্দিষ্ট সময়াবসানে ভাড়াটে পূর্ব্ব ভাড়ার হারেই ঘর রাখিতে পারিবেন ; কিংবা সুবিধা হইলে লিজ্‌ আরো বেশী সময়ের জন্য বাড়াইয়া লইতে পারিবেন।

কোন ফার্ম্ম কিনিয়া লইবার সময় যে চুক্তিপত্র করা হয় তাহাতে একটা সর্ত্ত এইভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয়, যে, ভুতপূর্ব্ব মালিক কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পূর্ব্বের ব্যবসা আর আরম্ভ করিতে পারিবেন না। আরম্ভ করিলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু অর্থ নুতন ব্যবসায়ীকে দক্ষিণা দিতে হইবে। এই সমস্ত দলিলের ভাষা একটু সংযতভাবে ব্যবহার করা উচিৎ ; কেননা উহার বাঁধন শক্ত হইলে অনেক সময়ে বিক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির নিজের সহরেও রুটি সংস্থান করা দুষ্কর হইয়া উঠিতে পারে। কোর্টে আপিল করিলে অনেক সময় এই ধরণের চুক্তিপত্র কঠোরবোধে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

কোন খালি বাড়ী দখল করিয়া কিংবা কোন ফার্ম্ম কিনিয়া ব্যবসায় সুরু করিতে গেলে উহার লেন-দেন সম্পর্কিত ব্যাপার চুক্তি-পত্রের মারফৎ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাহারো কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও দেখা যায় যে, অনেক কথাই অক্ষরের আকারে কাগজে ফুটিয়া উঠিলে তাহা আবার নরম সুরে নামাইয়া লইতে হয়। যেমন মুখের অনেক মোলায়েম কথা কাগজে কলমে অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া থাকে।

স্মরণ রাখিতে হইবে, রেট এবং ট্যাক্স, ঘর এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত জিনিষ পত্রাদির উপরই ধার্য্য হইয়া থাকে—ভাড়াটের উপরে নহে। কাজেই যদি রেট প্রভৃতি দেওয়া জমিদারেরই কর্ত্তব্য হয় এবং তিনি যদি তাহা সময়মত না দেন —তাহা হইলে ভাড়াটের মালপত্রাদিই উহার জন্য দায়ী হইবে। গোড়া হইতেই ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

গৃহাদির উপর একটা ট্যাক্স দিতে হয় এবং তাহা জমিদারকেই বহন করিতে হয় ; উহার নাম "ল্যাণ্ড-লর্ডস্‌ ট্যাক্স"। নূতন ব্যবসায়ীকে দেখিতে হইবে, তিনি যেন এই সমস্ত ট্যাক্সের ব্যাপারে বকেয়া খাজনা লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হইয়া পড়েন, নতুবা তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে।

লিজ্‌ কিংবা চুক্তিপত্রের ভাষার জন্ত অনেক গণ্ডগোল হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়

নহে। অনেক সময় অঙ্গীকার পত্রে লেখা থাকে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—সাধারণতঃ দুই কিংবা তিন মাস-ভাড়া না দিলে জমিদার গৃহটি পুনরধিকার করিতে পারিবেন। অনেকে ইহার অর্থ করেন যে উপরোক্ত দুই কিংবা তিন মাস সময় ভাড়া দিবার জন্য 'গ্রেস' দেওয়া হইল। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে, উহা আদৌ ঠিক নহে। যেদিন ভাড়া দিবার তারিখ, ঠিক সেই দিনই ভাড়া চুকাইয়া দিতে হইবে। যদি ২৫শে তারিখে ভাড়া দিবার তারিখ থাকে—ঠিক ঐ তারিখেই ভাড়া মিটাইয়া দিতে হইবে। না দিলে পরের দিন সকাল বেলায়, জমিদার তাহার প্রাপ্য আদায়ের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই পথ কদাচিৎ কেহ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, উপরোক্ত সময়টুকু পুরাতন ভাড়াটেকে চলিয়া যাইবার এবং নুতন ভাড়াটেকে আসিবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। ইহাও এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, জমিদার—চুক্তিপত্রের সমর্থন ব্যতীত সূর্য্যাস্তের পরে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ভাড়া আদায়ের জন্য দোকানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, কিম্বা দোকানে জোর পূর্ব্বক প্রবেশও করিতে পারিবেন না।

ঘর ছাড়িয়া দিবার নোটিশও আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার; তবে উহার নিয়ম কানুন

খামখেয়ালীভাবে না চলিয়া ভাড়া লইবার সর্ত্তানুসারেই চলিয়া থাকে। যদি ঘর এক সপ্তাহের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়া থাকে—তাহা হইলে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে; ১ মাসের কিংবা ৩ মাসের জন্য ভাড়া লইলেও উপরোক্ত ব্যবস্থানুসারে চলিতে হইবে। যদি ২৯শে সেপ্টেম্বর কোন ঘর ভাড়া লওয়া হয় তাহা হইলে ২৫শে মার্চ্চ তারিখেই ভাড়াটেকে নোটিশ দিতে হইবে। এক বছরের জন্য ঘর ভাড়া লইলে ছয় মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিলেই চলিতে পারে; কিন্তু চুক্তি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া না দিলে অনধিকার প্রবেশের পর্য্যায়ে পড়িতে হইবে।

ভাড়াটে বাড়ী ছাড়িয়া দিলে মনে করা হইবে যে তিনি উহার সমস্ত মাল সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন; চুক্তি শেষ হওয়ার দিন কিংবা তৎকালে কোন সময়ে যদি কোন মাল ভাড়াটে না লইয়া যান, তাহা হইলে বাড়ীর মালিক উহাকে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারেন। অনেক দামী বিষয় সম্বন্ধে এরূপ করাটা যে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ধরুন, একজন ভাড়াটে একটী গ্যাস-গ্লোব ফেলিয়া গিয়াছেন—বাড়ীর মালিকও বলিতে পারেন যে তিনি উহা তাঁহার শূন্য ঘরের মধ্যেই পাইয়াছেন। কাজেই তিনি উহা লইতে পারেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কোন মালপত্র যদি অসাবধানতার জন্য ফেলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলেও কি উহা তিনি দখল করিতে পারিবেন?

বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ লিখিয়া দেওয়াই দস্তুর। ভাড়াটে কিংবা তাহার ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জমিদারের কাছে অথবা তাঁহার বাড়ীতে নোটিশ পৌছাইয়া দিবেন। চুক্তি অনুসারে যতদিন বাড়ী ভাড়াটের দখলে থাকিবার কথা; তাহার আগে নোটিশ পৌছান নেহাৎ দরকার। অনেক লিজে স্পষ্টই উল্লিখিত থাকে, ডাকঘরের সাহায্যে কিংবা অন্য কোন উপায়ে নোটিশ জমিদারের কাছে পাঠাইতে হইবে। ডাকঘরের মারফৎ পাঠাইলে "রেজেষ্টারী পোষ্ট" বলিয়া উল্লেখ করা থাকে। নীচে উক্ত নোটীশের কয়েকটী মুসাবিদা করিয়া দেওয়া হইল।

বাড়ী ছাড়িবার নোটীশ

(জমিদারের কাছে ভাড়াটের পত্র)

শ্রীযুক্ত... ... ... য়ের বরাবরেষু—

মহাশয়,

এতদ্বারা আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, আগামী... ...মাসের......তারিখে,......নং...... ষ্ট্রীটের ঘর এবং তদধিকৃত স্থানসমূহ (স্থলবিশেষে গুদাম প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হইবে) আমি ছাড়িয়া দিতেছি। আজ......সনের.....ই (তাং) ......(মাস)

... ... (স্বাক্ষর)

(জমিদার ভাড়াটের কাছে)

শ্রীযুক্ত... ... ... য়ের বরাবরেষু—

মহাশয়,

এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আপনি......নং......ষ্ট্রীটে যে বাড়ী আমার কাছ হইতে ভাড়া লইয়াছেন তাহা আগামী......মাসের ......তারিখে পরিত্যাগ করিবেন।

... ... (স্বাক্ষর)

পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে এবং পরে যাহা বলা হইবে, তাহা অংশীদার কিংবা একক ব্যবসায়ী—উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হইবে। অনেক কারণের জন্য অংশীদার লইয়া কাজ করা ভাল; আবার অনেক দিক দিয়া একাকী ব্যবসা

চালানেও বিস্তর সুবিধা আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঠিকুজী (Statistics) দৃষ্টে বোধ হয় যে খুচরা-বিক্রয়-ব্যবসাতে অংশীদার লইয়া কাজ আরম্ভ করাতে বিশেষ সুবিধা হয় না—পাইকারী কাজে লাভের আশা আছে বটে। খুচরা-বিক্রয়ের অংশীদার লইয়া যে-ব্যবসা আরম্ভ করা যায় তাহা অনুপাত-হিসাবে বেশী ফেল করে; এই হিসাবে পাইকারী বিক্রয়-ব্যবসাতে অংশীদার লওয়া ভাল, এবং তাহাতে আয়ের অনুপাত খুচরা-বিক্রয়-ব্যবসার চেয়ে বেশী না হইলেও, সমস্ত আইন-কানুন-শৃঙ্খলায় এবং আয়-ব্যয় ও ক্ষতিতে আরো বেশী রকমের সংযম পরিদৃষ্ট হইবে। এতদ্ব্যতীত, পাইকারী ব্যবসাতে অংশীদারগণ নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট কাজে স্বকীয় উদ্যম ব্যয় করিতে পারেন; কাজেই খুচরা-বিক্রয়-ব্যবসার অংশীদারগণের মত তাহাদের চেষ্টা, বিচার এবং রুচির অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে।

ব্যবসা যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই উহার ডিপার্টমেণ্টগুলি এক-একজন বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রয়োজন

হইবে। ম্যানেজার নিজের স্বার্থের দিক দিয়াও ক্রয়-বিক্রয়ের সৌকর্য্যার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন ; কেননা, তাহার চাকুরী, সম্মান প্রভৃতি সমস্তই ব্যবসার উন্নতির উপর নির্ভর করে। বড় বড় খুচরা কাজের ব্যবসায়ে স্বত্বাধিকারীকে প্রায়ই বাহিরে বাহিরে কাটাইতে হয়, এরূপ স্থলে অংশীদার লইয়া কাজ করায় যথেষ্ট সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত, একজন অংশীদার অসুস্থ হইয়া পড়িলে, অন্যজন তাহার কাজ চালাইয়া লইতে পারেন। দুইজন কিংবা বেশী অংশীদার হইলে, মূলধনও বেশী হয় ; কিন্তু আয়ের পড়্‌তা আবার সেই অনুপাতে কমিয়া যায়।

ইহা বোধ হয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই যে, অংশীদারগণ পরস্পরের খুব পরিচিত হইবেন। কাহারো সহিত হঠাৎ বন্ধুত্ব হইলে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে অংশীদার হিসাবে তাহা শুভও হইতে পারে—মন্দ হওয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অংশীদার যদি রুক্ষ মেজাজের, খামখেয়ালী, একগুঁয়ে এবং অপব্যয়ী হন—তাহা হইলে উহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইবে সন্দেহ নাই। ইহাও বলা আবশ্যক যে. একজন অংশীদার কোন কাজ করিলে তাহার দায়িত্বভার সকলকেই গ্রহণ করিতে হয় ; শেষোক্ত ব্যক্তিগণ তাহার কোন বিশেষ কাজ সমর্থন না করিলেও, যদি সে কোন কাজে—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে—হাত দিয়া থাকে, তাহার জন্য সকলকেই ফলভোগ করিতে হইবে। তখন আর পলাইবার পথ থাকে না।

ফার্ম্ম বড় হউক কিংবা ছোট হউক যদি অংশীদার লইতেই হয়, তবে তৎকালে একটী চুক্তিনামা লিখাইয়া লইয়াই অংশীদার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার বিশিষ্ট সর্ত্তগুলি একজন আইনজ্ঞ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। একজন সুচতুর এবং কর্ম্মকুশল ব্যবসায়ীর পক্ষে একটী সুন্দর ও আইনানুযায়ী সর্ত্ত-পত্র লেখা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে ; কিন্তু তবুও অংশীদার লওয়ার সময় সলিসিটারের পরামর্শানুসারে কাজ করাই সমীচীন হইবে। এইরূপ চুক্তিপত্রে সাধারণতঃ অংশীদারগণের নাম, একত্র ব্যবসায় করিবার অঙ্গীকার নামা, ফার্ম্মের নাম ও উদ্দেশ্য উল্লিখিত হইয়া থাকে। কত পুঁজি লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইবে এবং অংশীদারদের প্রত্যেকে কত টাকা ব্যবসায়ে খাটাইবেন—তাহাও চুক্তি-পত্রেই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কে হিসাব খোলা এবং তাহা হইতে কিরূপে টাকা তুলিয়া লইতে হইবে, তাহাও এই সর্ত্ত-পত্রের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যেক অংশীদার সপ্তাহে কিংবা মাসে কত টাকা তুলিতে পারিবেন, কতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অংশীদার থাকিবেন, ইত্যাদি পরিষ্কার রূপেই লিখিত হইয়া থাকে। ইহার নিষেধ-সূচক সর্ত্তগুলির মধ্যে নির্দ্দেশ করা থাকে যে. অংশীদারগণের মধ্যে কেহ অপরের সম্মতি ব্যতীত বাহিরের কোন পার্টির জন্য জামিন হইতে পারিবেন না কিংবা দালালীতে হাত দিবেন না। যদি কোন অংশীদার নির্দ্ধারিত মূলধনের বেশী পুঁজি দেন, তবে তাহার জন্য সুদ দেওয়াও এইসঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে ; কোন অংশীদার যদি দেউলিয়া হন, মারা যান কিংবা উন্মাদ হন, তাহা হইলে অংশ সম্বন্ধীয় নিয়মপত্র বাতিল হওয়া সম্বন্ধে, আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মোটামুটি নিয়মাবলীও এই সঙ্গেই রচিত হইয়া থাকে। আয় ও ক্ষতির বখ্‌রাদারী সম্বন্ধীয় হিসাব পূর্ব্ব হইতেই এই দলিলে লেখা হইয়া থাকে। এই চুক্তি-নামা সকলে স্বীকার করিয়া

লইলে, উহা সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হইবে। যদি সকলে মিলিয়া উহার কোন সর্ত্ত কিংবা অন্য কিছু অদল-বদল করিতে চাহেন, তবে কোর্টের কাছে দরখাস্ত করিয়া তবে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এরূপ করিবার যথেষ্ট বলবৎ কারণ থাকা চাই।

যদি কোন অংশীদার ব্যবসার লাভ লইবার সময় লোভ দেখাইয়া থাকেন, ক্ষতির খেসারৎ পোষাইবার সময় তাহাকে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যদি কেহ সুদ লইয়া ব্যবসায়ে টাকা ধার দিয়া থাকেন, উহা নষ্ট হইবার সময় আসলও ফিরিয়া পাইবার ভরসা থাকে না। যদি কোন বখ্‌রাদার কিংবা স্বত্বাধিকারী নামে-মাত্রও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকেন, এবং এতদ্বারা ফার্ম্মে টাকা দিতে কাহাকেও প্ররোচিত করিয়া থাকেন—তবে তাঁহাকে ব্যবসা দেউলিয়া হইয়া যাইবার সময় ঋণের জন্যও দায়ী হইতে হইবে।

অংশীদার ঠিক হইয়া গেলে, উহা সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্য কোন বিশিষ্ট গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে। একজন অংশীদার চলিয়া গেলেও আবার তেমনি বিজ্ঞাপন দিতে হইবে এবং যে সমস্ত ফার্ম্ম হইতে মালপত্রাদি ক্রয় করা হইত, তাহাদিগকে জানানও আবশ্যক হইয়া পড়িবে। সাধারণতঃ যাহারা দোকান হইতে সদাসর্ব্বদা ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়াও দস্তুর। (ক্রমশঃ)

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনীমোহনের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মোহিনী মিলের সংস্থাপনার পর হইতে এই অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যে এই মিল কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কতদূর প্রসার হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সাধারণে প্রকাশ করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। এমন কোন বাঙ্গালী নাই যিনি মোহিনীমিল অথবা তথায় উৎপন্ন বস্ত্রাদির সহিত পরিচিত নহেন। সেই পরিচয় যাহাতে আরও গভীর এবং ঘনিষ্ঠ হয় সেই উদ্দেশ্যে এই বিবরণ আমরা দেশবাসিগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশবাসীর মনে শিল্পোন্নতির প্রতি যে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল মোহিনীমিল তাহারই সুফল। এই আন্দোলনের ফলে দেশে আর্থিক উন্নতির উপায়গুলির মধ্যে এই উপায়টির দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল স্বর্গীয় মোহিনীমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রথমে তাঁহার পুত্রদ্বয়ের সহায়তায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে এই বিরাট অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ইহার ফলাফল তখন অনিশ্চিত ছিল, কারণ বস্ত্রশিল্প বাংলায় তখন অজ্ঞাত; ল্যাঙ্কাসায়ার তখন ভারতের লজ্জা নিবারণ করিত এবং তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে তখন কাপড়ের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইত। সে সময় বোম্বে ও আমেদাবাদ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বস্ত্রশিল্পে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব কম ছিল, বাংলায় একজনও ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বৃটিশ শাসনের প্রায় ২০০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে এই জাতীয় শিল্পানুষ্ঠানের বিশেষ কোন চেষ্টা না দেখা গেলেও মোহিনীমিলের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে মোহিনীবাবু ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র বোম্বে এবং আমেদাবাদে মোহিনীবাবুর পুত্রদ্বয় মিল পরিচালনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রম এবং উদ্যম যে ব্যর্থ হয় নাই, গত ২৬ বৎসর ধরিয়া দক্ষতার সহিত এই মিল পরিচালনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মিল সংস্থাপনের কল্পনা জাগিবামাত্রই অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত অনুষ্ঠানের প্রাথমিক আয়োজন গুলি সম্পন্ন করা হইয়াছিল। সাধারণে এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্য কলাপ শুদ্ধ মাত্র লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন; পরে মিলের ভাগ্যোন্নতি বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া এই মিলকে সাধারণের সম্পত্তিরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য মোহিনীবাবুকে অনুরোধ করা হয়। মিল সংস্থাপনে মোহিনীবাবু ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি এবং আত্মোন্নতি সাধনের অভিপ্রায় ছিল না। প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি এবং প্রসারই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং

জনসাধারণের প্রস্তাবে তাঁহারা সম্মত হওয়ায় এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি গত ১৯০৮ সালে যৌথ কারবারে পরিণত করা হয়।

মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই একটা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে মিলের কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছিল। একযোগে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথমে সূতা প্রস্তুতের কল স্থাপন করা হয় নাই। সেই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে সূতা আমদানী করিয়া মিলের কার্য্য চালাইতে হইত। তথাপি বিদেশ হইতে আনীত সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা যে কাজ হইত তাহাও বিদেশী বস্ত্রের সঙ্গে সম্যক্ প্রকারে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আমদানীর অসুবিধা নিবন্ধন, সময়মত সূতা সরবরাহ না হওয়ায় এবং সূতার দর অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি

চাকুরী জীবনে মোহিনী মোহন।

মোহিনী মিলের দৃশ্য।

হওয়ায় মিলের কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। তখন হইতেই কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, প্রয়োজন মত বিভিন্ন প্রকারের সূতা এই মিলে উৎপন্ন না হইলে কখনও উপযুক্ত পরিমাণ লাভ রাখিয়া অল্পমূল্যে খাঁটী স্বদেশী বস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। এই অসুবিধা নিরাকরণ করিতে হইলে মিলের সঙ্গে সূতার কল রাখা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সম্পূর্ণ আধুনিক এবং উন্নত প্রণালীর সূতার কল স্থাপনের জন্য বিশিষ্ট অভিজ্ঞদের অভিমত লইয়া তখন মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়।

আমাদের সর্ব্ববিধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান বস্তু। ইহা উৎপন্ন করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশেরই তদ্দেশবাসীর অনুপাতে কাপড়ের কল স্থাপন করা আবশ্যক। বোম্বাই এবং আমেদাবাদ এ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান এবং জন-বহুল প্রদেশ হইলেও এ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। বোম্বে এবং আমেদাবাদ হইতে বঙ্গদেশে অনেক প্রাকৃতিক ও ব্যবসা গত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত কাপড়ের কল অতি অল্পই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর এ পর্য্যন্ত বোম্বে ও আমেদাবাদে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে শতাধিক নূতন মিল স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে যে সমস্ত প্রাকৃতিক ও ব্যবসা গত সুবিধা আছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

কয়লা: - বঙ্গদেশে উৎপন্ন কয়লাই

বোম্বাই এবং আমেদাবাদের কলে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশ হইতে ঐ কয়লা বোম্বে ও আমেদাবাদে যাইতে স্থানের দূরত্বের জন্য কয়লার মাশুল বঙ্গদেশ অপেক্ষা চতুর্গুণের অধিক দিতে হয়।

বাজার:—ব্যবসা হিসাবে ইহারই গুরুত্ব সর্ব্বপ্রধান। বেরার ও মধ্য প্রদেশেই তুলার আবাদ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। বম্বে ও আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মিল এবং বাঙ্গলার মিল সমূহকে সাধারণতঃ সেখান হইতে তুলা খরিদ করিতে হয়। মধ্য প্রদেশ হইতে বম্বে, আমেদাবাদে তুলা লইয়া যাইতে হইলে যে রেল মাশুল দিতে হয় সেখান হইতে বাঙ্গলায় তুলা আনিতেও সেই খরচ পড়ে অথচ বম্বে আমেদাবাদ হইতে কাপড় কলিকাতার বাজারে পাঠাইতে স্থানের দূরত্বের জন্য প্রতি জোড়ায় তিন আনা খরচ অধিক লাগে। কিন্তু বঙ্গদেশে উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই খরচ বাংলার মিলকে বহন করিতে হয় না। বাংলার বস্ত্রবয়ন চির-প্রসিদ্ধ। এজন্য অল্প পরিশ্রমে সুদক্ষ কারিকর সহজেই সংগ্রহ করা যায়। উল্লিখিত সুবিধা এবং সুযোগ লাভের দরুণ মোহিনী মিল প্রথম হইতেই এরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বস্ত্রশিল্প একটি বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমানে জনসাধারণের যেরূপ স্বদেশী বস্ত্রের প্রতি অনুরাগ দেখা যাইতেছে তাহাতে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে বস্ত্র শিল্পের অনুষ্ঠান আরও লাভজনক হইবে। অধিকন্তু যদি এই বস্ত্রশিল্প অধিকতর পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে তাহা হইলে শত শত লোকের উপার্জ্জনেরও পথ উন্মুক্ত হইবে, এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যাইবে।

যুদ্ধের সময় বোম্বাইয়ে যেসব মিলের নিজেদের সূতার কল ছিল তাহারা শতকরা ৬০্, ৭০্, ৮০্ এমন কি ১০০্ টাকা পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছিল। মোহিনী মিল বিগত ২৪ বৎসর ধরিয়া ভারতের জন সাধারণের প্রয়োজন এবং রুচিসঙ্গত টেঁকসই ধুতি, শাড়ী ও সার্টের কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। বোম্বাই এবং আমেদাবাদ অঞ্চল হইতে বস্ত্র শিল্পোন্নতির সর্ব্বপ্রকার কূট কৌশলগুলি আয়ত্ব করিয়া আসিয়া ম্যানেজিং এজেণ্টগণ অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ে ইহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। সাধারণতঃ অন্যান্য মিলের উৎপন্ন ধুতি শাড়ীতে বুনানী এবং পাড়ের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি বিষয়ে বহু দোষ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মোহিনী মিলের ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তাঁহাদের দেশবাসীর আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকায় তাঁহাদের বস্ত্রাদি দেশবাসীর রুচি অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা ক্রয় করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে বয়ন শিল্প একটি লাভজনক ব্যবসা এবং ইহাতে টাকা খাটাইলে তাহার অংশীদারগণেরও সন্তোষজনক মুনাফা হয়। মোহিনী মিল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে যে এ দেশে এইরূপ লাভজনক স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান অসম্ভব নহে। ১৯১২ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত মোহিনী মিলের কর্ম্মোন্নতির একটি বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্য এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম।
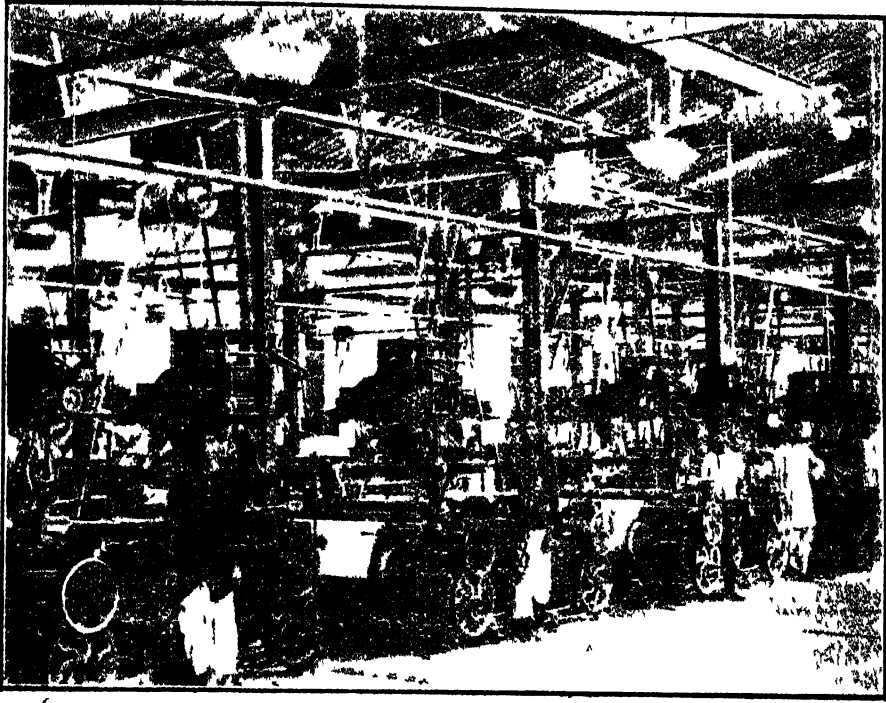
তাঁত গৃহের একাংশের দৃশ্য।

গত ১৯০৮ সালে এই মিল প্রতিষ্ঠার সময় সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের প্রিয় সুহৃদ পরলোকগত পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"১৯০৮ সালের ৩০শে জুন তারিখে আমার স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকিবে কারণ ঐদিন স্বচক্ষে বঙ্গদেশে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, বাঙ্গালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত অন্ততঃ একটি কাপড়ের কল দেখিয়া আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। ১৯০৫ সালে সমগ্র বঙ্গদেশ যখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তখন বাঙ্গালীর সেই স্বদেশ প্রাণতাব সুযোগে বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময় আমি বোম্বাই এবং আমেদাবাদ অঞ্চলের মিলওয়ালাদিগকে কাপড়ের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি না করিয়া অল্পমূল্য নির্দ্ধারণ করতঃ বাংলার বাজার হস্তগত করিয়া লইবার উপদেশ দিবার জন্য আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক বোম্বে প্রেরিত হইয়াছিলাম।

আমি প্রায় সকল মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় আমার আবেদন তাঁহারা যেরূপ তাচ্ছিল্যের

সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এই সুযোগে অধিক লাভবান হইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার কথায় কর্ণপাতই করিলেন না। অনেকে আবার এরূপ মতও প্রকাশ করিলেন যে ব্যবসাদি বিষয়ে বাঙ্গালীর কোন কথা বলার অধিকার নাই, কারণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ের কিছু বুঝে না।

বাংলায় বাঙ্গালীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত অন্ততঃ একটি মিলেরও প্রতিষ্ঠান দেখিবার আশা আমি তখন হইতেই পোষণ করিয়া আসিতে ছিলাম। সেইজন্য যখন মোহিনী মিল দেখিলাম—আমি সত্য সত্যই আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলাম এবং এইব্যবসায়ে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব দেখিয়া বিশেষ আশান্বিতও হইয়াছিলাম।

১৯১২ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত মোহিনী মিল্‌স লিমিটেডের কর্ম্মোন্নতির তুলনামূলক বিবরণ।

সন	আদায়ী মূলধন	এমারত ও কল-কব্জার মূল্য	এমারত ও কলকব্জা প্রভৃতির খাস্তা	মিলে তাঁতের সংখ্যা	বাৎসরিক উৎপন্ন বস্ত্রের জোড়া	বিক্রীত কাপড়ের মূল্য	নিট মুনাফা	শতকরা যে হারের লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে
১৯১২	১,৫০,০০০৲	১,০০,৯০০৲	২,০০০৲	৭২	৪৪,৬৭৮	৮৮,০০০৲	৮,৪০০৲	৫
১৯১৩	১,৫৮,০০০৲	১,২৬,০০০৲	২,৭০০৲	৯৪	৭৫,৪৫২	১,৫৬,০০০৲	৮,৫০০৲	৫
১৯১৪	১,৬৮,০০০৲	১,২৬,০০০৲	২,৭০০৲	১০০	৪৬,৭৭৬	৯৬,০০০৲	×	×
১৯১৫	১,৬৮,৫০০৲	১,২৬,০০০৲	২,৭০০৲	১০৭	৭০,৫৫৮	১,৫০,০০০৲	৮,৩০০৲	×
১৯১৬	১,৬৮,৫০০৲	১,৩৬,০০০৲	২,৭০০৲	১০৭	১,০১,৭৩৩	২,৪৫,০০০৲	৮,৬০০৲	৪৲
১৯১৭	১,৬৮,৮০০৲	১,৪১,০০০৲	২,৭০০৲	১০৭	৮৯,৯৫৮	৩,৬০,০০০৲	৩১,৪০০৲	৬৲
১৯১৮	১,৭৫,৪০০৲	১,৪১,০০০৲	২,৮০০৲	১০৭	৫২,৪৯৬	২,১৯,০০০৲	২৬,৪০০৲	১২
১৯১৯	৩,০০,৩০০৲	১,৮৯,০০০৲	৩,১০০৲	১০৭	৬৯,০৯৩	৩,৮৯,০০০৲	৩,৭০০৲	×
১৯২০	৫,৫৬,৮০০৲	২,৫৯,০০০৲	৪,০০০৲	১১০	৭০,৯৮৫	৪,২০,০০০৲	২৬,৭০০৲	৬।০
১৯২১	৬,৭৬,৪০০৲	৪,২০,০০০৲	৬,০০০৲	১৭৮	১,২৪,৩৭৯	৭,৫০,০০০৲	১,০০,০০৲	৭১০৲
১৯২২	৭,১৪,১০০৲	৪,৪৭,০০০৲	১৩,৫০০৲	২২৮	১,৫৯,৪২৮	৮,২৯,০০০৲	৫৯১০০৲	।।০

রিজার্ভ ও অন্যান্য ফণ্ড ... . ৯৯০০০৲ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বুঝিবার সুবিধার্থে অধিকাংশস্থলেই পূর্ণসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে।

* শারদীয় পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইবার ফলে ব্যবসায়ীগণ সচরাচর যে বস্ত্রাদি দেনায় ।াইতেন, তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হওয়ায় কাপড়ের ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে জাহাজের মসুবিধা হেতু নূতন আমদানি কমিয়া যাওয়ায় তৎকালে কোম্পানীর ভাণ্ডারে যে সূতা সঞ্চিত ছিল, তদ্বারাই মিলের ।ার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল এবং অতিরিক্ত উৎপন্ন দাম পরিহার-কার্য্যের সময় হ্রাস করিয়া দেওয়ায়, উৎপন্নের অল্পতা ।শতঃ কোম্পানীকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। বহু মাল মজুত থাকায় গৃহীত টাকার যে সুদ এবং তাহা বিক্রয়ের চেষ্টায় যে ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য এবং একটি "ফিনিশিং" মেসিনের (পালিশ যন্ত্রের) অভাবে ঐ ক্ষতির ।রিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, ১৯১৬ সালের লাভের দ্বারা এবং তৎপরবর্ত্তি সালের আয়ের কিয়দংশ ।রা ঐ ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত হইয়াছে।

† আলোচ্য বর্ষে একদিকে বাজারের অবস্থা অস্থির এবং অনিশ্চিত, অন্যদিকে আমদানী করণের অসুবিধা এবং অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু সূতার আমদানি হ্রাস, এই সমস্ত অসুবিধা হেতু তিন মাসের অধিককাল যাবৎ মিল অনেক সময়ই বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং প্রায় পাঁচ মাস যাবৎ কম সময়ই কার্য্য করাইতে হইয়াছে ; অথচ স্থায়ী সরঞ্জামী খরচা পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপেই বহন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট হইতে যে আদর্শ নিয়মিত হইয়াছিল এবং পরিমিত তুলা বিক্রয়ের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তজ্জন্য এবং এই মহাযুদ্ধের সন্ধিকালে কাপড়ের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অথচ সূতার মূল্য যুগপৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় মিলের আয় বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের সম্পূর্ণ আয় রিজার্ভ ফণ্ডে সঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সোডা বা বিলাতী ক্ষার

মাত্র ১৮।২০ বৎসর হইল এদেশে সোডার আমদানী হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে সহরে ও মফঃস্বলে ধোপারা সাজী মাটী ব্যবহার করিত। সাধারণ গৃহস্থ বাটীর মেয়েরা তেঁতুলের খোসা, কলার বাসনার ছাই, মটর কলাই প্রভৃতির খোসা ও খড়ের ছাই, তিলের খড়ের ছাই, কলসী কলসী জমাইয়া রাখিতেন এবং বার মাস প্রতি সপ্তাহে কাপড় কাচিতেন, তাহাতে মোটেই খরচ পড়িত না, অথচ নিতান্ত গরীব লোকেরা তখন বিনা ব্যয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারিতেন। তা-ছাড়া এখন সোডায় কাচা হয় বলিয়া একখানা কাপড় বড় জোর ৫।৬মাস চলে ত' বেশী, কিন্তু সাজী মাটী বা দেশীয় ক্ষারে কাপড় কাচিলে সেই কাপড় ১ বৎসর হইতে দেড় বৎসর চলিত; ফলে তখন লোকে অল্প খরচে বেশী কাপড় কাচিতে পারিত।

সোডার প্রচলনে বস্ত্র ব্যবসায়ে চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং এই আন্দোলনের সময় সোডার পরিবর্ত্তে সাজীমাটী বা দেশীয় ক্ষার ব্যবহার করিলে কাপড়ের অভাব হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না; সুতরাং বিলাতী সোডাই হউক, আর যে কোন দেশী সোডাই হউক সকলই বর্ত্তমানে বর্জ্জনীয়। সাজীমাটী বাঙ্গলার নিকটে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের মাটীতে যথেষ্ট পাওয়া যায়, মূল্যও খুব কম;. সের পয়সা মাত্র; কিন্তু যুদ্ধের সময় সোডার যে দর ছিল আজও প্রায় তাহাই রহিয়াছে। আপনারা সাজীমাটী ও দেশীয় ক্ষার ব্যবহার করুন, সোডার দাম সের দুই পয়সা হইলে তাহাতেও বিদেশী বণিক লাভ করিবে। বাসের প্রচলন না হইলে কি আজ ট্রামে মিড ডে ফেয়ার পাইতেন? সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য যে, তাহারা যেন রজককে সোডার পরিবর্ত্তে সাজীমাটী ব্যবহার করিতে অনুরোধ করেন, এবং প্রত্যেক পাড়ার মেয়েরা যেন এখন ক্ষার তৈয়ারি করিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি জমাইয়া রাখেন। কচুরী পানার ছাই হইতে ক্ষার করিলে কচুরী নাশেও সাহায্য করিবেন।

সর্টহ্যাণ্ডের ইতিহাস

[শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল]

সাঙ্কেতিক উপায়ে সংক্ষেপে ও দ্রুত লিখন প্রণালীকে ইংরাজীতে সর্টহ্যাণ্ড (Shorthand) কহে। বক্তার মুখনিঃসৃত বাক্য অবিকল লিখিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এই প্রণালীর সৃষ্টি। ইহার আরও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—Stenography, Tachygraphy, Brachygraphy ও Phonography।

গ্রীক ও রোমানদিগের সময় সাঙ্কেতিক লিখন প্রণালীর প্রচলন ছিল ও তাহারা মন্ত্রগুপ্তির জন্যও এই উপায় অবলম্বন করিত। দশ শতাব্দী হইতে যোড়শ শতাব্দীর মধ্যে এই বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাইট 'Characterie„ নামক পুস্তক প্রকাশ করেন ও ঐ পুস্তকে বাক্যের পরিবর্ত্তে সঙ্কেত ব্যবহার করেন। ১৫৯০ সালে পিটার বেল্‌স্ "Art of Brachygraphic" নামক পুস্তক বাহির করেন ও ইহাতে প্রত্যেক কথার পরিবর্ত্তে সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই দুখানি পুস্তকের দ্বারা বিশেষ কার্য্যকরী ফললাভ হয় নাই। ১৬০২ সালে জন উইলিশ "The Art of stenographic" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাহাতে অক্ষরের পরিবর্ত্তে সঙ্কেত ব্যবহৃত হয়। এই পুস্তকখানি বিশেষ কার্য্যকরী হওয়ায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছিল এবং পিটম্যানের প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা পঠিত হইত।

১৬২০ সালে স্কেলটন উপরোক্ত প্রণালীর অনুকরণে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং স্কেলটনের প্রণালী সাময়েল পেপি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১৬৪০ সালে জেরেমিয়া একটি নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন ও লবং সাহেব ইহার খুব প্রশংসা করেন। ১৬৫৩ সালে টমাস গার্নে তাঁহার "Brachygraphy" প্রণয়ন করেন। আধুনিক যুগে পিটম্যানের প্রণালীই সর্ব্বজন সমাদৃত ও বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্যার আইজ্যাক পিটম্যান ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও তিনি ইংলণ্ডের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়ক্রম কালে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "Stenographic Sound Hand" নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশ করেন ও সেই বৎসর হইতেই পিটম্যানের প্রণালী ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৪২ হইতে তিনি "Phonetic Journal" নামক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন ও তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইহা চালাইয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সর্টহ্যাণ্ডের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েন। পিটম্যানের বহু জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে Reed ও Baker লিখিত দুইখানি জীবনী-ই উৎকৃষ্ট।

পিটম্যানের প্রণালীর মূল ভিত্তিধ্বনির উপর সংস্থাপিত। ইহা বানানসঙ্কেত নহে, ইহা ধ্বনি-সঙ্কেত। পিটম্যানের প্রণালী শিক্ষায় যিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তিনি প্রতি মিনিটে ১৮০ কথা সাঙ্কেতিক উপায়ে লিখিতে পারেন। ১৯২০ সালে এক ব্যক্তি মিনিটে ৩২২টি কথা লিখিতে সমর্থ হয়েন। ১৮৩৭ সালে পিটম্যানের প্রণালী প্রবর্ত্তনের পর হইতে অন্যান্য নানারূপ প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্লোয়ান কর্ত্তৃক গৃহীত Sloyan Duployan" প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার সাঙ্কেতিক নিয়মগুলি পিটম্যানের অপেক্ষা কম।

যাঁহারা শ্লোয়ান প্রণালীর পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে এতদ্দ্বারা পিটম্যান অপেক্ষা দ্রুত লেখা যায়। এই প্রণালীতে পারদর্শী হইতে হইলে ভাষা জ্ঞান ও ভাষায় ব্যুৎপত্তি বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক, কিন্তু পিটম্যানে সেরূপ ভাষাভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। শ্লোয়ান ও পিটম্যান ব্যতীত অন্য যেসকল প্রণালী পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাদের প্রচলন খুবই কম, যথা,—বেল লিখিত "ষ্টেনোগ্রাফি" সুইট লিখিত 'কারেণ্ট সর্টহ্যাণ্ড" প্রেস লিখিত "সর্টহ্যাণ্ড", জেনস্ লিখিত "এরিস্টস সর্টহ্যাণ্ড" ও কিংসফোর্ড লিখিত "অক্সফোর্ড সর্টহ্যাণ্ড"।

কেরোসিন ও পেট্রল ব্যবসায়ী-দিগের ষড়যন্ত্র

পৃথিবীতে তেলের ব্যবসায়ে যাঁহারা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা সম্প্রতি প্যারিস নগরে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিজেদের এই গোপন সংসদের কথা তাহারা বহির্জগতের লোকচক্ষুর কৌতুহল হইতে ঢাকিয়া রাখিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন। জার্ম্মানীতে নির্ব্বাচন ব্যাপার, অটোয়া কন্‌ফারেন্স এবং যুদ্ধ ঋণ সম্পর্কীয় ব্যাপারের সমারোহ তাহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথে কতকটা অনুকূল হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে তৈলের প্রশ্ন একটী আন্তর্জাতিক সমস্যা; কেননা, রবীন্দ্রনাথ যে "বর্ব্বর সভ্যতার" কথা তাঁহার কাব্যে ও গল্পে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার শক্তির বেগ ইহা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। কেবল তেলের যোগান কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইলেই পৃথিবীর যন্ত্রকুলের রাজত্ব তৎক্ষণাৎ অপসারণ হইয়া যাইবে। কাজেই প্যারিসের এই গোপন সংসদ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, তাহা জগতের প্রত্যেক দেশের আর্থিক প্রগতিকে একটু নাড়াচাড়া দিয়া যাইবে।

এই তেল সমস্যার একটি ইতিহাসও আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীর তিনটি জাতি ইহার উৎপন্ন ব্যাপারে রেষারেষি করিয়া চলিত, যথা, আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড গ্রুপ, বৃটিশ প্রভাবান্বিত ডচ্ শেল গ্রুপ এবং রাশিয়ান গ্রুপ। বিগত বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রের পর সামর্থ্যহীন রুশিয়া তৈল জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইলে, বাকী দুইটি শক্তি তেলের ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়া পৃথিবীর সকল জাতিকে শোষণ করিতে লাগিল। রুশিয়ায় বিপ্লবের পর বলশেভিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। তাহাদের দেশে যে সমস্ত বিদেশী তেলের সম্পত্তি ছিল, তাহা নিজেদের তাঁবে লইয়া বলশেভিকেরা উহা চালাইতে সুরু করিয়া দিল।

কিছুকালের জন্য তাই ক্ষতিগ্রস্ত বৃটিশ ও আমেরিকান তৈলব্যবসায়ীরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল; কিন্তু রুষিয়ার চতুর রাজনীতিকেরা ইংরাজদিগকে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিতে লাগিল। কাজেই দেখা গেল যে, যদিও তাহারা প্রকাশ্যে অপহৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য একযোগে কাজ করিতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে উভয়েই অপরকে ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিবার জন্যই সচেষ্ট হইল। এই দুই দেশের গভর্ণমেণ্টও চুপে চুপে তাহাদের বণিকসঙ্ঘকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, রুষিয়ার বলশেভিকেরা কিন্তু বাহ্যতঃ কোন প্রকার রাজনৈতিক দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না।

ইহার পরে যেসব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা

সকলেরই জানা আছে। রয়াল ডচ্ শেল গ্রুপ "তেল চুরি" বলিয়া জগতের সম্মুখে চীৎকার সুরু করিয়া দিল এবং অনতিবিলম্বে ট্যারিফ-সংগ্রাম সুরু হইল। যেখানেই আমেরিকানরা রুষিয়ার তেলের বাজার জমাইয়া দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, সেইখানেই ইংরাজ বণিকেরা তেলের দাম সস্তা করিয়া দিল। এই বাণিজ্য-যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হইল দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, উভয় দলই ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছিল। "ভারতীয়" ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য রব তুলিল, যে, তাহাদের তেলের ব্যবসা মাটি হইতে বসিয়াছে; কাজেই একটি সংরক্ষণ-শুল্ক নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ম্মা শেলের কর্ত্তারা বুদ্ধিমানের মত পিছনে থাকিয়া দড়ি টানিতে লাগিলেন। ট্যারিফ বোর্ড কেবলমাত্র যে সংরক্ষণের দাবী উলটাইয়া দিলেন তাহা নহে, পরন্তু তৈল ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে অনেকগুলি কড়া কড়া কথা বলিলেন। অনুসন্ধানে বাহির হইল যে এই ট্যারিফ যুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল রয়াল ডচ শেল গ্রুপ, তাহারা নিজেরা সংরক্ষণের দাবী না করিলেও, তাহা বরাবর সমর্থন করিয়া চলিয়াছিল। ভারতীয় লোকদিগকে জোঁকের মত শোষণ করিবার জন্য তাহাদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত জঘন্য এবং হীনস্বার্থ প্রণোদিত।

ভারতকে এইরূপে ঠকাইতে না পারিয়া রয়াল ডচ্ শেল শীঘ্রই ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল গ্রুপের সঙ্গে সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইল, কিন্তু ইহার সর্ত্তগুলি এখন পর্য্যন্ত বাহিরের লোকে জানিতে পারে নাই;

রুষিয়া কিন্তু তাহাদের যাত্রাপথে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে। তৈল উৎপাদনের ব্যাপারে সে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম চারিমাসে রুষিয়া ৪০'৮ মিলিয়ন ব্যারেল তৈল উৎপাদন করিয়া, পৃথিবীতে আমেরিকার নীচের স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছে, আমেরিকা উৎপাদন করিয়াছে ১৯৬'৬ মিলিয়ান ব্যারেল, ভেনেজুলা ২৮'৮ মিলিয়ান ব্যারেল উৎপাদন করিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইহার পরেই রুমানিয়া এবং পারস্যের স্থান। ইহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩১ সনেও রুষিয়া আমেরিকার পরের স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

বৃটেন এবং আমেরিকার তৈল সম্রাটেরা রুষিয়ার উৎপাদন শক্তি দেখিয়া বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে। এইজন্যই তাহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিরা প্যারিসে একত্র মিলিত হইয়া রুষিয়াকে তৈল-জগতে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার জন্য একযোগে চেষ্টা করিতেছে। বলা বাহুল্য, যে এই কারণের জন্যই তাহারা তাহাদের সংসদের মূল সিদ্ধান্তগুলি বহির্জগতের সম্মুখে উদঘাটিত করিবার জন্য আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তবে অনুমিত হয় যে উৎপাদন ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা, ব্যবসার বাজার ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লওয়া এবং দামের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া তাহাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বিপদ এইখানে যে ষ্টাণ্ডার্ড রয়াল ডচ একত্রে মিলিত হইয়া তাহাদের অবাধ প্রভুত্ব স্থল সমূহে তেলের দাম আরো চড়াইয়া দিয়া, উহার আয় হইতেই রুষিয়াকে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে তাহাদের এক-চেটিয়া ব্যবসায় আছে; কাজেই দরিদ্র ও মূক ভারতবাসীদিগকে শোষণ করিয়া তাহাদের যুদ্ধের

স্পৃহা নিবৃত্তি করিবার জন্য আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। এদেশের লোকের এই ব্যাপারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধরিয়া তাহারা পেট্রোল এবং কেরোসিন তৈল বাবদ অজস্র অর্থ ঢালিয়া দিয়া বৃটিশ মূলধনকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে এবং আজ রুষিয়া যদি আমাদিগকে তৈল সস্তা দিতে চায়, আমরা কোন্ লজ্জায় বলিব যে, না,আমরা উহা চাহি না! পৃথিবীর তৈল ব্যবসায়ীরা যদি মিলিত হইয়া ভারতবাসীর ঘাড়ে আরো শাকের আঁটি চাপাইবার জন্য জিদ্ ধরে, আমাদের তাহলে রুষিয়াকে আমন্ত্রণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। তৈল সম্রাটদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে, তাহারা ভারতবাসীদিগকে যেন শত্রুতে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করেন; কেননা, দরিদ্র ভারতবাসীদের সস্তা তেলেরই প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই করাচীতে এক চালান রুষিয়ান তৈল আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহা স্থানীয় বাজারে সস্তাদরে বিক্রয় হইলেও বাংলা দেশে আজিও তাহার চালান আসে নাই। সম্প্রতি এই তৈল সম্রাটদিগের গুপ্ত সর্ত্তের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ১লা অক্টোবর হইতে পেট্রলের দাম আরও চড়িয়া গিয়াছে এবং এইতারিখ হইতে প্রতি গ্যালন পেট্রলের জন্য ১/১০ দিতে হইতেছে। ইহার প্রধান ধাক্কা খাইবে প্যাসেঞ্জার বাস এবং লরী সমূহ। একেই ট্রামের সহিত অসমপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাহারা পারিয়া উঠিতেছে না, তাহার উপর আবার পেট্রলের দাম চড়াইয়া দিলে উহাদের টেঁকাই দায় হইবে; যেরূপ শোনা যাইতেছে, তাহাতে প্রতি গ্যালন পেট্রলের দাম বাড়াইয়া উহারা ১॥০ দেড় টাকায় তুলিবে। এই জঘন্য একচেটিয়া ব্যবসার অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় রাশিয়া হইতে তেলের আমদানী করা।

বঙ্গীয় যুবকদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অধিকন্তু যাহাতে উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রগণ ছোট ছোট হাতে চালিত তাঁতের কারখানা আরম্ভ করিতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত জামিন দিলে শতকরা ৬৷৷০ টাকা সুদে দুই বৎসরে মাসিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ করার সর্ত্তে তাহাদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। কোন এক বৎসরে ৫টার অধিক ঋণ দেওয়া হয় না। প্রত্যেকটী ঋণ, যে কলকব্জা বসান হয় তাহার মূল্যের সমপরিমাণ হইতে পারে, কিন্তু কিছুতেই ৪২০৲ টাকার অধিক হইবে না। ঋণ দেওয়ার প্রথম তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের কোন কিস্তি আদায় করা হয় না।

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট।

এখানে চর্ম্মসংস্কার (ট্যানিং) ব্যবসায় চালাইবার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। চামড়া ও চামড়ার জিনিষ তৈয়ারী করার ব্যবসায় সমস্ত সভ্যদেশেই একটি প্রয়োজনীয় শিল্পের মধ্যে গণ্য এবং বহুসংখ্যক লোক ইহাতে কাজ পায়। ভারতবর্ষে চামড়ার ব্যবসায় সামাজিক কুসংস্কারের চাপে বহুদিন ক্ষতি ভোগ করিয়াছে এবং দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহা হইতে বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। এতকাল ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কাঁচা চামড়া, চামড়া এবং অপরিচ্ছন্ন ভাবে ট্যান্ করা চামড়া বিক্রয় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। এই সমস্ত কাঁচা মাল (চামড়া) দেশেই ট্যান্ করিয়া ফিনিস্ চামড়ায় পরিণত করা এবং তাহা দিয়া চামড়ার জিনিস তৈয়ারী করা উৎসাহী যুবকদিগের পক্ষে লাভজনক কাজ। আধুনিক ট্যানিং পদ্ধতি বিজ্ঞানমূলক কাজ। এই শিল্পে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণুতত্ত্ব এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জ্ঞান লাভজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়। বর্ত্তমান কালের চামড়ার ব্যবসায় কৃতকার্য্যতার সহিত পরিচালনা করিতে হইলে, সংবিবেচনা, মনের ক্ষিপ্রতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ব্যবসায় চালাইবার সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং আধুনিকভাবে চামড়া সংস্কারের (ট্যানিং) পেশা গ্রহণ করিতে কাহারও লজ্জিত হওয়ার কারণ নাই। আজকাল ইহা একটি শুভলক্ষণ যে, লোকে এই কথা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে এবং ব্যাপারটি পূর্ব্বাপেক্ষা ভালভাবে বুঝিতে পারায় এবং অনেক পরিমাণে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চাপের তাড়নায় সামাজিক নিন্দার বোঝা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে। শিক্ষিত যুবকগণ ক্রমেই এই চর্ম্মশিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং বাংলা সরকার "বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট" স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান প্রণালীতে চর্ম্ম তৈয়ার করিবার কার্য্য শিক্ষার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় এই বাঞ্ছনীয় আন্দোলন বিশেষভাবে প্রোৎসাহিত হইতেছে। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে

প্রায় দুইমাইল দূরে ক্যানাল সাউথ রোডে, বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট অবস্থিত এবং ইহাতে চামড়ার কাজ প্রদর্শন করিবার একটি সুসজ্জিত ট্যানারী (চর্ম্ম শোধনাগার) ও একটি কেমিকেল লেবরেটরী (রসায়নাগার) আছে। ইহার সংলগ্ন কোন ছাত্রাবাস (হোষ্টেল) নাই। ছাত্রদিগকে সহরে থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। সকাল ৯টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিবার সময়—মধ্যে ১২টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা জল খাবার জন্য ছুটী।

ছাত্র গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা

এক সঙ্গে ২৪টী ছাত্রের শিক্ষার স্থান আছে। বাঙ্গলার ছাত্রদিগের জন্য ১৬টী ও বিহার ও উড়িষ্যার জন্য ৮টী সিট রক্ষিত আছে।

ভর্ত্তি হইবার যোগ্যতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ অথবা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ পরীক্ষায় পাশ হওয়া সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতা রূপে ধরা হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না করিলেও যাহাদের চর্ম্ম শিল্পের সহিত সংস্রব আছে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করা হইতে পারে।

ছাত্রবেতন এবং বৃত্তি

কোনও ছাত্রবেতন আদায় করা হয় না। বাঙ্গলা সরকার ৪টী বৃত্তি প্রদান করেন। মাসিক ৩০৲ টাকার দুইটি সিনিয়ার বৃত্তি যাহাদের বি,এস্‌-সি-তে কেমিষ্ট্রী (রসায়ন শাস্ত্র) ছিল এমন সায়েন্স গ্রাজুয়েটদিগকে দেওয়া হয় এবং মাসিক ২০৲ টাকার দুইটি জুনিয়ার বৃত্তি যাহারা গ্রাজুয়েট নয় তাহাদিগকে দেওয়া হয়। বৃত্তিগুলি মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং দুই বৎসর পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্টও গ্রাজুয়েটদের জন্য একটি মাসিক ৪৫৲ টাকা ও যাহারা গ্রাজুয়েট নয় তাহাদের জন্য একটি মাসিক ৩০৲ টাকার বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য দিয়া থাকেন।

কোর্স

কোর্স দুই বৎসর ব্যাপী। প্রথম বৎসর কাজ ট্যানারিতে এবং ২য় বৎসর কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর কাজে অতিবাহিত হয়। ট্যানারিতে ছাত্রদিগকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হরেক রকম প্রধান প্রধান চামড়া অর্থাৎ জুতার আস্তর, শুকতলা, লাগামের সরঞ্জাম, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক, চামড়ার সুন্দর সুন্দর জিনিস, বেল্‌ট তৈয়ারী, গ্রন্থ-বন্ধন, লেস প্রভৃতির জন্য চামড়া তৈয়ার করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে লোমশ চামড়া প্রস্তুত করিতে, পশু লোমের ও শিকারে হত পশুদের লোমের সংস্কার করিতে, সরীসৃপ চামড়া সংস্কার করিতে (ড্রেসিং) শিখান হয়। যাহাতে ছাত্রেরা প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিখিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে কি হাতের কি কলের সকল কাজই নিজ হাতে করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হয়।

ল্যাবোরেটরীতে ছাত্রদিগকে শিল্পসংক্রান্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা জল, সাবান, তৈল এবং চর্ব্বি, শাকসব্জীর চর্ম্ম সংশোধক জিনিস, ট্যানিংএ ব্যবহৃত নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ, রং এবং চামড়া বিশ্লেষণ করা শিক্ষা করে।

ছাত্রগণ যাহাতে হাতেকলমে ট্যানিং কাজ করিতে পারে ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ রাসায়নিক হইতে পারে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই কোর্স তৈয়ারী করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

পুকুরে মাছধরা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভাজা আধার

লেবিয়ো কিংবা রোহিত মাছ শিকার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাছও সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যেগুলি এক পাউণ্ডের এক চতুর্থাংশের বেশী ওজনে হইবে না, তাহা ধৃত হইলেই বর্শী হইতে খুলিয়া লইয়া আধার রাখিবার পাত্রে এমনভাবে রাখিতে হইবে যে, মাছগুলি যেন তাজা এবং শক্তসমর্থ থাকে। বড় এবং শক্ত ছিপে শক্ত সুতো বাঁধিয়া লইয় তাহার আগের দিকে তার দিয়া মুড়াইয়া লইয়া তিনটি বর্শী ২ ইঞ্চি অন্তর গাঁথিতে হইবে। তারপরে একটি সীসার গোলক লাগাইলেই ¼ পাউণ্ডের মাছ আর নড়িতে পারিবে না। একটী ডিম্বাকৃতি ১২ বোরের বুলেট বা গুলির ভিতরে ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে বর্শীর সুতো প্রবেশ করাইয়া দুই ভাঁজ করিয়া টানিয়া লইলেই সূতাও আর সরিয়া আসিবে না, গুলিটাও ঠিক জায়গামত সংস্থিত হইয়া থাকিবে। আমি এসব ক্ষেত্রে একটী মাত্র বর্শী ব্যবহার না করিয়া তিনটি দিয়া কাজ চালাইয়া থাকি, কেননা, বোয়াল, শোল এবং চিতল প্রভৃতির মুখে এমনি তীক্ষ্ণ দাঁত আছে যে, অনেক সময় একটী মাত্র বর্শী উহাদিগকে বাগ মানাইতে পারে না। কর্ণেল পারসন আর একটী সূত্রে বুলেট গাঁথিয়া বর্শীর সূতার সঙ্গে উহা ঝুলাইয়া দিবার সুবিধা লিপিবদ্ধ করিলেও, আমার মনে হয় যে পুকুরে মাছ ধরিবার সময় ওরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। আমি বর্শীর সঙ্গে তার ব্যবহার করিয়া থাকি, কেননা বোয়াল, চিতল, শোল প্রভৃতি মাছ ধারালো দাঁত দিয়া সহজেই বর্শীর সূতা কাটিয়া ফেলিতে পারে।

এইরূপে বর্শীতে আধার গাঁথিয়া, উহা যথাসম্ভব দূরে ছুড়িয়া ফেল, কিন্তু লক্ষ্য রাখিও টোপটির যেন কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধিত না হয়। বুলেটটী জলে ডুবিয়া গেলে আলগা সূতোটুকু গুছাইয়া লইয়া ছিপটী এমনভাবে রাখো যে মাছ ধরিলেই যেন বিলের সূতো নির্ব্বিঘ্নে হুড়্‌হুড় করিয়া ছুটিয়া যাইতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় ছিপটিকে পাথর কিংবা অন্য কিছু দিয়া আটকাইয়া রাখ, নতুবা মাছের প্রথম ঝাঁকিতেই বর্শী, ছিপ্ সমস্তই মধ্যপুকুরের দিকে ছুটিতে থাকিবে। এইরূপ মাছ ধরিতে হইলে আমি ফাত্‌না ব্যবহার করা আদৌ পছন্দ করি না, কেননা, অভিজাত শ্রেণীর মৎস্য মহাশয়েরা তলদেশে থাকিতেই পছন্দ করেন। এতদ্ভিন্ন, ফাত্‌না থাকিলে নানান ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়; ইহা না থাকিলে সে-দিককার গণ্ডগোল একরূপ চুকিয়া যায়। বুলেট থাকিলে আধারটী বারে বারে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; কিন্তু কেবলমাত্র ফাত্‌না থাকিলে উহা সর্ব্বদাই তীরের দিকে যাইতে চেষ্টা

করে। কাজেই উহার দিকেই বেশী নজর দেওয়া দরকার হইয়া পড়ে, মাছের ঠোকরের দিকে লক্ষ্য দিবার অবসর আর বেশী ঘটিয়া উঠে না।

আমি কিন্তু এপ্রকার বিরাটবপু মাছ ধরা আদৌ পছন্দ করি না, তবে অন্যান্য মাছ ধরার আনুসঙ্গিক আমোদ হিসাবে ইহা শিকার করা চলিতে পারে। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এইপ্রকার মাছ ডাঙ্গায় তুলিতে হইলে উহাদের মুখব্যাদন করিবার জন্য এক প্রকার শাড়াসী থাকা দরকার। তারপরে মুখের মধ্যে বড় পাথর কিংবা কাঠ ঢুকাইয়া দিয়া বর্শী বাহির করিয়া লইতে হইবে, নতুবা মাছটী মরার মত পড়িয়া থাকিলেও উহার দাঁতের কামড়ে পরিত্রাহি চীৎকার করিতে হইবে।

লাগাইয়া লইলেই হইল। এই সঙ্গে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে তারকে সম্মুখ এবং পেছ-নের দিকে ক্রমাগত টানিলে উহার আয়ু কমিয়া আসে, কাজেই তার সাবধানের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে।

একটী তিনভাঁজ তারকে কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়া বর্শীর মাথার পাতে সহজেই আটকানো যাইতে পারে, কিন্তু উহা এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যে তারের জড়ানো অবস্থার বিপর্য্যয় না ঘটে। এই তিনভাঁজ তারের একপার্শ্বে বর্শীর চক্ষুর ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইয়া এক ইঞ্চি নীচে টানিয়া লইয়া তারপর জড়াইতে জড়া-ইতে উপরের দিকে উঠিতে হইবে। ইহার পরে আর কোনপ্রকার গেরো দিবার প্রয়োজন অনু
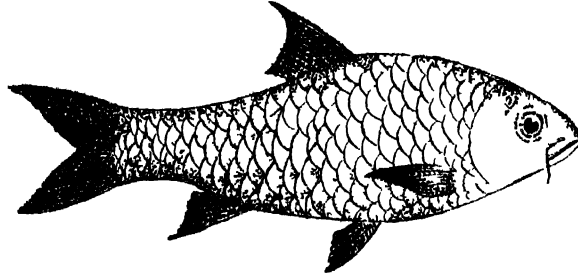
এক জাতীয় কাৎলা মাছ

ভারতের পরিষ্কার জলে আমি তারের গায়ে রেশমী সুতা জড়াইয়া লওয়া আদৌ পছন্দ করি না। কেননা উহা এত উজ্জ্বল যে বোয়াল, চিতল প্রভৃতি মাছ উহার কাছেই ঘেঁসিবে না, কাজে কাজেই আমি কেবলমাত্র তার জড়াইয়া লওয়াই উপযুক্ত মনে করি। রেশমী সুতার মত উহা সহজে পচিয়া যাইবার ভয় থাকে না। এতদ্ভিন্ন ইহা যেমনি সস্তা তেমনি আবার একটী দিয়াই সারাজীবন কাটাইয়া দেওয়া চলিতে পারে। মরিচা ধরিয়া যাইবার যখন আশঙ্কা থাকে, তখন উহাতে ভেসেলিন

ভূত হয় না, ইহার ফস্কিয়া যাইবারও কোন আশঙ্কা থাকে না। কোন কারণেও তারটী দুইভাঁজ করিয়া লইয়া তারপরে বর্শীর মাথার পাতে জড়াইও না; উহাতে তারের শক্তি কমিয়া যাইবে, দেখিতেও সুন্দর হইবে না। একটী চামড়া নির্ম্মিত পকেটে এই তার ভেসেলিন লাগাইয়া রাখিয়া দিলে ইহার নষ্ট হইবার ভয় থাকে না, পরদিন প্রভাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে রাত্রিতে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও কোনপ্রকার মরিচা ধরে নাই।

বোয়াল, চিতল, শোল প্রভৃতি মাছ সম্বন্ধে

যে কথা বলা হইল, তাহা বাগারিস সরেন্সি, সিলুন্তিকা গ্যাঙ্গেটিকা, ম্যাক্রোনস সিংঘল প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে সমস্ত পুকুরে নদীর জল অব্যাহত গতিতে আনিবার সুযোগ পায়, সেখানে ইহাদের সন্ধান মিলিবার সম্ভাবনাই বেশী।

এ অধ্যায়ে আলোচ্য না হইলেও, এই সঙ্গে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাহা মরা মাছ দিয়া মৎস্য শিকার করার কথা। ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা একটী মরা মাছ লইয়া ইল্ গর্জ বর্শীর মুখে লাগাইতে হইবে। তার জড়িত দুইটী বর্শীর গায়ে সীসা লাগাইয়া লইলেই উহাকে ইল্ গর্জ বর্শী বলে। বর্শীর মুখ আধারটীর মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইয়া লেজ পর্য্যন্ত এমনভাবে টানিয়া লও, যে সীসক খণ্ড আধারের পেটের উপর দুলিতে থাকে। তারপরে সুতো অনেক দূরের জলে নিক্ষেপ কর। ইহাতে ছিপের প্রয়োজন হয় না।

এক সপ্তাহের কার্য্যোপযোগী সাজ-সরঞ্জাম

ছিপ—বড় এবং খুব সমর্থযুক্ত হওয়া চাই, নরম কিংবা শক্ত হইলেও ক্ষতি নাই। একটী চৌদ্দ ফিট্ লম্বা দুইহাতে কাজ করিবার ছিপও বেশী শক্ত নহে। আমি স্প্যালমণ্ড ছিপ ব্যবহার করিয়া থাকি, রিঙ্গযুক্ত শক্ত বাঁশের ছিপও বেশ ব্যবহার করা চলিতে পারে।

হুইল—৩ ইঞ্চি ব্যাস, বেশী হইলেও চলে; কিন্তু কম যেন না হয়। ৩ ইঞ্চিই মানানসই।

সুতো—১২০ গজ লম্বা শক্ত সুতো প্রয়োজন।

ডুবানী সীসা—যে কোন ডুবানী দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারা যায়, কিন্তু কোনটীর ওজন যেন এক আউন্সের বেশী কম না হয়। উহার ৩টী লও।

বর্শী—৩টী ১নং লিমেরিক বর্শী লও এবং ৬টী ৫নং ট্রেবল বর্শী লও।

তার—তিনভাঁজ তারের দুই গজ লও।

সাঁড়াশী—একটী স্ক্রু এবং হ্যাণ্ডেল-যুক্ত সাঁড়াশী ব্যবহার করিতে হইবে। সমুদ্রে ব্যবহারোপযোগী বড় বর্শীর মুখাগ্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বাঁশের গায়ে লাগাইয়া লইলেও কাজ চলিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

বেঙ্গল চেম্বার্সের ব্যয় সঙ্কোচ-স্কীম

বেঙ্গল চেম্বার্স কিছুদিন আগে বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির কাছে একটী মেমোরেণ্ডাম দাখিল করিয়াছিলেন। উহাতে তাহারা টেক্‌নিক্যাল রিসার্চ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "বর্ত্তমানে টেক্‌নিক্যাল বিভাগে যে গবেষণা চলিতেছে, তাহার কার্য্যকাল আরো বাড়াইয়া দেওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। চেম্বার্স নিশ্চয়ই জানেন যে, উন্নতিকামী জিনিষ-নির্ম্মেতার কাছে (Progressive Manufacturers) টেক্‌নিক্যাল গবেষণা অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ। গবেষণার দ্বারা জিনিষের গুণের যেমন উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভবপর হয়, তেমনি আবার সাধ্যমত ব্যয়ও (Manufacturing cost) কমানো চলে; পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতার ফলে ইহার মূল্য যে কত বেশী তাহা না বলিলেও চলে। সকলেই জানেন যে স্বদেশী যুগে শত শত ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়া বহু সহস্র বেকার যুবকের অন্নসংস্থানের ভার গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু এই সমস্ত ফ্যাক্টরী যদি গবেষণাপ্রসূত আবিষ্কার প্রভৃতি লইয়া তাহাদের জিনিষের উৎকর্ষ সাধন এবং মূল্য হ্রাস করিতে না পারে, তাহা হইলে দেশের শিল্পের ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর অন্ধকার। হয়তো উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে পড়িয়া অনেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিয়াছেন; কিন্তু যদি তাহাদিগকে শক্ত আর্থিক ইমারতের উপর দাঁড় করানো না যায়, তাহা হইলে একদিন যে ইহাদের অনেকের ব্যবসাই বন্ধ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সুযোগে যদি বাংলা গভর্ণমেণ্ট টেক্‌নিক্যাল গবেষণার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, অনেক ফ্যাক্টরী নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। নতুবা বেকার সমস্যা আরো তীব্রতর হইয়া দেখা দিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলপি সোপ ওয়ার্কস্-এর কথা ধরুন—ইহারা উচ্চ শ্রেণীর টয়লেট্ সাবান প্রস্তুত করিতেছিলেন। সাবানের মত কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক করিবার পদ্ধতি না জানায় তাঁহারা সূর্য্যোত্তাপে ঐ কাজটী সমাধা করিয়া এমন খারাপ সাবান প্রস্তুত করিতেছিলেন যে তাঁহাদের ফ্যাক্টরী বাধ্য হইয়াই বন্ধ করিতে হইয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোককেও কার্য্য হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছিল। বহু গবেষণার পর ডিপার্টমেণ্ট অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিস একটী চেম্বার নির্ম্মাণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন—উহাতে দেশী সাবান নির্ম্মেতার অনেক অসুবিধা দূর হইয়াছে। কলপি সোপ ওয়ার্কস নিজেরাই একটী যন্ত্র খাড়া করিয়া উহার সাহায্যেই তাহাদের সাবানের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অন্যান্য ফ্যাক্টরীও চেম্বার নির্ম্মাণ করিয়া বিদেশীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে বলিয়া ভরসা

করিতেছে। এদিকে চামড়ার ব্যবসাও অনেক উন্নতি করিয়াছে—বিদেশী মালের সঙ্গে টক্কর দিয়া টিকিয়া থাকা এখন আর উহার পক্ষে অসম্ভব নহে; কেননা দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা-প্রসূত আবিষ্কারের ফল ফ্যাক্টরী পরিচালনায় এবং মাল প্রস্তুতের কাজে নিয়োগ করায় আশাতীত ফললাভ করা গিয়াছে। দুই লক্ষ কেস মেটাল নির্ম্মেতা এবং যাহারা আর্থিক দুর্দ্দশার জন্য ক্রমাগত এলুমিনিয়ামের জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহাদের সুবিধার জন্য এক প্রকার মিশ্রণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ্‌ কমার্স ও বঙ্গীয় ব্যয় সঙ্কোচ কমিটির কাছে একটী চিরকুট দিয়া নিজেদের অবিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন, কেন না, গভর্ণমেণ্ট জাতি-সংগঠন কর্ম্মে যে সামান্য উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহাও তাহারা বন্ধ করিতে বলেন। তাহাদের মেমোরেণ্ডামের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য বিষয় এই যে, চেম্বার ৫ জন ডিভিসন্যাল কমিশনার—যাহাদের পেছনে আমাদের গরীব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবারও রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ বহাল রাখিয়াছেন, কিন্তু যে গবেষণা কার্য্য দেশের সৌভাগ্য ফিরাইয়া আনিয়া তাহার মরণোন্মুখ শিল্পকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহার জন্য কয়েক সহস্র টাকা মঞ্জুর করিবার সৎসাহসও দেখাইতে পারেন নাই। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা এই যে সহরের ব্যবসা বাণিজ্যের ধুরন্ধর নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত অবিবেচক লোকের সমর্থন করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য যদি তাহারা দেশবাসীর ঘৃণা অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ঋণ-ভার পীড়িত ভারতের কৃষক

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি। বাঙ্গলার তথা

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

ভারতের কৃষিসম্প্রদায়ের ঋণের পরিমাণ, আঙ্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল হিসাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যাবিশেষ বা অঙ্কপাতগুলি যে একেবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ভুল – আমি এরূপ মনে করি না। বস্তুতঃ এরূপ মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এবিষয়ে একেবারে নির্ভুল

হিসাব করিতে হইলে যেরূপ বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করা আবশ্যক, ভারতবর্ষে এ যাবৎ তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ব্যাঙ্কিং কমিটী যে হিসাব দিয়াছেন তাহা বাধ্য হইয়াই কতকগুলি বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। আমি যে এই সকল হিসাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্য কেবল আপনাদিগকে চাষীদের অসহনীয় ঋণভার সম্বন্ধে একটি বাস্তব ধারণা করিয়া লইতে সহায়তা করিবার জন্য। এ-বিষয়ে আমাদের অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা থাকিলেও ইহার ভয়াবহ মূর্ত্তির সহিত আমাদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। আমার লিখিত হিসাবগুলির বিন্যাস কেবল এই বাস্তব পরিচয়ের জন্যই করা হইয়াছে।

ঋণের উৎপত্তি

এদেশের কৃষকদিগের ঋণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এই ঋণ-সমস্যার আশু কোন সমাধান না করিতে পারিলে চাষীদিগকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় থাকিবে না, কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করার আগে একবার কি কি কারণে তাহাদের ঋণের বোঝা এত ভারী হইল তাহার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটীর রিপোর্ট এবং অন্যান্য পুস্তকে এই বিষয় বিশদ আলোচনা রহিয়াছে বলিয়া আমি এই সব বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। আমি এ-সম্বন্ধে কেবল দুই একটী কথা বলিতে চাই।

পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঋণের জন্যই যে বর্ত্তমান চাষীদের ঋণের বোঝা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত দুর্ব্বহ হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু একমাত্র ইহাকেই যদি চাষীদের ঋণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা হয় তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে। কারণ এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে পূর্ব্বপুরুষকৃত ঋণের পরিমাণ খুব বেশী না থাকা সত্ত্বেও স্বকৃত ঋণের দায়ে চাষীর যথা-সর্ব্বস্বই লোপ পাইয়াছে। চাষীরা যে ঋণ করে তাহার অন্যতম কারণ এই যে, বীজবপন হইতে ফসল বিক্রয়ের টাকা পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বহু মাস, এমন কি বৎসরাবধি অপেক্ষা করিতে হয়। চাষকার্য্য পরিচালন এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থের আবশ্যক, সুতরাং ঋণ-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।

চাষীদের অমিতব্যয়িতা

অনেকের মুখেই শোনা যায় যে, চাষীরা অমিতব্যয়ী, এবং এই অমিতব্যয়িতাই তাহাদের ঋণের কারণ। চাষীরা যে সময় সময় অযথা খরচ করে এবং অনেক সময় যে তাহারা অযথা মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া টাকার অপব্যয় করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু এই বিষয়ে ১৮৭৫ সালে "ডেকান কমিশন" এবং ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী যে মন্তব্য প্রকাশ
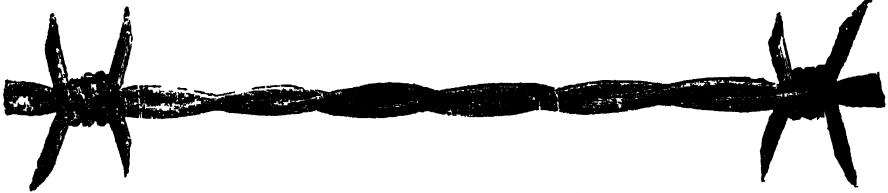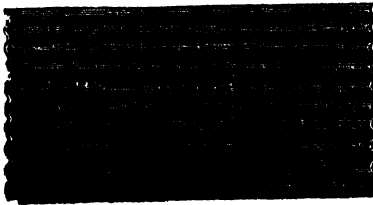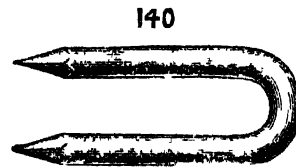
করিয়াছেন, আমার মতে তাহা অনেকাংশে সত্য। অমিতব্যয়িতার ফলে, অথবা মামলা মোকদ্দমা করিবার জন্য চাষীরা যে পরিমাণ ঋণ করে, তাহাদের মোট দেনার তুলনায় তাহা খুব বেশী নহে। দেশে বহুল পরিমাণে শিক্ষার প্রচলন হইলে এবং যত্ন সহকারে সঞ্চয় শিক্ষার জন্য প্রচার কার্য্য চালাইবার ফলে চাষীদের এই সব দোষ, অর্থাৎ অমিতব্যয়িতা, সামাজিক আড়ম্বর, মামলা মোকদ্দমার প্রবৃত্তি সবই কমাইয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেই যে চাষীরা ভবিষ্যতে আর ঋণ করিবে না, তাহা নহে, কারণ এই গুলিকে কিছুতেই তাহাদের ঋণের মুখ্য কারণ বলা যায় না—বস্তুতঃ ইহা ঋণের গৌণ কারণ মাত্র। অবশ্য তাই বলিয়া চাষীদের এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই, আমি এ কথা বলি না, বরং যাহাতে এই সকল কারণে চাষীদের ঋণের বোঝা অযথা ভারী না হয়, সে চেষ্টাও আমাদের করা উচিত। এ সম্বন্ধে আমার স্থূল বক্তব্য এই যে, চাষীরাও মানুষ, সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাহাদের এই অমিতব্যয়িতার প্রবৃত্তি কমিয়া গেলেও সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হইবে না।

বিবিধ প্রকারে সাহায্যের ব্যবস্থা

বর্ত্তমানে ঋণসমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে এই সমস্যা বিষয় সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা করিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষ-কৃত ঋণের বোঝা যথাসম্ভব কমাইয়া দিতে হইবে, বীজবপন হইতে ফসল বিক্রয়ের সময় পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের জন্য কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদের অবসর সময়ে যাহাতে কুটীর-শিল্প কিম্বা অন্য

কোনও উপায়ে তাহারা অতিরিক্ত কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে এবং চাষের উন্নতির জন্য নানারূপ প্রচেষ্টার সহায়তা করিবার জন্য যাহাতে তাহারা অল্প সুদে টাকা ধার লইতে পারে, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীরা সারা-বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার একটি পয়সাও তাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে না, থাকিতে পারেও না।

জীবনধারণের পক্ষেই তাহাদের আয় যথেষ্ট নহে, আয় বাড়াইবার মত জোত-জমিও তাহাদের যথেষ্ট নাই, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি বিধান করার পথও তাহাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়ার পক্ষে বর্ত্তমানে তাহাদের বিশেষ সুবিধা নাই। পূর্ব্বকৃত ঋণের সুদ দিয়াই তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, বস্তুতঃ অনেক সময় এই সুদের টাকাও তাহারা দিতে পারিতেছে না। কাজেই এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহার ফলে একদিকে যেমন তাহাদের আয় বাড়ে, অন্য দিকে তাহারা চাষের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল টাকাই অল্প সুদে ধার পাইতে পারে।

সুদের পরিমাণ কমাইলে কি হয়?

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের মনে এইরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে যে ঋণের উপর ধার্য্য সুদের পরিমাণ কমাইয়া দিলে দূরদর্শী চাষীরা দেনার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উৎসাহিত হইবে, এবং ফলে সুদের পরিমাণ হ্রাসই ঋণবৃদ্ধির অন্যতম কারণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপ ধারণা স্থান, কাল, পাত্র-নির্ব্বিশেষে ভ্রান্ত না হইলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবে

সম্ভব্য নহে। অন্ততঃ উচ্চহারে সুদ বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে ইহা কিছুতেই সঙ্গত যুক্তি হইতে পারে না, কারণ উচ্চ সুদের হারের মারাত্মক ফলাফল পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। নিম্নতর সুদের হারের বিপদ সম্বন্ধে আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে ইহা একেবারে অনিবার্য্য নহে। নিম্নতর হারের যে কর্জ্জ দেওয়া হইবে তাহা উৎপাদন সহায়ক কার্য্যে নিয়োজিত হয় কিনা, এবং চাষীদের নিয়মিত আয় হইতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ঋণ শোধ করিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ঋণদানের ব্যবস্থা করিলেই আশঙ্কিত বিপদ অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। ঋণদান সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহাদের নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যও এইরূপ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে।

ঋণদানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা।

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, আশা করি তাহা হইতে আপনারা ঋণের দায়ে আবদ্ধ চাষীদের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। এখন দেখা

যাক, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে চাষীদিগকে ধার দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। ৯০০ কোটী টাকার ঋণ তাহারা কোথা হইতে এবং কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছে সে বিষয়েও একটু আলোচনা করা দরকার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই ৯০০ কোটীর মধ্যে কতকাংশ প্রকৃতপক্ষে 'কৃষি-ঋণ'—অর্থাৎ অল্পকালের জন্যই হউক, বা দীর্ঘকালের জন্যই হউক, চাষীরা প্রকৃতপক্ষে চাষের উন্নতির জন্য এই টাকা ধার করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ভারত ৯০০ কোটী টাকা ঋণের মধ্যে ৩০ হইতে ৪০ কোটি টাকা চাষীরা স্বল্পকাল (short) বা অনতিদীর্ঘকাল Intermediate স্থায়ী কর্জ্জরূপে ধার করিয়াছে। উদ্বৃত্ত অন্ততঃ ৫০০ কোটি টাকা দীর্ঘকাল স্থায়ী কর্জ্জ বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে এই দুই প্রকার কর্জ্জের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮ কোটি এবং ৬২ কোটি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সমবায় ঋণদান সমিতি

এই পরিমাণ টাকার ঋণ বর্ত্তমানে মহাজন ঋণদান সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিতেছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, অনেক স্থানে সমবায় সমিতিগুলি চাষীদের অল্প সুদে টাকা ধার দিতেছে। কিন্তু এখনও এমন অনেক গ্রাম আছে যাহার ত্রিসীমানায় কোনও সমবায় সমিতি নাই, বস্তুতঃ এমন অসংখ্য চাষী আছে যাহারা কোনদিন এই সব সমিতির নামও শুনে নাই। দুই একটী তথ্য হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ৭৮ হাজার সমবায় সমিতি ছিল তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলি বাদ দিলে চাষীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতির সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার, ইহাদের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩ কোটি টাকা। বাঙ্গলা দেশে ঐ তারিখে ১৯ হাজার সমবায় সমিতি প্রায় ৫ কোটি কার্য্যকরী মূলধনের সাহায্যে চাষীদিগের চাষের উন্নতির জন্য টাকা ধার দিতেছিল। যেখানে পূর্ব্বোক্ত মোট কৃষিঋণের পরিমাণ ৩৮ কোটি টাকা এবং প্রতি বৎসরে চাষের জন্য বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটীর নির্দ্ধারণ অনুসারে অন্ততঃ পক্ষে ২৬ কোটি টাকা আবশ্যক হয়, সেখানে এই ৫ কোটিতে কি হইবে? লোকসংখ্যা হিসাব করিলেও দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলা দেশের চাষীদের অতি অল্প সংখ্যকই এ পর্য্যন্ত সমবায় সমিতির সভ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের ৬০ লক্ষ চাষী পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪॥০ লক্ষ ছাড়া আর কেহই সমবায় সমিতিগুলি হইতে সাহায্য পায় না। গড়পড়তা হিসাবে প্রতি ৫টি গ্রামে একটি করিয়া সমবায় সমিতি আছে। ইহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গলার চাষীদের পুঞ্জীভূত ঋণের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহাতে বর্ত্তমানে সমবায় সমিতিগুলি তাহার অতি সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সক্ষম।

সরকারী কৃষি ঋণ

সমবায় সমিতিগুলির সাহায্য ছাড়া চাষীদের আর একটী উপায়েও টাকা ধার করিবার সুবিধা আছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট Land Improvement Loans Act এবং Agriculturist's Loans Act নামে দুইটা আইন পাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, নিজ নিজ এলাকায় চাষীদিগকে

প্রয়োজন মত জমির উন্নতির জন্য কিংবা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদের সময় যাহাতে টাকা ধার দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই দুইটি আইন পাশ হইয়াছিল। কিন্তু এই আইনের সহায়তায় চাষীদের এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই, তাহা আপনারা জানেন। ১৯২৮-২৯ সালে বাঙ্গলা দেশের চাষীরা Agriculturist's Loans Act অনুসারে মাত্র ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা পাইয়াছিল; গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাই সব চেয়ে অধিক পরিমাণ টাকা অর্থাৎ অন্যান্য বৎসর ইহা অপেক্ষাও অনেক কম টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে দুর্ভিক্ষ বন্যা ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ইহার জন্য চাষীদের যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহার তুলনায় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকার সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।

Land Improvement Act পাশ হওয়ার জন্যও বাঙ্গলার চাষীদের কার্য্যতঃ কোন সুবিধা হয় নাই। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯২৬ সালেই বাঙ্গলা দেশে সব চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন যে, সেই বৎসরেও বাঙ্গলার চাষীরা তাহাদের জমির উন্নতি করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাত্র ৪৩ হাজার টাকা পাইয়াছে, তাহার বেশী নয়। বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী যে বলিয়াছেন,—"The Act is almost a dead letter throughout Bengal" ইহা খুবই খাঁটি কথা।

মহাজনের গ্রাস হইতে রক্ষা

গভর্ণমেণ্ট আর একটি উপায়ে চাষীদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে Usurious Loan act নামে একটি বিশেষ আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সুদখোর মহাজনেরা অপরিমিত সুদ আদায় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা; কিন্তু যাঁহারা এই বিষয়ে সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, এই আইনের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সফল হয় নাই। মহাজনেরা অনেক স্থলে পূর্ব্বের ন্যায়ই বিলক্ষণ উচ্চ হারে নিঃসহায় চাষীদিগকে টাকা ধার দিতেছে। গভর্ণমেণ্ট উক্ত আইন পাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রয়োগ না হইবার দরুণ চাষীদের বিশেষ কোন সুবিধা হইতেছে না।

প্রথমতঃ সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, ব্যাপকভাবে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বিষয়ে চাষীদের দুরবস্থা দূর করা যাইবে। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। অগণিত চাষী তাহাদের চাষের কাজের জন্য, দৈনন্দিন কাজের জন্য, এবং দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দুর্ব্বিপাক হইতে বাঁচিবার জন্য প্রধানতঃ মহাজনদের নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং চড়া হারে সুদ আদায় করিলেও এই মহাজনগণ তাহাদিগকে টাকা ধার দিয়া সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু যখন দেনা শোধ করিবার সময় উপস্থিত হয়, কিংবা যখন সুদ দিবার তাগিদ আসে, তখন চাষীরা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

ভারতীয় চাষীদের ঋণসংগ্রহের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সমবায় সমিতিগুলি সংখ্যায় অল্প এবং উহাদের যথেষ্ট টাকাও নাই; মহাজনেরা ঋণের টাকা যোগাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহার পর অত্যধিক হারে সুদ আদায় করিতেছেন, তাহা হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদারের পক্ষে পরিশোধ করা সাধ্যাতীত। দেনা শোধ করিবার জন্য ইহাদের নিকট কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার সুবিধা চাষীরা পাইতেছে না।

বিদেশে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা

ভারতীয় কৃষকের ঋণ-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিবে যে, অন্য দেশে কি কখনও এইরূপ অবস্থার উদয় হয় নাই; হইয়া থাকিলে তাহারা সেজন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছে? অন্য কোন দেশ এ-সম্বন্ধে এমন কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি, যাহা আমাদের কাজে লাগিতে পারে? এই সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে কৃষি ঋণ সমস্যা যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অন্য দেশ হইতে তাহার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এইসব দেশে আমাদের দেশের মত চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ স্তূপীকৃত হইয়া তাহাদের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলে নাই। চাষের উন্নতিকল্পে অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য চাষীরা যাহাতে সহজে এবং অল্প সুদে টাকা ধার পায়, প্রায় সকল উন্নত দেশেই এখন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা এই বিষয়ে তাহাদের নিকট হইতে অনেক প্রেরণা পাইতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীর পূর্ব্বকৃত ঋণ, যাহা ক্রমাগত জমা হইয়া বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য অন্য কোন দেশের দৃষ্টান্ত হইতে কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তবে

এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল হইবে না যে, কৃষক সম্প্রদায়ের আকস্মিক সঙ্কট নিবারণের জন্ম উন্নত দেশের গবর্ণমেণ্ট মাত্রই কার্য্যতৎপর হইয়া থাকেন।

চীন দেশের অবস্থা

প্রথমেই অনেকাংশে ভারতবর্ষের তুল্য দেশ চীন দেশের কথাই ধরা যাক। সেখানে শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষিজীবী,—আমাদের দেশ হইতেও অনেক বেশী। সেখানেও চাষীরা আমাদের দেশের চাষীদের মতই ঋণের জ্বালায় অহর্নিশি অস্থির হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেখানে এ পর্য্যন্ত এ সমস্যা সমাধানের কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই। এক হিসাবে বলা যায় যে, সেখানকার চাষীদের ভাগ্য আমাদের দেশের চাষীদের ভাগ্য অপেক্ষাও হীন; সেখানে জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কই বলুন, আর সমবায় ঋণদান সমিতিই বলুন, সবই আমাদের দেশ অপেক্ষাও কম প্রসার লাভ করিয়াছে। কাজেই এই দেশের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বিশেষ কিছু উৎসাহ বা প্রেরণা পাইতে পারি না।

ইউরোপ ও আমেরিকা

তারপর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলির কথা ধরুন; সেখানে একেবারে বিপরীত অবস্থা। "চাষীর ঋণ" বলিয়া তাহাদের কোনও এক বিশেষ সমস্যা নাই বলিলেই চলে। চাষের উন্নতির জন্ম অবশ্য সব দেশে একই রকম ঋণদানের ব্যবস্থা নাই, এবং এই উদ্দেশ্যে সব দেশেই যে চাষীরা প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ রকম ধার করিতে পারে তাহা নহে। কিন্তু সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে চাষীদের এই সব অসুবিধা দূর হইয়া যায়। কিন্তু প্রায় কোনও দেশেই চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ কিছুই নাই, কিম্বা থাকিলেও তাহা এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মত স্তূপীকৃত হয় নাই, এবং এই কারণে ইহার সমস্যাও এখন পর্য্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে নাই। কাজেই এই সব দেশে এ পর্য্যন্ত এমন কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই, যাহাকে আদর্শ মানিয়া আমরা নূতন কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে গ্রহণ করিতে পারি।

অষ্ট্রেলিয়া

ইদানীং অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রে এই সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে; আমাদের দেশে তাহার অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে কিনা, তাহা আলোচনা করিবার

পূর্ব্বে একবার এই ব্যবস্থাগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে গত বৎসর আগষ্ট মাসে Mortgagees' rights Restriction Act নামে একটী বিশেষ আইন পাশ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য বন্ধকী দেনার পাওনাদারগণ যাহাতে অযথা দেনদারগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। এই আইনের দ্বারা সর্ব্বোচ্চ আদালতের হুকুম ছাড়া পাওনাদারগণের পক্ষে দোকানদারগণের নিকট বন্ধকী দেনার টাকার দাবী করা কিম্বা দেনার টাকা আদায়ের জন্য কোনওরূপ চেষ্টা করা, ডিক্রীজারী করা, কিম্বা, বন্ধকী সম্পত্তি নীলামে ডাকিয়া কিনিয়া লওয়া ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সর্ব্বোচ্চ আদালত যাহাতে যথেচ্ছভাবে কোন রায় না দেন এবং তাঁহারা যাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন সে জন্য তাঁহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ অনুশাসন ব্যবস্থা আছে। কোনও পাওনাদার দেনদারের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করিবার জন্য আদালতের নিকট হুকুম প্রার্থনা করিলে আদালত কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য থাকেন, যথা:—(১) বন্ধকী সম্পত্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা (২) দেনাদার তাঁহার নিজস্ব টাকা হইতে কিম্বা অন্য কোথাও হইতে অল্প সুদে টাকা ধার করিয়া ঋণশোধ করিতে পারে কিনা (৩) পাওনাদারকে প্রার্থিত অনুমতি না দিলে তাঁহার শীঘ্র কোন বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা (৪) অনুমতি দিলে দেনাদারকে অতিরিক্ত কোনও চাপ দেওয়া হইবে কিনা (৫) বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতির জন্য দেনাদারের পক্ষে পাওনাদারের টাকা মিটাইয়া দেওয়া খুবই কষ্টদায়ক হইয়া পড়িয়াছে কিনা ইত্যাদি।

যদি আদালত এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, পাওনাদারকে প্রার্থিত অনুমতি দিলে দেনাদারের পক্ষে কোনও বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা এইরূপ অনুমতি দিবেন না, এবং যখন তাঁহারা এইরূপ অনুমতি দিবেন, তখনও তাঁহারা অবস্থা বিশেষে এমন কতকগুলি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন যাহার ফলে দেনাদারগণের প্রতি কোনওরূপ অবিচার হওয়ার আশঙ্কা না থাকে—উক্ত আইনে এইরূপ বিধি নির্দ্দেশও আছে।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রদেশেও দেনাদারদিগের দায়িত্ব লাঘব করিবার উদ্দেশ্য গত বৎসর কয়েকটা আইন পাশ করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ট্যাসমানিয়ার নাম করিতে পারি, সেখানেও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার Mortgagee's Rights Resriction Act এর অনুরূপ একটী আইন পাশ করা হইয়াছে, উপরন্তু কোনও বন্ধকী দেনার সুদ যাহাতে পাউণ্ড প্রতি ১৷৷ শিঃ এর বেশী না হয় সেই জন্য ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। নিউ সাউথ ওয়েলসে গত অক্টোবর মাসে Moratorium Act এবং Interest restriction Act নামে দুইটী আইন পাশ করা হইয়াছে, প্রথম আইনের ব্যবস্থায় চাষীদের অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত মহাজনেরা আদালতের বিশেষ হুকুম ছাড়া তাহাদের নিকট দেনা বাবদ আসল কিম্বা সুদ কিছুই দাবী করিতে পারিবে না। অবশ্য আদালতও যাহাতে এই সম্বন্ধে রায় দেওয়ার পূর্ব্বে চাষীরা বাস্তবিকই দেনার কিস্তী দিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে কিনা, এবং তাহাদিগকে এই ভাবে সুবিধা দেওয়ার

ফলে বন্ধকী জমির বাজার দর অদূর ভবিষ্যতে কমিয়া গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মহাজনদের ক্ষতি হইতে পারে কিনা, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেন— এই আইনে এইরূপ নির্দ্দেশও আছে। দ্বিতীয় আইনের উদ্দেশ্য সকল প্রকার দেনার সুদের হার কমাইয়া দেওয়া। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখানে গত ডিসেম্বর মাসে mortgagers' relief act নামে একটী আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে আগামী দুই বৎসরের মধ্যে দেনাদারগণের উপর যাহাতে ঋণ পরিশোধের চাপ না দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—ক্রমশঃ

ভাল পেইন্ট

বিভিন্ন প্রকারের রং-এর জন্য গিরিমাটির রং বদলাইয়া লইবে। ওয়াটার লাইম ১ পেক, নূতন শ্লেক্‌ড্ লাইম ১ পেক, হলদে গিরিমাটি ৪ পাউণ্ড, পোড়া umber ৪ পাউণ্ড। এইগুলি মিশাইয়া গরম জলে গুলিয়া লইবে।

ওয়াটারপ্রুফের আঠা

সাদা লাক্ষা, পরিশ্রুত ন্যাপ্‌থার সহিত গুলিয়া লইবে। আগুন বা আলোর নিকট হইতে দূরে রাখিবে। দুই ভাগ পেইল গ্লু, ৮ ভাগ টাট্‌কা সর তোলা দুধ গলাইয়া ওয়াটার বাথ দিয়া প্রয়োজনমত বাষ্প উড়াইয়া লইবে। ৬ ভাগ পেইল গ্লু উপযুক্ত পরিমাণ ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটারের সহিত গুলিবে। উহার সহিত দেড় ভাগ উৎকৃষ্ট হলদে রজন যোগ করিবে; যখন উহা গুলিয়া যাইবে, তখন ২ ভাগ স্পিরিট অব টার্পেন্টাইন দিয়া সবগুলি বেশ ভাল করিয়া মিশাইবে। গরম জলের 'বাথ' দিয়া সব মিশাইতে হইবে।

গোলাপজল

পনর ফোঁটা অয়েল অব রোজ এক ড্রাম কার্ব্বোনেট অব ম্যাগনেসিয়া, এক পাইন্ট ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার। প্রথমে ম্যাগনেসিয়ার সহিত তেল ঘষিয়া লইবে, তারপর ক্রমে ক্রমে জল মিশাইয়া ফিল্‌টার করিয়া লইবে।

রাশিয়ান গ্লু

কড়াই শুঁটির আকার পরিমিত গঁদ তরল করিতে যতটুকু স্পিরিট অব ওয়াইন প্রয়োজন ততটুকু স্পিরিট দিয়া গঁদ পাতলা করিয়া লইবে। অপর একটী পাত্রে আইসিংগ্লাস শিরীশ যাহা পূর্ব্বেই জলে ভিজাইয়া ফুলাইয়া নরম করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা ফ্রেঞ্চ ব্র্যাণ্ডি অথবা মদের মধ্যে যাহাতে ২ আউন্স ওজনের শক্ত আঠা হয় এমন ভাবে মিশাইবে। উহাতে অল্প একটু গাম গ্যালবেনাম বা এমোনিয়েকাম মিশাইয়া ঘষিবে বা এমন ভাবে চূর্ণ করিবে যেন উহা আঠার সঙ্গে গলিয়া যায়। তারপর জ্বাল দিয়া সবগুলি মিশাইবে এবং একটী বোতলে ছিপি আটকাইয়া রাখিবে। ব্যবহারের পূর্ব্বে বোতলটী গরম জলে রাখিয়া দিবে।

মেটাল পলিশ

Kieselguhr ৫৬ পাউণ্ড, প্যারাফিন তেল ৩ গ্যালন, মেথিলেটেড স্পিরিট ১½ গ্যালন, ক্যাম্পরেটেড স্পিরিট আধ গ্যালন, তারপিন তেল আধ গ্যালন, তরল এমোনিয়া ফোর্ট ৩ পাইন্ট। তেল, তারপিন এবং মেথিলেটেড স্পিরিটের মধ্যে এমোনিয়া ঢালিয়া দিবে। উহার সহিত ক্যাম্ফোরেটেড স্পিরিট যোগ করিয়া কিসেল গুড়ের সঙ্গে মিশাইবে। যাহাতে কোন দ্রব্য তলে পড়িয়া থিতাইয়া না যায় এজন্য ভরিবার

সময় বেশ ভাল করিয়া ঝাঁকিতে থাকিবে। কিসেল গুড় একটু কম দিয়া একটু sesquioxide of iron দিলে রংটা লাল হইবে। ন্যাকড়া দিয়া পলিশটী লাগাইবে, শুকাইয়া গেলে আর একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া অথবা ব্রাস দিয়া ঘষিবে।

শক্ত সিমেণ্ট

সর্ব্বোত্তম সাদা গ্লু ১ পাউণ্ড, শুকনা সাদা সীসা ½ পাউণ্ড, soft water এক কোয়ার্ট, ওয়াটার বাথে মিশাইয়া গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত অল্প অল্প তাপ দিবে। এই সময় আধ পাইণ্ট এলকহল এবং এক আউন্স স্পিরিট অব ক্যাম্ফর যোগ করিবে।

সাইকেল টায়ারের সিমেণ্ট

গাটা পার্চ্চা ½ এভর্ডুপয়েজ আউন্স caoutchouc, ১ এভর্ডুপয়েজ আউন্স, কার্ব্বণ বাই-সালফাইড্ এক ফ্লুইড আউন্স মিশাইবে এবং গুলিবে। ছিদ্র স্থান পরিষ্কার করিয়া উহাতে এই সিমেণ্টের ফোঁটা ফেলিবে। ছেঁড়া স্থান যদি বড় হয়, তাহা হইলে সিমেণ্ট পরদা করিয়া লাগাইবে। রবার টায়ারটি হাল্কাভাবে সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তারপর ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টাকাল শুকাইবে।

অগ্নিনির্ব্বাপক তরলসার

অপরিশ্রুত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ২০ ভাগ, লবণ ৫ ভাগ একত্রে ২৫ ভাগ জলে মিশাইবে। এই তরলসার তৈয়ার করিয়া ঘরে রাখিবে। কোথাও আগুন লাগিলে হাত পাম্প দিয়া প্রয়োগ করিবে।

Exle Grease

ট্যালো ১ পাউণ্ড, রেসিন ১ পাউণ্ড, তিসির তৈল ১ পাইণ্ট মৌচাকের মোম ½ পাউণ্ড, ক্যাষ্টর অয়েল ১ পাইণ্ট।

কেশোদ্ধার

সালফার ১৩০ গ্রেণ, লেড এসিটেট ২৩০ গ্রেণ, গ্লিসিরিন ৪ ফ্লুইড আউন্স, সুগন্ধ জল ১০ ফ্লুইড আউন্স। সবগুলি বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

আরামদায়ক সিরাপ

মরফিন সালফেট এক আউন্স, সোডিয়াম কার্ব্বনেট ২ গ্রেণ, সাধারণ সিরাপ ৩ ফ্লুইড, জল ১ ফ্লুইড আউন্স, স্পিরিট অব ফেনেল ২ ফ্লুইড ড্রাম, বেশ ভাল করিয়া মিশাইবে।

রক্তপরিস্কারক মিকশ্চার

পটাসিয়াম যোভাইড ৫২॥০ গ্রেণ, স্পিরিট অব স্থালভোলেটাইল ১০ মিনিম; ক্লোরিক ইথার ৬৭ মিনিম, সাধারণ সিরাপ ৫০ মিনিম, জল ৮ ফ্লুইড আউন্স; পোড়া চিনি দিয়া রং করিবে। চারি আনায় যে কোন ঔষধের দোকানে উক্ত মিকশ্চার তৈরী করিয়া দিবে। ডোজ এক চামচ দিনে তিনবার।

সিরাপ অফ ফিগস

এক পাউণ্ড ডুমুরের ছ্‌ এক আউন্স সোণামুখী পাতা, এক কোয়ার্ট জলে সিদ্ধ করিয়া এক পাইণ্ট করিবে। ¾ পাউণ্ড চিনি দিয়া তার পরে ১০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিবে।

কাটা পোড়া ঘা ইত্যাদির মলম

এক আউন্স হোয়াইট ওয়াক্স, এক আউন্স ভেসিলিন, বার্গাণ্ডিপীচ ¼ আউন্স, জলপাই এর তেল ½ আউন্স, তারপিন ½ আউন্স, ইউক্যালিপ্টাস অয়েল ¼ আউন্স, বোরাসিক এসিড ¼ আউন্স কার্ব্বলিক এসিড ¼ আউন্স, সবুজ তেল (green oil বা elder) ½ আউন্স। আঠার কেটলির মত কোন পাত্রে গলাইয়া ফেলিবে ও দশ মিনিট কাল অল্প অল্প ফুটাইবে। তারপর পাত্রটি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে রাখিবে। জমাট বাঁধিতে আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত নাড়িতে থাকিবে।

বাতের বড়ি বা পিল

সেলি সাইলেট অব সোডা ¼ আউন্স, গুই একাম ¼ আউন্স, এলোস ¼ আউন্স।

চুলের ঔষধ বা কেশরক্ষক

গ্লিসিরিন ১ আউন্স, স্পিরিট অব ওয়াইন ১ আউন্স, এমোনিয়া ¼ আউন্স, কেসিয়ার তেল ১০ ফোঁটা ঝাঁকিয়া মিশাইয়া লইবে।

মাথা ধরার পাউডার

এন্টি ফেব্রিণ ½ আউন্স, ক্যাস্টর সুগার ২ আউন্স বেশ ভাল করিয়া মিশাইবে। চায়ের চামচের ¼ চামচ শুক্‌না গুঁড়া জিহ্বার উপর রাখিয়া জলের সঙ্গে খাইয়া ফেলিবে।

বেদনাহীনভাবে দন্তোত্তোলনের উপায়

মরফিন সালফেট, হাইড্রেট অব কোরাল, কোকেন হাইড্রেট ক্লোরেট, কার্ব্বলিক এসিড, প্রত্যেকের ৫ গ্রেণ, গোলাপজল ৫ ফ্লুইড ড্রাম গলাইবে তৎপরে হাইপোডার্ম্মিক পিচকারী দিয়া উহা মাড়ির মধ্যে ইনজেক্‌সন করিয়া দিবে।

ঘা ফোড়া বা কাটার মলম

কার্ব্বলিক এসিড (ক্রিষ্টাল) ৪০ গ্রেণ, ক্লোরোফিল ¼ আউন্স, অয়েল অফ বার্গামট ১½ ড্রাম, পেট্রোলিয়াম জেলি ১ পাউণ্ড, এসিডকে একটু জেলি দিয়া সামান্য উত্তাপ সহযোগে গলাইবে তারপর সব একসঙ্গে মিশাইয়া লইবে।

অঙ্গরাগ

তেলো ত্বক

নারীরা তেলো চর্ম্ম থাকা দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যদি তাঁহারা এই কথাটি উপলব্ধি করিতেন যে উহার জন্যেই যৌবনের চাকচিক্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে নালিশ করিতেন না। বস্তুতঃ, যাঁহাদের ত্বক শুষ্কবৎ বোধ হয়, তাঁহারা অপর শ্রেণীর মেয়েদের মত জল বায়ুর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারেন না। তেলো ত্বক থাকা সত্ত্বেও অঙ্গশ্রী যাহাতে সুন্দর দেখায়, সেইজন্য কয়েকটী কথা লিপি বদ্ধ করিতেছি।

যদি ত্বক বাস্তবিকই চর্ব্বীযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে যবচূর্ণ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে। কিছু সূক্ষ্ম যবচূর্ণ গ্রহণ করিয়া উহার সঙ্গে এক চামচ সালফার চূর্ণ এবং আর এক পাত্র castile soap চূর্ণ মিশ্রিত কর। সমস্ত জিনিষটীকে এক সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত কর এবং তৎপরে উহার এক চামচ ছয় ইঞ্চি স্কোয়ার একটী butter muslin-এ রাখ। তারপরে ঐ ন্যাকড়াটিকে আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া ঈষদুষ্ণ জলে ভিজাইয়া মুখে ব্যবহার করিতে থাক; সাবানের প্রলেপটি শুকাইয়া যাইতে দিও। মিনিট তিনেক সময় অতিক্রান্ত হইলে, উহাকে ধুইয়া ফেলিও; সপ্তাহ খানেকের জন্য দৈনিক দুইবার ব্যবহার করিলেই বিশেষ উপকার লক্ষিত হইবে। তৎপরে সপ্তাহে দুই একবার করিয়া ব্যবহার করিলেই চলিবে।

লোমকূপ বড় হইয়া গেলে যবচূর্ণ ব্যবহারে উহা ছোট হইয়া আসিবে; ত্বকও পূর্ব্বের মত চর্ব্বীযুক্ত থাকিবে না। যদি লোমকূপগুলি খুব বড় হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে মুখের উপর দশরাত্র ধরিয়া নিম্নলিখিত জিনিষটী ব্যবহার করিতে হইবে। একটী ডিম ভাঙ্গিয়া উহার সঙ্গে এক আউন্স গলানো মধু লও এবং তাহার সঙ্গে তিন আউন্স বার্লি চূর্ণ মিশ্রিত কর। যদি মিশ্রিত দ্রব্যটী খুব ঘন হয়, তাহা হইলে উহার সঙ্গে একটু গোলাপ জল ব্যবহার করিতে পার। এই মিক্‌চারকে সমস্ত মুখের উপর সমানে লাগাইয়া দাও এবং তৎপরে নাক, মুখ, চক্ষু বাহিরে রাখিবার সুবিধা রাখিয়া সমস্ত মুখের উপর একটী মসলিন কিংবা সিল্ক লেপ্‌টাইয়া দাও। ভোর বেলায় ঈষদুষ্ণ জলে দুই এক ফোঁটা অডিকোলন ফেলিয়া দিয়া মুখ-মণ্ডল পরিষ্কার রূপে ধৌত করিয়া ফেল!

অনেকে মনে করেন যে তেলো ত্বকের উপর আর কোন প্রকার জিনিষ ব্যবহার করিতে নাই। বস্তুতঃ ইহা ভয়ানক ভুল ধারণা। যাহাদের গাত্র চর্ম্ম তেলোও নয়, খরখরেও নয়, তাহাদের অঙ্গে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত ফরমূলা বিশেষ কার্য্য-করী হইবে :—

স্পিরিট অফ্ ক্যাম্ফার ··	৩	ড্রাম
অডিকোলন	,,	,,
সিম্প্‌ল টিংচার অফ বেনজয়েন···	২	আউন্স
গোলাপ জল	৪	,,

এই শ্রেণীর ত্বকের জন্য অনেকে Foundation ক্রীমএর পরিবর্ত্তে পাউডার লোসন ব্যবহার করিয়া থাকে। বাজারেও অনেক ভাল জিনিষ পাওয়া যায়; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাউডার করিবার পূর্ব্বে লোসনটি যেন সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায়। এক টুক্‌রা স্যাময় লেদার দিয়া ইহাকে মসৃণ করিয়া তুলিতে হইবে; পাউডার করা সাধারণ নিয়মানুসারেই চলিবে। সম পরিমাণ গ্লিসারিণ এবং গোলাপ জল মিশ্রিত করিয়া লইলেও তেলো ত্বকের কাজে লাগাইতে পারা যাইবে। ইহা বাড়ীতেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নিম্নে আরও একটী ফরমূলা দেওয়া যাইতেছে:—

বোরাক্স চূর্ণ...	সিকি	ড্রাম
গোলাপ জল	৩	আউন্স
এল্ডারফ্লাওয়ার ওয়াটার···	১	,,
সিম্পল্ টিংচার অফ্ বেনজয়েন	১০	ফোঁটা

গোলাপজলে বোরাক্স মিশ্রিত করিয়া লও; তৎপরে এল্ডারফ্লাওয়ার ওয়াটারের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বেনজয়েন ফেলিয়া দাও। এখন, সমস্ত জিনিষটীকে একত্র মিশ্রিত করিয়া ভাল করিয়া ঝাঁকিতে থাক; পাউডার করিবার পূর্ব্বেই ব্যবহার করিতে ভুলিও না।

টোটকা

(১)

আঁতে তিতা দাঁতে নুন,
পেটের ভয় তিন কোণ,
কাণে কচু চোখে তেল
তার বাড়ী ন বৈদ্যের ঠেল।

(২)

ঘোল, কুল, কলা
তিনে নাশে গলা।

(৩)

সকাল শুয়ে সকাল উঠে,
তার কড়ি না বৈদ্যে লুটে।

(৪)

বাঁচার জন্য খাও, খাওয়ার জন্য বাঁচিও না।
(অর্থাৎ দেহ রক্ষার জন্য লঘু আহার করিবে।
অত্যধিক ভোজনের লোভে বাঁচিও না,
অতিরিক্ত ভোজনেই মানুষ মরে, বাঁচে না।)

(৫)

মুখ দিয়ে ফেলে শ্বাস,
পরমায়ু করে নাশ।

(৬)

রিপুর বেগ যে সহ্য করে,
তার আয়ু কে হরে ?

(৭)

সদানন্দ মনে যার,
দেহ সুস্থ রহে তার।

(৮)

নিম নিষিন্দে যথা,
রোগ হয় কি সেথা ?

(৯)

শুদ্ধ জল মুক্ত-বায়ু ভোগ
প্রাতঃসূর্য্য হরে সর্ব্বরোগ।

(১০)

ভ্রমণ ক'রলে সকাল বেলা
থাকে না'ক রোগের জ্বালা।

(১১)

ভুঁড়ি মুড়ি ঠাণ্ডা বোল
রোগ ঘেঁসে না তার কোল

(১২)

খেয়ে মুতে মুতে খায়
সকাল বিকাল নিকাল দেয়
তার কড়ি না বৈদ্যে পায়।

(১৩)

খেয়ে হাগে শুয়ে জাগে
সে মানুষ কোন্ কাজে লাগে

(১৪)

মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল
দুধে হয় বুদ্ধি বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল

(১৫)

টাটকা ফল স্বাস্থ্যের বল।

(১৬)

পচা বাসি ভেজাল খেলে
যমে চায় চক্ষু মেলে।

(১৭)

খেয়েই যে ঘুম যায়
অজীর্ণেতে তারে পায়।

(১৮)

শ্রম বিশ্রাম দুটী—দেহ রক্ষার খুঁটী

(১৯)

অসুখের বড় ছোট সকলই সমান
ছোট বলি তুচ্ছ করি না হারাও প্রাণ।

(২০)

না খেয়ে মরে যত
খেয়ে মরে তার কত শত।

(২১)

তুলসীর রস মধু দিয়ে—
সর্দ্দি কাসিতে দেবে খাইয়ে
বেশী সর্দ্দি যদি মনে কর
মিশিয়ে নিও একটু কর্পূরের গুঁড়ো।

(২২)

পুরাণো ঘি বা সরিষার তেলে—
আদা বা পিয়াজের রসটি ফেলে
মাঝে মাঝে গরম মালিশ ঘষলে
শ্লেষ্মা সরল হয় বুকেতে বসলে।

ঘরকন্নার কথা

অতি সূক্ষ্ম কোন কাঁটা কোথাও ফুটিলে এবং তাহা সহজে বাহির করার সুবিধা না থাকিলে একটু কার্ব্বলিক সাবান অতি অল্প লাল চিনির সহিত ভালরূপে মিশাইয়া ঐ কর্দ্দমবৎ পদার্থ পরিষ্কার কাপড়ের টুকরায় লাগাইয়া কাঁটার উপর পুলটিশ লাগাইলে শীঘ্রই ঐ কাঁটা বাহির হইয়া আসে।

*

হাঁসকে প্রাতে চালের কুঁরার সহিত পূর্ব্ব রাত্রের ভাতের ফেন মিশাইয়া দিতে হইবে, দুপুরে প্রত্যেকটীকে এক মুঠা করিয়া ধান, সন্ধ্যাবেলায় সামান্য চালের বা ভাতের সঙ্গে প্রত্যেককে দুই ফোটা করিয়া কড্‌লিভার অয়েল খেতে দিলে মাসে ১২টী হইতে ২৫টী ডিম পাওয়া যেতে পারে।

*

পুরাতন কাঠের আসবাস গুলি যাহাতে পোকা লাগিয়া নষ্ট হইয়া না যায় তাহার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যখনই কোন ছিদ্র অথবা অনুরূপ কিছু দেখিয়া কীটের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে তখনই ছিদ্র অথবা গর্ত্ত গুলি প্যারাফিন দ্বারা ভিজাইয়া দিতে হয়।

*

এনামেল করা খাটের ফ্রেম পরিষ্কার করিবার সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথম ফ্রেমটিকে সাবান ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়, পরে একটি ছোট কাপড়ের টুকরা প্যারাফিন দ্বারা পালিস করিতে হয়।

*

সদ্য আচার ও জ্যাম উপরের তক্তায় রাখা উচিত নহে কারণ গরম হাওয়ায় উহা শীঘ্র নষ্ট করে।

*

গ্যাস ষ্টোভের বার্ণারটি দুই মিনিট জ্বালিয়া তাহার পর চুল্লি দ্বারটি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খুলিয়া দিলে উহার ভিতরকার আর্দ্র বাতাস বাহির হইবার সুযোগ পায় এবং চুল্লিতে তাপ বেশী হয়।

*

কাচ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া উহার উপর একটু মেথিলেটেড স্পিরিট ঘষিয়া দিলে উহা বেশ চক্‌চকে হয়।

*

যখন চারিদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বাড়ে তখন সকল দ্রব্য ধৌত করিবার জলে কিঞ্চিৎ ইউক্যালিপ্‌ট্যাস তৈল মিশান উচিত।

*

ডিমের শ্বেত অংশ অসমান গাত্রচর্ম্ম সাদা ও নরম করে। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে উহা বেশ করিয়া চর্ম্মে ঘষিয়া লইতে হয় এবং প্রাতে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

*

তিন চামচ গোলাপজলের সহিত ডিমের শ্বেতাংশ বেশ করিয়া ফেটাইয়া লইয়া ব্যবহার করিলে চোখের ফোলা নরম পড়িয়া যায়। পরিষ্কার নরম কাপড় দ্বারা চোখে লাগাইতে হয়।

*

যদি হঠাৎ আঠার প্রয়োজন হয় অথচ উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তাহা হইলে ডিমের শ্বেত অংশ উত্তম আঠার কাজ করিতে পারে।

*

সমান অংশে গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিলে ডিমের শ্বেতাংশ পোড়া ঘার জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে। একখানি রুমালের উপর উহা ঢালিয়া পোড়া স্থানে বাঁধিয়া দিতে হয়।

*

লেস্‌ বা পর্দ্দা ধৌত করিবার সময় উহা বেশ করিয়া ভাজ করিয়া লইতে হয় তা'হলে উহা ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। কাচা হইয়া গেলে ভিজা অবস্থায় না নিংড়াইয়া মেলাইয়া দিতে হয়।

*

লিলেন কাপড় কাচিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত উহাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, কারণ ছিদ্র থাকিলে উহা কাচিবার সময় আরও বড় হইয়া যায়।

*

মেঝে পরিষ্কার করা ব্রাশ যদি খুব ময়লা হইয়া যায় তাহা হইলে অল্প গরম সাবানের জলে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং পরে উষ্ণ জলে ধুইয়া হাওয়ায় শুকাইতে হয়।

জীবন বীমার মূলসূত্র

প্রথম ভাগ—অগ্নি,-নৌ এবং দুর্ঘটনা বীমা (Casualty)

সাধারণতঃ বীমা করাকেই ইনসিওরেন্স বলা হইয়া থাকে। সম্পত্তি কিংবা জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তি কিংবা কোম্পানী যদি নির্দ্দিষ্ট একটী প্রিমিয়ামের বিনিময়ে উহার ভার গ্রহণ করিয়া চুক্তি করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইনসিওরেন্স করা হইয়াছে বলিতে হইবে। সমুদ্রস্থ মালপত্রাদি, জাহাজ প্রভৃতির উপর ইনসিওরেন্স গ্রহণ করাকে নৌ-বীমা বলা হইয়া থাকে। স্থলভাগে অগ্নি হইতে সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চুক্তি-পত্র করা হয়, তাহাকে অগ্নি বীমা বলে। কোন পুরুষ কিংবা নারী একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রিমিয়াম দিয়া কোন কোম্পানীকে এতৎ-সম্বন্ধীয় সমস্তভার অর্পণ করিলে, উহাকে জীবন-বীমা বলা হইবে। ইনসিওরেন্স গ্রহণ করার যে চুক্তি পত্র, তাহাকে ইনসিওরেন্স পলিসি বলা হইয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ইনসিওরেন্সকে একটী কূপ বলিয়া উপমা দিলেও বিশেষ ভুল হয় না, যাহার যাহা খুসী ইহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে পারেন বটে, তবে যাহার ক্ষতির আশঙ্কা, তিনি উহার মধ্যে হইতে তাহার সামগ্রাটী তুলিয়া লইবার অধিকার পাইয়া থাকেন। কাজেই কোন ক্ষতি পূরণ করিবার যে চুক্তি তাহাকেই ইনসিওরেন্স আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

নৌ বীমার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই আনুমানিক মূল্যে জিনিষ পত্রাদির দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিপদ ঘটিবার সময় যে ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই ইনসিওরেন্স চুক্তিপত্র গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কাজেই

যাহার ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হইবে, তিনি কেবলমাত্র ক্ষতির সম্পূরণ প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন; তাঁহার লাভের আশা করা সমীচীন হইবে না। সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহা যাহাতে ক্ষতিজনক না হয় এবং উহা গ্রহণের উপযোগী কিনা তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নৌ-বীমা বিভাগে অনেক সময় wager policy গ্রহণ করা হয়; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ইহার উপর কোনপ্রকার আইনকানুন রচিত হয় নাই।

Right of Subrogation-এ (অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতি সম্পূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সম্পূরণকারী ব্যক্তিগণকে তাহার সমুদয় ক্ষমতা এবং পন্থানির্দ্দেশ করিবার ভার অর্পণ করিয়া থাকে) দেখা যায় যে, ক্ষতিপূরণ করিবার চুক্তি ছাড়াও, উহা নৌ,-অগ্নি, আয়ের ক্ষতি, মজুরদের ক্ষতিসম্পূরণ, সিঁদচুরী প্রভৃতির অঙ্গীকার পত্রও গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাতে ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা, ফার্ম্মের পশু প্রভৃতির উপর বীমা সাধারণতঃ লওয়া হয় না; ক্ষতিসম্পূরণের চুক্তিপত্র সেইজন্যই বোধ হয় ইহার জন্য দায়ী থাকে না। এই কারণেই আমরা এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে subrogative ধরণের কতকগুলি অধিকার দিয়া বিশেষ সর্ত্তে অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করা হয়।

নৌ-বীমা বিভাগের নিয়মপদ্ধতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে জাহাজে স্থানান্তরিত মালের মূল্য এবং ভ্রমণের খরচাদির যোগে যে অর্থ নির্দ্ধারিত হয়, তাহার উপর ইনসিওরেন্স গ্রহণ করাই নৌবীমা বিভাগের কার্য্য। পলিসিতে চুক্তিবদ্ধ মূল্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট জাহাজের ভ্রমণে যদি এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে প্রেরিত মালের উপর দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহার অঙ্গীকার-পত্রকে Voyage Policy বলিবে। ধরুণ, আবার কোন জাহাজের হালের উপর একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন এক বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ১লা জানুয়ারী) যদি বীমা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহাকে

এস, এন, ব্যানার্জ্জী

Time policy বা সময়-পত্র বলিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে; কাজেই উহার সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিব না। এতদ্ব্যতীত floating policy এবং open policyও আছে। Open policyতে যে জিনিষটীকে ইনসিওর করা হয়, তাহার মূল্য পরে প্রমাণ ও নির্দ্ধারিত করিতে হয়। এই চুক্তিপত্রগুলি General average কিংবা Particular

average lossএর অধীন। প্রথম সর্ত্তানুসারে, যাহাদের সম্পত্তি জাহাজের বিপদের সময় রক্ষা করা হয়, পার্টি ইনসিওর করা না থাকিলেও সম্পত্তির যাহা ক্ষতি হয় তাহার অনুপাত হিসাবে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়।

যখন এই জিনিষের উপর নৌ এবং অগ্নিবীমা করা হয় এবং উভয় চুক্তিপত্র সম্পর্কীয় দেনা পাওনার কথা উঠে, তখন বীমাকারীর ক্ষতিপূরণ পাইতে একটু বিলম্ব হওয়া ছাড়া আর কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সম্মিলিত liabilityর ভার উভয় কোম্পানী স্থিরীকৃত করিয়া লইবেন।

অগ্নিবীমা সম্বন্ধে কোন কথা বিশেষভাবে জানিতে হইলে আমরা পাঠকদিগকে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নৌ-বীমা অ্যাক্ট পড়িতে অনুরোধ করি। ইহা এতৎ সম্বন্ধীয় আইনের সংক্ষিপ্ত সার। মনে রাখিতে হইবে যে, যুক্তস্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যদি কোথাও স্বেচ্ছায় ক্ষতি করা হয়, তাহা হইলে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই তাহাকে আংশিক রূপে ক্ষতিগ্রস্থলোকদের ক্ষতির ভার বহন করিতে হইবে। ইহাকে General Average কহে।

নৌ-বীমাতে জিনিষের মূল্য লইয়া প্রায় দর কষাকষির মতই হয়; অগ্নিবীমাতে দাম ঠিক করা চুক্তি এড়াইবার চেষ্টাই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, যাহা বাস্তবিক ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার দায়িত্বই উহার উপরে ন্যস্ত থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অগ্নিবীমাসম্পর্কীয় অফিস সমূহ এসোসিয়েশনের ভিতরেও থাকিতে পারে, বাহিরেও থাকিতে পারে। ইনসিওরেন্স ক্ষেত্রে অগ্নিবীমার কার্য্যে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হয়, অনেক সময় কয়েক বৎসর খুব ভাল কাজ চলিল, তারপরে আবার সমানে ব্যবসায়ে দুর্দ্দিন চলিতে থাকিল। এরূপ ক্ষেত্রে, অনেক বৎসর ধরিয়া ব্যবসার শ্রেণীবিভাগ, উঠ্‌তি পড়্‌তি প্রভৃতি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়, তদ্বারাই বীমার অনুমানিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

অগ্নিবীমার চুক্তিপত্র অনুসারে, আগুন লাগা

চাই। যদি বিদ্যুৎ কিংবা রাসায়নিক কোন কার্য্যে ক্ষতি হয়, তাহা হইলে উহার সম্পূরণ করিবার জন্ত কোম্পানীর কোন প্রকার বাধ্য-বাধকতা থাকে না। বর্ত্তমানকালে এরূপ কোন কারণের জন্ত ক্ষতি হইলেও, কোম্পানী ক্ষতি-পূরণ দিয়া থাকেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা না থাকিলে অগ্নি ব্যতীত যদি কোন কিছু explosionএ উড়িয়া যায়, তাহা হইলে কোম্পানী দায়ী থাকে না। কতকগুলি সাধারণ নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিবীমা সম্পর্কিত চুক্তিপত্র, বস্তুতঃ সর্ব্ব রণের ইনসিওরেন্স পত্রই, গ্রহণ করা হইয়া থাকে; যেমন :—আন্তরিক বিশ্বাস, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া এবং যাহার উপর বীমা করা হইতেছে তাহার উপর ইনসিওর কারীর ক্ষমতা আছে কিনা!

নৌবীমার অনেকগুলি সর্ত্তই ব্যাখ্যার মত এবং বেশীর ভাগই বীমাকারীর স্বার্থের অনুকূল। ইহাতে চুক্তি সম্পর্কিত বিবরণ, যেমন, বর্ণনা, পরিবর্ত্তন, সুদের হার বদল করা, যে-সর্ত্তে পলিসি বাতিল হইয়া যাইবে, দেয় হার, average clause এর কথা, সালিসি ও ওয়ারেণ্টের ব্যাপার —সমস্তই খুঁটিনাটিভাবে লিপিবদ্ধ করা থাকে।

অগ্নিবীমার বিকাশ আধুনিক কালে হইয়া থাকিলেও ইহার আর একটী দিক বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা Loss of profits এবং Standing charges এর খপ্পর হইতে বীমা-কারীকে রক্ষা তো করেই, এমন কি আয়-রক্ষা করিতে যাইয়া অগ্নিবীমার জন্ত যে বেশী ব্যয় হয়, তাহাতেও উহা সাহায্য করিয়া থাকে। চুক্তিতে লেখা থাকে যে ব্যবসায়ীর অগ্নি হইতে যদি কোন প্রকার আয়ের ক্ষতি হয় কিংবা standing charges দাঁড়ায়, তাহা হইলে কোম্পানী ক্ষতিসম্পূরণ করিবে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের the Employers Liability Act অনুসারে দায়িত্বভার প্রাপ্ত শ্রমজীবি-দের অমনোযোগিতার জন্ত নিযুক্তকারী কর্ম্মচারী দিগকেই দায়ী করা হইয়াছে। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতির ক্ষতি হইলে তাহাদের তিন বৎসরের মাহিনার সমান অর্থদণ্ড হইতে পারিবে; ঠিক কত অর্থ, তাহা জজ্‌ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের The workmen's Compensation Act দ্বারা শ্রমজীবিদের আরো কতকগুলি সুবিধা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১) মৃত্যু—যদি মজুরদের কাহারো মৃত্যু হয় এবং তাহার পোষ্য পরিবার থাকে, তাহা হইলে সে তিন বৎসরের মাহিনার সমান অর্থ পাইতে পারিবে।

(২) অক্ষমতা—কাজ করিতে সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকভাবে অক্ষম হইলে তাহার জন্ত বন্দোবস্ত করা হয়। এ সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলিয়া একটী থোক অর্থ ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) মজুরেরা আনুসঙ্গিক যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করে (যেমন, ভাঁড়া না দিয়া থাকার অধিকার) তাহা বেতনে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

(৪) এতদ্ব্যতীত অ্যাক্টের কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া আরো বিবিধ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

এখন আমরা Casualty Insurance এর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িতেছি। কোন বিশিষ্ট ধর-নের সম্পত্তি উড়িয়া কিংবা ভাসিয়া গেলে, বীমা-করা অর্থের অনুপাতে যে ক্ষতিপূরণ করা হয় এবং তৃতীয় পক্ষের সম্পত্তি কিংবা অন্ত কোনপ্রকার

ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়, তাহাকে Casualty Insurance বলে।

বয়লার, ইঞ্জিন, ইলেক্‌ট্রিক্যাল প্ল্যাণ্ট, ইলেক্‌ট্রিক্ লিফ্‌ট্ প্রভৃতি ইনসিওরেন্স।

অগ্নি সংযোগের জন্য যদি বিস্ফোরণ (explosion) হয়, যদি কোন দ্রব্য ব্যবহারের জন্য ক্ষয়িত হইয়া যায় কিংবা ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ইহাদিগকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিতে হইবে না।

যান চক্রের ইনসিওরেন্স।

মোটর গাড়ীতে অগ্নি লাগিয়া কিংবা অন্য প্রকারে ক্ষতি হইলে, উহা এই সর্ত্তের আমলে আসিবে, কিন্তু মেসিন খারাপ হওয়া (অতিরিক্ত রেট দিলে ইহাও গ্রহণ করা হয়) কিংবা ব্যবহারে ক্ষয়িত হওয়ার জন্য কোম্পানী দায়ী থাকিবে না। কতকগুলি সর্ত্তানুসারে যদি মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনায় ব্যক্তিগত ক্ষতি কিংবা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে উহাও ইহার আমলে আসিবে।

প্রিমিয়ামের হার treasury rating এর উপর নির্ভর করে এবং গাড়ীর মূল্যের মধ্যে

টায়ার, ল্যাম্প্ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদিও ধরা হয়। যেখানে কারের মালিক স্বয়ং গাড়ী চালাইয়া থাকেন কিংবা যেখানে একটার বেশী গাড়ী ইনসিওর করা আছে অথবা যেখানে বীমাকারীও গাড়ীর ক্ষতির জন্য একটী চুক্তি অনুযায়ী অর্থ স্বীকার করিয়াছে কিংবা যেথানে দাবী দাওয়া করা হয় নাই—এরূপস্থলে অর্থের হার কমাইয়া দেওয়া হয়। মোটর সাই- কেলও এইরূপে ইনসিওর করা যাইতে পারে।

গৃহপালিত পশু বা Live stock ইনসিওরেন্সও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ এই ধরণের চুক্তিপত্র ১২ মাসের জন্য গ্রহণ করা হয়; জীবজন্তুর বয়স বুঝিয়া উহার বাজারের মূল্যানুসারে প্রিমিয়াম ঠিক করিতে হয়।

Fidelity Guarantee Insurance— অর্থাৎ এই নামযুক্ত চুক্তি পত্রানুসারে কেরাণী, ভ্রমণকারী এবং ট্রাষ্টিদের অসাধুতা হইতে লোক কিংবা কোম্পানীকে রক্ষা করা হয়। কর্ত্তব্য এবং পারিশ্রমিক, বীমাকারীর হিসাবে টাকা জমা রাখা, ইত্যাদি এই অঙ্গীকার পত্রের মূল- সূত্র। অর্থ না দিলে বীমাকর্ম্মী উহাকে আদা- লতে হাজির করাইবার ক্ষমতা রাখেন।

Burglary Insurance—Burglary অর্থে কোনজায়গায় জোর করিয়া রাহাজানী করা বুঝাইবে। তবে ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে Larceny র কথা আদৌ আসে না; কেন না, উহাতে এমন একটী কিংবা বহুলোকের দ্বারা চুরী বুঝায়, যাহারা পূর্ব্ব হইতেই চুরী করিবার স্থলে উপস্থিত আছে।

Property owners' Indemnity Insurance—

এই নির্দ্ধারণ অনুসারে যে সমস্ত কুটীর বা খোলা ঘর town planning Act এর আমলে আসে, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

প্লেট্ গ্লাস ইনসিওরেন্স—গ্লাসের আকার এবং গুণের উপর ইহার বীমা নির্ভর করে।

ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা এবং অসুস্থতার বীমা

ইহার সর্ত্তানুসারে মৃত্যু, অঙ্গহানি, দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হওয়া, প্রভৃতি কারণের জন্য অর্থ দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, লাইফ্ এসিওরেন্স পলিসিতে আজকাল Disability Benefit বা অঙ্গ বিকার ক্ষতিসম্পূরণ করা হয়। যথাসম্ভব শীঘ্র দাবীর জন্য নোটিশ দিতে হয়। বীমাকারীর ব্যয়েই সংবাদ ও সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হয়। বীমা কর্ম্মীগণও তাঁহাকে ডাক্তারী পরীক্ষা না করিয়া রেহাই দিবে না, অবশ্য যদি তাঁহাদের ইচ্ছা হয়; তবে ইহার ব্যয়ভার বীমাকর্ম্মীগণকেই বহন করিতে হইবে।

Freak Insurances -অনেকেই খবরের কাগজে পড়িয়া থাকিবেন যে নর্ত্তকী এবং গায়ি- কারা তাহাদের পায়ের অগ্রভাগ ও কপোল প্রদেশ ইনসিওর করাইয়া থাকেন। ইহাদিগকে Freak insurance বলা চলে বলিয়া আমি মনে করি। হলিউডে বড় বড় ষ্টারদের অনেকেই সপ্তাহে চারি হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করিয়া থাকেন; যখন তাঁহাদের কাহারো কোন বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে হয়, তখন অনেকেই সৌন্দর্য্যরক্ষার জন্যে আঙ্গুল কিংবা গোড়ালী প্রভৃতি বীমা করাইয়া লন। ভারতবর্ষে এরূপ ধরণের বীমা ব্যতিক্রম মাত্র।

যখন অগ্নি, সিঁদকাঠি কিংবা অন্যান্য ঐরূপ ধরণের ইনসিওরেন্সের জন্য days of grace বা শুধিবার সময় দেওয়া হয়, মনে রাখিতে হইবে সে সময়টি অন্যত্র ব্যবসায় বন্দোবস্ত করিবার জন্য দেওয়া হয় নাই। কোম্পানীর সঙ্গে পূর্ব্বের সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য যে সুবিধা দেওয়া হইল, তাহা অপব্যবহার করিবার জন্য নহে। যদি প্রমাণিত হয় যে বীমাকারী অঙ্গীকার পত্র পুনরায় গ্রহণ করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহা হইলে শুধিবার সময়ে কোন দাবী দাওয়া উঠিলে তাহা মেটানো হইবে না।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আপনি ভাল করিয়া চুক্তি পত্রগুলি পাঠ করুন, বীমাকর্ম্মীদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে অঙ্গীকার পত্রে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে কিনা, সেই পরিবর্ত্তনের আলোকে আপনার অর্থের অবস্থাটা একটু সমঝাইয়া দেখিবেন; কিন্তু সর্ব্বোপরি নিজের ইনসিওরেন্স দেখিবার সময় উহা এবং উহার প্রিমিয়াম বিশেষভাবে খতাইয়া লক্ষ্য করিবেন। বিপদের আশঙ্কা কাটাইবার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই মূলমন্ত্র অনুসারে কাজ করিয়াই যাহারা ছোট ছিল তাহারা বড় হইয়াছে এবং যাহারা বড় আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। বীমা ক্ষেত্রে এই মোটা মোটা কথাগুলি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। *

(বারান্তরে সমাপ্য)

* কলিকাতা ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এস্‌, এন, ব্যানার্জ্জীর প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশিত হইল। —সম্পাদক।

কলিকাতা কর্পোরেশন

লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট

গাড়ী ও ঘোড়ার উপর ট্যাক্স

দ্বিতীয় বর্ষার্দ্ধ ১৯৩২-৩৩

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারামতে ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, দৌড়ের ঘোড়া, ঘোড়া, টাট্টু এবং খচ্চর ইত্যাদির, মালিকগণকে জানান যাইতেছে যে ১৯৩২, ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে তাঁহারা যেন তাঁহাদের জীবজন্তু যান বাহনাদি ও তজ্জন্য প্রদত্ত ট্যাক্সের একটি বিবরণ অবিলম্বে মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করেন। উক্ত বিবরণী প্রদানের (চালান) মুদ্রিত ফর্ম্মা এখনও না পাইয়া থাকিলে, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিসে লাইসেন্স বিভাগে আবেদন করিলেই পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যারা আরও জানান যাইতেছে যে ৩০শে নবেম্বরের মধ্যেও যদি উক্ত চালান দাখিল করা না হয় তাহা হইলে দোপর্দ্দ করিয়া ২০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হইবে। যাঁহারা নিজ স্থানে বসিয়াই উক্ত কর প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এতর সম্পর্কে টাকা গ্রহণ ও লাইসেন্স প্রদানে ক্ষমতা প্রাপ্ত ইনস্পেক্টরের নিকট টাকা প্রদান করিয়া লাইসেন্স লইতে পারেন। ব্যবহৃত না হওয়ার যুক্তিতে যাঁহারা ঘোড়ার গাড়ীর ট্যাক্স প্রদান করিতে অসমর্থ, ১৯৩২, ৩১শে ডিসেম্বরের পরে এ বিষয়ে তাহাদের কোন আবেদনই গৃহীত হইবে না।

গরুর গাড়ী রেজেষ্ট্রী করণ

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে গত ১লা অক্টোবর হইতে বর্ত্তমান অর্দ্ধ বৎসরের নিমিত্ত গরুরগাড়ী রেজেষ্ট্রী করা আরম্ভ হইয়াছে। গরুরগাড়ীর এবং ঠেলাগাড়ীর (যাহা মানুষের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় না) মালিকগণ যেন অবিলম্বে উহা রেজেষ্ট্রী করিয়া লন। প্রত্যেকখানি গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন ফি ৪৲ মাত্র। এতদ্ব্যতীত গাড়ীর সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিবার নম্বর প্লেটের জন্য অতিরিক্ত ১৲ ফি দিতে হইবে।

গরুর গাড়ী চালকের টিকেট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারানুযায়ী প্রত্যেক গরুর গাড়ী চালকের সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এরূপভাবে কর্পোরেশন অনুমোদিত একখানি করিয়া টিকেট ধারণ করিতে হইবে।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

উক্ত আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী কলিকাতার প্রত্যেক কুকুরের জন্য বার্ষিক ৫৲ ট্যাক্স এবং প্রত্যেক কুকুরের মালিকগণকে তাঁহাদের পালিত কুকুরের তালিকা কর্পোরেশনে দাখিল করিতে হয়। উক্ত ট্যাক্স প্রদান করার পর কর্পোরেশন হইতে লাইসেন্স ও কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য নম্বর সম্বলিত একটি প্লেট দেওয়া হয়। কোন কুকুরের গলায় এইরূপ নম্বর সম্বলিত প্লেট না থাকিলে উহাকে মারিয়া ফেলিবার কিংবা ধরিবার সম্ভাবনা থাকে।

বি, ভি, রামিস্ত্রী।
কর্পোরেশনের সেক্রেটারী।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৩১শে অক্টোবর, ১৯৩২

বীমাব্যবসায়ে প্রতারণার কাহিনী

বীমা ব্যবসায়ে নানারূপ প্রতারণার কাহিনী মাঝে মাঝে লোক চক্ষুর গোচরে আসে। কিন্তু সম্প্রতি যেরূপ এক ভীষণ প্রতারণার কাহিনী ধরা পড়িয়াছে তাহার তুলনা সচরাচর বড় দেখা যায় না। বিশেষতঃ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ ভদ্রলোকেরা বীমা কোম্পানীকে ঠকাইবার জন্য যে এরূপ জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারে ইহা অনেকের ধারণারও অতীত ছিল। ঘটনার বিবরণ এই :—

ন্যাশন্যালকে ঠকাইবার চেষ্টা

জীবিত পলিসি-হোল্ডারকে মৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার তথাকথিত পত্নী দ্বারা বীমার টাকা দাবী করা হইয়াছে বলিয়া গত ৭ই জুলাই প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক মামলা হইয়া গিয়াছে। এই মামলায় বালী মিউনিসি-প্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং বালী বেঞ্চ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেশচন্দ্র পাল, শিবকৃষ্ণ চাটুজ্যে এবং কুমার কৃষ্ণ ঘোষকে প্রতারণা, প্রতারণার চেষ্টা, প্রতারণার জন্য ষড়-যন্ত্র, জাল, জাল দলিল খাঁটি বলিয়া চালানো ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই যে আসামীগণ ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বহু টাকার পলিসির বাবদ ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ ইনসিওরেন্সকে প্রতারণার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তাহারা প্রথমতঃ বালীর শৈলেন্দ্র নাথ পাল নামক একজন কল্পিত লোকের নামে ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে ৫০০০৲ টাকার একটী বীমা করে। প্রস্তাবপত্রে বীমা-কারীর এবং তাহার একজন বন্ধুর নাম জাল করিয়া স্বাক্ষর করা হয়। মাত্র ৪টী প্রিমিয়াম দিয়াই প্রথম আসামী মিথ্যা করিয়া বীমা কোম্পানীকে জানায় যে, তাহার ভ্রাতা শৈলেন্দ্র-নাথ পাল মারা গিয়াছে এবং তাহার বিধবার নামে (সুশীলাবালা দাসী) দাবীর টাকার ফর্ম্ম পূরণ করিয়া দাখিল করা হয়। দাবীর ফর্ম্মে সুশীলাবালার জাল টিপ সহি এবং একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বালীর একজন ডাক্তার ও অন্যান্য ভদ্রলোকের নাম জাল করিয়া সহি করা হয়। বালী মিউনিসিপ্যালিটির মৃত্যু তালিকায় শৈলেন্দ্রনাথ পালের নাম ঢুকাই[illegible] দেওয়া হয় এবং দাবীর ফর্ম্মে মৃত্যুর স[illegible]-ফিকেটও জুড়িয়া দেওয়া হয়। প্রথম আসামী ঐ ফর্ম্মে তাহার পিতা ডাঃ এ, এন পালের শীলও ব্যবহার করে এবং দাবী যে সত্য, তাহা প্রমাণ করে। কোম্পানী উহা বিশ্বাস করিয়া ঐ টাকার চেক দেয় এবং আসামীরা চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা উঠাইয়া লয়।

আসামীদের দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে, তৃতীয় আসামীর (কুমারকৃষ্ণ ঘোষ) নামে কোম্পানী ২০,০০০ টাকার একটী জীবন বীমা করা। মাত্র এক কিস্তির প্রিমিয়াম দিয়া আসামীরা তথাকথিত বিধবার (সুশীলা বালা দাসী) নামে ঐ টাকা দাবী করে এবং বালী মিউনিসিপ্যালিটীর মৃত্যু

তালিকায় কুমার কৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহার পর দাবীর ফর্ম্মে সুশীলার নামের জাল টিপসহি এবং বালীর বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নাম জাল স্বাক্ষর করি। উহা কোম্পানীকে পাঠান হয়। কিন্তু ইহাতে কোম্পানীর সন্দেহ হয় এবং পুলিশ তদন্তে প্রতারণা ধরা পড়ে এবং পূর্ব্বে যে ৫০০০৲ টাকা প্রতারণা করা হইয়াছে, তাহাও ধরা পড়ে। তখন আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তাহাদের তৃতীয় কার্য্য হইতেছে হুগলী জেলার রামনাথপুরের জনৈক যতীন্দ্রনাথ দাসের নামে গ্রেট ইষ্টার্ণ এসিওরেন্স কোম্পানীতে ১৫০০০৲ টাকার একটী জীবন বীমা করার চেষ্টা করা, কিন্তু কোম্পানী তদন্ত করিয়া ঐ বীমা গ্রহণ করেন নাই।

সুশীলাবালা দাসী সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ৩৭ নং শাঁখারিটোলা ইষ্ট লেনে বাস করেন এবং আসামী কুমারকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার স্বামী। তিনি আসামী সুরেশ পালকে চিনেন—সুরেশ তাঁহার ভাসুরের শ্যালক। তিনি বীমার কিছুই জানেন না এবং ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট তিনি কখনও ২০,০০০৲ টাকা দাবী করেন নাই। তাঁহার স্বামী মারা গিয়াছে বলিয়া তিনি ছোট আদালতে কখনও কোন বিবৃতি দেন নাই। তাঁহার স্বামী এখনও জীবিত। জীবন বীমার টাকা দাবী করার ফর্ম্মে তিনি কখনও কোন টীপ সহি দেন নাই।

মেসার্স জি পি রায় এডভোকেট, পি সি, বাগচী; এস, এন, ঘোষ (ইহারা সকলেই বালী বেঞ্চ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এন, এন, চাটুয্যে এডভোকেট, বালীর ডাক্তার কে, এন্ মুখুয্যে এবং বালার আরও কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক দাবীর ফর্ম্মে স্বাক্ষর করেন নাই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ঐ সমস্ত কাগজে তাঁহারা কখনও স্বাক্ষর করেন নাই এবং ঐ সমস্ত স্বাক্ষর জাল।

সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর মামলাটী হাইকোর্টে প্রেরিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার রায় বাহির হইয়াছে। বিচারপতি প্যাংক্রিজ এবং জুরীদের বিচারে সুরেশচন্দ্র পালের প্রতি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০০৲ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কুমার কৃষ্ণ ঘোষের প্রতিও ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। শিবকৃষ্ণ চাটুয্যে বেকসুর খালাস পাইয়াছে।

বীমা কোম্পানী প্রতারিতঃ—দুই বৎসর কাল মামলা চলিবার পর লাহোরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রামনাথ সুধরার বিচারে আসামী সাধু সিং, অমর সিং ও রামপ্রসাদের প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের এবং চন্দ্র সেন ও নাথ সেনের প্রতি দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে প্রকাশ যে আসামীগণ প্রতারণা পূর্ব্বক ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে ৩৫,০০০৲ টাকা এবং প্রুডেন্সিয়াল্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর নিকট হইতে ৩০,০০০৲ টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিল। আসামীগণ সাধু সিংকে গুরদিত সিং এই জাল নাম দিয়া নিজের জীবন বীমা করায় ও সে মারা গিয়াছে—এই মিথ্যা সংবাদ দিয়া টাকা আদায় করার অপরাধে দণ্ডিত হয়।

সান্ লাইফের কথা

সান্ লাইফের স্থানীয় ম্যানেজার মিঃ হেনরী :এফ, লিউইছ্ গত ১০ই অক্টোবরের ষ্টেট্‌স্ ম্যানে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে সান্ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ টি, বি, মেকলে ক্যানাডার জর্ণাল অফ্ কমার্সের সম্পাদক ও তথাকার পলিসি হোল্‌ডার্স্ এসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ জে, জে, হার্পেলের বিরুদ্ধে এক লাইবেলের মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের পাঠকগণ জানেন যে মিঃ হার্পেল গত কয়েক বৎসর ধরিয়া সান্ লাইফের কার্য্য কলাপ, ব্যবসা পরিচালনা পদ্ধতি এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জর্ণাল অফ্ কমার্স কাগজে নানারূপ ভয়াবহ সংবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন এবং সান্ লাইফের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বার বার চ্যালেঞ্জ করিয়া লিখিয়াছেন যে এই সকল সংবাদ যদি মিথ্যা হয় তবে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করার জন্য তাঁহার নামে আদালতে অভিযোগ করা হউক। এতদিন পরে সান্ লাইফের কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার নামে, বিলাতের "The City Mid Week" নামক এক সংবাদ পত্রের নামে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার "The Shilton News Agency"র নামে লাইবেলের মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

জর্ণাল অব কমার্সের এডিটর মিঃ হার্পেলের নাম বীমা জগতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সান লাইফের ব্যাপার লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীমা মহলে তিনি সুপরিচিত হইয়াছেন।

"The City Mid week" লণ্ডনের একখানি সাপ্তাহিক কাগজ। মেসার্স জার্ভি ও ম্যাক্‌লারেন নামক দুইজন এই সাপ্তাহিক সম্পাদন করিয়া থাকেন। ম্যাক্‌লারেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। জার্ভি ব্রিটিশ প্রেস এসোসিয়েসনের একজন মেম্বার; লড়াইয়ের সময় তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন এবং চারি বৎসরকাল (১৯১৪—১৮) যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধান্তে পুনরায় ব্রিটিশ প্রেস এসোসিয়েসনে যোগদান করিয়া সেখানে দুই বৎসর কাজ করেন, পরে "Glasgow Daily Record"এ এক বৎসর থাকেন এবং "Evening Standard"এ দুই বৎসর কাজ করেন। অতঃপর Old Hams Pressএ সাত বৎসর কাজ করেন। গত বৎসর ১৯৩১ সালে জার্ভি ও ম্যাক্‌লারেন একযোগে "City Mid week" বাহির করিয়াছেন। এদিকে জর্ণাল অফ্ কমার্সের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে City Mid week এর নামে এই লাইবেল আনার পর সান্ লাইফের ব্রিটিশ পলিসি হোল্‌ডারগণ সান্ লাইফ্ কোম্পানীর ব্রিটিশ ট্রাষ্টী রাইট অনারেবল্ রেজিন্যাল্ড ম্যাক্‌কেনাকে সান্ লাইফের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধান ও প্রশ্নজালে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সান্ লাইফের নিকট এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পাঠাইলে তাঁহাদের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলকে জানাইতেছেন যে এ বিষয়ে যখন মোকর্দ্দমা করা হইয়াছে তখন তাহার ফলাফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে।

ভারতের বহু লোক সান্ লাইফে জীবন বীমা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংবাদ জানার জন্য ভারতের বীমাকারী এবং বীমা সংস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে জর্ণাল অফ্ কমার্স পত্রিকায় সান্ লাইফের কার্য্যকলাপ ও তাহার ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট সংক্রান্ত নানা ব্যাপারের যে সকল ভয়াবহ বিবরণ বাহির হইয়াছে এবং উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের বারবার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও সান্ লাইফের কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহার এই প্রচারের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা না করায় সান্ লাইফের ভারতীয় বীমাকারীদিগের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে সান্ লাইফের কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করায় সকলেই ইহার ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। আমরা যেমন যেমন সংবাদ পাইব তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পাঠকদিগের গোচরে আনিব।

লাইট অফ্ এশিয়া

লাইট অফ্ এশিয়ার ক্রমোন্নতিতে আমরা পরম সুখী, কারণ ইহার নামের সহিত স্বদেশী যুগের বাংলার দানবীর সকল জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহায়, দেশের অকৃত্রিম এবং একনিষ্ঠ সেবক, পরলোক গত রাজা সুবোধ মল্লিকের নাম সংস্পৃষ্ট আছে। রাজার দেহান্তের পর লাইট্ অফ্ এশিয়া গতিহীন বদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় দীর্ঘকাল যাবত নিশ্চল ও থমথমাগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহার পর বিখ্যাত সাহিত্যিক, জননেতা ও সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্তের পুত্র 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বাংলার বিখ্যাত ব্যবহারজীবি, স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে হৃতসর্ব্বস্ব, পরলোকগত ৺ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র, প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত সমরেশ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতার এটর্ণী মহলে সুপরিচিত, সাধুতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ধীরেন মিত্র এবং কুচবিহারের পরলোকগত স্বনামধন্য দেওয়ান ৺কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের পুত্র, অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি লাইট্ অফ্ এশিয়ায় যোগদান করতঃ মরাগাঙ্গে বান ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই কোম্পানীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার কর্ম্মকর্ত্তাগণ অন্যান্য অনেক লিমিটেড্ কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগের ন্যায় দুই চারি খানা সেয়ার কিনিয়া কোম্পানীতে মোড়লী করিতে আসেন নাই। এইরূপ দুই চারিখানা সেয়ারের মালিক যাহারা, তাহাদের কোম্পানীতে কোনও state না থাকায় উহার ইষ্টানিষ্টের প্রতিও তাহাদিগকে প্রায়ই উদাসীন থাকিতে দেখা যায়। যদি কোম্পানীর ভাগ্যক্রমে উহার কাজ ভালমত চলে তবে ইহাদের "পোয়া বারো"; কিন্তু যদি আকাশে মেঘ ওঠে, তবে এই সব মোড়লেরা আগেই নৌকা ছাড়িয়া ঘর মুখো দৌড় দেন, কারণ stake ত মাত্র ওই দুই চারিখানা সেয়ার, যাহার

হয়ত মাত্র application ও allotment money দেওয়া হইয়াছে, তারপর call এর টাকা আর কে দেয়? সেটা ডিরেক্টরের ফি হইতেই সাধারণতঃ উস্থল হইয়া যায়। এই জন্য এদেশের লিমিটেড কোম্পানীগুলি যখন ঘোলার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খায় তখন তাহাকে বাঁচাইবার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কারণ সব অংশীই এইরূপ এক সেয়ার দুই সেয়ারের মালিক। তাহারা কেহ ইন্‌ভেষ্টমেণ্টের হিসাবে সেয়ার কেনে না, সকলেই ২।১ খানা সেয়ার কিনিয়া "পেট রিয়ট্" সাজে এবং ক্যান্‌ভাসারের হাত হইতে উদ্ধার পায়।

লাইট্ অফ এশিয়ার বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাগণ এইরূপ ছিটে ফোঁটা দিয়া মোড়ল সাজেন নাই। কোম্পানীর প্রায় সমুদয় মূলধনই তাঁহারা নিজে জোগাইয়াছেন. সুতরাং কোম্পানীর ইষ্টানিষ্টের সহিত তাঁহাদের জীবন মরণের সম্বন্ধ। লাইট্ অফ্ এশিয়ার কোনও ক্ষতি হইলে তাহার প্রথম এবং প্রধান আঘাত ইঁহাদের বুকেই বাজিবে. সুতরাং নিজেদের না মারিয়া ইঁহাদের পক্ষে অপরের অনিষ্ট করা অসম্ভব। লিমিটেড্ কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বভার যাহাদের হাতে ন্যস্ত তাঁহাদের কোম্পানীতে এইরূপ Substantial stake বা মোটা টাকা ন্যস্ত থাকা বীমাকারীদিগের পক্ষে কম নিরাপদের কথা নহে। সর্ব্বোপরি ইঁহাদের নিজেদের নাম, যশ, খ্যাতি প্রতিপত্তি সবই ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে। ক্রেডিট অনুষ্ঠান সমূহের ইহাই কষ্টি পাথর; এই পাথরে যতই কষিয়া দেখি ততই ইঁহাদিগের মধ্যে খাদহীন খাঁটি সোণার জলুস্ দেখিতে পাই। যাহাদের চোখ কান এবং বুদ্ধি বিবেচনা আছে তাহারা লাইট্ অফ্ এশিয়ার দাবী কখনও উপেক্ষা করিতে পারে না।

* * *

বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ও রিয়াল্ প্রপার্টি কোম্পানীর বর্ত্তমান পরিচালকদিগের তত্ত্বাবধানে কার্য্য বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ২নং চার্চ্চ লেনে আফিস স্থানান্তরিত হইয়াছে। নবগৃহে যাইয়া ইহাদের আরও শ্রীবৃদ্ধি হউক এই কামনা করি।

কলিকাতার বাজার দর

সোণা ও রূপা

৩১শে অক্টোবর, কলিকাতা

টাকশালের বার প্রতি ভরি		৩ ৸৵৬
বড়ালের	„	৩০৸/৬
চিনাপাত	„	৩ ৷০
রূপা প্রতি ১০০ পাইকারী		৫৬৷৷০
ঐ খুচরা		৫৫৸০

প্রসাদ দাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স ২৮ নং সোযালো লেন, কলিকাতা।

চিনির দর

দেশী চিনি

সুখচর দোবরা চিনি		১৮৷৫
„ একবরা	„	১৬৵৫
„ পেতে	„	১৪৷৷৫
„ চোফেরা		১৪৷৷৫
কোটচাঁদপুর দোবরা	„	১৮৲৫
„ একবরা	„	১৬৵৫
„ আকড়া বা দলুয়া	„	১০৲৫
„ গোঁড়		৮৷?, ৮৷৷৫
শান্তিপুর দলুয়া		১১৲৫, ১১৷৫
„ গোড়	„	৮৷৷৫
মুন্সিগঞ্জ দলুয়া	„	১১৷৷৫
„ মধ্যম আকড়া	„	১০৲৫
„ চাঁদি গোঁড়	„	৯৷৷৫
„ কমালালি	„	৮৷৫

কাণপুর চিনি

কাণপুর দানাদার ১নং		„	১০৷৷৵০
„	২নং	১০৲	১০৵০
„	৩নং	„	৯৸০
পিটি	১নং	„	১০৷০
„	২নং	„	১০৵০
„	৩নং	„	১০৲
ছাঁচি ইক্ষুজাত		„	১১৲৫
কাশীর চিনি		„	১ ৸০, ১১৷০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাঁ

২ বি, রামকুমার রক্ষিত লেন, বড়বাজার চিনিপটী, কলিকাতা।

ঘৃত

কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর

প্রতি মণ

শ্রী—	৬১৲
ভাবতী—	৫১৲
খুরজা—	৫৪৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪৯৲
লক্ষ্মী—	৪৮৲
বাঁদাসাগর—	৪১৲
গণ্টুর—	৪৬৲

শ্রীঅশোকচন্দ্র রক্ষিত লিঃ, ২৬নং কটন ষ্ট্রীট, ফোন ৭১১ বড়বাজার।

দেবলা দেবী	৬২৲
টেক্কা	৫২৲
পূর্ণচন্দ্র	৫৩৲
দেবভোগ্য	৫৬৲
জয় লক্ষ্মী	৪৭৲
সেকোয়াবাদ	৪৮৷৷০
সাগর (চাঁদা)	৪১৲
মটকী ঘৃত	৫৫৲

প্রোঃ অবিনাশচন্দ্র দত্ত। ৩নং বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আটা ও ময়দা

৩১শে অক্টোবর, কলিকাতা

প্রতি মণ

পেটেণ্ট ময়দা	৬৵০	হইতে	৬।০
সুপার ফাইন	৫৸৵০	"	৬৲
হাউস হোল্ড	৫৷৷০	"	৫৷৷৵০
সুজী	৫৸৵০	"	৬৲
আটা 'বি'	৫৷৷৴০	"	৫৸০
আটা ২নং	৫।৵০	"	৫৷৷০
আটা 'এস'	৫।০	"	৫।৵০
আটা 'ক'	৪৷৷৴০	"	৪৸০
আটা ৩নং	৩৷৷০	"	৩৷৷৵০
পোলার্ড	২৴০	"	২৵০
ব্র্যান	২৲	"	২৴০

এই সকল ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই দর দেওয়া হইল।

কাশিম ও ইস্‌মাইল—ময়দার দোকান ৫।২, গার্ষ্টিন প্লেস, কলিকাতা।

মদনমোহন কোং বালতীর দর

	৭"	৮"	৯"	১০"	১১"	১২"	১৩"	১৪"
হনুমান মার্কা			১।০	২।০	৩।০	৪।০	৫।০	৬।০

তাজমহল ১৷৷৵০ ২৷৷৵০ ৩৷৷৵০ ৪৷৷৵০ ৫৷৷৵০ ৬৷৷৵০ ৯৲ ১১৲

রেডক্রশ ২৷৷০ ৩৲ ৪৲ ৫৲ ৬৲ ৭৲

ঈগল ৩৲ ৩৷৷০ ৪৷৷০ ৫৷৷০ ৬৷৷০ ৭৷৷০ ১০৲ ১২৲

মদনমোহন কোং

১ বি, রামরতন বসু লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা।

চাউলের দর

দাদখানি			৮৷৷০
কাটারিভোগ	৫।৵০	হইতে	৫৷৷০
বাদসা ভোগ	৫৲		৫।০
মাজারাঁকতুলসী (সরেস)	৫৷৷০		৫৸০
ঐ কোরা	৪।০		৪৷৷০
ঐ আতপ	৫।০		৫৷৷০
ভাসা মাণিক	৪৵০		৪ ০
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল	৩৸০	"	৪৲
পাটনাই (সরেস)	৩৸৵০		৪৲
কলমা			৩৷০
ছাটা বালাম ১নং	৪৮১	"	৫৲
ছাচি মোটা	২৸৵০	"	৩৲

বঙ্গলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

করগেট ও লোহা

৩১শে অক্টোবর, কলিকাতা

করগেট	চাদর	২২	গেজ	১২।০	হন্দর
"	"	২৪	"	১১।০	"
"	"	২৬	"	১৩।০	"

জয়েষ্ট বা কড়ি	৪।৵০—৬।৵০
টী বা বরগা	৫৵০ „ ৬৵০
এঙ্গেল	৫৴০ „ ৬৴০
বোল্ট [গোল]	৪৵০ „ ৭৵০
„ [চৌকা]	৪৴০ ৭৴০
কাঁটা তার	১০৸০
মটকা ॥৴০ হইতে ১।৵০ প্রত্যেকটী	

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা

ফোন, কলিঃ ৬৬৪

ধাতু ও রং

৩১ শে অক্টোবর, কলিকাতা

ব্লক টিন বা রাং	১২৮॥০	
তামার ইনগট	৩৭।৵০	„
সীসার বাট, বি এম, ছাপ	১২৸৴০	„
ঐ ঐ দেশীয়	১২।০	„
এ্যান্টিমনি	২৭॥৵০	„
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৯৮।০	„
পিতলের ছড়	৩৫৵০	„
তামার চাদর	৫০।৵০	„
তামার ছড়	৫৩।৵০	„
সীসার চাদর	১৭৸০	„
দস্তার টাল আমদানী	১২॥৴০	„
ঐ দেশীয়	১২।০	„
সাদা দস্তা রং	৩৫।৵০	„
সাদা সীসা রং	১৮৸৵০	„
সবুজ রং	১৯।৴০	„
লাল রং	১২॥০	„
তারপিন তৈল	১৭৵০	
তিসির তৈল [পাকা]	৯।৵০	
ঐ ঐ [কাঁচা]	৮৲০	„
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৬॥৵০ প্রতি টন	
ঐ আমদানী	৯৸০ প্রতি পিপা	

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ

৮৬।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা।

কলিকাতা ২৮শে অক্টোবর

টাটা—		প্রতি হন্দর
কড়ি মার্কা ৪৸০ হইতে	৫৸০	
ঐ বে-মার্কা ৪৲ „	৪৸০	„
বরগা ৫৵০ „	৫৸০	„
এঙ্গেল ৫৲ „	৫॥০	„
বল্টু (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ)	৫।০ হইতে ৫৸০	
গরাদে ঐ	৫।০ „ ৫৸০	
ব্ল্যাক সিট ও প্লেট	৫।০ „ ১১।০	
করগেট (২২ গেজ)	১১॥০ হইতে ১৩৲	
„ (২৪ গেজ)	১১৵০ „ ১১৸০	
গ্যালভেনাইজড চাদর (২৪ গেজ)	১৩॥০	
কন্টিন্যাণ্টাল :—		প্রতি হন্দর
(গোল রড ও সুতা ও নিম্ন)	৪৲ হইতে ৫৲	
টানা রড ঐ	৪৲ „ ৬৲	
করগেট টিন (২৬ গেজ) ১২॥০	„ ১৪॥০	
গ্যালভেনাইজড চাদর (২৬ গেজ)	১২॥০ হইতে ১৩॥০	
কাঁটা তার	৯॥০	

কন্টিন্যাণ্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

ইংলিশ— প্রতি হন্দর

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল ও বৃটিশ মালের দাম উপরোক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ২৲ টাকা হইতে ৩৲ অধিক।

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১৩।৵০

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিঃ ৫৯৪৫।

সূচীপত্র

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৯শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৩৯ { ৮ম সংখ্যা

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

শক্তিশালী কষ্টিক সোডিয়ম্ যোগে Saponification করিবার নূতন উপায়।

যাহারা সাবান নির্ম্মাণ করিতে যাইয়া নির্ম্মাণ প্রণালীর অনুসরণ করেন না, তাহারা পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্ত (full boiled) সাবান তৈয়ার করিতে গেলে বাষ্পযুক্ত আধারের সাহায্যে প্রথমতঃ কিংবা [illegible] সাহায্যে উত্তপ্ত করিয়া Saponification এর কার্য্য সমাধা করে। তেল এবং চর্ব্বির মধ্যে কষ্টিক সোডা লাই দিয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। কার্য্যের প্রথম দিক দিয়া উহার শক্তি বেশী না থাকিলেও যখন সাবান নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসে তখন উহার শক্তি বেশ বাড়িয়া যায়। ইহার সঙ্গে ৩।৪ বার অ্যালকালি সংযোগ করা হয়, শেষে পরে দেখা যায় যে কিছু বেশী পরিমাণে ফ্রি কষ্টিক সোডা রহিয়া গিয়াছে। শক্তিশালী লাই প্রারম্ভের দিকে ব্যবহার করা হয় না; কেন না, অনেকের ধারণা যে উহাতে Saponification এর ব্যাঘাত জন্মে। সমস্ত অ্যালকালিও একসঙ্গে ব্যবহার করার দস্তুর নাই।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে সাবান প্রস্তুত করিতে গেলে কয়েকটী বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত করিতে হইবে। কেন না, প্রত্যেক স্তর-নির্ম্মাণ শেষে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে লাই'এর কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে; কাজেই তেল এবং

চর্ব্বী সংযোগে সমস্ত স্তরের কার্য্য শেষ করিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগিয়া যায়। ইহাতে জ্বালানী খরচও বেশী হয় ইহার পেছনে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জার্ম্মাণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিলে সময় অনেক কম লাগে; কাজেই জ্বালানী খরচও অনেক কমিয়া যায় এবং বেশীক্ষণ থাকার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস হইয়া আসে। একটা নির্দ্ধারিত পরিমাণের তেল এবং চর্ব্বীর সংমিশ্রণকে Saponify করিবার জন্য যে শক্তিশালী কষ্টিক সোডা লাই দিতে হয়, তাহা হইতে একটু বেশী লওয়াই এক্ষেত্রে প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উহাতে Steam Coil যুক্ত একটা পাত্রে জ্বাল দিয়া তেল এবং চর্ব্বী সংযোগ দিতে হইবে। প্রথম দিক দিয়া ইহার ফল খুব ভালই হয়; কিন্তু তেল যতই কষ্টিক সোডা নিঃশেষ করিতে থাকে, ততই লাই'এর শক্তি কমিয়া আসিতে থাকে। বস্তুতঃ শেষাংশে পূর্ব্বোক্ত বর্ণিত প্রণালীর চেয়ে বেশী সময় লাগিয়া থাকে।

তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উভয় পন্থাতেই লাই শেষ পর্য্যন্ত অ্যাল্কালিন থাকিবে; নতুবা Saponify করিবার উপযুক্ত চর্ব্বী সাবানে রূপান্তরিত হইবে না। যে অল্প পরিমাণ ফ্রি কষ্টিক সোডা ব্যবহৃত সুরাভাগে থাকিয়া যায়, তাহার আর কোন সদ্গতি হয় না। ইহা মূল্যবান জিনিষের অপব্যয়; কাজেই জ্বালানী এবং বেশীক্ষণ সময় কার্য্যস্থলে বসিয়া থাকার সঙ্গে যদি এই খরচের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে কার্য্যশেষে দেখা যাইবে যে সাবানের মূল্য বাড়াইয়া না দিলে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে।

এই দিক দিয়া কোন সুবিধা করা যায় কিনা, সেইজন্য Industrial Research Laboratoryতে পরীক্ষা সুরু করা গিয়াছিল; পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইয়াছিল বলিয়াই ধারণা হইতেছে। ইহাতে সময় কম লাগিবে, সাবান সুন্দরও হইবে এবং ব্যবহৃত সুরাভাগের কষ্টিক সোডা কার্য্যে লাগানো যাইবে। আরো একটা বিশেষ সুবিধার কথা এই যে ইহাতে যে কোন আকারের প্রত্যক্ষ তাপ প্রাপ্ত প্যানে কাজ করিলেও সাবানের গুণ এবং বর্ণের কোন প্রকার হানি হইবে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ষ্টীমের তাপ প্যান উত্তপ্ত করিয়া যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহার সমুদয়ই আদায় হইতেছে। উন্নততর ধরণে কাজ করিতে হইলে বেশী পরিমাণে কষ্টিক সোডা শক্তিশালী সলিউসনে মিশ্রণ করিতে হইবে; নিম্নে উহার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

সাবান জ্বাল দিবার পাত্রে শক্তিশালী কষ্টিক সোডা লাই লও। বিভিন্ন তেল এব চর্ব্বীর অনুপাত এবং ওজনের উপরই লাইয়ের শক্তি এবং ঘনত্ব নির্ভর রিবে। যদি নারিকেলের তৈলের অল্পাংশ ব্যবহারের জন্য লওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত তৈল এবং চর্ব্বীর অনুপাতে কষ্টিক সোডার ভাগ ২৩ পার্সেণ্ট হইবে নারিকেল তৈলের ভাগ যদি আরো বেশী করা হয়, তাহা হইলে কষ্টিক সোডার শক্তি ১৮ পার্সেণ্টে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। কষ্টিক সোডা লাই ঢালিয়া দিলেই প্যানে উত্তাপ দিতে হইবে; যখন উক্ত পদার্থটী ফুটিতে থাকিবে তখন তৈল এবং চর্ব্বীর সংমিশ্রণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। উহা খুব ধীরে ধীরে ঢালিতে হইবে, নতুবা কড়া সাবান তৈয়ারীর মালগুলির ফুটন্তভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। জমানো জিনিষগুলির মধ্যে তৈল ঢালিয়া দিলেই উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের আকারে উঠিতে থাকিবে.

Saponification এর কার্য্যও খুব তাড়াতাড়ি চলিতে থাকিবে। খুব বেশী শক্তিশালী লাই ঢালিয়া দিলে তৈলে তৎক্ষণাৎ দানা বাঁধিয়া উঠিবে এবং উহা বেশী unsaponified তৈল গ্রহণ করিতে থাকিবে; কিন্তু নিস্তেজ লাই'এর ব্যবহারে উৎলাইয়া উঠিবার ভাব হ্রাস পাওয়ায় ফলও তেমন চটকদার হয় না। উপরোল্লিখিত নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যেক ধরণের সাবানে লাই'এর শক্তি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। ইহা অল্প সময়ের মধ্যেই জিনিষটি Saponified হইয়া আসিবে। কেবলমাত্র একটী ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল যে তিন ঘণ্টা জ্বাল দেওয়ার পর সাবানে ৩ পার্সেণ্ট Unsaponified চর্ব্বী রহিয়া গিয়াছিল। জ্বাল দেওয়া শেষ হইয়া গেলে পর, সাবানকে লাই হইতে তফাৎ করিয়া নিয়া শেষোক্তটীকে পাত্র-তলস্থ বহির্গমনের পথ দিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে।

উপরে যে সাবানের কথা লেখা হইল, তাহাকে বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে Grained কিংবা Settled Soap এ রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

যেখানে বেশী টাকা কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা সম্ভবপর নহে, সেখানে কড়ায় প্রত্যক্ষ তাপ দিয়া কাজ সুরু করা যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তৈল সর্ব্বদাই লাই'এর উপর ভাসিতে থাকে প্যানের তলায় উহা আদৌ যায় না। কাজেই যদি সাবানে অত্যধিক তাপ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রঙের কোন প্রকার বিপর্য্যয় হইবে না। পাত্রের সাবান এবং ব্যবহৃত সুরাসারের বহির্গমনের পথ থাকা দরকার। যদি সর্ব্বদাই পাত্রের মধ্যস্থলে ক্রমাগত উত্তাপ পাইতে থাকে, তাহা হইলে কড়া শীঘ্রই অকেজো হইয়া পড়িবে। কাজেই কড়াটীকে চতুষ্কোণাকার করিয়া, তলপ্রদেশ চেপ্টা এবং নিম্নের কোণগুলি ঢালু করিয়া সেখানে বহির্গমনের পাইপ বসাইবে; উহা প্রখর উত্তাপের সীমানা হইতে বাহিরে থাকিবে বলিয়াই উহার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত হইবে। তবে ষ্টীম ব্যবহার করিলে, পাত্র সাধারণ আকারের হইলেই চলিবে।

সাবান উৎলাইবার পাত্র হইতে যে অল্প ব্যবহৃত লাই ফেরৎ পাওয়া যায়, তাহাতে অনেক শক্তিশালী কষ্টিক সোডা থাকে এবং উহা দ্বারা তৈল এবং চর্ব্বিকে আবার Saponify করা চলে। একটী বিভিন্ন পাত্রে এই আংশিক ব্যবহৃত কষ্টিক লাই'কে নূতন তৈল এবং চর্ব্বীতে ফলা যাইতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে Saponification করা নহে, অ্যালকালির পুনরুদ্ধার করা। এই লাই'তে সম্পূর্ণরূপে Saponify করিবার উপযুক্ত যে অ্যালকালি থাকে তাহা হইতে বেশী পরিমাণ তৈল এবং চর্ব্বী যোগ করিলে সমস্ত অ্যালকালির অংশ আদায় হয়। ইহার শক্তি নেহাৎ কম থাকে না; কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা তৈল কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। জিহ্বা কিংবা অন্য কোন রকমে পরীক্ষা করিয়া যখন দেখা যাইবে যে আর ফ্রি অ্যালকালি নাই, তখন আংশিকরূপে Saponified Chargeকে লবণ দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে নূতন তৈল এবং চর্ব্বীতে Saponification করা শেষ হইয়া আসিলে, উপরোক্ত আংশিক Saponified Charge-কে প্রথম প্যানে লইয়া আসিতে হইবে; ইহার শেষ ফল এই দাঁড়াইবে যে আমরা একটী সম্পূর্ণরূপে Saponified করা সাবান পাইব।

আংশিকরূপে ব্যবহৃত কষ্টিক লাইয়ের পরিবর্ত্তে চর্ব্বী এবং তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলি যাহাতে উপস্থিত কষ্টিক সোডা দ্বারা Saponified হয়, সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। অ্যালকালি একটু বেশী রাখা ভাল; তাহা হইলে সম্পূর্ণ Saponification সম্বন্ধে কোন দ্বিধা থাকিবে না। এই প্রণালী উপরোল্লিখিত জার্ম্মাণ প্রণালীর অনুরূপ; কাজেই তাড়াতাড়ি ফল লাভ করিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। ব্যবহৃত সুরাসারে যে অ্যালকালি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা দিয়া বর্ণ কিংবা গন্ধ-বিশিষ্ট তৈলকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিম্নস্তরের তৈল এবং চর্ব্বীকে সংশোধিত করিবার জন্য মূল Saponification-এর আংশিক ব্যবহৃত কষ্টিক লাই কাজে লাগানো যাইতে পারে। ইহাতে তৈলের অবিশুদ্ধ ভাগের বেশী অংশই, বিশেষতঃ বর্ণের ভাবটা, দুরীভূত হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এইরূপ ধরণের তৈল এবং চর্ব্বী হইতে উৎপন্ন সাবান প্রথম কড়াস্থ মূল জিনিষগুলিতে মিশ্রিত হইবার পূর্ব্বেই, উপরোক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কাজেই এ বিষয়ে শঙ্কাকুল হইবার কোন কারণ নাই।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে আমরা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাইতেছি।

(ক) খুব শক্তিশালী কষ্টিক মিডিয়ামে Saponification আরম্ভ এবং শেষ হয়। ইহাতে সাবান লাই হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে থাকে। তৈল ফুটিবার সময় অবিশুদ্ধ জিনিষ স্বতন্ত্র হইয়া যায়; কাজেই উহা আর সাবানে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায় না। বস্তুতঃ ডাইলুট কষ্টিক লাই দিয়া বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে গন্ধ এবং বর্ণের যে হ্রাসসাধন করা হয়, ইহাতে সেই প্রচেষ্টা আরো বেশীদূর পর্য্যন্ত যায়।

(খ) এই কাজ সমানে চলিতে থাকে; কাজেই ব্যবহৃত লাই হইতে সমস্ত কষ্টিক অ্যাল-

কালি বাহির করিয়া না আনা পর্য্যন্ত উহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয় না। ইহাতে কষ্টিক সোডার কোন প্রকার অপব্যয় হয় না; কাজেই জিনিষ প্রস্তুত করিবার দামও অপেক্ষাকৃত সুলভ হয়।

(গ) Saponificationএর কাজ সম্পূর্ণ করিবার জন্য সময় খুব কম লাগে; কাজেই জ্বালানী এবং পরিশ্রম বাবদ অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়।

(ঘ) যে সমস্ত পাত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে তাপ দেওয়া চলিতে পারে, তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। পাত্রের আকার ইচ্ছানুসারে বৃদ্ধি করা যায়; কেন না, ইহাতে অত্যধিক তাপ পড়িবার সম্ভাবনা নাই, পড়িবারও কোন প্রয়োজন পড়ে না। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সাবান পাত্রের তলার দিকে আদৌ যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, ফ্যাক্টরী যত বড়ই হউক না কেন, উহার সমস্ত মালকে উপযুক্ত আকারের একটী পাত্রেই Saponify করা যাইতে পারে। একটী চুল্লী রাখিতে হইবে এবং উহার যতগুলি অগ্নিদ্বার রাখা প্রয়োজন, তাহাও রাখিবে।

(ঙ) উচ্চ শ্রেণীর সাবান নির্ম্মাণের জন্য মালগুলিকে বারেবারে ফুটাইবার যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, এক্ষেত্রে তাহার আদৌ দরকার নাই। শক্তিশালী কষ্টিক লাই ব্যবহার করিলে একবার কিংবা বড় জোর, দুইবার উৎলাইয়া লইলেই Saponificationএর কার্য্য সমাধা হইল।

তাঁতের ব্যবসা ও ট্যারিফ বোর্ডের তদন্ত

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন যন্ত্রসভ্যতার যুগ ইউরোপে ও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দেশে কায়েমী হইয়া বসিল, তখন হইতেই ধনের বিভাগে যে অসাম্য দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা জাতিভেদের যতই নিন্দা করি না কেন, পৃথিবী জুড়িয়া যে বিরাট অর্থ-কৌলিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এবং জগতের অশান্তি এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, একবার কড়া হাতে রশ্মি টানিয়া ইহার অগ্রগতি থামানো দরকার, নতুবা হয়তো ইহা একদিন বর্তমান সভ্যতাকে চূর্ণ করিয়া দিবে। কমিউনিষ্টদের আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, তাহাদের মূলনীতি যে ক্রমশঃ মানবজাতির নিম্নস্তরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আর হইবেই বা না কেন? শ্রমজীবিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিনান্তে আট আনা দশ আনার বেশী উপায় করে না; কিন্তু যাহারা কলের মালিক তাহারা একবিন্দু পরিশ্রম না করিয়াও কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রমজীবিরা আজ এই প্রশ্ন তুলিতেছে যে, কলের মালিকদের এত অর্থের উপর সত্য সত্যই এত বেশী দাবী আছে কি না; যাহারা মাল উৎপাদন করিতেছে, ব্যবসায়ের লাভের উপর কি তাহাদের কোনই স্বার্থ থাকিবে না? তাহারা শ্রীকৃষ্ণের গীতান্তর্গত নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যাখ্যা এইখানে একেবারে ওলোট পালোট করিয়া দিতে চায়। কেননা জগতে প্রথম কথাটি হইতেছে "**বাঁচিয়া থাকা**"। যদি অর্থনৈতিক অসাম্যের উপর গঠিত বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের বাঁচিবার উপায় কি? তাহাদিগেরও পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, সম্ভবমত একটু আরাম ও আনন্দও চাই ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণের জন্যই আজ পৃথিবী জুড়িয়া এই প্রশ্নটি বিভিন্ন আকারে নানাস্থানে দেখা দিয়াছে। যাহারা কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়া পরম নিশ্চিন্তে সময় কাটাইতেছেন ও যাহারা দিনান্তে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও ব্যক্তিগত আর্থিক দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না, তাহাদের অসাম্য দূর করিবার জন্য চিন্তাবীরেরা উপায়

নির্দ্ধারণ করিতেছেন। নতুবা বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য যদি কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মানবজাতির সভ্যতাকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইবে।

অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও অর্থনৈতিক অসাম্যের সূত্রপাত হইয়াছে। কলের মালিকগণ যেমন কোটি কোটি টাকার সংস্থান করিয়াছেন, শ্রমজীবিদের অবস্থা আবার তেমনি শোচনীয়। অন্যান্য দেশের কলওয়ালাদের চেয়ে নানান্ কারণেই আমাদের দেশের কলের মালিকগণের অবস্থা ভালো নহে, তথাপি অর্থনৈতিক পার্থক্যের মূল সুর একই খাদে প্রবাহিত হইতেছে। এখানে কলওয়ালাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক দাসত্বের জন্য যত প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে হয়। এখানকার ট্যাক্স, সেস্, বিনিময় হার বিদেশী প্রভুদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হয়। কাজেই, অন্যান্য দেশের কলের মালিকগণ যে সুবিধায় কাজ করেন, এখানে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ।

এই অসাম্য দূর করিবার জন্যই মহাত্মা গান্ধী চরখা, তাঁত প্রভৃতির উপর এত জোর দিয়াছেন; কেননা, মানুষের অর্থনৈতিক পরাধীনতা না ঘুচিলে কোন জাতি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে মিলের প্রয়োজন নাই, একথা আমরা বলি না—প্রত্যেক জেলায় জেলায় কল হউক, ইহাই আমরা কামনা করি। কিন্তু তাহাতে যেন অর্থ নৈতিক বৈষম্যের ভাব বৃদ্ধি না হয়, ইহার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর মত আমরা তাঁত ও চরখাতে এত বিশ্বাসবান না হইলেও, প্রশ্নটী এইদিক হইতে বিচার করিলে, তাহার সমাধানই যে সহজ ও সুন্দর, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের দেশে তাঁতের প্রচলন আবার বাড়িয়া চলিতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। স্বদেশী ও বিদেশী বিরাট মিল ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াও যে ইহাদের অস্তিত্ব আজিও বজায় আছে, তাহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় তাঁতে ৭৮৪ মিলিয়ন গজ কাপড় প্রস্তুত হইত; ১৯৩০ সনে প্রস্তুত হইতেছে ১৩৫৫ মিলিয়ন গজ—এই ৩৪ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের লোকের স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা লওয়া যে ইহার একটী প্রধান কারণ, তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই ১১০০টী স্থলে একলক্ষ তাঁত চলিতেছে, উৎপন্ন মালের দামও ন্যূন পক্ষে ৪॥ কোটি টাকা। যদি আমদানী কাপড়ের উপর বিশেষ শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে তাঁতের কাজেও অনেক সুবিধা হয়; কিন্তু তন্তুর উপরে করধার্য্য করিলে তাঁতিদের পক্ষে উহা মারাত্মক হইবারই কথা বেশীরভাগ তাঁতিই ২০ হইতে ৪০ নম্বরের দেশী ও বিদেশী সূতা ব্যবহার করিয়া থাকে।

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে আমদানী তুলার উপরকার শুল্ক যদি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সূতার দাম কমিয়া যাওয়ার জন্য তাঁতিদের প্রত্যেকের আয় দৈনিক দুই আনা করিয়া বাড়িয়া যাইবে, এবং ইহা প্রয়োজনীয়ও বটে; কেননা আমরা দেখিতেছি, যে-সমস্ত কাপড় নির্ম্মাণে মিলের সঙ্গে তাঁতের প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাঁতগুলি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে, শতকরা ৬০ ভাগ হ্রাস হইয়াছে। যেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার

আশঙ্কা নাই সেখানে তাঁতিদের আয় বজায় রহিয়াছে। বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, এই শিশু-ব্যবসাটিকে রক্ষা করিতে হইলে ষ্টেটের কিছু আর্থিক সাহায্য করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে ; এতদিন পরে গভর্ণমেণ্টের হঠাৎ ‧ কথা মনে পড়িয়া গেল কেন, তাহা একটু সন্দেহের বিষয় বটে। ইহা তাঁতিদের দুঃখে 'কুমীরের অশ্রুপাত' না হইলেই আনন্দের বিষয় হইবে। লোক যাহা কানাকানি করিতেছে আমরা তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র—

তাঁতীদের কল্যাণের ধূয়া ধরিয়া হয়তো লোক বলিতেছে যে ল্যাঙ্কাশায়ারের একটু সুবিধা করিয়া দিবার ইহা ভিন্ন আর প্রকৃষ্ট পন্থা নাই, সেই জন্যই এতদিন পরে গভর্ণমেণ্টের তাঁতিদের কথা মনে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উহার উপরকার আমদানী শুল্ক রহিত করিয়া নিলেই বিদেশী পণ্য দামোদরের বন্যার মত আসিয়া দেশী মিলগুলির তন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্র আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতে পারে। তবে গভর্ণমেণ্ট যে সত্য সত্যই এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই কাজ করিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই ; ইহা শুধু সাধারণের অনুমান মাত্র গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁতিদিগকে সাহায্য করিবার জন্য হঠাৎ ব্যাকুল হইয়াই থাকেন, তাহা হইলে অন্য একটি পন্থা নির্দ্ধারণ করাই বোধ হয় ভাল ছিল ; যাহাতে, তাঁতি এবং কলের মালিক কাহারো কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু বিদেশী তন্তুর উপর শুল্ক বজায় থাকিত। তবে ইহা মন্দের ভাল যে, সিল্কের কাপড়ের উপর এবং সূতার উপর যথাক্রমে ৫০ এবং ১৮৳ পার্সেণ্ট শুল্ক বহাল রহিয়াছে। তাহাতে মিলগুলির একটু সাহায্য হইবে

গভর্ণমেণ্টের বিদেশী সূতার উপর হইতে ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়ার মূল সুর আরো পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মিঃ অ্যাডভানীর সাক্ষ্যে। তিনি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার তিনি ২৫শে আগষ্ট তারিখে (১৯৩২) ট্যারিফ বোর্ডের সম্মুখে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে ভারতীয় মিলে প্রতি পাউণ্ড সূতার উপর তিন পাই করিয়া সেস্ বসান হউক। ইহা হইতে যে আটলক্ষ টাকার মত আয় হইবে, তাহা "তাঁতিদের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য" ব্যয় করা হউক।

মিঃ অ্যাড্ভানী দেশী মিলের সূতার উপর পাউণ্ড প্রতি এক পয়সা শুল্ক বসাইতে চাহিতেছেন এবং শুল্কলব্ধ টাকাটা তাঁতীদের উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে বলিতেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বিদেশী সূতার উপর যে শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে তাহা তুলিয়া দিতে বলিতেছেন। এইখানেই গভর্ণমেণ্টের সরলতার প্রতি লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। আমরা দেশী বিলাতী সকল রকম capitalist exploitation এর বিরোধী ; মিলের প্রতিযোগিতায় লক্ষ লক্ষ তাঁতী যে নিরন্ন হইয়া বেকার বাহিনীর সৃষ্টি করিতেছে এবং ক্রমে ধ্বংসের মুখে চলিতেছে তাহা রোধ করিতে হইলে তাঁতিদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দেওয়া উচিত। দেশী মিল সমূহ স্বদেশী যুগের প্রারম্ভ হইতে বছর বছর যে পরিমাণ ধনসঞ্চয় করিতেছে তাহার কিয়দংশ তাঁতীদের কল্যাণে প্রদত্ত হওয়া উচিত এবং সেইজন্য এইরূপ একটা সেস্ বসানও উচিত ; কিন্তু এই ধূয়ায় যদি বিদেশাগত সূতার উপর আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হয় তবে দেশীমিলগুলি বিদেশী মিলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে পারিবেনা এবং তাহাদের লাভ হওয়াত দূরের কথা, লোকসান খাইয়াই মারা যাইবে। একদিকে

বিদেশী মিলের প্রতিযোগিতায় লোকসান খাইবে, আবার পাউণ্ড পিছু একপয়সা হিসাবে শুল্ক দিবে —এই ডবল চাপে মিলগুলির বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তার চেয়ে বিদেশী সূতার উপর যে রক্ষাশুল্ক আছে তাহা অটুট থাকুক। কিন্তু এইরূপ রক্ষাশুল্কের সহায়তায় দেশীমিল সমূহ যে পরিমাণ লাভ করিতেছেন তাহার কণিকা মাত্র নিজের দেশের তন্তুবায়কুলকে রক্ষা করিবার জন্য দিতে প্রস্তুত হউন এবং আনন্দের সহিত মিঃ অ্যাডভানীর এই প্রস্তাবে রাজী হউন। নচেৎ সাদা ধনীদের আর্থিক অত্যাচার এবং নির্ম্মম পেষণের হাত হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশী কালা ধনীদের পেষণের চাপে দেশের এবং জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এক একটা শ্রেণী তাহাদের লক্ষ লক্ষ লোক সহ তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে, এদৃশ্য অসহ্য !

মোহিনীমিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহিনীমোহনের জীবনী

ব্যক্তিগত জীবনে মোহিনীমোহন যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুসরণীয়। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি কখনও অহঙ্কার বা ক্রোধের বশীভূত হইতেন না। তাঁহার ধর্ম্মলিপ্সা চিরদিনই বলবতী ছিল। তিনি সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং দেব-দ্বিজে যথেষ্ট ভক্তিমান্ ছিলেন। এমন কি ইষ্টমন্ত্র জপ না করিয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহা পালন করিতেন কিন্তু ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও আড়ম্বরকে ঘৃণা করিতেন। তিনি জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অতীত ছিলেন। তাঁহার নিজের বেশভূষা সামান্যই ছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসিলেও তিনি বিলাসিতা ভালবাসিতেন না। তাঁহার বাবুগিরি আদৌ ছিল না। এমন কি কেহ তাঁহাকে কখনও কেশের পারিপাট্য সাধন করিতে দেখেন নাই। তাঁহার জীবনটাকে তিনি যেন সহজ সরল করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের কোনও অনাবশ্যক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বা বিলাস চরিতার্থতা হেতু তিনি কখনও অর্থ নষ্ট করেন নাই। তিনি উপযুক্ত দানে মুক্তহস্ত ছিলেন—কি বিদ্যার্থী, কি গৃহহীন, কি নিরন্ন, কি কন্যাদায়গ্রস্ত, কি বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি যিনিই যখন তাঁহার নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনিই তাহা লাভ করিয়াছেন। মোহিনীমোহন আর্ত্তের বন্ধু এবং অজাতশত্রু ছিলেন।

আরায় অবস্থান কালে মাতারাম কাহার নামক তাঁহার জনৈক ভৃত্য দুরারোগ্য বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মোহিনীমোহনের হৃদয় যেরূপ গভীরভাবে আলোড়িত হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কঠিন ব্যাধির কবল হইতে মাতারামকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে সুদক্ষ ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং তাহার পথ্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়া, চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও, সংক্রামতাভয়ে আদৌ ভীত না হইয়া মাতারামের শুশ্রূষার জন্য অবসর সময়ে আপনাকে এবং অন্য সময়ে তদীয় একাদশবর্ষবয়স্ক প্রাণাধিক পুত্রকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের ও প্রাণপ্রিয় পুত্রের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও মাতারামকে বাঁচাইতে পারিলেন না।

মোহিনীমোহনের গুণরাশির মধ্যে সংযম ও নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাহাই তাঁহার দীর্ঘজীবনলাভের প্রধান কারণ। তিনি মিতাহারী ছিলেন। ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তির অনুপাতে যখন যে খাদ্য যে পরিমাণে আহার

করা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই নিয়মিত সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আহার করিতেন। খাদ্য যতই উপাদেয়, রুচিকর বা লোভনীয় হউক না কেন তদতিরিক্ত কোন দ্রব্যই তিনি আহার করিতেন না। কোন মাদক দ্রব্যের, এমন কি পানতামাকের সহিতও তাঁহার জীবনে কখনও পরিচয় হয় নাই। তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অনুসারে যখন যেটুকু পরিশ্রম করা আবশ্যক তাহা তিনি করিতেন এবং নিয়মিত ভ্রমণে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তাঁহার

বার্দ্ধক্যে মোহিনী মোহন।

নিজের একটি পুস্তকালয় ছিল। তিনি জ্ঞান ও গবেষণামূলক পুস্তকাদি এবং সংবাদপত্র নিয়মিতরূপে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন এবং সময়ের মূল্য এতই বুঝিতেন যে জীবনের একটি মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা যাইতে দিতেন না। তিনি অতীব সংযমী ছিলেন।

কোনও সময়ে সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক কর্ণেল ক্রিয়ারের ব্যবস্থানুসারে রোগপ্রশমনার্থ তিনি অহিফেনসংযুক্ত ঔষধ অনেক দিন যাবৎ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন। পরে অন্য কোন ব্যাধির চিকিৎসার্থ খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনানের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলেন যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দ্বারা তাঁহার রোগ আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু ঔষধের সহিত তিনি যে অহিফেন ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হইবে না এবং তাঁহার দেহে হোমিওপ্যাথিক

ঔষধের কোন ক্রিয়াও হইবে না। মোহিনীমোহন ডাক্তার ইউনানের ঐ কথা শুনিবামাত্র একটু হাসিয়া বলিলেন —

"আমি কোন অভ্যাসের দাস নহি, অহিফেন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে আদৌ অসম্ভব বা কঠিন নহে। আমি এই মুহূর্ত্তেই উহা পরিত্যাগ করিলাম"।

তদবধি মোহিনীমোহন জীবনে আর কখনও অহিফেন বা অহিফেনসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। বলা বাহুল্য ডাক্তার ইউনানের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ ব্যবহারে ইপ্সিত ফললাভ করেন। মোহিনীমোহন স্থূলকায় ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি শালপ্রাংশু মহাবাহু ছিলেন। তাঁহার দেহ সর্ব্বথা কর্ম্মঠ ছিল। তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু কখনও স্থবির হয়েন নাই। তিনি কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও যে সুদীর্ঘকাল জীবিত ও কর্ম্মপ্রবণ ছিলেন, ইহাই তাঁহার সংযমশক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোহিনীমোহনের জীবনে আর একটি মহৎগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। ধর্ম্মে বা কর্ম্মে তিনি আদৌ আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, কখনও আভিজাত্যের গৌরব করিতেন না। তাঁহাকে কেহ কখনও কোন কার্য্যে বাক্‌চাতুর্য্যের আশ্রয়গ্রহণ করিতে দেখেন নাই। তিনি নীরবকর্ম্মী এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। অচল, অটলভাবে কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া তিনি জনসাধারণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন।

মোহিনীমোহনের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যুগপৎ কুলিশকঠোর ও কুসুমকোমল ছিলেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বিবেকের অনুপ্রেরণায় তিনি যেমন বজ্রের ন্যায় কঠোর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে জানিতেন, তেমনি তাঁহার হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমলতা গুণবিশিষ্টও ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মোহিনীমোহন তাঁহার উপযুক্ত পুত্রকে বহুজনবাঞ্ছিত সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ গ্রহণ করিতে না দিয়া তাঁহাকে মিলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দেন তাহা বিরল। মোহিনীমোহন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও সৌজন্য সকলকেই মুগ্ধ করিত। কর্ম্মজীবনে যেখানেই থাকুন না কেন, সেই-খানেই দরিদ্র ছাত্রদিগকে তাঁহার আবাসে রাখিয়া বিদ্যোৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য দ্বারা বিদ্যার্থীদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার দানের মধ্যে এমন গুপ্তদান অনেক ছিল, যাহা তাঁহার সন্তানগণকে পর্য্যন্ত জানিতে দিতেন না।

বঙ্গজননীর সুসন্তান দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক, অশেষ গুণালঙ্কৃত মোহিনীমোহনকে আমরা নবযুগের আদর্শ বলিতে পারি। তিনি একাধারে কর্ম্মী ও তাপস ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবন ভাবীপুরুষের অনুকরণীয় ছিল। এই জড় দেহ নশ্বর হইলেও তাহা কি উপায়ে সুদীর্ঘকাল স্থায়ী করিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন ও মানবের হিতানুষ্ঠান করা যায় তাহাই মোহিনী-মোহন স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর ৪ মাস বয়সে বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক নিয়মে বিশেষ কোন ব্যাধির কবলে কবলিত না হইয়া সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে ইষ্টধ্যানে ১৩২৮ সালের ২০শে কার্ত্তিক তারিখে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফার্ম্ম ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিনামা

এই এগ্রিমেণ্টনামা বা সর্ত্ত-পত্র ..সনের...(মাসে) (তাং) লিখিত হইতেছে। এই চুক্তিপত্রে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ সহরের ব্যবসায়ী—নাম বাঁশীরাম পোদ্দার। তাঁহার কর্ম্মস্থল ১৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট (অতঃপর তাঁহাকে 'মালিক' বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) অপর ব্যক্তি কলিকাতা-সহরস্থ হাটখোলার বাসীন্দা —নাম, মাণিক্যধন সাহা এবং তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এজেণ্ট (অতঃপর তাহাকে "ক্রেতা" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) বটেন। যেহেতু মালিক তাহার ব্যবসা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ক্রেতাও ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ উক্ত ফার্ম্ম কিনিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি তাঁহারা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন।

(১) বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মালিক ১৯..সনের ১৯শে এপ্রিল তারিখে নিজের যে সর্ত্তানুসারে বাড়ী লইয়াছিলেন, সর্ত্তের সেই সময় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বের চুক্তিপত্র বলবৎ থাকিবে। জনার্দ্দন পাল এক পক্ষে এবং 'মালিক' অপর পক্ষে —এই দুই জনের মধ্যে সর্ত্তপত্র লেখা হইয়াছিল। ভাড়া, সময় হিসাব এবং অন্যান্য নিয়ম সম্বন্ধে পূর্ব্বের চুক্তিপত্রই প্রামাণ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবে।

(২) ব্যবসায়ের সুনামের জন্য .... টাকা দিতে হইবে।

(৩) গৃহের সাজ-সজ্জা, আসবাব প্রভৃতির দাম এপ্রেইজার দ্বারা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কোনটির দাম লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে মধ্যস্থের রায় এবং শাসনই গ্রাহ্য করিতে হইবে। জিনিষপত্রের এইরূপে একটী মূল্য নির্দ্ধারিত হইলে তাহা দিয়া জিনিষপত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) দোকানস্থ মালপত্রাদি পরের দিন তালিকাভুক্ত করিয়া লইয়া ক্রেতা উহা মূল্যানুসারে বুঝিয়া লইবেন।

(৫) মালিকও স্বীকার করিতেছেন, যে, চুক্তি' তারিখ হইতে ফার্ম্ম বিক্রয়ের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন জিনিষ বিক্রয় কিংবা খরিদ করিবেন না। শুধু এই সময়ের মধ্যে কোন জিনিষ ক্রয় করা কিংবা মালপত্রাদির জন্য কিছু আদায় করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িলে—উক্ত ব্যবসার জন্য—মালিক তাহা করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত, কোন জিনিষ আনিবার কিংবা সরাইয়া লইবার অধিকার তাহার রহিল না।

(৬) মালিক যে অর্থ অন্যের কাছে পাইবেন, তৎসম্বন্ধীয় হিসাব বহি ক্রেতা ইচ্ছা করিলে লইতে পারিবেন। তবে তাহার জন্য দেয় অর্থ ভ্যালুয়ার কিংবা তাহাদের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, মধ্যস্থই——ঠিক করিয়া দিবেন। নচেৎ, ক্রেতা শুধু হিসাবের বকেয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং মাসে মাসে মালিককে আদায় সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ প্রদান করিবেন। তিনি তাহার পরিশ্রমের জন্য আদায়ের সাড়ে সাত ভাগ লইতে পারিবেন———ইহাই তাহার কমিশন।

(৭) ক্রয়ের শেষ দিন ১৯...সনের . (তাং)... (মাস) ধার্য্য হইল।

(৮) ইহা উল্লেখ থাকে, যে বর্ত্তমান পার্টি-দ্বয়ের মধ্যে মালিক পক্ষে শ্রীযুক্ত সুরপতি রায় ঠিকানা....................এবং ক্রেতার পক্ষে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ঠিকানা········· ভ্যালুয়ার বা মূল্য নির্দ্ধারক নিযুক্ত হইলেন।

(৯) ক্রয় শেষ হইয়া গেলে, ক্রেতা মালিককে নিম্নলিখিত রূপে অর্থ দিবেন। আড়াই হাজার টাকার মধ্যে পাঁচ থেকে পাঁচশত টাকা করিয়া মালিক নিযুক্ত কোন লোক-ক্রেতার বিল পাইয়া গ্রহণ করিবেন। বাকী অর্থ ক্যাসে দিতে হইবে।

(১০) ক্রেতা এই চুক্তিতে সই করিয়াই শ্রীযুক্ত সুরপতি রায় জমা-হিসাবে এক শত টাকা দিবেন—উহা বিক্রয়-মূল্যের অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে। বিক্রয়-কার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মালিকের অনুমতি লইয়া এই অর্থ মূল্য নির্দ্ধারক-দের হেপাজতে থাকিবে।

(১১) মালিক বিক্রয় সমাপ্তির দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ভাড়া, রেট এবং ট্যাক্স প্রভৃতির দাবী-দাওয়া মিটাইয়া দিবেন এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন দাবী হইতেই ক্রেতার সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষা করিবেন।

(১২) এই চুক্তিনামা উক্ত গৃহের জমিদারের সম্মতির উপর নির্ভর করিবে। যদি তিনি ক্রেতাকে গৃহ পত্তন দিতে রাজী হন, তাহা হইলে নজর-সেলামী মালিক এবং ক্রেতাকে তুল্যরূপে বহন করিতে হইবে। জমিদার অনুমতি না দিলে পূর্ব্বোক্ত জমার সমস্তই সুদ বাদে ক্রেতাকে ফেরৎ দিয়া দিতে হইবে। সমস্ত বন্দোবস্তই ইহাতে নাকচ হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু প্রত্যেক পার্টিকে, এতাবৎ যাহা ব্যয় কিংবা ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ভার বহন করিতে হইবে।

সাক্ষী

১। দেবীবর রায়

তাহার বর্ণনা　　　দেবীবর রায়

২। হলধর ঘোষ

তাহার বর্ণনা　　　হলধর ঘোষ

বাৎসরিক ভাড়ার চুক্তি

.........র শ্রীযুক্ত............(পরে তাঁহাকে 'জমিদার' বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) এবং...... র শ্রীযুক্ত............(পরে তাহাকে 'প্রজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইবে) এই চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। জমিদার তাহার গৃহ ভাড়া দিতে স্বীকৃত হওয়ার এবং প্রজা········ মাসের......ই তারিখ হইতে উহা এক বৎসরের জন্য লইতে স্বীকৃত হওয়ায় (নির্দ্ধারিত সময় পার না হইতেই ছয়মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিলে উহা অবশ্য আলাদা কথা হইবে), এবং তৎপরে আরো এক বছরের জন্য ; পরে ফি বছরে এইরূপে লইতে পারিবেন। নং......(সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হইতে) যে-বাড়ী

এবং আসবাবপত্র বাৎসরিক......টাকায় ভাড়া দেওয়া হইতেছে তাহা, যে-কোন, পক্ষের ছয় মাসের নোটিশ পাইলেই চুক্তির অবসান হইবে। ভাড়া চতুর্থ দিবসে দিতে হইবে এবং প্রথম ভাড়া আগামী .....মাসে......ই তারিখে দিতে হইবে। প্রজাও ল্যাণ্ডলর্ড'স্ প্রপার্টি ট্যাক্স এবং অন্যান্য রেণ্ট দিতে স্বীকৃত আছেন; তবে ইহা প্রকাশ থাকে, যে, পূর্ব্বের কোন বকেয়া খাজনা মিটাইতে তিনি বাধ্য থাকিবেন না। ভবিষ্যতের রেণ্ট, ট্যাক্স, এসেসমেণ্ট প্রভৃতি যাহা চুক্তি সময়ের জন্য ধার্য্য হইবে—তাহা দিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। নিকটবর্ত্তী গৃহস্থদের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা এবং ক্ষতি হয়, বিরক্তি জন্মে—তিনি এরূপ কাজ কোনও করিবেন না এবং চুক্তি কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিনি নির্ব্বিবাদে জমিদারকে তাঁহার গৃহ বর্ত্তমানের অবস্থাতে ফিরাইয়া দিবেন। সময়ের অত্যাচার, আগুন লাগা কিংবা অন্যান্য দৈব-দুর্ঘটনার কথা অবশ্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। যদি বাড়ী ভাড়া অথবা তাহার কিয়দংশ বাকী পড়িয়া যায় এবং প্রজা ২১ দিনের মধ্যে উহা জমিদারকে বুঝাইয়া না দেন, কিম্বা যদি বর্ত্তমান আলোচ্য ঘরটি নিকটবর্ত্তী অধিবাসীদ্দিগের বিরক্তির কারণ উৎপাদন করিয়া থাকে – তাহা হইলে গৃহস্বামীর নিয়োজিত কোন ব্যক্তি চুক্তি পত্রানুসারে গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং প্রজাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারিবেন। বকেয়া ভাড়া আদায় এবং ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্যান্য সকল সর্ত্তগুলিই তখন হইতে নাকচ হইয়া যাইবে। প্রজাও স্বীকার করিতেছেন, যে, এমতাবস্থায় তিনি একমাস পূর্ব্ব হইতেই জমিদারকে তাঁহার গৃহের কোন নজরে পড়িবার মত স্থানে এই "বাটী ভাড়া দেওয়া যাইবে" এইরূপ লিখিতে অনুমতি দিবেন।

সাক্ষী

.........উপস্থিতিতে,

সাক্ষরকারী পার্টিদ্বয়।

বঙ্গীয় যুবকদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

"সেসন" আরম্ভ হইবার সময় ও দরখাস্ত করিবার প্রণালী।

আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে "সেসন" আরম্ভ হয় এবং অভিভাবক ও শিক্ষকদের সুপারিশপত্রসহ ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত পোঃ ইটালী, কলিকাতা, বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এই ঠিকানায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পাঠাইতে হয়।

ভবিষ্যৎ সুবিধা।

এদেশে এখনও চর্ম্ম-শিল্প তেমন প্রসারলাভ করে নাই। এদেশে কাঁচা মাল যথেষ্ট আছে এবং চামড়া নির্ম্মিত অন্যান্য জিনিষের চাহিদা ভারতে ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব বুঝা যায় যে, ঠিকমত কাজ করিতে পারিলে এই ব্যবসায়ে এখনও যথেষ্ট উন্নতিলাভের সম্ভাবনা আছে। ভারতের কাঁচা ও পাকা চামড়ার অর্দ্ধেক ট্যান্ করা চামড়া বুট ও জুতার কারবারে বহু কোটী টাকা খাটিতেছে। কলিকাতার চামড়ার যে কারবার হয়, তাহার হিসাব লইলে স্পষ্ট দেখা যায়, বাঙ্গালীদের এই বিরাট কারবারে বিশেষ কোন হাত নাই। উদাহরণ স্বরূপ জুতার কারবারের কথা বলা যাইতে পারে। এই কারবার প্রায় চীনাদের একচেটিয়া। বাঙ্গালী যুবকদিগকে যে সুবিধা দেওয়া হইতেছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারা যদি এই বিরাট কারবারের কিয়দংশ পরিমাণও অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে।

বর্ত্তমানে যে সব চামড়ার কারখানা আছে তাহাতে কোন পদ খালি হইলে এই স্কুলে শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকগণ হাতেকলমে ট্যানিং করিবার কাজ পাইতে পারিবে। প্রথম অবস্থায় গুণানুসারে তাহারা ৫০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতে পারে। অভিজ্ঞতা ও কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারিলে ক্রমে বেতনও বৃদ্ধি হয় এবং ইহা দেখা গিয়াছে যে চর্ম্মশিল্পে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এমন কি মাসিক ১,৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতে ট্যানারির সংখ্যা খুব কম এবং সে হিসাবে লোকের চাহিদা নাই বলিলেও চলে। কাজেই অনেক ছাত্রকে শিক্ষা শেষ করিয়া নিজদিগকেই ছোট ছোট ট্যানারী খুলিতে

নিজেরাই তাহাদের থাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হইবে ও ক্রমে নিজেদের কারবারের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। কারবারে কৃতকার্য্য হইলে অনেক আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এই রকমও দেখা গিয়াছে যে, ভারতে অনেক ট্যানা-রীর মালিকগণ তাহাদের কারবারে সাফল্য লাভ করিয়া অগাধ সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে পাশ করার পর ছাত্রগণ সামান্য মূলধন লইয়া চামড়ার জিনিষপত্র তৈয়ার করিবার কারবার করিতে পারে ও ক্রমে ক্রমে ঐ কারবার বাড়াইতে পারে। দরকার হইলে তাহারা চামড়া সংস্করণের কাজ, কাঁচা ও পাকা চামড়ার কাজ অথবা চামড়ার তৈয়ারী জিনিষ বিক্রয়ের ক্যান্‌ভাসারের কাজও করিতে পারে।

ছাত্রদিগকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তদ্দারা তাহারা ট্যানিং এক্সট্র্যাক্ট কারখানায় ও লেবরেটরীতে রাসায়নিকের কাজ করিতে পারে।

এই বিদ্যালয় হইতে পাশ করা অনেক ছাত্র এই শিল্পের কোনও না কোন শাখায় উপযুক্ত চাকুরী পাইয়াছে এবং মাসিক ৫০৲ হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেছে। আর যাহারা নিজেরাই কারবার খুলিয়া দিয়াছে তাহারাও ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ইহা ছাড়া এখানে আরও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রসায়নশাস্ত্রের গ্রাজুয়েটগণ এখানে গবেষণামূলক কাজ করিতে পারে এবং তদ্দারা ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। ইহাদের পক্ষে প্রথমে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতন পাওয়া কিছুই বেশী নহে।

বহরমপুরের রেশম, বয়ন ও রং করিবার বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয়ে দুই রকম কোর্স আছে, (১) উচ্চতর কোর্স ও (২) কারিগরী কোর্স।

উচ্চ শিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রদিগকে দুই বৎসর পড়িতে হয় এবং তাহাদের কোর্স প্রত্যেক বৎসর জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। ১৬ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক যে সব ছেলে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, সিনিয়ার মাদ্রাসা পরীক্ষা অথবা এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার উদ্দেশ্যে কোন শিল্পবিদ্যালয়ে পড়িয়াছে, তাহাদিগকেই প্রথম ভর্ত্তি করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক কোর্সে মাসিক দশ টাকা হারে দশটী বৃত্তি দেওয়া হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রথম বার্ষিক কোর্সে চারিটা ও দ্বিতীয় বার্ষিক কোর্সে চারিটা বৃত্তি রিজার্ভ রাখা আছে। স্কুলে কোন বেতন লওয়া হয় না।

উপরে বর্ণিত কারিগরী কোর্স, বিশেষ করিয়া রেশম বয়নকারী তন্তুবায়দের ছেলেদের পক্ষে উপযোগী। ইহাতে কোন বয়সের বাবিশেষ গুণের দরকার হয় না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের সামান্য কিছু লেখাপড়া জানা থাকিলে ভাল হয়। এই বিভাগে মাসিক ৬৲ হিসাবে ১৫টা, এবং ৪৲ হিসাবে ১৫টা বৃত্তি এক বৎসর কালের জন্য দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় সংলগ্ন খোলা ও বায়ুসঞ্চারিত দালানে একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের থাকিবার স্থায়ী হোষ্টেল আছে। হোষ্টেলের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে একজন সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে। ছাত্রেরা

করে। মাসে ১৩৲ কি ১৪৲ টাকা খরচ করিলে একজন ছাত্র বহরমপুরে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। উচ্চ কোর্সের প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক ১৲ টাকা করিয়া সিট ভাড়া দিতে হয়। তদুপরি মিউনিসিপাল টেক্স মাসিক ।৶০ হইতে ॥০ আনা এবং আসবাব পত্র ভাড়া বাবদ মাসিক ।০ করিয়া দিতে হয়।

কারিগরী কার্য্য শিক্ষার্থী ছাত্রদের সিট ভাড়া লাগে না।

এইরূপ ধরণের বিদ্যালয় বঙ্গদেশে কেবল এই একটি মাত্র। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উন্নত ধরণের হস্ত ও শক্তি দ্বারা চালিত তাঁত, রেশম জড়াইবার ও বয়ন করিবার যন্ত্রাদি আছে। ইহা ছাড়া বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি অতি আধুনিক রং করিবার কারখানা আছে, উহাতে কাপড় ছাপিবার এরোগ্রাফ কলও আছে।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে রেশম বয়ন, রং করা ও রেশমী কাপড়ে ছাপ দেওয়া শিক্ষা দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য এই যে, ভবিষ্যতে যেন তাহারা শিক্ষানবীশির পর রেশম শিল্পের কলকারখানায় ম্যানেজার ও তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বপূর্ণ কাজ লইতে পারে।

যদিও এখনও চারি বৎসর হয় নাই এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি এখান হইতে পাশকরা কয়েকজন ছাত্র ইতিমধ্যেই গভর্ণমেণ্টের অধীনে ও কারখানায় চাকুরী পাইয়াছে; কয়েকজন ছাত্র নিজেরাই কারখানা খুলিয়াছে। যেসব ছেলে এই বিদ্যালয়ে রেশম ও সূতা বয়ন, রংএর কার্য্য ও কাপড়ে ছাপ মারা ইত্যাদির বিভিন্ন কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে তাহারা উল্লিখিত যে কোন কাজে তাহাদের শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিতে পারে। কাপড় রং করা ও ছাপ মারা আজকালকার দিনে একটা লাভজনক কারবার এবং ইহার চাহিদাও খুব বেশী। সামান্য মূলধন লইয়া রং ও ছাপার কারবার আরম্ভ করিয়া যে কোন বুদ্ধিমান ছেলে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে।

এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ক্রমেই ভাল হইতেছে এবং রেশম শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বৎসর মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ এখন যাহা আছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী হইবে; এইরূপ আশা করা যায়।

মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

(১) শিক্ষানবিশি শিক্ষার বোর্ড।—যে সকল শিক্ষানবিশ, শিক্ষানবিশ বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে কেবল তাহারা কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে কারখানায় এবং ভারতীয় ও এংলো ইণ্ডিয়ানগণ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর কারখানায় প্রাথমিক শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইতে পারে। খড়্গপুর ও অন্যান্য কারখানায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক ভারতীয় শিক্ষানবিশদের মধ্যে যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে তাহাদিগকেই প্রথমে ভর্ত্তি করা হয় এবং পরে অন্যান্যদের কথা বিবেচনা করা হয়। অতএব যাহারা কারখানায় ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক তাহাদের এই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া আসাই ভাল। শিক্ষানবিশি শিক্ষা-বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রত্যেক বৎসরে দুইবার অর্থাৎ জানুয়ারী ও মে মাসে হইয়া থাকে। পরীক্ষার্থীদের বয়স ১৯ বৎসরের কম হওয়া চাই এবং পরীক্ষার্থীদিগকে ১২৲ টাকা করিয়া পরীক্ষার ফিস দিতে হয়। এই পরীক্ষার দুইটি শাখা আছে:—

(১) বাধ্যতামূলক শাখা।—এই শাখায় ইংরেজী শ্রুতলিপি ও লিখন এবং ইংরেজী রচনা, অঙ্ক, (পাটীগণিত, বীজগণিত, পরিমিতি, জ্যামিতি) এবং কল্পনার সাহায্যে ড্রয়িং সমেত কোনরূপ যন্ত্রাদি ছাড়া কেবল হস্তদ্বারা ড্রয়িং করা, এই সব বিষয়গুলি আছে।

(২) ইচ্ছাধীন পাঠের শাখা।—এই শাখায় যন্ত্রবিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি, প্রাথমিক পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাথমিক রসায়নশাস্ত্র এবং ব্যবহারিক জ্যামিতি ও ড্রয়িং আছে। পরীক্ষার্থীগণকে এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে ১টি বা ২টি বিষয় অবশ্য লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

লবণ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নহে

হাতের কাছে সঠিক বিবরণ না থাকায় আমি নির্দ্দিষ্ট কোন মত দিতে পারি না ; কিন্তু আমার মনে হয়, যে বাংলায় এবং উত্তর উড়িষ্যাতে ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশন উপায়ে লবণ প্রস্তুত করিলেও তাহা ব্যবসা হিসাবে সুবিধাজনক হইবে না।

জ্বালানীর দাম

পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, লবণের কারখানায় কয়লার খরচ প্রতি টনে আনুমানিক ১৫৲ টাকা হইবে। এক টন লবণ প্রস্তুত করিতে ৫৲ টাকার কম পড়িবে বলিয়া বিশেষ ভরসা হয় না। ট্যারিফ বোর্ডের কাছে সাক্ষ্যে শ্রীযুক্ত কপিলরাম ভকিল এবং মিঃ অ্যাল্‌কক অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তাঁহারা কয়লার ক্লোরিফিক ভ্যালু ধরিয়াছিলেন ১১,০০০ হইতে ১২,০০০ বি, টি, ইউ—বাংলার কয়লায় উহা মাত্র ৭০০৫ বি, টি, ইউ। এই কথা মনে রাখিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উত্তর পশ্চিম তীরের কারখানায় প্রতি টন লবণ তৈয়ার করিতে গেলে কয়লার খরচ ৫৲ টাকা হইতে ৬৲ টাকার মধ্যে পড়ে।

আনুসঙ্গিক খরচ

উপরোক্ত খরচের সঙ্গে আবার ডিপ্রিসিয়েশানের এবং ইন্টারেষ্টের দাবী মিটাইতে হইবে, ভ্যাকুয়াম প্ল্যান্ট পরিদর্শনের খরচও থাকিবে ; পূর্ব্বে জ্বালানীর জন্য যে প্রতি টনে ৫৲ হইতে ৬৲ টাকা করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা ঘন লোণা জল হইতে নিমক প্রস্তুত করিবার সম্পর্কেই বলা হইয়াছে। কাজেই ভ্যাকুয়াম ইভাপোরেশনের ব্যয়ের সঙ্গে লোণা জল জমানোর ব্যয়ও ধরিতে হইবে। এই উপায়ে Ex-works মূল্যে লবণ তৈয়ার করিতে গেলে প্রতি টন ১৯৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকার কমে হইবে না। কলিকাতার বাজারের চাহিদা মিটাইতে হইলে এই সঙ্গে আবার মালপত্রাদি স্থানান্তরিত করিবার ব্যয়ও ধরিতে হইবে। রাজধানীর ১০০ মাইলের মধ্যে ফ্যাক্টরী কিছুতেই স্থাপন করা যাইতে পারে না, কাজেই প্রতি টন লবণ আনা নেওয়া করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৲ টাকা ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দেখা যায় যে, প্রতি টন লবণ তৈয়ারীতে ২৩৲ টাকার কাছাকাছি পড়িবে ; অর্থাৎ ১০০ মণে ৮২৲ টাকা লাগিবে। অস্থির জল বায়ু এবং আবহাওয়ার জন্য উপরোক্ত অঙ্কগুলি বাড়িবে বই কমিবে না।

উচ্চশ্রেণীর লবণের চাহিদা কম

ইহা অবশ্য সত্য কথা যে এইরূপে লবণ তৈয়ার করিলে বাংলার বাজারে যে নুন বিক্রয় হয়, তাহার চেয়ে ইহার গুণ উচ্চ ধরণের হইবে—সমানও হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য ইহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই যে গুণানুপাতে উহার চাহিদা বাড়িবে—দাম বেশী হওয়া সত্ত্বেও। ট্যারিফ্ বোর্ডের প্রমাণানুসারে সূর্য্যের তাপে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহার উপরেও ১৲৮৲ টাকা দাম বেশী হওয়ায় লিভারপুরের লবণের চাহিদা ক্রমাগত ২৫ বৎসর ধরিয়া কমিয়া আসিতেছে ইহা হইতে কতকটা আন্দাজ করা চলে যে, সস্তা দ্বিতীয় শ্রেণীর নিমক সহজেই বেশী দামের ভালো লবণকে বাজার হইতে হটাইয়া দিতে পারে।

ইউরোপে ভ্যাকুয়াম সল্ট তৈয়ার

অনেকের কাছে ইহা আশ্চর্য্য ঠেকিতে পারে যে চেসায়ার এবং হামবার্গে এইরূপে লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে—যদিও উপরোক্ত স্থলসমূহ কয়েক সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। জানিয়া রাখা উচিত, যে বাংলায় এইরূপে লবণ প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব হইলেও, উপরোক্ত স্থলসমূহের প্রস্তুত লবণ বাজারে কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও স্বচ্ছন্দে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইউরোপীয় কেন্দ্রগুলির রক্ সল্টে (Rock Salt) জল পাম্প করিয়া ভিজাইয়া লইয়া উহা হইতে লবণ প্রস্তুত করা হয়; কাজেই জলবায়ুর দৌরাত্ম্য উহাদিগকে মোটেই পোহাইতে হয় না। যন্ত্রপাতিও সমস্ত বৎসর ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পারে, কাজেই ওভার-হেড চার্জ্জ বা ফালতু খরচের কথাও উহাদিগকে ভাবিতে হয় না। চেসায়ার'এর লবণ কেন্দ্রগুলি আবার কয়লার খনি, নিমকের রক্ (rock) এবং বন্দরের ২০ মাইলের মধ্যে—কাজেই লবণ স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্তও খুব আধুনিক ধরণের। এতদ্ব্যতীত, কোন জাহাজের প্রধান মালপত্রাদি দিয়া ভর্ত্তি করিয়াও যদি জায়গা থাকে, তাহা হইলে বাকী জায়গা লবণ দিয়া পূরণ করিয়া দেওয়ার সুবিধা সেখানে যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে। এই লবণ অত্যন্ত কম মাশুলে চালান হয়। বাংলা দেশে সবই উল্টো—লোণা জলের সরবরাহে অনেকটা অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে কয়লার খনিগুলিও যে কোন লবণ কেন্দ্র হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩০০ মাইল দূরে হইবে এবং লবণ স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্তও সেকেলে এবং ব্যয়সাধ্য।

আমাদের হাতে যে-সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাতে বোধ হয় যে ভ্যাকুয়াম-এর সাহায্যে লবণ প্রস্তুত করার অনেক বেশী ঝুঁকি নিজের ঘাড়ে লইতে হইবে এবং তাহার ফলাফলও অনিশ্চিত।

পরীক্ষা করিয়া কি কি ঠিক করিতে হইবে।

যে ঋতুতে লবণ প্রস্তুত করা আদৌ চলিবে না, তখন শ্রমজীবিরা কোন্ হারে মাহিয়ানা পাইলে সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহা জানা বিশেষ দরকার। এতদ্ব্যতীত, কয়লা ও স্থানীয় জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের খরচ এবং তাহার অনুপাতে কতখানি লবণ প্রস্তুত হইল তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট লোণা জল পাওয়া যাইবে কিনা এবং পাওয়া গেলে তাহা রবি-কিরণে কিংবা সাবেকী প্রথায় ফিল্টার করিয়া লইলে ব্যবসা হিসাবে লাভজনক হইবে কিনা! এতৎসম্বন্ধে পরীক্ষা কি প্রকারে চালাইতে হইবে তাহা কেহ

কেহ জিজ্ঞাসা করায়, আমি নীচে আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি।

লবণাক্ত মাটী ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রথমেই প্রশ্ন হইতেছে যে নিমক প্রস্তুত করিবার জন্য লোণা মাটী ব্যবহার করা আদৌ সমীচীন কিনা। আমি বলিব যে, না; কেননা, উহাতে বেশী লবণ তো প্রস্তুত হইবেই না, পরন্তু ইহা সংগ্রহের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা ও বাংলার সৈকতভূমি আস্তে আস্তে নিজেদের তাঁবে আনিয়াছেন। পূর্ব্বে যেখানে নিবিড় অরণ্যানী মানুষের মনে শঙ্কা জাগাইয়া তুলিত, আজ সেখানে শস্যক্ষেত্রের 'শ্যামসমারোহ' দেখিয়া বিস্ময় লাগে! কাজেই যে স্থল হইতে আগে আগে লোণা মাটী এবং জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইত, তাহার পরিমাণ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। সরকারী এবং বেসরকারী লোকের ধারণা এই যে যদি লবণ প্রস্তুত ও ধান্য উৎপাদন করার মধ্যে একটীকে বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে লোকে নিঃসন্দেহে চাষ আবাদের জন্যই অভিমত প্রকাশ করিবে। কাজেই এতৎস্থলের লোক দরিদ্র হইলেও যে নিমক প্রস্তুতের জন্য জমা ছাড়িয়া দিবে, তাহা মনে হয় না।

যুক্ত উপায় নির্দ্ধারণ।

যেহেতু উপযুক্ত পরিমাণে লোণা মাটী পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত এবং জলবায়ুর খামখেয়ালীও নিতান্ত কম নহে, তখন মনে হয় যে একটী প্ল্যাণ্টের সাহায্যে এবং ছোটখাটো অপস্থত ইভাপোরেশন উপায়ে কাজ করিলে সুফল লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

লোণা জলের শক্তির ব্যাখ্যা।

এই প্রশ্নটী পরীক্ষা করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে হইবে, যে স্থান কার্য্যোপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে স্থান ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত লোণা জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যায় কিনা। এই জায়গা এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে এই স্থলে অনেকগুলি অগভীর কনডেন্সার থাকিতে পারে; কনডেনসারগুলির মুখ লবণাক্ত জল জমাইবার জন্য একটী পাত্রে যাইয়া পড়িবে। যখন জোয়ারের জল প্রথম কনডেনসারে আসিয়া হাজির হইবে, তখন খোলা স্লুইস দরজাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যদি জোয়ারের জলের উচ্চতা হইতেও উচু কোন জায়গাকে কার্য্যোপযোগী বলিয়া ঠিক করা হয়, তাহা হইলে পাম্পিং করিবার আবশ্যকতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। কাজ চলিবার সময়, বিশেষতঃ এপ্রিল এবং মে মাসে যখন "তুঙ্গ মণিমন্দিরে বিজুরী ঘন সঞ্চরে, মেঘরুচি বসন পরিধানা," তখন কর্ম্মস্থলে জলসেচন কার্য্য খুব নীচুতেই সমাধা করিতে হইবে। খুব বৃষ্টিপাত হইলেও যাহাতে বেশী পরিমাণ জমানো লোণা জল চলিয়া না যায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কনডেনসারগুলির একটী পরবর্ত্তীটিকে লোণা জল যোগান দিতে থাকিবে; জলের শক্তি বাড়িতে বাড়িতে ষ্টোরেজ প্যানে গিয়া ২৩° কিংবা ২৪° বমীতে দাঁড়াইলেই ঠিক হইবে।

কৃত্রিম জলশোষণ প্রণালী।

ষ্টোরেজ প্যান হইতে লোণা জল পাম্প করিয়া লইয়া একটী সাদাসিধে খোলা প্যান বয়লারে নিতে হইবে। কলিকাতার বিভিন্ন কার্ম্মের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এরূপ ধরণের একটী বয়লার খাড়া করিতে বিশেষ বেগ পাইতে

হইবে না। বয়লারে অতিরিক্ত উত্তাপ উঠিলে তাহাকে সিদ্ধ লবণ শুকাইবার কাজে ব্যবহৃত করা চলিতে পারিবে। ২৩° হইতে ২৪° বমী লোণা জলের শক্তি হইলেই যদি উহাকে বয়লারে নেওয়া হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ সমস্ত ক্যাল্‌সিয়াম্ সালফেট লোণা জল জমাইবার প্যানে একত্র হইবে; কেবলমাত্র সলিউসন্ অফ্ সোডিয়াম্ এবং ম্যাগ্নেশিয়াম্ ক্লোরাইড্ অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিবে। সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ না জমা হওয়া পর্য্যন্ত এই সলিউসন্‌কে উত্তপ্ত করিতে হইবে। যে উত্তাপ এবং ঘনত্বে কাজ করিলে আর্থিক দিক দিয়া সুবিধা হইবে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত করিতে হইবে। ইহার পর যে সুরাসার থাকে তাহা শোষণ করিয়া লইয়া, লবণকে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে শুকাইতে হইবে। এই পরীক্ষাকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সমাধা হইতে পারে, আমি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তবে স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া কিছু অদলবদল করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

স্থানীয়-ভাবে লবণ প্রস্তুতের দোষ-গুণ।

আমি পরিভ্রমণ করিবার সময় সুন্দরবন এবং কাঁথি অঞ্চল হইতে স্থানীয় প্রস্তুত লবণের নমুনা আনিয়াছিলাম। ইহা আলিপুরস্থ গভর্ণমেণ্ট টেষ্ট হাউসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

	১	২	৩	৪	৫
	%	%	%	%	%
সিক্তভাব (১৪০° সি'তে ক্ষয়িতভাব প্রকাশ)	১'৬৮	১'৫৮	১'৮২	০'৯৫	৭'৯৬
জলে অদ্রবনীয় পদার্থ	০'৩৭	০'০৪	০'০৬	০'২৩	০'০৩
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	০'৬৪	১'৬৮	১'৭৩	১'৫৪	০'৬৪
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড	০'৬২	০'২১	০'১৩	০'৩২	৩'৩৬
সোডিয়াম সালফেট	১'৫০	২'৬৬	২'৪৬	২'৫২	৩'৬৫
সোডিয়াম ক্লোরাইড (বিভিন্নতা দিয়া)	৯৫'১৯	৯৩'৮৩	৯৩'৮০	৯৪'৪৪	৮৪ ৩৬
	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০	১০০'০০

১নং হইতে ৪নং পর্য্যন্ত লবণের নমুনা সুন্দরবন হইতে এবং ৫নং লবণের নমুনা কাঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ট্যারিফ বোর্ড কর্ত্তৃক পরীক্ষিত বিদেশী লবণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে—

	এডেন, সৌর, শ্রেষ্ঠ	এডেন, শ্রেষ্ঠ,	পোর্টসৈয়দ, চূর্ণ	শ্রেষ্ঠ ও শুভ্র, চেসায়ার
সিক্তভাব (১৪০° সি'তে ক্ষয়িতভাব প্রকাশ)	৩'৬৭	৩'৫৩	২'০২	০'৫
জলে অদ্রবনীয় পদার্থ	০ ২	০'০৯	০'১২	০'৩৫
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	০'৯৫	০'৭১	০'৫৫	১'০৫
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড	১'৩৭	১'২০	০'৬৬	—
সোডিয়াম ক্লোরাইড	৯২'২৩	৯২'৮৬	৯৫'৬৪	৯৭'০৯
সোডিয়াম সালফেট	১'৫৮	১'৬১	১'০১	১'৩১

(ক্রমশঃ)

পুকুরে মাছ ধরা

তৃতীয় অধ্যায়

ফাত্‌না সহ মাছের আধার

মারাল (Marral)

আমি মারাল মাছকে যে খুব বেশী পছন্দ করি, তাহা নহে ; কেন-না,তাহারা বেশী ক্রীড়াশীল নহে। তবে ইহা একটী সুবিধার কথা যে ইহাদিগকে প্রায় প্রত্যেক পুকুর হইতেই পাকড়াও করা যাইতে পারে। এদেশের লোকেরা ইহাকে তাজা মাছের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। জলের বাহিরে অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও ইহা সহজে মারা যায় না ; একটুখানি জলের ছিটা লাগাইয়া দিলেই ইহা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জীবিত থাকিবে। এতদ্ব্যতীত ইহা সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। কাজেই এদেশের লোকেরা ইহাকে যে-কোন জলে ছাড়িয়া দিবার ভরসা পায়। সহজে মরে না বলিয়াই, ইহারা পাচকের কাছে পৌছান পর্য্যন্তও অনেক সময় জীবিত থাকিয়া থাকে। কলিকাতার মেছো-বাজার সমূহে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; বিক্রেতারা মাঝে মাঝে একটু একটু জলের ছিটা দিয়া মাছকে তাজা রাখিয়া থাকে।

একটী ফাত্‌না-যুক্ত বর্শীতে ছোট মাছ গাঁথিয়া এই মাছ ধরা যাইতে পারে! মোট কথা, যাহাতে আধারের ভারে ফাৎনা জলের নীচে ডুবিয়া না যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। ৪ কিম্বা ৫ নম্বরের আইড্‌ লিমেরিক হুকে লেজশুদ্ধ ৪½ ইঞ্চি লম্বা একটি ছোট আধার গাঁথিবে। অনেকে আবার ২টি ৬নং লিমেরিক হুক পেছনে পেছনে বাঁধিয়া তাহাতে আধার দিয়া কাজ হাঁসিল করা সুবিধাজনক মনে করেন ; কেন না ইহাতে বর্শীটা দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য মৎস্যটী নীচের দিক হইতে আসিয়া আধারের কাছে হাজির হইবে।

আধার কত বড় হইবে তাহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। কেহ ৩½ ইঞ্চি, কেহ বা ৪½ ইঞ্চির পক্ষপাতী। আমাদের মাছটী ৪½ ইঞ্চি লম্বা আধারের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও মৎস্যশিকারীর পক্ষে বড় আধার লইয়া শিকার করা একটু বেশী রকমেরই বিরক্তিজনক। কেন না, জলে ছাড়িয়া দিলেও, মাছের টোপটী জলজ আগাছার দিকেই ক্রমাগত ছুটিবার প্রয়াস করিবে। ইহা সহ্য করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। লোভনীয় হওয়া ছাড়াও বড় টোপটির সুবিধা এই যে ইহা ডবল বর্শীকে বেশীভাবে আবৃত করিয়া থাকিবে।

জলের দুই ফিটের মধ্যেই মাছ ধরিতে চেষ্টা করিবে। ইহা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। সময় বুঝিয়া ছিপ্‌টি মারিলে যদি মাছ উঠে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে উহাদের আকার সাধারণতঃ দুই পাউণ্ডের বেশী নহে। মাঝে মাঝে ইহার চেয়ে বড় মাছও যে

ধরা না পড়ে, তাহা নহে! ২৩ ফিট লম্বা মাছও বেশ মিলিয়া থাকে। এই সব মাছ বড্ড লাজুক, কাজেই তাহার দৃষ্টি বহির্ভূতভাবে অবস্থান করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"এসিয়ান" নামক মাসিক পত্রে এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে এই মাছকে 'ফ্লাইফিসিং' করিয়াও ধরা যাইতে পারে। তিনি ৫নং লিমেরিক হুকে পুরু-গাঁথা যে কৃষ্ণ-পামার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম।

একটি ছিপের কোন জায়গা কিংবা বৃক্ষশাখা হইতে সুতা জলে ছাড়িয়া দিলে, তাজা ব্যাঙ্‌টি জলের উপরেই ভাসিতে থাকিবে। ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ "The Rod in India" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এক সপ্তাহের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম

ছিপ, হুইল, সুতা—লেবিয়ো ধরিবার উপযুক্ত।

বর্শী—৬টি ৪নং আইড্‌ লিমেরিক হুক্

ফাত্‌না—একটি বড় শোলার ফাত্‌না।

শীশকখণ্ড—অধারকে জলের নীচে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়।

পাপ্‌তা মাছ

একই উপায়ে পাপ্‌তা মাছও ধরা যাইতে পারে। যেসমস্ত পুকুরে নদীর জল অবাধে আসিবার সুযোগ পায়, সেখানে চিতল, বোয়ালের ন্যায় পাপ্‌তা পাওয়াও দুর্লভ নহে। তাহাদের ওজন সাধারণতঃ ২½ হইতে ৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; মধ্যে মধ্যে জেলেরা ৬।৭ পাউণ্ড ওজনের মাছও ধরিয়া থাকে। মাছ—আধারের বদলে পোকা দিয়া পাপ্‌তা শিকার করিলে যে ২½ পাউণ্ড ওজনের নীচের মাছও ধরা দিবে, তাহা অসম্ভব নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে পাপতা মাছ শিকার করার মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে এবং উহা ধরিবার জন্য চেষ্টা মোটেই অপব্যয়িত হয় না।

পাপ্‌তা মাছ

মাছগুলি খুব চতুর; কাজেই তারের উপরে রঙীন রেশমী সুতা ব্যবহার না করিয়া কেবলমাত্র সূক্ষ্ম তার ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ইহাদের দাঁতও আবার তেমনি ভীষণ শক্ত। ১টি ৬নং লিমেরিক বর্শী লইয়া জলের একচতুর্থাংশের পরিমাণে ফাত্‌না ঠিক করিয়া লইয়া ছোট দুই ইঞ্চি আন্দাজ আধার গাঁথিয়া দাও; এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে যে কথাগুলি এই সম্বন্ধে বলিয়াছি, পাপ্‌তা মাছ ধরিবার সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। ইহার সগোত্র মাছগুলি এই প্রকারেই

ধরা যাইতে পারে, বড় মাছগুলিকে ধরিতে গেলে ওয়ালাগো অত্তু, কিংবা চিতলা বোয়াল প্রভৃতিকে ধরিবার পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। এই দুইরূপে ভারতীয় সমস্ত মাছই বর্শীতে মারা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।

চিতল মাছ

চিতল-মাছ

চিতল মাছ উত্তর ভারত, বঙ্গদেশ এবং আসামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক সময় ইহা ৪ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়; ইহা দেখিতে চ্যাপ্টা এবং পাপ্তা মাছ ধরিবার প্রণালী ইহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। দক্ষিণ ভারতের নেটোপটেরাস্ কপিরাৎ শ্রেণীর বড় মাছও এই প্রকারে শিকার করা যাইতে পারে; এগুলির ওজনও সময় সময় ৪ পাউণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী হইয়া থাকে। ছোটগুলিকে পোকা কিংবা চিংড়ি দিয়া ধরাই সুবিধাজনক।

মেগালপ্‌স্‌ সাইপ্রিনয়েড

এই শ্রেণীর মাছ নদীর সঙ্গমেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইয়া থাকে ; তবে মাঝে মাঝে যে পুষ্করিণী দীঘিতেও পাওয়া যায় না, তাহা নহে।

এক সপ্তাহের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, এতৎ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পোকা এবং চিংড়ি আধার

একটি ছয় নম্বরের লিমেরিক বর্শী, শক্ত শণের সূতা, পোকা, এবং হাল্‌কা ফাত্‌না দিয়া অনেক রকমের মাছই শিকার করা চলিতে পারে। যে রকম শিকারই পছন্দ করিয়া থাকে। পুকুরের তলে পোকার টোপ বর্শীতে গাঁথিয়া আমি অনেক সময় লেবিয়ো শিকার করিয়াছি। বস্তুতঃ খুব কম মাছই পোকা পছন্দ করে না।

বেলে মাছ

বেলে-মাছকে তামিল ভাষায় উলাভে বলিয়া থাকে। অনেক সময় ইহা লম্বায় দেড় ফুট এবং ওজনে ৩ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়। ইহার মুখ বেশ বড়, ঠোকরায়ও খুব জোরে। ইহারা ফাৎনাকে জলের নীচে নিয়া হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া চলিতে থাকিবে। এই সময়ই ছিপ্‌টি মারা প্রয়োজনীয়। ইহাদের রঙ কতকটা হলুদাভ এবং মনে হয় যেন ইহাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ সমস্ত জিনিষই দেখা যাইতেছে ; মাথাটীও একটু বড়সড়। এ দেশের লোকেরা ইহাকে খুব পছন্দ করিয়া থাকে।

বেলে মাছ

ফলুই মাছ

সমস্ত মাছ পুকুরের তলায় ও অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে, তাহাদের পক্ষে মৃত চিংড়ির আধার বড় মারাত্মক রকমের প্রলোভন। মাছেরাও এই

ফলুই মাছ

ইহা এক প্রকার চ্যাপ্টা রৌপ্যাভ মাছ ; মুখ এবং মাথা ছোট। ইহাদের ওজন সাধারণতঃ

২ পাউণ্ডের বেশী হয় না ; অধিকাংশই অর্দ্ধ পাউণ্ড কিংবা পৌনে এক পাউণ্ড ওজনে হইয়া থাকে। ইহা শিকার করা পোকা কিংবা মৃত-চিংড়ি মাছ দিয়া সহজেই চলিতে পারে। ৬নং লিমেরিক হুক্ দিয়া শিকার করিতে গেলে, চিংড়ি-মাছ নেওয়াই ভাল ; ৮নংএর বর্শীতে পোকা ব্যবহার করাই সমীচীন। ফাৎনা এক দিকে ছুটিয়া যাইবার সময় কিংবা ক্রমাগত জোরে ডুবিবার সময়, ছিপ্‌টি মারিতে ভুলিবে না।

এট্রোপ্লাস্ সুরাটেন্‌সিস

দক্ষিণ ভারতে এই মৎস্য পল্লি-কেন্দই নামে পরিচিত হইয়াছে। মাছগুলি বেশী বড় নয় ; পাশগুলি পুরু হইলেও চ্যাপ্টা। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহারা আমাদের দেশের বিধবাদের মত নিরামিষাশী। তামিল দেশের লোকেরা এক প্রকার আগাছার মূল (ইহাকে মূল পাশি বলে) বর্শীর চারিদিকে জড়াইয়া লইয়া জলের দেড়ফুটের মধ্যেই বর্শী ফেলিয়া থাকে। আমি অনেক সময় এই মাছ ছোট পোকার সাহায্যে শিকার করিয়াছি ; তবে আধারটীকে আমি তলের দিকে ফেলিয়া দিতেই অভ্যস্ত ছিলাম। ইহাদের মুখ খুব ছোট ; কাজেই ১০নং লিমেরিক বর্শীতে খুব ছোট পোকার আধার গাথিয়া ফেলিতে হইবে। ফাৎনাটি ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা হওয়া চাই ; ৬ ইঞ্চি হইলে বেশী বড় হইয়া যাইবে। মোট কথা সাধারণ ফাৎনার চেয়ে ইহার বহর সব দিক দিয়াই ছোট হওয়া প্রয়োজন ; এই কথা গোড়াতেই মনে রাখিতে হইবে। যখন মাছে জোরে ঠোকরাইতেছে, তখন ছিপটি মারিতে দ্বিধা করিও না।

মাছগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর ; রং কতকটা সবুজাভ। গায়েও নানা প্রকারের দাগ আছে। ইহাদের ওজন দুই পাউণ্ড কিংবা তদূর্দ্ধ কিছু বেশী হইয়া থাকে। ইহার একটী মাছ বর্শীতে ধরিতে পারিলে দেখিবে যে শরীরের অনুপাতে ইহাদের জোর কত বেশী। যদি তুমি অসাবধান ভাবে ছিপটি মারো কিংবা মাছ লইয়া খেলাইতে থাক, তাহা হইলে বর্শীর ছিপ ভাগিয়া যাওয়া আদৌ অসম্ভব নহে।

এই মাছ সাধারণতঃ তীরের কাছাকাছিই আসিয়া থাকে। আমি কোন পুকুরে ইহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। মান্দ্রাজের ফোর্ট ডিচ্ অঞ্চলে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ; আফিয়ারের ফাম্ম অ্যানিকাটের কাছেও সুস্বাদু এই মাছ পাওয়া যাইয়া থাকে। আমার মনে হয়, যে মৎস্য শিকারের জন্য ইহা পুকুরে ছাড়িয়া দিয়া অসীম আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে। ইহার সগোত্র আর এক শ্রেণীর মাছ আছে, তাহার নাম এট্রোপ্লাস মকুলেটাস্ : পেটটী গম্বুজের মত, পাশে কালো দাগ দেখা যাইবে। ইহাদিগকে সহজেই পুকুরে পোষ মানান যাইতে পারে পোকা খাইতেও ইহারা অনভ্যস্ত নহে।

চেলা মাছ

চেলা মাছকে প্রায় প্রত্যেক পুকুর হইতেই আবিষ্কার করা যাইতে পারে। মাছি, ভাতের কণা, পেষ্ট কিংবা পোকা একটী ১৪নং শ্লেক্ বেণ্ড্ হুকে পরইয়া ইহাকে জলের এক ফুটের মধ্যে ফেলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ফাৎনা ব্যবহার করিতে ভুলিও না। লেবিয়ো মাছের জন্য যে প্রকার ফাৎনা ব্যবহার

করা হয়, তাহার অর্দ্ধ দৈর্ঘ্য এবং ঘনত্বের পরিমাপে ইহার জন্য ফাংনা তৈয়ার করিবে। অনেক সময় এই মাছ ধরিবার সময় চালের কুঁড়া ফাংনার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের

চিতল বোয়াল প্রভৃতি মাছ ধরিবার পক্ষে চেলা ভাল আধার বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত কোমলাঙ্গ; কাজেই শীঘ্রই ইহারা অন্যান্য মাছের মুখে-মুখেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত

চেলা মাছ

লোকের মত ইহারা হুড়মুড় করিয়া আসিয়া হাজির হইবে। খৈ চূর্ণ করিয়া ছড়াইয়া দিলে আরো ভাল হয়।

হইয়া থাকে। এগুলিকে খাইতেও একপ্রকার মন্দ লাগে না।

কয়লার ফিল্টার পরিষ্কার করার প্রণালী

প্রথমতঃ অঙ্গার বা কয়লাগুলি ব্রাস দিয়া ঘষিবে অথবা অধিক দিনের জমা ময়লা থাকিলে ছুরি দিয়া চাছিয়া ফেলিবে। পরে এক কোয়ার্ট জলের মধ্যে এক আউন্স হাইড্রোক্লোরিক এসিডে কয়লাগুলি ভালরূপে ভিজাইবে। পরে উহাতে অল্প কয়েক খণ্ড পটাশ পারমাঙ্গানেটের দানা ফেলিয়া দিবে, যেন জলটা বেগুনী রং হইয়া যায়। এইরূপ সলিউসনে ভাল করিয়া কয়লাগুলি ধুইয়া উহা পুনরায় পরিষ্কার জলে ধৌত করিবে। তারপরে আগুনের কাছে শুকাইয়া লইবে। যদি এমন হয় যে কয়লাগুলি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, উহা সরানো যায় না, তবে তিন পাইন্ট জলে ১ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ এবং কয়েকটি পটাশ পারমাঙ্গানেটের দানা মিশাইয়া ফিল্টারের মধ্যে ফেলিবে।

মেজে পালিশ

বড় সাইজের একখানি বিশুদ্ধ মোম লইয়া উহা র্যাঁতার সাহায্যে খুব সুন্দররূপে চূর্ণ করিবে। তারপর কোয়ার্টার পাউণ্ড ফ্রেঞ্চ চক্ লইয়া উহা তাহার সহিত ভাল করিয়া মিশাইবে। ঢাকনীর উপরে অনেকগুলি ছিদ্র-সংযুক্ত একটি টিনের কৌটায় উহা রাখিবে, এবং প্রয়োজন মত মেজের উপর ছিটাইয়া দিবে।

মেজের দাগ

গরম জলে পারমাঙ্গানেট অব পটাশ গুলিয়া মেজের উপর দুই পরদা পেইন্ট দিবে।

ধাতুদ্রব্য পালিশ

১২০ ভাগ ফুটন্ত জলে ১৫ ভাগ অক্সালিক এসিড মিশাইয়া উহাতে পাঁচশত ভাগ গুঁড়া করা পিউমিস্ ষ্টোন ৭ ভাগ তার্পিন তেল ৬০ ভাগ নরম সাবান ৬৫ ভাগ লার্ড একত্র করিয়া কাদায় পরিণত করিবে। এই কাদায় যে কোন ধাতু দ্রব্যের জিনিস খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হইবে।

সুগন্ধি প্রসাধনের সাবান

পাম অয়েল ৮ পাউণ্ড, নারিকেল তৈল ২ পাউণ্ড, সোডা লাই ৫ পাউণ্ড (শতকরা ৩৬

ভাগ), এল্‌কহল ৪ পাইন্ট, থাইম অয়েল ৩ ড্রাম, ল্যাভেণ্ডার তৈল ৩ ড্রাম, কেসিয়া তৈল ৪ ড্রাম, ক্লোভ তৈল ২ ড্রাম, সাইট্রোনেলা তৈল ২ ড্রাম সংগ্রহ করিবে। গরম ভাবরা বা ওয়ার্ম বাথ দিয়া তেল গুলি গলাইয়া ফেলিবে। তারপর উহা নামাইয়া প্রায় ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত নাড়িতে থাকিবে, তৎপরে লাই ও এল্‌কহল একসঙ্গে মিশাইয়া উহা একটি পাত্রে জলের ভাবরা (Water bath) দিবে, অপর একটি পাত্রে তেলগুলিকে (water bath) দিবে। পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত উহাতে তাপ দিবে, কিন্তু সাবধান দেখিবে উহা যেন না ফুটে। তৎপরে দুইটি মিশ্রিত জিনিষ একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিবে। যখন উপরে ফেনা বা গাঁজ জমিবে তখনই বুঝিবে সাবান হইয়াছে। ফেনা বা গাঁজ উঠা হইলেই উহা একটি টিনে ঢালিবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ঠাণ্ডা করিবে। ইহার পরে তেলগুলি এক পাউণ্ড এল্‌কহল ও ১ পাউণ্ড গ্লিসিরিণে একত্রে মিশাইয়া বলের আকার বা যে কোন প্রকার আকার করিয়া লইতে পারিবে।

লাইম ক্রীম

সমানভাগে নাট অয়েল ও পূর্ণ শক্তির লাইম ওয়াটার লইয়া লেবু ও সাইট্রোনেলা তেল দিয়া সুগন্ধি করিবে। জিনিসগুলি না মিশা পর্য্যন্ত ঝাঁকিতে থাকিবে। বাদাম তেল ও লাইম ওয়াটার দ্বারাও ইচ্ছামত সুগন্ধি মিশাইয়া লাইম ক্রীম করা যায় সব সময়েই লাইম ওয়াটারের সহিত মিশাইবার পূর্ব্বে সুগন্ধিগুলি তেলের সহিত মিশাইবে।

দেয়াল রং

ঘরের দেয়াল নিম্নলিখিতরূপে রং করা যায়। ১৬×২০ ফিট স্কোয়ার কোন ঘরের দেয়ালে যদি দুই পোঁচ রং করিতে হয় তবে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। উহাতে ½ পাউণ্ড ফিকা রং এর গ্লু এবং পাঁচ অথবা ছয় পাউণ্ড প্যারিস হোয়াইট লাগিবে। একটি টিনের মধ্যে প্রায় এক কোয়ার্ট গরম জলে এক রাত্র গ্লু ভিজাইয়া রাখিবে। যদি পরদিন দেয়াল রং করিতে হয়, তবে গ্লু এর সহিত আরও এক পাইন্ট জল মিশাইবে। আঠাপূর্ণ টিন পাত্রটি তখন একটি ফুটন্ত জলের কেট্‌লির মধ্যে বসাইবে। ইহাতে আঠা আর শুকাইতে পারিবে না। তার পর একটি বড় জলের পাত্রে প্যারিস হোয়াইট রাখিয়া উহাতে গরম জল ঢালিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত তরল পদার্থটি খুব ঘন দুধের মত না হইবে সে পর্য্যন্ত উহা নাড়িতে থাকিবে। তারপর

সাদা গুঁড়ার সহিত উপরোক্ত তরল আঠা মিশাইয়া বেশ করিয়া ঝাঁকিবে। তৎপরে চুণ কাম করার ব্রাস অথবা বড় রং করা ব্রাস দিয়া দেয়ালে লাগাইবে।

টুপী ও কাপড়ের রং লাগাইবার উপায়

এক আউন্স করিয়া বোরাক্স এবং ক্যাম্ফর লইবে। তৎপরে উহা এক কোয়ার্ট ফুটন্ত জলের সহিত মিশাইবে। যখন উহা ঠাণ্ডা হইবে তখন এক পাইণ্ট মেথিলেটেড স্পিরিট যোগ করিয়া বোতলে রাখিবে, এবং বেশ ভালরূপে ছিপি আটিয়া দিবে। যখন ব্যবহারের প্রয়োজন তখন একটী স্পঞ্জ দিয়া উহা টুপীতে বা কাপড়ে লাগাইবে। ইহাতে জিনিসটি যেমন পরিস্কার হইবে, তেমনি উহার রং জাগিবে।

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার

৪ ড্রাম মৃগনাভির এসেন্স, ৪ ড্রাম এম্বার গ্রিসের এসেন্স, ১০ ফোঁটা অয়েল সিনেম্যানন্, ৬ ড্রাম ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার, ২ ড্রাম অয়েল অব জিরেনিয়াম, ২০ আউন্স স্পিরিট অব ওয়াইন একসঙ্গে মিশাইলেই বেশ ভাল ব্যবহারোপযোগী ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত হইবে।

কোল্ড ক্রীম

এক পাউণ্ড বাদাম তেল, ৪ আউন্স হোয়াইট ওয়াক্স একটি মাটির হাঁড়িতে একসঙ্গে গলাইবে। যখন উহা প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে, তখন ১২ আউন্স রোজমেরিতে ক্রমে ক্রমে নাড়িতে থাকিবে।

কেশ তৈল

এক পাইণ্ট অলিভ অয়েল বা জলপাই তৈল, ১২ ফোঁটা অটো অব রোজ ১ ড্রাম অয়েল অব রোজ মেরি মিশাইলে উত্তম সুগন্ধ কেশ তৈল হইবে।

আমেরিকান টুথ পাউডার

কাট্‌লফিসের হাড়, কোরাল ও ড্রাগন ব্লাড প্রত্যেকের আট ড্রাম লাল স্যাণ্ডার্স, ফটকিরি পোড়া প্রত্যেকের চারি ড্রাম, ওরিস (বচ) মূল ৮ ড্রাম, ক্লোভ (লবঙ্গ) এবং সিনেমন (দারুচিনি) প্রত্যেকের ½ ড্রাম, ভেনিলা ১১ গ্রেণ, রোজ উড্‌ ½ ড্রাম,রোজ পিঙ্ক ৮ ড্রাম। এই সকল জিনিস মিশাইলেই উত্তম আমেরিকান টুথ পাউডার হইবে।

রাত্রির আলো (শোবার ঘরে)

সাধারণ মোমবাতি হইতে যে সব মোম গলিয়া গা বাহিয়া পড়ে, এবং পুড়িতে পুড়িতে শেষ অংশ যে টুকু থাকে উহা সংগ্রহ করিয়া উহার সহিত কিছু সাদা মোম মিশাইবে। উহা গলাইয়া একটি আংটির মত মোটা লম্বা টিনের কৌটায় অথবা লম্বা বড়ির কোটায় ভরিবে। মোম তরল থাকিতে উহার মধ্য দিয়া সুতা চালাইয়া দিবে।

নিকেল প্লেটিং

কোন ঔষধের দোকান হইতে চারি পয়সা পরিমাণ মূল্যের নাইট্রেট অব সিল্‌ভার সলিউসন এবং ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার কিনিয়া ছোট একটী পাত্রে

রাখিবে। যে পর্য্যন্ত তলানী পড়া শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত উহার সহিত সাধারণ লবণের সলিউসন মিশাইবে, তারপর জলটা ফেলিয়া দিবে, জল ফেলিবার পরে যে তলানী পড়িয়া রহিল উহাই ক্লোরাইড অব সিলভার। ইহার সহিত তিন আনা ওজনের লবণ মিশাইবে। তারপর অল্প গরম জলে নাড়িয়া কাদার মত করিবে। যে জিনিস প্লেটিং করিবে উহা বেশ পরিষ্কার করিয়া তদুপরি উপরোক্ত কাদা বা পেষ্ট ব্যবহার করিবে।

আয়নার কোন অংশে পারা উঠিয়া গেলে তাহা মেরামতের উপায়।

যে অংশ হইতে পারা বা সিল্ভারিং উঠিয়া গিয়াছে, উহা ভাল করিয়া তুলিয়া ফেলিবে। কাঁচখানি পরিষ্কার করিয়া ঐ দাগের চারিদিকে মৌচাকের মোম লাগাইবে। তদুপরি কিছু সিলভার অব নাইট্রেট ঢালিয়া দিবে। তৎপরে উহা চিনি অথবা লবঙ্গ তৈল (অয়েল অব ক্লোভস্) অথবা স্পিরিট অব ওয়াইন দিয়া তলানী ফেলিবে। ইহাতে মেরামতের স্থানের চতুর্দ্দিকে আর কোন সাদা দাগ পড়ে না।

ভারতীয় মালবাহী জাহাজ ও বৃটীশ স্বার্থের সংঘর্ষ

ভাড়া হ্রাসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিযোগিতা

সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ তাঁহার বাৎসরিক বক্তৃতায় বলিতেছেন :—

"ব্যালান্স-সিট বা লাভ-লোকসানের খতিয়ানে দেখা যাইতেছে যে কোম্পানী আলোচ্য বর্ষে ২,৯৫,৬০০ টাকা ৮ আনা ও ৭ পাই লাভ করিয়াছে। আমি গত বৎসরের বক্তৃতায় বলিয়া ছিলাম যে, ভাড়ার হার অর্থনীতির দিক দিয়া সুবিধাজনক না হওয়ায় এবং বিল অফ্ লেডিং (Bill of lading) এর দেনা পাওনার চুক্তি অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠায় জাহাজ চালানো দায় হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাল জাহাজে পাঠাইবার অর্ডার shipping order সর্ত্তের মধ্যে আসে না বলিয়া বিপদ আরো বাড়িয়া গিয়াছে।

ভাড়া হ্রাসের যুদ্ধ

ইহা ছাড়াও দুইটী বিশিষ্ট কারণের জন্য কোম্পানীর রিপোর্টে লাভের অঙ্ক বেশী করিয়া দেখানো যাইতে পারে নাই। ডিরেক্টারগণ নিজেরাই বলিয়াছেন যে বিদেশী জাহাজের অন্যায় প্রতিযোগিতার জন্য উপকূলবাহী ভারতীয় জাহাজ চালানো অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অনেকস্থলে ভাড়ার হার ৫০ হইতে ৭৫ পার্সেণ্ট পর্য্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও ছোট ছোট দেশী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি ব্যবসার সর্ত্ত সমূহ পালন করিয়া চলিয়াছে, তবুও বৃটিশ কোম্পানীগুলি উহাদিগকে অনধিকার প্রবেশ-কারী বলিয়াই মনে করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীগুলির অবাধ প্রতিযোগিতা স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতে থাকে; কিন্তু যেই মাত্র দেশী ষ্টীমার কোম্পানী সমুদ্র উপকূলে হাজির হইল, অমনি আরম্ভ হইল ভাড়া হ্রাসের যুদ্ধ। সমান ভাড়ায় প্রতিযোগিতা করিবার সদিচ্ছা তাহাদের আদৌ দেখা যাইতেছে না। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এককালে এমনি করিয়াই লোপ পাইয়া গিয়াছিল; যে শিশু কোম্পানীগুলি দেশের উপকূল বাণিজ্য পুনর্গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও বৃটিশ স্বার্থের সংঘাতে বারে বারে প্রতিহত হইয়া আসিতেছে।

এই সমস্ত কারণে বাধ্য হইয়াই স্বদেশী কোম্পানীগুলি গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যদিও লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লির অনেক মেম্বার এই অন্যায়

প্রতিযোগিতায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তবুও গভর্ণমেণ্ট মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করা ছাড়া কার্য্যতঃ আর কিছুই করে নাই। দেখা যাইতেছে, শক্তিশালী বৃটিশ স্বার্থের খাতিরে গভর্ণমেণ্টও কতকটা উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন; তাহাদের অবস্থা অসহায় শিশুর মত। ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য নৌ-বহর সৃষ্টির কথা দূরে থাকুক, সামান্য উপকূল-ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্যও গভর্ণমেণ্ট কোন পন্থা অবলম্বন করিতেছেন না। ইহা কি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় নহে? ভারতে বর্ত্তমানে ৪টী দেশী জাহাজ কোম্পানী কাজ করিতেছে। উহাদের নাম, ইষ্টার্ণ ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, দি ন্যাশন্যাল ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী, দি মালাবার ষ্টীম সিপিং কোম্পানী এবং মার্চেণ্টস্ ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী।

ভারতীয় জাহাজগুলিকে অনধিকার প্রবেশ-কারী বলিয়া মনে করা ব্যতীতও বিদেশী কোম্পানীগুলি চুপে-চুপে ভাড়া হ্রাসের প্রতি-যোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে রপ্তানীকারকের মাল সস্তায় পাঠাইবার প্রলোভন দেখাইয়া আরো গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, কয়েকটী লাইনে নির্দ্ধা-রিত মাশুল অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। একটী ছোট ষ্টীমার বোম্বাই হইতে তুতিকোরিন পর্য্যন্ত মাল কনফারেন্স রেটে নিতে রাজী হইলে অমনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—বার আনায় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত ছিল—তাহা কমাইয়া প্রতি ব্যাগে বা ছালায় মাত্র তিন আনা করিয়া দিল।

এইরূপ বিপদের সময়ে কোম্পানী যে খুব ভাল ফল দেখাইতে পারিবে, তাহা অসম্ভব। যদি ব্যয় সঙ্কোচ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কার্য্য সমাধা করা না হইত,তাহা হইলে কোম্পানীর অবস্থা যে আরো খারাপ হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেকস্থলে মাহিয়ানা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অনেক স্থলে উহা স্বেচ্ছায়ই সম্পন্ন হইয়াছে, অনেককে আবার দুঃখের সহিত কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। জাহাজস্থ লোকদের রসদ বিলেরও (Victualling Bill) পরিবর্ত্তন সাধিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণের জন্যই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়লার অল্প খরচ এবং অন্যান্য কারণের জন্যও কিছু ব্যয়সঙ্কোচ হইয়াছে। এই সমস্ত কথা পূর্ব্বাপর একত্রে ভাবিলে কোম্পা-নীর লাভের অঙ্ক যে একেবারে নৈরাশ্যজনক হই-য়াছে, তাহা কেহই বলিবেন না।"

মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ তাঁহার বার্ষিক অভি-ভাষণে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষীরই প্রণিধানযোগ্য এবং গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য আছে, তাহা জানিতে আগ্রহ হওয়াও স্বাভাবিক। গত গোলটেবিল বৈঠকের সময় বৃটিশ ডেলিগেটগণ বলিয়াছিলেন যে ভারতীয়গণ যদি উপকূল-বাণিজ্য নিজেদের জন্যই রাখে তাহা হইলে উহা বৃটিশ মূলধন আত্মসাতের নামান্তর মাত্র হইবে। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ কিন্তু একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে উপকূল-বাণিজ্য স্বদেশের জন্য রাখিয়া দেওয়ার নাম আত্মসাৎ করা নহে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ড আর-উইনের সভাপতিত্বে একটী নৌ-কন্‌ফারেন্স বসে এবং তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট স্বদেশী নৌ-বহর সৃষ্টি করিবার স্পৃহাকে অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে দেখিতেছেন; কিন্তু

ইহার পথে যে কতকগুলি অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতেছেন।

মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের বক্তৃতায় যে গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা পরীক্ষা করিবার সুযোগ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা এইস্থলে চিন্তনীয়। দেশের উপকূল বাণিজ্যের কি ব্যবস্থা করা হয়, তাহা দিয়াই গভর্ণমেণ্টের 'সহানুভূতির' প্রকৃষ্ট পরীক্ষা হইবে। বিলিতি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ম যাহারা উচ্চরব তুলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে বৃটীশ বণিকেরা ভারতীয় উপকূলে অন্যায় প্রতিযোগিতা দ্বারা তাহাদের ব্যবসা চালাইতে চাহে না, তাহাদিগকেও এই সঙ্গে যাচাই করিয়া লওয়া যাইবে।

চিনির কলওয়ালাদের কনফারেন্স

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি গোরক্ষপুর চিনি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্ম মিলওয়ালাদের একটী বৈঠক বসিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট রক্ষণনীতি অবলম্বন করার পর হইতে প্রায় ২৫টী মিল স্থাপিত হইয়াছে এবং উহারা শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই কন্‌ফারেন্সে একটী চুক্তি হইয়াছিল যে কলের মালিকগণ ইক্ষু উৎপাদকদের সঙ্গে একটী সর্ত্তে আবদ্ধ হইবে যে তাহারা প্রতিমণ ইক্ষুর জন্ম ৫ আনা করিয়া দিবে। বস্তুতঃ ৫ আনা করিয়া হইলে কলওয়ালারা সহজেই জাভা চিনির সঙ্গে বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত মিলওয়ালারা বাংলা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশস্থ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে ইক্ষু গাড়ী হইতে সরাইবার জন্ম বেশী সময় পাইয়াছেন; ইহাতে মিলগুলির ডিমারেজ (demarrage) চার্জ্জ অনেক কমিয়া যাইবে।

কলিকাতাস্থ ভারতীয় সুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েশনও বি এণ্ড এন ডাবলিউ রেলওয়ের কাছে প্রতিনিধি পাঠাইয়া বোম্বাই, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, কানপর, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় চিনি স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা পাইতেছেন। শোনা যাইতেছে যে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষও বেশী আর্থিক লাভের সম্ভাব্যতায় চিনির ভাড়া হ্রাস করিয়া দিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহাতে একদিক দিয়া যেমন বিদেশী চিনির সঙ্গে দেশী চিনির প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধা হইবে তেমনি আবার মিলওয়ালাদের কর্ম্মক্ষেত্রের চৌহদ্দি অনেকখানি বাড়িয়া যাইবে।

সুগার মিল্‌স্‌ এসোসিয়েশনের অনুরোধে তাহারা ঝোলা গুড়ের ভাড়াও কমাইয়া দিবার কথা ভাবিতেছেন। ইহাতে বাংলা, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবসা দেশী লোকের হাতে আসিয়া পড়িবে। রেলওয়েরও ইহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আশা করা যাইতেছে যে চিনি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়াও হ্রাস হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে গভীর নৈরাশ্য এবং হতাশার ছায়া পড়িতেছে। কেবলই মনে হইতেছে এই সব বৈঠকে **বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী কোথায়?**

বিদেশ হইতে আনীত লবণের উপর শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এদেশে বিদেশী লবণ আসার পথ ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সুযোগে বোম্বাই, সম্বর এবং কাথিওয়াড়ের লবণের ব্যবসায়ীগণ নূতন নূতন লবণের কারখানা স্থাপন করার জন্য এবং যে সকল কারখানা আছে তাহার কাজের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার জন্য বিপুল তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন,—আর বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীরা এতদিনের মধ্যে একটীও লবণের কারখানা স্থাপন করিতে পারিল না। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত কেবলমাত্র একটী লবণের কোম্পানী স্থাপনের সংবাদ মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, কিন্তু আজিও তাঁহারা কাজে নামিবার মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

চিনির সম্বন্ধেও ওই এক কথা। জাভার চিনির উপর রক্ষা শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবামাত্র বিহার এবং উত্তর ভারতে বহু লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গণ্ডায় গণ্ডায় চিনির কল স্থাপিত হইয়া গেল এবং এখনও হইতেছে, আর আমাদের বাংলা দেশে এক সরকার ব্রাদার্স নামধারী একটী কোম্পানী সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেয়ার বেচা সুরু করিয়াছে মাত্র। এইরূপে যখন সুযোগ উপস্থিত হইবে তখন বাঙ্গালীরা নাকে তেল দিয়া ঘুমাইবে, আর তাহাদের আলস্য ও ঔদাসীন্য দেখিয়া অবাঙ্গালী ধনীগণ যেই লবণ ও চিনির কল খুলিয়া জোরের সহিত কারবার চালাইতে আরম্ভ করিবে, তখন বাঙ্গালীরা কানে কলম গুঁজিয়া এবং হাতে দরখাস্ত লইয়া তাহাদের দরজায় চাকুরীর জন্য যাইয়া ধর্ণা দিবে—আর সোরগোল করিয়া বলিবে যে অবাঙ্গালীরা এসে আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে গেল। মুখের অন্ন তুমি যদি নিজে জোগাড় করিয়া নিতে না পার তবে তোমার দেশে হয় অবাঙ্গালী, আর না হয় যে কোন ইউরোপীয় বা এসিয়াটিক জাতি আসিয়া কাড়িয়া খাইবে। তোমাদের ধনীরা কেবল পোষ্ট্যাল্‌ ক্যাশ সার্টিফিকেট ও সরকারী কাগজ কিনিবে, আর মধ্যবিত্ত লোকদের ত' ভাঁড়ে ভবানী; সুতরাং দেশের শিল্প বাণিজ্য গড়িবে কাহারা?—এই দারুণ দুর্দ্দশার জন্যই অবাঙ্গালীরা একে একে সকল অর্থাগমের ক্ষেত্রই দখল করিয়া বসিতেছে।

এ সম্বন্ধে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী "বঙ্গবাণী" যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"চিনির ব্যবসায়ে সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপনের পর হইতে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই ব্যবসায়ের বিপুল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট আন্দোলন করিয়া আসিতেছি এবং বাঙ্গলার যে সকল জেলায় পূর্ব্বে গুড় ও চিনি প্রভূত পরিমাণে

উৎপন্ন হইত সেগুলিতে ঐ সকল ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন সাধনকল্পে দেশবাসীর নিকট বারম্বার অনুরোধ জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ দেখা যাইতেছে, সমগ্র বাঙ্গলা দেশে মাত্র দুইটী কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—আর বিহারে হইয়াছে পঁচিশটি। বাঙ্গলার আর্থিক দুরবস্থা বিহারের তুলনায় কিছু মাত্র কম নয়—বরং বিহারের সরকারী শিল্পবিভাগ হইতে যে বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে জানা যায় যে, তথায় শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন—সরকারী তহবিলে অর্থাভাব-বশতঃ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য বহু প্রতিষ্ঠান মুমূর্ষু—অনেকগুলি চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই দুরবস্থা সত্ত্বেও বিহারের ব্যবসায়িগণ নিরুদ্যম হন নাই। তাঁহারা নব নব পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য সঞ্জীবিত করিয়া শিল্প ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। বিহারে যে সকল চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলির কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—আগামী মাস হইতে সেগুলির মাল বিক্রয় সুরু হইবে। এ অবস্থায় নূতন ব্যবসায়ের সকল প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নব-গঠিত ভারতীয় চিনি-কল-সমিতির পরিচালকগণ গোরখপুরে এক সভায় সম্মিলিত হন। এই সভায় যে সকল কলের মালিক উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে—এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্গালীর হাতে চলিয়া যাইতেছে—এবং বর্ত্তমানে যাহারা এ ব্যবসায়ে নেতৃত্ব পাইলেন ভবিষ্যতে যে তাহারাই নেতৃত্ব পাইবেন ইহা সহজেই বলা যায়—কারণ একবার নেতৃত্ব হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাওয়া সোজা নয়।

নূতন সমিতির অধিবেশনে নিম্নলিখিত সাতটি কোম্পানীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—মেসার্স বেগ সাদারল্যাণ্ড এণ্ড কোং; এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং; ক্যারু এণ্ড কোং; বিরলা ব্রাদার্স লিঃ; সর্দ্দার কৃপাল সিং; মিঃ সেরওয়ানী; চৌধুরী মুখতার সিং

এই সকল কোম্পানীর তরফ হইতে ব্যবসায় পরিচালন সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে নানারূপ বিধিব্যবস্থা স্বীকৃত ও স্থিরীকৃত হয়। কি দরে ইক্ষু কেনা হইবে—ইক্ষু চলাচলের জন্য রেলের মাশুল কত ধার্য্য হইবে, মাল নামাইতে উঠাইতে কয়দিন করিয়া সময় দেওয়া হইবে—গুড় চালানের জন্য রেলভাড়া কিরূপ হইবে, চিনির মাশুলই বা কত হইবে—মোট কথা ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলি একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে; বুঝা যাইতেছে নূতন ব্যবসায় সুরু হইলে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য রেল কোম্পানী, ইউরোপীয় ব্যবসায় কোম্পানী এবং দেশীয় বণিক সম্প্রদায়—কাহারও মধ্যে কোনও-রূপ মতভেদ বা বিরোধ থাকিবে না—যতদিন ভালভাবে ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন না হইতেছে ততদিন বিরোধের কোনও প্রয়োজন নাই, সম্ভাবনাও নাই; আর সরকারী ব্যবস্থায় উচ্চহারে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এ-ব্যবসায় যে কিছুকালের জন্য বেশ ভালভাবেই চলিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা ও আসামেই বিহারের কলে প্রস্তুত চিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলিবে এবং নূতন ব্যবসায়িগণ এই দুই প্রদেশের উপর নজর রাখিয়া তাঁহাদের কার্য্যবিধি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। বাঙ্গলায় প্রতিবৎসর অন্ততঃ বিশকোটী টাকার বিদেশী চিনি আমদানী হয়—আর ইহার অর্দ্ধেক যে বাঙ্গলায় ব্যয় হয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই দশ কোটী টাকা ঘরে রাখিবার জন্য সকল প্রকার সম্পদ বাঙ্গলা দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও, বাঙ্গালী আমরা, নিজেদের আলস্য, ঔদাসীন্য ও ভীরুতার ফলে ইহার কোন সুযোগ বা সুবিধাই উপভোগ করিতে পারিতেছি না—আর দেশবিদেশের ভ্রাম্যমান বণিকের দল ইহার সকল সুবিধা করায়ত্ত করিবার জন্য সাগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেছে।

কিন্তু এখনও সময় বা সুযোগ শেষ হইয়া যায় নাই।

বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম প্রদেশে নিত্য যে পরিমাণ চিনির প্রয়োজন, তাহা মাত্র পঁচিশটি কলেও কুলাইতে পারা যাইবে না। এখনও যশোহর, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে, নদীয়ার রাণাঘাট মহকুমার অনেক স্থানে এবং অন্যান্য জেলার বহু স্থানে ইক্ষু চাষ এবং চিনির কল প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক অনটনের দিনে বাঙ্গলা দেশের শ্রমিক যে বিহারী শ্রমিকের তুল্যমূল্যেই পাওয়া যাইতে পারিবে এ-আশাও সহজে করা যাইতে পারে। একমাত্র উৎসাহ সহকারে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলেই সকল বাধা দূর হইয়া যাইবে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কি এইটুকুও করিতে পারিবে না?

———

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞাপন

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের তৃতীয় সেডুল-ধৃত সাধারণ মহলগুলির (constituency) আগামী চতুর্থ মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের জন্য প্রারম্ভিক নির্ব্বাচক-তালিকা প্রস্তুত হইয়া ১৯৩২ সনের ১৫ই নভেম্বর ছাপা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে যাহাদের নাম উক্ত তালিকাভুক্ত হয় নাই কিংবা যদি এমন কাহারও নাম তালিকায় উঠিয়া থাকে যাহার নাম উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে কাহারও আপত্তি থাকে, তাঁহারা যেন একটা লিখিত পত্রে সমস্ত বিবরণ দিয়া উহা ১৯৩২ সনের ২০শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যা ৫টার পূর্ব্বেই কলিকাতায় ৫নং স্যুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডে অবস্থিত সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সংশোধক মণ্ডলীর কর্ত্তার কাছে প্রেরণ করেন। যাঁহারা এরূপ দাবী করিবেন কিংবা কোন প্রকার আপত্তি তুলিবেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের যুক্তিগুলির বিশদ বিবরণ দিয়া নিম্নে নিজের নাম সহি করিতে না ভুলেন। প্রারম্ভিক তালিকাভুক্ত নামের জন্য যদি কোন প্রকার দাবী উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে উহারও বিশেষ বিবরণ দিতে হইবে। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোম্পানী, ফার্ম্ম, যুক্ত-পরিবার এবং অন্যান্য এসোসিয়েশনের মধ্যে যেগুলির ভোট দিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা কেবল মাত্র তাহাদিগের মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারাই ভোট দিতে পারে। যদি তাহাদের মনোনীত কোনও প্রতিনিধির নাম কোন কারণে রেজেষ্টারীভুক্ত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা যেন নির্দ্ধারিত সময়ে কিংবা তৎপূর্ব্বেই উহা সংশোধক মণ্ডলীর (Revising Authority) কর্ত্তার কাছে বিজ্ঞাপিত করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে নির্ব্বাচন তালিকার কোনপ্রকার ভুল ভ্রান্তি আর সংশোধন করা হইবে না।

প্রত্যেক মহলের নির্ব্বাচন-তালিকার সম্পূর্ণ লিষ্ট কলিকাতা সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে রক্ষিত আছে, অফিসের সময়ে উহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। কেহ ক্রয় করিতে চাহিলে উহার কাপি সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ডস্ ডিপার্টমেণ্টে পাইবেন। ১৬ পৃষ্ঠাধিক এইরূপ এক মহলের তালিকার মূল্য ১৲ টাকা, ১৬ পৃষ্ঠা কিংবা তাহার চেয়ে কম হইলে ৷৷৹ আনা। বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে কলিকাতায় সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের ইলেক্টোরাল রোল অফিসারের কাছে আবেদন করুন।

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩২

জে, সি, মুখার্জ্জি
চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার।

ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিজ্ঞাপন দিবেন কেন ?

তাহার উত্তর আমরা দিতেছি :—

১। বর্ত্তমান দুঃখ দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার দিনে এই ধরনের কাগজ পড়িবার জন্য সকলেই ব্যাকুল, সুতরাং যে কাগজ পড়ার জন্য বেশী লোকে ব্যাকুল, সেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

২। ইহার একটা পরখ যদি করিতে চান, তবে টেবিলের উপর প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, প্রবর্ত্তক, গল্পলহরী, মানসী, কজ্জলী, বিজলী, বিচিত্রা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মাসিকের সঙ্গে একখানা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" রাখিয়া দিন। দেখিবেন অধিকাংশ লোকই ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাতা ওল্টাবার জন্য ব্যগ্র ! এই হিসাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ।

৩। বিজ্ঞাপন দাতার সব সময় বিচার ক'রে দেখা উচিত (discriminate) যে, কোন শ্রেণীর লোকে তাঁহার বিজ্ঞাপন পড়ে এবং তাহাদের purrchasing power বা কিন্‌বার ক্ষমতাই বা কতটুকু। হোতে পারে হয়ত অমুক মাসিকে ন্যাংটা ছবি ও প্রেমের গল্পের, হাট বাজার, সুতরাং বহুলোক এই মাসিক খানি পড়ে। কিন্তু একটু তালিয়ে দেখ্‌লেই বোঝা যায়, সেই সব পাঠকদের পনর আনাই ছাত্র অথবা অল্প বেতনের চাকুরে যুবক, যারা হয় এখনও উপার্জ্জনক্ষম হয়নি আর না হয় তাদের এমন কোন আয় নাই। বিজ্ঞাপনের দিক থেকে দেখিলে, এই সব পাঠকদের purchasing power বা কিন্‌বার ক্ষমতাই এখনও জন্মায় নি।

সুতরাং তাঁদের কাছে বিজ্ঞাপন প্রচার করা আর বেণাবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৪। "ব্যবসা ও বাণিজ্য" বেকারের বন্ধু এবং ব্যবসায়ীর সুহৃদ্। ইহার যাহারা গ্রাহক পাঠক তাঁহারা হয় ব্যবসায়ী, নাহয় ব্যবসা করিবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন, আর না হয় খরিদ্দার— কোথায় কোন্ জিনিষ কিনিতে পাওয়া যায় তারই বিজ্ঞাপন খুঁজিতেছেন। এবং হয় জিনিষের দরকারে না হয় ব্যবসা করার জন্য কোন না কোন জিনিষ কিন্‌বেন। ইঁহাদের purchasing power বা কিন্‌বার ক্ষমতাও আছে ; সুতরাং বিজ্ঞাপনের দিক্ থেকে যে কাগজের গ্রাহক ও পাঠক অধিকাংশই এই শ্রেণীর, সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও শ্রেয়।

৫। ব্যবসা ও বাণিজ্য কারবারী কাগজ ব'লে নানারকম জিনিষের গুণাগুণ প্রচার করা ইহার একটা ব্রত। সুতরাং কাগজের মধ্যে নানারূপ প্রবন্ধ লিখে আমরা বিজ্ঞাপন দাতাদের সমস্ত জিনিষের গুণ ব্যাখ্যা করে থাকি এবং এজন্য কোন চার্জ্জ করি না। এই সঙ্গে ফটো, ব্লক প্রভৃতি দিলে আমরা বিনা চার্জ্জেই সে সব পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকি। অন্যান্য সাহিত্যিক কাগজ কখনও এসব করে না, কারণ তাহাদের রীতি বিরুদ্ধ।

৬। **বিজ্ঞাপনদাতারা আপন আপন দোকান সম্বন্ধে অনেক খবর এই কাগজের মারফতে বিনা খরচায় প্রচার করিতে পারেন—যা আর কোনও কাগজ করে না এবং করবে না।**

ফোন বড়বাজার ৫৩৫৫ } **ম্যানেজার—ব্যবসা ও বাণিজ্য অফিস**

নস্য

নস্যের ব্যবহার আজকাল বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। আজকাল প্রায় যুবক বৃদ্ধ সকলেই নস্য লইবার পক্ষপাতী। তামাক হইতে নস্যের জন্ম, কিন্তু এদেশে তামাক আমদানির বহু পূর্ব্ব হইতে নস্যের ব্যবহার প্রচলিত আছে। সংস্কৃত গ্রন্থে নস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন অন্য উপাদানে নস্য প্রস্তুত হইত।

ইউরোপে তামাক আবিষ্কারের পরই নস্যের প্রচলন আরম্ভ হয়। ফরাসী দেশের রাজা এবং তাঁহার অমাত্য ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সখ হিসাবে নস্যের ব্যবহার চলিত। ক্রমে উহা সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আধুনিক যুগের প্রারম্ভে উহার প্রচলন ও আদর অনেক কমিয়া যাওয়ার পর আবার উহার চাহিদা বাড়িয়াছে। গত ৫ বৎসরের মধ্যে লণ্ডন সহরে নস্যের কাটতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাজ্যেও নস্যের ব্যবহার তদ্রুপ বাড়িয়াছে।

বিলাতের হাডার্স ফিল্ডে কেবল নস্য গ্রহণের জন্য ক্লাব আছে। এখানে নানারূপ নস্য নানা প্রকার সুদর্শন নস্যাধারে স্থান লাভ করিয়া ক্লাবের সভ্যদিগের নিকট সর্ব্বদাই বিরাজ করে। অন্যান্য ক্লাবের অন্যান্য বিলাস আয়োজনের মধ্যে নস্যের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বৃটীশ পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সের প্রধান প্রবেশ দ্বারে সদস্য-দিগের জন্য ঐরূপ একটি নস্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। মহাসভার কোন পূর্ব্বতন নস্যপ্রিয় সদস্য তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার উইলে এই নস্যের জন্য কিছু অর্থ দান করিয়া যান এবং তাহা হইতে পার্লামেণ্টের প্রবেশ দ্বারের ঐ ব্যবস্থা অল্পদিন হইল কর্ণেল ড্রেক নামক এক ইংরাজ নস্য প্রিয়দের সুবিধার জন্য কোন সমিতিকে ৫০ পাউণ্ড উইল করিয়া গিয়াছেন।

অনেক নস্যসেবীর বিশ্বাস, নস্য ব্যবহারের ফলে সর্দ্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, নস্য গ্রহণ করিলে হৃত দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে। স্থানে স্থানে ইহার উদাহরণও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। কয়েক বৎসর নস্য ব্যবহারের পর নাকি চশমা ব্যবহার না করিয়া পঠন কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল। এ সকল

কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রমাণিত হয় নাই। তবে যাহারা যে সকল নেশার পক্ষপাতী তাহারা সেই সকল নেশার দ্রব্যের সুখ্যাতি প্রায়ই করিয়া থাকে। যদি সত্যই কোন সুফল হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সপ্রমাণ করা প্রয়োজন। 'নাসাল' মহাশয়দের শুধু বিশ্বাসেই কোন কিছু সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

১। তামাক নানাপ্রকারের আছে। যথা —পোলো, মতিহার, হিংলী, পুমো প্রভৃতি। এই সকল তামাকের চাষ দেশের সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণিয়া ও চম্পারণ জেলার তামাকই প্রসিদ্ধ। এই কার্য্যের (নস্য, দোক্তার ব্যবসার) জন্য উক্ত স্থান হইতে হিংলী ও মতিহার তামাক আনানই কর্ত্তব্য

২। প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে তামাকের পাতাকে রৌদ্রে বা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া শিলায় চূর্ণ করিতে হয়। গুঁড়া যেন খুব মিহি হয় (এজন্য সূক্ষ্ম চালুনি দ্বারা চালিয়া নিতে হইবে) তাহার পর উক্ত গুঁড়ার সহিত গোলাপজল বা ল্যাভেণ্ডার অথবা ইচ্ছানুযায়ী যে কোন প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত ও সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিবেন। এইরূপে ৪।৫ বার করিয়া খুব মিহি চালুনি দ্বারা চালিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নস্য প্রস্তুত হইবে।

খাম্বীরা প্রস্তুত প্রণালী

বেশ পাকা ফল কতকগুলি লইয়া কাটিয়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিতে হইবে। দরকার হইলে খোসা ফেলিয়া দিবে। একটা বড় মাটীর হাঁড়িতে ফলগুলি রাখিয়া তাহার উপর মাতগুড় ঢালিয়া দিবে। হাঁড়িটী বেশ করিয়া ঝাঁকা হবে যেন সব ফলের গায়েই ভাল করিয়া মাতগুড় লাগে। হাঁড়ির উপর মাটীর সরা বসাইয়া তাহার চারিদিকে মাটীর প্রলেপ দিয়া বাতাস যাইবার পথ বন্ধ করিবে। হাঁড়ির এক চতুর্থাংশ খালি রাখিবে—সম্পূর্ণ ভরিবে না। ঠাণ্ডা অথচ ভিজে নয় এমন স্থানে মাটীর ভিতর হাঁড়িটী পুতিয়া রাখিবে। কিন্তু হাঁড়ির মাথাটি যেন বাহিরে থাকে। মাতগুড় ধীরে ধীরে পচিয়া এক হইতে ছয় মাসের মধ্যে খাম্বীরা প্রস্তুত হইবে।

সুবাসিত নারিকেল তৈল প্রস্তুত প্রণালী

১। উৎকৃষ্ট কোচীন নারিকেল তৈলকে প্রথমতঃ জ্বাল দিয়া পরে কাঠের কয়লার উপর ঢালিতে হইবে। ঐ তৈল কয়লার সহিত এক দিবা রাত্রি ভিজিলে নারিকেল তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট হইয়া যায় অথবা, ১৫ দিনকাল পাট পাতা ও গোলাপ ফুলের কুঁড়ির তৈলে ভিজাইয়া রাখিলেও তৈলের গন্ধ নষ্ট হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ায় গন্ধ নষ্ট হইলে পর তাহাকে পরিষ্কার কাপড় বা ফ্লানেল দ্বারা ছাকিয়া লইবেন—ক্রমশঃ দুই তিনবার ছাকিতে হইবে। ২.৩ বার এইরূপ ছাঁকিলে তৈল বেশ পরিষ্কার ও তরল হইবে। যদি রং করিতে চাহেন তাহা হইলে আবশ্যকমত পরিষ্কার য়্যাল্কানিরুট মিশ্রিত করিলে পর দ্বাদশ ঘণ্টা মধ্যে তৈল ঘোর গোলাপী রঙে পরিণত হয়।

তৈলে য়্যাল্কানিরুট মিশ্রিত করিবার নিয়ম :—

পরিস্কৃত নারিকেল তৈল ৬ সের, য়্যাল্কানিরুট ৬ ড্রাম উক্ত প্রকারে বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া রিফাইন হইলে পর শিশি অথবা বোতলে ঢালিয়া রাখিবেন, তৎপরে অভিপ্রায়ানুসারে সুগন্ধি দ্রব্য বা তৈল মিশ্রিত করিবেন।

প্রত্যেক সুগন্ধি তৈলের এক একটী করিয়া বর্ণনা করিতে হইলে সে অনেক লিখিতে হয়, তাই কয়েকটী সুগন্ধি তৈলের নাম দেওয়া গেল :—

১। অয়েল অব স্যাণ্ডেল—ইহাতে চন্দনের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইবে।

২। অয়েল অব নিরোলী—ইহা মিশাইলে কমলালেবুর যেরূপ গন্ধ তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী গন্ধ নির্গত হইবে।

৩। অয়েল অফ লিমন—ইহা মিশ্রিত করিলে কাগজী লেবুর ন্যায় গন্ধ নির্গত হইবে।

৪। অয়েল অব ফস্ফরাস্—ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট ছাঁচি পানের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইবে।

২য় প্রণালী

নারিকেল তৈল ৴১৷৹ সের, চন্দন তৈল অর্দ্ধসের, পচা পাতা অর্দ্ধ পোয়া, বেনার মূল অর্দ্ধ পোয়া, গোলাপ ফুল শুষ্ক অর্দ্ধ পোয়া, হেনা আতর অর্দ্ধ ভরি প্রথমে নারিকেল তৈল পচা পাতা,

বেনার মূল এবং গোলাপ ফুল সহ ১৫ দিন ভিজাইয়া রাখিবেন, পরে যখন দেখিবেন তৈলের গন্ধ আর পাওয়া যায় না তখন হেনা আতর এবং চন্দন তৈল মিশ্রিত করিবেন। রং করিবার জন্য অ্যাল্কানিরুট ব্যবহার করিবেন এবং তৈলকে রিফাইন করিবার জন্য ফ্লানেল কিংবা ব্লটিং কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইবেন।

তৃতীয় প্রণালী

এক বোতল নারিকেল তৈলে পচা পাতা, চন্দন কাষ্ঠ, গোলাপ ফুল শুষ্ক, মেথী, আমলা, পদ্ম কাষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত তৈলে দশ দিন ভিজাইয়া রাখিলে অতি সুন্দর গন্ধ হয়। নিয়মিত সময়ের শেষে মসলাগুলি ছাঁকিয়া, এক আনা মৃগনাভি সেই তৈলে দিয়া রাখিলে তাহার গন্ধ মনোমুগ্ধকর হইবে।

তার এবং তারকাঁটার ব্যবসায়

ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় জাপানী ইয়েনের দাম কমিয়া যাওয়ায় অনেক স্বদেশী ব্যবসায় টলমল করিতেছে। ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে কাপড়ের ব্যবসায়; ব্যবসায়ী মহল এবং ভারতীয় সংবাদ পত্র ইহার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও ট্যারিফ বোর্ডকে অবিলম্বে একটী রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন। ইহার কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেন না ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ট্যারিফ অ্যাক্ট অনুসারে, [৩(ক) ধারা] আকস্মিক বিপদে কাজ করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কি-করি-না-করি ভাব দেখিয়া মনে হয় যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ imperial preference এর পক্ষপাতী। বোম্বাইর ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চ্যাম্বার এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তার এবং তার কাঁটার ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হইলেও প্রেস এবং জনসাধারণ ইহার দিকে এপর্য্যন্ত বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই। ট্যারিফ বোর্ডের অনুমোদন অনুসারে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবসায়কে রক্ষণের জন্য ১৯৩২ সনের ৬ই মার্চ্চ তারিখে আংশিক উপায় অবলম্বণ করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া ভারতের সহিত জাপানের ব্যবসা চলিলেও, মাত্র বিগত এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম তার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমদানী হয়। তাহার পর হইতে ইয়েনের দাম এত কমিয়া গিয়াছে যে রপ্তানী তার নির্ম্মিত দ্রব্যাদির মূল্য স্বদেশী জিনিষের নির্ম্মাণ-মূল্যের শতকরা ১৫ ভাগ নীচে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই, যদি তাড়াতাড়ি কোনপ্রকারে বন্দোবস্ত না করা হয় তাহা হইলে টাটানগরের ফ্যাক্টরী শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে।

ইহা সত্য কথা যে, জাপান কাঁচা মালের শতকরা ৯০ ভাগ (তার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার) নিজের দেশেই গ্রহণ করিয়া থাকে; কাজেই ঐ সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিয়া চালানী দিয়া লাভ করা অনেকের কাছে সমস্যার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সত্য কথা যে জাপান স্বর্ণমান ত্যাগ করিবার প্রায় ৩ মাস পূর্ব্ব হইতেই অনেক কাঁচামাল সুবিধাজনক দরে ক্রয় করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে হয়তো আগামী এক মাসের মধ্যেই জাপানী ইয়েনের মূল্য শতকরা ৩০ ভাগ হিসাবে হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষেও ইহা বলা যাইতে পারে যে জাপানের পুঞ্জীকৃত কাঁচামাল ফুরাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ইয়েনের সুদিন দেখা দিবে না। জাপানী

ডেপুটেশন শপথ করিয়া বলিলেও, যে-কোন সাধারণ লোকই বুঝিতে পারিবেন যে এই ইয়েন মূল্য হ্রাসের প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে, জাপানীদের প্রাচ্য ভূখণ্ডের অরক্ষিত এবং অর্দ্ধরক্ষিত ব্যবসায় বাজার দখল করিয়া লইবার ইচ্ছা।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ, কমার্স মারফৎ এবং পরোক্ষ ভাবে গভর্ণমেণ্টের কাছে এই আবেদন পেশ করিয়াও বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। শোনা গিয়াছে যে,গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কেননা, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ট্যারিফ অ্যাক্ট অনুসারে তার এবং ঐ শ্রেণীর দ্রব্যাদিকে ব্রিটিশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির হিসাবে বিবেচনা করা হয় নাই। উপরোক্ত অ্যাক্টের একটী স্থলে লেখা আছে, "তিনি (অর্থাৎ সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল গেজেট অফ, ইণ্ডিয়াতে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এইরূপ শুল্ক হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করিতে পারেন, যদি ঐ শুল্ক অনুরূপ ব্রিটিশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির উপরে নির্দ্ধারিতবৎ শুল্কের চেয়ে কম না হয়।" এখন দেখা যাইতেছে, এরূপ ধরণের ব্রিটিশ নির্ম্মিত কোন দ্রব্যাদি ভারতে আমদানী হয় না। ইহা হইতে কি প্রমাণিত হয় যে সংরক্ষিত তার এবং তারজ দ্রব্যাদির সম্বন্ধে ঐ অ্যাক্ট প্রযোজ্য হইবে না?

বস্তুতঃ গভর্ণমেণ্টের সংরক্ষণেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই; সুতরাং একটী পন্থা অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। যদি গভর্ণমেণ্ট স্বকীয় ক্ষমতায় কিছু না করিতে পারেন, তাহা হইলে অবিলম্বে ট্যারিফ বোর্ডের অনুমোদন চাহিয়া পাঠানো উচিৎ। যদি ব্যবসাগত চুক্তি কিংবা অন্য কোন কারণের জন্য একমাত্র জাপানীদের আমদানীর উপর শুল্ক বসানো সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দেশ-নির্ব্বিশেষে দ্রব্যাদির উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ষ্টার্লিং এর মূল্য হ্রাসের জন্য ইউরোপের তার প্রভৃতি বেশী আমদানী হয় না; কাজেই কিছুকালের জন্য যদি এই নীতি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে ইউরোপের তার ব্যবসায়ের কোনই ক্ষতি হইবে না। যদি কোন শুল্ক নির্দ্ধারণ করা হয়ই, তাহা হইলে উহা অন্ততঃ পক্ষে একবৎসরের জন্য হওয়া উচিৎ। কেননা বর্ত্তমান বিনিময়-হারের উপর নির্ভর করিয়াই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কণ্ট্রাক্ট করা হইয়াছে, কাজেই যদি অদূর ভবিষ্যতে ইয়েনের উন্নতিও হয়, তবুও উহাতে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

করাচীতে আচার্য্য রায়ের বক্তৃতা

করাচীতে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—

"আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে আচার ব্যবহার ও চালচলনে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা পশ্চিমেরই কল্যাণ সাধন করিয়াছে; কিন্তু আমাদের পক্ষে বড়ই নির্ম্মম পরিণামকে আনয়ন করিয়াছে—শক্তির অতীত হইলেও আদব কায়দায় দুরস্ত থাকা ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছে।

এদেশের রাজন্যবর্গ আজ আর নিজ প্রজাপুঞ্জের মাঝে বসবাস করিতে ভালবাসেন না। তাঁহাদের এক একবার বিদেশ ভ্রমণে ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়। একথা ভুলিলে চলিবে না, যে দৈন্য-ক্লিষ্ট-বুভুক্ষু-নিরক্ষর প্রজাগণকেই এই অপব্যয়ের ভার বহন করিতে হয়।

আমাদের গবর্ণমেন্টের অপব্যয়ের বহরও সহজ নহে। উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী বড় বড় আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, জমিদার, তালুকদার ও ব্যবসায়ী অনাবশ্যক খরচে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত। আমি জানি, যিনি ৫ শত টাকা রোজগার করেন তাঁহার একখানা মোটর না হইলে চলে না।

আচার্য্য রায়, আরও বলেন, "ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রের চাহিদা ১৯২২ সাল হইতে ২৭ সালের মধ্যে ২৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশম শিল্প ধ্বংস প্রায়—ইহা যান্ত্রিক সভ্যতার অভ্যুত্থানের ফল।

শিল্প প্রদর্শনীর সুফল

"ভারতবর্ষে যে আজকাল শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইতেছে ইহা বড়ই শুভলক্ষণ। যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠানকে মন্তব্য করিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তামাসা দেখানই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে; স্বদেশী দ্রব্যের প্রীতিই সকলকে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সমবেত করিতেছে।

বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের সাময়িক সম্বন্ধে মানুষ একত্রিত হয় কিন্তু প্রদর্শনীর সম্বন্ধ অন্যরূপ এবং ব্যাপক। প্রদর্শনীতে ক্রয় করার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বিভিন্ন বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখিবার ইচ্ছাই দর্শকদের থাকে প্রবল। যে সমুদয় বিষয় তাহাকে অধিক তৃপ্তি দেয়, ফিরিয়া যাওয়ার পরে তাহার মনে সে বিষয়গুলি বেশ জাগরূক থাকে। কাজেই প্রদর্শনী যেমন সমস্ত জিনিষের বিজ্ঞাপন কেন্দ্র তেমনি শিক্ষা বিষয়ক প্রভাবও যথেষ্ট।

প্রদর্শনী এদেশে অভিনব কিছু নহে। বহু পুরাতন কাল হইতেই নানা সময় নানা স্থানে মেলার অনুষ্ঠান হয়। পুরাতন ভারতের রাজারাই এই সব মেলার প্রবর্ত্তক। কুম্ভমেলা মাত্র সাধুদেরই মেলা নহে,—বহু দ্রব্য ও ক্রেতা বিক্রেতার আমদানী সেখানে হয়। বিহারের হরিহরছত্রের মেলার মতন মেলা জগতে আর কোথাও মেলে না।

স্বদেশী মেলা বা প্রদর্শনী আমাদের দেশে নূতন বটে, ইহার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে অনুভূত হইতেছে। এই সকল প্রদর্শনী মাত্র প্রচলিত দ্রব্য প্রদর্শন করাইবার স্থান নহে।

কৃত্রিম রেশমী বস্ত্র, বাটার জুতা, টর্চ্চ লাইট কিম্বা চশমা বা ঘড়ি দেখাইয়া বা দেখিয়াই তৃপ্ত হইলে চলিবে না। আরও চাই। সবে মাত্র অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আরও চাই।

বাঙ্গলায় প্রদর্শনীর সাফল্য

প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত দ্রব্যাদি হয়ত আশানুরূপ হয় নাই কিম্বা দাম একটু বেশী, তা বলিয়া এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। আমরা যত বেশী ক্রয় করিব তত বেশী উৎপন্ন হইবে এবং ক্রমে উৎকর্ষলাভ করিবে। বাঙ্গলা দেশে এই প্রণালী খুবই সুফল প্রদান করিয়াছে। প্রত্যেক দেশের শিল্প কর্ম্ম সমূহ পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। শিল্পসমূহকে সাহায্য করিয়া আমরা আমাদের বেকার আত্মীয় বন্ধুদের সংস্থানই করিব।

এইরূপ প্রদর্শনীর সাহায্যে আমরা আমাদের শিল্প প্রচেষ্টার উত্থানপতনের হিসাবনিকাশ করিতে পারি—এই সকল প্রদর্শনীর দ্বারা স্বদেশী পণ্যের প্রতি আমাদের প্রীতি অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ অপেক্ষা এইরূপ প্রীতি স্বদেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ঢের বেশী শক্তিশালী।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, শাসকদের মানসিক পরিবর্ত্তন না হইলে কোন গোলটেবিলই কার্য্যকরী হইবে না। আমিও অনুরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলিতেছি যে আমাদের দেশের লোকদেরও অনুরূপ মানসিক পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, যাহাতে পশ্চিম দেশীয় চাকচিক্য আমাদিগকে আর অর্থনৈতিক অকল্যাণের পথে না লইয়া যাইতে পারে।

জীবনবীমার মূলসূত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয়-অংশ—জীবনবীমা

ইন্সিওরেন্সের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ হইতেছে, জীবনবীমা বিভাগ। ইন্সিওরেন্স বলিতে ঠিক কি বুঝায় এবং উহার চুক্তিপত্রের আইনগত সংজ্ঞা কি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অগ্নি, নৌ, আকস্মিক দুর্ঘটনা বীমার মূলসূত্র-গুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে উহাদিগকে সাধারণভাবে ক্ষতি সম্পূরণ করিবার অঙ্গীকার পত্র বলা চলে। কার্য্যতঃ 'এসিওরেন্স'কে ক্ষতিপূরণ করিবার চুক্তিপত্র বলা ঠিক হয় না—যেমন লাইফ্ এসিওরেন্স এবং ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা সম্পর্কিত চুক্তিপত্র। যদি বস্তুতঃ ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ইন্সিওরেন্স বলিতে ঐ ক্ষতিসম্পূরণ করিবার চুক্তিপত্রকে বুঝাইবে।

মূলতঃ, জীবনবীমা করা হয় বিপদের আশঙ্কায়; সাধারণতঃ মৃত্যুর পরে পরিবার-বর্গের জন্য কিছু সংস্থান করিবার জন্যই এই চুক্তিপত্র করা হয়। অগ্নি কিংবা নৌ-বীমাতে বীমাকারী বিপদের আশঙ্কা করেন বটে; কিন্তু উহা যে আদৌ ঘটিবে তাহা কেহ হলফ্ করিয়া বলিতে পারে না। কাজেই এ-ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ করিবার কথা সচরাচর উঠে না। সাধারণতঃ এক বৎসর কিংবা ১৮ মাসের জন্য এই চুক্তিপত্র গ্রহণ করা

হয়, এই সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই অঙ্গীকার কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। জীবনবীমায় কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মিয়াদে চুক্তিপত্র সাধারণতঃ গ্রহণ

মিঃ এস্, এন্, ব্যাণার্জ্জী।

করা হইয়া থাকে। জীবনবীমায় কতকগুলি বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে :—

(১) পরিবারবর্গ কিংবা পোষ্যের সংস্থান

(২) বৃদ্ধ বয়সের জন্য

(৩) লাগানী—

(৪) সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা

জীবনবীমাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

(১) প্রিমিয়াম

(২) চুক্তি পত্রানুসারে যে সমস্ত সুবিধা দেওয়া হয়

(৩) অঙ্গীকার পত্রের সর্ত্ত

এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে জীবনবীমা ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালে কিরূপে কাজ চলিতেছে, তাহার একটু আভাষ দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। ইতিহাসের কথা বাদ দিলে আমরা এমন এক সময়ে আসিয়া পৌছি, যখন বীমাকর্ম্মীদের কোনপ্রকার এসোসিয়েসন বা সঙ্ঘ ছিল না; ক্রমে এই সমস্ত দায়িত্বভার কোম্পানী অথবা অফিস সমূহে গিয়া ন্যস্ত হইয়াছে। তাহারা একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়ামের পরিবর্ত্তে জীবনবীমা গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা এইটুকু যে আমরা ব্যবসার খুটিনাটি বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার ও শ্রেণীবিভাগ করিবার সুযোগ পাই। ইহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি ও পরিযোজনার ভার নির্ব্বাচন করিবার অনেক সুযোগ উপস্থিত হয়। যত বেশী সংখ্যক লোক কোন কোম্পানীতে বীমা করিতে আসে, ততই তাহাদের সুবিধার দিকে নজর দিবার অবকাশ উপস্থিত হয়।

মানুষ মৃত্যুর অধীন; ইহা আসিবেই। কাজেই জীবন বীমা ক্ষেত্রে কাজ করিতে আসিলে মানুষের জীবনের হার (mortality table) কি প্রকার তাহা জানা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। যদি ভালরূপে এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে কোন্ শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিরূপ মৃত্যুহার আছে, তাহা জানা এক দিক দিয়া অনেক কাজে লাগে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, হয় আমাদের সেন্সাস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে হইবে নতুবা জীবন বীমা সম্পর্কিত কোম্পানীর তথ্যগুলি অনুধাবণ করিতে হইবে। অনেক কারণের জন্য সেন্সাস রিপোর্টের উপর অন্ধের মত নির্ভর করা যায় না। বীমা ক্ষেত্রেও

ইনষ্টিটিউট অফ্ অ্যাকচুয়ারীস্ এবং দি ফ্যাকাল্টি অফ্ অ্যাকচুয়ারীস্ অনেকগুলি বীমা কোম্পানীর মৃত্যু-হার খতাইয়া দেখিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার মূল উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যু-হারের উপর নির্ভর করিয়াই প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কয়েক বৎসরের আনুপূর্ব্বিক মৃত্যু হারের তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত ৪।৫ বৎসরে মৃত্যুর হার কতকটা কমিয়া গিয়াছে। যে মৃত্যু-হারের অঙ্ক প্রথম পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, তাহাকে Select table বলা হয়। সাধারণতঃ ইহার উপর নির্ভর করিয়াই প্রিমিয়ামের হার নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। মৃত্যুর হার অনেক আছে এবং দরকার বুঝিয়া ইহার বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। প্রিমিয়ামের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তৎপরে কার্য্য সুরু করা যাইতে পারে। তবে বলা বাহুল্য, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমা সংক্রান্ত কার্য করী জ্ঞানও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মানুষের মনস্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সদাগরী আইন পর্য্যন্ত জানা দরকার হইয়া পড়ে ; কাজেই এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা সম্প্রতি আমার নাই।

মানুষের মৃত্যুর হারের সঙ্গে প্রিমিয়ামের কি

সম্বন্ধ তাহা আমি একটী দৃষ্টান্ত দিয়া পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। মৃত্যুর-হার সংযুক্ত তথ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট বৎসরে জীবিতদের সংখ্যা ও মৃতদের সংখ্যা উল্লিখিত থাকে। ধরা যাউক যে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ২৫ বৎসর বাঁচিবে এবং তাহাদের মধ্যে ১৩৫ জন ইনসিওর করিল। ইহাদের মধ্যে যদি ৮৬ জন প্রথম বৎসরের শেষের দিকেই মারা যায় তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসরের গোড়ার দিকে ৪৯ জন বাঁচিয়া থাকিবে। ধরা যাউক যে ইহাদের মধ্যেও আবার ৪০ জন শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে না। তাহা হইলে দেখা গেল যে তৃতীয় বৎসরের প্রথম দিক দিয়া ৯ জন বাঁচিয়াছিল; ধরা যাউক, ঐ বৎসরের শেষের দিকেই সকলের মৃত্যু হইল। এখন যদি প্রত্যেকেই ১০০০৲ টাকার বীমা গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমাদের ১,৩৫,৯০০৲ টাকার দাবী মিটাইতে হইবে। এই টাকার মধ্যে ৮৬০০০৲ টাকা প্রথম বৎসরের শেষেই চুকাইয়া দিতে হইবে; ৪০০০০৲ টাকা দ্বিতীয় বৎসরের শেষের দিকে এবং ৯০০০৲ টাকা তৃতীয় বৎসরের শেষের দিকে। যদি শতকরা ৩৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত সংখ্যক টাকার সুদ তৃতীয় বৎসরের শেষে ১,২৯,৪২০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়াইবে। ইহাকে জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলেই এক একটী প্রিমিয়াম সংখ্যা বাহির হইবে; বর্ত্তমানক্ষেত্রে উহা ৯৫০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু সকল লোকেই এক প্রিমিয়াম দিতে রাজী থাকে না; কাজেই বাৎসরিক প্রিমিয়াম কত হইবে তাহা দেখা দরকার। যদি তৃতীয় বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এক টাকার প্রিমিয়াম হিসাবে আনা যায়, তাহা হইলে উহাতে মোটামুটি ১৯১৲ টাকা হইবে। বাৎসরিক প্রিমিয়াম যাহাতে দাবীর অর্থের সমান হয়, তাহাই আমাদিগকে বাহির করিতে হইবে; তাহার একটী ১৯১৲ টাকা এবং অপরটী ১,২৯,৪২০৲ টাকা। কাজেই যদি আমরা ১৯১৲ টাকা দিয়া অপর অঙ্কটীকে ভাগ করি তাহা হইলেই বাৎসরিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা বাহির হইবে। দেখা গেল যে, এক্ষেত্রে উহা ৬৭৲ টাকা মাত্র। বুঝাইবার সুবিধার জন্ম আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে সমস্ত মৃত্যু সংখ্যাই বৎসরের শেষের দিকে গিয়া ঘটিবে। এরূপ সচরাচর ঘটে না; কাজেই হিসাবের মধ্যে আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ইহার সঙ্গে আবার ইনসিওরেন্সের risk অফিসের বিভিন্নপ্রকার ব্যয় প্রভৃতিও হিসাবের মধ্যে গণনা করিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বেশীর ভাগ কোম্পানীকেই এজেন্টদের সাহায্যে কাজ চালাইতে হয়, তজ্জন্ত তাহাদিগকে কমিশন দেওয়াই রেওয়াজ। এই সমস্ত ব্যয়ও প্রিমিয়ামের সঙ্গে ধরা হয়, ইংরাজীতে ইহাকে gross premium বলে। আমরা বোধ হয় বাংলাতে ইহাকে 'আনুসঙ্গিক প্রিমিয়াম' বলিতে পারি। এই ধরণের প্রিমিয়াম ইনসিওরেন্সের সময় হইতে বীমাকারী দিতে থাকেন; কোন বিপদ ঘটিলে কোম্পানী চুক্তিপত্রের সর্ত্তগুলি পালন করিতে বাধ্য থাকেন।

মৃত্যু হইলে কিংবা চুক্তির নির্দ্ধারিত সময় শেষ হইলে, উপযুক্ত প্রমাণ দেখাইয়া অর্থ দাবী করাই দস্তুর। অনেক কোম্পানীতে মৃত্যু-স্থলে নানা-প্রকার সুবিধার তালিকা ভারী করিয়া দেখাইয়াছেন।

জীবনবীমার কতকগুলি সাধারণ সর্ত্ত আছে:—

(১) রীতিমত ভাবে প্রিমিয়াম দিবার জন্ত একটী সর্ত্ত থাকে।

(২) চুক্তিপত্রানুসারে প্রিমিয়াম না দিলে অঙ্গীকার-পত্র বাতিল হইয়া যায়।

(৩) আর একটী সর্ত্ত থাকে, যাহাতে পলিসিকে সহজেই paid-up এসিওরেন্স বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিংবা পলিসির পরিবর্ত্তে অর্থ-বিনিময় হয়।

(৪) একটী সর্ত্তানুসারে বীমাকারীর স্বচ্ছন্দগতি অব্যাহত থাকে না। যদি তিনি এমন জায়গায় থাকেন যাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে কোম্পানীর সঙ্গে তদনুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার পেশা যদি বিপদসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য হইবে।

(৫) কোম্পানীর বোনাস্ কিংবা লভ্যাংশ বিতরণের সম্পর্কে বীমাকারীর মতামত গ্রহণের জন্য একটী সর্ত্তও উহাতে সন্নিবিষ্ট থাকে।

(৬) এতদ্ব্যতীত আত্মহত্যা সম্পর্কিত একটী সর্ত্তও সাধারণতঃ উহাতে জুড়িয়া দেওয়া থাকে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে প্রত্যেকটি সুবিধা দেওয়ার জন্য কোম্পানীকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, যদিও উহার সঠিক অঙ্ক বাহির করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। ধরুন, যদি খুব বেশী করিয়া প্রত্যর্পণ মূল্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে যাহারা চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া দেয়, তাহাদিগকেই বেশী সুবিধা দেওয়া হইবে; কিন্তু বোনাসের জন্য নির্দ্ধারিত অর্থের হার কম হইয়া আসিতে থাকিবে। যে সমস্ত বীমাকারীর চক্ষু-কর্ণ সজাগ আছে, তাহারা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই কোম্পানী বাছিয়া লয়। অল্প প্রিমিয়াম অথবা উচ্চ হারের বোনাসের সুবিধা আবার অন্যান্য সর্ত্ত দ্বারা কতকটা খর্ব্বীকৃত হইয়া আসিতে পারে। বীমাকারীর পক্ষে যে পলিসি করা সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা করাই উচিৎ হইবে। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে সর্ত্তগুলিকে এড়াইয়া চলিবার পথ নাই; কাজেই সব দিক দেখিয়া শুনিয়া বীমা না করিলে মারাত্মক রকমের ভুল করা হইবে।

অগ্নি, নৌ, এবং আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত বীমার ন্যায় জীবন বীমা বিভাগও গভর্ণমেণ্টের পরিদর্শনে রহিয়াছে। দি ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীজ্ অ্যাক্ট, ১৯২২ সনে কোম্পানীগুলির রক্ষনার্থে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট কিনা অথবা ইহাকে Insurance Uudertakings Bill of United Kingdom এর সমপর্য্যায়ে আনা উচিৎ কিনা তাহা এখনো তর্কের বিষয় রহিয়া গিয়াছে।

ইন্‌সিওরেন্স ক্ষেত্রে প্রতারণা

বালী মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের কীর্ত্তি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সুরেশচন্দ্র পাল, (তিনি নিজেকে বালি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন) ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সাব-এজেন্ট শ্রীশিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীকুমারকৃষ্ণ ঘোষ জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু প্রারম্ভ বক্তৃতায় বলেন যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপরোক্ত আসামীত্রয় ষড়যন্ত্র করিয়া বিভিন্ন পলিসি বাবদ অনেক অর্থ ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী এবং গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী হইতে লইবার বন্দোবস্ত করে। প্রথমে তাহারা শৈলেন্দ্র নাথ পালের নাম করিয়া ও তাহার একটী বন্ধুর নাম সহি করিয়া ন্যাশ্‌নাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে ৫,০০০৲ টাকার একটি জীবনবীমা করে। তারপর প্রথম আসামী সত্য গোপন করিয়া বলে যে, তাহার খুড়তুত ভ্রাতা শৈলেন্দ্রনাথ পাল মারা গিয়াছে এবং সুশীলাবালা দাসী নাম্নী জনৈক মহিলাকে তাহার বিধবা সাজাইয়া টাকার দাবী করিবার জন্য তাহার বৃদ্ধ অঙ্গুলীর টিপসহি লয়। এই দাবীপত্রে একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বালির একজন ডাক্তারের নাম জাল করা হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সমস্ত সহি করা হইয়াছিল। বালি মিউনিসিপ্যালিটির চিত্রগুপ্তের দপ্তরেও শৈলেন্দ্রনাথ পালের মৃত্যুসংবাদ লেখানো হইয়াছিল। এইরূপে ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নামে চেক কাটিতে বাধ্য হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রথমোক্ত আসামী তাহার পিতার (তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন) শিলমোহর ব্যবহার করায় সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ ছিল না।

প্রথম কার্য্যে সফল হইয়া আসামীগণ আবার আর একটী প্রতারণায় হস্তক্ষেপ করিল। ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কুমারকৃষ্ণ ঘোষের নামে ২০,০০০৲ টাকার একটি জীবনবীমা করা হইল। একটি প্রিমিয়াম দেওয়ার পরই আসামীত্রয় পূর্ব্বোক্ত পন্থা অনুসরণ করিয়া নকল বিধবাকে দিয়া একটি দাবীপত্র পাঠাইয়া দিল, ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে। কিন্তু দাবী মিটাইবার পূর্ব্বেই কোম্পানীর কোনপ্রকারে সন্দেহ হওয়ায় উহার ভার পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল। তাহারা তদন্ত করিয়া কেবল যে এই জুয়াচুরীর ব্যাপার ধরিল তাহা নহে, পরন্তু পূর্ব্বের যে পাঁচ হাজার টাকা উহারা সরাইয়া লইয়াছিল তাহাও এইসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পাবলিক প্রসিকিউটারের বক্তৃতা শেষ হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের জামীনে খালাস পাইবার অনুরোধপত্র বাতিল করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বিচার পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে বীমা সম্বন্ধে প্রতারণা

বোম্বাইএর তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কান্দলাওয়ালার আদালতে একটি বিরাট প্রতারণার মামলা চলিতেছে। ইহাতে মতিলাল রাওজী নামক এক ব্যক্তি একটি সুপ্রসিদ্ধ বীমা কোম্পানীকে পঞ্চাশ হাজার ডলার (এক ডলারে প্রায় আড়াই টাকা) প্রতারণার অভিযোগে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। পুলিশ মতিলাল রাওজীকে 'কচ্ছের মহাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সংক্ষেপতঃ ঘটনাটী এই :—কুভারজী মুরশে নামক এক ব্যক্তি ক্ষয়রোগে মারা যায়। তাহার মৃত্যুর বিশদিন পূর্ব্বে তাহার নামে পঁচিশ হাজার ডলারের একটী বীমার প্রস্তাব পেশ করা হয়। ইহার পরে আবার বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পঞ্চাশ হাজার ডলারে পরিণত করা হয়। প্রকাশ, রাজকোটের ডাঃ রতিলাল সা এবং ডাঃ শান্তিলাল সা এই বীমা প্রথম শ্রেণীর বীমারূপে গ্রহণযোগ্য বলিয়া পাশ করেন।

এক মাসের মধ্যেই যখন বীমাকারী মুরশের মৃত্যুসংবাদ এম, কাঞ্জী এণ্ড কোম্পানীর নিকট পৌঁছে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বোম্বাই সি, আই, ডি, পুলিশের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। এম, কাঞ্জী এণ্ড কোং বীমা কোম্পানীর এজেন্ট এবং তাঁহাদের নিকটেই বীমা করা হইয়াছিল। বোম্বাইএর সি, আই, ডি, পুলিশ বীমাকারীর শ্যালক যাদবজী খিমজীকে কাচমণ্ডভীতে এবং ডাঃ রতিলাল সাকে রাজকোটে গ্রেপ্তার করে। তৎপরে সহকারী চিকিৎসক ডাঃ শান্তিলাল সাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ লিম্বদি ষ্টেট অভিমুখে গমন করিলে গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া সে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করে। পুলিশ তৎপরে ওয়াদ্বানে হরিগোয়াল শুকলাল সা নামে এক ব্যক্তিকে এবং মতিলাল রাওজী ও খাঁদুলাল ত্রিভুবন দাস সা নামক বোম্বাইএর দুজন বীমা এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেন।

স্বামী স্ত্রীর অদ্ভুত ফন্দী

ফ্রান্সের অন্তর্গত লিঁয়ঁর পুলিশ অতিকষ্টে বহুদিনের পরিশ্রমের পরে একটি ঝানু প্রতারকের প্রবঞ্চনা ধরিয়া ফেলিয়াছে। লোকটা একটি বীমা কোম্পানীকে ঠকাইয়া বহু টাকা লাভ করিয়াছিল, এবং আর কিছুকাল ধরা না পড়িলে সারাজীবন বেশ ভোগসুখের মধ্যেই কাটাইয়া দিতে পারিত। প্রবঞ্চনার মধ্যেও লোকটার দুঃসাহসিকতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সে প্রথমে ১৫ হাজার পাউণ্ডের একখানি জীবন বীমার পলিসি গ্রহণ করে। তারপর একদিন যাহাতে না মরে অথচ মরার মত দেখায় কৌশলে এইরূপ পরিমাণ মত কুইনিন খায়। ডাক্তার ডাকা হইলে তিনি অতি সহজেই বুঝিতে

পারেন যে লোকটার মস্তিষ্কের জ্বর বা ব্রেণ ফিবার হইয়াছে। পরদিন তাহার সঙ্গিনী যাহাকে বীমার উত্তরাধিকারিণী করা হইয়াছিল সে ডাক্তারের নিকট গিয়া বলে যে তাহার স্বামী মারা গিয়াছে। এই বলিয়া সে ডাক্তারের নিকট হইতে মৃত্যুর সার্টিফিকেট আদায় করে। কবরের ব্যবস্থাতেও দুর্ব্বৃত্তের আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। সে বিবর্ণ অবস্থায় সারা দিন শুইয়া পড়িয়া থাকে, এবং আত্মীয়স্বজন তাহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া শোক করিয়া চলিয়া যায়। যখন শববাহকগণ কবরস্থ করিবার জন্য শবাধার বহন করিতে আসে, তখন সে কোনো প্রকারে আপনাকে একটি বাসন রাখিবার তাকের পশ্চাতে লুকাইয়া শবাধারটি তাহার দেহের ওজনে বালি পূর্ণ করিয়া দেয়। যথাসময় শবাধারটি কবরস্থ করা হয়। তখন তাহার সঙ্গিনী বীমার টাকা আদায় করে এবং স্বামী স্ত্রী অতি দূর পল্লীগ্রামে কতক জমি ক্রয় করিয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে থাকে। কিন্তু বিধি একান্ত বাম বলিয়া বেশীদিন তাহাদের অদৃষ্টে এত সুখ সহিল না। অকস্মাৎ একদিন বীমাকারীর এক বন্ধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া যায় এবং তিনি ভণ্ড লোকটাকে চিনিয়া ফেলেন। শেষকালে বন্ধুই কাল হইল। পল্লীর শান্ত নিরালা জীবনের পরিবর্ত্তে এখন তাহারা কারাগারের বদ্ধ কুঠরীতে দিনাতিপাত করিতেছে।

বিদেশের তুলনায় ভারতে বীমার অবস্থা

বিভিন্ন প্রকার বীমার মধ্যে জীবন-বীমার কার্য্য ভারতে ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করিতেছে। অগ্নি-বীমা, জল-বীমা, চুরী-বীমা প্রভৃতি বীমার কার্য্য সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু না বলিয়া আমরা কেবল জীবন-বীমা সম্বন্ধেই কয়েকটি প্রাথমিক আলোচনা করিব।

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের জীবন-বীমার কার্য্য অতি শৈশব অবস্থায় আছে। এই বিষয়টি আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি, যখন আমরা দেখি যে, আমেরিকার একটা বড় বীমা কোম্পানী 'প্রতিদিন' ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার বীমা পত্র (Policy) বাহির করে ও দিন ৬১ লক্ষ টাকার দাবী (Claims) পরিশোধ করে; আর আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানীর বীমা-পত্র বাহির করিবার ও দাবী পরিশোধ করিবার পরিমাণ যথাক্রমে "এক বৎসরে" ৬,৫০, ৪,৫৩৯ ও ১২,৫৩,৬৬০ টাকা মাত্র। নিম্নের তালিকা হইতে আমরা আরও বিশেষ ভাবে আমাদের বীমার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারি—

দেশ	লোকসংখ্যা	জীবন-বীমার টাকা
ইউনাইটেড ষ্টেটস্-অফ আমেরিকা	১১২ কোটী	২৪,০০০কোটী
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৪২ "	৩,০০০ "
ক্যানাডা	৯০ লক্ষ	১,২৯০ "
জাপান	৫২ কোটী	৯০০ "
অষ্ট্রেলিয়া	৩০২ লক্ষ	৬০১ "
ভারতবর্ষ	৩৩ কোটী	৬০ "

উপরোক্ত তালিকা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের স্থান বীমা জগতে কত নিম্নে। কিন্তু আমরা যদি উন্নতি করিতে চাই, আমরা যদি জগতের সমক্ষে একটা জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, তাহা হইলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রভৃতি যতগুলি প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করিতে হইবে, বীমার প্রতিষ্ঠান তাহাদের মধ্যে অন্যতম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পারিবারিক ও অর্থনৈতিক, দুরবস্থা দূর করিতে বীমা অনেক সাহায্য করিতে পারে। মনে করুন, কোন ভদ্র-লোককে তাঁহার দৈনিক শ্রম দ্বারা ৫।৭জন লোক-বিশিষ্ট পরিবারের ভার বহন করিতে হয়। তিনি যদি অল্পবয়সে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে হঠাৎ দারি-দ্র্যের নির্ম্মম আঘাত পাইতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারস্থ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুদ্বারা শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছল পরিবারকেও দুঃখের আগারে পরিণত হইতে দেখা যায়। এইরূপে যত অধিক পরিবারের কষ্ট হইবে, তত তাহা সমগ্র

জাতির একটা অর্থনৈতিক কষ্ট বলিয়া প্রকাশ পাইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে যদি হঠাৎ মৃত্যুজনিত আর্থিক দুঃখ কষ্ট বীমা দ্বারা দূর হয় তাহা হইলে স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রকারে যদি বীমা দ্বারা স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়।

বীমার কাজে এখন আমাদের অনেক বাকি রহিয়াছে। অবশ্য এখনই যে আমরা আমেরিকার ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা নহে। কিন্তু আমরা যদি বিশেষ চেষ্টা ও যত্নের সহিত বীমার কার্য্য চালাই, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় লোকসংখ্যা হিসাবেই আমাদের দেশ যে সকলের বড়, তাহা উপরে দেখান হইয়াছে। যদি বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ও সততার সহিত আমরা কার্য্য করি, আমাদের সাফল্যলাভ করিবার সম্ভাবনা আসিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, বীমা কোম্পানীর জন্মস্থান যদিও ইংলণ্ডে, তবুও আজ সে এই বিষয়ে আমেরিকার অনেক নীচে পড়িয়া আছে। ইংলণ্ডের প্রথম সুপ্রণালী-বিশিষ্ট বীমা কোম্পানীর জন্ম হয় ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার বহু বৎসর পরে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম বীমা কোম্পানী স্থাপিত হয়। কিন্তু আজ আমেরিকা বীমা ব্যবসায়ে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আজ সমগ্র জগতে বীমার যে কার্য্য চলিতেছে, তাহার শতকরা ৭১ ভাগেরও বেশী আমেরিকায়।

বীমার কার্য্য বৃহৎ ভাবে চালাইতে হইলে, দেশের মধ্যে যত বেশী কর্ম্মদক্ষ এবং সৎলোক দ্বারা পরিচালিত এজেন্সী গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই এজেন্সী গড়িতে ভাল লোকের আবশ্যকের কারণ এই যে, তাঁহাদের কথাতে জনসাধারণের বিশ্বাস হইবে। আজকাল দেখা যায়, হয়ত যে যুবক ২।৩ বৎসর বেকার ভাবে বসিয়া আছে, হঠাৎ সে একদিন আসিয়া বীমার উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে সাধারণ লোক যে সংজে বীমার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বলিয়া ত বোধ হয় না। ইহা ছাড়া বীমা সম্বন্ধীয় পত্রিকাদি যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত হয়, তাহাও করিতে হইবে। আজকাল ঐরূপ পত্রিকাদি এইরূপ সহরের মধ্যেই আবদ্ধ। মফঃস্বলে প্রচার আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার সহরের ও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হয় কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, আমা-দিগকে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে।

কান্ট্রি ইন্‌সিওরেন্সের কৈফিয়ৎ।

মাননীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পাদক মহাশয়
সমীপে—

মহাশয়,

নিম্নলিখিত প্রতিবাদটি আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর অন্যায় অত্যাচারের বিশদ বিবরণ ইহাতে আছে। আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় আমাদিগের বক্তব্য বা কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আশা করি একটু স্থান দিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত—
মেন্থর এণ্ড কোং

আজ কয়েকমাস যাবৎ কলিকাতার দুই একটি সাপ্তাহিক ও মাসিক এই কোম্পানী সম্বন্ধে ভাল-মন্দ আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। "ভগ্নদূত" নামক একটি পত্রিকা পূজার পূর্ব্বে অকস্মাৎ বীমা বিভাগ খুলিয়া এই কোম্পানীর ছিদ্র অনুসন্ধানে অদ্যাবধি নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে—ইহার কারণ কি? যদি কোন স্বার্থে আঘাত না লাগিয়া থাকে তবে কলিকাতায় এত কোম্পানী থাকিতে আক্রোশটা "কান্ট্রি ইন্‌সিওরেন্সের" উপর পড়িল কেন? আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে,—হয় আমরা উঁহাদিগকে কোন বিজ্ঞাপন দেই নাই, কিম্বা এইরূপ কোন স্বার্থে আঘাত করিয়াছি, অথবা কোম্পানীর স্কীম বুঝিতে না পারিয়া ইহারা আমাদের অযথা নিন্দাবাদ করিতেছে।

গত এপ্রিলমাসে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্তৃক "কান্ট্রি ইন্‌সিওরেন্স"র উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে এবং তদবধি কোম্পানীর পরিচালকবর্গ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া এই অল্প দিনেই কোম্পানীর সমুদয় অংশমূল্য বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের বীমা সংগ্রহ করিয়াছেন। মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, ত্রিচীনোপলী, বেজওয়াদা ভিজিয়ানাগ্রাম, কলম্বো, বোম্বাই, মজাফরপুর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি এবং করাচীতে ইহার শাখা অফিস ও বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, আফ্রিকা এবং ভারতের সর্ব্বত্র ইহার এজেন্সী আছে। এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডেও উপযুক্ত নামজাদা ব্যক্তিগণ আছেন। যথা:—

১। স্যার এ, পি, পাত্র কে, টি। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও রাউণ্ড টেবল্ কন্‌ফারেন্সের সভ্য।

২। মাননীয় দেওয়ান বাহাদুর জি, নারায়ণ স্বামী চেট্টি সি, আই, ই। মাদ্রাজ কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি।

৩। মিঃ যতীন্দ্র মোহন সিংহ। বাঙ্গলার অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর।

৪। ডাঃ এস্, সি, চৌধুরী এম, এ (ক্যাণ্টাব), এল, এল, ডি। বার-এট-ল। রিপণ ল'কলেজের প্রিন্সিপাল ও ইণ্টারন্যাশন্যাল্ টায়ার ও মোটর কর্পোরেশনের ও জগদ্ধাত্রী কটন মিলের বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টর সভার সভাপতি।

৫। শেঠ লিলারাম হিরানন্দ। ব্যাঙ্কার, গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর এবং ষ্টোন্ মার্চ্চেণ্ট, পাকুড়।

৬। মিঃ এন্, রাহা। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর।

৭। মিঃ জে, আর, কিং। অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী অডিট ইন্সপেক্টিং অফিসর।

৮। মিঃ কে, ডি, লাল। মেসার্স মেহুর এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল্ ম্যানেজার।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মেসার্স মেহুর এণ্ড কোং। ইঁহারাই পরিচালনার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন!

কোম্পানীর যে স্কীম সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে তাহার নাম "থ্রিপ্ট" স্কীম (Thrift Scheme) অর্থাৎ কতকটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ন্যায়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এইরূপ স্কীমের কতকগুলি কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু তাহারা কোম্পানী পরিচালনার খরচ বাবদ কোন ব্যবস্থা না রাখায় কিছুদিন পরে তাহারা ভ্রম বুঝিতে পারে ও নিয়ম সংশোধন করিয়া কতক বা কার্য্য চালাইতে থাকে আর কতক কার্য্য বন্ধ করে। আমেরিকাতেও "কান্ট্রি, ইনসিওরেন্স" স্কীমের মত প্রায় তের হাজার কোম্পানী, বর্ত্তমানে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া, দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহ নির্ম্মাণ ও আর্থিক সুবিধা করিয়া দিতেছে। "কাণ্ট্রী ইন্সিওরেন্স" কোম্পানী শতকরা এই "থ্রিপ্ট" স্কীমে ৬৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ দেয় টাকা ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার দিতেছেন এবং হাজার করা খরচা বাবদ ২০৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা কাটিয়া লইবেন, ইহাও বলিতেছেন। কোম্পানীর প্রস্পেক্টাসে এ কথা পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। কোম্পানী যে টাকা আদায় করিবেন তাহা নূতন বাড়ী তৈয়ারী স্কীমে খাটাইবেন ও অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায়েতেও খাটাইবেন কাজেই লাভ লোকসান হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, কোম্পানী সাধারণের নিকট টাকা প্রত্যর্পণ করিবার যে অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর। ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। তবে প্রথাটী এদেশে একেবারে নতুন, কাজেই একটু সংশয় লাগে।

এখন "ভগ্নদূতের" বীমা বিভাগের সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি এই সামান্য হিসাবটা ঠিক করিতে পারিতেছেন না কেন? একটা নামজাদা (?) পত্রিকার, বীমা বিভাগের (?) বিজ্ঞ সম্পাদক (?) হইয়া এ হিসাবটা কি করা যায় না? তিনি হিসাবটা বুঝিবার জন্য ও বিজ্ঞাপন গ্রহণের জন্য বহুবার আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, এবং আমরাও অতি যত্নের সহিত স্কীমটি অঙ্ক কষিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম; তাহাতেও তিনি উহা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত সম্পাদকের বীমা বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হয় এবং তাঁহাকে বীমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, তাহার উত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলেন যে তাঁর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কিছুই নাই। তখন তাঁহাকে স্কীম বুঝাইবার আশা আমরা ত্যাগ করি। ইহাতে তাঁহার হোল রাগ, কোম্পানীকে লোক সমাজে অপদস্থ করিবার প্রতিজ্ঞা করে ধরিলেন লেখনীরূপ অস্ত্র।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি যে, স্যার পি. সি, রায়ের কাছে যেয়ে—তাঁহার ন্যায় সরলপ্রাণ লোককে যা' তা' বলে—নিজের হাতে নিজের ইচ্ছামত চিঠি লিখে কি আচার্য্যদেবের সহি করিয়া লওয়া হয় নাই? যখন চিঠিখানিতে আচার্য্যদেব সহি করেছিলেন, তখন চিঠিখানি পড়ে তাঁকে কি শুনান হয়েছিল যে, তাতে কি সাপ-ব্যাঙ্‌ লেখা আছে? তারপর চিঠিখানি নিয়ে নিজহস্তে উহার নকল ক'রে, কলিকাতার সকল পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করে পাঠান হয় নাই কি? আমরা বিশেষভাবে প্রমাণ পেয়েছি যে, একখানি বাঙ্গলা মাসিক ছাড়া আর কোন পত্রিকা ভগ্নদূত সম্পাদকের অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কোন কোন ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণের ও গণিতবিদ্‌ ব্যক্তিগণের নিকট সম্পাদক ভায়া নিজে গিয়া কি তাঁহাদিগকে যা' তা' ভাবে স্কীম সম্বন্ধে বলিয়া, অঙ্ক কষাইয়া পরীক্ষা করেন নাই? সেই অঙ্কই ত' তিনি পত্রিকায় বাহির করিয়া জয়ডঙ্কা মারিতেছেন। উক্ত সম্পাদকগণ ও গণিতবিদ্‌গণ যখন স্কীমের সমস্ত অঙ্ক পাইলেন, তখন তাঁহারা সম্পাদকের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া নীরব হইলেন এবং মত দিলেন যে কোম্পানীর স্কীম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হতে পারে না। কোম্পানীর উপর ভগ্নদূতের রাগ এত বেশী যে, বিনা মূল্যে কলিকাতার দেওয়ালে প্লাকার্ড মারিয়া ও কোম্পানীর শাখা অফিস সমূহে "ভগ্নদূত" পাঠাইয়া কোম্পানীকে খেলো করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেছেন না।

অথচ একা "ভগ্নদূত" ছাড়া সকলেই কোম্পানীর স্কীমের প্রশংসা করিতেছেন। স্যার দেবপ্রসাদ, স্যার পাত্র, মিঃ এস্‌, এন. মল্লিক, এডভান্স, অমৃতবাজার, লিবার্টি, বঙ্গবাণী, নবশক্তি, আনন্দ বাজার, ভোটরঙ্গ, দীপালি, বাতায়ন, টিচার্স জারণাল, সমাচার, ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জারন্যাল, ইনসিওরেন্স ওয়ারল্ড, ইনসিওরেন্স ও ফাইনান্স রিভিউ, বাঙ্গলার বাণী, অবতার, কমার্সিয়াল গেজেট, ষ্টার অফ্‌ ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজের জষ্টিস, ও ভারতের অন্যান্য পত্রিকা সকলেই স্কীমের প্রশংসা করিয়াছেন। এই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ও পত্রিকাসমূহের মতাবলী কতক কোম্পানীর নূতন প্রস্‌পেক্টাসে দেওয়া আছে—এই সকল প্রশংসা পত্রের প্রতি ভগ্নদূত সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এমন কি "ভোটরঙ্গ, দীপালি, ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জারণাল" প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ভগ্নদূতের মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বিশেষ সৎসাহসের পরিচয়ও দিয়াছেন।

এখন ভগ্নদূত সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি যে, ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের ও সকল প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের কি কোন মূল্য নাই? অনর্থক একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্বার্থবশে লোকচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করা ও আচার্য্যদেবকে এমনভাবে বিপদাপন্ন করা কি খুব একটা বাহাদুরীর বিষয়? এ বিষয় বেশী বাড়াবাড়ি করিলে হয়ত আসল ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সেটা কি তাঁদের পক্ষে ভাল হবে? এ বিষয় এখানেই শেষ হ'লে ভাল হয় না কি?

সাধারণের অবগতির জন্য "ভগ্নদূতের" কতকগুলি মন্তব্যের প্রতিবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

"ভদ্রদূতের মন্তব্য"

১। "মেহুর কোম্পানী নিজদিগকে বীমা কোম্পানী বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু আসলে উহা বীমা কোম্পানী নহে।"

২। "কাণ্টি, ইন্‌সিওরেন্স" নামকরণ ভুল হইয়াছে—আসলে উহা বীমা কোম্পানী নহে।

৩। "কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরে একজনও বীমা ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি নাই।"

৪। "এত অল্পদিনে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর কেন পরিবর্ত্তন হইল। অর্থাৎ শৈলেশ রাহা, আর, এন, ঘোষ ও শেঠ ওম্‌প্রকাশ কেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের পদ ছাড়িয়া দিলেন? উহারা কি কোম্পানীর সেয়ার খরিদ করিয়াছিলেন?"

আমাদের উত্তর

১। মেহুর কোম্পানী কোনদিন বীমা কোম্পানী বলিয়া পরিচয় দেন নাই। উক্ত কোম্পানী ব্যাঙ্কার, ইন্‌সিওরেন্স ম্যানেজারস্ এবং "কাণ্টি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী"র ম্যানেজিং এজেন্টস্। এমন কোন প্রমাণ আছে কি, যাহাতে কোম্পানী মিথ্যা প্রচার করেন?

২। "কাণ্টি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী" ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের ও সাধারণ কোম্পানী সমূহের আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রীকৃত। তা' হ'লে নামকরণে ভুল হ'ল কি করে?

৩। মিঃ কে, ডি, লালা আজীবন বীমা বিভাগে আছেন ও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটির করাচী শাখায় তিন বৎসর ম্যানেজার রূপে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং এই কোম্পানীকে এত অল্পদিনে এত দ্রুত অগ্রসরের পথে লইয়া যাওয়া, ইহাই তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধেও শেঠ ওম্‌প্রকাশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া মিঃ কিং হিসাব বিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ। অন্যান্য ডাইরেক্টরগণও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন।

৪। শৈলেশ রাহা, আর, এন, ঘোষ ও শেঠ ওম্‌প্রকাশ কোম্পানীর প্রথমাবস্থায় ডাইরেক্টর ছিলেন ও প্রত্যেকেই ডাইরেক্টর হইবার উপযুক্ত সেয়ার খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি দেখিয়া স্যার এ, পি, পাত্র, দেওয়ান বাহাদুর নারায়ণ স্বামী চেট্টি সি. আই, ই ও রিপণ ল' কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ এস, চৌধুরী ডাইরেক্টর হইতে সম্মত হওয়ায় এবং কোম্পানীর উপযুক্ত সেয়ার খরিদ করায় স্বেচ্ছায় উপরোক্ত তিনজন আপনাপন পদ ছাড়িয়া দিয়া বোর্ড অফ

ডাইরেক্টরে এই তিনজনের স্থান করিয়া দেন এবং সেয়ার খরিদ যেমন করিয়াছিলেন তাঁহাই রাখিয়া দেন। আরও উপরোক্ত তিনজনের ডাইরেক্টরী ছাড়িবার প্রধান কারণ যে উহারা কোম্পানীর বেতনভুক কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারী বোর্ড অফ ডাইরেক্টরে থাকা কি যুক্তিসঙ্গত ?

৫। আচার্য্যদেব কোম্পানীকে গত মে মাসে যে আশীর্ব্বাণী দিয়াছিলেন তাহা "ধাপ্পায় পড়ে" দিয়াছিলেন, পরে উহা বুঝিতে পারিয়া প্রত্যাহার করেন।

৫। এবিষয়ে আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "ধাপ্পা আমায় কেহ দেয় নাই, বরং দেখিতেছি যে পত্রিকা বিশেষের লোকই আমায় যা' তা' বলে সহি লইয়াছে।" আর প্রত্যাহার পত্র তিনি আজও কোম্পানীকে দেন নাই। তবে "ভগ্নদূতের" ব্যাপারে আচার্য্যদেবের নাম লইয়া মতলববাজ লোকেরা যেরূপ ছিনিমিনি খেলে, তাহা দেখিয়া কোম্পানী স্বেচ্ছায় তাঁহার আশির্ব্বাণী পত্র প্রস্পেক্টাস্ হইতে তুলিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

৬। "কোম্পানী শতকরা ৭ হইতে ৮ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদসহ টাকা ফেরৎ দিবার অঙ্গীকার দিতেছেন, তাহা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এবিষয়ে লণ্ডন ও আমেরিকার নজির দ্রষ্টব্য।"

৬। এবিষয়ে পূর্ব্বে সমস্ত কথাই বলা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে "ভগ্নদূত" যদি আশা করেন যে, কোম্পানীর কার্য্যের ও স্কীমের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব গ্রহণ করিতে ও সাধারণের নিকট business secrets out করাইতে, তাহা হইলে তাঁহাকেও কোম্পানীর সেয়ার হোল্ডার হইতে হয়; নহিলে কোম্পানী সাধারণকে তাহাদের business secrets বলিবে কেন ?

৭। "নামজাদা ডাইরেক্টর থাকিলেই যে কোম্পানী ভাল হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। কোন্ ডাইরেক্টর কয়বার কোম্পানীর মিটিংয়ে হাজির হইয়াছেন ?"

৭। এ প্রশ্ন নিতান্ত বালকের ন্যায়। পৃথিবীর যৌথ কারবার মাত্রেই নামজাদা ডাইরেক্টর অনুসন্ধান করে কেন ? মিটিংয়ে তাঁহাদের কে কয়বার হাজির হয়েছেন ইত্যাদি প্রশ্ন বাহিরের লোকের জানিবার উপায় বা অধিকার আছে কি ?

এবার এই পর্য্যন্ত—পরে যদি আরও বাড়াবাড়ি হয় তখন প্রমাণসহ আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

বীমা-জগতের খবর

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীযুক্ত ডি, আর, কৃষ্ণমূর্ত্তি এশিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ (Asiatic Government Security Life Assurance Co. Ltd. Bangalore) এর কলিকাতাস্থ সাব-অফিসের (Sub office) এর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তির নাম সুপরিচিত। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সামান্য ক্যানভাসার রূপে বীমা কার্য্যে প্রবিষ্ট হন, এব এই এশিয়াটিকেই শিক্ষানবিশী করেন। আশা করি তিনি বীমা জগতে দিন দিন আরও উন্নতি করিতে পারিবেন।

* * *

লাহোরের ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। লালা হরকিষণ লাল এই কোম্পানীর পরিচালকবর্গের সভাপতি। সম্প্রতি একজন ডাইরেক্টর, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গৌবা, ব্যারিষ্টার, আদালতে এই বলিয়া নালিশ করিয়াছিলেন যে "ভারতে"র তহবিল হইতে কোন রূপ অর্থ যেন লালা হরকিষণ লাল কিংবা তৎপরিচালিত কোন কোম্পানীকে অথবা কোন ডাইরেক্টরকে না দেওয়া হয়। "ভারত"কোম্পানীর নিয়মাবলীর ৩ডি ধারাতেই তিনি এই আবেদন করিয়াছিলেন। জজ সাহেব রায় দিয়া তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। ফলে, ভবিষ্যতের জন্য "ভারতে"র আর্থিক অবস্থা নিরাপদ হইয়া রহিল। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, লালা কানাইলালও "ভারতে"র একজন পরিচালক, লালা হরকিষণলালের সুযোগ্য পুত্র এবং Uncle sham H-H নামক দুখানি বহুল প্রচারিত পুস্তকের লেখক। আমরা লালা হরকিষণ লালের নামে নানাকথা শুনিয়াছিলাম; শুনা যায়,পূর্ব্বে লালাজী এই ভারতবিখ্যাত কোম্পানীর তহবিল হইতে তাঁহার অন্যান্য Mill factory ও পরিচালনার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য তাহার জন্য "ভারত" কোম্পানীতে জামিন হিসাবে যথেষ্ট সিকিউরিটিও দাখিল করিয়াছিলেন। আমরা "ভারতে"র কলিকাতাস্থ ম্যানেজার মিঃ টি, এন, গুপ্ত মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, সে সমস্ত টাকা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা হইযাছে। সুতরাং জনসাধারণ এবং "ভারতে" যাঁহারা বীমা করিয়াছেন তাঁহারা এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর তহবিল ও লালা হরকিষণ লালের নাম যেভাবে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, উপরিউক্ত injunction এর হুকুম হওয়াতে আর সেরূপ হইবার অবসর পাওয়া যাইবে না। আমরা আশা করি, ভারতের এজেণ্ট এবং সংগ্রাহকগণ এই সুখবরটুকু বীমাকারীগণকে দিয়া তাঁহাদের উদ্বেগ দূর করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পূজাবকাশে কিছুদিন মশুরী বাস করিয়া উত্তর ভারতের কয়েক স্থানে হিন্দুস্থানের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং তথাকার কার্য্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নানা তথ্য নিজে দেখা শুনা করিয়া জানিয়া আসিয়াছেন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ মাঝে মাঝে এইরূপ সফরে বাহির হইলে নিজের চোখে কানে যে সকল বিষয় দেখা শুনা করিয়া আসিতে পারেন, অপরের মুখে ঝাল খাইলে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আশা করা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভের পর নলিনীবাবু তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদিগের নিকট যে সকল আভাষ দিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠিত হইলে বীমাজগতে বাঙ্গালীর শক্তি ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। নলিনীবাবুর আশা, উদ্যম ও উদ্দেশ্য সফল হউক – ইহাই আমরা কামনা করি। অটোয়া কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কমিটির নিকট সম্প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন ; এইবার এই সকল বিষয়ে তিনি মনোযোগ দিবেন।

* * *

নিউ ইণ্ডিয়ার জীবনবীমা বিভাগের সেক্রেটারী ডাক্তার এস্, সি, রায় সম্প্রতি তাঁহার "ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স্ রিভিউ" এর অফিসে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদিগকে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। সেদিন সমস্ত দিনব্যাপী যে দুর্য্যোগ ছিল তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি নাই যে এত লোক সমাগম হইবে। কিন্তু সেই দুর্য্যোগের মধ্যেও প্রায় সকল স্যংবাদিক দিগকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বুঝিলাম যে ডাক্তার রায়ের প্রতি সকলের আকর্ষণ এত বেশী যে ভীষণ দুর্য্যোগেও কেহ তাঁহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জলযোগের পর আমাদের প্রিয়বন্ধু ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছায়াচিত্রযোগে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন। সভায় যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। বন্ধুবর সুরেশবাবুর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও যেমন, নিমন্ত্রিতদিগের জন্য তাঁহার চিরাচরিত আয়োজনের ব্যবস্থাও তেমনি সুবিদিত। সুতরাং ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট সেদিন মেঘ, বিদ্যুৎ এবং বর্ষাপ্লাবনের জন্য জনবিরল হইলেও কলিকাতাস্থ সাংবাদিক এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সম্মিলনে ও আনন্দ কোলাহলে ক্লাইভ ষ্ট্রীট মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার রায়ের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও বন্ধুবৃদ্ধি হউক।

* *

স্বরাজীযুগের সুবিখ্যাত মালসী শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার সম্প্রতি দিল্লীর Tropical Insurance কোম্পানীর বাঙ্গলা দেশস্থ শাখার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্বরাজীযুগের কাউন্সিল গৃহে একদিন ভায়ার বক্তৃতা সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগের বস্তু ছিল। আমাদের কাউন্সিল সমূহ এখনও পর্য্যন্ত বয়স্কদিগের ডিবেটিং ক্লাব ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ দায়ীত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা কিম্বা জাতীয়তা গঠনের সহায়তাসূচক কোনও রূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের ও প্রচলনের পক্ষে ব্যবস্থাপকদিগের যখন কোনও ক্ষমতা নাই, তখন এই সব কাউন্সিলে যতই অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা হউক না কেন, ফলে কিন্তু কাঁচা রম্ভা। সুতরাং কাউন্সিল গৃহে যাত্রাদলের গদাবর্ষী, ভীমার্জ্জুনী বক্তৃতায় কান ঝালাপালা হইয়া গেলে ভায়ার নানারসসম্বলিত হাস্যোদ্দীপক উচ্ছ্বাস শুনিবার জন্য আমরা সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতাম এবং একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানর্ প্যান্‌প্যানানির পর হেমন্ত ভায়ার কল্যাণে

লোক পেট ভরিয়া হাসিয়া খুসী হইত! কিন্তু সে সাধের মালসী-মঞ্চ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভায়া এখন "বাঁশী ছেড়ে অসি ধরিয়াছেন।" যেদিন কলাতলায় গিয়া ভায়া মন্ত্র আওড়াইলেন—

"এই হাতে নিলাম মাকু
এইবার ভ্যাঁ করত বাপু"

সেইদিনই বুঝিলাম যে ভায়ার Free Lance-গিরির দিন এইবার শেষ হইল। এইবার ভায়াকে "রজতগিরিনিভং"এর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নূতন মন্ত্র আওড়াইতে হইবে—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং
ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
রৌপ্যচক্র নামধেয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

ভায়া নাকে কাণে খং দিয়া মালসী মজলিসের মায়া কাটাইয়া তাঁহার পূর্ব্বতন অনুরক্তদের বোঝাইতে সুরু করিয়াছেন—

Money, Money, Money !
Brighter than Sunshine
Sweeter than honey !!

যাক্, এই ত চাই!—পেটে Silver Tonic না পড়িলে কি দেহে শক্তি হয়, না কণ্ঠে জোর আসে! ভায়ার হাতে পড়িয়া Tropical এবার নূতন শক্তি লাভ করিবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বীমার কাজে তিনি নিউ ইণ্ডিয়া এবং মেট্রোপলিট্যানে হাত পাকাইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এখানে নিজেই যখন কর্ম্মকর্ত্তা তখন নানারূপ নিষেধ বিধি ও বন্ধনের নাগপাশ হইতে মুক্ত থাকায় তিনি নিজের মনোমত পথে কার্য্য পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ, সুবিধা ও অবসর পাইবেন। তাঁহার যাত্রাপথ শুভ এবং কল্যাণময় হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

* * *

আমরা শুনিলাম, বেঙ্গল মার্কেণ্টাইল ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ (Bengal Mercantile Insurance Co. Ltd.) এর পরিচালকবর্গের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মেসার্স মুখার্জ্জী এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ (Messrs Mukherjee & Friends) ইহার পরিচালন ভার লইয়াছেন। Messrs Mukherjee

Friendএর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু বীমাজগতে সুপরিচিত; তিনি ইতিপূর্ব্বে Unique Assurance Co. Ltd.এ Chief Organiser ছিলেন। ইউনিকে থাকার সময় ব্যাপকভাবে বীমার কাজ সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচালনা পদ্ধতিও Whirlwind Campaign বা ঘূর্ণী বায়ুর বেগের ন্যায় দ্রুত গতি বিশিষ্ট ছিল।

বেঙ্গল মার্কেণ্টাইলের পরিচালক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টর বোর্ডেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়াছেন দেশপ্রসিদ্ধ এবং নানারূপে নির্য্যাতিত ও নিগৃহীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; দেশের বহুলোক তাঁহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে এবং বিশ্বাস করে। এইরূপ যোগাযোগ হওয়ায় আশা করা যায় যে বেঙ্গল মার্কেণ্টাইলের বদ্ধ জলাশয় এইবার বাঁধমুক্ত হইয়া আবার খরস্রোতে প্রবাহিত হইবে। আমরা চিন্তাহরণবাবুর এই নূতন প্রচেষ্টায় আমাদের শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

* * *

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটির মাদ্রাজ শাখা-অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পি, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার মহাশয়ের সম্প্রতি পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। মিঃ আয়াঙ্গার বীমাজগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে দেশীয় বীমাজগত বিশেষতঃ "হিন্দুস্থান" একজন যথার্থ কর্ম্মী হারাইল। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

অটোয়া চুক্তির চুম্বক বিবরণ

অটোয়া চুক্তি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ে ভারতের যে লাভ লোকসান হইবে সে সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইতেছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নানা তর্ক বিতর্কের পর এই বিষয়ে অভিজ্ঞদিগের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করার জন্ত একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল ; বাঙ্গলা দেশ হইতে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং "হিন্দুস্থানে"র জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই কমিটীতে সুযুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটীর অধিকাংশ সদস্যের মতে সাময়িক ভাবে তিন বৎসরের জন্ত অটোয়া চুক্তি মানিয়া লইবার জন্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট অনুমোদন করিয়াছেন। কেবল সার আবদার রহিম, শ্রীযুক্ত রাজু ও হরবিলাস সর্দ্দা

পৃথক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। আমরা এই রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার এইখানে প্রকাশ করিলাম।

অধিকাংশ সদস্য যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে ;—"আমরা যতদূর বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে অটোয়া চুক্তি গ্রহণ ভারতের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল বলিয়াই আমরা নিঃসংশয়রূপে বিবেচনা করি, তবে প্রকৃত ফল কি হয় তাহা পরীক্ষা করা দরকার। আমরা বিশ্বাস করি, এই রিপোর্টে আমরা যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা উক্ত পরীক্ষা পরিচালনার পক্ষে আবশ্যকীয় উপাদান যোগাইবে।" রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে, শুল্কসুবিধার ফল সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি বার্ষিক রিপোর্ট তৈয়ারী করিবেন। আমদানী শুল্ক-সুবিধার জন্য ভারতীয় শিল্পব্যবসায়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ জানাইলে তাহাও তৎসহ বিবেচিত হইবে। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কৃষি ও অন্যান্য বিষয়ে চুক্তির ফল কিরূপে হয় তাহার বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক রিপোর্ট আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থা পরিষদের ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটী গঠিত হইবে এবং কমিটী ব্যবস্থা পরিষদে রিপোর্ট পেশ করিবেন। অধিকাংশ সদস্য আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, চুক্তি অনুযায়ী তিন বৎসর কাজ চলিবার পর গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিস্তৃত রিপোর্ট প্রদান করিবেন। উহা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা পরিষদ যদি বুঝেন যে, চুক্তি অব্যাহত রাখা ভারতের স্বার্থের অনুকূলে নহে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বাতিল করিবার জন্য আবশ্যকীয় নোটিশ প্রদান করিবেন।"

সার হরি সিং ও শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ারের অতিরিক্ত মন্তব্য।

সার হরি সিং গৌর ও শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার অটোয়া কমিটীর রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়া তৎসহ একটি অতিরিক্ত মন্তব্য লিপি প্রদান করিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, তাহাতে এই চুক্তি ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মনে সংশয় আছে। এইরূপ অবস্থায় দুইটি পন্থা মনোমধ্যে উদিত হয়,—চুক্তি অনু-মোদন অথবা বাতিল। কিন্তু তৃতীয় পন্থা বর্ত্তমানে অধিকতর সমীচীন। উহা হইতেছে এই যে, তিন বৎসরের জন্য সাময়িক ভাবে চুক্তিতে সম্মতি প্রদান। চুক্তি কার্য্যকরী হইবার পর উহার ফল কিরূপ হয়, গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসর পরে তাহা ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিবেন। চুক্তি অব্যাহত রাখা বা বাতিল করা উচিত কি না, ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। ইতিমধ্যে ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর চুক্তির ফল কিরূপ হয়, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কমিটী গঠিত হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক রিপোর্টে যে সকল তথ্য সরবরাহ করিবেন, সংশ্লিষ্ট শিল্প ব্যবসায়ের প্রতিনিধিগণের তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কমিটীর থাকা উচিত। চুক্তির উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদ যাহাতে বিচার করিতে সক্ষম হন, তজ্জন্য কমিটীর সাময়িক রিপোর্ট প্রদান আবশ্যক, যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে তাঁহারাই তথ্যের অভাব স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

বিনা সর্ত্তে গ্রহণ ও সম্পূর্ণরূপে বাতিল এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী পন্থা তাঁহারা অবলম্বন

করিয়াছেন। মন্তব্যলিপির উপসংহারে বলা হইয়াছে,—"যে দেশ ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গত দাবী পূরণে অস্বীকৃত, অথবা যে সকল উপনিবেশ ভারতীয়গণকে সাধারণ নাগরিকের প্রাথমিক অধিকার প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই, তাহাদের সহিত সন্ধির বিরোধিতায় আমরা অমনোযোগী নহি ; কিন্তু এ সকল রাজনৈতিক বিষয় এবং আমাদের বিবেচনায় বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিব. তাহাকে রাজনৈতিক বিবেচনা দ্বারা আচ্ছন্ন হইতে দেওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে আমরা আশা করি যে, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে বন্ধুত্বের এই ইঙ্গিত পরিণামে উপনিবেশ সমূহ আমাদের দেশ ও দেশবাসিগণের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব আগমনের প্রীতিপ্রদ সূচনা বলিয়া প্রমাণিত হইবে। গ্রেটবৃটেনে ভারতের কোন্ কোন্ পণ্যে শুল্ক সুবিধা পাইবে, তাহার আলোচনা করিয়া মূল রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, গ্রেটবৃটেন যে সকল পণ্য সম্পর্কে ভারতবর্ষকে শুল্ক সুবিধা হইতে বাদ দিয়াছে তাহাতে ভারত বর্ত্তমানে যে বাজার অধিকার করিয়া আছে তাহার অনেকাংশ তাহাকে হারাইতে হইবে।" সদস্যগণ দুঃখ করিয়া
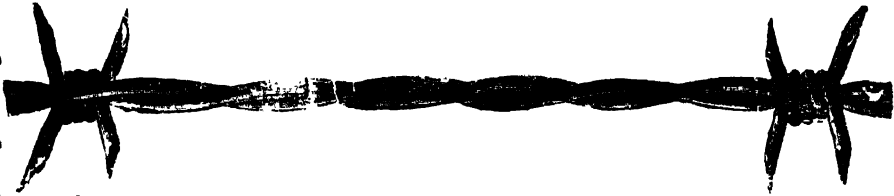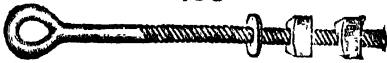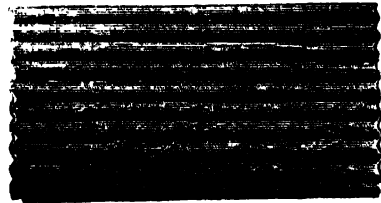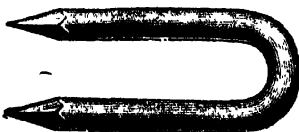
বলিয়াছেন যে তুলার বীজের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহারা এই সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবার দাবী করিয়াছেন। অতঃপর রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের শুল্কনীতির ফলে ঐ সকল দেশে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের আশু বা ভাবী আশা খুব কমই আছে; কারণ ভারতীয় রপ্তানী মালের উপর তাহারা শুল্ক বৃদ্ধি করিতেছে, পক্ষান্তরে গ্রেটবৃটেন তাহার বাজারে ভারতকে তাহার ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা ও সুযোগ দিতেছে। গ্রেটবৃটেনের বাজার ভারতের পক্ষে বড় ও স্থায়ী বাজার।" রিপোর্টে এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ছোট ছোট ভারতীয় শিল্প যাহা শুল্ক প্রাচীরের পিছনে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহা রক্ষা করা সম্বন্ধে অটোয়া শুল্ক বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিবেন।

তিনজন সদস্যের পৃথক রিপোর্ট।

সার আবদার রহিম, শ্রীযুক্ত সীতারাম রাজু ও দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দ্দা তাঁহাদের পৃথক রিপোর্টে বলেন যে, দুই সপ্তাহ কাল পরীক্ষার পর তাঁহারা অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত—"চুক্তিগ্রহণ নিশ্চিতরূপে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে"—ইহা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। উক্ত অধিকাংশ সদস্য স্বীকার করিয়াছেন যে, চুক্তির যে অংশে ভারতে আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক-সুবিধা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই অংশ সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিবার পর্য্যাপ্ত সময় পান নাই। অথচ ইহা আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক সুবিধা সংক্রান্ত অংশের ন্যায়ই প্রয়োজনীয়। ইহা লইয়া ব্যবসায়ী মহলে এবং দেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, আমাদের সহকর্ম্মীগণ ব্যবসায়ী মহলের এই অভিমতের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন না। অথচ পরিষদ কর্ত্তৃক এই স্পেশ্যাল কমিটী নিয়োগের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে যে, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের অভিমত নির্দ্ধারণ; সুতরাং এইরূপ অভিমত উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে উচিত নহে বলিয়া বিবেচনা করি। পৃথক মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, শুল্ক-সুবিধার পরিকল্পনা ভারতের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে বিবেচিত হয় নাই। লর্ড কার্জ্জনের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ শুল্ক-পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক কমিশন ইহার অনুমোদন করেন নাই। (ক্রমশঃ)

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৯ { ৯ম সংখ্যা

বঙ্গ-বীর

[শ্রীকেশব সেন]

(১)

গঙ্গা নদীর তীরে,
টেরিটী কাটিয়া শিরে,
দেখিতে দেখিতে ষ্টেশনে আসিছে
হইতে চতুর্দ্দিক,
নয়টা বাজিতে ঠিক।
হাজার জনায় আসিয়া বনায়
হইতে হাজার দিক—
প্লাটফর্ম্মে আসি, সিগ্ন্যাল পানে
চাহিল নির্নিমিখ্।

(২)

পোঁ পোঁ ঝক্ ঝক্
মহারব উঠে লোকজন ছুটে
ছাড়ে ধোঁয়া ভক্ ভক্।
ঘিরি পাশে পাশে লোক ছুটে আসে
দ্বার রোধে ঠক্ ঠক্।
হুইসেল্ হ'ল, গরজি উঠে সে
পোঁ পোঁ ঝক্ ঝক্।

(৩)

জীবনে যে প্রতিদিন
লক্ষ পরাণে শান্তি না জানে
নাহি আপত্তি ক্ষীণ।
জীবন মৃত্যু, পরের ভৃত্য
চিত্ত ভরসা হীন।
গঙ্গা নদীর ঘিরি দুই তীর
কেরাণীর প্রতিদিন

(৪)

সেক্রেটারিয়েটে—
হোথা যার যার সাহেব-জাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে।
কাদের ভাগ্যে লেট্ এবসেণ্ট্
দিনের মাহিনা টুটে,

কে জানে কি লেখা আছে কার ভালে
হাসিটী উঠিল ফুটে!

(৫)

গঙ্গানদীর তীরে
হাওড়া ষ্টেশনে আসি অবশেষে
পৌঁছিল গাড়ী কিরে?
প্লাটফর্ম্ম বুক চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটিছে আগু চিরে!
দলে দলে সবে ছুটিয়া আসিল
গঙ্গার এই তীরে।
কাতারে কাতারে চলে অগণ্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
চোখে, নাকে পশে ধূলা, তাই মুখে
কোঁচার খুঁটটী তুলি।
বাস্, ট্রাম-কার্ চলে চারিপাশে
বাজাইয়া ভেপুগুলি।
দৃক্‌পাত তায় কেরাণী না করে
কাছা-কোঁচা যায় খুলি।
শোনেনাক' ধ্বনি—'হঠ্ যাও হো'
চলে—প্রাণ ভয় ভুলি
কেরাণী উড়ায় আফিস বেলায়
সহরের পথে ধূলি।
সিঁড়ি দোরে কাড়াকাড়ি
কে আগে কে পরে উঠিবে উপরে
তারি লাগি তাড়াতাড়ি!

(৭)

লালদীঘি পারে কাতারে কাতারে
কেরাণীরা সারি সারি
"জয় হুজুরের" কহি সবে ফের্
খুলে বসে পাত্‌তাড়ি।
গৃহ হ'ল নিস্তব্ধ!
লিখিতে লিখিতে কণ্ঠ শুকায়
হিম হ'য়ে আসে রক্ত।
স্থির হ'য়ে সবে লিখিছে না করি
একটীও ক্ষীণ শব্দ।
বাংলার বীর—কেরাণীরা স্থির
আফিসেতে নিস্তব্ধ।

বঙ্গীয় যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বালকদিগের পক্ষে ইচ্ছাধীন পাঠের দুইটি বিষয় লওয়াই ভাল, কেননা তাহা না হইলে পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। পরীক্ষা যখন যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য লওয়া হয়, তখন অন্য সব সমান বিষয় হইলেও যে যত অধিক উচ্চস্থান অধিকার করে তাহার নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনা তত অধিক।

এই বিষয়গুলির পাঠ্যতালিকা মোটামুটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন এবং জুনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার অনুরূপ ; কিন্তু প্রশ্নপত্র অধিকাংশস্থলে পুস্তকগত না হইয়া ব্যবহারিক জ্ঞানের পরীক্ষার উপযোগী হয় ; ইহাতে পরীক্ষার্থী-দের শিক্ষানবিশ হইবার যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এখানে ইহা বলা দরকার যে পরীক্ষার পূর্ব্বে বিশেষ শিক্ষা না লইলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ অনেক সাধারণ ছাত্র, এমন কি আই-এ, পাশ ছেলেদের পক্ষেও ইংরেজী রচনা, পরিমিতি, ড্রয়িং ও ইচ্ছাধীন পাঠের বিষয়সমূহে পাশ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। অপর দিকে যাহাতে এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলসমূহে ও স্কুল ফাইনালের সায়েন্স বিভাগে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(২) কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়।—মেকা-নিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্ ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স। এই কোর্সে ভর্ত্তি হইতে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা দরকার :—

সেসন আরম্ভ হওয়ার প্রথম তারিখে ছাত্রদের বয়স ১৬ বৎসরের কম হইবে না।

(ক) তাহাদের স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হওয়া চাই অথবা (খ) তাহাদের শিক্ষানবিশি বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হওয়া চাই।

(ক) কলিকাতা বা তৎসন্নিহিত কোন সুপরিচিত কারখানায় তাহাদের শিক্ষানবিশ হওয়া চাই এবং (খ) ছাত্রগণ যদি প্রথম বৎসরে শিক্ষানবিশ পদ লাভ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রারম্ভিক শিক্ষা কোর্সে ভর্ত্তি করা যাইতে পারে। না হইলে তাহাদিগকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কারখানা সমূহে যখন উনিশ বৎসরের বেশী বয়স্ক কোন শিক্ষানবিশ নেওয়া হয় না, তখন ছাত্রদের উচিত ঐ বয়সের পূর্ব্বে এই শিক্ষা আরম্ভ করা। যাহারা কোন কারখানায় প্রবেশ করে নাই তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিবার পর এই

বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়, কিন্তু ভর্ত্তির এক বৎসরের মধ্যে তাহাদিগকে কোন কল-কারখানায় শিক্ষানবিশ হইয়া ঢুকিতে হইবে; এ বিষয়ে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেসন্ আরম্ভ হয় এবং মে মাসের শেষ সপ্তাহে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়।

এই স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফিস ৫৲ টাকা এবং ছাত্র বেতন মাসিক ৮৲ টাকা। অনেক স্থলে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের শিক্ষানবিশদের বেতন স্কুলকে দেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ বিষয়ে প্রত্যেক কারখানার আপন আপন নিয়ম আছে। যাহারা পুর্ব্বোক্ত বর্ণিত শিক্ষানবিশি বোর্ডের (উপরোক্ত) প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চাহে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটা প্রারম্ভিক বা গোড়ার ক্লাশ আছে। শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি কাল উত্তীর্ণ হইলে সে যে কারখানায় কাজ করে সেখানে কর্ম্মচারী হিসাবে ঢুকিতে পারে। অবশ্য পদ খালি থাকিলে ও শিক্ষানবিশের ঐ পদ অনুযায়ী গুণ থাকিলেই সে চাকুরী পাইবে আরও উচ্চ যোগ্যতাবিশিষ্ট শিক্ষানবিশগণকে তিন চারি বৎসর শিক্ষানবিশি করার পর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য প্রত্যেক জুলাই মাসে গৃহীত প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়। যাহারা তথায় ভর্ত্তি হইতে সমর্থ হয় তাহারা এদেশের সর্ব্বোচ্চ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় এবং শিল্পসংক্রান্ত কাজে অফিসারের পদ পাইবার যোগ্য হয়।

ইলেক্ট্রিক তার লাগাইবার কোর্স

সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা করিয়া ছয় মাসের জন্য এই কোর্স। এই কোর্সে বৈদ্যুতিক তার বসাইবার কাজ সম্বন্ধে পুঁথিগত ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ভর্ত্তি

(১) ভর্ত্তির তারিখে, শিক্ষার্থীদের বয়স ২০ বৎসরের কম যেন না হয়। কনট্রাক্টারের বেতনপ্রাপ্ত বা বিনা বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে প্রথমে ভর্ত্তি করা হইবে। ক্লাশে ২৫ জনের অধিক লোক নেওয়া হইবে না।

(২) পদপ্রার্থীদের ইংরেজী ও প্রাথমিক অঙ্ক শাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান আছে তদ্বিষয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটী পরীক্ষাও লইতে পারেন।

বেতন

অনুমোদিত কোর্সের (ছয় মাসের) ছাত্রবেতন ৩০৲ টাকা এবং সাবধানতার জন্য ১০৲ টাকা জমা দিতে হয়। সন্তোষজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করিতে পারিলে প্রত্যেক ছাত্রকে পারদর্শীতার একখানি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

প্লাম্বিং এবং সেনিটারি ফিটিং কোর্স

নিম্নলিখিত তিনটি সর্ত্ত পূরণ করিতে পারিলে ছাত্রদিগকে এই বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়:—

(১) সেসন্ আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিনে তাহাদের বয়স ১৬ বৎসরের বেশী হওয়া চাই।

(২) তাহাদের (ক) স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষা অথবা (খ) শিক্ষনবিশি শিক্ষা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হওয়া চাই।

(৩) (ক) তাহারা কোন উপযুক্ত কারখানার প্রকৃত শিক্ষানবিশ হইবে অথবা (খ) তাহারা কলিকাতার রেজিষ্টার্ড্ প্লাম্বার্ হইবে। এই কোর্সের প্রথম বৎসরে যদি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র না পাওয়া যায় তাহা হইলে স্কুলের অধ্যক্ষ কোন কোন ছাত্রকে উপযুক্ত ২ নং যোগ্যতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

বর্ত্তমানে এই ক্লাশে উর্দ্ধপক্ষে বিশ জনের অধিক ছেলে নেওয়া হয় না।

সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ১লা জুলাই তারিখে কোর্স আরম্ভ হইবে এবং প্রতি বৎসরে দুইটি টার্ম থাকিবে, যথা—জুলাই হইতে ডিসেম্বর, এবং জানুয়ারী হইতে জুন।

বৎসরে ৯৬৲ টাকা ফি আদায় করা হয়। অনুমোদিত কোর্সের বেতনের জন্য এই টাকা লাগে। যে সব ছাত্র শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে তাহাদেরও উহা কম করা হয় না। বেতন প্রত্যেক মাসে অগ্রিম দিতে হয়।

প্রত্যেক ছাত্রকে সাবধানতার জন্য ১০৲ টাকা জমা দিতে হইবে। সকল ছাত্রকেই স্কু নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষানবিশদের বেলায়, দরখাস্ত তাহাদের কারখানার মালিকদের মারফতে আসা দরকার। রেজিষ্টার্ড প্লাম্বারগণ ভর্ত্তির সময় তাহাদের রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট উপস্থিত করিবে। এই সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে জানা যাইবে; ঠিকানা ১১০ নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাঁচড়াপাড়া শিল্পবিদ্যালয়

কাঁচড়াপাড়া স্কুলে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের কাঁচপাড়াস্থিত কারখানায় হাতেকলমে শিল্প শিক্ষার কাজ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারী ও মে মাসে গৃহীত শিক্ষানবিশ ট্রেণিং বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলানুসারে ছেলেদিগকে বৎসরে দুইবার প্রথমশ্রেণীর শিক্ষানবিশরূপে ভর্ত্তি করা হয়। ১লা জানুয়ারী অথবা স্থলবিশেষে ১লা মে তারিখে ছেলেদের বয়স ১৮ বৎসরের অধিক হইবে না এইরূপ হওয়া চাই। তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল হওয়া দরকার। গরীব মেধাবী ছেলেদিগকেও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই রেলওয়ে ভালরূপ ভাতা সাহায্য করে এবং শিল্পবিভাগদ্বারা পরিপুষ্ট এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার সুবিধা দেয়। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভাতার পরিমাণ মাসিক ১৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া বাৎসরিক বৃদ্ধি হইয়া ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীতে মাসিক ৪০৲ টাকায় গিয়ায় দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া থাকা ও খাওয়া খরচ লাগে না। প্রত্যেক স্কুলেই কারখানায় ও স্কুলে সন্তোষজনকভাবে কাজ করিলে তবে এই বাৎসরিক বৃত্তিবৃদ্ধি দেওয়া হয়। কারখানার কাজের সময় মধ্যে ক্লাশ হয় এবং প্রত্যেক শিক্ষানবিশকে সপ্তাহে প্রায় ২২ ঘণ্টা করিয়া ক্লাশে উপস্থিত থাকিতে হয়।

শিক্ষানবিশি শিক্ষা বোর্ড বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন; উহা ছাত্রদিগের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সন্তোষজনকভাবে ছয় বৎসর শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর প্রত্যেক শিক্ষানবিশ কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ ও শিক্ষানবিশি বোর্ড হইতে মিলিত একখানা সার্টিফিকেট পাইতে অধিকারী হয়। ঐ সার্টিফিকেটে শিক্ষানবিশের কারখানার শিক্ষার বিবরণ এবং সে কোন্ কোন্ বিষয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা থাকে। কাঁচড়াপাড়ায় চারি বৎসর শিক্ষালাভ করার পর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া ছাত্রগণ শেষোক্ত কলেজে মেকানিক্যাল ও ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা বা এসোসিয়েটশিপ্ লাভ করিতে পারে। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশকালে যে পরীক্ষা নেওয়া হয় তাহার ফলাফল অনুসারে ঐ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কয়েকটা বৃত্তি দেন। যে সকল ছাত্র ডিপ্লোমা অথবা এসোসিয়েটশিপ্ কোর্স গ্রহণ করে তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত ছাত্রদিগকে শিল্পবিভাগ কয়েকটা বৃত্তি প্রদান করেন এবং এই বৃত্তি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িলে পাওয়া যায়।

শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলেই চাকুরী পাওয়া যাইবে, এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই; তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ যেরূপ আশাজনক ইহাদেরও অন্ততঃ সেরূপ হইবে ইহা বলা যায়। এখান হইতে পাশ করিলে কলকারখানায়, রেলওয়েতে, পোর্ট কমিশনরের অধীনে এবং বাংলাদেশ ও অন্যান্য স্থানের উন্নতিশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইতে পারিবে। গত ছয় বৎসরে যে ৫২জন শিক্ষানবিশ এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রায় ৪৫ জন ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও অন্যান্য স্থানে কোনও না কোন চাকুরী পাইয়াছে এবং মাসিক ৮০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ভর্ত্তির সময়, ভাতার পরিমাণ, বয়সের সীমা এবং শিক্ষার কাল সংশোধিত স্কিমএ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

খড়্গপুরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের শিক্ষানবিশদিগের রাত্রিকালীন শিল্পবিদ্যালয়।

বৎসরে দুইবার এখানে ছাত্র নেওয়া হয়, যথা—জানুয়ারী ও জুলাই মাসে। যে সকল প্রার্থী শিক্ষানবিশি শিক্ষা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া এখানে ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ হইতে ১৯ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই।

প্রার্থিগণ দরখাস্ত করিলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বেঙ্গল-নাগপুর রেলে বিনা মাশুলে খড়্গপুর যাইবার ও আসিবার পাশ দেওয়া হয়। শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করার সময় এরূপ একটা সর্ত্ত আছে বলিয়া ধরা হইয়া থাকে যে তাহারা মনোনীত হইবামাত্র তিন মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে তাহাদিগকে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, ইহার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখা যে তাহারা ঐরূপ কাজের উপযুক্ত কিনা। ঐ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে শিক্ষানবিশদিগকে যদি উপযুক্ত দেখা যায় এবং উভয় পক্ষ সম্মত হইলে, তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য পাকা শিক্ষানবিশ বলিয়া ভর্ত্তি করা হয় এবং নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি দেওয়া হয়:—

		মাসিক। টাকা।
প্রথম বৎসর	...	৩৩৲
দ্বিতীয় "	...	৪০৲
তৃতীয় "	...	৪৫৲
চতুর্থ "	...	৫২৲
পঞ্চম "	...	৬৫৲

(ক্রমশঃ)

পুকুরে মাছ ধরা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম অধ্যায়

মাদ্রাজ অঞ্চলে মাছ ধরিবার জায়গা

মাদ্রাজ হইতে ৭ মাইল দূরে রেড্ হিল্ লেক ; সেখানে সকাল বেলায় মোটরে চাপিয়া গেলে বিকেল বেলাতেই ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হয়। ইহাতে লেবিয়ো, চিতল, বোয়াল হইতে চেলা পর্য্যন্ত নানান ধরণের ছোট বড় মাছ পাওয়া যায়। ইহাতে কখনো জাল ফেলা হয় নাই ; কেননা, তাহাতে পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়। ছিপ্ দিয়া মাছ ধরিতে গেলে সেরূপ কোনপ্রকার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে নৌকায় চড়িয়া দ্বীপের কাছাকাছি ভাল মাছ ধরা যাইতে পারে ; কিন্তু নৌকা সব সময় জোগাড় করা মুস্কিল। ও-দেশী লোকেরা সাধারণতঃ তীর হইতে বর্শী দিয়া মাছ মারিয়া থাকে ; কিন্তু তাহাতে ছোট ছোট কার্প মাছ ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ে না। এরূপস্থলে মাছ মারিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে অসুবিধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইতেছে বায়ুর দৌরাত্ম্য। উন্মুক্ত নদীবক্ষে যখন বেগে দম্‌কা হাওয়া বহিতে থাকে, তখন কাত্‌লার ও তাণ্ডব-নৃত্য সুরু হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোহিত জাতীয় মাছের ঠোকরাণো সহজে নজরে পড়ে না। কিন্তু যেদিন আকাশ সুনীল ও মেঘনির্ম্মুক্ত থাকে, তখন বড় বড় মাছ পাকড়াও করা একেবারে অসম্ভব নহে। তবে যখন হাওয়ার দৌরাত্ম্য থাকে না, তখন বড় বড় মাছ ধরা অসম্ভব নহে।

মাদ্রাজ পিপল্‌স পার্কের পুকুরগুলিতে মারাল, ফলি, শোল, বোয়াল, চিতল রোহিত প্রভৃতি মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যখন বর্ষাকালে চারিদিক জলে ভরিয়া যায়, তখন মাছ মারিবার প্রকৃষ্ট সময়। আদিয়ারের কাছে সিদাপেট ফার্ম্মের বাঁধ দেওয়া জলে বোয়াল, কাত্‌লা, রোহিত, চেলা, কার্প, ফলি প্রভৃতি মাছও বেশ পাওয়া যায়।

রাতজেলা মাছ

শোল মাছ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, সিংহল, বর্ম্মা, চীন, ফিলি-পাইন দ্বীপসমূহেও ইহাদের সংখ্যা কম নহে। উহারা জলোভূমি এবং আগাছাপূর্ণ দীঘিতে থাকিতে খুব ভালবাসে। ইহারা প্রায় ৩ ফিট কিংবা তদূর্দ্ধ লম্বা হইয়া থাকে। আধার খাইতে

ইহারা মোটেই বিলম্ব করে না এবং অনেকের মতে ইহারা ব্যাঙে্র পরম ভক্ত।

পাপ্‌তা মাছ সিন্ধু প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সিংহল, আসাম, মালয় উপদ্বীপসমূহ এবং অন্যত্রও পাওয়া যায়। ইহার আকার সাধারণতঃ দেড় ফুটের মত হয়। বোয়াল মাছও ভারতের সর্ব্বত্র এবং বর্ম্মা ও সিংহলে পাওয়া যায়; ইহার আকার ছয় ফিট্‌ কিংবা তদূর্দ্ধ হয়। ইহা খাইতে মন্দ লাগে না বটে; কিন্তু মাছগুলি বড় পেটুক, যা তা' খাইবার লোভ ইহারা সম্বরণ করিতে পারে না। পাঙ্গাস মাছও বোয়ালের চেয়ে কম পেটুক নহে; ইহাদিগকে বর্ম্মা এবং ভারতবর্ষের নদী সঙ্গমে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্যেও ইহারা ৬ ফিট্

শোল মাছ

এবং তদূর্দ্ধ হইয়া থাকে। কালা বাউস মাছ পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, কচ্ছ, দাক্ষিণাত্য, ডেকান, মালাবার অঞ্চল, কৃষ্ণ নদী হইতে আরম্ভ করিয়া উড়িষ্যা, বাংলা এবং বর্ম্মা দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়।
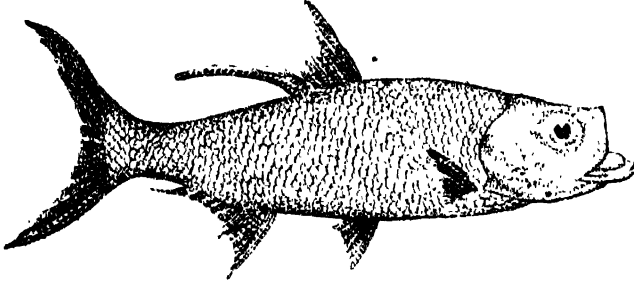
ইহা তিন ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। যদি কাঁটা খুব বেশী না থাকিত, তাহা হইলে কালা বাউস মাছ বেশ রুচিকর আহার্য্য হইত।

মাছ ধরিবার অঞ্চল

মাছ ধরিবার অঞ্চল সম্বন্ধে মোটামুটি অনেকগুলি কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার চেয়ে বেশী কোন খবর দেওয়া সহজ নহে। অনেকগুলি জায়গা ব্যক্তিগত সম্পত্তি; সেখানে মাছ ধরিতে গেলে মালিকের অনুমতি চাই। কাজেই এ সমস্ত ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার কথা বর্ত্তমানক্ষেত্রে টানিয়া না আনাই ভাল। আমি শুধু কলিকাতায় মাছ ধরার সুবিধা সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়াই বর্ত্তমানে উপসংহার করিব।

কলিকাতার চিড়িয়াখানার পুকুরে কাতলা, রোহিত, মিরগিল, কাল বাউস, শৌল এবং অন্যান্য অনেক মাছ পাওয়া যায়। চিংড়ি এবং কাঁকড়ার তো অন্তই নাই।

হাবিলদার, জেনারেল, বিরজো, গীর্জ্জা এবং লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের পুকুরগুলিতেও কাত্‌লা রোহিত, মিরগিল, চিতল প্রভৃতি মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। লালদীঘি এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের বাসস্থানেও অনেক পুকুর আছে—তাহাতেও মৎস্যের সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত। কলিকাতার সহরতলীতেও অনেক ব্যক্তিগত পুকুর আছে; উহাতে মাছ ধরিবার অনুমতি পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের বিষয়।

(ক্রমশঃ)

লবণ প্রস্তুত প্রণালী

কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত

আমি যখন তদন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম তখন কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া উহাকে ব্যবসার জন্য চালান দেওয়া যাইতে পারে কিনা! যদি এই ভাবে কাজ আরম্ভ করাই যায়, তাহা হইলে দুইটী বাধাকে অতিক্রম করিতে হইবে। প্রথমতঃ, লবণের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করা চলিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, ১৯৩১ সনের ১০ই মার্চ্চ তারিখের ভারত গভর্ণমেণ্টের মেমোরেণ্ডাম অনুসারে সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে এই ধরণের লবণ বিক্রয় করিতে পারা যাইবে।

কুটীর শিল্পের সংজ্ঞা

আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের রেকর্ড খুঁজিয়াও লবণ কুটীর শিল্প হিসাবে প্রস্তুত হইত বলিয়া কোন প্রমাণ পাই নাই। যদি কোন পরিবারের লোক বাহিরের লোকের সাহায্য না লইয়া সহজ প্রাপ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে লবণ প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে উহাকে কুটীর শিল্প বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমুদ্র সন্নিকটবর্ত্তী লোকেরা দুইটী চাটি (chati) এবং চৌভের সাহায্যেই লবণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহাকে বাস্তবিকই কুটীর শিল্প বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য কেবল যে মজুরের প্রয়োজন হইত তাহা নহে, পরন্তু কার্য্যোপযোগী স্বতন্ত্র চুল্লীও নির্ম্মাণ করিতে হইত!

কেন্দ্র গড়িবার প্রয়োজনীয়তা

কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া উহাকে ব্যবহারের কাজে লাগাইতে হইলে একটী কেন্দ্রীয় ডিপো বা গুদাম করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবে। গৃহে যে লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা সন্নিকটস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে বিক্রয় করিয়াও যদি বেশী থাকে, তাহা হইলে উহা এইখানে জমা দিতে হইবে। এরূপ ধরণের একটী কেন্দ্রীয় ডিপো গড়িয়া তোলা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে।

বাজারের অভাব

বোধ হইতেছে, কয়েক বৎসর ধরিয়া সমুদ্র সমীপবর্ত্তী অঞ্চলে লবণ এই ধরণে প্রস্তুত হইয়া চুপে চুপে বিক্রয় হইতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের কৃষি বিবরণীতে দেখা যাইতেছে যে সুন্দরবন অঞ্চলে এইরূপে ২৫০০০ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লবণ, গাঁজা প্রভৃতি বিভাগের হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, মাঝে মাঝেই এই ধরণের লবণ প্রস্তুত করার সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আসিতেছে। কাজেই বোঝা যাইতেছে যে, এতদঞ্চলে কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিয়া নিজের চাহিদা মিটাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, এই প্রকারে লবণ তৈয়ার করা আর নিষিদ্ধ নহে। যাহাতে এই সমস্ত লবণ একত্রীভূত করিয়া দূরবর্ত্তী স্থলেও

পাঠান যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মজুরের কথা

স্থানীয় লোকের মধ্যে যাহারা মাছের কারবার করিয়া থাকে, তাহা ছাড়া সকলেই প্রায় ধান্য চাষের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ডিসেম্বর মাসের ঐদিকে ধান কাটা শেষ হইয়া যায়; কাজেই জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত অধিকাংশ কৃষকই বেকার বসিয়া থাকে এবং এই সময়ই লবণ প্রস্তুত করার পক্ষে প্রশস্ত। আমি সরকারী এবং বেসরকারী লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময়ে তাহারা তিন আনা পারিশ্রমিক লইয়াও কাজ করিতে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাতে মজুরের পারিশ্রমিক ব্যতীত আর বেশী কিছু খরচ না হইলেও আমার মনে হয় যে ২০।২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এই লবণ কেন্দ্র হইতে চালান দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

সতর্কতা

কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ প্রস্তুত করা আইনসিদ্ধ হওয়ায় উহার জন্য কোন প্রকার শুল্ক দিতে হয় না; সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামাদিতে বিক্রয় করার জন্যও কোন প্রকার জবাবদিহী দিতে হয় না।
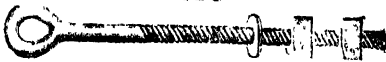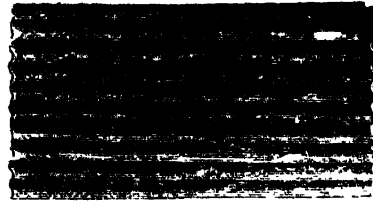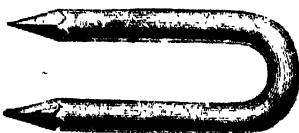
এই প্রকার সুবিধায় লবণ প্রস্তুত করিয়া যাহাতে কেহ বাহিরের বাজারে বিক্রয় করিতে না পারে, সেদিকে নজর দিবার আবশ্যকতা রহিয়া গিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট কুটীর শিল্পের বিরোধী নহে

লোকের প্রবল ইচ্ছা আছে যে গভর্ণমেণ্ট লবণকে কুটীর শিল্প হিসাবে প্রস্তুত করিতে সাহায্য করুন। ব্যবসায়ের হিসাবে ইহা সফল হইতে পারে কিনা তাহার জন্য তীরস্থ দুই একটি স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রার্থনীয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত অঞ্চলের লোকেরা যাহাতে লবণ প্রস্তুত করিয়া সেখানে বিক্রয় করিতে আসে, তাহার জন্যও উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। যাহাতে নূন চুরি হইয়া কিংবা বৃষ্টিতে ধুইয়া না যায়, তাহার জন্য ভাল ইমারৎ তুলিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট মদের আড়তের আকার যেমন, ইহাও সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রহরী

আমি গভর্ণমেণ্টকে এই পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বলি না। কেননা, যদি উক্ত উদ্যম সফল না হয় তাহা হইলে জনসাধারণ কেবল সমালোচনাই করিতে থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট কেবল-মাত্র গুদামে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন; ইহাতে উক্তস্থল হইতে লবণ বিনা শুল্কে চালান হইতে পারিবে না। এই খরচের ভার বিশেষ আমদানী ফণ্ড হইতে মিটানো যাইতে পারে; যদি উক্ত উদ্যম সফলই হয়, তাহা হইলে উহার ব্যয় গুদামের লবণের উপর শুল্ক ধরিয়াই ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

ব্যয়

কি মূল্যে লবণ বিক্রয় করিতে হইবে, তাহাও কাঁথির দৃষ্টান্তে স্থির করিতে পারা যাইবে। কলিকাতা হইতে আমদানী লবণ প্রতি সের /০ আনা

কিংবা ৴৫ পয়সা হিসাবে খুচ্‌রা বিক্রয় হয়। অর্থাৎ প্রতি মণের দাম পড়ে ২॥০ আড়াই টাকা হইতে ৩৵০ আনা। কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করার ব্যয় হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, বিক্রেতার মণপ্রতি ৶০ আনা কিংবা ।০ আনা করিয়া লাভ থাকে। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে চারি আনা করিয়া লাভ থাকিবে তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত খারাপ লবণের পাইকারী দাম পড়িবে ২।০ টাকা করিয়া এবং ভাল লবণের দাম পড়িবে ২৸৵০ আনা করিয়া। লবণের উপর ১॥৵০ আনা করিয়া যে শুল্ক ধরা আছে, তাহা বাদ দিলে নিম্নতর স্তরের লবণের জন্য ॥৶০ আনা এবং ভাল লবণের জন্য ১।৵০ আনা করিয়া ধরিতে হইবে। ইহা হইতে বেশী খরচ পড়িয়া উহা বাহিরের লবণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। বস্তুতঃ স্থানান্তরিত করিবার ব্যয় প্রভৃতি বিবেচনা করিলে মনে হইবে যে উক্ত লবণ প্রতি মণ অন্ততঃপক্ষে আট আনা হিসাবে ধরিলে তবে ব্যবসা হিসাবে সফল হইবে।

স্থানীয় নূনের দাম—

গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের সুবিধা লইয়া, অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া কাঁথির বাজারে বিক্রয় করিত। ইহাতে প্রতি সেরের দাম পড়িত তিন পয়সা অর্থাৎ মণের মূল্য পড়িত ১৸৵ আনা হিসাবে। মনে রাখিতে হইবে, ইহাতে কোন প্রকার শুল্ক দিতে হইত না। এত সস্তা দামেও এই লবণের বেশী কদর হয় নাই; অনেকেই বলিয়াছিল যে আমদানী লবণের তুল্য স্বাদবিশিষ্ট করিতে হইলে ইহাকে বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইত। কেননা, কাঁথির নিকটবর্ত্তী স্থানে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাতে সোডিয়াম ক্লোরাইডএর পরিমাণ ৮৪%; ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড্ ও সোডিয়াম সালফেট্এর পরিমাণও এত বেশী যে, উহার জন্য লবণ তিক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই নূন বিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত হয় নাই, নতুবা সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ ভাল লবণই পাওয়া যাইতে পারে। আমরা বিশ্লেষণ সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

পরীক্ষণের কৃতকার্য্যতা সন্দেহজনক

যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলের মত লবণ সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে, তাহা হইলেও আমার মনে হয় না যে এই পরীক্ষণ ক্রিয়া বিশেষ সুফল প্রসব করিবে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে দেখাযাইতেছে যে একজন লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া ৩।৪ সেরের বেশী লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। আমরা হয়তো স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, গৃহের চুল্লীতেই এই কাজ সমাপ্ত হইবে এবং সেজন্য কোন বেশী ব্যয় করিতে হইবে না। ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর লবণের জন্য ॥০ আনার বেশী দিবে বলিয়া মনে হয় না; কাজেই এক মণ লবণ প্রস্তুত করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে দশদিন খাটিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে নূনওয়ালার দৈনিক আয় হইবে মাত্র ৯৬ পয়সা, ॥০ আনার বেশী দামে বিক্রয় করিতে না পারিলে ।৶ আনা করিয়া লাভ হইবে না। দৈনিক কতখানি মাল প্রস্তুত হইতে পারিবে, তাহা কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় নাই; যাহা বলিয়াছি তাহার চেয়ে বেশীও হইতে

পারে। সমস্তই লোকের উদ্যম এবং লোণা জলের শক্তির উপর নির্ভর করে।

পরীক্ষণাঞ্চল—

স্থানীয় অনুসন্ধানে বোঝা যাইতেছে যে, প্রতি মাইল লবণাক্ত সৈকতে মাসিক ৪০০।৫০০ মণ লবণ প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিৎ যে ইহা তখনই সম্ভবপর হইবে যখন বিস্তৃত লবণাক্ত ভূমি পাওয়া যাইবে এবং নূন প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত লোকেরা কিছু উদ্যম লইয়া কাজ করিতে থাকিবে। আরো বেশী পরিমাণ লবণ পাওয়াও অসম্ভব নহে। যেখানে লোণা মাটী বেশী, যেমন, কাঁথির সন্নিকটস্থ শোলাখালের পশ্চিম-প্রান্তস্থ পুরুষোত্তমপুর, এবং সম্ভবতঃ ভেরীখান খালের মোহানা, তাজপুর, মন্দরমণি প্রভৃতি জায়গা—এসব স্থলে বেশী লবণ পাওয়া যাইবারই কথা। বালেশ্বরের সমীপবর্ত্তী বুড়াবালং নদীর মোহানাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য; এখানে লোকের বসতি খুব বেশী নহে বলিয়াই একটু অসুবিধা আছে। আমি চট্টগ্রাম হইতে পুরী পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গা খুব ভালরূপে ঘুরিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই; কাজেই উপরে যে সমস্ত স্থলের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার চেয়ে সুবিধাজনক স্থানের আবিষ্কার হওয়াও অসম্ভব নহে। পরীক্ষায় সফলতার জন্য চাই বিস্তৃত ভূভাগ, স্থানান্তরিত করিবার সুবিধা এবং লোকের ঘনবসতি।

প্রহরার ব্যয়—

যাহাতে চোরাই লবণের ব্যবসা না চলে তাঁহার জন্য ঘাঁটিতে ঘাটিতে প্রহরী মোতায়েন করিতে হইবে। ইহার জন্য কত ব্যয় হইতে পারে তাহা বলা শক্ত; কেননা সমস্তই নির্ভর করিবে স্থানীয় অবস্থার উপর। এতদ্ব্যতীত, প্রতিবৎসরে ৩।৪ মাসের বেশী নূন প্রস্তুত করা চলিবে না; কাজেই মরশুমের সময় অনেক অস্থায়ী কর্ম্মচারী গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে গুদাম পিছু ২০০ টাকা করিয়া ব্যয় হইবে; ইহার কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। মান্দ্রাজ লবণ-কর বিভাগে একটী নিয়ম আছে যে, ফ্যাক্টরী হইতে রপ্তানী লবণের উপর যে কর ধার্য্য আছে, তাহার দশ পার্সেণ্টএর বেশী যদি প্রহরী রাখিবার জন্যই ব্যয় হয়, তাহা হইলে ফ্যাক্টরীর পাওনাদারকে বাকী টাকা দিতে হইবে। দশ পার্সেণ্টের কম ব্যয় হইলে উহার ভার গভর্ণমেণ্টেই বহন করিয়া থাকে। যদি ঐ রকম নিয়মই প্রবর্ত্তিত করা হয়, এবং প্রতি-ষেধক উপায় অবলম্বন করিবার জন্য যদি গুদাম প্রতি ২০০৲ টাকা করিয়াই ব্যয় হয়, তাহাহইলে ফ্যাক্টরীর মালিককে প্রহরা-ব্যয় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ১১০০ মণ লবণ প্রস্তুত করিয়া ২০০০৲ টাকা কর দিতে হইবে। ব্যবসাকে সফল করিতে হইলে ফ্যাক্টরীর কর্ত্তা প্রতিষেধক-ব্যয় হিসাবে বেশী অর্থ দিতে পারিবেন না; গভর্ণমেণ্টও যে এতৎসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি আরো সহজ করিতে পারিবে, তাহাও ধারণা হয় না।

সৈকতাঞ্চলের অধিবাসীকে এই সমস্ত তথ্যগুলি ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। নতুবা অন্তভূ ভাগে চোরাই মাল রপ্তানী বাড়িবে বই কমিবে না। যদি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ মিটাইবার ক্ষমতা নূতন ফ্যাক্টরীর না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইবে। দুই বৎসর পরীক্ষা করিলেই সমস্ত ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া আসিবে। যদি এই সময়ের শেষে দেখা যায় যে ফ্যাক্টরীর মাল সুবিধা মত দরে বাজারে কাটাইতে পারা যাইবে, তখন সমুদ্রাঞ্চলের স্থলে স্থলে অসংখ্য কারখানা গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

ক্রমশঃ

অটোয়া চুক্তির চুম্বক বিবরণ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

অতঃপর তাঁহারা সার জর্জ্জ সুষ্টারের বক্তৃতা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—'ভারতের অনুকূলে ব্যবসায় সুবিধা অধিক প্রদত্ত না হইলে ভারতবর্ষ বর্দ্ধিত চাহিদা অনুযায়ী মাল যোগাইতে সক্ষম হইবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্দ্ধিত মাল যোগাইতে সক্ষম হইতে ভারতীয় কৃষকগণের অনেক সময় লাগিবে। অধিকাংশ প্রদেশে নূতন জমি সহজে চাষের যোগ্য করা যায় না এবং জোত সকল এত খণ্ডবিখণ্ড যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করাও শক্ত। পক্ষান্তরে বৃটেনের ন্যায় সুগঠিত ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সমন্বিত দেশ বর্দ্ধিত চাহিদার অনুরূপ সহজেই মাল যোগাইতে পারে। কিন্তু মূল রিপোর্টে স্বাক্ষরকারী অধিকাংশ সদস্যই ভারতের প্রকৃত অবস্থার প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন নাই।"

অতঃপর সার আবদার রহিম ও তাঁহার সহকর্ম্মীদ্বয় বলেন, ভারতের যে সকল পণ্য একচেটিয়া বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সকল পণ্য সম্পর্কে ভারতের তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, ভারতে রপ্তানী পণ্যের মধ্যে সেই সকল পণ্যই অধিক। এই সকল পণ্য সম্পর্কে শুল্ক সুবিধা প্রদানের কোন মূল্য নাই। টাকার সহিত পাউণ্ডের দর বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে গত ১১ মাসের মধ্যে বৃটেনে প্রায় এক শত কোটি টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। ইহার ফলে যে সকল দেশে স্বর্ণমাণ প্রচলিত আছে সেই সকল দেশের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ভারতে ক্রয়শক্তি আরও খর্ব্ব হইয়াছে।"

ভারতের রপ্তানী পণ্য।

রপ্তানী পণ্য তালিকা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বলেন যে, গ্রেটবৃটেনের বাজারে ভারতের গম, রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। রেলের মাশুল, অবস্থা আরও নৈরাশ্যজনক করিয়াছে।

চাউল

চাউল সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, ভারত ও ব্রহ্মে যে চাউল উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৫ ভাগ রপ্তানী হয়, সুতরাং গ্রেটবৃটেনের বাজারে শুল্ক-সুবিধা প্রদান ফলে ইংলণ্ডের ক্ষতি সামান্যই হইবে। নারিকেল তৈল সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, গ্রেট বৃটেনের বাজারে উহা তেমন উল্লেখ-যোগ্য নহে।

তিসি

তিসি সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন যে, শতকরা ১০ টাকা শুল্ক-সুবিধার অবসরে লঙ্ঘন করা আর্জেন্টাইনের পক্ষে শক্ত হইবে না। ভারতে কৃষির অবস্থা যেরূপ তাহাতে উহার প্রসারের আশা সুদূরপরাহত।

কাফি

কাফি চাষ প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলেও শুল্ক-সুবিধা বিশেষ মূল্যবান হইবে; কারণ ইহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রহিয়াছে বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা।

চীনা বাদাম

চীনা বাদাম সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, ভারতে উৎপন্ন চীনা বাদামের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র গ্রেট বৃটেনে যায় এবং অন্যান্য দেশ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রহণ করে। গ্রেট বৃটেন আর হয়ত শতকরা ৬ ভাগ লইতে পারে; ইহার অধিক প্রয়োজন তাহার নাই।

পাটজাত দ্রব্য

পাটজাত দ্রব্য সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, ভারতের প্রধান বাজার হইল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও

আর্জেন্টাইন। কাঁচা পাট ভারতের একচেটিয়া, কিন্তু পাটজাত দ্রব্যে বৃটেন স্বয়ং ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহা ছাড়া, গ্রেটবৃটেনের সহিত ভারতের পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ মোট রপ্তানীর শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। পাটজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দেওয়া হইলে ডাণ্ডীর বিরুদ্ধে ভারত নিজেকে রক্ষা করিতে এবং তাহার পাটজাত দ্রব্য ব্যবসায়ের প্রসার করিতে পারে।

চা সম্পর্কে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সিংহল ভারতের পক্ষে গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে; কারণ সিংহলে চা-উৎপাদন-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। চায়ের দর বাড়িয়া যাইবে বলিয়া বৃটিশ জনসাধারণ ভারতীয় চা'কে শুল্ক-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে না।

কাঁচা মাল

ভারতের কৃষির অবস্থা যেরূপ তাহাতে সাধারণভাবে সকল কাঁচা মাল উৎপাদন বর্দ্ধিত করার সম্ভাবনা ভারতের নাই। যদিও কিছু বাড়ে তাহা মধ্যবর্ত্তী লোক, জাহাজ ও বীমা কোম্পানী কর্ত্তৃক শোষিত হয়।

পৃথক মন্তব্য লিপির উপসংহারে বলা হইয়াছে, "আমাদের সহকর্ম্মিগণ অবস্থা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করি না। নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত তথাকথিত ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে বলিয়া আমাদের সহকর্ম্মিগণ উহার কার্য্যকাল সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, পরবর্ত্তী ভারত শাসন আইনে গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী হইবেন। কিন্তু নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হইবে, তাহা এখনও কেহ জানেন না।"

শ্রীযুক্ত রঙ্গআয়ার

শ্রীযুক্ত সি এস রঙ্গআয়ার সার হরিসিং গৌর হইতে পৃথক আর একটি মন্তব্যলিপিতে বলেন যে চুক্তির কার্য্যকারিতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যে কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা তিনি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহাকে পরিষদের একটি জয়স্বরূপ বলিয়া মনে করেন, কারণ চুক্তির ফল যদি ভারতের স্বার্থ-বিরোধী বলিয়া দেখা যায় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ৬ মাসের নোটিশ দিয়া চুক্তি বাতিল করিতে পারেন, তজ্জন্য পরিষদ পর্য্যাপ্ত প্রমাণ দিতে পারিবেন। রাষ্ট্রতন্ত্র যদি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে চুক্তি অব্যাহত রাখা বা বাতিল করা সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এই পরিষদের উত্তরাধিকারী পরিষদের যথেষ্ট উপাদান থাকিবে।

মূল রিপোর্টে স্বাক্ষরকারীগণ

সার জোসেফ ভোর, সার হরিসিং গৌর, মিঃ ইয়াসিন খান, সার হ্যারেন পার্সন্স, শ্রীযুক্ত রঙ্গ আয়ার শ্রীযুক্ত মোদী, মিঃ এফ-ই জেমস, মিঃ ফর্কস মিঃ ডি'সৌজা, শেঠ আব্দুল্লা হারুণ, ডাঃ জিয়াউদ্দীন আমেদ, সার জুলফিকার আলি ও শ্রীযুক্ত সমুখম চেট্টি এই মূল রিপোর্ট স্বাক্ষর করিয়াছেন।

এই রিপোর্টের উপসংহারে বলা হইয়াছে—

আমরা আরও জানিতে চাই যে, চুক্তি যে কোন সময়ে বাতিল করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের অধিকার আমাদের এই প্রস্তাবের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অটোয়া চুক্তি গৃহীত হইলে ভারত কোন্ কোন্ শুল্ক সম্বন্ধে বৃটেনকে কি পরিমাণে সুবিধা প্রদান করিবে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

শুল্ক বিল অনুযায়ী কোন্ বিভিন্ন জিনিষের উপরে কি হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে দুইটি নূতন অধ্যায়ে তাহা ভারতীয় শুল্ক আইনের ২নং তালিকার সহিত সংযুক্ত করা হইবে। কলাই করা লোহার চাদরের শুল্কের হার দ্বিতীয় তালিকার সপ্তম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইবে।

চুক্তির (চ) তালিকার অধিকাংশ দ্রব্য ভারতীয় শুল্ক আইনের ২নং তালিকার পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। উহাদের মূল্যের উপর সাধারণতঃ শতকরা ১৫৲ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইত ; কিন্তু বর্ত্তমানে গত বৎসর রাজস্বের ঘাটতি পূরণের জন্য দুইবার ধার্য্য অতিরিক্ত শুল্কের ফলে শতকরা ২৫৲টাকা হারে শুল্ক আদায় করা হইয়াছে। চুক্তি অনুযায়ী ঐ শ্রেণীর বৃটীশ মালের শুল্কহ্রাস করিয়া শতকরা ২০ করা হইবে ; পক্ষান্তরে বৃটিশাতিরিক্ত মালের শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়া শতকরা ৩০ করা হইবে।

নিম্নলিখিত যে সমস্ত দ্রব্যের মূল্যের উপরে বর্ত্তমানে শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হয় ঐ সমস্ত বৃটীশ পণ্য হইলে উহাদের উপর শতকরা ৪০ টাকা হারে এবং বৃটিশাতিরিক্ত অন্য দেশের হইলে শতকরা ৫০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে :—বন্দুকের টোটা, মিষ্ট দ্রব্য, ইলেকট্রিক বাল্‌ব, বাদ্যযন্ত্র, তামাক ও দেশলাই ব্যতীত ধূম-পানের সরঞ্জাম, খেলনা ও ক্রীড়ার সরঞ্জামাদি।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উপর বিভিন্নরূপ বিশেষ হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে :

আগ্নেয়াস্ত্র—বৃটিশ ১৮ টাকা ১২ আনা কিম্বা মূল্যের উপর শতকরা ৪০ টাকার মধ্যে যাহা অধিক হয়।

বৃটিশাতিরিক্ত—১৮ টাকা বার আনা ও তৎসহ মূল্যের শতকরা ১০ টাকা কিংবা মূল্যের শতকরা ৫০ টাকার মধ্যে যাহা বেশী হয়।

সর্ব্বপ্রকার বিয়ার মদ্য, পিপার উপর প্রত্যেক গ্যালনে—বৃটিশ ২৪ আনা, বৃটিশাতিরিক্ত ১৮ আনা , কোয়াটার সাইজ বোতলে বৃটিশ ২ আনা, ৪ পাই, বৃটীশাতিরিক্ত ৩ আনা। অন্যান্য আকারের বোতল ও পাত্রের মদের উপর এই হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে।

সুগন্ধ স্পিরিট প্রতি গ্যালনে—বৃটীশ ৫২ টাকা ৮ আনা, বৃটিশাতিরিক্ত ৬০ টাকা। ঔষধে ব্যবহার্য্য স্পিরিট ও ঔষধ প্রতি গ্যালনে—বৃটিশ ২৬ টাকা, বৃটিশাতিরিক্ত ২৯ টাকা ; অপরীক্ষিত —বৃটিশ ৩৬, বৃটীশাতিরিক্ত ৪০।

জুতা—বৃটিশ মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা বৃটিশাতিরিক্ত ৩০ টাকা ; উভয় প্রকার জিনিষে কোনও স্থলে প্রতি জোড়ায় ন্যূনতম শুল্ক ৫ আনা হওয়া চাই।

সিমেন্ট (বিলাতী মাটী) প্রতি টন—বৃটীশ ১৩ টাকা বার আনা ; বৃটিশাতিরিক্ত ১৮ টাকা ৪ আনা।

বেতারের সরঞ্জাম—বৃটিশ মূল্যের উপর শতকরা ৪০ ; বৃটিশাতিরিক্ত মূল্যের উপর শতকরা ৫০ টাকা।

মোটরগাড়ী—বৃটিশ মূল্যের উপর শতকরা ৩০ টাকা, বৃটিশাতিরিক্ত ৩৭৲ টাকা ৮ আনা।

মোটরবাস, লরী ও মোটর গাড়ীর অংশ—বৃটিশ মূল্যের উপর শতকরা ২০, বৃটিশাতিরিক্ত শতকরা ২৭॥ টাকা।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা হয় নাই এরূপ যে সমস্ত শ্রেণীর লৌহ ও ইস্পাতের উপর শতকরা ১৫॥০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য করা হয় ঐ সমস্ত শ্রেণীর বৃটিশ মালের উপর শতকরা ১০ টাকা এবং বৃটিশাতিরিক্ত মালের শতকরা ২০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে।

চুক্তির (ঙ) তালিকায় যে সমস্ত জিনিষের উপর বর্ত্তমানে শতকরা ২৫ টাকা হারে শুল্ক আদায় করা হয়, ঐ সমস্ত দ্রব্য কোনও উপনিবেশের হইলে শতকরা ২০ টাকা এবং অপর দেশের হইলে শতকরা ৩০ টাকা হারে শুল্ক ধার্য্য হইবে

বিদেশের মশলা সমূহ :—

মোটা শুক্‌না মাছ—প্রতি মণে উপনিবেশের ২॥০ টাকা; অন্য দেশের ৩॥০ টাকা।

সুপারী—উপনিবেশের শতকরা ৩৭॥০ টাকা অন্য দেশের ৪৫ টাকা।

বর্ত্তমান শুল্ক তালিকার ১২৪ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত মসলা সমূহ—উপনিবেশের শতকরা ৩৭॥০ টাকা, অন্য দেশের শতকরা ৪৫ টাকা। অন্যান্য মসলা যথা,—লঙ্কা, আদা, মৈত্রী উপনিবেশের শতকরা ২২॥০ টাকা, অন্য দেশের শতকরা ৩০ টাকা।

তিক্ত ঔষধ প্রতি ইম্পিরিয়াল গ্যালন— উপনিবেশের ৪৫ টাকা, অন্য দেশের ৫০ টাকা; প্রুফ গ্যালন উপনিবেশের ৩৩॥০ টাকা অন্য দেশের ৩৭০ টাকা।

রম (মদ) প্রুফ গ্যালন—উপনিবেশের ৩৭৮০ অন্য দেশের ৩৭॥০ টাকা।

চা প্রতি পাউণ্ডে—উপনিবেশের ৩ আনা, অন্য দেশের ৫ আনা।

কাফি মূল্যের উপর—উপনিবেশের শতকরা ২৫ টাকা অন্য দেশের শতকরা ২৫ টাকা ও তৎসহ প্রতি পাউণ্ডে ১ আনা।

অটোয়া চুক্তি সম্বন্ধে ইউরোপের অভিমত

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট বৃটেন হইতে রপ্তানী মালকে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ব্যবস্থায় আমদানী হইতে দিবেন বলিয়া ধারণা হওয়ায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ দেশগুলিতে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। ইহা তাহাদের ব্যবসা কমিয়া যাইবে বলিয়া নহে; পরন্তু শেষে যে ইহা ভারতেরই অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই তাহাদের ধারণা। ইহা ভারতের আর্থিক উন্নতির পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতাও অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। নিক্তির ওজনে যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বৃটেন এবং ডমিনিয়ান সমূহ যে সুবিধা লাভ করিবে, তাহার তুলনায় ভারতের সুবিধা নগণ্য বলিলেই চলে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে আমদানী মালের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে আসিত; ইহা কমিতে কমিতে গত বৎসরে ৪৬ পার্সেণ্টে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর পক্ষে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ভারতের লেন দেন বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে ৫৪ পার্সেণ্ট হইয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয় রপ্তানী মালের মাত্র ৪০ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে, বাকী ৬০ অংশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে গ্রহণ করিয়া থাকে।

যদি আমরা আবার এই ব্যাপারটিকে পণ্যের মূল্য দিয়াই যাচাই করিয়া লই, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বৃটিশ সাম্রাজ্য যত মূল্যের মাল ভারতে রপ্তানী করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় গৃহীত পণ্যের দাম অনেক কম। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্য বিভাগ বলিতেছে :—

"ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বলতার পরিচায়ক যে গ্রেট বৃটেন যে মূল্যের মাল ভারতে রপ্তানী করিয়া থাকেন তাহার তুলনায় গৃহীত পণ্যের মূল্য ঢের কম। অর্থনীতির বিধান না মানিলেও, কিছুকাল হইতে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, যে জাতি কোন বিশিষ্ট দেশের মাল বেশী পরিমাণে ক্রয় করিয়া

থাকে, তাহার রপ্তানী মাল ক্রয় করাই পৃথিবীতে কতকটা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে।

বস্তুতঃ ভারতের দিক হইতে প্রশ্নটার উত্তর দিতে হইলে আমরা বলিব যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতের বাণিজ্যগত সম্পর্কে কতকটা নিষ্ক্রিয় (Passive) ধরণের ; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পর্কে এই কথাটা ঠিক এমনভাবে প্রযোজ্য হয় না। শেষোক্ত দেশসমূহ যে পরিমাণে মাল ভারতে রপ্তানী করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় তাহারা ঢের বেশী মূল্যের কাঁচা মাল গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বহির্বাণিজ্যের মূলোচ্ছেদ হওয়া ছাড়া অটোয়া চুক্তিতে আর কিছুই হয় নাই। যে সমস্ত দেশ ভারতের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সংশ্লিষ্ট আছে, তাহারা ইচ্ছা করিলেই ভারতের বহির্বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিতে পারে। যে সমস্ত দেশ ভারতের সহিত ব্যবসার বাজারে প্রতিযোগিতা করিতেছে, তাহাদের সঙ্গে লেন দেন করিয়াও সাম্রাজ্যের বাহিরের দেশগুলি ভারতের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে।

যদি নিরপেক্ষভাবে উপরোক্ত যুক্তিগুলির বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সাম্রাজ্য সুবিধাবাদ গ্রহণ করিলে ভারতেরই মারাত্মক লোকসান হইবে ; কেননা, তাহার ব্যবসা পৃথিবীর অনেক দেশের সঙ্গেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভবিষ্যতে হয়তো থাকিবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা খুব বেশী নহে ; পরন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খরিদ্দার হইতেছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি। যদি এই সমস্ত দেশগুলিকে ভারতের বাজারে সুবিধা না দিয়া অল্পক্রয়কারী সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগকেই দেওয়া হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্য-বহির্গত দেশগুলি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবে না বলিয়া কেহ হলফ করিতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভারতের বাণিজ্যে অনেক ওলোট পালোট হইবে এবং তাহা আমাদের পক্ষে আদৌ সুবিধার কথা হইবে না।

জলগর্ভ হইতে স্বর্ণোদ্ধার

১৯২২ সনে ইজিপ্ট নামক একখানি ইংরেজ পোত একখানি ফরাসী জাহাজের সহিত সংঘর্ষে জলমগ্ন হইয়া যায়। কুয়াশার দিক্‌চক্রবাল তখন আচ্ছন্ন ছিল, চারিদিক লেপিয়া যেন একাকার হইয়া গিয়াছিল। এই দুর্য্যোগের সময় ব্রেষ্ট বন্দরের ৪০ মাইল দূরে বিস্কে উপসাগরের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং ইংরেজ জাহাজখানি ৪০০ ফিট নীচে ডুবিয়া যায়। জাহাজের মধ্যে প্রায় ৫ টন স্বর্ণ ও ৪৩ টন রৌপ্য ছিল; ১৯২২ সনের বিনিময় হারে তাহার মূল্য ছিল ১,০৫৪,০০০ স্বর্ণ পাউণ্ডের সমতুল্য। এই সমস্ত সম্পত্তি লয়েড্‌স কোম্পানীতে বীমা করা ছিল; কাজেই জাহাজ যখন ডুবিয়া গেল তখন কর্ত্তৃপক্ষকে সমস্ত অর্থ কড়ায় ক্রান্তিতে গুণিয়া দিতে হইয়াছিল। যেদিন ইজিপ্ট অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছিল, সেদিন কে জানিত যে তাহার কুক্ষি বিদারণ সেই বিলুপ্তপ্রায় রত্নসম্পদের আবার পুনরুদ্ধার হইবে! অতি সুদক্ষ ডুবুরীও সাধারণ রবারের পোষাক পড়িয়া ১৩০ ফিটের নীচে নামিতে পারে না; আজ তাই আর্টিগ্লিও নামক উদ্ধার-তরণী যখন সেই অতল সমুদ্রতল ছানিয়া রত্নসম্ভারের কিয়দংশ উদ্ধারে কৃতকার্য্য হইল, তখন বিশেষজ্ঞ ও কবির কল্পনা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন যে সমুদ্রের বুক চিরিয়া যে খরস্রোত বহিয়া যায়, শুধু তাহার জন্যই ইজিপ্টের উদ্ধারণ কার্য্য আদৌ সম্ভবপর নহে; কেবলমাত্র তাহাই নহে, যে ডুবুরী রবারের পোষাক পড়িয়া ৪০০ ফিট জলের নীচে কাজ করিবে, তাহার পক্ষে এরূপ প্রবল জলের চাপ সহ্য করিয়া কাজ করা আদৌ সম্ভব নহে। কঠোর কল্পনা ও বিশেষজ্ঞের সতর্কবাণীকে ব্যর্থ করিয়া যাহারা এই রত্নসম্ভারের উদ্ধারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ৪ জন ইটালীয় যুবক, তাঁহাদের কাহারো বয়স ৩০ বৎসরের বেশী নহে। এই অসাধ্যসাধনের জন্য ম্যারিও রাফেলি, রাফেলো ম্যাঞ্চিনি, জিওভান্নি লেন্সি ও ফচুনেটো সোডিনির নাম আজ সভ্যজগতের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে; মানবের ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয় ঘটনা। প্রকৃতিকে জয় করিবার দুর্জ্জয় সাহস যাহাদের আছে, যাহারা জননীর অঞ্চলতলে নিতান্ত "ভাল মানুষ" সাজিয়া বসিয়া থাকে না, তাহাদিগকে দিয়াই এইরূপ অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হয়। সেদিন যখন তাই এই দুঃসাহসিক সমুদ্রজয়ী বীর চতুষ্টয় আর্টিগ্লিও জাহাজ হইতে প্লাই-মাউথের বন্দরে অবতরণ করিলেন, সেদিন ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে উৎসবের উৎস বহিয়াছিল, বন্দরে বন্দরে জয়পতাকা উড়িয়াছিল। ভাগ্যদেবী

ও কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাদের ললাটে যে রাজটিকা পড়াইয়া দিয়াছিল, আজ তাহা ইটালী দেশকেও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনের অভিযানে ইহা চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

এই ডুবুরী চতুষ্টয়ের অভিযানে প্রথম সমস্যা হইয়াছিল, পোষাক-পরিচ্ছদের। কেননা, রবারের পোষাক পরিধান করিয়া ৪০০ ফিট নিম্নস্থ সমুদ্রগর্ভে ডুব দেওয়ার অর্থই মরণ বরণ করা। তাহাদিগকে তাই একটী ইস্পাতনির্ম্মিত সেল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল; উহাকে পর্য্যবেক্ষণগৃহ নাম দিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। কেননা, রবারপোষাক পরিহিত ডুবুরীরা জলের মধ্যে যেমন যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে পারে, ইস্পাত সেলের আচ্ছাদনে তাঁহাদের সে সুবিধা আদৌ নাই। তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ ঘরে একটী টেলিফোন ছিল, তাহা দিয়া উপরস্থ লোকদিগকে আদেশ দিলে তাহারা তদনুসারে কাজ করিত। দ্বিতীয় সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, জাহাজের অবস্থিতি লইয়া। ফরাসী ও ইংরেজ কাপ্তেনদ্বয় যাহারা সেই দুর্দ্দিনের ঘটনার সাক্ষী ছিলেন, তাহারা ইজিপ্টের সংস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতে থাকিলেন। কাজেই তাহাদিগের মতামতে ডুবুরীদের কাজের কোন সুবিধা হইল না। তাঁহারা অন্ধের মত সমুদ্রগর্ভস্থ ৫০ বর্গ মাইল জায়গা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ইজিপ্টের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। ইহা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘটনা। যে জাহাজ খুঁজিতে গিয়া একদল সাহসী লোকের জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল, তাহাকে এইরূপে খুঁজিয়া পাওয়া গেল। খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও রত্নোদ্ধার করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ডুবুরীদের হাত থাকিলেও ইস্পাতকক্ষে তাহারা একরূপ বন্দীর মতই ছিল। এইরূপ অবস্থাতেই তাহাদিগকে বোমা বসাইয়া লৌহকক্ষ বিদীর্ণ করিতে হইয়াছে, তারপর সেই প্রায়ান্ধকার জাহাজের কুক্ষি হইতে সমস্ত রত্নরাজিকে উপরে উঠাইতে হইয়াছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে। তাঁহাদের অসমসাহসিকতার কথা আজ ঘরে ঘরে নন্দিত হইতেছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যাবলীতে যে ধৈর্য্য, সংযম ও দৃঢ়-চিত্ততার আভাষ মিলিতেছে তাহার কাছে সাহসের কথা হার মানিয়া যায়। গত বৎসর ছয়মাস ধরিয়া তাঁহারা যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার আর তুলনা মিলেনা।

তারপরে রত্নোত্তোলন কার্য্য সুরু হইল। ডুবুরীরা জাহাজের কক্ষে বার্ম্মিংহাম প্রস্তুত ভারতীয় মহিলাদের ইয়ারিং, পাতিয়ালার মহারাজার বন্দুক ও কার্টিজ, লর্ড ইঞ্চকেপের বাইবেল, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের হাজার খানেক টাকার নোট প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। তারপরে স্বর্ণোত্তোলন কার্য্য সুরু হইল।

ইটালীর এই ডুবুরী চতুষ্টয়ের জীবনী পর্য্যালোচনার যোগ্য। তাহাদিগকে প্রতি পদে অসংখ্য বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রকৃতির উপর জয়ী হইতে হইয়াছে। তাঁহারা পরাজয়ে নিরুৎসাহিত হয় নাই, জয়েও অতিরিক্ত আনন্দিত হয় নাই; যেন, ইহা তাঁহাদের জীবনে একটী অতি সাধারণ ব্যাপার। এমনি করিয়া মানুষ, জাতি, এবং সমগ্র দেশ বড় হয়। আজ ইটালীর যুবকদের এই অসমসাহসিক অভিযান সম্বন্ধে লিখিতে বসিয়া আমাদের দুর্ভাগা দেশের কথা বারে বারে মনে পড়িতেছে। এদেশের যৌবনের অভিযান কি কেবল জঘন্য "লীলায়িত লালসাময়" উপন্যাসেই পর্য্যবসিত হইবে?

রেলওয়ে ভাড়া সম্বন্ধে তদন্ত

কিছুদিন পূর্ব্বে পাতিয়ালার রোলার ময়দার কল ময়দা চালানীর হার লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। দরখাস্তকারীগণ বলিতেছেন যে ১৯৩২ সনের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রেরকের দায়িত্বেই পুরা গাড়ী ময়দা গ্রহণ করিত, schedule রেটে; কিন্তু এখন তাহারা নূতন পদ্ধতি অনুসারে কাজ করায় রোলার কোম্পানীর পাঞ্জাবস্থ মিলগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। কেন না, উহাদের বেশীর ভাগ চালানই যুক্ত প্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা, বাংলা ও আসাম-প্রদেশে হইয়া থাকে। দরখাস্তকারীগণ বলিতেছেন যে, যে উদ্দেশ্যে নূতন পদ্ধতিকে অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার মিলগুলির সাহায্য করা। ইহাতে পাঞ্জাব মিলগুলির বাজার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ডি, এইচ্, এবং এ, বি, রেলওয়ের চৌহদ্দির মধ্যে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিবে। ইহা ব্যতীত কাণপুর, এলাহাবাদ, বারাবাঁকি, লক্ষ্ণৌ, ই, বি, রেলওয়ে এবং অন্যান্য স্থলে ষ্টেশনে ভিন্ন ভিন্ন রেট প্রচলিত আছে; ইহা তাহার মধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। দরখাস্তকারীগণ সেই জন্য অনুরোধ করিতেছেন যে, পূর্ব্বকার Schedule রেটেই ময়দার চার্জ্জ লওয়া হউক এবং কাণপুর প্রভৃতি স্থলে যে বিশেষ ব্যবস্থা বলবৎ আছে তাহা পাতিয়ালা অঞ্চলেও প্রবর্ত্তিত করা হউক

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, নব প্রচলিত হার ই, আই, আর এণ্ড ময়দা চালানী সম্পর্কে সর্ব্বত্রই সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের যুক্তি এই যে, পূর্ব্বোক্ত হারে পাঞ্জাবের মিলগুলির কোন ক্ষতি হইতেছে না এবং কাণপুর প্রভৃতি স্থলে যে বিশেষ রেটের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এবং কাটিহার ঘুরিয়া যে বি, এণ্ড এন, ডবলিউ রেলওয়ে যায় তাহার ভাড়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য। এই সমস্ত কারণের জন্যই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ পাতিয়ালা হইতে চালানী মালের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিতে রাজী নহেন।

এতদ্ব্যতীত আরো একটী দরখাস্ত আসিয়াছে, মধ্য প্রদেশ এবং বেরারের মাইনিং এসোসিয়েশনও নাগপুর হইতে। তাহারা বলিতেছে যে, যে সমস্ত ম্যাঙ্গানিজ অবিশুদ্ধ অবস্থায় বিদেশে চালান হইয়া যায়, তাহার ভাড়ার হার বি, এন, রেলওয়েতে কমাইয়া দেওয়া হউক। তাহারা বলিতেছে যে, তাহাদের জিনিষের চাহিদা ইউরোপে খুব বেশী; কিন্তু কতকটা বাজার মন্দা হওয়ার দরুণ এবং কতকটা রুষিয়া হইতে প্রচুর মাল আমদানী হওয়ার দরুণ, মধ্যপ্রদেশস্থ মালের কাট্‌তি ইউরোপে অনেক

পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মাল সমূহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উহা সহজেই বেশী পরিমাণে বাজারে প্রচলিত হইতে পারে, যদি রেলওয়ে-ভাড়া সামুদ্রিক বন্দর পর্য্যন্ত সম্ভব মত কমাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা আরো বলিতেছে যে, ম্যাঙ্গানীজ্ বোঝাই করিবার ষ্টেশন হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ block rate এমন ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, বোম্বাই অপেক্ষাকৃত সন্নিকটে হইলেও কলিকাতা ও বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলের ভাড়া একই পড়িয়া থাকে। কাজেই ম্যাঙ্গানীজ ব্যবসাদারগণ block rate উঠাইয়া দিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বকার হার বজায় রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

বি, এন, রেলওয়ে উপরোক্ত তথ্যগুলির সত্যতা স্বীকার করিতেছে না। তাহারা বলিতেছে যে, নাগপুর হইতে বোম্বাই ও কলিকাতায় সাধারণ ভাড়ায় মাল পাঠাইতে হইলে, বোম্বাই পর্য্যন্ত প্রতি টনে ৷৷১০ আনা করিয়া কম পড়ে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার rebate নিয়া মাল পাঠাইলে এক টাকা দুই আনা এক পাই কম পড়িয়া থাকে। রেলওয়ের নিয়মানুসারে দূরত্ব বেশী হইলে আপেক্ষিক ভাড়ার হার কম হইয়া থাকে। ইহাই তাহাদের যুক্তির মূল সূত্র।

সম্বর হ্রদের অনেক লবণ ব্যবসায়ী নালিশ করিতেছেন যে বি, বি, সি, আই এবং বি. এন, ডবলিউ রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্বর হইতে লবণ চালানী দেওয়ার জন্য খুব বেশী ভাড়া আদায় করিতেছেন। কিন্তু হাওড়া হইতে ই, আই, বি, এবং এন, ডবলিউ রেলওয়ে মারফৎ যে সমস্ত মাল শেষোক্ত লাইনের ষ্টেশন সমূহে আসিয়া থাকে, তাহার ভাড়ার হার কম। এতদ্ব্যতীত ট্যারিফ বোর্ড তাহাদের লবণ সম্বন্ধীয় তদন্তের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে যদি বর্ত্তমান ভাড়ার কোন পরিবর্ত্তন করা না হয়, তাহা হইলে খেওড়া এবং সম্বরের লবণ বিদেশ হইতে আমদানী নিমকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া পারিবে না। সম্বরের ব্যবসাদারগণ এইজন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। বি, বি, সি, আই, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, দরখাস্তকারীগণ হাওড়া হইতে আমদানী গুঁড়া নুন (crushed salt) সম্বরের অচূর্ণিত লবণের কথাই বলিয়াছেন। তাহাদিগকে বি, এবং এন ডবলিউ রেলওয়ের ষ্টেশনসমূহে থ্রু ভাড়ায় বিশেষ সুবিধা দেবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ই, আই এবং বি, এন, ডবলিউ রেলওয়ে লাইনে কম ভাড়ায় মাল চালানী দেওয়া সম্পর্কে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ট্যারিফ বোর্ডের সাক্ষ্যও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে; কেন না, উহা করকচ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; বস্তুতঃ ট্যারিফ বোর্ড পরিস্কারই বলিয়াছেন যে, বিদেশাগত লবণের সঙ্গে এই শ্রেণীর নিমকের প্রতিযোগিতা করিবার কোনও আশঙ্কা নাই। এতদ্ব্যতীত, ভাড়া হ্রাস পাইলে যে সম্বরের লবণ ব্যবসায় খুব মাথা চাঁড়া দিয়া উঠিবে, তাহা অনিশ্চিত। বি, এন, রেলওয়ে স্বীকার করিতেছে যে হাওড়া হইতে আমদানী লবণের ভাড়া খুব কম; তবে ভাড়া বাড়াইয়া দিলে যদি উহার ক্ষমতা রক্ষিত হয়, তাহা হইলে ষ্টেট্ রেলওয়ে সমূহ উহা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছে।

তাঞ্জোর সাউথ আর্কট মিলের স্বত্বাধিকারীগণ

এবং মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে এম, আই, রেলওয়ে মারফৎ যে চাউল সিংহল এবং পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চল সমূহে রপ্তানী হইয়া থাকে, তাহার ভাড়া কেবলমাত্র যে অযৌক্তিক তাহা নহে, পরন্তু বেশীও বটে। এতদ্ব্যতীত, কাহাকে কাহাকেও সুবিধা (preference) দেওয়া ছাড়াও দেখা যাইতেছে যে সন্নিকটবর্ত্তী এম, অ্যাণ্ড এস, এম রেলওয়েতে একই শ্রেণীতে ভাড়ার হার অপেক্ষাকৃত কম। বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার দিনে একেই তো ধান চাউলের ব্যবসা করা আদৌ লাভজনক নহে, তাহার উপর যদি রেলওয়ে রেটে এইরূপ অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে ব্যবসার বাজার আর ভাল হইবে না। কাজেই তাহারা প্রার্থনা করিতেছে যে, সিংহল পর্য্যন্ত ভাড়ার হারের অসামঞ্জস্য দূরীভূত করিয়া উহা অপেক্ষাকৃত কম হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক এবং এম, অ্যাণ্ড এস, এম, রেলওয়ে ও পশ্চিম তীরের মধ্যে বর্ত্তমানে যে ভাড়াগত বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হউক।

রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, দরখাস্ত-কারীগণ তথ্য সন্নিবেশ করিয়া তাহাদের যুক্তি প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন নাই। তবে তাহারা কোন কোন ষ্টেশন হইতে সিংহল পর্য্যন্ত কাহাকে কাহাকেও সুবিধা (preference) দিবার কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, রেট কমাইয়া দিয়া এখন সে অসুবিধার সুরাহা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, যাহাতে মালপত্রাদির সকলই ষ্টীমারে না যায়, সেইজন্য সিংহল এবং পশ্চিম তীরের কোন কোন স্থলে রেলের ভাড়া হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল ; ইহাতে প্রতিযোগিতা করিয়া ষ্টীমারে প্রেরিতব্য মালের কিয়দংশ রেলে পাঠাইবার জন্য ব্যবসায়ীগণকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল, অন্য কোন কারণে নহে। সেইজন্যই দেখা যাইতেছে যে, বন্দরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থলের রেলভাড়া অপেক্ষাকৃত কম ; কিন্তু তাঞ্জোর এবং দক্ষিণ আর্কট-অঞ্চল অন্তর্ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া উহার রেট হ্রাস করিবার কোন প্রস্তাব প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নাই। এই অঞ্চলের কোন কোন ষ্টেশন হইতে খুব বেশী পরিমাণ মাল কলম্বোতে রপ্তানী হয় ; কাজেই রেলকোম্পানী এতদঞ্চলের ভাড়া অন্যায়রূপে বেশী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না।

সাধারণ বাঙ্গালীর গ্রাহ্য কৃষিপদ্ধতি

[শ্রীসুরথ কুমার সরকার]

বাঙ্গলা কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু এখানে কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষ কিছু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দুই একটি Co-operative Society বা তজ্জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোনও কোনও জমিদার এবং গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বঙ্গীয় রায়ও তথা নিজেদের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কাগজ ও কলমে এ বিষয়ে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ফল ভয়াবহ। কারণ ইঁহাদের পরিচালিত এমন কোনও কৃষিক্ষেত্রের নাম সাধারণে অবগত নহেন, যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয় নাই। সুতরাং এক মণের স্থলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দেড় বা দুই মণ দেখাইলেও সর্ব্বসাধারণ এই সকল নব-উদ্ভাবিত কৃষিপদ্ধতিকে তাঁহাদের কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া মনে না করায় পরিহার করিয়া চলিতেছেন।

সরকার পরিচালিত কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যপরিচালনাপদ্ধতিতে প্রথমেই অন্ততঃ দুই-তিন শত বিঘা লপ্ত জমির প্রয়োজন। এই জমি হইতে যে আয় হইবে তাহার উপরে মাসিক দেড়শত টাকা বা ততোধিক বেতনের একজন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার অধীনে দশ বিশ জন কেরাণী ও কেতাদুরস্ত আফিস পরিচালনা করিয়া লাভ দেখান সম্ভবপর নহে। সাধারণ কৃষিজীবি বাঙ্গালী লেখাপড়ার বড় ধার ধারে না। তাই যখনই তাহারা কৃষির নামে সরকারের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দেখিতে পায়, তখনই উন্নততর কৃষি-প্রণালীকে দূর হইতে প্রণাম জানাইয়া সরিয়া পড়ে। তাহারা মনে করে যে তাহাদের পক্ষে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া দশটী গাছের নয়টীকেই অফলা রাখিয়া একটিতে এক বা দুইটীপাঁচসেরা বেগুন' ফলান'র অপেক্ষা দশটীর প্রত্যেকটীগাছে দুইসের করিয়া ছোট বেগুন ফলান' অধিক লাভজনক। কিন্তু সরকারী কৃষি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে উপরে রিপোর্ট পাঠাইতে হয়; আর কর্ত্তৃপক্ষ এই রিপোর্টে দেখিতে চাহেন যে, তাঁহাদের সাধের "আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে" কৃষিকার্য্যের উন্নতিমূলক Extra-ordinary কি কি কার্য্য হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মচারীগণেরও চাকুরী রক্ষার খাতিরে চেষ্টা থাকে কেবল Extra-ordinary রকম ব্যয় করিয়া Extra-ordinary ফসল উৎপাদন করিতে। এই সকল নবোদ্ভাবিত প্রচেষ্টায় যাহা ব্যয় হয় উৎপন্ন ফসল বিক্রয় করিয়া তাহা উঠিতে পারে কিনা সে বিবেচনা তাঁহারা

করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সুতরাং যাহাদের কৃষিকর্ম্মই জীবিকা, তাহারা ক্ষতির ভয়ে এই সকল কৃষিক্ষেত্রের সংস্রবে আসিতে চাহে না এবং ইহাদের কার্য্য হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে চাহে।

কোনও নূতন পদ্ধতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইলে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া গ্রহীতাগণ যে নিশ্চিত লাভবান হইবেন ইহা না বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা যে তাঁহাদের পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিবেন ইহা মনে করা ভুল। কেবলমাত্র ফসলের তুলনামূলক ফলন দেখাইয়া বাঙ্গালী কৃষকের সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে।

উপরোক্ত কারণবশতঃ পাশ্চাত্য কৃষিশিক্ষা পদ্ধতি কৃষকসাধারণের মধ্যে কোনও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মোটর ট্রাক্টর বা তজ্জাতীয় বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রের নাম কেবলমাত্র আনাড়ীগণের মুখে মুখেই ফিরিতেছে। দুই একজন ভদ্র চাষী যদি বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকর্ম্মের ধারা বদলাইয়া দিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়া নামিতেছেন, কিন্তু সে দুইচারি দিনের জন্য। অনভিজ্ঞতাবশতঃ দুই একটা ফসলের আবাদ করিতে না করিতেই তাঁহাদিগের কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও তাঁহারা ঘটিবাটি তুলিয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন।

ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু কৃষিজীবি বিশেষ লাভবান হইতেছেন, কিন্তু ভারতে ইহা সম্ভবপর হইতেছে না কেন? এই প্রশ্নটী অনেকেরই মনের কোণে উঁকি মারে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না বলিয়া তাঁহারা আর ইহার সমাধানের চেষ্টা

করেন না। হাতে দুইচারি হাজার টাকা এবং দুইচারি শত বিঘা জমি থাকিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রবর্ত্তন দ্বারা কৃষি-কর্ম্মে নূতন যুগ আনিতে চেষ্টা করিয়া ইঁহারা "সদুদ্দেশ্যে" এবং একটা বিরাট লাভের কল্পনায় সেইটাকাগুলি কৃষিকর্ম্মের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি কিনিয়া নষ্ট করেন। সেইজন্য যাঁহারা খাঁটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হইতে চাহেন, তাহাদিগকে ইহার প্রাথমিক ব্যয়ের একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করিয়া কৃষিকার্য্যে লাভবান হইতে হইলে প্রথমেই খুব কম করিয়া তিনশত বিঘার তিন লপ্ত (plob) বা নয় শত বিঘা জমি চাই। কিন্তু এই নয়শত বিঘা যদি লগ্ন জমি হয় তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই জমি সম্পূর্ণভাবে চাষ করিয়া তাহা হইতে ফসল উঠাইয়া গোলাজাত করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রাথমিক ব্যয় না করিয়া লাভের আশা করা বৃথা।

১।	ট্রাক্টর ৩ খানি	৭,০০০৲
২।	বিদে' বা লাঙ্গলে' দুই রকম ৪ খানি	১,০০০৲
৩।	ফসল কাটা ও আঁটি বাঁধিবার যন্ত্র ১টা	১০,০০০৲
৪।	ফসল ঝাড়িবার কল ১টা	১৫,০০০৲
৫।	অন্যান্য ছোট যন্ত্র	৩,০০০৲
৬।	জলের কল ও পাইপ	৪,০০০৲
৭।	বীজের মূল্য (১ ফসলের)	১,০০০৲
৮।	ঘর বাড়ী প্রভৃতি	৫,০০০৲
৯।	কর্ম্মচারীদের ৬ মাসের বেতন	৬,০০০৲
১০।	আকস্মিক ব্যয়	২,০০০৲
১১।	সার	১,০০০৲
১২।	রিজার্ভ ফাণ্ড	১০,০০০৲
	মোট—	৬৫,০০০৲

কমপক্ষে পূর্ব্বোক্ত ৬৫,০০০ হাজার টাকা এবং এক হাজার বিঘা জমি লইয়া যিনি বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন তিনি তিন চারি বৎসর পরে লাভবান হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু দশ বা পনর হাজার টাকা এবং দুই তিনশত বিঘা মাত্র জমি লইয়া যিনি "বৈজ্ঞানিক উপায়ে" কৃষি-কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন তাঁহার গণেশ উল্টাইতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না। কেন, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

একখানি ট্রাক্টর মাসে চারিশত বিঘা জমি দোয়ার চাষ দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই অধিক সময় ধরিয়া জমিতে চাষ দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ "যো" হারাইয়া জমিতে চাষ দেওয়া ও না দেওয়া সমান কথা। এই কারণে নয়শত বিঘা জমির জন্য অন্ততপক্ষে দুইখানি ট্রাক্টরের

প্রয়োজন। কিন্তু যখনই আমরা যান্ত্রিক শক্তির উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে যাইতেছি তখনই আমাদের মনে রাখা উচিত যে কল বিগড়াইতে বশীকরণের প্রয়োজন হয় না, এবং যদি দুইখানির একখানি ট্রাক্টরও কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই জন্য তৃতীয় ট্রাক্টরের ব্যবস্থা।

ট্রাক্টর দ্বারা তিন চারিশত বিঘা জমির আবাদ করিতে গেলেও খরচে পোষায় না। ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করিতে গেলে যে সব আনুসঙ্গিক ব্যয় হয় তাহা খুবই বেশী পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে এবং এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক কৃষি কার্য্যের জন্য প্রদত্ত আনুসঙ্গিক ব্যয়গুলি দেড় হাজার বিঘা জমির আবাদ পর্য্যন্ত সমান থাকে।

কলের লাঙ্গল করিবার উদ্দেশ্য- গভীরতর করিয়া জমি চাষ দেওয়া এবং গরু ও মজুরের দায় হইতে সাধ্যমত অব্যাহতি পাওয়া। কিন্তু জমি চষিলেই ফসল গোলায় উঠে না—চাষ দেওয়াকে ফসল জন্মাইবার প্রাথমিক কার্য্যমাত্র বলা যায়। জমি চষিয়া বীজ বপন করিবার পরেও জমিতে প্রয়োজনমত লাঙ্গল, মই প্রভৃতি দিতে হয়। এই কাজগুলি চালাইবার জন্য ট্রাক্টরের উপযোগী যে সকল যন্ত্রাদি কিনিতে পাওয়া যায়, বহুমূল্য হইলেও তাহা না কিনিয়া উপায় নাই। কারণ, এই কার্য্যের জন্য গরু বা মহিষ পুষিতে হইলে লোকের খরচায় লোকসানের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইবে মাত্র।

ফসল কাটা, আটিবাঁধা এবং ঝাড়াই, মাড়াই প্রভৃতি কার্য্য মজুরের দ্বারা করাইতে গেলে মজুরী অধিক পড়িবে, কল এবং কলের চালকও সেই সময়ে বসিয়া থাকিবে। সুতরাং ব্যয়ের অঙ্কটা আরও একটু বড় হইয়া উঠিবে মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে ফসল কাটিবার ও আটি বাঁধিবার কলটীও না কিনিয়া উপায় নাই।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিতে যাইয়া যাঁহারা গোড়াতেই গরুর সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ফসল মাড়াই করিবার সময়ে গরুর আমদানী করা আদৌ সুবিধাজনক হইবে না। তাহা ছাড়া, কেবল মাত্র ফসল মাড়াই করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এত গরু পাইবেনই বা কোথায়। সুতরাং ঝাড়াই ও মাড়াই করিবার কলটীও সকল বৈজ্ঞানিক কৃষিজীবিকেই কিনিতে হইবে (মূল্য—১৫,০০০৲ টাকা মাত্র)।

একহাজার বিঘা জমিতে জলসেচনের সুব্যবস্থা ৪০০০৲ টাকার কমে করা সম্ভব নহে। এই উপলক্ষে যদি আরও চারি বা পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাও বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক কৃষিজীবির করা উচিত। কারণ, উত্তমরূপ জলের ব্যবস্থা না থাকিলে ইচ্ছানুরূপ ফসল উৎপাদন সম্পর্কে অনেক ব্যাঘাত ঘটে। দৈব বৃষ্টির উপরে নির্ভর করিলে কৃষিকার্য্য করিয়া বিশেষ লাভ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি কাহারও অধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত বৃষ্টি হয় না। সুতরাং কৃষিকার্য্যে লাভবান হইতে হইলে আমাদিগকে নিকটবর্ত্তী কোনও নদী, দীঘি, বিল অথবা পুকুরের আশ্রয় লইতে হইবে, এবং এই জল ক্ষেত্রে সেচন করিবার জন্যই Water Pump ও Pipe এর দরকার।

পূর্ব্বোল্লিখিত মোটামুটি ব্যয়ের তালিকায় আমরা দশ হাজার টাকা মাত্র রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখিতে বলিয়াছি। বাস্তবিকপক্ষে ইহা এত কম

যে দৈব ক্রমে কেবলমাত্র প্রথম ফসলটী যদি নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেই পরবর্ত্তী ছয় মাসে উক্ত দশ হাজার টাকা কর্ম্মচারীদের বেতন, বীজের মূল্য, প্রভৃতির জন্য দরকার হইবে, এবং কৃষির অবস্থা দ্বিতীয় বারেও যদি তেমন সুবিধাজনক না হয়, তাহা হইলেই চক্ষু কপালে উঠিবে।

ইহা সত্বেও এই সকল বৃহৎ ব্যাপার যদি কেহ পরিচালনা করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা যাঁহার উপরে এবিষয়ে নির্ভর করিবেন তাঁহার উপাধির বহর অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতা যাহাতে অধিক থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা কার্য্যকরী জ্ঞানের মূল্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেক অধিক।

আমরা উপরে যাহা দেখাইয়াছি, তাহাতেই বোঝা যাইবে যে উপযুক্ত পরিমাণ জমি ছাড়াও যে ৬৭,০০০ টাকা কার্য্যের প্রাথমিক ব্যয় বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে কষ্টেসৃষ্টে কার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু মূল ধন ২।৩ লক্ষ টাকা হইলেই এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার পক্ষে আমাদের দেশে একটা খুব বড় অসুবিধা এই যে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ জমিই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিয়া বহু লোকের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা আছে। এক লপ্তে এক হাজার বিঘা জমি তো দূরের কথা, একশত বিঘা জমি পাওয়াও দুষ্কর। অথবা, যেখানে এত জমি এক সঙ্গে পাওয়া যায় সেখানে লোকালয়, বাজার, গঞ্জ, রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির ঘোরতর অসুবিধা। যাহাই হউক, এই সকল "বৃহৎ ব্যাপার" লইয়া আর অগ্রসর না হইয়া আমরা প্রচলিত কৃষিকর্ম্ম পদ্ধতির সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে অধিক কাজ হইবে বলিয়া আশা করি। (বারান্তরে সমাপ্য)

রয়নাবীজের তৈল

সেকালের প্রাচীনারা যে-উপায়ে রয়না-বীজ হইতে তৈল বাহির করিতেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে দিতেছি :—

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে রয়না গাছে ফুল হয়। প্রতি শাখায় ৩।৪টি করিয়া ফলের ছড়া হয়। এক একটি ছড়ায় ৪।৫টি করিয়া সাদা ফল ধরে। প্রত্যেকটি ফলের ভিতর তিনটা করিয়া বীচি থাকে। মাঘ-ফাল্গুন মাসে ফলগুলি ফাটিয়া যায় এবং বীচিগুলি মাটিতে পড়ে। বীচির উপরে একটা লাল রঙের পরদা থাকে। শুকাইলে কতক পরদা পড়িয়া যায়, আর কতক বীচির সহিত জড়াইয়া থাকে। পরদার ভিতর লিচুর বীচির মত গাঢ় খয়েরী রঙের শক্ত খোসা থাকে। এই খোসার ভিতর যে সাদা শাঁশ থাকে তাহা হইতেই তৈল হয়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছের তলা হইতে বীচিগুলি কুড়াইয়া আনিয়া ঢেকি, কাইল বা উদুখলের সাহায্যে লাল পরদা ছাড়াইয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়। বীচিগুলি ৪।৫ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেকি বা অন্য উপায়ে শাঁশ বাহির করিতে হয়। শাঁশগুলি ঝাড়িয়া খোসাগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। আবার ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া শাঁশগুলিকে ঢেকিতে বা অন্য উপায়ে গুঁড়া করিতে হয়। গুঁড়াগুলিতে গরমজল ছিটাইয়া এক বা ততোধিক গোলা বানাইয়া একদিন রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন ঐ গোলা গুলি ভাঙিয়া এমনভাবে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে যাহাতে এই ঝরঝরে গুঁড়াগুলি আবার ঢেকিতে পিষিয়া কাদার মত করা যায়। এই কাদা জল দিয়া গুলিয়া কড়াইয়ে বা মাটির পাতিলে ২ বা ২।।০ ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়। যখন ঐ তরল পদার্থ কাদার মত হইয়া উঠিবে এবং উপরে তৈল দেখা যাইবে তখন পাতিল বা কড়াইটা নামাইয়া কয়েকটি পাতিলে ঐ কাদা রাখিতে হইবে, যেন পাতিলের সিকি অংশ ভরে। ইহা কিছু কম বেশী হইলে ক্ষতি নাই। তৎপর ঠাণ্ডা-জল দিয়া প্রত্যেকটি পাতিল পূর্ণ করিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া কাদা-জলের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। তখন জলের উপরে তৈল ভাসিতে থাকে। এক টুক্‌রা টীনের সাহায্যে ঐ তৈল অন্য একটী পাতিলে তুলিয়া লইতে হয়। টীনের টুক্‌রাটিতে ছোট কয়েকটি ছিদ্র থাকিলে তৈলের সঙ্গে জল কম যাইবে। ২।৩ ঘণ্টা পর পর তৈল তুলিয়া পাতিলের জল ভাল করিয়া নাড়িয়া দিতে হয়। এইরূপে যখন আর তৈল উঠিবে না তখন এগুলি ফেলিয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ ২ দিনের বেশী তৈল উঠে না। এই তৈলে কিছু জল মিশ্রিত থাকে, তজ্জন্য জ্বাল দিয়া জল শুকাইয়া লইতে হয়। এই তৈল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার তৈল হইবে। এই উপায়ে ১৫ সের বীচি হইতে এক সের তৈল তোলা যায়।

এতদ্ব্যতীত রয়না-শাঁসের গুঁড়াগুলি গরম জলে ভিজাইয়া ঘানিতে পিষিয়াও তৈল

বাহির করা যায়। উল্লিখিত উপায়ে খিলা গুনিমের বীচি হইতেও তৈল বাহির করা যাইতে পারে।

'বাজনা'র তৈল

বাজনা দশ পনর হাত উচ্চ কাঁটাওয়ালা গাছ। প্রত্যেক শাখার অগ্রভাগে এক এক গোছা বীজ ধরে। বীজগুলি গোল মরিচের মত বড়। বীজগুলি পাকিলে তাহার খোসা। লাল হয় এবং ফাটিয়া যায়। শ্রাবণ মাসেই এগুলিপাকে, তখন কাক, শালিক ইত্যাদি পক্ষীতে ঐগুলি খাইয়া ফেলে। এই সময় বীজের গোছাগুলি একটী আকর্ষির মাথায় দা আটকাইয়া তাহা দ্বারা কাঠিয়া আনিয়া ঘরের বেড়ায় বা দড়ি টাঙাইয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ২।৩ দিনের মধ্যে খোসা ফাটিয়া কাল রঙের আঁঠি দেখা দিবে। গাছ হইতে বীজগুলি পড়িবার সময় ভিজা থাকিলে খোসা ফাটিবে না। আঁটিগুলি খোসা হইতে হাতে ছাড়াইয়া লইতে হইবে। তৎপরে ৩।৪ দিন বীচিগুলি শুকাইয়া অথবা ভাজিয়া ঢেঁকিতে বা অন্য উপায়ে পিষিতে হইবে। তখন এগুলি তৈলাক্ত কাদা হইবে। এই কাদা গরম জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। যখন উপরে তৈল ভাসিবে এবং ঐ তরল জিনিষটা কাদার মত হইয়া উঠিবে, তখন চুলা হইতে পাতিল নামাইয়া উপরের তৈল অন্য পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে। কাদাগুলিতে ঠাণ্ডা জল দিয়া পাতিল ভরিয়া রাখিলে উপরে তৈল ভাসিবে। রয়না বীজের তৈল তোলার মত এগুলিরও তৈল ২।১ দিন তুলিয়া অবশিষ্ট ফেলিয়া দিতে হইবে। তৈলগুলি জাল দিয়া ছাঁকিয়া লইলে সুন্দর তৈল হইল। ভাত-তরকারীর সঙ্গে খাইতেও সুস্বাদু, আবার জ্বালানও যায়। ঘানিতে দিয়াও বাজনার তৈল বাহির করা যায়। ৴৫ সের বীচি হইতে এক সের তৈল উঠে।

ভেরেণ্ডা বীজের তৈল

ভেরেণ্ডার বীজ সংগ্রহ করিয়া ২।১ দিন শুকাইতে হইবে। তৎপর বীচিগুলি ঢেকিতে বা যে কোন উপায়ে পিষিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া কড়াইয়ে জাল দিতে হইবে। যখন ঐ তরল পদার্থ কাদার মত হইবে এবং উপরে তৈল ভাসিতে দেখা যাইবে, তখন কড়াই নামাইয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে; কতক্ষণ পর পর জলের উপরের তৈল পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অন্য পাত্রে তুলিয়া লইতে হইবে। এই তৈল আবার জাল দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই পরিষ্কার তৈল হইবে। ভেরেণ্ডা বীজ ঘানিতে দিয়াও তৈল বাহির করা যায়। ৴৫ সের বীচি হইতে ৴১ সের তৈল তোলা যায়; এই তৈল জ্বালান যায় এবং "ক্যাষ্টর অয়েলে"র জন্য পয়সা না ফেলিয়া এই তৈল ব্যবহার করা যায়।

সাধারণের ব্যবহার উপযোগী তৈল বাহির করিবার কোন উৎকৃষ্টতর প্রণালী কাহারও জানা থাকিলে, তাহা এই পত্রিকার মারফৎ আলোচনা করিলে সুখী হইব.

(মোহাম্মদী)

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

(শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

গায়ে মাখা সাবান (Toilet Soaps

কাপড় কাঁচা সাবান এবং গায়ে মাখা সাবান একই রকম প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। কাপড় কাঁচা সাবানে কষ্টিক সোডা সামান্য বেশী (শতকরা ২।১ অংশ) থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ কষ্টিক সোডা সামান্য বেশীই থাকে। কিন্তু গায়ে মাখা সাবানে কষ্টিক সোডা বেশী থাকিলে শরীরের মসৃণ চামড়া আক্রান্ত হয় এবং তাহাতে নানারূপ চর্ম্ম ব্যাধি হইতে পারে। সেজন্য গায়ে মাখা সাবান neutral অর্থাৎ কষ্টিক সোডা বেশী না হইয়া বরাবর থাকা দরকার।

কাপড় কাঁচা সাবানে গ্লিসারিণ ব্যতীত তৈল ও কষ্টিক সোডার ময়লা থাকে। গায়ে মাখা সাবানে তাহা থাকা উচিত নয়। Soap stone প্রভৃতি দ্রব্যও গায়ে মাখা সাবানে মিশ্রিত করা যায় না। ইউরোপ আমেরিকায় কোন কোন গায়ে মাখা সাবানে শিলিকেট মিশান হয়। এদেশে তাহা মিশান হয় না। তবে সস্তা দামের সাবানে শিলিকেট মিশান হয়।

উপাদান

(১) নারিকেল, চর্ব্বি। কেহ কেহ সামান্য Castor oil (রেড়ির তৈল) Ceresine নামক মোম, মিশাইয়া থাকেন।

(২) কষ্টিক সোডা— ১৬-১৮ ভাগের।

(৩) রং (colours)—বর্ত্তমানে Aniline coloursই ব্যবহৃত হয়। সাবানের রং পৃথক। ইহা কষ্টিক সোডায় পরিবর্ত্তন হয় না। Soap colours বলিলেই পাওয়া যায়। রং খুব সামান্য মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। এত অধিক পরিমাণে নিবে না যে সাবান ব্যবহারের সময়ে উহার ফেণা রঙ্গিল হয়।

রং খুব সাবধানের সহিত মিশাইবে। যদি ঠিকমত না মিশে তবে খুব ভাল সাবানও বিক্রয় হয় না। কারণ একই সাবানে নানা জায়গায় নানারূপ রং হয় এবং মাঝে মাঝে দাগ থাকে। রং মিশাইবার পূর্ব্বে জল দ্রব করিয়া নিবে এবং কাপড়ে ছাকিয়া নিবে। মিশাইবার সময়ে কাষ্ঠ ফলাকাদ্বারা আলোড়ন করিবে।

তৈল হইতে সাবান প্রস্তুত করার পূর্ব্বে তৈলের সাথে রং মিশান যাইতে পারে। অথবা সাবান তৈয়ার হইবার পর রং মিশান হয়।

কয়েকটী রংএর নাম :—

Yellow—fluoresceine, uramine, Napthol yellow, Metanil yellow.

Red—Rhonamine, Safranine.

Violet—Mettryl violets.

Green—Alizasine or Naphthol green.

উপরোক্ত রংগুলি খুব তীব্র। সে জন্য খুব সামান্য পরিমাণ মিশাইতে হয়। এক মণ সাবানে ১ তোলার ৪ ভাগের একভাগ মিশাইতে হয়। প্রত্যেকের পচ্ছন্দ অনুযায়ী অল্প সাবান রং করিয়া পরিমাণ ঠিক করিয়া নিতে হয়। প্রত্যেক রং প্রস্তুত-কারকের রংএর পৃথক পৃথক নাম আছে।

সুগন্ধি (perfumes)

সাবানের সুগন্ধির উপর সাবানের মূল্য ও উৎকর্ষতার নিরূপণ হয়। সুগন্ধি উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়া দরকার এবং সাবান ব্যবহৃত হইলে শেষ অংশের গন্ধ পূর্ব্ববৎ থাকা চাই।

সাধারণতঃ ফুলের গন্ধ হইতে গন্ধ দ্রব্য আহরণ করা হয়। বর্ত্তমানে উহার অনুকরণে বহু গন্ধদ্রব্য তৈয়ার হয় এবং সচরাচর তাহাই ব্যবহার হয়। যে ফুলের গন্ধের সাবান তৈয়ার হইবে তাহার গন্ধ ঐ ফুলের অনুরূপ হওয়া দরকার। যেমন বকুল সাবানের গন্ধ বকুল ফুলের মত হওয়া দরকার। তাহাতে গোলাপের গন্ধ হওয়া ঠিক নহে। Synthetic perfumes (তৈয়ারী গন্ধ) একটী দ্বারা কোন মনোরম গন্ধ হয় না। অনেকটী মিশ্রিত করিয়া একটী মনোরম গন্ধ করিতে হয়। গন্ধ সব সম অনুপাতে নেওয়া হয় না, বিভিন্ন অনুপাতে নেওয়া হয়।

কতকগুলি গন্ধ উৎকৃষ্ট এবং দামী, কতকগুলি গন্ধ অপেক্ষাকৃত খারাপ এবং সস্তা। উৎকৃষ্ট সাবানে প্রথম শ্রেণীর গন্ধ ব্যবহার করা হয় এবং সস্তা সাবানে নিম্ন শ্রেণীর গন্ধ ব্যবহার করা হয়। Synthetic perfumes যথেষ্ট আছে; সকলের নাম দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। কতকগুলি দরকারী গন্ধের নাম দিলাম।

সাধারণতঃ গন্ধ স্থায়ী হয় না। কারণ বাতাসে উড়িয়া যায়। সেজন্য আর একরকম গন্ধ আছে তাহা মিশাইলে পূর্ব্ব গন্ধকে আটকাইয়া রাখা যায়। ইহাকে fixers বলে। উহা না মিশাইলে সাবানের গন্ধ স্থায়ী হয় না।

Perfumes :—Citronellol, Geraniol, Bergomot oil, Rose oil, Geranium oil, Terpineol, Benzylacetate, Lemon oil, Vetivert oil, Clove oil, Citronella oil, Lavendar oil, Ylang ylang oil, Rosemary oil, Jasmin, Cassia oil, Palmarosa oil, Phenyl-ethyl alcohol.

Fixers :—Peru Balsan, Sandal wood oil, Vetivert oil, Musk, Balsam of Toln, Ambergris.

প্রস্তুত প্রণালী

গায়ে মাখা সাবান দুই প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। (১) তাপ দ্বারা ফুটাইয়া (Boiling process)। বিনা তাপে (Cold process).

Boiling processই উত্তম এবং উৎকৃষ্ট। সাবান মাত্র এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়। সস্তা বাজার চলন গায়ে মাখা সাবান উভয় প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়।

গায়ে মাখা এবং কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুতের প্রণালীতে কোন তফাৎ নাই। গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতে শেষে কয়েকটী প্রক্রিয়া বেশী করিতে হয়।

পাকান সাবান (Boiling Process) এই উপায়ে সাবান প্রস্তুত প্রণালী ছয় ভাগে বিভক্ত :—

(১) সাবান পাকান (Saponification)

(২) সাবানের জল কাটান (Salting art)

(৩) উপযুক্ত সিদ্ধ ও পরিস্কৃত করা। Boiling proper and Purification)

(১) সাবান পৃথককরণ (Separation)

(৫) রং এবং সুগন্ধি মিশ্রিত করন। (colouring and mising Perfumes

(৬) সাবানের আকার প্রদান (Sizing the soaps into tablets)

সাবান পাকান

পূর্ব্বে বর্ণিত কাপড় কাঁচা সাবানের ন্যায়। তৈল, চর্ব্বি ও কষ্টিক সোডা লাই জ্বাল দিয়া সাবান হয়। বড় বড় কারখানায় কয়লার

আগুনের পরিবর্ত্তে ষ্টীম দ্বারা (Steam) ঢাকা কড়াইতে সাবান পাকান হয়।

(২) জল কাটান :—পূর্ব্ব বর্ণিত মত লবণ সংযোগে সাবানের জল কাটান হয়।

(৩) উপযুক্ত সিদ্ধ ও পরিষ্কৃত করা :—জলকাটানের পর ঘন কষ্টিক লাই (Strong lye) পূর্ণ সাবান আবার সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে লবণ প্রভৃতি যাহা সাবানে লাগিয়া থাকে তাহা বাহির হইয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধের পরে দেখা যাইবে যে সাবান উপরে এবং লাই প্রভৃতি নীচে পৃথক ভাবে আছে। সাবান উঠাইয়া নিয়া জলে ধৌত করিতে হয়। দরকার মত ২।৩ বার এইরূপে জলে ধৌত করা হয়। এইরূপে সাবান পরিষ্কৃত হইলে খুব সামান্য জল সহযোগে সাবান সামান্য জ্বালে পাকাইতে হয়।

সাবান পৃথককরণ

সাবান পরিষ্কার, তাম্রবর্ণ তরল মধুর ন্যায় আকার ধারণ করিলে মন্দ মন্দ জ্বাল দিয়া গাঢ় করিতে হয়।

এই সাবান ঠাণ্ডা হইলে কড়াইতে ৩ ভাগে বিভক্ত হয়। উপরে ফেণ ও পরিষ্কৃত সাবান মধ্যভাগে nigre (অপরিষ্কৃত সাবান) এবং সর্ব্ব নিম্নস্তরে ময়লাযুক্ত লাই থাকে।

নাইগার (nigre) ও লাই পুনরায় সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়। উপরের পরিষ্কৃত সাবান গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

পরিষ্কৃত সাবান উপযুক্তরূপ শুকাইলে মেসিনে কাটিয়া (chips) পাত্‌লা টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয়। এই টুক্‌রা সাবান রৌদ্রে বা গরম ঘরে (drying room) শুকান হয়। শুকাইবার সময়ে বার বার এই টুক্‌রা সাবান ওলট পালট করিয়া দিতে হয়। তাহাতে শীঘ্র শুকায় এবং এক জায়গায় বেশী গরম লাগিয়া সাবান নরম হইয়া যায় না। ইহাতে সাবানের জলীয় অংশ কম হয়।

(৫) রং ও সুগন্ধি মিশ্রিতকরণ:—শুষ্ক সাবানের টুক্‌রা, রং এবং সুগন্ধি একত্রে mixing machine এ দেওয়া হয়। পরে ঐ মেসিনে উত্তমরূপে ঘাটাইয়া সকল জিনিষ ঠিক মত মিশ্রিত করা হয়। ইহাতে রং, সুগন্ধি সর্ব্বত্র সমভাবে সাবানের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত সাবান milling machine এ দিয়া আরো উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয় যাহাতে রং এবং সুগন্ধি কোন জায়গায় অসম ভাবে না থাকে। এই মিশ্রনের পর মেসিন হইতে ফিতার (ribbons) ন্যায় সাবানের টুক্‌রা বাহির হয়।

Milling machine এর টুক্‌রা সাবান Plodding machine এ দেওয়া হয়। সেখানে উহা সংযুক্ত হইয়া Bar এর মত বাহির হয়। ইহা কাটিয়া বড় বড় Bar করা হয়।

সাবানের আকার প্রদান

উপরোক্ত bar গুলিকে cutting machine এ উপযুক্ত মত ছোট ছোট খণ্ড করিয়া নেওয়া হয়। এই ছোট ছোট খণ্ড সাবান stamping machineএ ছাপ প্রভৃতি দেওয়া হয়। পরে উহা (oil paper) কাগজে মুড়িয়া বাক্সে রাখা হয়।

সস্তা দামের গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুতে অনেকে ঐ প্রক্রিয়ার সকল গুলি পালন করেন না। জল কাটানোর (Salting art) পর সাবান একবার জলে ধৌত করিয়া রং মিশ্রিত করা হয়। সাবান তরল অবস্থায় থাকিতে রং জলে দ্রব করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশান হয়। পরে সাবান ঠাণ্ডা অথচ তরল অবস্থায় থাকিতে সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রিত হইলে ফ্রেমে রাখিয়া দেয়। যখন সাবান উপযুক্তরূপ শক্ত হইয়াছে তখন Cutting machine এ কাটিয়া Stamping machine এ ছাপ প্রভৃতি দেওয়া হয়।

ঠাণ্ডা সাবান। (Cold Process)

পূর্ব্বে বর্ণিত কাপড় কাঁচা সাবানের ন্যায় Cold Process এ সাবান তৈয়ার হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে তৈল এবং কষ্টিক সোডার অংশ যেন পরিমাণ মত হয়, বেশী না হয় যেন।

সাবান উপযুক্তরূপ শক্ত হইলে মেসিনে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয়, এবং তাহা শুকান হয়। পরে Boiling Process এর (৫) রং এবং সুগন্ধি মিশ্রিত করণ (৬) সাবানের আকার প্রদান—ইহার সকল প্রক্রিয়াগুলি করা হয়।

পূর্ব্বে বর্ণিত কাপড়কাঁচা সাবান প্রস্তুতের ন্যায় Cold Process এ তৈল ও

কষ্টিক সোডা লাই মিশ্রিত করা হয়। তাহার পর প্রথমে রং পরে সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করা হয়। মিশ্রিত হইলে Cold Process এর ন্যায় সাবান প্রস্তুত হইতে দেওয়া হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে তাহা cutting machine এ কাটিয়া Stamping machine এ ছাপ প্রভৃতি দেওয়া হয়।

রং পরে না মিশাইয়া পূর্ব্বেই তৈলের সহিত মিশান হয়। পরে কষ্টিক সোডা লাই মিশ্রিত করিয়া সাবান প্রস্তুত হয়। সুগন্ধি দ্রব্য সর্ব্বদা পরে মিশাইতে হয়; কখনও পূর্ব্বে মিশান হয় না।

শিলিকেট মিশ্রিত করণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইউরোপ আমেরিকায় কোন কোন গায়ে মাখা সাবানে শিলিকেট মিশান হয়। এ দেশেও সস্তা দামের গায়ে মাখা সাবানে শিলিকেট মিশান হয়। উভয় প্রণালীতেই মিশ্রিত করা যায় এবং তাহার প্রণালী পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। Cold Process এ সর্ব্বদা শিলিকেট মিশান হয়। উহা ভাল শিলিকেট হওয়া দরকার।

নিম্নে কয়েকটী formula দেওয়া গেল।

১। উৎকৃষ্ট সুগন্ধি।

Jasmin গন্ধ

Rose oil	250 parts
Benzylacetate	200 "
Cinnamic alcohol	50 "
Orange oil	100 "
Phenylethyl alcohol	100 "
Ylang ylang oil	50 "
Amyl cinnamic oldehyde	19 "
Phenyl propyl aldehyde	1 "
Methyl anthranilate	79 "
Hydroxyl Citronettal	60 "
Civet extract	50 "
Jasmin	50 "

Lavender গন্ধ

Lavender oil	500 parts
Rosemary oil	100 "
Thyme oil	50 "
Borneol	50 "

Rose oil 100 "
Terpinyl acetate 100 "
Musk 50 "

Musk গন্ধ

Musk ambrette 50 parts
Vetivert oil 40 "
Sandal wood oil 100 "
Bergamot oil 100 "
Geranium oil 200 "
Musk extract 100 "
Terpineol 100 "
Cassia oil 30 "

Rose গন্ধ

Palma rosa oil 20 parts
Ginger grass oil 100 "
Geraniol 150 "
Rose oil 100 "
Clove oil 50 "
Phenylethyl alcohol 100 "
Diphenyl metham 70 "
Musk 30 "
Terpineol 200 "

Sandal গন্ধ

Sandal wood oil 200 parts
Cedar wood oil 300 "
Rose oil 50 "
Lavender oil 100 "
Geraniol 50 "
Musk 100 "
Terpineol 200 "

Toilet soaps এর formula.

Boiling Process এ শুধু নারিকেল তৈল ও চর্ব্বি ব্যবহার হয়। তাহা যে কোন্ অংশে লওয়া যায়। উহার অংশ অনুপাতে কষ্টীক সোডা লইতে হয় (Caustic Soda 76-781.)

Saponification সময়ে যে লাই ব্যবহার হয় তাহা প্রথম অবস্থায় Baume Hydrometer এর ১০ ডিগ্রী এবং শেষ অবস্থায় ১৫ ডিগ্রীর বেশী হয় না।

Boiling proper এ যে লাই ব্যবহার হয় তাহা Baume Hydrometer এ অন্ততঃ ২৫ ডিগ্রী হওয়া দরকার।

(১)
নারিকেল তৈল ১০ সের
কষ্টিক সোডা ২৮ সের

(২)
নারিকেল তৈল ১০ সের
চর্ব্বি ৫ সের
কষ্টিক সোডা ৩৭ সের

(৩)
নারিকেল তৈল ১০ সের
চর্ব্বি ১০ সের
কষ্টিক সোডা ৪৸৵০ সের

(৪)
নারিকেল তৈল ৫ সের
চর্ব্বি ১০ সের
কষ্টিক সোডা ৩।০ সের

Cold processএ নিম্নলিখিত formula অনুসারে গায়ে মাখা সাবান প্রস্তুত করা যায়।

(১) নারিকেল তৈল—১০ সের
কষ্টিক লাই ৩৮ ডিগ্রী বমি ৫সের

রং :—
Metanil yellow—15 grains

সুগন্ধি দ্রব্য :—
Camphor oil — 3 oz
Thyme oil — 3 oz
Tarpine oil — 4 oz

(২) নারিকেল তৈল — ১০ সের
কষ্টিক লাই ৩৮ ডিগ্রী বমি—৫ সের

রং :— Soap red — 10 grains

সুগন্ধি দ্রব্য :—

Citronella oil — 2 oz
Clove oil — 1 oz
Cassia oil — 1 oz
Terpineol — 1 oz

(৩) নারিকেল তৈল — ৩০ সের
কষ্টিক লাই ৩৮ ডিগ্রী বমি —১৫ সের

রং :— Rhodemine — 40 grains

সুগন্ধি দ্রব্য :—

Rose geranium — 1 oz
Bergamot oil — ½ oz
Rhodinol — 1 oz
Benzyl Acetate — 1 oz

(৪) নারিকেল তৈল — ১০ সের
চর্বি — ৩ সের
কষ্টিক লাই ৩৮ ডিগ্রী বমি— ৬॥ সের

রং :—Soap red — 20 grains
Soap brown— 20 grains

সুগন্ধি দ্রব্য :—

Cassia oil — 1 oz
Citronella oil — 2 oz
Ylang-ylang oil — 1 oz
Terpineol — 1 oz

(৫) নারিকেল তৈল — ১০ সের
রেড়ি তৈল — ১ সের
কষ্টিক লাই ৩৮ ডিগ্রী বমি — ৫॥ সের

রং :—Metanil yellow — 10 grains

সুগন্ধি দ্রব্য :—

Tincture musk — 1 oz
Bergamot oil — ½ oz
Lavendar oil — ½ oz
Rosemary oil — 1 oz

ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা

ব্যবসা জগতে অনেকগুলি জিনিষের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের উপরই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। সেই প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির ভিতর প্রচারকার্য্য ও (advertisement campaign) একটী প্রধান জিনিষ। সত্যকথা বলিতে গেলে, এই বিজ্ঞানটীর প্রভাবেই আজ পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের এত দ্রুত প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। পৃথিবীর ভিতর যে সকল জাতি ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়া আজ ব্যবসায়ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে সকল জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহারা এই প্রচার কার্য্যকে বহু উচ্চে স্থান দিতেন। তাঁহারা দৈনিক সংবাদপত্রে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদিতে এত অধিক বিজ্ঞাপন দিতেন যে তাহা আমরা অনেক সময় কল্পনাও করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেয়ালে দেয়ালে আঁটিয়া দিতেন। এইরূপ আরও অনেক প্রকারে তাঁহারা প্রচার কার্য্য চালাইতেন; অবশ্য এই প্রচার কার্য্যে তাঁহাদের যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও হইত, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইহা হইতে বিরত হয়েন নাই, কারণ তাঁহারা ইহা বেশ জানিতেন যে বিজ্ঞাপনে যাহা তাঁহাদের ব্যয় হইবে তাহার অনেক বেশী তাঁহারা উহা হইতে পাইবেন। এইরূপ করিয়াই বিদেশী কোম্পানিগুলির আজ এত বিস্তার। যদিও ১৯৩১ সালের সরকারের বীমা-বার্ষিকী হইতে আমরা অবগত আছি যে, ভারতে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিতেছে, তথাপি আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আজিও যে ব্যবসাক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানিগুলির বহু পশ্চাতে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে এতদিনেও উন্নত হইতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ তাহাদের প্রচার কার্য্যের অভাব। আর যে সকল দেশীয় কোম্পানীগুলি উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে তাহাদের ইতিহাস খুঁজিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, প্রচার কার্য্যই ইহার উন্নতির অন্যতম কারণ। কিছুদিন পূর্ব্বে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী চমৎকার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সারাংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

"কোন পঁচিশটী কোম্পানী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া বৃদ্ধি করায় ১৯৩১ সালে তাহাদের আয় পূর্ব্ব বৎসর হইতে শতকরা মাত্র সাতটাকা হ্রাস পায়, কিন্তু অন্য পঁচিশটী কোং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন হ্রাস করায় তাহাদের শতকরা ১৭৲ টাকা আয় কমিয়া যায়। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। আমরা

আশা করি, আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আমেরিকার কোম্পানী সমূহের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। আমাদের যে সকল দেশীয় কোম্পানীগুলি এই মন্দার বাজারেও তাহাদের নূতন বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে তাহারা সকলেই বিশেষ ভাবে কোম্পানীর প্রচার কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। এই সম্পর্কে একটী চমৎকার গল্প বলা যাইতে পারে।

কোন একটী বিজ্ঞাপন দালাল একটী বীমা কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট গিয়া তাঁহার কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রার্থনা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে তাঁহার কোম্পানীটী বিশেষ পুরাতন এবং সকলের নিকটই ইহার নাম সুবিদিত, সুতরাং উহার বিজ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তিনি দালালটীকে স্থান ত্যাগের ইঙ্গিত করিলেন। তখন প্রত্যুৎপন্নমতি দালালটী উত্তর দিলেন, যে কোন একটী স্থানে অতি পুরাতন একটী গির্জ্জা ছিল এবং ইহার নাম কাহারও অবিদিত ছিল না, তথাপি গির্জ্জাটী প্রত্যেক রবিবারের প্রত্যূষেই ঘণ্টাধ্বনি করিত। এই উত্তরে ম্যানেজার বিশেষ লজ্জিত হইয়া যুবক দালালটীকে কোম্পানীটীর একটী বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বিজ্ঞাপনও গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনির মত প্রত্যহই যদি দৈনিক সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়া লোকের সম্মুখীন হয় তাহা হইলে প্রত্যহই দেখিতে দেখিতে অন্ততঃ কাহারও কাহারও ইহার প্রতি একটা আকর্ষণ আসিয়া যাইবে।

আজকাল জীবন বীমার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে বীমা বিষয়ে আলোচনাও বিশেষ বিস্তারলাভ করিতেছে। বীমা কোম্পানীগুলির ন্যায় ইহাও লোকের অশেষবিধ সুবিধা করিয়া থাকে। ইহা যে কেবল কোম্পানীর প্রচার কার্য্যই করিয়া থাকে তাহাই নয়, পরন্তু ইহা সাধারণকে বীমা বিষয়ে অনেক জ্ঞান ও সংবাদ দান করিতেছে। আমরা আশা করি, বীমা কোম্পানীগুলির ও সাধারণের সাহায্যে ও অনুগ্রহে এইরূপ সংবাদপত্রগুলি দিন দিনই উন্নতির পথে চলিতে থাকিবে।

বাঙ্গলা দেশের ব্যবসায়ী শিল্প

কয়েক বছর আগেও বটতলাপ্রকাশিত "রামায়ণ মহাভারতের" কাঠ খোদাই ছবির ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল। Publicity (প্রচারকার্য্য) বলে কথাটার মূল্য বাঙ্গালী খুব অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছে।

একটা ব্যবসায়ে যে মূলধন খাটে তার কত বড় একটা অংশ যে প্রচার কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে হয় তা' যে কোনো একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর করিলেই বোঝা যায়।

বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর বোধকরি এইচ-বোস, আর বেঙ্গল কেমিক্যাল-ই এই প্রচার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেন। যতদূর মনে পড়ে, বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায়ী শিল্পের জন্মের গোড়ার কথা এই-ই।

অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টি এবং সংযম না থাকিলে ব্যবসায়ী-শিল্পী হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। অল্প কয়েকটি রেখার মধ্য দিয়া একটী বিশেষ জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া

কম বাহাদুরীর কাজ নয়। যখন যে জিনিষটী সম্বন্ধে শিল্পী ছবি আঁকিবেন—দর্শকের দেখেই মনে হইবে—এর একটী আমার না হলেই চলিবে না—এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

অনেকেই শিল্পী পি-ঘোষের আঁকা—"পাঁচটী কারণে কুন্তলীন আমি ভালবাসি"—এই ছবিখানি দেখিয়া থাকিবেন। গোটা কয়েক রেখার টানে এখানে শিল্পী যে কেরামতি দেখাইয়াছেন তা' শিল্পানুরাগী মাত্রেই অনুধাবন করিতে পারিবেন।

কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান দিন কয়েক বেশ ভালো ভাবেই প্রচার কার্য্য চালিয়ে এই মনে ক'রে বিজ্ঞাপন একেবারে বন্ধ ক'রে দেন যে, আমাদের ত' এখন বাজারে সকলেই চেনে নূতন করে পয়সা খরচের প্রয়োজন কি ?

কিন্তু এটা একটা মস্ত ভুল! যে মুহূর্ত্তে আমি আমার ব্যবসায়ের প্রচার বন্ধ করিব, সেই থেকেই জনসাধারণ আমায় ভুলিতে সুরু করিবে। শেষটায় দেখা যাইবে, কেউ তার খোঁজ খবর নিলে জবাব মিলিবে—"হাঁ, ফার্ম্মটার বেশ নাম ছিল, উঠে গেছে হয়ত"।

"উঠে গেছে হয়ত" এই কথাটা কোনোদিনের তরে যাহাতে জনসাধারণের মনে না উঠিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সব সময় লোকের চোখের সামনে নানা রকম বিচিত্র প্রাচীর পত্র (পোষ্টার) বিজ্ঞাপনী পত্র, মাস পঞ্জী ধবে ধরে জানিয়ে দিতে হবে 'আমরা বেঁচে আছি।' এই হচ্ছে প্রচার শিল্পের মূলমন্ত্র। এই প্রচারেরও আবার রকম ফের আছে। সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ রেখা চিত্র দিয়ে আর একভাবে ব্যবসায়ের প্রচার করা চলে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁদের 'অগুরু'র বিজয় যাত্রা, 'শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে', প্রভৃতি বিজ্ঞাপনী চিত্রগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, জবাকুসুম প্রভৃতিও এই পন্থা অবলম্বন করেছেন।

ব্যঙ্গ চিত্রের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ আর এক ধরণে বিজ্ঞাপন প্রচার করা চলে। ও দেশের "ক্রুচেন সল্ট" অনেক সময় এই পন্থা অবলম্বন করে থাকেন।

আমাদের দেশে "হিমানী" ব্যঙ্গ চিত্রের ভেতর দিয়ে বহুদিন প্রচার কার্য্য চালিয়েছেন। ব্যঙ্গ চিত্রের ভেতর দিয়ে প্রচার করবার সুবিধে এই যে, তাতে জন সাধারণের মনকে সহজে আকৃষ্ট করা যায়। কিন্তু সে চিত্র জোরালো হওয়া দরকার। ব্যঙ্গ হবে যেমন ক্ষুরধার—রেখার টানও থাকা চাই ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণ।

প্রাচীর পত্রের ভেতর দিয়ে যে কোনো একটি ব্যবসায়কে খুব অল্পদিনের ভেতর লোকের চোখের সামনে খুব বড় করে তোলা যায়। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিবছর যে বিচিত্র প্রাচীর পত্রগুলি বের করেন তা' বোধ করি অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

দেয়ালপঞ্জী (Calender) দিয়েও ব্যবসায়ের বেশ প্রচার করা চলে। সুষ্ঠু এবং সুন্দর দেয়ালপঞ্জী জনসাধারণ আগ্রহ করে পয়সা খরচ করে কিনে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। এদেশে প্রচারিত ডিজ (dietz) লণ্টনের দেয়ালপঞ্জী খুব সুদৃশ্য এবং সর্ব্বজনপরিচিত।

ব্যবসায়ী শিল্পের সব চাইতে বড় কথা এই, যে কোন জিনিষই প্রচার করা হো'ক না কেন, চিত্র-পরিকল্পনার সমস্ত দায়িত্ব শিল্পীর ওপর ছেড়ে দিতে হ'য়।

যারা তা' চান না—ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁরা মস্ত বড় ভুল করেন। কেননা, শিল্পী নিজে অল্প কথা এবং গুটি কয়েক রেখার ভেতর দিয়ে যে জিনিষ ফুটিয়ে তুলবেন যে-কোনা ব্যবসায়ীর নিজের পক্ষে তা' পরিকল্পনা করা শুধু যে দুঃসাধ্য তা' নয়—এক রকম অসম্ভবই বলা চলে।

"বঙ্গবাণী"

অ্যান্টিসেপ্টিক

অ্যান্টিসেপ্টিক পাউডার

১—বোরাক্স — ৩ আউন্স

শুষ্ক অ্যালাম — ৩ „

থাইমল — ২২ গ্রেণ

ইউক্যালিপ্টল — ২০ ফোঁটা

মেন্থল — ১½ গ্রেণ

ফিনাইল — ১৫ গ্রেণ

গলথেরিয়া তৈল (oil of gaultheria) — ৪ ফোঁটা

একটু রঙের আভা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চার্মিন।

২—অ্যালাম চূর্ণ — ৫০

বোরাক্স চূর্ণ — ৫০

কার্বলিক এসিড্, ক্রুষ্টা' — ৫

ইউক্যালিপ্টাস তৈল — ৫

উইণ্টার গ্রিণ তৈল — ৫

মেন্থল — ৫

থাইমল — ৫

(ভাল করিয়া মিশাইতে হইবে)

৩—বোরাসিক এসিড্ — ১০ আউন্স

সোডিয়াম বাইবোনেড্ — ৪ „

অ্যালাম — ১ „

জিঙ্ক সালফোকার্বোনেট — ১ „

থাইমিক এসিড — ১ ড্রাম

সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত কর। অ্যান্টীসেপ্টিক ওয়াসের জন্য এক কোয়ার্ট ঈষদুষ্ণ জলের মধ্যে ১ কিংবা ২ ড্রাম ছাড়িয়া দাও।

৪—জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড (Jinc Hydroxide) এবং ডাইয়োক্সাইড্ (dioxide) একত্র মিশ্রিত করিলে এক্টোগান নামক নূতন ধরণের একটী পাউডার তৈয়ার হইবে। ইহা কার্য্যক্ষম অক্সিজেনের আট ভাগের সমতুল্য। ইহা হলুদাভ শুভ্র বর্ণের পাউডার; ইহার কোন প্রকার স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, জলেও ইহা দ্রবীভূত হয় না। সাইট্রিক, টার্টারিক কিংবা ট্যানিক এসিড্ (যাহা অক্সিজেন উৎপাদন করে)-এর সংযোগে ইহাকে ঘা কিংবা চর্ম্মরোগে মলমের মত বাহিরে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আইয়োডাইড সঙ্গে ব্যবহার করিলে ইহা আয়োডিন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাও খুব বেশী আন্টিসেপ্টিক এবং ইহাকে পাউডার, গজ্ কিংবা প্লাষ্টার ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অ্যাণ্টিসেপ্টিক পেন্সিল

১—ট্যানিন কিউ, এস,

অ্যালকহল, কিউ-এস	১ অংশ
ইথার, কিউ-এস	১ „

অ্যালকহল এবং ইথারকে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া সবটাকে ঘন করিয়া লও। যেমন দরকার সেইরূপ দীর্ঘ এবং পুরু পেন্সিল জড়াইয়া লও। তৎপরে উপরে কলোডিন দিয়া, বিশুদ্ধ সিল্‌ভার লিফ দিয়া জড়াইয়া নিম্নলিখিত জিলাটিন সলিউসন দিয়া উহাকে শুষ্ক করিয়া তোল।

জিলাটিন	১ ড্রাম
জল	১ পাইণ্ট

মৃদু তাপের এসিড দিয়া উহা গলাইয়া লইতে হইবে।

যখন ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন আচ্ছাদনের একাংশ মোচন করিয়া, পেন্সিলকে ঈষদুষ্ণ জলে ডুবাইয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

২—রক্ত থামাইবার জন্য পেন্সিল কিরূপে প্রস্তুত হয় :—

বিশুদ্ধ অ্যালাম	৪৮০
বোরাক্স	২৪
অক্সাইড জিঙ্ক	২½
থাইমল	৮
ফর্মালিন (Formalin)	৪

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করিয়া একটী ওয়াটার বাথে (water bath) গলাইয়া লও; তৎপরে উহার সঙ্গে কিছু সুগন্ধি দ্রব্যের সংযোগ কর। এইরূপে মিকচার প্রস্তুত হইলে পেন্সিল কিংবা কোণে লাগাইয়া দিতে হইবে।

এই পেন্সিল তৈয়ার করিবার একটী সহজ উপায় হইতেছে একটী ছোট গ্লাস টিউবের প্রতিকৃতি লওয়া। একখণ্ড তৈল কাগজ লইয়া টিউবের চতুর্দ্দিকে জড়াও; তৎপরে গ্লাস টিউবটী ভিতর হইতে সরাইয়া লইয়া উহার একপ্রান্তের উপর কিংবা কোন বোতলের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দাও। তারপরে ইহার মধ্যে মিশ্রণ

ঢালিয়া দিতে থাক; ঢালা শেষ হইয়া গেলে উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া কাগজটী সরাইয়া ফেলিবে।

অ্যান্টিসেপ্টিক পেষ্ট (বিষ)

(ক) গমের ময়দা　　　　১৬ আউন্স

ঠাণ্ডা জল দিয়া মিশাইয়া লও

　　　　১৬ ফ্লুইড আউন্স

তারপরে ফুটন্ত জলে ঢাল　　　　৩২ ,,

(খ) চূর্ণিত গম আরেবিক　　　　২ ,,

(pulverized gum arabic)

ফুটন্ত জলে গলাও　　　　৪ ফ্লুইড আউন্স

(গ) চুর্ণিত অ্যালাম　　　　২ ,,

ফুটন্ত জলে গলাও　　　　৪ ফ্লুইড আউন্স

(ঘ) এসিটেট অফ লেড (acetat of lead)

　　　　২ আউন্স

ফুটন্ত জলে গলাও　　　　৪ ফ্লুইড আউন্স

(ঙ) করোসিভ সাব্লিমেট (corrosive sublimate)　　　　১০ গ্রেণ

(ক) এবং (খ) কে মিশ্রিত করিয়া গরম থাকিতে থাকিতেই নাড়া সুরু করিয়া দাও; এই অবসরে আবার (গ) কে পরিপূর্ণ ভাবে মিশ্রিত কর। তৎপরে (ঘ) যোগ কর। ভাল করিয়া নাড়া শেষ হইলে শুষ্ক করোসিভ সাব্লিমেট ঢালিয়া দাও। এই মলম অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা অ্যানাটমী এবং অর্গানিক টিস্যুর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

মুখের অ্যান্টিসেপ্টিক

১—থাইমিক এসিড, ২৫ সেন্টিগ্রাম (৩½ গ্রেণ); বেনজয়িক এসিড, ৩ গ্রাম (৪৫ গ্রেণ); এসেন্স অফ পেপারমিণ্ট, ৭৫ সেন্টিগ্রাম (১০ মিনিম) টিংচার অফ ইউক্যালিপ্টাস, ১৫ গ্রাম (৪½ ড্রাম); অ্যালকহল, ১০০ গ্রাম (৩ আউন্স); দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য উহাকে এক গ্লাস জলে ছাড়িয়া দাও।

২—ট্যানিন, ১২ গ্রাম (৩ ড্রাম); মেন্থল, ৮ গ্রাম (২ ড্রাম); থাইমল, ১ গ্রাম (১৫ গ্রেণ); টিংচার বেনজয়েন, ৬ গ্রাম (৯০ মিনিম); অ্যালকহল, ১০০ গ্রাম (৩ আউন্স), অর্দ্ধ গ্লাস পরিমিত ঈষদুষ্ণ জলে ১০ ফোঁটা ফেলিয়া দাও।

অ্যান্টিসেপ্টিক পেষ্ট

সিক্ত স্থলগুলিতে অ্যান্টিসেপ্টিক ড্রেসিং করিতে গেলে অনেক অসুবিধা হয়; যেমন, ওষ্ঠের উপর অপারেসন করা। সোকিন সাহেব এইজন্য একটী মলমের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। উহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

জিঙ্ক অক্সাইড্ ৫০ ভাগ; জিঙ্ক ক্লোরাইড্ ৫ ভাগ; বিশুদ্ধ জল, ৫০ ভাগ। একটী বুরুষ কিংবা স্পাচুলা (spatula) দিয়া ঘা শুষ্ক করিয়া লইয়া এই মলম লাগাইতে হইবে। তৎপরে উহাকে উপরোক্তস্থলে ৫ ৬ দিন রাখিয়া দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে ইহাকে সরাইয়া দিয়া, আবার একটী নূতন ড্রেসিং করা যাইতে পারে।

পটাসিয়াম বাইকার্বনেট্	...	৩২·০	গ্রাম
সোডিয়াম বেনজোয়েট	...	৩২·০	,,
সোডিয়াম বোরেট	...	৮·০	,,
থাইমল ...	...	০·২	,,
ইউকালিপ্টল্	...	২·০	সিমেণ্ট
পেপারমিণ্টের তৈল	...	০·২	,,
উইণ্টারগ্রিনের ,,	...	০·৪	,,
টিংচার অফ্ কড্ বিয়ার	...	১৫·০	,,
অ্যালকহল	...	৬০·০	,,
গ্লিসেরিন ...	...	২৫০·০	,,

জল এই পরিমাণে দিতে হইবে যেন ১০০০·০ সি সেন্টিমিটার হয়।

এই সল্টগুলিকে ৬৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার জলে গুলাইয়া লও; থাইমল, ইউক্যালিপ্টস এবং তৈলকে অ্যাল্‌কহলে মিশ্রিত করিয়া লও। তৎপরে অ্যাল্‌কহলযুক্ত মিশ্রণকে গ্লিসেরিণ এবং অ্যাকোয়াম লিকুইডে সংযোগ কর; সর্ব্বশেষে এমন পরিমাণে জল দিবে যে, যেন ১০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার হয়। কয়েকদিন এইরূপে রাখার পর, ফিল্টার কর। প্রয়োজন বোধ করিলে ফিল্টারে একটু ম্যাগ্নেশিয়াম কার্বনেট দিতে পার।

অ্যালক্যালিন গ্লিসেরিণ অফ্ থাইমল

সোডিয়াম বাইকার্বনেট	...	১০০	গ্রেণ
„ বাইবোরেট	...	২০০	„
„ বেনজায়েট	...	৮০	„
„ স্যালিসিলেট	...	৪০	„
মেন্থল ...	...	২	„

পামিলিয়ো পাইন ওয়েল (Pumilio pine oil)		৪	মিনিম
উইণ্টারগ্রিন তৈল	...	২	„
থাইমল ...	...	৪	গ্রেণ
ইউক্যালিপ্টল	...	১২	মিনিম

থাইমলের কম্পাউণ্ড সলিউসন

(ক)

বেনজয়িক এসিড	...	৬৪	গ্রেণ
বোরাক্স ...	...	„	„
বোরিক এসিড্	...	১২৮	„
বিশুদ্ধ জল	...	৬	আউন্স

এইগুলিকে একত্র মিশ্রণ কর।

(খ)

থাইমল ...	...	২০	গ্রেণ
মেন্থল ...	...	৬	„
ইউক্যালিপ্টল	...	৪	মিনিম
উইণ্টারগ্রিনের তৈল	...	৪	„
পেপারমিণ্টের „	...	২	„
থাইমের „	...	১	„

অ্যালকহল (৯০ পার্সেণ্ট) ... ৩ আউন্স
একত্র মিশ্রণ কর। ইহার (ক) এবং (খ) কে একত্রে মিশ্রিত কর। ইহার সঙ্গে বিশুদ্ধ জল সংযোগ করিয়া ফিল্টার কর।

অ্যাণ্টিসেপ্টিকরূপে চিনামন তৈল

৯ পার্সেণ্ট এমালসনে চিনামন তৈল ব্যবহার করিলে হাত সম্পূর্ণরূপে বিষ নির্মুক্ত হয়। ৭ হইতে ৮ পার্সেণ্ট এমালসন এক পার্সেণ্ট করোসিভ সাব্লিমেট সলিউসনের সমান। ব্যবহার করিতেও ভাল। থাইমের তৈলের ১১ পার্সেণ্ট সলিউসন চিনামন তৈলের ৭ পার্সেণ্ট সলিউসনের সমকক্ষ।

অ্যাণ্টিসেপ্টিক সলিউসনের সবুজ রং করা

বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য যে সলিউসন ব্যবহৃত হয়, তাহার রং ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ক্লোরোফিল (chlorophyll) ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। স্পিনাসের টিংচার কিংবা ঘাসের তাজা পাতা মর্দ্দন করিয়া দুই আউন্স রস এক পাইট অ্যালকহলে ৫ দিন ভিজাইয়া রাখিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে।

অ্যাণ্টিসেপ্টিক ব্রোমাইন সলিউসন

(Antiseptic Bromine Solution)

ব্রোমাইন ... ... এক আউন্স
সোডিয়াম ক্লোরাইড ... ৮ „
জল ... ... ৮ পাইণ্ট

জলের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড্ মিশ্রণ করিয়া উহার সঙ্গে ব্রোমাইন সংযোগ করিতে হইবে। খসখসে চামড়ায় লাগাইতে হইলে এই সলিউসন আরো পাতলা করিয়া লইতে হইবে। এক ভাগ সলিউসনের সঙ্গে ১৫ ভাগ জল মিশাইয়া লইলেই ঠিক হইবে।

ক্যাম্ফরেটেড অয়েল

২ আউন্স সর্ব্বোত্তম তার্পিন তেল, একআনা মূল্যের sweet oil, দুই আনা মূল্যের কেক ক্যাম্ফর। তার্পিন তেল একটি শিশিতে রাখিবে এবং কর্পূরগুলি ছোট টুকরা করিয়া শিশিতে পুরিবে। যখন ইহা মিশিয়া যাইবে, তখনই ব্যবহারোপযোগী হইবে।

কাশির মিকশ্চার

এক আউন্স গ্লিসিরিণ, এক আউন্স লিমন জুস অথবা তিনটি লেবুর রস, এক আউন্স কডলিভার তৈল মিশাইবে। একবারে চায়ের চামচের এক চামচ করিয়া খাইবে।

স্মেলিং সল্ট

এক আনা দামের রক এমোনিয়া কিনিয়া উহা ছোট ছোট খণ্ড করিবে। ছোট একটি বোতলে রাখিয়া উহা ল্যাভেণ্ডার জল অথবা অ-ডি-কলোনে আবৃত করিবে।

কৃত্রিম মধু

ভাল লাল (পিঙ্গল বর্ণ) চিনি ১০ পাউণ্ড, জল এক কোয়ার্ট, মৌচাকের দুই পাউণ্ড পুরাতন মধু, এক চাংচ ক্রীম অব টার্টার, গাম এরাবিক ১ আউন্স, পেপারমিণ্ট তেল ৩০ ফোঁটা, অয়েল অব রোজেস ২ ফোঁটা মিশাইয়া তিন মিনিট সিদ্ধ করিবে। উহাতে একটা ডিম গোলা এক কোয়ার্ট জল ঢালিবে, তারপর জ্বাল দিতে থাকিবে এবং যত ফেণা উঠিবে উহা সযত্নে তুলিয়া ফেলিবে। ইহার পর আগুন হইতে

নামাইয়া যখন একটু ঠাণ্ডা হইবে তখন ২ পাউণ্ড মৌচাকের মধু দিয়া ঘাঁটিয়া লইবে।

ঘাম নিবারণের পাউডার

ক্রীম অব টারটার এবং পরিশ্রুত নাইটার এক আউন্স গুঁড়া করা সাদা hellebore এবং লিকরিস ৩ ড্রাম, আফিং পাউডার ২ ড্রাম, সবগুলি একসঙ্গে গুঁড়া করিয়া লইবে। শুইতে যাইবার পূর্ব্বে ২০ হইতে ৪০ গ্রেণ ব্যবহার করিবে।

টুথ পেষ্ট

এক আউন্স উত্তমরূপে চূর্ণ করা পিউমিস ষ্টোন, এক আউন্স গুড়া করা myrrh, এক আউন্স গুঁড়া করা orris মূলের সহিত কারমাইন সলিউসন মিশাইয়া রং করিবে। তৎপরে এক ড্রাম লবঙ্গতৈল ও ¼ ড্রাম লিমন এসেন্স, ৪ ফোঁটা অটো অব রোজ মিশাইবে। মিশাইবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন সবগুলি সমান ভাবে মিশিয়া যায়। ইহার সহিত দুই আউন্স মধু মিশাইলেই ভাল দাঁত মাজা পেষ্ট হইবে।

লাইম জুস ও গ্লিসিরিণ

এলমণ্ডের সুইট অয়েল ½ পাউণ্ড, লাইম ওয়াটার ½ পাউণ্ড, হোয়াইট ওয়াক্স ¼ পাউণ্ড, গ্লিসিরিণ ½ আউন্স, ভারবেনা তেল ১৫ ফোঁটা, লিমন এসেন্স ১½ ড্রাম, এসেন্স অব বার্গামোট ৪৫ ফোঁটা। ওয়াক্স বা মোমটা তেলের সহিত মিশাইবে, তারপর ক্রমে ক্রমে লাইম ওয়াটার দিয়া জোরে ঝাঁকিয়া লইবে।

চুল কোঁকড়া করিবার উপায়

আধ আউন্স গাম এরাবিকের উপর আধ পাইণ্ট গরম soft water ঢালিবে। উহার সহিত ৬ তালচিনি মিশাইবে। যে পর্য্যন্ত চিনি এবং আঠা গলিয়া না যায় সে পর্য্যন্ত উহা নাড়িতে থাকিবে। তারপর ঠাণ্ডা হইলে ৬ আউন্স ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার এবং ২ আউন্স রাম বা হুইস্কি যোগ করিবে। এই তরলসার দিয়া চুল ঈষৎ ভিজা ভিজা করিবে তারপর উহা ন্যাকরা কাগজে বা পিনের সাহায্যে কোঁকড়া করিবে। কখনও কোঁকড়ানোর জন্য চিমটা বা সাড়াশী ব্যবহার করিবে না।

সিডলিজ পাউডার

ব্লু পেপার, টার্টারাইজড সোডা (রোচেল সল্ট) ২ ড্রাম, কার্ব্বোনেট অব সোডা ২ স্ক্রুপল। হোয়াইট পেপার, টার্টারিক এসিড ½ ড্রাম। ব্লু পেপারের জিনিসগুলি জলে মিশাইয়া নাড়িবে এবং উহাতে এসিড পাউডার দিবে। যখন ফস্ ফস্ করিয়া উঠিবে তখন পান করিবে।

চুলের কলপ

নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন চুলের কলপ প্রণালী বর্ণিত হইল। ইহাতে শরীরের কোন ক্ষতি করে না। তবে ইহার একটি মাত্র দোষ এই যে, ইহাতে চুলে যেমন রং হয় তেমনি চক্ষের উপরেও রংএর দাগ পড়ে।

তৈয়ার করিতে হইলে ½ পাউণ্ড মিশ্রিত ওয়ালনাট পাতা এবং তুষ লও, বেশ করিয়া ঘষিয়া ২৪ ঘণ্টা কাল এক গ্যালন জলে ভিজাইয়া রাখ। তারপর যতক্ষণ উহার পরিমাণ আধ গ্যালন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাল দাও। তারপর ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে এক পাইণ্ট unsweetened gin বা মদ যোগকর।

ওডি কলোন

এসেন্স অব বার্গামোট তিন আউন্স, নিরোলিয়া দেড় ড্রাম, মেড্রাট ২ ড্রাম, অয়েল অব রোজমেরি ১ ড্রাম, স্পিরিট অব ওয়াইন ১২ পাউণ্ড, স্পিরিট অব রোজমেরি ৩½ পাউণ্ড, ও-ডি-মেলিসে ডি ক্যান ২¼ পাউণ্ড মিশাইবে। উহা পরিষ্কার করিয়া (distil) একটি ঠাণ্ডা পাত্রে কিছুকাল রাখিবে।

অটো অব রোজ

পালিশ করা একটি বড় মাটির হাঁড়ি গোলাপের পাতা দিয়া পূর্ণ করিবে, দেখিবে যেন বোঁটাগুলিও উহার মধ্যে না যায়, তারপর উহা ঝরণার জল দিয়া ভরিবে। পাতা অপেক্ষা যেন জল বেশী হইয়া না যায়। তারপর পাত্রটি দুই অথবা তিন দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। রাত্রে ঢাকা দিয়া ঘরে তুলিবে। তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হল্‌দে তেলের কণা ভাসিতে দেখা যাইবে। সাতদিন এইরূপ রাখিলে খুব পাতলা সরের মত পড়িবে। এই সরই অটো অব রোজ। একটি কাঠির আগায় তুলা লাগাইয়া উহা ধীরে ধীরে তুলিয়া বোতলে পূরিবে।

ট্যান্ বুট পলিস

এক ভাগ মৌচাকের মোমের সহিত ৪ ভাগ তার্পিণ তেল মিশাইবে।

মহিলাদের জুতা পরিষ্কার

ভিনিগার ১৬ আউন্স, বিশুদ্ধ পরিস্কৃত জল ৮ আউন্স, করাতের গুঁড়া ৪ আউন্স, গ্লিসিরিণ ২ আউন্স, নীলের গুঁড়া এক ড্রাম, ট্রাগাকান্থ ২ ড্রাম, ভাল গ্লু ২ আউন্স, বাইক্রোমেট অব পটাসিয়াম ২ ড্রাম। বাইক্রোমেট অব পটাসিয়াম ব্যতীত অপর সবগুলি একসঙ্গে সিদ্ধ করিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে বাইক্রোমেট অব সোডার জল যোগ করিবে।

সাইকেল এনামেল

এক পাউণ্ড রজনের গুঁড়া জলে মিশাইবে এবং এক পাউণ্ড এস্ফেল্টাম ৪ পাউণ্ড আলকাতরার (টার) সহিত মিশাইবে। একটা লোহার কেটলিতে গরম অবস্থায় মিশাইবে। দেখিবে, যেন আগুনের সহিত এই সব জিনিসের কখনও সংযোগ না ঘটে।

রোজ পমেড

স্পার্মাসেটি ৮ ড্রাম, বাদাম তেল ৮ ড্রাম, লার্ড ১ পাউণ্ড, কটু বাদাম তেল ১০ ফোঁটা অয়েল অব রোজ জেরানিয়াম ১০ ফোটা, অটো অব রোজ দশ ফোঁটা, রং করিবার জন্য আলকানেট ব্যবহার করিবে। ১৮ পাউণ্ড সোডা, তেল সাবান ক্ষৌরীর সাবান। দুই পাইণ্ট জল। একটি কড়াইতে রাখিয়া গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত আগুনের তাপে মিশাইবে। যে পর্য্যন্ত মিকশ্চারটি ঘন না হয় সে পর্য্যন্ত কেবল নাড়িবে। তারপর উহা ঠাণ্ডা করিয়া ইচ্ছামত চৌকা গোল ডিম্বাকৃতি বা যে কোন রকমের সাইজ করিয়া লইবে।

ওয়াটার প্রুফ

এক গ্যালন্ ফুটন্ত তিসির তৈলের সহিত ৫ পাউণ্ড ইণ্ডিয়া রাবার আগুনের উত্তাপে জ্বাল দিয়া মিশাইবে। যদি খুব ঘন হইয়া যায়, তবে গরম তেল দিয়া পাতলা করিবে ; যদি খুব পাতলা হয় তবে রবার মিশাইবে।

তরল বুট পলিস

½ পাইণ্ট তিসির তেল এবং ½ পাইণ্ট ভাল ক্রীম লইবে। পৃথক ভাবে উহা অল্প গরম করিবে। তারপর একসঙ্গে ভাল ভাবে মিশাইবে। একখণ্ড ন্যাক্‌রা, ফ্লানেল বা স্পঞ্জ দিয়া ঘষিয়া গোলাকৃতি ভাবে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া জুতায় লাগাইবে এবং বেশ নরম পরিষ্কার শুক্‌না ন্যাক্‌রা দিয়া আবার গোলাকৃতি ভাবে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পালিশ করিবে। পালিশ লাগাইবার পূর্ব্বে যাহাতে জুতার চামড়া বেশ পরিষ্কার ও শুক্‌না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(ক্রমশঃ)

স্বল্প মূলধনে ব্যবসায়

(শ্রীঅনুপম চট্টোপাধ্যায়)

বাঙলার বিশ্ব বিদ্যালয় প্রত্যাগত যুবকদের বর্ত্তমান কর্ম্মহীনতার গ্লানি, অর্থহীনতার কষ্ট স্মরণ হইলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বর্ত্তমানের বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে অনেকেই আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, ব্যবসায় বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ ক'রতে, চাষী মজুরের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিতে। এই অজস্র উপদেশ বর্ষণ যে একেবারে বিফল হয়েছে একথা বলা চলে না, কারণ আজকাল অনেকেই ব্যবসা করতে, স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রতে চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু সে কাজের বাধা ও অন্তরায় অনেক উৎসাহীর উৎসাহ নষ্ট করেছে, অনেকের স্বল্প সঞ্চয় নিঃশেষ করেছে। মূলকথা আমরা আজকের দিনে বড় রকমের ব্যবসায় ত' ক'রতেই পারিনা—ছোটখাটো দু'চারটে ব্যবসা যে একান্তই নেই একথাও বলা চলে না; কিন্তু সে-পথেও অনেকে যেতে সাহসী হয়না নানা কারণে। যাদের সাহস থাকে তারা নিঃস্ব, আবার যাদের কিছু আছে তাদের সাহস হয় না। অভিজ্ঞতার অভাব, অর্থের অভাব, খুব বড় বড় উচ্চাশার প্রতি সহজ আকর্ষণ, প্রভৃতি কারণে আমাদের ছোটখাটো ব্যবসায়ের পথে যেতে বাধে। তিনটি বছর ধরে নানাবিধ স্বল্প মূলধনের ব্যবসার পিছনে ছোটাছুটি করে দেখা গিয়েছে যে স্বল্প মূলধনে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র আছে প্রচুর, কিন্তু কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা চাই, সহিষ্ণুতা চাই, বুদ্ধি চাই। নানাদিক থেকে বিচার করে দেখা গিয়েছে যে আজকের দিনে যখন মূলধন ভিন্ন ব্যবসায় করার কোনও উপায় নেই, তখন যা'দের সামান্য কিছু করে দেবার সামর্থ্য আছে তাদের ছোটছোট ভাগীদারী ব্যবসায়ী-সঙ্ঘ স্থাপন করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এই রকম ভাগীদারী ব্যবসায়ী সংঘের মূলধন ১০০৲ টাকা থেকে আরম্ভ করে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ব্যবসায়ে সততার একান্ত আবশ্যক; বিশেষ করে বাঙ্গালীর বদনাম আছে—কাঁচা পয়সার ব্যবসায়ে সতত৷ রক্ষা নাকি বাঙ্গালী করতে পারে না। কথাটা আংশিক সত্য হলেও একথার অসত্যতা প্রমাণ করতে হবে। মূলধন সংগ্রহ হবার পর কর্ম্মঠ বিশ্বাসী ভাগীদার পাওয়া গেলে পর স্থান, সুযোগ, সুবিধা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিচার করে ব্যবসায়ে নামা চলে। অবশ্য এই কাজটাই হলো গিয়ে শক্ত এবং সব চাইতে কঠিন।

কুটির শিল্প হিসাবে চক, কালী, ছাপার কালী, ছাপার রোলার, লজেন্স প্রভৃতির ব্যবসায় লাভজনক। এর মধ্যে চকটা এখনও তেমন ভাবে তৈরী হ'চ্ছে না। এ ছাড়া বর্ত্তমানে

আরও গোটা কয়েক ব্যবসায় আছে—যা'তে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়, যথা—পোল্ট্রি, ডেয়ারী, ছাগ দুগ্ধের ব্যবসা প্রভৃতি। ছাগ দুগ্ধের ব্যবসায়ে মূলধন লাগে খুব অল্প—সাধারণতঃ কলিকাতায় ছাগী দুগ্ধ দশ আনা বারো আনা সের দরে বিক্রী হয়; প্রকৃত পক্ষে সমস্ত খরচ খতিয়ে দেখলে প্রতি সের দুধের দাম পড়ে তিন আনা, চার আনা, তা ছাড়া প্রত্যেকটা ছাগী বছরে কম ক'রে দু'টা বাচ্চা দেয়—সেই বাচ্চা বিক্রী করেও ছাগলের খাবার খরচটা উঠে যায়।

এছাড়া আর একটা ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, অল্পস্বল্প মূলধন খাটিয়ে বেশ কিছু আয় করা যেতে পারে। সেটা হলো গিয়ে কাঁচা মাছ চালানী—বিশেষ ক'রে বর্ত্তমানে মাছের কারবার। এই দু'টি পরস্পর সম্পর্ক বিহীন ব্যবসায় সম্বন্ধে সামান্য চুম্বক এখানে দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনও এক বা ততোধিক উৎসাহী যুবক যৎসামান্য মূলধন নিয়ে কাজে নামতে চান তা'হলে তাঁদের বিস্তারিত ভাবে আমি জানাতে পারি।

মাছের ব্যবসায় সম্প্রতি কিভাবে চলে তার একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার। সাধারণতঃ বাজারে মাছ আসে আরও তিনহাত ঘুরে—অর্থাৎ জেলেদের কাছ থেকে, এক শ্রেণীর লোক আছে (নিকারি) তারা মাছ কেনে, তারা পাঠায় কলকাতার আড়তে, আড়তদাররা আবার বিক্রী করে পাইকার বা 'ফড়ে'র কাছে—'ফড়ে' আবার বেচে তাদের কাছে যারা বাজারে বসে বেচে। অল্প মূলধন নিয়ে মাছের একচেটিয়া ব্যবসায় আয়ত্ব করিতে হলে—

(১) জেলেদের কাছ থেকে কিনে বরাবর একেবারে বাজারে নিজেদের লোক দিয়ে বেচা।

(২) জেলেদের কাছ থেকে কিনে এনে বাজারের লোকদের কাছে বেচা।

(৩) জেলেদের কাছ থেকে কেনার অসুবিধা হলে (অনেক সময় দাদন দেওয়া থাকে) নিকারীদের কাছ থেকে কিনে পূর্ব্বোক্ত দু'ভাবে বিক্রয় করা।

(৪) জেলে অথবা নিকারীদের কাছ থেকে কিনে আড়তদারের মারফত পাইকারদের কাছে বেচা—

এই চারিটি উপায়ের কোন একটি অবলম্বন করতে হয়। এই চারটের মধ্যে সর্ব্বশেষটিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও নিরাপদ, তবে লাভ কম। অবশ্য লাভ কম হলেও প্রতি বাক্স মাছে অন্ততঃপক্ষে দুটি টাকা লাভ থাকে—খরচ খরচা বাদে। একাজে যে প্রতিযোগিতা নেই তাহা বলা চলে না, তবে খুব নিরীহ ভাল মানুষটীর মারনেই; সুতরাং খুব সহজেই নিজেদের জায়গা করে নেওয়া যায়। কলিকাতা ভিন্ন মফঃস্বলে কয়েকটা জায়গা আছে—সেখানে মাছের দর খুব বেশী। সেই সমস্ত জায়গায় চালান দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। কেউ যদি একা একাজে নামতে চান তাহলে তিনি পঞ্চাশ টাকা দিয়েও কাজ আরম্ভ করতে পারেন। আর যদি ন্যূনপক্ষে শ'দু'তিন টাকা হাতে থাকে তাহলে অবশ্য বেশ ভালভাবে কাজ চালান যায় এবং জনচারেক ভাগীদারের ভাগে প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে চার টাকা করে লাভ থাকে।

সম্প্রতি গঙ্গার ইলিশ ও পদ্মার ইলিশ মাছ ও পুকুরের মাছের ব্যবসা চলে। বাজারে বাজারে দোকান দিয়েও মন্দ লাভ থাকে না। জনচারেক ভাগীদার প্রত্যেকে একশত করে টাকা যদি খাটায় তাহলে প্রত্যেক দিন চার পাঁচ বাক্স মাছের কাজ চলে। অবশ্য চারজনকেই

খাটতে হবে। ইহাতে প্রত্যহ অন্ততঃ ২০ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে চারজন লোকই যে প্রয়োজন তা নয়, কেবলমাত্র দু'জন লোকেও চ'লে। হাওড়া কিম্বা শিয়ালদহ ষ্টেশনে মাছের আড়ত পরিদর্শন ক'রলে অনেকটা ধারণা জন্মাবে। অবশ্য একাজে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রতে হয় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা আবশ্যক। এই সময় ইলিশমাছের ব্যবসায় লাভজনক এবং কার্ত্তিকমাসে আরম্ভ হয় রুই কাত্‌লা ইত্যাদি জীয়ানো মাছের ব্যবসায়। বর্ত্তমানে পুষ্করিণীর মাছের ব্যবস্থা ক'রতে পারলে মন্দ লাভ হয় না। অভিজ্ঞতা লাভ করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়, মাছের দর ঠিক করা, বাক্সবন্দী করার পদ্ধতি ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছু জানতে হয় না। তবে কোথায় সস্তা মাছ পাওয়া যায়, কোন্ ষ্টেশনে বেশী লাভ হয়, প্রতি বাক্স মাছ খরিদ, প্যাকিং, বরফ প্রভৃতিতে কিরকম খরচ পড়ে ইত্যাদি জানতে হ'লে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হয় এবং ব্যবসায়ের স্থানে যেতে হয়।

সেখানে গিয়া ব্যবসায়ীরা কি ভাবে মাল যোগাড় করে অথবা চালান দেয় ইত্যাদি ব্যবসায়ের উপযোগী সকল তথ্যই জানিয়া লওয়া দরকার। আজকাল সকলে সকল ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতেছে, কিন্তু মাছের মত এমন একটি লাভজনক ব্যবসায়ে কেহই তেমন মনোযোগ দিতেছে না। দেশের শিক্ষিত যুবকরাও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেকে আবার সম্মানের ভয়েও নামিতে চায় না। কিন্তু সম্মান প্রতিপত্তি সব আজকাল টাকার ঘরেই। এ সম্বন্ধে অধিক বক্তৃতা দিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করা উদ্দেশ্য নয়। দেশের বেকার ভাইরা যাহাতে চাকরির মোহ ভুলিয়া স্বল্প মূলধনে যে-কোন একটী ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং কাম্য।

ইহা ছাড়া অন্যান্য আর যে-সব ফরমুলা এবং নানাবিধ জিনিষ তৈরীর কথা বলা হইল, তাহা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে। কাহারো কিছু জানিতে হইলে আমাদের আপিসে আসিয়া খোঁজ করিতে পারেন অথবা ডাকটিকিট সহ পত্র লিখিতে পারেন।

বাবলা গাছ

বাবলা অতিশয় মূল্যবান বৃক্ষ। তবে ইহা প্রায় অযত্নেই বর্দ্ধিত হয়। ইহার তদ্বির ও যত্ন করিলে ইহা হইতে বহু পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। স্থান ভেদে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই নানা রকমের বাবলাগাছ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে মাত্র ২২ প্রকার পরিচিত।

বাবলাগাছ ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। ভারতবর্ষেই ইহার জন্মস্থান। পল্লীগ্রামে জমির সীমানায় অথবা পতিত জমিতে ইহা বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ভিজা জমিতে ইহা ভাল জন্মে না। আতপযুক্ত শুকনা স্থানে ইহার আবাদ ভাল হয়। বাঙ্গলা, বিহার ও অযোধ্যায় বাবলার চাষ অনেক হ্রাস হইয়াছে। আসাম, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ হইতেও ইহার প্রায় তিরোধান হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বেরার, বোম্বাই, সিন্ধু প্রভৃতি স্থানে ইহা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের নদ, নালার তীরবর্ত্তী স্থানে, এবং যুক্তপ্রদেশের রাস্তার ধারে ইহা প্রভুত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সান ডাইটিচ ব্রেনডস ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতবর্ষে ইহাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভাগ করা হয়—(১) কৌলিয়া বাবলা—বেরার প্রদেশে ইহা দৃষ্ট হয়,—(২) চেলিয়া বাবলা (৩) রাম কাঁচা বাবলা। কৌলিয়া বাবলার গাছগুলি ছোট, নীরস জমিতে জন্মে। ইহার কাঠেরও মূল্য অন্যান্য জাতীয় বাবলা অপেক্ষা কম।

আবাদ।

বীচি ও কলম হইতে বাবলা গাছ জন্মে। ইহা সারিবন্দীভাবে অথবা বীজগুলি ছড়াইয়া বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে বুনিতে হয়। বীচিগুলি অত্যন্ত শক্ত, এজন্য বুনিবার এক দিন কি দুই দিন পূর্ব্বে জলে কিম্বা তরল গোবরসারে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। দেশীয় কৃষকেরা সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়াই আষাঢ় শ্রাবণ অর্থাৎ বুনিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, গোবর দিয়া ঢাকিয়া রাখে। চারা জন্মিবার তিন বৎসর পরে ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট গাছগুলি উঠাইয়া অন্যত্র লাগাইবে—এক গাছ হইতে অন্য গাছের দূরত্ব অন্ততঃ পক্ষে ১০।১২ হাত হওয়া বাঞ্ছনীয়; তাহাতে গাছগুলি স্বাস্থ্যযুক্ত ও কার্য্যকরী হইবে। তৃতীয় বৎসরে গাছগুলিতে ফুল ও ফল হয়। ৪ হইতে ৬ বৎসরের গাছগুলির ছালে অতি সুন্দররূপ কস বা ট্যান হয়।

জমি।

বাবলা সাধারণতঃ অল্প বালুকাময় বিশিষ্ট জমিতে ভাল জন্মে। পার্ব্বত্য প্রদেশে বা পাথর-সঙ্কুল স্থানে ইহার আবাদ হয় না। নীচু জমিও ইহার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ছাল, গঁদ (আঠা) বা ক্কাথ, এই তিনটি বাবলার মূল্যবান জিনিষ—এই তিনটি পাইতে হইলে গাছের স্বাস্থ্য ও জমির উর্ব্বরাশক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গঁদ!

মানুষের শরীরে প্রতিলোমকূপ হইতে যেরূপ ঘাম পড়ে, তেমনি বাবলা গাছের প্রতি গাঁইট বা ক্ষতস্থান হইতে একপ্রকার সাদা জলীয় পদার্থ বাহির হয়, তাহাকে গঁদ বা আঠা বলিয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পাওয়া যায়। এক একটি গাছে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫ সের আঠা পাওয়া যায়। অনেক স্থলে গাছের গায়ে নল বসাইয়া আঠা বাহির করা হয়। প্রতি সের বার আনা হইতে এক টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বাবলার আঠা বহু শিল্প কাজে সহায়তা করে। ঘরে চূণকাম ও দেয়ালে রংএর কার্য্যে ইহা চূণ ও রংয়ের সহিত মিশান হয়। মাটির খেলনায় যে রং দেওয়া হয় তাহাতেও ইহা লাগে।

বাবলার আঠা অনেক স্থানে মানুষে খায় এরূপ দেখা গিয়াছে। ঘি, বাবলার আঠা, চিনি এবং অন্যান্য মসলা দিয়া মিষ্ট আস্বাদযুক্ত খাবার প্রস্তত করিয়া সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

একটু চেষ্টা করিলে অযত্নে বর্দ্ধিত এই বাবলা গাছের আঠা সংগ্রহ করিয়া আমরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি।

বাবলার ছাল

ট্যানারিতে চামড়া ট্যান্ করিবার পক্ষে বাবলার ছালের বিশেষ প্রয়োজন হয়। কাঁচা চামড়াকে বাবলার ছালের রসে ভিজাইয়া মাংসল ভাগ উঠাইয়া ব্যবহারোপযোগী করতঃ চামড়া প্রস্তুত করা হয়।

এই ছাল হইতে রংও তৈয়ারী হইয়া থাকে। আমদানী হিসাবে ইহার মূল্যের তারতম্য হয়, এক কানপুরে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ মণ ছাল বিক্রয় হয়। এই অত্যধিক ব্যবহারহেতু অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সেখানকার মূল্য অতি সামান্য। বাবলার ছাল কোষ্ঠবদ্ধতার মহৌষধ; ইহার ভস্ম বা ছাই দাঁত মাজার পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত।

খোসা বা বীজাধার

শিমজাতীয় ফলের ন্যায় ইহার ফল খোসার ভিতর থাকে। এই খোসাগুলি চামড়া টান্ করিতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। অন্যান্য কয়েকটী পদার্থের সহিত মিশাইয়া ইহা হইতে লিখিবার কালী প্রস্তুত করা হয়।

সিদ্ধ করিয়া ইহা হইতে এক প্রকার এক্সট্রাক্ট বা নির্য্যাস বাহির করা হয়। আরবদেশে ইহা 'একাসিয়া' নামে পরিচিত। ঐ নামে আজও পর্য্যন্ত তুরস্ক ও পারস্য হইতে ভারতবর্ষে ঔষধ আমদানী হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের হাকিমী ঔষধালয়ে ইহা পাওয়া যায়।

কাঁচা ফলগুলি চূর্ণ করিয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা দন্ত মাজনও চলে। কাঁচা ফল গরু, ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত পশুর বিশেষ উপাদেয় খাদ্য। ইহা খাইলে গরু অধিক পরিমাণে দুধ দেয়। বোম্বাই বনবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে দেখা যায় যে এক বোম্বাই প্রদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ১০,০০০ টাকার কাঁচা ফল বিক্রয় হইয়া থাকে।

বাবলার পাতা

অনেকে মনে করেন চামড়া কস করিতে পাতারও প্রয়োজন হয়। রং প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে বাবলার পাতা অমোঘ। পশুর খাদ্য হিসাবেও ইহার মূল্য নিতান্ত কম নহে। ইহা অহিফেনের সহিত মিশাইয়া কবিরাজ মহাশয়েরা 'মোদক' প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

চিকিৎসায়

বাবলার কচিপাতা আধ তোলা পরিমাণ একটু জলের সহিত বাটিয়া খাইলে আমযুক্ত অতিসার ও মেহ রোগ ভাল হইয়া থাকে। বাবলার আঠা মধু সহ সেবন করিলে মূত্র বেশ পরিষ্কার হয়। শুকনা বাবলার পাতা গুঁড়া করিয়া উপদংশের ক্ষতে দিলে উপদংশ আরোগ্য হয়। ইহার কাঠি বা ছোট ডগার দ্বারা দন্ত ধাবন করা চলে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে দন্তধাবনের জন্য বহু লোক ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জন্যই ইহা মাড়োয়ারীদের অত্যন্ত প্রিয়। দন্ত ধাবনের পূর্ব্বে ইহার একপাশ দাঁত দিয়া চিবাইয়া ব্রাশের ন্যায় করিয়া লইতে হয়। ছোট ছোট ডাল হইতে এক প্রকার ঝুড়িও তৈয়ার হয়। ইহার ছালে এক প্রকার মোটা সুতা পাওয়া যায়। গাছগুলি সারিবন্দি ভাবে লাগাইলে বেড়ার কার্য্যও করিয়া থাকে।

বাবলার কাঠ

ইহার কাঠ অত্যন্ত শক্ত এবং মূল্যবান। চাষবাস সংক্রান্ত যত প্রকার যন্ত্রপাতি আছে, তাহার সমস্ত জিনিষেই ইহার প্রয়োজন হয়। ইহাদ্বারা গাড়ির চাকাও প্রস্তুত হয়। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বোম্বাই প্রদেশে এই কাঠ দ্বারা গৃহের আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈয়ার হয়। কুসংস্কার হেতু গৃহের আসবাবের জন্য বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশে ইহার আদর নাই। জ্বালানী হিসাবেও এই কাঠ অতি প্রশস্ত। পাতা, ছাল এবং ডালপালা বাদে সাধারণ রকমের একটি গাছে ৫ মণ জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায়।

বাবলার লা' বা লাক্ষা

বাবলা গাছে নূতন পাতা বাহির হইলে লাক্ষার বীজ ধরাইতে হয়। সিন্ধু এবং পাঞ্জাব প্রদেশে বাবলার গাছে বহু পরিমাণ লাক্ষা প্রতি বৎসর পাওয়া যায়।

গৃহস্থালীর কথা

কোন কাপড়ের দাগ কাপড়কাচা সোডা দ্বারা তুলিতে চেষ্টা করিলে কাপড় নষ্ট হইয়া যায়।

* * *

মাছ, পেঁয়াজ, পনির প্রভৃতির নিকট দুধ রাখিলে দুধ শীঘ্র খারাপ হয়।

* * *

কাঁচা দুধে কিঞ্চিৎ বাইকার্ব্বনেট অব সোডা মিশাইলে দুধ টাটকা থাকে।

* * *

রান্নার সময় কড়ার তেলে আগুন ধরিলে জল না দিয়া বার্লী কিংবা ময়দা অথবা এক মুঠা বালি ফেলিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়। জল দিলে আগুন ছড়াইয়া পড়ে।

* * *

আবলুষের ব্রাস পরিষ্কার করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া ভেসিলিন মাখাইয়া লইলে সোডা অথবা এমোনিয়াতে ইহা নষ্ট হইয়া যায় না।

* * *

এলুমিনিয়ামের কেটুলি প্রত্যহ রাত্রে উপুড় করিয়া রাখিলে শীঘ্র ফুটা হয় না ও বেশী দিন টিকে।

ভাল লেস্ ইস্ত্রি করিলে নষ্ট হইয়া যায়; কাচিবার পর একটি বোতলে জড়াইয়া রাখিলে শীঘ্রই শুকাইয়া যায় ও ইস্ত্রি করার দরকার হয় না।

* * *

একটু ভিনিগার ও লবণ গরম জলে মিশাইয়া একখণ্ড ফ্লানেল সেই জলে ভিজাইয়া, তাহা দ্বারা পুরাতন রঙিন কম্বলে ঘষিলে কম্বলের নূতন রঙ পুনরায় ফিরিয়া আসে, পরে উহা হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হয়।

* * *

কাপড় ভিজাইয়া, তাহার উপর সাবান ঘষিয়া দিয়া, পরে ভাল করিয়া তাহার উপর চা খড়ির গুড়া ছড়াইয়া পরে খানিক বাদে কাচিয়া ফেলিলে সকল রকম দাগ উঠিয়া যায়।

* * *

তরকারী বাষ্পে সিদ্ধ করিতে দিবার পূর্ব্বে একবার সোডা মিশ্রিত গরম জলে ধুইয়া লইলে উহার রঙ ঠিক থাকে।

* * *

Black lead এমোনিয়ায় ভিজাইয়া লইয়া লাগাইলে পালিস খুব উজ্জ্বল হয় ও বেশী দিন স্থায়ী হয়।

জমির উইএর উৎপাত কমাইতে হইলে জলের সহিত কিছু লবণ মিশাইয়া ঐ জল জমিতে ছিটাইয়া দিলে, অথবা তুঁতের জল বা কেরোসিন তৈল ঢালিলে উই মরিয়া যায়। ঘরের খুঁটী, বেড়া ইত্যাদির যে স্থানে উই ধরে, সেখানে ঐ তুঁতের জল বা কেরোসিন তৈল দেওয়া মাত্রই উই মরিয়া যাইবে।

* * *

জল ফিল্টার করিবার সহজ উপায়—প্রথমে জল ফুটাইয়া পরে ব্লটিং কাগজের ফ্লানেল প্রস্তত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া সেই গরম জলকে চোয়াইয়া লইতে হয়।

* * *

দশ সের জলে ১ তোলা রস-কর্পূর (উহা উগ্র বিষ, স্নতরাং সাবধানে রাখাই কর্ত্তব্য) গুলিয়া তাহা মাটিতে ঢালিয়া দিলে ঘরের ভিতরের উইএর উৎপাত কমিয়া যায়।

* * *

চায়ের দাগ একটু গ্লিসারিণ দিয়া ঘষিলেই উঠিয়া যায়, তবে পুরাতন দাগ হইলে কিছুক্ষণ গ্লিসারিণ দিয়া ভিজাইয়া রাখা দরকার।

* * *

দুই আউন্স সাজি মাটি তিনটা পেঁয়াজের রস, এক পাইট ভিনিগারে মিশাইয়া লিনেনের উপরকার দাগ উহা দ্বারা সহজে তোলা যায়।

* * *

সামান্য ঠাণ্ডা চা খানিকটা গরম জলের সহিত মিশাইয়া নরম পশমের কাপড় দিয়া কাঠের উপর ঘষিলে উহার পালিশ দেখিতে নূতনের মত হয়।

* * *

জানালার কাচের উপর রংয়ের দাগ লাগিলে একটু ভিনিগার গরম করিয়া তদ্বারা ঘষিলে উঠিয়া যায়।

* * *

এলুমিনিয়ম কখনও সোডার দ্বারা পরিষ্কার করা উচিৎ নহে। পিউমিছ্ পাউডার একটি কাপড়ে ঘষিয়া তাহা দ্বারা পরিষ্কার করাই সর্ব্বাপেক্ষা স্নবিধা।

* * *

ঝাঁট দিবার সময় অনেক সময় খুব সূক্ষ্ম ধূলিকণা আর তুলিতে পারা যায় না, তখন উহা পরিষ্কার করিবার সহজ উপায় হইতেছে—কতকগুলি কাগজ খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া ছিড়িয়া উহা জলে ভিজাইয়া ধূলির উপর ছড়াইয়া দিতে হয়; ইহাতে ধূলিগুলি উহাতে জড়াইয়া যায় এবং তুলিয়া ফেলিবার স্নবিধা হয়।

* * *

প্যার্য্যাফিন বা টার্পেণটাইনের মত হাতে রংয়ের দাগ তুলিতে অলিভ অয়েলও অতি উত্তম কাজ করে।

বাঙ্গলার বাসন-শিল্প

দেশের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী জিনিষের প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ বাড়িয়াছে। এই বিষয়ে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য দেশের মধ্যে "স্বদেশী ক্রয়: কর লীগ" ও তদনুরূপ বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে। ইঁহারা স্বদেশী জিনিষ ক্রয় ও ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা দেশবাসীকে নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কেবলমাত্র পত্রিকামারফৎ বা বক্তৃতাদি সাহায্যে প্রচারকার্য্য চালানোই যথেষ্ট নহে—এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উচিত আরও গঠনমূলক কার্য্য করা। প্রত্যেক প্রদেশে যে সকল শিল্প লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে সেগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ করা এই সকল প্রাদেশিক সঙ্ঘের কর্ত্তব্য।

বয়ন-শিল্প ও বাসন-শিল্প বাঙ্গলার অন্যতম দুইটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য শিল্প। পূর্ব্বের তুলনায় বয়ন শিল্পের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইলেও এখনও তাহা দেশের অনেকের অন্ন জোগাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার বাসন শিল্প আজ ধ্বংসোন্মুখ ও নষ্টপ্রায়। এক সময়ে ইহা ঢাকা, মৈমনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি জেলার বহু লোকের অন্নসংস্থানের উপায় ছিল। খাগড়ার কাঁসার বাসন শুধু বাঙ্গলা নয়, ভারতের নানা প্রদেশেই সমাদৃত হইত। বিষ্ণুপুরের কাঁসার বাসনেরও সমাদর কিছু কম ছিল না। হুগলী জেলার পিতলের বাসনেরও বিশেষ খ্যাতি ছিল। এদেশে এলুমিনিয়ামের বাসনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পিতল ও কাঁসার বাসনের কাট্‌তি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, এবং ক্রমশঃ এলুমিনিয়াম বাসনের কাট্‌তি যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গলার পিতল ও কাঁসার বাসন-শিল্প বোধ হয় নষ্ট হইয়া যাইবে। ১৯৩০-৩১ সনে যত টাকার এলুমিনিয়ম ধাতুর তৈরী জিনিষপত্র আমাদের দেশে আসিয়াছিল, তাহার প্রায় দেড় গুণ মূল্যের জিনিষ গত বৎসর ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে।

এলুমিনিয়ম বাসনের একমাত্র গুণ এই যে ইহা অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু "সস্তার তিন অবস্থা"—এই প্রবাদটি বাঙ্গালী এত শীঘ্র ভুলিয়া গেল, ইহাই আশ্চর্য্য। এলুমিনিয়াম বাসনে উষ্ণ ও অম্ল দ্রব্যাদি রাখিলে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ

হানিকর হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন খরচের দিক হইতে বিবেচনা করিলে কিনিবার সময় অল্প মূল্যে পাইলেই জিনিষ সস্তা হয় না। মূল্যের অনুপাতে যে জিনিষের স্থায়িত্ব যত অধিক, শেষ পর্য্যন্ত সেই জিনিষ তত সস্তা। এলুমিনিয়ামের বাসন শুধুই যে অল্প দিনে নষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, পুরাতন এলুমিনিয়ামের কোন দাম নাই বলিলেই চলে। কিন্তু পুরাতন পিতল কাঁসার বাসনের একটা দাম আছে। দুর্দ্দিনে তাহা বন্ধক দিয়াও টাকা পাওয়া যায়। অতএব ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ এই উভয়ের দিক হইতেই পিতল কাঁসার বাসনের ব্যবহারের পুনঃপ্রচলন প্রয়োজন।

অবশ্য কাঁসার বাসন ওজনে একটু ভারি হইয়া থাকে, কাজে কাজেই তাহার দামও কিছু বেশী পড়ে। কিন্তু ক্রমেই দেশের আর্থিক দুর্দ্দশা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের মত অধিক দাম দিয়া পিতল কাঁসার বাসন কিনিবার মত শক্তি অনেকের নাই। দেশের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী শিল্পের গতি নিয়ন্ত্রিত না হইলে সে শিল্পের উন্নতি হওয়া কঠিন। অতএব অল্পমূল্যে যাহাতে পিতল-কাঁসার বাসন বাজারে বিক্রয় করিতে পারা যায় সেদিকে উক্ত শিল্প-ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যদি আধুনিক উপায়ে সুন্দর মজবুত ও হাল্কা কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারা যায় তবে বাজারে তাহার কাটতি অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন হইল বাঙ্গলার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইঞ্জিনীয়ারের চেষ্টায় ঢালাই প্রণালীতে হালকা পিতল ও কাঁসার বাসন তৈয়ারীর এক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রকাশ, কয়েকটি স্থানের পরীক্ষায় এই নূতন উপায়ে খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও স্বদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তব্য এই পরীক্ষা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা। ইহা সফল হইলে বাঙ্গলার একটি মৃতপ্রায় শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

"বঙ্গবাণী"

কি ছিলাম
কী হয়েছি—
সুরবল্লী
কষায়
নিস্তেজদের
সতেজ করে।
সকল ডাক্তার
খানায় পাওয়া যায়
সি, কে, সেন
এণ্ড কো লিঃ
২৯, কলুটোলা
কলিকাতা।
ADIA

সূচীপত্র

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ | মাঘ ১৩৩৯ | ১০ম সংখ্যা

বাংলার দেশীয় শিল্প পতনের কারণ

(শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার)

পৃথিবীতে যত অঘটন ঘটিয়াছে তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে যাহা ঘটিয়াছে তাহার তুলনা নাই। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার লোকালয়ে অন্ন নাই। অনাহারে বাঙ্গালী হাহাকার করিতেছে। নদী পুষ্করিণীতে জল নাই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে কর্দ্দমাক্ত দূষিত জল পান করিতে বাধ্য হইয়া বাঙ্গালী রোগাক্রান্ত হইতেছে এবং রোগযন্ত্রণার কাতর ক্রন্দনে বাংলার আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করিয়া অকালে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে।

বাংলা ভিন্নজাতীর পদানত; পূর্ব্বেও সুদীর্ঘ কাল এই অবস্থায় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানের মত এত শোচনীয় অবস্থা ইতিপূর্ব্বে যে তাহার কখনও হয় নাই ইতিহাস তাহার সাক্ষী। দুইচার জনের উন্নতি, সুখসুবিধা বা উচ্চপদ-লাভ যে সমগ্র দেশের সুখসুবিধা বলিয়া গণ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য। আজ বাংলার এই দুরবস্থার কারণ দেশের শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে বলিয়া। ইহার এক-মাত্র প্রতীকার হইতে পারে দেশের কৃষির উন্নতি এবং শিল্পবাণিজ্যের প্রসার দ্বারা, অন্য পথ নাই। তাই সর্ব্বস্বপণ করিয়া বাঙ্গালীকে

একার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা এ জাতির সমূলে বিনাশ অনিবার্য্য। দেশের ইহা শুভ লক্ষণ যে শত বাক্য কোলাহলের মধ্যেও সে চেষ্টা যদিও সামান্য আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু নানা কারণে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইতে পারিতেছে না। অনেক শিল্পবাণিজ্যের পতন হইতেছে; এই পতনের কারণ কি এবং এ বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি, সে, সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(১) অনেকের ধারণা বাংলার শিল্পবাণিজ্যের পতনের একমাত্র কারণ চুরি ও জুয়াচুরি। আমরা কিন্তু তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তাদের চুরি জুয়াচুরিই হয়ত কারণ, কেননা জগতের কোনও দেশে কোনও কালে সমস্ত লোকই সাধু ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান সময়েও তাহা নাই। আমাদের দেশটাও জগত ছাড়া নয়, তাই চোর জুয়াচোরের হাত হইতে এই দেশ সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছে এরূপ হাস্যাস্পদ কথাটা আমরাও বিশ্বাস করিনা; তবে আমাদের ধারণা এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পবাণিজ্যের পতনের কারণ অন্য। তাহা জুয়াচুরির মত নীচ না হইলেও অনেক ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা বিশেষ মারাত্মক।

(২) ব্যবসা ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি যে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, নব্য ব্যবসায়ী বাঙ্গালী তাহা এখনও হাতে কলমে শিখিয়া দৃঢ়মনা হইতে শেখে নাই। তাই একপক্ষে ব্যবসায়ে সামান্য লাভেও তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজেকে ব্যবসাক্ষেত্রে খুব কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান মনে করিয়া এবং তজ্জন্য ক্ষমতার অতিরিক্ত বড় কাজে হাত দিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিবার বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবে ব্যবসায়ে লোকসান ঘটাইতেছে, এবং অন্যপক্ষে সামান্য লোকসানেও দিশাহারা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া মাঝ নদীতে নৌকা ডুবাইয়া বসিতেছে। চাকুরিজীবি এবং ওকালতী বা ডাক্তারীতে পসারকারী বাঙ্গালী এই সহজ কথাটাই বুঝিতে শেখে নাই যে চাকুরী, ওকালতী বা ডাক্তারীতে শুধু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেই উন্নতি করা যায়, কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি শুধু নিজের বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করেনা; তজ্জন্য আরও অনেক কিছু চাই। টাকা চাই, বিশ্বাসী কর্ম্মক্ষম সাহায্যকারী লোকজন চাই এবং শিল্প বা ব্যবসা সুনিয়মে চালাইবার অভিজ্ঞতা চাই। ইহার একটির অভাবেও শিল্প বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। এ দেশে ও-সবগুলি তৈরী পাওয়া যায় না, গড়িয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য যে ধৈর্য্যের দরকার বাঙ্গালীর তাহাও নাই।

উত্থান ও পতন ব্যবসা ক্ষেত্রের চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু সময়ে উত্থানের সংখ্যাই যে বেশী হইবে অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী তাহা জানিতে পারে নাই বলিয়াই সুরুতেই অনেকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ব্যবসাক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। তাই নিত্য নূতন শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হইতে পারিতেছে না।

(৩) সত্য বটে এক সময়ে বাংলায় শিল্প-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ত দেড়শত বৎসর আগে মারিয়া ভূত করা হইয়াছে। আজ যে বাংলার শিল্পবাণিজ্য তাহা ত' জন্মিয়াছে সেদিন। মাত্র পনর কুড়ি বৎসর শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে অতি শৈশবের বয়স। মানব শিশু যেমন জন্মিয়াই এমন সবল ও বুদ্ধিশালী হয়না যে কখনও না পড়িয়াই একবারে চলিতে

শেখে, তেমনই শিশুশিল্পও একবারও না পড়িয়াই চলিতে শিখিবে এরূপ আশা করাই ভুল। যে শিশুকে পিতামাতা বা অন্য কোনও সাহায্যকারী যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য আহার করায় এবং হাতে ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া চলা শিক্ষা দেয়, সে একটু শীঘ্র শীঘ্র চলিতে শেখে। কিন্তু যে কখনও পুষ্টিকর খাদ্য চোখে দেখে নাই এবং "হাঁটি হাঁটি" শিক্ষায় যাহার কোনও সহায় নাই বরং বাধা দিবার অনেক লোক আছে, তাহার পক্ষে চলা শিক্ষা করা যে কত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহা বোঝা বিশেষ শক্ত নয়। বাংলার শিশুশিল্প এই শেষোক্ত অবস্থায় পতিত। তাই বাঙ্গলার শিল্পের উত্থান কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় পরস্কন্ধে আরোহণ করতঃ শিখানোবুলি আবৃত্তিকারী দানাপানি যোগাড়কারী কালপুচ্ছ বিশিষ্ট ময়না পাখীর ঝাঁক প্রস্তুত করিবার জন্য দিবারাত্রি চীৎকার করিতেছেন এবং তজ্জন্য দেশের কোটি কোটী টাকা সেনেটে ও স্কুল কলেজে খরচ করিতেছেন। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও পুরুষত্ব দানকারী শিক্ষা এবং অন্নদাতা ও আরামদাতা শিল্প বিজ্ঞানের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া তদুপযুক্ত লোক তৈয়ারী করিবার জন্য তাঁহারা মাথা ঘামান দরকার মনে করেন না। তাই এদেশে শিল্পবাণিজ্য চালাইবার মত উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের একান্তই অভাব হইয়া পড়িয়াছে এবং উপযুক্ত লোকের অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের আশানুরূপ উন্নতি হইতে পারিতেছে না।

(৫) দেশের অধিকাংশ লোক দেশের শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার উৎসাহ

দেওয়া টাকার অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। অনেকে মনে করেন বিদেশী জিনিস গুণে ভাল, দামে সস্তা, তাই তাঁহারা দেশী জিনিসের পরিবর্ত্তে তাহা আদর করিয়া ঘরে আনিয়া নিজেদের অঙ্গের ও গৃহের শোভা বর্দ্ধন করেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহারা এই কথাই বলিতে চান যে পরের ছেলে যদি সুন্দর হয়, এবং সে বিদ্যাবুদ্ধিতে যদি এত অগ্রসর হইয়া থাকে যে তাহার জন্য টিউটারের খরচ লাগিবে না, তাহাকে যদি কম মূল্যে খরিদ করিতে পারা যায়, তবে নিজের কালো শিশুছেলের শিক্ষা ও ভরণপোষণের জন্য পয়সা অপব্যয় না করিয়া তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া, উক্ত পরের ছেলে ঘরে আনিয়া ঘর উজ্জ্বল করা আমাদের মতে সমীচীন। 'সহায়হীনের সাহায্য করা ধর্ম্ম' এ কথা ভাবা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই মোটা কথাটাই ভাবিয়া দেখা দরকার মনে করেন না যে, পরের সুন্দর ছেলে ঘর উজ্জ্বল করিতে পারে সত্য, তাহার রূপগুণ দেখাইয়া লোকের নিকট বাহবা নেওয়াও হয়ত যাইতে পারে, কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষদের উদ্ধারের কার্য্য তাহার দ্বারা চলে না, তা ছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ বংশও লোপ হয়। যাঁহারা স্বদেশী শিল্পের উৎসাহদাতা বলিয়া নিজদিগকে প্রচার করেন, তাঁহাদেরও অনেকেই কর্ত্তব্য বলিয়া বা ইহাকে যথার্থ ভালবাসেন বলিয়াই যে ইহার উৎসাহদাতা সাজিয়াছেন ইহা মনে হয় না। ইঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, স্বদেশীর ভড়ং দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবেন শুধু এই শূন্যগর্ভ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা খদ্দর প্রভৃতি দুই একটা স্বদেশী জিনিস সময় সময় ব্যবহার করিয়া ঘরের বাহিরে আসেন। ইঁহাদের ঘরের ভিতর অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই-একটা খদ্দরের ধুতি বা জামা ছাড়া প্রায় অন্য সব জিনিসই বিদেশী। তাই এই সব লোক-দেখানো স্বদেশীদের নিকটেও দেশীয় শিল্প বিশেষ কিছু সাহায্য পাইতেছে না। প্রধানতঃ এই সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবেই দেশীয় যে কয়টা শিল্প বর্ত্তমানে আরম্ভ হইয়াছে যেমন খদ্দর, সাবান, পটারি, পেন্‌সিল, গ্লাস, দেশলাই প্রভৃতি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। দেশের লোক ইহা অনুভবই করিতে পারিতেছে না যে এখন কিছু পয়সা খরচ করিয়া—(খরচই বা বলি কেন, দেশের পয়সা দেশেই থাকিবে, যাহা দেশের বাহিরে যায় তাহাই দেশের পক্ষে খরচ) এবং কিছু অসুবিধা ভোগ করিয়া ইহা-দিগকে উৎসাহ দিলে সময়ে ইহারাও সস্তায় উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে। কোনওরূপ প্রটেক্‌শান্ ছাড়া জগতের কোনও দেশে কোনও শিল্পই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যে দেশের শিল্প গভর্ণমেণ্টের প্রটেক্‌শান্ পায় না, তাহাকে যদি দেশের লোকেও প্রটেক্ট্ বা রক্ষা না করে, তবে সে আর কোথায় প্রটেক্‌শান্ পাইয়া বাঁচিবে! তাই যেগুলি জন্মিয়াছে তাহারা অকালে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে এবং এই অকালমৃত্যুর ভয়ে নূতন শিল্পও জন্মিতে পারিতেছে না।

(৬) কোনও কোনও শিল্প কাঁচা মালের (raw material) অভাবে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না, যেমন দেশের ফলরক্ষণের কারখানাগুলি। দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে খরচ হইতেছে, অথচ শত মাথা কুটিয়া, সংবাদ পত্রে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া কত আলোচনা করিয়াও

উক্ত ডিপার্টমেণ্ট দ্বারা অন্ততঃ এক কাঠা জমিতেও—আনারস যে ফিল্‌ড্‌ ক্রপ (field crop) হইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া "কাঁটা ঝোপে জন্ম তার অন্য তরুতলে" এই কবি বাক্যের সিদ্ধান্ত বাঙ্গালীর মন হইতে দূর করান গেল না। দেশের লোক যাঁহারা স্বরাজের জন্য ফণ্ড তুলিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে সাহায্য করা ত' দূরের কথা চিন্তা পর্য্যন্ত করিতেও নারাজ। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা বাসীরা আনারসের নাম পর্য্যন্ত জানিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না; অথচ আজ তাহারা তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তাহা 'ফিল্‌ড্‌ ক্রপ' করিয়া হাজার হাজার বিঘা জমিতে আনারস উৎপন্ন করিতেছে এবং ফলরক্ষণ শিল্পের সাহায্যে নানাদেশে রপ্তানি করিয়া প্রতিবৎসর কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতেছে এবং হাজার হাজার লোককে প্রতিপালন করিতেছে। আর বাংলায় যেখানে একটু চেষ্টা করিলেই আমেরিকা অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে উৎকৃষ্ট আনারস, আমেরিকার দশ ভাগের একভাগ অর্থ ব্যয় করিয়া যেখানে-সেখানে উৎপন্ন করিয়া ফলরক্ষণ শিল্পের সাহায্যে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশ হইতে আনিবার রাস্তা করা যায়, সেখানে ফলরক্ষণের কারখানাগুলি ফলের অভাবে বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, যে-দেশে যথেষ্ট ফল নাই সে-দেশে ফলরক্ষণের কারখানা খোলাই ভুল হইয়াছে। একদিক দিয়া দেখিলে একথা সত্য বটে, কিন্তু ইহার অন্য একটা দিকও দেখিবার আছে। এই যে দেশে যথেষ্ট ফল নাই, এ ধারণা দেশের লোকের কল্পনাতেও আসিত না এবং ইহার ব্যবসায়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে দেশে আনিতে পারা যায় এই প্র্যাক্‌টিকাল দৃষ্টান্ত দেশ পাইতেই পারিত না যদি এই ফলরক্ষণের কারখানাগুলি খোলা না হইত এবং তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে ইহা না দেখিতে পাইত। দুই তিন লাখ টাকা খরচ করিয়া এ শিক্ষা পাওয়া দেশের পক্ষে মহা লাভ, যদি এই শিক্ষাকে এখন কাজে লাগাইবার জন্য দেশ

সচেষ্ট হয়। এখানে তুলনা মূলক একটা অবান্তর কথা বলিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশে ব্যোমযান (air service) চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে; তজ্জন্য তাঁহারা কোটী কোটী টাকা জলের মত অকাতরে খরচ করিতেছেন এবং সে সমস্ত দেশের এমন একটা সংবাদ পত্র নাই যাহা তাহাকে উৎসাহ দিতেছে না। উহার পাইলট (Pilot) দিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্বয়ং রাজা, যুবরাজ এবং রাজপরিবারের ও দেশের প্রায় সমস্ত নরনারী সমবেত হইয়া কিরূপ ভাবে তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া এই কাজের দিকে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। অন্য সব দেশের ত' কথাই নাই! আমাদের দেশেরও ইংরাজদিগের সংবাদপত্রগুলি তাঁহাদের দশ কুড়ি টাকা ইঞ্চির কলমের পর কলম লিখিয়া এইসব কাজের কিরূপ প্রশংসা করিতেছে তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। এইজন্য অকৃতকার্য্য অনেক ডিজাইনারের বা মেকানিকের পকেটে কোটি কোটি টাকা অনর্থক গিয়াছে।

চেষ্টা করিলে এইসব ডিজাইনার বা মেকানিকের অনেককে হয়ত জুয়াচোর প্রমাণ করা শক্ত হইত না; কিন্তু তাহা লইয়া সে সব দেশের কোনও লোকের মুখে বা কোনও সংবাদ পত্রে এক বিন্দু সমালোচনা কেহ কখনও শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন কি? কখনই না; কেননা, তাহারা জানে প্রথম প্রথম এই টাকা খরচ হইবেই এবং কৃতকার্য্য হইলে ভবিষ্যতে ইহা সুদসমেত আদায় হইয়া একটা স্থায়ী আয়ের রাস্তা খুলিয়া দিবে। এখন এই লইয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে এ-কাজে কোনও লোকই অগ্রসর হইবে না। ইংরাজভক্ত বাঙ্গালী, ইংরাজের এই সব উদাহরণের অনুকরণ না করিয়া, শুধু বাপের নিকট সিগারেট ধরাইবার জন্য দেশলাই বা মদের বোতলের ছিপি খুলিবার জন্য কর্ক স্ক্রু চাহিবার মত কাজের অনুকরণ করিয়া ইংরাজ সাজিবার প্রয়াসী হইতেছে—ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর আর কি অধঃপতন হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনায় আসে না।

(৭) দেশীয় শিল্প যে দেশের নিকট শুধু সাহায্য বা সহানুভূতি পাইতেছে না তাহা নয়, দেশী ও বিদেশী অনেক শক্তিশালী শত্রু নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই শিক্ষা-বিহীন দুর্ব্বল শিশু-শিল্পকে ফেলিয়া দিয়া বা মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া প্রাণনাশ করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে। দেশের লোক তাহা দেখিয়াও অগ্রসর হইয়া ইহার সাহায্য করা ত' দূরের কথা, বরং ইহা একবার পড়িলে যাহাতে আর না উঠিতে পারে, যাহাতে সে মারা যায়—এরূপ সব কাজে শত্রুদের প্ররোচনায় বুঝিয়া ও না বুঝিয়া যোগ দিয়া দেশীয় শিল্পের শত্রুদিগকে সাহায্য করিতেছে। এই শত্রুদের কেহ কেহ যাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পবাণিজ্যের প্রতিও দেশের লোকের বিদ্বেষ জন্মে তজ্জন্য ছল করিয়া মিত্র সাজিয়া প্রচার করিতেছে যে দেশীয় শিল্পের পতনের একমাত্র কারণ কর্ম্মকর্ত্তাদের চুরি ও জুয়াচুরি। প্রমাণ স্বরূপ বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কথা বলা হয়। কিন্তু এই বাঙ্গালীই যে এই বাঙ্গলা দেশেই প্রায় পাঁচ শত ব্যাঙ্ক এবং লোন কোম্পানী সুচারুরূপে চালাইতেছে, সে সংবাদ পর্য্যন্ত কেহ রাখা দরকার মনে করেন না।

আজ এক ব্যানার্জ্জি ও লাহিড়ী প্রমুখ দুই একজন ব্ল্যাক শিপের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটাই ব্যাবসাক্ষেত্রে চোর ও জুয়াচোর রূপে এই বঙ্গবন্ধুদের নিকট গণ্য হইতে চলিয়াছে। এই ব্লাকদের সঙ্গে এক হোয়াইটকেও হাফ্ প্যাণ্ট পরিতে হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য বঙ্গবন্ধুগণ সমস্ত সাদা জাতিটাকেই চোর বলিতে সাহস করেন কি? ব্ল্যাক্ শিপ্ সব দেশেই কম-বেশী আছে। আমাদের দেশের ব্ল্যাক শিপের শাব্দিক মানে যদি ধরা হয় কালো ভেড়া, তবে বিলাতের ব্ল্যাক শিপের মানে হওয়া উচিত কালো জাহাজ; কেননা, আয়তনে তাহারা এত বড় যে উভয়ের মধ্যে তুলনা হয় না। এই কয়েকদিন আগেও সেখানকার হ্যাট্রি নামক এক ব্ল্যাক শিপের ধাক্কায়, ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে পর্য্যন্ত থরথরি কম্পমান হইতে হইয়াছিল। সেজন্য সেদেশে শিল্প বাণিজ্যে অর্থ খাটাইতে লোকেরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছে কি? তাছাড়া আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেই এই কয় বৎসরের মধ্যেই যে কত বিদেশী এবং বিপ্রো দশী ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া বাঙ্গালীর লক্ষ লক্ষ টাকা ধ্বংস পুরে পাঠাইয়াছে তাহার সংবাদ পর্য্যন্তও অনেকে রাখে না। সেদিনও অন্য এক জাতির এক মহাপুরুষ শিল্প বাণিজ্যের নামে বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়া দুর্ণাম গ্রহণ করা ত' দূরের কথা সেই জাতির মধ্যে মহাসম্মানের এক আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদ পত্রে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু তজ্জন্য উক্ত লোক বা তাহার জাতির এই বঙ্গ বন্ধুদের নিকট চোর জুয়াচোর নামে অভিহিত হয় নাই।

ইহাই মহা দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালী কালী পূজার সময় বাজী পোড়াইয়া, দোলের সময় রং ও আবীর খেলিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ধ্বংস করিতে দ্বিধা বোধ করে না। মালসী হইয়া কাউন্সিলে হাত তুলিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, তাহারাই উহাদের অকাল মৃত্যু নিবারক! অথচ

শিল্প বাণিজ্যের জন্য কিছু ক্ষতিগ্রস্ত যদি কখনও হয়, তখন তাহাদের পয়সার মমতা এত বেশী উপস্থিত হয় যে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই মিত্রবেশী শত্রুদের চাটু বাক্যে মুগ্ধ হইয়া এবং তাহাদের কথায় সায় দিয়া দেশের ভবিষ্যত শিল্প বাণিজ্যের রাস্তাও বন্ধ করিতে বিরত থাকে না; তাই দেশীয় শিল্প, বাহিরের শিক্ষা ও সাহায্য না পাইয়াও পতনের মধ্যে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহাও বিশেষ কাজে লাগাইতে পারিতেছে না।

বাঙ্গালীর প্রথম প্রতিষ্ঠান বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। দেশের লোক যখন শুধু ইহার শেয়ার খরিদ করিয়াই নিরস্ত ছিল তখন ইহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লাভ ত' দূরের কথা, মূলধন প্রায় বার আনা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন একশত টাকার সেয়ার অনেকে দশ, পাঁচ টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। অনেকে ক্রেতার অভাবে শেয়ার স্ক্রিপ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু যখন হইতে দেশবাসী ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই মিলে প্রস্তুত কাপড় খরিদ করিয়া ও অন্যান্যরূপে ইহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তখন ইহার অবস্থা কত উন্নত হইয়াছিল তাহাও আমরা দেখিয়াছি। একশত টাকার শেয়ার প্রায় সাড়ে তিন শত টাকায় বিক্রী হইয়াছিল এবং ইহার অবস্থা অতীব উন্নত হইয়াছিল বলিয়াই লক্ষ লক্ষ টাকা জুয়চোরের হাতে নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহা দাঁড়াইয়া আছে, এবং পূর্ব্বের মতই যদি ইহার প্রতি দেশের সহানুভূতি থাকে, তবে এই লোকসান বর্ত্তমান ম্যানেজিং এজেন্টসগণ অচিরেই পূর্ণ করিয়া লইবেন এরূপ আশা করা যায়। বাঙ্গালীর অন্য বড় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্। ইহার প্রধান কাজ কেমিক্যাল জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বাজারে প্রচলিত করা; সেই কাজে বিদেশীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহাকে কিরূপ ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে তাহা তাহার কর্ম্মকর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায়। এক পেটেন্ট ঔষধ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই পেটেন্ট ঔষধগুলি যদি দেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত নাম প্রাপ্তদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইত এবং তাহাকে যদি দেশের শিক্ষিত নামধারীদের উপর নির্ভর করিতে হইত, তবে অনেকদিন আগেই সহানুভূতির অভাবে এই বেঙ্গল কেমিক্যালকেও মৃত্যু মুখে পড়িতে হইত এবং ইহার কর্ম্মকর্ত্তারা হয়ত চোর বা জুয়াচোর আখ্যা পাইয়া শিক্ষিত নামধারী লোকদের টিট্‌কারী ভাজন হইতেন এবং লোকগঞ্জনায় বাঙ্গলার মাতৃভক্ত সন্তান শিল্প-প্রাণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দেশত্যাগী হইতে হইত ও গড্ডলিকার পরশুরামকে এই গড্ডলিকার ধাক্কায় নিজের কুঠার নিজের মাথায় মারিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রয়াসী হইতে হইত।

বাঙ্গলার এই দুর্দ্দিনে নেতৃবর্গের ও দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত কর্ত্তব্য যে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের অযথা গালাগালি না করিয়া এবং গলাবাজীর দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ হওয়ার দুরাশা ত্যাগ করিয়া, দেশের যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় এরূপ কাজে তাহাদের সময় ও সামর্থ্য নিয়োজিত করা। যেমন প্রত্যেক মানবের তেমনই প্রত্যেক জাতির সাংসারিক জীবনের প্রথম কাজ তাহার বাঁচিয়া থাকা, দ্বিতীয়—আরাম উপভোগ করা,

তৃতীয়—দশজনের সমকক্ষ হওয়া। উচ্চ চিন্তায় মনকে আনন্দ দান বা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলেও প্রথম তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আহারের দরকার। যাহার পেটে অন্ন নাই তাহাকে দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় গরমের সময় ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে শয়ন করাইয়া বিশ্বক'বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেও সে আরাম উপভোগ করিতে পারিবেনা—ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিবে, এবং তাহাকে যদি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়া কোন রাজদরবারে রাজার পাশে রাজ সিংহাসনে বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতেও সে নিজকে রাজার সমকক্ষ মনে করিয়া উচ্চাসনের গর্ব্ব অনুভব করিতে পারিবে না, বরং ঐ যে রাজার নিম্নতন ভৃত্য ছাতু গুড়ে উদর পূর্ণ করিয়া সিংহাসনের পার্শ্বে রাজ আজ্ঞার অপেক্ষায় যোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছে তাহার অবস্থাও সে নিজের অবস্থার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিবে। তাহা ছাড়া দুই চারি দিনের মধ্যেই তাহার অনশনে মৃত্যুও অনিবার্য্য।

আজ বাঙ্গলার এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, তাহার বার আনা লোক, যাহারা বাকি চার আনা লোকের আহার যোগাইতেছে, ক্ষুধার জ্বালায় হা-অন্ন হা-অন্ন বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এ অবস্থায় অন্নের সংস্থান করিয়া উক্ত লোকদিগকে বাঁচানই দেশের প্রধান এবং একমাত্র কাজ। নতুবা স্বরাজলাভ ত' দূরের কথা শীঘ্রই যে, বাঙ্গলার সমুদয় লোককেই—বার আনারা আগে এবং চার আনারা হয়ত কিছু পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে তাহারও লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তাহার আরামের বা দশজনের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করা শুধু বাতুলতা মাত্র। কেননা তাহা কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মেই যে পারেনা তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। আহার জুটিলে পরবর্ত্তী দুই অবস্থার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে এবং তখন দেশ স্বাভাবিক নিয়মেই সেই চেষ্টায় নিয়োজিত হইবে। এখন নিজকে বাঁচাইতে হইলে, জাতিকে বাঁচাইতে হইলে কি হিন্দু কি মুসলমান সমস্ত বাঙ্গালীকে দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া কেহ অর্থ দিয়া, কেহ চিন্তা দিয়া, কেহ বাক্য দিয়া, কেহ কার্য্য দিয়া, কেহ শক্তি সামর্থ্য দিয়া, কবি ও ঔপন্যাসিক তাহাদের কাব্য ও উপন্যাসের দ্বারা শিল্প বাণিজ্যের প্রতি লোকের ভালবাসা জন্মাইয়া, এক কথায় যাহার যাহা আছে তাহা দিয়া, এই জীবনদাতা কৃষি, ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। চোর ও জুয়াচোরের ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইলে চলিবে না। ব্যবসায়ে অংশীদারগণের দৃষ্টি থাকিলে চুরি জুয়াচুরির সম্ভাবনা স্বতঃই কম হইয়া যাইবে। রিফরম্, ইণ্ডিয়ানিজেশন্ অফ্ সারভিস্ প্রভৃতি ধাপ্পাবাজির কথায় অন্যমনস্ক হইলে সর্ব্বনাশের রাস্তা আরও প্রশস্ত হইবে। মনে রাখিতে হইবে বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটনের অকপট মনে বলা সেই সত্য কথাটা যে, "ইংরাজ এদেশে এমন কোনই কাজ করিবে না যাহাতে তাহাদের ন্যাশনাল্ ইন্‌টারেষ্টের ক্ষতি হয়।" ইংরাজেরা কি সব নেশান্ তাহার আভাস বহু পূর্ব্বেই নেপোলিয়ান দিয়া গিয়াছেন। তাহাদের ন্যাশন্যাল্ ইন্‌টারেষ্ট্ কি তাহাও কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; এবং এই অল্লাধিক দেড়শত বৎসরের মধ্যেই সেই ইণ্টারেষ্টের ফলে বাঙ্গলার

আজ কি অবস্থা হইয়াছে তাহাও কাহাকে আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না। Round Table Conference এর বার বার তিন বারের অধিবেশনে, হাজীর উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিল হইতে আরম্ভ করিয়া যখনই ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব উঠিয়াছে তখনই ইংরাজব্যবসায়ীদের আসল মনোগত ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। যে কোনও দিকে চোখ ফিরাইলে আপনা হইতেই তাহা চোখে পড়িবে।

সম্প্রতি ডোমিনিয়ান্ ষ্টেটাসরূপ অশ্বডিম্ব হাতে পাইবার জন্য দেশের নেতৃবর্গ আশামুগ্ধ হইয়া হস্তপ্রসারণে উদ্যত হইয়াছেন। এই অভিনব ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্‌টা যে কি বস্তু তাহাই এখনও জানা গেলনা; অথচ তাহা হাতে পাইব এই আশায় দেশে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা যদি ভারতের সমুদয় প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ দেশবাসী পায়, যদি সমুদয় উচ্চ নীচ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে দেশবাসীদিগকে রাজকর্ম্মচারী করা হয় এবং দেশের ভিতরকার আইন কানুন করিবার ক্ষমতাও যদি দেশবাসী পায়, আমরা বলিব তাহাতেও দেশের কিছুই কল্যাণ হইবে না, কতকগুলি তেলা মাথায় আরও কিছু তেল ঢালা হইবে মাত্র এবং তাহাতে দেশের স্লেভ্ মেণ্টালিটি বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। দেশের দুঃখ দৈন্য একতিলও কমিবে না, যদি বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইবার এবং দেশের রাজস্ব হইতে যথেষ্ট অর্থ শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার দেশবাসী না পায়। অন্য সব ক্ষমতা ইংরাজ হাতে রাখিয়াও যদি শুধু এই দুইটি ক্ষমতা দেশবাসীকে দেয়, তবে আমরা মনে করিব দেশের সুদিন আসিয়াছে। ইংরাজের দরবারে ভিক্ষা করা সার্থক হইয়াছে। দেশ আর অনাহারে মরিবে না। আহার জুটিলে আরাম উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং দশজনের সমকক্ষ হওয়ার ইচ্ছা স্বাভাবিক নিয়মেই এই অধঃপতিত জাতির ভিতরও জাগিয়া উঠিবে। তখন সেই ইচ্ছা পূরণ কার্য্যের সকল রকম বাধাকেই দেশ অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। আর যদি ইংরাজ তাহা না দেয় তবে আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া—

"কিছুই আমি পাইনি যেন সে কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"

বঙ্গীয় যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Apprentices' Homes এ যে টেক্‌নিক্যাল ক্লাশ বসে, পুস্তকগত শিক্ষালাভ করার জন্য তাহাদিগকে সপ্তাহে দুইদিন সেখানে যাইতে হইবে। স্কুলে চারিজন সাময়িক শিক্ষক আছেন এবং এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়:—বাষ্প ও বাষ্পীয় যন্ত্র, কলকব্জা তৈয়ারী, যন্ত্রসম্বন্ধীয় ড্রয়িং, ফলিত-যন্ত্র বিদ্যা, জ্যামিতি সম্বন্ধীয় ড্রয়িং এবং ব্যবহারিক অঙ্কশাস্ত্র। সাধারণতঃ শিক্ষানবিশ শিক্ষা বোর্ডে যে পাঠ্য তালিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য হয়।

নিম্নলিখিত হারে স্কুলের বেতন লাগে:—

			মাসিক।	
			টাঃ	আঃ।
প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক ছেলেদের			২	০
তৃতীয়	,,	,, ...	২	৮
চতুর্থ	,,	,, ...	৩	০
পঞ্চম	,,	,, ...	৩	৮

কাজের ধরণ।

কাজে প্রবেশের সময় বালকগণ যেরূপ পেশা নির্ব্বাচন করে কারখানায় সেইভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; অর্থাৎ, লোকোমোটিভ্ বিভাগের শিক্ষানবিশকে নিম্নলিখিত কারখানায় দেওয়া হয়:—ফিট করিবার, কলকব্জার কাঠের কলের, যন্ত্র গঠনের, বয়লারের, কামারশালের, ঢালাই এবং চাকা তৈয়ারী বিভাগে। যাহারা আরোহী গাড়ী বা মালগাড়ী বিভাগে আছে তাহারা গাড়ী প্রস্তুতকারকরূপে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য তাহাদের সকল সময়ই গাড়ীর কারখানা-গুলিতে থাকিতে হইবে। ইলেক্‌ট্রিক বিভাগের শিক্ষানবিশগণকেও তাহাদের পূরা শিক্ষাকাল ধরিয়া ইলেক্‌ট্রিক কারখানায় একটি বিশেষ কোর্স সমাপন করিতে হইবে। কারখানায় ও টেক্‌নিক্যাল ক্লাশে তাহাদের কার্য্যদ্বারা যে কৃতিত্ব ও অধ্যবসায় প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষানবিশগণের মধ্যে যাহাদের নক্সা কার্য্যের জন্য বিশেষ দক্ষতা আছে তাহাদেরও শিক্ষানবিশ কালের শেষ এক বা দুই বৎসর ড্রয়িং আফিসে দেওয়া হইয়া থাকে। কোন্ কারখানায় ঠিক কতদিন কাটাইতে হইবে তাহার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই; কারণ শিক্ষানবিশের আপন বুদ্ধি ও কার্য্যের উপর উহার অধিকাংশ নির্ভর করে।

ইউরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষানবিশ-গণের থাকিবার সুবিধার জন্য একটি সুসজ্জিত বোর্ডিং খোলা হইয়াছে। উহাতে ৪০ জন শিক্ষানবিশ থাকিতে পারিবে ও বালকগণের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য উহা একজন সার্জ্জেণ্টের তত্ত্বাবধানে আছে। শিক্ষানবিশের বোর্ডিংএ থাকিতে মাসিক ৩৬৲ টাকা খরচা

লাগিবে; ইহা ছাড়া মাসে প্রায় ১০৲ টাকা করিয়া বাধ্যতামূলক কতকগুলি খরচা আছে। ইহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক বালক প্রথম বৎসরে মাসিক ৩৩৲ টাকা ভাতা পাইবে, সুতরাং কাপড়চোপড়, হাত খরচা ইত্যাদি বাবদ তাহাকে প্রথম প্রথম মাসে প্রায় আরও ১৩৲ টাকা যোগাড় করিতে হইবে।

যে-সকল শিক্ষানবিশ তাহাদের শিক্ষানবিশের কাল সন্তোষজনকরূপে সমাপ্ত করে তাহারা যাহাতে চার্জ্জহ্যাণ্ড, সহকারী ফোরম্যান ও ফোরম্যানের পদে উন্নীত হইতে পারে সেইজন্য তাহাদিগকে প্রথমে ইম্‌প্রুভাররূপে দুই বৎসর কাল মাসিক ১২০৲ টাকা বেতনে কার্য্যে বহাল রাখা হয় এবং এই উন্নতি তাহাদের গুণাগুণ ও দক্ষতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অধিকন্তু তাহাদের শিক্ষানবিশের কাজ সমাপ্ত হইলে সচ্চরিত্রতার জন্য তাহাদিগকে ২০০৲ টাকা বোনাস দেওয়া হয় এবং দুই বৎসরের জন্য জার্নিম্যানের কার্য্য সন্তোষজনকরূপে নির্ব্বাহ করিলে আরও ১০০৲ টাকা দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ক্লাশের শিক্ষানবিশদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষার ফল অনুসারে পারিতোষিক দেওয়া হয় এবং যদি কোন শিক্ষানবিশের নাইট স্কুলের পড়াশুনা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার শিক্ষানবিশি পাঁচ বৎসর শেষ হইলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত নাইট স্কুল বোনাস্ দেওয়া হয়।

ইচ্ছাপুরের রাইফেল্ ফ্যাক্টরী —ট্রেড্ শিক্ষানবিশি ঃ—

১। সাধারণতঃ প্রতি বৎসর জুলাই মাসে ট্রেড্ শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করা হয়। পদপ্রার্থিগণের সাধারণ যোগ্যতা ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের উপর তাহাদের নির্ব্বাচন হওয়া নির্ভর করে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে-সকল পদপ্রার্থী উত্তীর্ণ হয় তাহাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইবে ও চূড়ান্ত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাহাদের স্বয়ং উপস্থিত হইতে আহ্বান করা হইবে।

২। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে কমপক্ষে কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষা থাকা প্রয়োজন এবং কেবল খুব বিশেষ কারণ থাকিলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ নহে এমন পদপ্রার্থীকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে।

৩। ট্রেড্ শিক্ষানবিশ (লেখাপড়ায় খুব বিশেষ যোগ্যতা না থাকিলে) নিযুক্ত হইবার বৎসরের ১লা জুলাই তারিখে, ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক অথবা ১৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইবে না। যে সকল পদপ্রার্থী এরূপ বিদ্বান যে তাহারা ২য় বার্ষিক টেক্‌নিক্যাল্ ট্রেণিং ক্লাশে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত, তাহাদের বেলায় বয়সের সীমা ঊর্দ্ধসংখ্যায় ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারা যাইতে পারে।

৪। কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় শিক্ষানবিশ অবিবাহিত থাকিবে এবং শিক্ষানবিশি কালের মধ্যে বিবাহ করিবে না, এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইবে।

৫। ইচ্ছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরীর Employment ম্যানেজারের নিকট প্রাপ্তব্য একটি ফরমে পদপ্রার্থীদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত নিজ হস্তে লিখিয়া দিতে হইবে।

৬। ১৫ই মে তারিখের পূর্ব্বে ঐ ফরমটি পূর্ণ করিয়া ৩৲ টাকা পরীক্ষার ফিস্‌সহ এম্প্লয়মেণ্ট ম্যানাজারকে ফেরত পাঠাইতে হইবে এবং সেই তারিখের পরে কোন কারণেই ফিস্ ফেরত দেওয়া হইবে না।

৭। ইচ্ছাপুর পার্কে, কারখানার নিকটে শিক্ষানবিশদিগের জন্য একটী হোষ্টেল আছে। শিক্ষানবিশগণকে তথায় থাকিতে ও তথাকার নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষানবিশদিগের নিকট হইতে বাড়ী ভাড়া, আলোক, জলের ট্যাক্স ও ময়লা পরিস্কারের খরচা আদায় করা হইবে না।

৮। যে সকল শিক্ষানবিশ হোষ্টেলের সাধারণ খাদ্য খাইতে অসমর্থ হয় তাহাদের জন্য পৃথক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে যে অতিরিক্ত খরচা হয় তাহা তাহাদিগকে দিতে হইবে।

৯। হোষ্টেলে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষানবিশকে মেস্ ও হোষ্টেলের চাঁদাস্বরূপ অগ্রিম ২০৲ টাকা জমা দিতে হইবে। হোষ্টেলের যে সকল খরচা রাইফেল ফ্যাক্টরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুমোদন করিবেন তাহা যতদূর সম্ভব শিক্ষানবিশের মাহিনা হইতে মাসে মাসে খাজাঞ্চী কাটিয়া লইবেন। যদি সকল খরচা দেওয়া হইয়া থাকে

তাহা হইলে হোষ্টেলে অবস্থান শেষ হইলে উক্ত জমার ২০৲ টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

১০। সকল ট্রেড শিক্ষানবিশের পক্ষেই নিম্নলিখিত মাসিক চাঁদা বাধ্যতামূলক :—

লাইব্রেরীর ফিস্ ... একদিনের মাহিনা
ক্রীড়া-কৌতুকের ফিস্ „ „

১১। শিক্ষানবিশের কাল সাধারণতঃ বৎসরে ২৮০ কার্য্যের দিন, এই হিসাবে পাঁচ বৎসর অর্থাৎ মোট ১,৪০০ দিন হইবে।

১২। কারখানায় হাতেকলমে কাজ শিক্ষা ও কারখানার ক্লাশে ও ল্যাবরেটারীতে যে শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা কারখানার কার্য্যের সময়ের ভিতর দেওয়া হয়, যথা, সোমবার হইতে শুক্রবার, প্রাতে ৭-৪৫ হইতে বিকাল ৪-৩০ পর্য্যন্ত ; মাঝে এক ঘণ্টা ছুটি থাকে ও শনিবারে প্রাতে ৭-৪৫ হইতে বৈকাল ১-৪৫ পর্য্যন্ত কাজ হয়।

১৩। উপযুক্ত শিক্ষানবিশদিগকে বৎসরে ১৫ দিন পর্য্যন্ত মাহিনাসহ ছুটী দেওয়া হইবে এবং উহা উপস্থিতি বলিয়া গণ্য হইবে। অসুস্থতা প্রভৃতি বিশেষ কারণের জন্য উহার অতিরিক্ত ছুটি অনুপস্থিতি বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। ট্রেড্ শিক্ষানবিশের প্রাথমিক মাহিনা ইচ্ছাপুরের ৩০ মাইলের ভিতরকার বাসিন্দা মাসিক ২০৲ টাকা ও ৩০ মাইলের বাহিরের বাসিন্দা হইলে মাসিক ৩০ টাকা হইবে ; সময় হইলেই মাহিনা বাড়িবে এই হেতুতে মাহিনা বাড়ান হয় না ; উহা উন্নতি, সচ্চরিত্রতা ও হাজিরার উপর নির্ভর করে। নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে :—

	টাঃ	আঃ।
(ক) যে শিক্ষানবিশের বৎসরের কার্য্য মোটামুটি ভাল হইয়াছে তাহার	৫	০
(খ) যাহার কার্য্য বিশেষভাবে উত্তম হইয়াছে তাহার	৭	৮
(গ) ক্লাশের হেড শিক্ষানবিশ	১০	০

১৫। শিক্ষানবিশ কালের প্রথমভাগে অর্থাৎ প্রথম ৬০০ কার্য্যের দিনের মধ্যে যে ট্রেড শিক্ষানবিশের কাজ সন্তোষজনক হয় তাহাকে উপরিলিখিত ১৪ উপদফায় যে হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই হারে দেওয়া হইবে এবং সে পীস্-ওয়ার্ক অনুযায়ী মাহিনা পাইবে না। দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ প্রথম ৬০০ কার্য্যের দিনের পরে তাহাকে যতদূর সম্ভব পীস্-ওয়ার্ক করিতে দেওয়া হইবে।

১৬। ট্রেড্ শিক্ষানবিশের মাহিনা হইতে মাসে মাসে শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত কাটিয়া লইয়া পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে। এইভাবে শিক্ষানবিশের নামে যে টাকা জমা হয় তাহা কেবল সম্পূর্ণ কোর্স সমাপ্ত হইলেই ফেরত দেওয়া যাইবে এবং শিক্ষানবিশ কার্য্যে ইস্তফা দিলে বা কার্য্য হইতে বরখাস্ত হইলে উহা বাজেয়াপ্ত হইবে।

১৭। শিক্ষানবিশদিগকে কারখানায় খাকি কামিজ, ছোট পায়জামা ও মোজা পরিধান করিতে হইবে এবং অনুমোদিত নোটবুক, ষ্টেশনারী, ড্রয়িংএর জিনিষপত্র নিজেদের কিনিতে হইবে। এই সকল জিনিষ কো-অপারেটিভ সোসাইটির ষ্টোরে পাওয়া যাইবে।

১৮। শিক্ষানবিশদিগকে ক্রীড়া-কৌতুকের যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহাতে যোগ দিতে হইবে।

১৯। হোষ্টেলে প্রাথমিক শুশ্রূষাসম্বন্ধে যে শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষানবিশগণ উহাতে উপস্থিত থাকিবে ও পারদর্শিতা লাভ করিবে।

২০। শিক্ষানবিশের উন্নতি নিয়মিতভাবে লক্ষ্য করা হয় এবং শিক্ষা লাভ করিবার কালে বরাবরই তাহার হাতেকলমের শিল্পকার্য্যের জ্ঞান ও আচরণের উপর নম্বর দেওয়া হইয়া থাকে।

২১। যে সকল শিক্ষানবিশ সমস্ত কোর্স শেষ করে ও যাহারা পরীক্ষায় (যাহা বাহিরের ও ভিতরের উভয়বিধ প্রকারেরই হইতে পারে) প্রয়োজনানুরূপ নম্বর পায়, কেবল তাহাদিগকেই কতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়া থাকে।

২২। শিক্ষার কাল শেষ হইবার পর শিক্ষানবিশদের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার ভার কর্তৃপক্ষ রাখেন না। শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৩ বৎসরের জন্য ৯০৲ টাকা হইতে ১৭০৲ টাকা মাসিক বেতনে ইন্‌স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত হয় ও কালে ফ্রি কোয়াটার, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, ইত্যাদি সমেত মাসিক ২০০৲—১০৲—৩৫০৲ টাকা বেতনের চার্জ্জম্যানের পদে উন্নীত হইবার আশা করিতে পারে।

২৩। রাইফেল ফ্যাক্টরীর মজুরদের জন্য যে সকল নিয়ম মধ্যে মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, শিক্ষানবিশগণ সকল বিষয়েই সেই সকল নিয়মাধীন থাকিবে।

২৪। এই সকল নিয়মাবলী অনুসারে শিক্ষানবিশ যে কোন সময়েই কার্য্য ছাড়িয়া দিতে পারিবে এবং রাইফেল ফ্যাক্টরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও সেইরূপ শিক্ষানবিশকে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

২৫। শিক্ষানবিশী সম্বন্ধে সকল বিষয়েই রাইফেল ফ্যাক্টরীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মীমাংসাই চরম হইবে।

(ক্রমশঃ)

চিনির কারখানা

(শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়)

পৃথিবীর বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ের অবনতির একটি প্রধান কারণ। বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর দুরবস্থা আজ চরম সীমায় পৌছিয়াছে। যে সকল কৃষিদ্রব্যের বিক্রয় ও কাট্‌তির জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তৎসমুদয়ের জন্য বাংলার কৃষকের ঘরে ত' হাহাকার উঠিয়াছেই, পরন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিবন্ধন দেশমধ্যে বিক্রয় যোগ্য ফসল ধান্য, চাউল, গম, সরিষা প্রভৃতির মূল্যও এত কমিয়া গিয়াছে যে তদ্দ্বারা আর কৃষকের গ্রাসাচ্ছাদনও নির্ব্বাহ হয় না।

বাংলার শতকরা ৯০ জন লোকের জীবিকা কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। হিন্দুমতে কৃষক বা বৈশ্য সমাজ দেহের উরুস্বরূপ, সাধারণমতে তাহাদিগকেই মনুষ্য সমাজের মেরুদণ্ড বলিতে হইবে। এই মেরুদণ্ড এখানে বিকল হইয়াছে। উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে উহা যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায় তবে দেহটি রক্ষা পাইবে কিরূপে? ধনীর বিলাস, ব্যবসায়ীর জাঁক জমক, জমিদারের ঐশ্বর্য্য, রূপের গৌরব, দেশের মঙ্গল, সমাজের শিক্ষা, সভ্যতা, উন্নতি, এ সকলই কৃষকের উন্নতি-অবনতির উপর নির্ভর করে।

বর্ত্তমানে পাটের যে ভীষণ পরিণতি হইয়াছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। পাট বাংলার একচেটিয়া সম্পত্তি। বাংলা এবং বাংলার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থান ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও পাট চাষের বিরাট প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে নাই। পাট একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ইহার চাহিদাও যথেষ্ট। কিন্তু দেশের কেহই ইহার ব্যবহার জানেনা বা করে না। এদেশে যে কয়টি পাটের কলকারখানা আছে তাহার প্রায় সকলগুলির মালিকই বিদেশী ইউরোপীয়ান সম্প্রদায়। বর্ত্তমানে তাহাদের কাজও বড় মন্দা চলিয়াছে। আর্থিক জগতের নানা প্রকার কূটনীতির পরিচালনার জন্য, ইংরেজগণের স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার জন্য, অথবা প্রত্যেক দেশে দেশীয়শিল্প রক্ষানীতির অবলম্বনের জন্যই হউক, কিম্বা বিদেশীর হাতে টাকা না থাকার জন্য, বহু বৎসর যাবৎ সস্তায় পাট অগ্রিম মজুত রাখার জন্য, অথবা নানা কারণে পাটের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় এক্ষণে আর বাংলায় পাটের আদর নাই। এদিকে আবার অজ্ঞ কৃষকগণ দেশহিত চিকীর্ষু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্ব্ববিধ উপদেশ ও প্রচারকার্য্য সত্বেও একের উপর টেক্কা দিয়া অপরে অধিক লাভবান হইবার আশায় দিনের পর দিন অধিকতর পরিমাণে পাটের চাষ করিতেছে। ফলে, গত বৎসর পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সকল কথা সকলেই জানেন; সুতরাং পুনরুক্তি বা বিস্তৃতিভয়ে এতৎসম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া বঙ্গের বর্ত্তমান অর্থ

সমস্যার একটি প্রতিকারোপায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বঙ্গীয় জনসাধারণের আর্থিক-কৃচ্ছ্রতা দূর করিতে এ-পর্য্যন্ত যে-সকল উপায় পরিকল্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে চিনির কারখানা স্থাপন অন্যতম। দেশের মধ্যে চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ লিমিটেড কোম্পানী স্থাপন করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতেছেন। ইহা ভাল লক্ষণ সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলা যদি তাহার চিরন্তন প্রবাদানুসারে কেবল ভাবপ্রবণতারই পরিচয় না দিয়া—অথবা হুজুগ কালীন প্রতিষ্ঠিত বহু কলকারখানা, সভা সমিতি, প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিণতির পথে অনুপযুক্ততা ও অকৃতকার্য্যতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করিয়া প্রকৃত ব্যবসায়ী ও কর্ম্মীরূপে স্থির ধীর ভাবে অগ্রসর হইতে পারে তবেই মঙ্গল।

বলা বাহুল্য যে চিনির কারখানা স্থাপন ও চিনির ব্যবসায় খুব লাভজনক। দেশবাসীগণের স্বাদেশিকতা ও গুড়-প্রিয়তার জন্য জাভা চিনির আমদানী একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। তাহাতে বাংলার একটা আশা জাগিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার চিনির বাজার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে জাভা চিনির আমদানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। চিনি শিল্প রক্ষা বিল অনুসারে প্রতিহন্দর জাভা চিনিতে ৯ টাকার উপর কর স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যদি কলিকাতার বাজারে জাভা চিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রীত হয় তবে ইহার চেয়ে দৈন্য ও নিরাশার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি যখন এই চিনির বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বাংলার গ্রামে গ্রামে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে বিহার, পাঞ্জাব এবং ইউ'পির কলকারখানা-জাত চিনি এবং গ্রামসমূহের অসংখ্য খান্‌সালি প্রথা ও প্রতিষ্ঠান জাত চিনি প্রায় সবই তত্তৎ স্থানে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় প্রতি সের বা মণ চিনির উপর অতিরিক্ত কর দিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও প্রায় ১৩।১৪৲ টাকা মণ দরে তাহারা দেশী চিনি ব্যবহারে পশ্চাৎপদ হয় না। অথচ ঐ সকল স্থান হইতে চিনি আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতে সামান্য কয়েক আনা বেশী পয়সা খরচ লাগে বলিয়া, সস্তা হিসাবে জাভার চিনি এখনও এখানে আমদানী করা হয়। যাহা হউক, দেশীয় কারখানা ও শর্করা সমিতির চেষ্টায় ও রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে স্বদেশী চিনির পড়্‌তা মূল্য শীঘ্রই আরও কমিতে পারে। তাহাতে আর একটা উপকার এই হইবে যে দুষ্ট ব্যবসায়ীদের জাভা চিনির সহিত চিটা মিশ্রিত করিয়া সেন্ট্রিফিউগেল মেসিন সাহায্যে চিনির রং পরিবর্ত্তন করিয়া এবং ওজন বৃদ্ধি করিয়া দেশী, কাশীপুরী প্রভৃতি নামে বিক্রয় করিয়া অশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা দূর হইবে। দেশবাসীও অপবিত্র জিনিসের হাত হইতে রক্ষা পাইবেন।

এই সকল এবং অন্যান্য অনেক কারণে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র চিনির কলকারখানা স্থাপন করিয়া আর্থিক উন্নতি বিধানের সুবিধা আছে। এক্ষণে সকলেই ইহার অল্পাধিক চিন্তা করিতেছেন। অনেকে অনেক প্রকার পরিকল্পনা করিতেছেন। কাহারও মতে এখনই ১৪।১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে বৃহৎ কারখানা স্থাপন করা উচিত। কাহারও মতে

প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করা সঙ্গত। প্রথমোক্তদের ধারণা, অধিক মূলধন খাটাইয়া উন্নত প্রণালীতে অধিক পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করিয়া অধিকতর লাভবান হইবেন। শেষোক্তদের ধারণা—কেবল মাত্র ধনী সম্প্রদায়ের করতলগত ২।৪টি বৃহৎ কলের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া কুটীর শিল্প এবং অনায়াস লভ্য ব্যবসায় হিসাবে ব্যাপক ভাবে অল্প মূলধনের অধিক সংখ্যক কলকারখানা সর্ব্বত্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে লাভবান হইতে পারে। এই দুইটি প্রশ্নই বর্ত্তমানের প্রধান প্রশ্ন এবং ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিতে গেলে আমাকে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বারান্তরে ঐ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে ইহাই বলিতে চাই যে উক্ত প্রশ্ন দুইটির মীমাংসার পূর্ব্বে বঙ্গে বিশেষ বিশেষ কলকারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নিম্ন বর্ণিত বিষয় সমূহের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। কারখানার নির্ব্বাচিত স্থানে নিত্য প্রয়োজনীয় আখ সরবরাহের, উপাদান সমূহের আমদানীর এবং উৎপন্ন চিনি রপ্তানীর সহজ সুন্দর ব্যবস্থা আছে কিনা।

২। কারখানার চতুষ্পার্শে ও নিকটে যথেষ্ট ইক্ষুর চাষ হয় কি না—তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাকি ঘন? নিত্য পরিমিতভাবে সরবরাহ চলিবে কিনা?

৩। দেশী আখের শর্করা শক্তি কত এবং তাহা সহজে ভাঙ্গা যায় কিনা? উন্নত প্রণালীর আখ আছে কিনা? প্রয়োজন হইলে কতদিন মধ্যে উহাদের পরিবর্ত্তে উন্নত প্রণালীর শর্করা বহুল ইক্ষুর চাষের প্রচলন করা যাইতে পারে?

৪। কারখানা সংলগ্ন বা কারখানার নিজস্ব কোন সুবৃহৎ ইক্ষু ক্ষেত্র আছে কিনা? না থাকিলে—নিকটবর্ত্তী কৃষকগণ যথোপযুক্ত মূল্যে তাহাদের উৎপন্ন ইক্ষু বিক্রয় করিবে কিনা? বাংলার কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থা, বিহার, ইউ-পি ও পাঞ্জাবের কৃষকের অবস্থার ন্যায় কিনা?

৫। লাভ লোকসান।

৬। কলকারখানা। উৎপাদন শক্তি। প্রকার ভেদ।

৭। বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় সমূহের পর্য্যালোচনার উপর ক্ষুদ্র বৃহৎ চিনির কলকারখানা স্থাপন করা নির্ভর করে। দৈনিক যে কলে ৪০০ টন বা ১০, ৮০০/০ মণ আখ ভাঙ্গা হয় তাহাকে একটি বৃহৎ কল বলা যাইতে পারে। এইরূপ কলে সাধারণতঃ ভেকুয়াম্ প্যানে কাজ হয়। দৈনিক ৫০ টন হইতে উপরে সহস্র সহস্র টনের কারখানা ভেকুয়াম্ প্যানে (Vacuum Pan) পরিচালিত হয়। তন্নিম্নে Vacuuam Pan দ্বারা কাজ করিলে খরচের পড়তা হিসাবে লাভবান হওয়া যায় না। খোলা কড়াই (Open Pan) দ্বারা ছোট ছোট কাজ উত্তমরূপে করা যায়।

যদি ৪০০ টনের এক একটি কল স্থাপন করিতে হয়, তবে (১২০ দিন কার্য্য কাল ধরিলে) অন্ততঃ ১২, ৯৬,০০০/০ মণ ইক্ষুর দরকার হইবে। বিগত বৎসর চম্পারণ চিনির কলে মোট ২৭,৪৮,০০০/০ মণ, সমস্তিপুর মিলে ২১,২৩০০০/০ মণ, লোহাট মিলে ৩৪,৮৬,৯১৩/০ মণ ইক্ষুর কাজ হইয়াছিল। অন্যান্য মিলেও এই অনুপাতে কার্য্য চলিয়াছিল। বিস্তৃত বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল বিবরণ এখানে দেওয়া গেল না। ৪০০ টনের একটি কলের জন্য অন্ততঃ ২২০০ একর ভূমির আখ প্রয়োজন। যদি প্রতি ১০০ স্কোয়ার মাইলের অন্ততঃ ১-১০ একের দশ অংশ ভূমিতে প্রকৃষ্টরূপে উন্নত প্রণালীর ইক্ষুর চাষ হয় তবে ঐরূপ একটি মিলের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত হইবে। ময়মনসিংহের কথা ধরা যাউক। ঐ হিসাবে যদি প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে এক জনেও তাহার ষোল আনা জমিতে অর্থাৎ প্রত্যেকে স্ব স্ব ভূমির পরিমাণের অন্ততঃ ১-১০ একের দশ হইতে ২.৫ একের পাঁচ অংশ পর্য্যন্ত ভূমিতে ইক্ষুর নিরেট চাষাবাদ করে, তবে ময়মনসিংহ জেলার এক একটি থানাতেও এক একটি বড় বড় কল স্থাপিত হইতে পারে। যেহেতু ময়মনসিংহ জেলা মধ্যে—

থানা ফুলবাড়িয়ায় আছে—

১,১৭,৩৯৭ একর বা ১৮৩'৫৪ স্কোঃ মাইল ভূমি
হালুয়াঘাটে ১,০৫,০৭২ " " ১৬৪'১১৮ "
ফুলপুরে ১,৪৬,৮৪৯ " " ২২৯'৪৬ "
ঈশ্বরগঞ্জে ১,২৯,৮১৫ " " ২০২'৮৩ "
কত্তোয়ালীতে
(ত্রিশালসহ) ১,৪৯,৫৭০ " " ২৩৩'৭০ "
মুক্তাগাছায় ৭৭,৪৭৭ " " ১২১'০০ "
নান্দাইলে ৮১,০০০ " " ১'৬'৫৮ "
গফর গাঁওএ
(ভালুকা সহিত) ২,০৪,০০০ " " ৩১৯'০৫ "

এক একটি থানাতেই যদি এক একটি কল স্থাপন করা না যায় তবে প্রত্যেক জেলায় ত ঐরূপ অন্ততঃ একটি কলও হইতে পারে। নিম্নে ২।৪টি মাত্র জেলার আয়তন দেখান গেল—

ময়মনসিংহ	৩,৯৯২,৩২০ একর
ঢাকা	১,৭৫৯,৪১৫ "
রঙ্গপুর	২,২৩৭,৪৪০ "
দিনাজপুর	২,৫২৫,৪৪০ "

বলা বাহুল্য যে ঐ সকল জেলায় ইক্ষুর চাষও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। যদি সমগ্রভাবে ইক্ষুর চাষের বিষয়টিই চিন্তা করা যায় তবে নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে প্রতীতি হইবে যে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি বৃহৎ কল যথার্থই স্থাপন করা সম্ভব।

জেলার নাম—	কত জমিতে আখের চাষ করা হইয়াছে।—
ময়মনসিংহ—	১৭,৩০০ একর
দিনাজপুর—	১৩,২০৮ "
রঙ্গপুর—	২১,৯০০ "
ঢাকা—	২৩,১০০ "
বগুড়া—	৪,৫৫০ "
হুগলী—	২৭,৭০০ "
হাওড়া—	৩,৯০০ "
রাজসাহী—	৮,১০০ "
বরিশাল—	১৭,১০০ "
নদীয়া—	১০,৪০০ "
যশোহর—	১০,৫০০ "
বর্দ্ধমান—	১০,০০০ "

কিন্তু এক একটি জেলা প্রকাণ্ড বড় এবং ইক্ষুর চাষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। জেলাগুলির যে সকল গ্রাম বা এলাকা প্রচুর চাষের জন্য বিখ্যাত সেই সকল গ্রামে যাইয়াও দেখিয়াছি যে অনেকগুলি ক্ষেত বা মাঠ অতিক্রম করিয়া গেলে পর ২।৫টি ভাল ইক্ষুক্ষেত দৃষ্ট হয়। বিহার; আগ্রা ও অযোধ্যার ইক্ষু-বহুল যে কোন গ্রামেই গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি ক্ষেতের পর ক্ষেত কেবলই ইক্ষুর আবাদে পরিপূর্ণ। ময়মনসিংহ ঢাকা প্রভৃতি স্থানের পাটক্ষেত দেখিলে পাট চাষের সম্বন্ধে যেরূপ একটা ধারণা করা যায়,—দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, ছাপরা, সারণ, চম্পারণ, গোরক্ষপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে তেমনই একটা ধারণা করা যায়। সে সকল স্থানে ঘনভাবে চাষ হয় (in compact areas), সুতরাং কোন কালেই ইক্ষুর অভাব হয় না। অপিচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রত্যেক কৃষক স্ব স্ব ইক্ষু অত্যন্ত আগ্রহের

সহিত বিক্রয় করিতে ব্যস্ত। প্রতি মণ ইক্ষুর মূল্য ৶০ হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত পাইলেই তাহারা খুব সন্তুষ্ট। সেখানকার প্রায় ইক্ষুই শর্করা বহুল কঃ ২১৩, ২৯০ এবং ২৮৫ নং।

উপস্থিত আমাদের বঙ্গদেশে ঐ সমুদয় দেশের ন্যায় সুবিধা বর্ত্তমান নাই। যদি যাভা, কিউবা, মরিশাস্ প্রভৃতি দেশের ইক্ষু চাষ ও শর্করা উৎপাদনের বিরাটত্বের সহিত আমাদের দেশের তুলনা করা যায় তবে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইতে হয়। কিন্তু হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীতে সকল কার্য্যই একভাবে এক দৃষ্টান্তে চলে না। আমাদের দেশের চিনি শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি করিতে হইলে এখন হইতেই আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উপরি লিখিত প্রশ্ন সমুদয় কতকটা নৈরাশ্য ব্যঞ্জক হইলেও দেশকালানুযায়ী ও সামর্থ্যানুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ ঐ সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সুবৃহৎ কল খুব লাভজনক বটে কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা সম্যক ফল প্রসব করিবে না। তবে বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে এবং দাদনাদি দিয়া কৃষকগণকে উৎসাহিত করিতে পারিলে আগামী দুই বৎসর মধ্যে বাংলায় ঐরূপ বৃহৎ কল পরিচালনা করা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু অল্প মূলধনে পরিচালিত ক্ষুদ্র কল কারখানায় কোনই অসুবিধা হইবে না। বরং এখন হইতে প্রতি গ্রামে (অবশ্য যে সকল স্থলে ইক্ষুর আবাদ হয়) এইরূপ এক একটি কল যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে, অথবা কৃষকগণ সামান্য-অধিক শ্রম ও অর্থব্যয়ে উন্নত প্রণালীর চিনি প্রস্তুত করিয়া যাহাতে অধিকতর লাভবান হইতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেকেরই এখন হইতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কৃষকগণকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, যাহাতে তাহারা প্রায় গুড় প্রস্তুতের মূলধন ও শ্রম দ্বারাই উত্তম চিনি প্রস্তুত করিয়া অন্ততঃ তিন গুণ অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ের কেহ আলোচনা চাহিলে বারান্তরে তাহা দেওয়া যাইবে।

এই প্রকার ছোট কারখানা নিম্ন প্রকারের হইতে পারে।—

১। খান্‌সালি প্রথা দ্বারা।

২। কেবল মাত্র চোলা বা কড়াই দ্বারা।

৩। কেবল মাত্র গুড় বা রাব দ্বারা।

৪। গোশক্তি মিল ও উন্নত প্রণালীর চুল্লী দ্বারা।

৫। সমুদয় সরঞ্জাম দ্বারা অল্প মূল্যে।

এই সকল প্রথায় কাজ করিতে মূলধন ১০০০৲ টাকা হইতে ২৫০০৲ হাজার টাকার অধিক প্রয়োজন হইবে না। অথচ এই প্রথায় শতকরা ২৫৲ টাকা হইতে ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ পাওয়া যাইতে পারে।

১ম দৃষ্টান্ত—

একসেট কড়াই	৩২৫৲
চুল্লী প্রস্তুত	৫০৲
ঘর প্রস্তুত ইত্যাদি	১৫০৲
অন্যান্য সরঞ্জাম	১২৫৲
অস্থবিধ মূলধন	২৫০৲
সেণ্ট্রি ফিউগেল মেসিন	৫০০৲
অন্যান্য	১০০৲
মোট	১৫০০৲

খরচ——দৈনিক।

১৫/০ মণ কড়ায় প্রতি মণ ।৵০ হিঃ—	৯৩৸০
উৎপাদন খরচ মণ প্রতি ৴০ হিঃ—	২৮৵০
বোরা, কুলী ও অন্যান্য—	৫৵০
মোট	১২৭৲

দৈনিক আয়—

১৫/০ মণ রসে শতকরা ১০/০ হিসাবে—

১৫/০ চিনি ও ১৫/০ চিটা।

প্রতি মণ চিনি ৯৲ টাকা দরে—১৫ × ৯ = ১৩৫৲

„ চিটা ॥০ হিঃ— ১৫/০ × ॥০ = ৭॥০

মোট ১৪২॥০

দৈনিক আয়—	১৪২॥০
„ ব্যয়—	১২৭৲
	১৫॥০
বাদ খাজনা, ট্যাক্স ইং	৪॥০
মোট লাভ	১১৲

মোটের উপর—১২০ দিন কার্য্য কাল ধরিলে বৎসরে লাভ হয়—১১ × ১২০ = ১৩২০৲ টাকা অর্থাৎ মূলধনের উপর প্রায় শতকরা ৮৭৲ টাকা লাভ হয়।

যদি প্রতি মণ রসের মূল্য উর্দ্ধ সংখ্যায় ॥৵০ আনা ধরা যায় এবং চিনি প্রস্তুত করিতে উর্দ্ধ সংখ্যায় রসের মণ প্রতি ৴০ ধরা যায় তথাপি মূলধনের উপর লভ্য ৮৭ পারসেণ্ট পড়ে। চিনির মূল্য ৮৲ টাকা হইলেও লাভের পরিমাণ কম থাকে না।

২য় দৃষ্টান্ত।—

প্রতিদিন যদি ২২ ঘণ্টা কাজ করিয়া ১৩২০ মণ আখ মাড়ান যায় এবং তাহা হইতে খোলা কড়াই সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করা যায়—

১। দুই সেট তিন রোলার মিল— মূল্য প্রত্যেক (১০″ × ১৪″)—	২,৮০০৲
২। ৪২ ঘোড়া শক্তি ইঞ্জিন—	৫,১০০৲
৩। ১৮″ × ১২″ সেণ্টিফিউগেল— ৬টি × ৫৫০৲—	৩,৩০০
৪। পাগ মিল—২টি— ৫০০ × ২—	১,০০০৲
৫। রস পাম্পার—১টী—	৪০০৲
৬। সাফ্‌টিং, পুলী ইত্যাদি—	৫০০৲
৭। আধার (Tanks) ইত্যাদি—	৭০০৲
৮। উন্নত প্রণালীর কড়াই ৪ সেট—	২,০০০৲
৯। গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি—	২,৫০০৲
১০। কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি—	১,০০০৲
১১। গাড়ী ভাড়া, কুলী ভাড়া, যাতায়াত—	৩০০৲
১২। সরঞ্জাম, চিটার পাত্র, তৈল, জ্বালানী ইত্যাদি—	২০০৲
	১৯,৫০০৲

দৈনিক খরচ—

১৩২০/০ মণ আক × প্রতি মণ ৷৵০ দরে—	৪৯৫৲
বেতন এবং অন্যান্য খরচ মণ প্রতি ৴০ হিঃ	২৪৭॥০
	৭৪২॥০

দৈনিক আয়—

৫॥০ পারসেণ্ট হিসাবে ১৩২০/০ মণে

১ম নং চিনি ৭২/০ প্রতি মণ ৮॥০ দরে—৬৩০৲

১॥• পার্সেণ্ট হিসাবে ১৩২০/০ মণে
২নং চিনি ২০/০ প্রতি মণ ৭॥• দরে— ১৫০৲
চিটা বা লালী ৬০/০ মণ × প্রতি মণ
॥• হিসাবে— ৩৫৲

৮১৫৲

দৈনিক আয়—	৮১৫৲
„ ব্যয়—	৭৪২।•
„ উদ্বৃত্ত—	৭২॥•

যদি বৎসরে মাত্র ১২০ দিন কাজ করা যায় তথাপি লাভ হয় ৭২॥০ × ১৩০ = ৮৭০০৲ টাকা বা মূলধনের উপর শতকরা বার্ষিক লাভ ৪৫৲ টাকা।

বলা বাহুল্য যে এখানে চিনির উৎপাদন ইক্ষু ওজনের মাত্র ৭ পার্সেণ্ট ধরা হইয়াছে। অভিজ্ঞ কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিলে উৎপাদন পরিমাণ ৮॥০ এর উপরেও উঠিয়া থাকে।

বদ্ধ কড়াই (vacuum pan) সাহায্যে কার্য্য করিলে ব্যয়ের তুলনায় লাভের পরিমাণ কথঞ্চিৎ কম হয় বটে, কিন্তু উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তবে এইরূপ কারখানা বহু ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া মাত্র ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই উহা আবদ্ধ থাকে। ব্যাপকভাবে কোন ব্যবসায়ের প্রসার লাভ না করিলে তাহাতে জনসাধারণ উপকৃত হয় না। সুতরাং খোলা কড়াই (open pan) দ্বারা ভাল কাজ হয় না বলিয়া যাহারা বদ্ধকড়াই প্রথাকেই (vacuum pan system) একমাত্র প্রধান স্থান দান করেন তাঁহাদের হিসাবে একটু ভুল আছে।

(নবশক্তি)

পুকুরে মাছ ধরা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৎস্য পালন

দক্ষিণ ভারতের পুকুরগুলি হইতে কলিকাতাস্থ দীঘিগুলিতে মৎস্য প্রতিপালন করিবার স্থবিধা ঢের বেশী। নদী হইতে তাজা মাছ ধরিয়া আনিয়া পুকুরে প্রতিপালন করাই এখানে রেওয়াজ; অনেক সন্নিকটস্থ হ্রদেও একাজ চলে। একাজটা ঠিক মোল্লাদের মুর্গী পোষার ন্যায়; বড় হইলেই উহা রসনার তৃপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। জেলেরাও এই ধরণের মাছ নদী হইতে তুলিবার কায়দা জানে; মাছকে জড়ো না করিয়া স্থানান্তরিত করিবার কায়দাও তাহাদের অজ্ঞাত নহে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জেলেদের কাছে হাজার বার চীৎকার করিলেও একথাটী মাথায় ঢুকিবে না, যে, মাছ প্রতিপালন অত্যন্ত আবশ্যক। কলিকাতায় ইহার জন্য চাহিদা বেশী থাকায়, এই ধরণের মাছ সর্ব্বদা সরবরাহ হইয়া থাকে এবং উহার উপর যথেষ্ট যত্ন করাও দস্তর হইয়া উঠিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে তুমি ইচ্ছা করিলেই যে কোন মাছ জানা দামেই কিনিয়া লইয়া পুকুরের জন্য ব্যবহার করিতে পার। জেলেরা কিরূপ তৎপরতার সহিত শত শত মাছের মধ্য হইতেও তোমার মাছটী খুজিয়া বাহির করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুতঃ বাংলাদেশ সব দিক দিয়াই মাছ ধরিবার ও প্রতিপালন করিবার উপযুক্ত স্থান। আমরা ৪ জনে ৩ দিনে ৬৭৮ পাউণ্ড মাছ ধরিয়াছিলাম; বলা বাহুল্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী মাছ সহজেই বাংলা দেশে পাওয়া যাইয়া থাকে। আমরা অবশ্য ৫০ হইতে ১০০ পাউণ্ডের কাত্‌লা বর্শীতে ধরিতে পারি নাই; কিন্তু যে সমস্ত অতিকায় কাল বাউস এবং রোহিত মাছ ধরিয়াছি, তাহা যে কোন মৎস্যশিকারীর আনন্দের খোরাক জুটাইবে। কলিকাতায় বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ মাছ প্রতিপালন করিবার জন্য ধরিয়া আনা হয়; কাজেই এই "প্রাসাদপুরী" যে মৎস্যশিকারীর পক্ষেও নন্দনপুরী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ভারতের অন্যত্র এত বিভিন্ন শ্রেণীর মাছ পাওয়া সম্ভবপর নহে, এবং এত উদ্যোগী মৎস্যশিকারীও অন্যত্র দুর্ল্লভ।

প্রকৃতির খামখেয়ালীর জন্য ভারতের নদীগুলিও বিভিন্ন প্রকারের; এখানকার মাছগুলিও তাই ইউরোপের চেয়ে বেশী দুরন্ত। উহারা একস্থানে থাকিতে আদৌ ভালবাসে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কান্ মাছের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইজন্যই উহাদিগকে বিভিন্ন স্থল হইতে সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর ব্যাপার নহে।

তবে আগেই বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতীয় মাছের সম্বন্ধে কোন কথা বিশেষভাবে বুঝিতে গেলে ইংরেজ মৎস্যশিকারীর জ্ঞান লইয়া উহার আলোচনা করা চলিবে না। বিলাতে যাহাকে স্যালমন মাছ বলা হয়, এদেশে সেই শ্রেণীর মাছ ইল্‌সা নামে পরিচিত। ইহারা সর্ব্বদাই তাজা জলে থাকিতে ভালবাসে এবং ইহাদের গতি সর্ব্বদাই নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে। ভারতে সামুদ্রিক এবং প্রবাহশীলা নদীর মাছ অত্যন্ত অস্থির, চঞ্চল শিশুর মত। যখন পূর্ণ জলোচ্ছ্বাস চারিদিক একাকার করিয়া দিয়া যায়, তখন উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট শাখানদীতে ছুটাছুটি সুরু করিয়া দেয়; নদীর স্রোত কমিয়া আসিলেই উহারা পূর্ব্বের মত আবার বড় নদীতে ফিরিয়া আসে। কেননা, এই ধরণের মাছ চিরকাল অগভীর নদীতে কাটাইবার ভরসা পায় না। একটু বড় হইলেই তাহারাও বিপুলকায়া স্রোতস্বতীর দিকে চলিতে থাকে। কাজেই অনেক সময় এই শ্রেণীর বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছের সঙ্গে নদীর জলে ধরা পড়িয়া থাকে।

অন্যান্য কারণের জন্যও ভারতীয় মাছ মাঝে মাঝে স্থান বদল করিয়া থাকে। ভারতের বিচিত্রময় গগনতলে ষড়ঋতু নানা ছন্দে নানা রঙ্গে দেখা দিয়া থাকে; এক সময় যাহার তলভূমি সূর্য্যের খরতাপে জ্বলিয়া গরম হইয়া উঠে, অন্য সময়ে তাহাই আবার জলে থৈ থৈ করিয়া উঠিতেছে। যদি ভারতীয় মাছের স্থান পরিবর্ত্তন করিবার স্পৃহা আদৌ বলবতী না হইত তাহা হইলে যে শুষ্ক নদী চৈত্রমাসের দিকে ফুটিফাটা হইয়া পড়িয়া থাকিত, বর্ষার সময় তাহাতে মাছের এত মহোৎসব লাগিয়া যায় কেন? ভারতীয় মাছের স্বভাব বিলাতী ধরণের হইলে বর্ষাকালেও এরূপস্থল মৎস্যবিহীন হইয়া পড়িয়া থাকিত। তাজা জলে আসিয়া পড়িলেই, মাছের চঞ্চল পুচ্ছ অধীর হইয়া উঠে; লক্ষ লক্ষ মাছ যুদ্ধের সেনার মত কুচকাওয়াচ করিয়া চলিতে থাকে। বস্তুতঃ মৎস্যের জীবনধারণ করিবার পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তন করা নেহাৎ আবশ্যকও বটে। নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাদের আহারও জোটা ভার হইয়া উঠে। বিলাতী মাছের মত সমুদ্র খুঁজিবার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণের জন্য এদেশী মাছ স্থান পরিবর্ত্তন করে না—ইহা তাহাদের পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা।

কিন্তু কি আহার্য্য দ্রব্য যে ইহারা সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা আমাদের কাছে বেশীর ভাগই অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তবে মশা-যে ইহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য, তাহা অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে। বস্তুতঃ ইহাকে মৎস্যের জীবন কাঠি বলিলে ভুল করা হইবে না। যেখানে দমকা হাওয়া লাগে না, অথচ থাকিবার আশ্রয় আছে, সেইখানেই মশার ডিম পাড়িবার সুবিধাজনক স্থান।

মাছ স্থানান্তরিত করা

মাছ স্থানান্তরিত করিতে গেলে উহা কখনো জড়ো করিয়া চালান দিতে নাই। দুই এক শ্রেণীর মাছ অবশ্য বহির্জগতের বায়ুগ্রহণ করিয়াই জীবিত থাকে; কিন্তু বেশীর ভাগ মাছই জলজ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। একটী রুদ্ধ কক্ষে বেশী লোক থাকিলে তাহারা অ্যাস্‌ফিক্সিয়াতে মারা যাইবে, তেমনি কোন পাত্রে বেশী মাছ জড়ো করিলেও উহারা জীবিত

থাকিতে পারিবে না। জল অক্সিজেন টানিয়া লইতে পারে বটে ; কিন্তু তাহার ক্ষমতা অনেক সীমাবদ্ধ। যদি পাত্রস্থ মাছ উহার জলের গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত অক্সিজেন সেবন করিতে থাকে, তাহা হইলে উহার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হইবে না। কাজেই পাত্রের মৎস্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ হওয়া উচিৎ। যদি উহার ভিতরকার মাছ বাতাসের জন্য জলের উপর ক্রমাগত ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে পাত্রে অক্সিজেনের পরিমাণ কম হইয়া গিয়াছে। তখন মাছের সংখ্যা কমাইয়া দিতে হইবে।

ইহা সত্য কথা যে, জলকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুপূর্ণ করিয়া তোলা যাইতে পারে। হাওয়া দিবার বেলোজ্ (bellows) সাহায্যে কিংবা জল উচ্চ হইতে পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, অথবা পাত্রকে বারেবারে নাড়া-চাড়া করিয়া জলকে বাতাসপূর্ণ করা অসম্ভব নয় ; কিন্তু অল্পদূরের রাস্তা না হইলে এরূপ কাজে কখনো হাত দিতে নাই। তবুও যদি মৎস্যবাহী ভৃত্য কর্ম্মদক্ষ ও চতুর না হয়, কিংবা যদি ঘুমাইয়া পড়ে অথবা নিজের কাজে অমনোযোগিতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সমস্ত মাছই মরিয়া যাইবে। কাজেই দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে মাছগুলি যেন অতিরিক্ত ভাবে বড় না হইয়া পড়ে। ব্যয় সঙ্কোচ করিবার জন্য বড় করাই জেলেদের দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করিতে হইলে মাছ খাদ্য ও বায়ুর অভাবে অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়ে। তবুও ইহা সহ্য না করিয়া উপায় নাই ; কেননা, অগৃহীত খাদ্যদ্রব্য পাত্রের নীচে পড়িয়া থাকিলে জল অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, মাছও সহজেই দলে দলে মরিতে থাকে। তবে যদি মশার ডিম মাছকে খাওয়াইবার কোন প্রকার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইবে ; ছোট বড় সকল মাছেরই ইহা প্রিয় খাদ্য।

ভারতে মৎস্য স্থানান্তরিত করিবার জন্য মাটীর জালা ব্যবহার করা হয়। কাজেই যখন সূর্য্যোত্তাপে উপরের জল বাষ্প হইতে থাকে, তখনও নীচের জল বেশ ঠাণ্ডা থাকে। জালার মুখ ছোট থাকে বলিয়া মাছের তাড়াতেও জল উপচিয়া মাটীতে পড়ে না ; অথচ ইহাতে জালা বায়ুপূর্ণ হইতে থাকে। কাজেই এই ধরণের পাত্রে দুইটী কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, জলও ঠাণ্ডা থাকে এবং উহা মাছের পুচ্ছতাড়নে আবার বায়ুপূর্ণও হইয়া থাকে। জালার আকার গোলাকার বলিয়া মাছেরও ধাক্কা খাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উহার মুখ ছোট থাকার জন্য মাছের লাফাইয়া বাহির হইবার সুযোগও অত্যন্ত কম। তবুও মাঝে মাঝে মৎস্য-নন্দনেরা নীচে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যায় ; ইহার পথ বন্ধ করিবার জন্য শক্ত ও সূক্ষ্ম একখণ্ড জাল জালার মুখে আটকাইয়া দেওয়া উচিৎ। কখনো কাপড় ব্যবহার করিতে নাই ; ইহাতে বায়ু চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং নিজেরও মৎস্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা অনেক কমিয়া আসে। জালার মুখে কাপড় দেওয়া থাকিলে উহার ভিতরকার মৃত মৎস্য চোখে পড়িবে না। মাছ মরিয়া গেলে উহাকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া ফেলিতে হইবে নতুবা অন্যান্য মাছও সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া উঠিবে। যে সমস্ত মাছ অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে তাহারা কিছুক্ষণ জলের উপর ভাসিয়া থাকিয়া

নীচে তলাইয়া যাইবে। সেইজন্যই মাঝে মাঝে জালার তলপ্রদেশে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া মৃতমাছ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করিতে হইবে, নতুবা জীবিত মাছগুলিও ভয় পাইয়া যাইবে এবং মৃতমাছও আন্দোলিত জলোদ্বেলনে ক্রমাগত স্থানচ্যুত হইতে থাকিবে।

পাত্রটী গোলাকার ধরণের ; কাজেই ছোবরা ও খড় দিয়া 'বিড়া' প্রস্তুত করিয়া উহার উপর জালাকে বসাইতে হইবে। রেলগাড়ীতেও জালা সেইজন্যে বসানো কঠিন হইবে না। কিন্তু যদি ঘাট কিংবা অন্যত্র উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় এবং গরুর গাড়ী প্রভৃতিও না মিলে, তাহা হইলে জালাকে নমমান বংশদণ্ডে অর্থাৎ বাঁকে করিয়াই স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। একজন মানুষ যাহা বহন করিতে পারে, দুইটী পাত্রের ওজন এবং আকারও তদনুরূপ হওয়াই উচিত।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে জলে বায়ুসঞ্চালন ততক্ষণ পর্য্যন্তই হয়, যতক্ষণ মাছ ক্রমাগত নড়া-চড়া করিতে থাকে। তোমার গন্তব্যস্থলে

পৌঁছিলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে চেষ্টা করিও না; অনেকে তাহাই করিয়া থাকে বটে। ইহাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক সময়; কেননা, এখন মৎস্যের পুচ্ছতাড়নে জল আন্দোলিত না হওয়ার জন্য উহাতে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই এরূপস্থলে বেশী দেরী না করিয়া পুকুর, হ্রদ কিংবা দীঘিতে মাছগুলি ছাড়িয়া দিবে।

মাছকে নূতন জলে ছাড়িয়া দিবার সময় যদি দেখিতে পাও যে মাছ কোন প্রকারেই তাহার নিজের ভার বহন করিতে পারিতেছে না এবং পার্শ্বদেশে হেলিয়া পড়িতেছে, তাহা হইলে উহার মূর্চ্ছা ও অবসাদের ভাব না কাটাইয়া উঠা পর্য্যন্ত উহাকে স্বহস্তে ধরিয়া রাখিতে হইবে। কয়েক মিনিট পরেই দেখিতে পাইবে যে মাছটি সলিলনৃত্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে; ঐ সময়ে উহাকে সাহায্য না করিলে মাছটী হয়তো মরিয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে মৎস্য খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

একটি চতুষ্কোণাকার পুকুর অর্দ্ধ একর জমি জুড়িয়া পড়িয়া আছে এবং একজন কনট্রাক্টারকে উহা হইতে মৎস্যশিকার করিবার অধিকার দেওয়া হইল। সে উহা হইতে এমন করিয়াই মাছ ধরিয়া লইয়া গেল, যে একটী ব্যাঙাচির বাচ্চাও অবশিষ্ট রহিল না। তখন পুকুরটায় জলও বেশী ছিল না। ১৫ই জুনের কিছু পরেই একটী খাল দিয়া কাবেরী নদীর জল হু হু শব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না যে সেখানে জালে মাছ ছাকিয়া লওয়া হইয়াছে, কাজেই আমরা ২৯শে আগষ্ট তারিখে সেখানে মাছ ধরিতে গেলাম। অন্ততঃপক্ষে জাল ফেলা ও মাছ আসার ৭০।৭৫ দিন পরে আমরা সেখানে বর্শী ফেলিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় যে আগন্তুক মৎস্য শিশুদের ওজন ২।৩ ড্রামের বেশী ছিল না! পুকুরটী মাছে পরিপূর্ণ ছিল এবং বর্শী ফেলা মাত্রই উহারা দলে দলে ভীড় করিয়া আসিতে লাগিল। উহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে পুকুরে কি ধরণের মাছ আছে। আমরা সাদা কার্প ও রোহিত মাছ ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং উহাদের মোট সংখ্যা ১৮৪টী ছিল। ইহা হইতে বোঝা গেল যে ২।৩ ড্রাম ওজনের মাছগুলি ৭০।৭৫ দিনেই প্রায় অর্দ্ধ পাউণ্ডের মত ভারী হইয়াছে। একটী মাছ কেবল এক পাউণ্ডের চেয়ে কিঞ্চিদধিক ভারী ছিল।

অন্য একটী পুকুরেও আমরা এই ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। ইহার ভারও একজন কনট্রাক্টারের উপর দেওয়া হইয়াছিল। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য পুকুরটীতে ১২।১৪ মাস পূর্ব্বে শেষ জাল ফেলা হইয়াছিল এবং নূতন জলের সঙ্গে ২।৪ ড্রাম ওজনের অনেক মৎস্যশিশু সেখানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আমরা যে সমস্ত মাছ ধরিয়াছিলাম, তাহার সবগুলির আকার প্রায় একই ধরণের; ১¼ হইতে ১½ পাউণ্ডের মধ্যে। একটী কেবল ৩ পাউণ্ড ওজনের মাছ ছিল। ১¼ পাউণ্ডের কম মাছ যৎসামান্য ছিল। ইহা হইতে বোঝা গেল যে ১২।১৩ মাসে ২।৪ ড্রাম ওজনের মাছগুলি পূর্ব্বোক্ত আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; তিন পাউণ্ড ওজনের মাছটী সম্ভবতঃ আগেকার জালের খপ্পর এড়াইয়া গিয়াছিল।

দুইটী পুকুরের অভিজ্ঞতাই অনুরূপ। আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম যে ধৃত মাছগুলির মধ্যে অনেকেরই ডিম পাড়িবার সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। (ক্রমশঃ)

ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যখন পোষ্টাফিসের মারফৎ মালের অর্ডার দেওয়া হয়, তখন চিঠির লেখা এমন হওয়া দরকার যে উহা যেন নির্ভুল এবং কোন পরিবর্ত্তন করা যেন অসম্ভব হয়। নমুনা কিংবা প্যাটার্ণকে চিহ্নিত করিয়া পিনদ্বারা অর্ডারের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া উচিৎ। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় যে চিঠি খোলা মাত্র অসাবধানতার জন্য ভিতরকার জিনিষ অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে, যে অর্ডারকারী খরিদ্দারের ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করা ভয়ানক মুস্কিল হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই মৌখিক অর্ডারে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। যদি অর্ডারের দপ্তর রাখাই হয়, তাহা হইলে যে-সমস্ত অর্ডার পোষ্টে প্রেরিত হয়, তাহার ,ঠিকানা ও বিবরণ রাখাও প্রয়োজন। সবচেয়ে সহজে এবং তাড়াতাড়ি যাহাতে কাজ চলিতে পারে তাহা হইতেছে নীল কাগজ-ওয়ালা ম্যানিফোল্ড বইতে বিবরণ রাখা; ইহাতে দ্বিতীয় কাপি পাইবার পক্ষে বিলম্ব হয় না। ইহাতে কেবলমাত্র অর্ডার সীট্ ছিঁড়িয়া পাঠাইয়া দিলেই হয়।

অনেক ব্যবসা-সংগ্রাহক নীল কাগজ-ওয়ালা ম্যানিফোল্ড বইতে অর্ডার দিবার সময় দুইটী কার্ব্বন কাপি রাখিয়া থাকেন। ইহার একটী যায় খরিদ্দারের কাছে, একটীর চালান যায় "হৌসে" বা মূল ফার্ম্মে এবং অপরটি কমিশন আদায় করিবার জন্যে ব্যবসা-সংগ্রাহকের সন্নিকটেই থাকে। সাধারণতঃ, তিনি অর্ডার পাইলেই উহা লিখিয়া লইয়া খরিদ্দারকে পড়িতে ও সহি করিতে দিবেন। ইহা দস্তুরমত আইন মাফিক কার্য্য। এই কাপি না দেওয়া হইলেও ভবিষ্যতের গণ্ডগোল এড়াইবার জন্য অর্ডারদাতা মূল্য এবং পরিমাণ সঠিক মত নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইবেন। তৎপরে, যখন মালপত্রাদি আসিয়া পৌছাইবে, তখন সেগুলি এই অর্ডার দেখিয়া মিলাইয়া লইবে, ইনভয়েসের (invoice) সঙ্গেও মিলাইয়া লইবে। যদি কোন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করিতে ভুলিবে না।

ব্যবসায়ীর ঘাড়ের উপর যাহাতে বেশী বোঝা চাপিয়া না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে আমরা ইহা লিখিতেছি না। যাহাতে লেন-দেনে কোন প্রকার মনোমালিন্য কিংবা গণ্ডগোলের সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য আমাদের এত কথা বলা। নগণ্য ২।১ টীকে বাদ দিলে বেশীর ভাগ পাইকারী বিক্রেতার ফার্ম্মই সহজসরল (straight forward) ভাবে কাজ করিতে পছন্দ করিয়া থাকে। তবে অনেক সময় নিম্নস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ অসাবধান

কিংবা দোষী হয়; পাইকারী ব্যবসাতে সততার স্থান এতই উচ্চে যে কোন ভুলচুক হইয়া গেলে উহা তৎক্ষণাৎ সংশোধিত করা যায়।

সাধারণতঃ ছোট একটী চিঠি অর্ডারের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া জানাইয়া দিবে যে মাল পাঠাইতে যেন অযথা বিলম্ব করা না হয়। চিঠি এবং অর্ডারকে যেন ভালরূপে ভাঁজ করা হয়; তারপরে এনভেলাপে ঠিকমত শীলমোহর করিয়া উহার গায়ে টিকিট লাগাইতে ভুল করিও না। টিকিট লাগানো হইয়া গেলেই উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিবে। অনেকের মনে হইতে পারে এ-সমস্ত ব্যাপার তো সকলেই জানে, ইহা এত আড়ম্বর করিয়া বলিবার কি দরকার ছিল। বাস্তবিকই ইহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গিয়াছে। কেননা, লেখকের হাতের কাছেই তিন খানা চিঠি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে; উহাতে সবই ঠিক আছে, কেবল কাহার কাছে এবং কি মাল পাঠাইতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। হয়তো শীঘ্রই উপরোক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ খুব কড়া চিঠি লিখিবেন; কিন্তু ভ্রমেও ভাবিবেন না, যে, তাঁহাদের অসাবধানতার জন্যই আমরা মাল পাঠাইতে পারিতেছি না।

যদি জিনিষ বিক্রয়ের জন্য অর্ডার পাওয়া যায় এবং উহা গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত চুক্তি উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য হইবে। যদি এই আইন কড়াকড়ি রূপে প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় উহা বিক্রেতাকে মুস্কিলে ফেলিয়া থাকে; কেননা, হয়তো আরো অর্ডার গৃহীত হইয়াছে, অথচ হাতে মাল নাই। এরূপ স্থলে আজকাল সাধারণতঃ স্বীকৃত-পত্রে (letter of acceptance) লেখা থাকে, "স্বীকার করিবার সময় বিক্রয় হইয়া না থাকিলে।" (Subject

to the goods not being sold) সময় যদি না থাকে তাহা হইলে টেলিগ্রাফ করিয়াই মালের অর্ডার দিবে; তারের সাহায্যে পাঠাইয়া থাকিলে, পরে চিঠির দ্বারা তারের সংবাদকে পাকা বা Confirm করিতে হইবে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে নমুনা, ক্যাটালগ কিংবা মূল্য-তালিকা দেখিয়া মাল কিনিলে উহা পছন্দসই হয় না। অনেক ফার্ম্ম খরিদ্দারকে খুসী রাখিবার জন্য অপছন্দ হইলে জিনিষ ফেরৎ লইয়া থাকে। ইহা বিশ্বস্ততার লক্ষণ বটে; কিন্তু বেশী করিয়া ইহার প্রশ্রয় দেওয়া ভাল ব্যবসায়ীর লক্ষণ নহে। যদি মালগুলিকে লাভ রাখিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা রাখা মন্দ নহে। সাধারণ ভদ্রতা অনুসারে ব্যবসায়ী-কেই জিনিষটার পাঠাইবার খরচ বহন করিতে হয়; যদি অনেক দূর হইতে মাল আসে এবং উহা ভারী কিংবা বৃহদায়তন হয়, তাহা হইলে খরচ অনেক বেশী পড়িয়া যায়। এই খরচটা মিছেমিছি হয়; এতদ্ব্যতীত পুনরায় প্যাক্ করিবার খরচও আছে। যে 'হৌস' হইতে মাল পাঠানো হইতেছে, সেখানে সমস্ত ব্যাপার বিশদভাবে লিখিয়া কিছু অ্যালাউন্স চাহিয়া লওয়া উচিৎ। যদি ইহা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে পাইকারী বিক্রেতা মাল ফেরৎ পাঠাইতে বলিবেন, মাল পাঠাইবার খরচ অবশ্য তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। যদি তাহারা অ্যালাউন্সও না দেয়, প্রেরিত মালও গ্রহণ না করে, তাহা হইলে এরূপ ফার্ম্মের সঙ্গে আর কারবার করা উচিৎ কি না, তাহা বিশেষ রূপে বিবেচ্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন ফার্ম্মের সঙ্গে বেশী বিবাদ করা কিংবা সামান্য কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি

করা আদৌ উচিৎ নহে। কোন পাইকারী ব্যবসাদার যদি খরিদ্দারের রুচিমাফিক কোন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যবসাদার যে উহা আবার ফেরৎ লইবেই, তাহা আশাকরা অন্যায়।

যখন কোন মালপত্র ফেরৎ পাঠানো হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই পোষ্ট করিয়া ইন্‌ভয়েস্ (invoice)—ও পাঠাইতে হইবে এবং উহার এক কাপি দপ্তরে রাখিয়া দিতে হইবে। যখন ক্রেডিট্ নোট (Credit note) আসিয়া পৌছায়, তখন উহার মাল পত্রাদির বিবরণ ও পরিমাণ Invoice এর হিসাবের সঙ্গে মিলাইয়া লইবে; মাসিক এবং চতুর্ম্মাসিক যে-সমস্ত বিবরণ আসে তাহাও ঐরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে জমার হিসাব ভুলক্রমে খরচের দিকটায় লেখা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শুধু অঙ্কটা খরচের দিক হইতে কাটিয়া দিলেই হইবে না, উহাকে জমার দিকে না বসাইলে ভুলই থাকিয়া যাইবে।

যদি অর্ডারের চেয়ে বেশী মালপত্র আসিয়া থাকে তাহা হইলে ক্রেতা উহা রাখিতে পারেন; কিন্তু ব্যবসায়ীকে জানাইতে হইবে যে মাল বেশী আসিয়া গিয়াছে এবং উহার জন্য তাহাদের ইন্‌ভয়েস্ পাঠাইতে হইবে। না জানাইলে উহা জঘন্য অসাধুতার পরিচায়ক হইবে। যদি ক্রেতার উহা রাখিবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে পাইকারী ব্যবসায়ীকে উহার উপযুক্ত ক্রেডিট্ দিয়া মালের ডেলিভারী লইতে হইব।

অনেক ফার্ম্ম ক্রেতাকে এই চুক্তিতে মাল দিয়া থাকে, যে, অবিক্রীত জিনিষপত্রগুলি উহারা পুনরায় ফেরৎ লইবে। এই ধরণের সর্ত্তে একটী সময় নির্দ্দিষ্ট করা থাকে এবং তাহার মধ্যেই সমস্ত লেন-দেন নিষ্পত্তি করিতে হয়। যদি ক্রেতা এরূপ স্থলে মাল ফেরৎ পাঠায়, ফার্ম্ম সেই প্রেরিত জিনিষ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে। পাঠাইবার খরচও তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে।

এই সঙ্গে আমি একটী সতর্ক বাণী উচ্চারণ না করিয়া পারিতেছি না। অনেক নূতন ব্যবসায়ী কোন মরশুমের প্রাক্কালে সুবিধা দর পাইয়া ফার্ম্ম হইতে ঢের বেশী মাল ক্রয় করিয়া থাকেন। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করা থাকে, যাহার মধ্যে দাম পরিশোধ করিতে হয়। ক্রেতা সুবিধার কুহকে পড়িয়া অনেক জিনিষ কিনিয়া শেষে উহা বাজারে কাটাইতে পারেন না; তাঁহাকে শেষকালে আপ্‌শোষ করিতে হয়। এমন করিয়া কত ব্যবসা যে ফেল পড়িয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই। ফ্যান্সী জিনিষের ব্যবসা সাধারণতঃ শীতকালেই ভাল জমিয়া থাকে। কাজেই শরৎকালের আরম্ভ হইতেই নানা প্রকার সার্কুলার আসিতে থাকে, নানান সুবিধার প্রলোভন দেখাইয়া। খরিদ্দার তখন হইতেই কিনিতে আরম্ভ করেন; এবং এইরূপে গুদামে প্রচুর মাল জমিয়া যাইতে থাকে, অথচ উহা বাজারে কাটাবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতে থাকে। কাজেই ক্রেতাকে খ্রীষ্ট মাসের বাজার শেষে ব্যবসার জন্যে মালের বরাত সম্মুখ বৎসরের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। ভবিষ্যতের তারিখ দিয়া এইরূপে মাল কেনা অত্যন্ত বিপজ্জনক; কাজেই আমরা গোড়াতেই একটু মুখবন্ধ করিয়া লইলাম।

যদি প্রয়োজনীয় মালকে গুদাম হইতে

সহজে বাহির করা না যায়, তাহা হইলে ষ্টক্ বেশী থাকা না থাকায় কিছু আসে যায় না। এই জন্যই সমস্ত জিনিষকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে। সঠিক জায়গার খবর কেবলমাত্র ব্যবসায়ী নিজে রাখিবেন না, পরন্তু তাঁহার সহকর্ম্মীগণকেও জানাইতে হইবে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, খরিদ্দার আসিয়া হয়ত একটী জিনিষ চাহিলেন, কিন্তু তাহা হাতের কাছে হাতড়াইয়া না পাইয়া দোকানী কিংবা তাহার কর্ম্মচারী বলিয়া দিলেন যে জিনিষটী নাই। পরে জিনিষ পত্রাদি নাড়া চাড়া করিবার সময় দেখা গেল যে সেই জিনিষটাই এক কোনে প্রচুর রহিয়া গিয়াছে। জিনিষ পত্রাদি কোথায় কি আছে তাহা দোকানের সকলের জানা না থাকিলে এইরূপে মাল থাকিতেও খরিদ্দার ফিরিয়া যায় এবং দোকানের লোকসান হয়।

দোকান সজ্জা আজকাল একটা বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে; গ্লাসকেস, ড্রয়ার প্রভৃতি থাকার জন্য কাজের অনেক সুবিধাও হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত জিনিষপত্র গ্লাস-কেসের মধ্যে রাখা যায় না, তাহাদিগকে পার্শ্বেল কিংবা বাক্সবন্দী করিয়া সেল্‌ফে গুছাইয়া রাখিতে হয়। সেল্‌ফ্ খুব উঁচু হইলে আবার বিপদও হয়; অনেক সময় উহার কথা মনে থাকে না, হাতের কাছেও থাকে না। কাজেই অনেক জিনিষ বিক্রয়ের সুবিধা অজ্ঞাতসারে চলিয়া যায়। আজকাল মফঃস্বলে যদিও "Day light" প্রভৃতি উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি এই সকল আলোতে কেরোসিন ব্যবহার হয় বলিয়া তাহার ধোঁয়ায় মূল্যবান দ্রব্যাদির বর্ণ একদম খারাপ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে এই সকল জিনিষ বাক্সবন্দী করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ; তাহা সম্ভবপর না হইলে জিনিষগুলিকে ভাল করিয়া মুড়িয়া রাখিতে হইবে। ছোট পার্শ্বেল হইলে উহাকে পুরু কাগজেই প্যাক্ করিয়া রাখা চলে, একটু বড় হইলে ক্যান্‌ভাস কিংবা অনুরূপ আচ্ছাদনে আবৃত করিতে হয়। উহা এরূপভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলেই উহাকে খোলা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, উহার গায়ে জিনিষের নাম ও খুচ্‌রা দাম লিখিয়া রাখিতে হইবে। ভালরূপে প্যাক্ না করার জন্য ব্যবসায়ীর যে কত ক্ষতি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেক জিনিষ ধূলো এবং উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়, অনেক জিনিষ আবার খেঁতো হইয়াও যায়। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ-সম্বন্ধে ধারণা আরও পরিস্কার হইয়া আসিবে।

একটী ডাষ্টার বা সম্মার্জ্জনী যেন সর্ব্বদাই নিকটে থাকে; সেল্‌ফ হইতে জিনিষ নামাইলে উহা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লইতে হইবে। দোকান যতই পরিস্কার হউক না কেন, পার্শ্বেল ২।১ ঘণ্টা এক জায়গায় পড়িয়া থাকিলে উহার উপরে ময়লার স্তর জমিয়া যায়। পরিস্কার করিবার সময় খরিদ্দার যেন নিকটে না থাকে। কেননা, ইহাতে তাঁহার ধারণা জন্মিতে পারে যে জিনিষগুলি পুরাতন কিংবা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ধূলা উড়িয়া গিয়া খরিদ্দারের গায়ে লাগিলে তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা। একটু অভ্যাস করিলেই ডাষ্টারকে জিনিষের উপর দিয়া মৃদুভাবে বুলাইয়া লইয়া উহাকে পরিস্কার করিতে পারা যায়। নিঃশব্দে এই কাজ সম্পন্ন হইলে খরিদ্দার উহা লক্ষ্যও করিবেন না।

প্রত্যেক পার্শ্বেল পুনরায় প্যাক্ করা হইয়া গেলে উহাকে স্বকীয় স্থানে রাখিতে হইবে, নতুবা আবার সব গোলমাল হইয়া যাইবে। দিনের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সেল্‌ফ্ এবং প্যাকেজগুলি পরিস্কার করিয়া রাখা উচিত।

গুদামের মাল প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া গুছাইয়া রাখিতে হইবে। একটা গল্প আছে যে, গুদাম সাফ্ করিতে গিয়া হার্কিউলিস্‌কেও নাকি গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। আমরা অনেক গুদাম ঠিক এই ধরণেরই দেখিয়াছি। প্রত্যেক জিনিষের জন্য জায়গা রাখিবে এবং উহাকে সঠিক স্থানে বসাইবে। রাত্রিতে ঘর পরিস্কার করিবার সময় সমস্ত জিনিষের উপর একটী ক্যান্‌ভাসের আচ্ছাদন বিছাইয়া দিতে হইবে।

কাউণ্টার (Counter) এবং মেঝে যাহাতে সর্ব্বদা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকে সেদিকে নজর রাখিবে। সমস্ত জায়গা যদি অগোছালো জিনিষপত্রে ভর্‌তি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা বিরক্তি উৎপাদন করিবে। নূতন মাল আসিলেও বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া উহাকে গুদামে পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। যদি দোকানে ঢুকিবার চতুষ্পার্শ্বে খড়, শূন্য বাক্স প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাদের প্রবেশ পথে যে কতদূর বাধা হয়, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। সাধারণ খরিদ্দার এরূপ অগোছালো দোকান পশ্চাতে ফেলিয়া পরিস্কৃত ফিট্‌ফাট্ দোকানই বাছিয়া লইয়া থাকেন।

অনেক সময় কাউণ্টারের গ্লাসকেসে যে সমস্ত ফ্যান্সী দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকে, তাহা খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। যখন তাহার প্রার্থনানুরূপ জিনিষ আনিবার জন্য সহকারী চলিয়া যায়, তখন এই সমস্ত জিনিষের কুহকই অনেক সময় খরিদ্দারকে মুগ্ধ করিয়া থাকে এবং তাহাকে ক্রয় করিবার জন্য প্রলুব্ধ করে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে কাজের হিড়িকের সময় কাউণ্টার পরিস্কার থাকাই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে খরিদ্দার সুসজ্জিত অবস্থায় সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিতে পারেন এবং মনে মনে তুলনামূলক আলোচনা করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে অনেক সময় বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়।

ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন

শ্রীসুরথ কুমার সরকার

ব্যবসায় জগৎ বর্ত্তমানে এতই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পূর্ণ যে বিজ্ঞাপন ব্যতীত ব্যবসায়ক্ষেত্রে সম্যক্ লাভবান হওয়া কিংবা আশানুরূপ উন্নতিলাভ করা অসম্ভব। ব্যবসায়ী মাত্রেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন বিশেষভাবে বুঝেন এবং ইহাও জানেন যে ব্যবসায়ক্ষেত্রে যে দুইটী মোটা ব্যয় লাভের অঙ্ক শুষিয়া ছোট করিয়া দেয় তাহাদের একটীর নাম Establishment ও অপরটী Advertisement. Establishment ব্যবসায় পরিচালনায় একেবারেই অত্যাজ্য; Advertisement ইচ্ছানুসারে কম বা বেশী করা যাইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপন একেবারেই বন্ধ করিলে খরিদ্দারের ভিড়ও প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে, অথচ খরিদ্দারই ব্যবসায়ীর একমাত্র কাম্য। কারণ, ব্যবসায়ে লাভ হয় ক্রেতার নিকট মাল বেচিয়া, অন্যত্র হইতে নহে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বাহির হইয়া যায় তাহার অনুপাতে ক্রেতার দর্শন না মিলিলে বিজ্ঞাপনের ব্যয়কে অপব্যয় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনকে আমরা ক্যাটালগ, পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল, প্রেস (দৈনিক ও সাময়িক পত্র) এবং যানবাহিত, মোটামুটি এই পাঁচভাগে ভাগ করিতে পারি। ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসায়ের পক্ষে উহাদের কোন্ দিক দিয়া কত টাকা ব্যয় করা সুবিধাজনক মনে করেন প্রথমেই তাহার একটা খসড়া হিসাব প্রস্তুত করিবেন। কারণ, বিজ্ঞাপনের আকার প্রকার তাঁহার এই ব্যয়ের ফিরিস্তির সহিত তাল রাখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্য ক্রেতা আকর্ষণ এবং বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের চাহিদার সৃষ্টি করা। বিজ্ঞাপনের ভাষা, ভঙ্গী, চিত্র প্রভৃতির উপরে ইহা যথেষ্ট নির্ভর করে।

বিজ্ঞাপনের ভাষা সাধারণ লিখিত ভাষা হইলে যেমন সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়, গ্রাম্য বা সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা তেমন কার্য্যকরী হয় না। বিজ্ঞাপন লিখিবার সময় প্রথমেই এমন দুইচারিটী শব্দ ব্যবহার করা উচিত যাহাতে সকলেই বিজ্ঞাপনদাতার পণ্যের শ্রেষ্ঠতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারেন।

স্থানভেদে বিজ্ঞাপন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। যেখানে বেশী কথা পড়িবার ধৈর্য্য নাই সেখানে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দেওয়া যেমন অযথা অপব্যয়, ক্যাটালগ বা হ্যাণ্ডবিল সেইরূপ তিন কথায় শেষ করিলে প্রায় একই ফল পাওয়া যায়। মূলকথা, বিজ্ঞাপনদাতার পণ্য বাজারের তত্তুল্য দ্রব্যের অপেক্ষা কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা ক্ষেত্রবিশেষে অল্প বা অধিক কথায়, অথবা কথা ও চিত্রসহ পাঠকের মনে গাঁথিয়া দিলে সুফল পাওয়া যায়।

দেখা গিয়াছে, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের দেনায় অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী ডুবিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথচ সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপন তাহার ব্যয়ের আঠারগুণ পর্য্যন্ত টাকা সাধারণের পকেট হইতে ব্যবসায়ীর ঘরে আনিয়া দিতে পারে।

ব্যবসায়ী মাত্রেরই নিজস্ব ক্যাটালগ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই ক্যাটালগ্‌খানি গঠন পারিপাট্যে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাঁহার নিকটে ইহার একখানি প্রেরিত হইবে তিনি—অন্য কারণে না হইলেও—কেবলমাত্র ইহার গঠন পারিপাট্যের জন্যও ইহাকে সযত্নে তুলিয়া রাখিবেন, দুধ গরম করিয়া বা উনুন ধরাইয়া নষ্ট করিবেন না, অবসরকালে ইহা পাঠ করিবেন। দুঃখের বিষয়, এদেশীয় ফার্ম্মের যত ক্যাটালগ বা তজ্জাতীয় যাহা কিছু আমরা পাই, তাহার অধিকাংশের চেহারা দেখিয়াই আমরা সেগুলিকে Waste-paper basketএ নিক্ষেপ

করিতে ইতস্ততঃ করি না। ইহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি এত প্রবল যে ১২ পাউণ্ড ডবল ক্রাউন ঘেষো কাগজে নাক-কাণ ভাঙ্গা টাইপ ও ভুষো কালিতে ছাপা, ভ্রম পরিপূর্ণ কাটালগ ইঁহারা সর্ব্বত্রই প্রেরণ করেন, যেন এই অপরূপ একখানি কেতাবের জন্য ভদ্রসাধারণ উন্মুখ হইয়াছিলেন—সিভিললিষ্ট ও Thacker's Directory দেখিয়া বিতরণ করিতে যা কিছু বিলম্ব।

তৎপরে ক্যাটালগের ভাষা! এদেশীয় ব্যবসায়ীর বাঙ্গলা, ইংরাজী ও হিন্দী ইত্যাদিতে প্রকাশিত অধিকাংশ ক্যাটালগের ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর নমুনার একটী প্রদর্শনী করিলে তাহা সাহিত্যামোদীগণের দেখিবার মত জিনিষ হয় বটে।—ক্যাটালগ্ প্রচারের উদ্দেশ্য ক্রেতাকে বিক্রেতার পণ্যের উৎকর্ষ বুঝাইয়া দেওয়া—তাঁহাকে বিক্রেতার পণ্যশালায় প্রত্যক্ষভাবে বিক্রেতার স্বার্থরক্ষার জন্যই আমন্ত্রণ নহে। ক্যাটালগের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এরূপ হইবে, যাহাতে যে কোনও ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে বর্ণিত দ্রব্যের মধ্যে সকলগুলি না হইলেও কোনও-না-কোন গুলির অভাব তাঁহার আছে এবং তাহা পাওয়া তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ক্যাটালগ ক্রেতাকে উপদেশ দিবে এবং ক্রেতার ইচ্ছাকে পরোক্ষভাবে বিক্রেতার পণ্যের দিকে আকর্ষণ করিবে—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে 'আমায় কেন', 'আমায় কেন' বলিবে না বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি কোনও প্রকার কটাক্ষ করিবে না।

বিক্রেতা তাঁহার যে সকল পণ্য বাজারে বিশেষভাবে চালু করিতে চাহেন সেগুলির প্রতি রুচিসম্মত ব্লক ও চিত্রাদির সাহায্যে পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করাইতে পারেন। কিন্তু কালীর রংএর সমতা যাহাতে রক্ষা পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। একসঙ্গে Deepface ও Lightface টাইপ চক্ষুর পীড়াদায়ক ও বর্ণিত বিষয় অপাঠ্য করিয়া তোলে—পুস্তকেরও সৌন্দর্য্য হানি হয়। অথচ অনেক ব্যবসায়ীই তাঁহাদের ক্যাটালগে Deepface ও Lightface টাইপ এমন অসামঞ্জস্যভাবে সাজাইয়া থাকেন যে সেই ক্যাটালগের বিজ্ঞাপন হিসাবে মূল্য অনেক কমিয়া যায়।

পোষ্টারকে বিজ্ঞাপন না বলিয়া "বিশেষ প্রচার" বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ ইহা দুই চারিটী কথার সাহায্যে কোনও একটী পণ্যকে বিশেষরূপে প্রচার করে মাত্র। যেমন, "স্নানের আনন্দ জবাকুসুমে" বা "আসল দুটো জিনিষ সাম্‌লে' নিয়েছি—চন্দ্রকান্তি ও পুষ্পরাজ" —আর তাহার সঙ্গে বেশ বড় ও চিত্তাকর্ষী একখানি বহুবর্ণ চিত্র। চিত্রখানি যখনই স্মৃতিপথে উদিত হয় তখনই উহার আনুসঙ্গিক কথা কয়টীও মনে পড়ে। এই জাতীয় বিজ্ঞাপন পণ্যের মান বাজারে প্রচার করিবার পক্ষে খুবই কার্য্যকরী হয়। ইহারা কেবল "জবাকুসুম," "পুষ্পরাজ" বা 'চন্দ্রকান্তি' নামটীই প্রচার করিতেছে। পূর্ব্বে বহুবার বিজ্ঞাপন দেওয়ায় "জবাকুসুম" ও "পুষ্পরাজ" যে মাথায় মাখিবার তৈল—খাদ্যদ্রব্য নহে—এবং "চন্দ্রকান্তি" একটী স্নো—কাব্যগ্রন্থ নহে, তাহা সাধারণে জানে। এখন তাহাদের স্মৃতিতে কেবল ইহাদের নাম জাগাইয়া রাখা এবং ইহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয়তার সৃষ্টি করাই আবশ্যক। সচিত্র পোষ্টারের সাহায্যে ইহা যতদূর সম্ভব ততদূর অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে। কিন্তু, ধরুন Tazu Co. নামে কোনও একটী নূতন কোম্পানী তাহাদের

নবাবিষ্কৃত এসেন্সের নাম কেবলমাত্র পোষ্টারের সাহায্যে বাজারে প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে এই কোম্পানীর বিক্রয় বিজ্ঞাপনের অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না। কারণ, পোষ্টারের ভিত্তি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের উপরে গঠিত হইয়া থাকে। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে পণ্যের সহিত পরিচিত করিবার পরে অন্ততঃ সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টারে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপিত পণ্য সম্বন্ধে সাধারণের যে অনুকূল মতের সৃষ্টি হয়, কেবল মাত্র পোষ্টারের সাহায্যে তাহা হইতে পারে না।

যদিও পোষ্টার বিজ্ঞাপনীতে বিষয়বস্তুর পার্থক্য চিরদিনই হইবে তাহা হইলেও উহা প্রস্তুত করিবার পদ্ধতির মধ্যে কোনও রকমফের নাই। ইহার বক্তব্য বিষয়টী এত সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন যে উহা এক নিমেষে পড়িয়া ফেলা যায়। কারণ, পোষ্টার পথচলতি লোকের জন্য, যাহাদের বিজ্ঞাপন পড়িবার সময় নাই তাহাদের জন্য—যাহারা পড়িতে জানে না বা
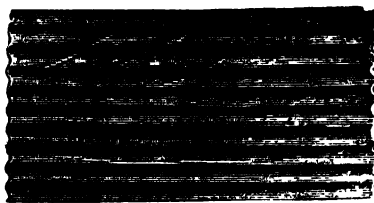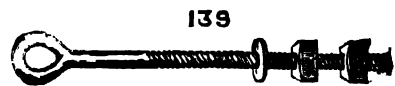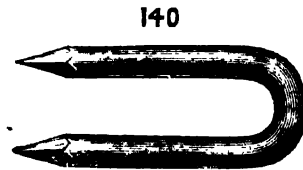
অত্যল্প শিক্ষিত তাহাদের জন্য নহে। বিজ্ঞাপিত বিষয়কে ছাড়িয়া পাঠকের মন যাহাতে অন্যত্র না যায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং উহার ভাব ও প্রকাশভঙ্গী যত স্পষ্ট হয় ততই ভাল।

পণ্যদ্রব্য সুপরিচিত হইলে চিত্রের সহিত উহার নামটী মাত্র দিলেই চলিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের চিত্রও তদনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। চিত্র মনোমদ হইলেই যে বিজ্ঞাপনে কাজ হইবে তাহা নহে। যদি সেই চিত্রের সহিত পণ্যদ্রব্যের কোন কথাই দর্শকের মনে উদিত না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের ব্যয় ও পরিশ্রম বৃথা হইবে। ধরুন, Glaxoর খোকা বা Horlicks এর বোতল-বাহন খোকার ছবি। এই হৃষ্টপুষ্ট খোকার ছবি দেখিলেই কোলে লইতে ইচ্ছা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় নিজের শিশুদিগকে কি করিয়া এইরূপ হৃষ্টপুষ্ট করা যায়। ইতিমধ্যেই চোখে পড়ে "Glaxo" বা "Horlicks" নামটী, যাহা শিশু ও রুগ্নের খাদ্য বলিয়া সকলের নিকটেই সুপরিচিত। ফলে, ওই খোকার ছবিটী Glaxo বা Horlick's কিনিবার জন্য দর্শকের মনকে যথেষ্ট প্ররোচনা দেওয়ার অবসর পায় এবং দর্শকও ভবিষ্যতে তাঁহার শিশুকে স্বাস্থ্যবান করিবার বাসনায় যখন কোনও শিশুর খাদ্য ক্রয় করিবেন, তখন তিনি Glaxo বা Horlick's বাদ দিয়া অন্য অন্য কোম্পানীর তজ্জাতীয় পণ্য যাচাই করিতে যাইবেন না। কারণ, ওই শিশুর ছবিটীই এ বিষয়ে তাঁহার প্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়াছে, আর ওই ছবির সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে "Glaxo" বা "Horlick's" নামটী।

প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পোষ্টারেই তাঁহার বিশেষত্ব প্রকাশ পাওয়া উচিত। কিন্তু এই বিশেষত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া অনেকেই অন্য কোনও বিষয়ে বিবেচনা না করিয়া কেবল মাত্র ভাল ছবি প্রকাশের দিকে ঝোঁক দেন বেশী। এইজন্য তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী অনেক অংশেই বিফল হইতে দেখা যায়। ছবির ভালমন্দ সাধারণতঃ ব্যবসায়ের কর্ত্তৃপক্ষের পছন্দের উপরে নির্ভর করে। আর তাহারই ফলে আর্টিষ্ট যে ছবিখানা "কার এ্যাণ্ড মহলানবিশের" টেনিসের বিজ্ঞাপনের জন্য আঁকিলেন, তাহা তাঁহাদের পছন্দ না হইলে তিনি পাঁচ যায়গা ঘুরিয়া অবশেষে হয়তো "নরসিংহ চন্দ্র দাঁ কোম্পানীর" নিকটে বিক্রয় করিবেন। ধরা গেল, নরসিংহ চন্দ্র দাঁ কোম্পানী ওই ছবিখানা দেখিতে সুন্দর বলিয়া ক্রয় করিলেন ও এক্ষণে উহা তাঁহাদের বন্দুকের পোষ্টার বিজ্ঞাপনীতে ব্যবহার করিতেছেন। ফলে দেখা যাইবে এই বিজ্ঞাপন তাঁহাদের পক্ষে ততদূর লাভজনক হয় নাই। কারণ এইবারের বিজ্ঞাপনের চিত্রখানি তাঁহাদের এতদিনের বিশেষত্বপূর্ণ বিজ্ঞাপনের সঙ্গে খাপ খায় না। এই চিত্রে তাঁহাদের এতদিনের বিশেষত্বটুকু হারাইয়াছেন, আর তাহারই ফলে সাধারণের মনের উপরে ইহার দাগ পড়িবার পূর্ব্বেই তাহারা বিজ্ঞাপনের স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইবে, অথবা চিত্রখানি চোখে পড়িলেও চিত্রপ্রদাতার নাম চোখে পড়িবার সময় হইবে না। পথচলতি লোকের মনের উপরে একদিনের একখানি মাত্র পোষ্টারে বিশেষ কোনও কাজ করিতে পারে না। একই ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন প্রত্যহ চোখে পড়িলে তবেই তাহা মনের উপরে প্রভাব বিস্তার

করিতে পার। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একঘেয়েমি নষ্ট করিবার জন্য চিত্রের রকমফের হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। অথচ সকল চিত্রের মধ্যেই এমন একটী বিশেষ ভঙ্গিমার প্রকাশ থাকিবে, যাহাতে এই চিত্রের সিরিজ যে একই ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাহা সাধারণে অভ্যস্ত চক্ষুর দৃষ্টি দ্বারাই বুঝিতে পারে।

চিত্রে নিজেদের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে যখন যে আর্টিষ্টকে পাওয়া গেল তাহাকে দিয়াই একখানি ছবি আঁকাইয়া লইলাম, এরূপ করিলে উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক আর্টিষ্ট তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে ছবি আঁকিয়া থাকেন এবং একজনের বৈশিষ্ট্য অপরের চিত্রের মধ্যে আসিতে পারে না। হেমেন মজুমদারের চিত্রের বর্ণসম্পাত, বিনয় বসুর চিত্রে পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, বিনয় বসুর চিত্রের expression বা ভঙ্গিমাও তেমনি হেমেন মজুমদারের নিকটে আশা করা আমাদের উচিত হইবে না। এই কারণেই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিজস্ব আর্টিষ্ট থাকা বিশেষ আবশ্যক। এ বিষয়ে একানুরক্তি কখনই ক্ষতিকর হয় না।

আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যে নারীচিত্র প্রীতি যেন অতিরিক্ত পরিমাণে দেখা যাইতেছে। তাই কলিকাতার পথে বাহির হইলেই দেখিতে পাই—সাবানের বিজ্ঞাপনেও নারীর চিত্র, জুতার বিজ্ঞাপনেও নারীর চিত্র, কিছুদিন পূর্ব্বে একজিমার ঔষধের একটী পোষ্টার বিজ্ঞাপনী দেখিয়াছিলাম—তাহাতেও নারীর চিত্র! যেন নারীচিত্র ব্যতীত পোষ্টারবিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিলে ব্যবসায়ীর অর্থ জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। স্বীকার করি নারীচিত্রের একটা আকর্ষণ আছে; কিন্তু সাধারণের সেই আকর্ষণের মূল্য ব্যবসায়ীর নিকটে কতটুকু, সে বিষয়ে ব্যবসায়ী মাত্রেরই বিবেচনা করা উচিত। পোষ্টারের চিত্র কেবলমাত্র সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সেই চিত্র তাহাদের মনের উপরে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের জন্য একটা প্রয়োজনের সৃষ্টি করিবে। অন্যথায় সেই চিত্রের মূল্য বিশেষ কিছুই নহে। সুতরাং পোষ্টার-বিজ্ঞাপনীতে সর্ব্বত্রই যে নারীচিত্র দেওয়ার প্রয়োজন আছে এরূপ মনে হয় না। ইহাতে নারী, পুরুষ, বালক বা শিশুর চিত্রও যেরূপ কার্য্যোপযোগী হইতে পারে, একটী ক্যাঙারু, কি গণ্ডার, অথবা একটী ফুলের সাজি বা একগোছা রুমালের ছবিও ঠিক সেইরূপ কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। অঙ্কণ অনুসারে চিত্র গম্ভীর ভাবাশ্রিত অথবা হাস্যরসাশ্রিতও হইতে পারে। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে চিত্রের বস্তু বা ভাবে কিছু যায় আসে না। "হিমানীর" উড়িয়া ঠাকুরের ছবি হাস্যরস উদ্রেক করিলেও উহার বেশ মূল্য আছে।

ঠিকভাবে নিজেদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া পোষ্টার প্রস্তুত করাইতে পারিলে তাহার দ্বারা যে কতদূর লাভবান হওয়া যাইতে পারে তাহা ধারণাতীত। কোথায় কতকগুলি কাল কাল সীসার হরফের বিজ্ঞাপন—যাহার সৌন্দর্য্য কেবল কতকগুলি সমান্তরাল রেখায়, আর কোথায় বহুবর্ণে সুচিত্রিত ও অল্প অক্ষর এবং সুমার্জ্জিত ভাষায় গ্রথিত পোষ্টারবিজ্ঞাপনী! পোষ্টারের বিজ্ঞাপন যত অল্প সময়ে স্পষ্টভাবে কার্য্যকর হয়, অন্য কোনও উপায়েই ততটা হওয়া সম্ভব নহে।

হ্যাণ্ডবিল বিলি করিবার যে ব্যবস্থা সম্প্রতি

আমাদের দেশে চলিতেছে তাহা থিয়েটার ও বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন প্রচারের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও অন্যব্যবসায়ীর পক্ষে এই পদ্ধতি সম্যক্ লাভজনক নহে। কারণ, থিয়েটার ও বায়োস্কোপের হ্যাণ্ডবিলে বিষয় ও কোম্পানীর নামটী সাধারণের চোখে পড়িলেই যথেষ্ট; আর সেটুকু পড়েও। তাহার পরে যাঁহার প্রয়োজন বা আগ্রহ থাকে তিনি উহার সবটুকুই পড়েন, আর যিনি প্রয়োজন বোধ করেন না তিনি উহাকে ফুটপাথেই নিক্ষেপ করেন। আর যাহারা একটু হিসাবী তাঁহারা পড়ুন বা না পড়ুন, হ্যাণ্ডবিল পাইলেই পকেটস্থ করেন ও ক্ষৌরকার্য্যের সময়ে তাহা দাড়ি মুছিতে বা তজ্জাতীয় অন্য কোনও কার্য্যে ব্যবহার করেন। হ্যাণ্ডবিল এইরূপে যদি সাধারণের কাজেও লাগে, তাহা হইলেও ইহাকে হ্যাণ্ডবিলের দুর্দ্দশা ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। কারণ, ব্যবসায়ী উহাতে যাহা লিখিলেন তাহা যদি অপঠিতই থাকিয়া গেল, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর কোনও লাভই হইল না। কিন্তু উপায় নাই—সাধারণের স্বভাবই এই। ফলে এইরূপ হ্যাণ্ডবিল প্রচার দ্বারা সাধারণ ব্যবসায়ী বিশেষ লাভবান হইতে পারেন না। তবে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে পারিলে সাধারণে নিশ্চয়ই তাহা হাতে পাইবা মাত্র ফুটপাথে ফেলিয়া দেয় না, অথবা দাড়ি মুছিতে ব্যবহার করে না। প্রথমতঃ হ্যাণ্ডবিলের কাগজ ও ছাপা প্রথম শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক। তৎপরে সকলের চেয়ে বড় কথা, বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যাহাই ছাপি না কেন তাহার সহিত সাধারণের প্রয়োজনীয় কিছু থাকা চাই। ব্লটিং পেপারে বিজ্ঞাপন এইজন্যই অধিক কার্য্যকরী হইয়া থাকে। "রেডিয়াম স্নো"র একখানি হ্যাণ্ডবিলের এক পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের একটী গান ও অপর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছিল। কেবলমাত্র একখানি গানের জন্যই উহার শতকরা ৯৫ খানিই অনেকের পকেটে বা টেবিলে স্থান পাইয়াছিল—ফুটপাথ আশ্রয় করে নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। I. F. A. র Tie-sheet কখনও ফুটপাথে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না; কিন্তু উহারও আষ্টেপৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন ভর্ত্তি থাকে এবং ইহা ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃকই প্রকাশিত হইয়া বিতরিত হয়।

দুই এক পৃষ্ঠা ছাপা জিনিষ যখন ডাকে পাঠাইবার আবশ্যক হয় তখন তাহা Printed matter rate বা Book-Postএ না পাঠাইয়া বন্ধ খামে চিঠি করিয়া পাঠাইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু Book-Postএ প্রেরিত এই জাতীয় বিজ্ঞাপন সাধারণ হ্যাণ্ডবিলের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া wastepaper basketএ আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপনীপত্র এই কারণেই পত্রের ন্যায় বন্ধ লেফাফায় প্রেরণ করা সঙ্গত।

বিজ্ঞাপনীপত্র (Advertising and Circular letters) হাতের লেখার অনুরূপ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিতে পারিলে তাহাতে যতদূর কাজ পাইবার আশা করা যায়, তাহা ছাপার অক্ষরের বিজ্ঞাপনী পত্রের অপেক্ষা অনেক অধিক।—পত্র ছাপার অক্ষর, টাইপ, অথবা হাতের লেখার অনুরূপ লেখা (Script Types বা Script Block) যে রূপেই ছাপা হউক না কেন, উহার নামসহিটী নিজহাতে করিতে পারিলে যেরূপ কার্য্যকরী হয়, ছাপার অক্ষরের

নামে সেরূপ হয় না, ইহা ব্যবসায়ী মাত্রেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হাতে নামসহি করা সম্ভব না হইলে নামসহির একখানি ব্লক প্রস্তুত করাইয়া উহা চিঠির উপরে ভিন্ন কালীতে ছাপাইয়া লইলেও সাধারণ ছাপানো নামের চিঠি অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী হইবে। ছাপানো চিঠি বলিয়া নাম সহিটীও সীসার হরফে ছাপাইয়া লইলে সেই ছাপানো চিঠির মূল্য বিশেষ কিছু থাকে না।

বর্ত্তমান জগতের সংবাদপত্র পরিচালনা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের জীবন। বিজ্ঞাপন ব্যতীত আমরা কখনই দুই পয়সায় "আনন্দ-বাজার" বা "বঙ্গবাণীর" ন্যায় সংবাদপত্র পাইবার আশা করিতে পারিতাম না। আবার, সংবাদপত্রের বহুল প্রচারের জন্য ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই তাঁহার পণ্য বিক্রয়ের বহুপ্রকার সুবিধা করিতে পারিতেছেন। "সংবাদপত্র" বলিতে কেবল ইহাই বোঝায় না যে উহাতে দৈনন্দিন রাজ-নৈতিক ও সামাজিক সংবাদ মাত্রই থাকিবে, পরন্তু, উহা দৈনন্দিন ব্যবসায়ের সংবাদই অধিক পরিমাণে বহন করিয়া থাকে। বিজ্ঞাপনকে আমরা ব্যবসায়ের দৈনিক সংবাদ ছাড়া আর কিছু বলিতে পারি না। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠায় আমরা সেই দিনের ব্যবসায়ের সংবাদ এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পক্ষে অনেক নূতনত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক পণ্যের সংবাদ পাইয়া থাকি।

নিত্য প্রয়োজনীয় এমন অনেক পণ্য আছে যাহাদের বিজ্ঞাপন দৈনিক সংবাদপত্রে দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। অন্যান্য পণ্য সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায় যে দৈনিক কাগজে সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপন দিয়া বিজ্ঞাপনদাতাকে কখনও ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে দেখা যায় নাই। কারণ, যাঁহারা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁহাদের সংখ্যা মোটের উপরে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা-পাঠীর সংখ্যা হইতে অনেক বেশী এবং অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিজ্ঞাপন ও সংবাদ একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি থাকে বলিয়া বিজ্ঞাপন বাদ দিয়া সংবাদ পাঠ করা একেবারেই অসম্ভব। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপনটী পাঠ না করিলেও তাহার প্রধান কথাগুলি (যাহা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত বড় হরফে ছাপা হয়) সকলেরই চোখে পড়িবে। সংবাদপত্র পাঠের সময় প্রাতঃকাল বলিয়া সেই সময়ে সকলেরই মনের অবস্থা বেশ শান্ত থাকে। মনের এই শান্ত অবস্থায় যাহা চোখে পড়ে তাহা লইয়া ভাবিবার যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, ব্যস্ততার মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সময়ে বিজ্ঞাপনের একটী অংশমাত্র চোখে পড়িলেও তাহা মনের উপরে বেশ একটু প্রভাব বিস্তার করে। তাহার ফলে সর্ব্বসাধারণ বিজ্ঞাপনদাতা ও তাহার পণ্যের সহিত সংবাদ-পত্রের মারফতে পরিচিত হয় এবং নেপথ্য পরিচয় পরে অনেক ক্ষেত্রেই আদানপ্রদানে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

(পরবর্ত্তী মাসে সমাপ্য)
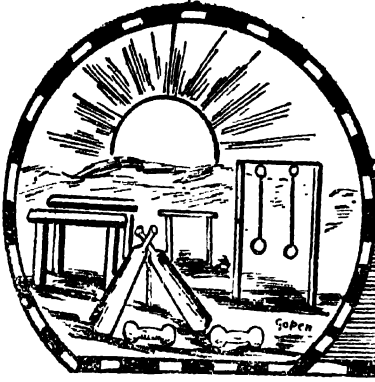
কলেরা ও বসন্তের কথা

(১)

একমাত্র আমাদের বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর কলেরা ও বসন্ত রোগে কত শত লোক মরিতেছে তাহার খবর আমরা কম লোকেই রাখি।

"It is probable that from remotest antiquity cholera has been endemic in Lower Bengal, and has from time to time spread as an epidemic over the rest of India." (Manson Bahr. Tropical disease. Page 341).

Dr. Manson কলেরা সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করিয়াই উপরোক্ত এই কয়টি ছত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই সকলে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের উপর এই নিদারুণ ব্যাধির অহেতুকী কৃপার কথা সহজে অনুমান করিতে পারেন।—ইচ্ছা করিলে এই বিভীষিকাময়ী ব্যাধির মৃত্যুসংখ্যা যে কত হ্রাস করা যায় তাহাও আমরা সকলে জানি না। অন্যান্য ব্যারাম ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র কলেরার মৃত্যুসংখ্যা জানিলে এবং কলেরার প্রকোপে এক একটী পরিবারের শোচনীয় পরিণাম দেখিলে আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিব এবং চোখের জল সংবরণ করিতে পারিব না। অথচ ইচ্ছা করিলে এই সর্ব্বনাশের হাত হইতে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেক অংশেই রক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু এই সর্ব্বনাশের মূল প্রথম আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্য,—দ্বিতীয় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের ঔদাসীন্য।

প্রথম আমাদের নিজেদের ঔদাসীন্য এই যে, কোন স্থানে কলেরা আরম্ভ বা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইলে (১) আমরা নিজেরা যথোপযুক্ত প্রতিষেধক চিকিৎসা নিতে জানি না (২) নেই না বা (৩) নেওয়ার বন্দোবস্ত হয় না; এবং সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের যিনি কর্ত্তা অর্থাৎ হেলথ্ অফিসার তাঁহাকে সকল সময় ব্যারামের বিষয় জানান হয় না।

দ্বিতীয়—সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তার ঔদাসীন্য (১) সকল জায়গায় সকল সময় তাঁহাদের পরিদর্শন সম্ভব হইয়া উঠে না; হইলেও,

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে জনসাধারণের মধ্যে রোগ প্রকাশ পাইবে না এবং রোগ প্রকাশ পাইলেই বা কি করা উচিত, স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে তেমন কোন প্রকার পুস্তিকা বা বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জনসাধারণকে জানান হয় না; (২) এবং কোন কোন স্থলে চিকিৎসক প্রেরিত হইলেও অতি প্রয়োজনীয় ঔষধাদি বা যন্ত্রপাতি সকল সময় তাঁহার সঙ্গে থাকে না, কাজেই রোগী যথোপযুক্ত চিকিৎসা পায় না।

কিন্তু জনসাধারণ এবং সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের সহায়তায় এবং সহযোগিতায় সকল জায়গায় এই মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস এমন কি একদিন এই রোগের সমূলে বিনাশ সাধন করা শুধু কল্পনা নাও হইতে পারে।

আমাদের দেশের লোক শুনিলে অবাক হইবেন যে মালয় দেশে 'কলেরা' নাই। 'নাই' বলিলেই যে মনে করিবেন এখানে কলেরা কখনও দেখা যায় না তাহা নহে—খুব ক্বচিৎ—এত কম যে কখনও দেখা যায় না বলিলেই হয়। স্থানান্তর হইতে এখানে যে সকল যাত্রীবাহী জাহাজ পিনাং, সিঙ্গাপুর বা অন্যকোন বন্দরে নঙ্গর করে, প্রয়োজন বোধে

সে সকল যাত্রীকে 'কুয়েরান্টীনে' (quarantine) রাখা হয়, কাজেই বহির্দ্দেশ হইতে কলেরা ইত্যাদির ন্যায় কোন ব্যাধি এদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। কচিৎ একটী কলেরা রোগী পাইলে সারা দেশময় কাগজে লেখা লেখি, কোথা হইতে কি প্রকারে রোগ এখানে প্রবেশ করিল ইত্যাদি তত্ত্ববার্ত্তা নিয়া একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এক জায়গার একটা কলেরা রোগী পাইলে, সকল জায়গায় হেলথ্ অফিসারের এক একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়; তাঁহারা তাঁহাদের এলাকার তত্ত্ববার্ত্তা লন;—সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে কলেরা নিবারণের নানাপ্রকার উপায় নির্দ্ধারিত পুস্তিকা সকল বিনামূল্যে সাধারণ্যে বিতরণ করা হয়; তাহা হইতে জনসাধারণ জানিতে পারে, (১) রোগের আক্রমণের পূর্ব্বে কি করিয়া সাবধান হইতে হয় (২) কি করিয়া রোগের আক্রমণ হয় ইত্যাদি, এবং স্থানীয় চিকিৎসকগণকে সে বিষয় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হয়, স্থল বিশেষে ও প্রয়োজন বোধে চিকিৎসা বিষয়েও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আর আমাদের দেশে সর্দ্দি, কাসি, মাথা বা পেট ব্যথার মত কলেরা, বসন্ত বারমাস লাগিয়াই আছে, কৈ আমরা ত' অতটা ভাবিয়া সারা হই না? সে বিষয়ে বড় একটা ভাবিওনা, কিংবা কোন মহামারী ইত্যাদির সময় যদি বা একটু ভাবি, তখন মনে করি, অন্যান্য আর দশটা ব্যাধির মত ইহাও হইবেই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে কলেরা নিবারণ করা যায়।

আজও ঠিক মনে পড়ে, পাঠ্যাবস্থায় কোন শিক্ষক বলিয়াছিলেন, 'You can eat cholera, you can drink cholera, but you can not catch cholera. আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে কলেরা রোগীর বমি বা মল হইতে মাছি ইত্যাদি কালেরা জীবাণু বহন করিয়া আনে এবং সেই সকল জীবাণু আমাদের খাদ্য দ্রব্য বা পানীয়ের সহিত কোন প্রকারে মিশ্রিত হইলে আমাদের রোগ হইতে পারে এবং হয়।

অনেকেই হয় তো দেখিয়া থাকিবেন কোন গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে সেই গ্রামের লোক ভয়ে জড়সর হইয়া যায়। লোকের মনে একটুও আনন্দ উৎসাহ থাকে না; লোকে ভাবে গ্রামে কোন অপদেবতার কোপ-দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাই গ্রামবাসী নানাপ্রকার পূজার্চ্চনা, হরিসঙ্কীর্ত্তন, মানসিক-মানৎ করে—আর মুসলমানেরা 'ওঝা', 'মোল্লা' কত কি আমদানী করে। এই পূজার্চ্চনা বা হরিসঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি লোকের মনে পবিত্রতা আনয়ন করে। দশজনের একত্র সমাবেশে, মনে সাহস ও আনন্দ দান করে সন্দেহ নাই, কিন্তু কলেরার 'প্রতিষেধক' বা 'নিবারক' কতটুক্ কি কাজ করে জানি না বা 'ওঝা' 'মোল্লাগণের' ঐ 'জল-পড়া' বা 'তাবিজ' ইত্যাদি কতটুকু কাজ করে তাহাও জানি না।

কিন্তু কোন স্থানে কলেরা বা বসন্তের প্রাদুর্ভাব সময়ে বিশেষ তৎপূর্ব্বে, সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তব্য, ঐ সকল রোগের 'প্রতিষেধক' (Prophylactic) ও 'নিবারক' (Preventive) উপায় নির্দ্ধারিত পুস্তিকা বা বিজ্ঞপ্তিদ্বারা জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া। ডিষ্ট্রীক্টহেলথ্ অফিসার সেই সকল বিজ্ঞপ্তি বা পুস্তিকা বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিলে, প্রেসিডেণ্ট মহাশয় তাঁহার

চৌকীদার দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে সে সকল বিলি করিয়া দিতে পারেন, হাটে, বাজারে, স্কুলে বা কোন ধর্ম্মমন্দির বা জুম্মা মসজিদে যেখানে অনেক লোক জমায়েৎ হন, সে-সকল স্থানে এই 'বিজ্ঞপ্তি' পাঠ করিয়া নিরক্ষর জনসাধারণকে জানাইয়া ও উপদেশ দিয়া দিতে পারেন। যে সকল স্থানে বছর বছর ঐ সব রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেই সকল স্থান ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসার মহাশয় নিজে পরিদর্শন করিয়া, ছায়াচিত্র এবং বক্তৃতাদ্বারা তথাকার অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া আসিলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিলেও আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কিন্তু ইহাতে কিছু কমেনা। স্থানীয় চিকিৎসকগণ, স্কুলের শিক্ষকগণ ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যই সকলের আগে, কাজেই তাঁহাদের দায়ীত্বও বেশী। প্রথম কথা, কোথাও ব্যারামের প্রাদুর্ভাব বা প্রকাশের উপক্রম হইলে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সভা সমিতি করিয়া, হাটে, বাজারে বা স্কুলে বক্তৃতা দ্বারা ঐ সব রোগের প্রতিষেধক ও নিবারণের উপায় জনসাধারণকে বলিয়া দিবেন,—রোগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে কি ভাবে রাখিতে হয়, রোগীর কি ভাবে সেবা, যত্ন করিতে হয়, শুশ্রূষাকারীর বা শুশ্রূষাকারিণীর নিজের কি ভাবে চলা উচিৎ, পরিবারের অন্যান্য লোকদিগের কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে তাহাদের রোগ না হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবেন, এবং কোথাও কোন রোগ হইবামাত্রই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টকে বা স্থানীয় চিকিৎসককে রোগের বিষয় জানাইবেন, যাহাতে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ-অফিসারকে জানান কিংবা স্থানীয় যে কেহ বা কয়েকজন একত্রে ডিষ্ট্রীক্ট-হেলথ্ অফিসারকে জানাইতে পারেন, এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন,—তাহাতে লাভ হইবে, সংবাদপত্রের মারফতে এই সংবাদ স্থানান্তরে প্রচার হইয়া গেলে তত্রস্থ লোকেরা তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের অবকাশ পায়।

'কলেরার' ন্যায় 'বসন্ত'ও মালয় দেশে খুব কম; যদি দৈবাৎ কোথাও কোন বসন্ত রোগী দেখা যায় তাহা হইলে কলেরা হইতেও সতর্ক প্রহরায় তাহাকে রাখা হয়, যাহাতে সে জনসাধারণের ভিতর এই রোগ ছড়াইতে না পারে! আর আমাদের দেশে? আমরা কলেরার বেলা যেমন উদাসীন বসন্তের বেলায়ও তেমনি—এবং তার শোচনীয় পরিণামও ভোগ করি।—কথা প্রসঙ্গে বোধহয় ইহা বলা অবান্তর হইবেনা যে, যে 'কালাজ্বর' (Kala Azar) আজ আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত সোণার সংসারকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে, সে রাক্ষুসী কালাজ্বরও মালয় দেশে নাই।

এই সময় থেকেই আমাদের দেশে "কলেরা" ও 'বসন্তের' প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। কাজেই আমাদের শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন এই সময় স্বীয় সুখ একটু বর্জ্জন করিয়া, একটু শ্রম স্বীকার করিয়া, নানা প্রকার সভা সমিতি করিয়া, কলেরা ও বসন্ত সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে সচেতন করিয়া দিয়া তাঁহাদের মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন।—অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, এবম্বিধ পীড়ার 'প্রতিষেধক' চিকিৎসার ব্যবস্থা কেবল কখন কখন সহরেই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা যে দূরবর্ত্তী ঐ নিঃস্ব-পল্লীতেও প্রয়োজন তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? 'টীকা' (Vaccination) দিবার সময় কোন কোন গ্রামে দেখিয়াছি অভিভাবকেরা ভয়ে শিশুটীকে লুকাইয়া রাখেন, কাহারও বা ধারণা 'টীকা' দিলে বসন্ত হইবে। কোথাও হয়ত টীকা দেওয়া হইল, কিন্তু ঔষধ খারাপ বিধায় (bad lymph) 'টীকা' উঠিল না; কিন্তু 'টীকাদার' কি আর সেই খোঁজ লন? প্রয়োজনানুসারে সকলকেই 'টীকা' দিতে হইবে, 'টীকা' না উঠিলে পুনরায় দিতে হইবে, বৎসরান্তে সকল বিষয় হেল্‌থ্-অফিসারকে হিসাব-নিকাশ (Return) দিতে হইবে।...অভিজ্ঞদের মত যে, প্রত্যেক চার ৪ বৎসরে একবার করিয়া 'টীকা' লওয়া প্রয়োজন, কারণ একবারের 'টীকা' ৪ বৎসরের বেশী কাজ করিতে পারে না। এই সব নানা বিষয়ে আমাদের জন-সাধারণকে উপদেশ দিতে হইবে ও শিক্ষিত করিতে হইবে, তবে ত' দেশের ও দশের কল্যাণ!

গৃহস্থালীর কথা

সদ্য আচার ও জ্যাম উপরের তক্তায় রাখা উচিত নহে, কারণ গরম হইয়া উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়।

* * * *

গ্যাস ষ্টোভের বার্ণারটি দুই মিনিট জ্বালিয়া তাহার পর চুল্লি দ্বারটি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য খুলিয়া দিলে উহার ভিতরকার আর্দ্র বাতাস বাহির হইবার সুযোগ পায় এবং চুল্লিতে তাপ বেশী হয়।

* * * *

কাচ পরিস্কার করিয়া ধুইয়া উহার উপর একটু মেথিলেটেড স্পিরিট ঘষিয়া দিলে উহা বেশ চক্‌চকে হয়।

* * * *

যখন চারিদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বাড়ে তখন সকল দ্রব্য ধৌত করিবার জলে কিঞ্চিৎ ইউক্যালিপ্‌ট্যাস্‌ তৈল মিশান উচিত।

* * * *

ডিমের শ্বেত অংশ অসমান গাত্রচর্ম্ম সাদা ও নরম করে। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে উহা বেশ করিয়া চর্ম্মে ঘষিয়া লইতে হয় এবং প্রাতে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

* * * *

তিন চামচ গোলাপজলের সহিত ডিমের শ্বেতাংশ বেশ করিয়া ফেটাইয়া লইয়া ব্যবহার করিলে চোখের ফোলা নরম পড়িয়া যায়। পরিস্কার নরম কাপড় দ্বারা চোখে লাগাইতে হয়।

* * * *

যদি হঠাৎ আঠার প্রয়োজন হয় অথচ উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তাহা হইলে ডিমের শ্বেত অংশ উত্তম আঠার কাজ করিতে পারে।

* * * *

সমান অংশে গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিলে ডিমের শ্বেতাংশ পোড়া ঘার জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে। একখানি রুমালের উপর উহা ঢালিয়া পোড়া স্থানে বাঁধিয়া দিতে হয়।

* * * *

লেস্ বা পর্দ্দা ধৌত করিবার সময় উহা বেশ করিয়া ভাঁজ করিয়া লইতে হয় তা'হলে উহা ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। কাঁচা হইয়া গেলে ভিজা অবস্থায় না নিংড়াইয়া মেলাইয়া দিতে হয়।

* * * *

লিনেন কাপড় কাচিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত উহাতে কোন ছিদ্র আছে কিনা, কারণ ছিদ্র থাকিলে উহা কাচিবার সময় আরও বড় হইয়া যায়।

* * * *

মেঝে পরিষ্কার করা ব্রাশ যদি খুব ময়লা হইয়া যায় তাহা হইলে অল্প গরম সাবানের জলে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং পরে উষ্ণ জলে ধুইয়া হাওয়ায় শুকাইতে হয়।

সাবানের সঙ্গে কিরূপে সিলিকেট মিশাইতে হয়

সমান পরিমাণে জল এবং সিলিকেট লইয়া বিভিন্ন পাত্রে রাখিয়া দাও। তারপরে জলে প্রখর তাপ দিয়া উহাকে ফুটাইয়া লও এবং পরে ইহার সঙ্গে সিলিকেট সংযোগ করিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। এই পরিমাণে সিলিকেট জলের সংমিশ্রণে যে মিক্‌চার প্রস্তুত হইবে, তাহার শক্তি ৪০ বি হইবে। সাধারণ নিয়মানুসারে সিলিকেট এবং জল সমপরিমাণে লইতে হয়; জল একটু বেশী লইলেও ক্ষতি হয় না, কিন্তু কখনো উহা যেন কম না হয়।

সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে সিলিকেট যাহাতে ঠাণ্ডা জলে না পড়ে; তাহা হইলে উহা জলের নীচেই অমিশ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। জল খুব গরম না হইলে সিলিকেট ঠিকমত গলিবে না।

সর্ব্বদাই সিলিকেট মিক্‌চার সাবানের সঙ্গে মিশাইতে হইবে; মিক্‌চার না মিশাইয়া কেবলমাত্র সিলিকেট ব্যবহার করিলে সাবান অত্যন্ত শক্ত হইয়া যাইবে। সিলিকেট এইরূপে জলের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া গেলে উহা গরম গরম থাকিতেই সাবানের সঙ্গে মিশাইতে হইবে। কখনো মিক্‌চার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে ব্যবহার করিতে নাই। সাবানও যখন তরল এবং গরম অবস্থায় থাকে, তখনই এই কার্য্য সমাধান করা উচিৎ। ইহাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করিবার সময় কাঠ কিংবা লোহার খুন্তী দিয়া ভাল করিয়া নাড়িতে হইবে।

সিলিকেট মিক্‌চার মিশাইবার পূর্ব্বে, সাবানটী সিদ্ধ করিয়া কিংবা ঠিক মত তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। অর্দ্ধ-প্রস্তুত সাবানের সঙ্গে সিলিকেট মিশ্রণ করিলে সাবানটী একদম নষ্ট হইয়া যাইবে।

ঠাণ্ডা উপায়ে সাবান প্রস্তুত করা

তৈল এবং কষ্টীক্ লাই ভালরূপে মিশ্রিত হইয়া গেলে, ইহার সঙ্গে সিলিকেট মিক্‌চার মিলাইয়া লইয়া ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। তারপরে ঠাণ্ডা উপায়েই কাজ করিয়া যাইতে হইবে। একমণ তৈল হইতে প্রস্তুত সাবানের সঙ্গে এক হইতে বিশ সের পর্য্যন্ত সিলিকেট মিশান যাইতে পারে।

মুষ্টিযোগ

(১)

তুলসীর রস মধু দিয়ে—
সর্দ্দি কাসিতে দেবে খাইয়ে;
বেশী সর্দ্দি যদি মনে কর,
মিশিয়ে নিও একটু কর্পূরের গুঁড়ো।

(২)

পুরাণো ঘি বা সরিষার তেলে—
আদা বা পিঁয়াজের রসটী ফেলে,
মাঝে মাঝে গরম মালিশ ঘস্‌লে,
শ্লেষ্মা সরল হয় বুকেতে বস্‌লে।

(৩)

দুই রতি নিশাদল—নয়ক ভুল,
সঙ্গে মিশিয়ে এক রতি পিপুল;
ভাল ক'রে গুঁড়িয়ে রাখ্‌বি ঘরে;
ছেলেকে যদি ঘুংড়ী হাঁপানিতে ধরে,
একটুখানিক মিশিয়ে মধু,
এক রতি পরিমাণ খাওয়াবি বধু;
খাওয়াবি তিন চার ঘণ্টা অন্তর,
না ডেকে ডাক্তার না ঝেড়ে মন্তর।

(৪)

গাঁদালের ঝোল পোয়াতি খেলে,
শিশুর হাগাতে উপকার মেলে।

(৫)

কুমোর যে কালে গড়ে হাঁড়ি,
ছুটে যাবে সেই সময় তাদের বাড়ী,
(তার) হাত থেকে নিয়ে এক তোল মাটি,
মেশাবে এক পোওয়া ছাগ-দুধে খাঁটি।
আধ তোলা মধু ঠিক মিশিয়ে খাবি।
সুফল তাহলে শিগ্‌গিরই পাবি।

বাংলা দেশে একখানি সঠিক up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরীর একান্ত অভাব। থ্যাকার্স, পি, এম, বাকচী প্রভৃতি যে সকল ডাইরেক্টরী প্রকাশ করেন তাহা একরূপ "পাঁচ ফুলের সাজি"র মত নানা সংবাদে ভরা। ইহাতে প্রত্যেক জেলায়, সহরে, বন্দরে এবং বাজারে যে সকল ব্যবসাদার আছেন তাঁহাদের সকলের নাম, ধাম এবং কে কোন জিনিষের কারবার করেন, তাহার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মোকামের বিভিন্ন কারবারীর নামধামাদি জানা প্রয়োজন।

মনে করুন, আপনি বিদেশ হইতে নানারূপ cycle Parts আমদানী করিয়াছেন। আপনি বাংলা দেশের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রের সাইকেল-ব্যবসায়ীদিগের নামধামাদি যদি জানিতে পারেন, তবে সেই সকল dealerএর নিকট আপনার জিনিষের ক্যাটালগ, নমুনাদি পাঠাইয়া দিয়া অতি সহজেই জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

আবার মফঃস্বলের কোনও ব্যবসাদার হয়ত লঙ্কা, তেঁতুল, সুপারি, গুড় ইত্যাদি বাঁধী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি কলিকাতার আড়তদার এবং Exporters দিগের নামধামাদি জানিতে পারেন—যাহারা এই সকল মাল খরিদ করেন—তাহা হইলে অতি সহজেই তিনি নানা স্থানের মালের নমুনা, দাম ইত্যাদি পাঠাইয়া জিনিষ বেচার সুবিধা করিতে পারেন।

এই দুইটী দৃষ্টান্ত উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়া একখানি সঠিক এবং up-to-date ব্যবসায়ীর ডাইরেক্টরী দেশে যে কত দরকার, তাহাই এখানে বুঝাবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই কাজ করিবে কে?

বাংলা গবর্ণমেণ্টের Commerce এবং Industry Department হইতে এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী বাহির করিলে তাহা সঠিক এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবার সম্ভাবনা; কারণ বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডে গভর্ণমেণ্টের সংবাদ সংগ্রহ করার organisation বা আয়োজন আছে। বাংলা গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে circular জারী করিয়া এই সকল স্থান হইতে সকল সংবাদ সহজেই আনাইয়া এইরূপ একখানি ডাইরেক্টরী সঙ্কলন করিতে পারেন, এবং ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিয়া খরচ উঠাইয়া লইতে পারেন।

পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে এইরূপ সুন্দর এবং সুপরিচালিত ডাইরেক্টরীর কোনও অভাব নাই। কেবল এই হতভাগ্য দেশেই এসব কোনও অনুষ্ঠান নাই; কিন্তু যতদিন Commerce এবং Industry Department হইতে এই প্রয়োজনীয় জিনিষ প্রকাশ করা না হয়, ততদিন হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকার পক্ষপাতি আমরা নই। যে সকল বিষয়ে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরী প্রণয়নও তাহার মধ্যে একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

এইজন্য আমরা একখানি ডাইরেক্টরী প্রস্তুত করার সঙ্কল্প করিয়াছি, এবং সর্ব্বসাধারণকে দেশের নানাস্থানের দোকানদারগণের ঠিকানাদি পাঠাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সকলে এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিয়া দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের এই বিশেষ অভাব মোচন করিবেন। যাহারা দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার কল্পে ক্লেশ স্বীকার করতঃ এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। প্রতি মাসেই এই সকল সংবাদ আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব। ইহাদের ন্যায় যাঁহারা শুভ-সংকল্প প্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন স্থানের দোকানদারগণের নাম, ধাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়-সামগ্রীর সম্যক বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইবেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পত্র সানন্দে পত্রিকাস্তম্ভে প্রকাশ করিব। অনুরোধ, কেহ যেন অযথা সংবাদ দিয়া আমাদিগকে হয়রাণ না করেন।

Malda D. 28—11—31.

মাননীয়—

ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়—

মালদহের কতিপয় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদারদের নাম পাঠাইলাম। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ ইহা আপনার পত্রিকার ডাইরেক্টরী বিভাগে প্রকাশিত করিলে উপকৃত হইব। মালদহ সাধারণতঃ আম ও রেশমের জন্য প্রসিদ্ধ। জিলাটি মহানন্দা নদীর ধারে অবস্থিত। রেল ষ্টেশন এবং ষ্টীমার ষ্টেশন উভয়ই আছে। কেহ যদি কোন দরকারী খবর বিশেষ করিয়া জানিতে চান—Secy Rajsthan Library, Malda ঠিকানায় চিঠি দিলে তিনি নিশ্চয়ই যথার্থ উত্তর পাইবেন।

বাঙ্গলা ভাষায় কোনও পত্রিকায় ব্যবসায় সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্তর বিভাগ নাই। আপনি যদি এই আবশ্যকীয় জিনিষটীকে আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় স্থান দেন—তা হলে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আশাকরি এরূপ করাতে আপনার গ্রাহক সংখ্যাও বাড়িবে। ইতি—

Yours Faithfully
Secy. Rajsthan Library, Malda.

প্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসায়ীগণের নাম :—

শ্রীলছমন দাস বদ্রীদাস
শ্রীভারমল তুলসীরাম
শ্রীসূর্য্যকরণ জীউরাজ
শ্রীসিউকিশন প্রেমসুখ
শ্রীশ্রীচাদ সুজানমল
শ্রীরঘুনাথ দাস রামনাথ
শ্রীরাম কিশুন কানাইলাল
শ্রীরামনারয়ণজী হরেরাম।

সুতী কাপড় :—

রূপচাঁদজী সিউকিশন
মেঘরাজ কিশনলাল
মুন্নালাল মোহনলাল
গঙ্গাবিষ্ণু নারায়ণ দাস
কানাইলাল হীরালাল।

ধান চাউল ইত্যাদি :—

শ্রীসূর্য্য প্রসাদজী বেহানী
শ্রীকানাইলাল হীরালাল
শ্রীভারমন তুলসীরাম
শ্রীসিউকিশন প্রেমসুখ।

রেশমী কাপড় ও Silk waste

শ্রীসিউকিশন প্রেমসুখ

তামাক এবং আমের প্রসিদ্ধ আড়তদার :—

শ্রীশঙ্করলাল সারদা
বৈজনাথ মারোয়াড়ী।
যমুনালাল কাস্ট।
এসমাইল সেখ দালাল। মগদুমপুর, মালদহ
গোলাপ খলিজা।

কবিরাজ :—

শ্রীকৃপাসিন্ধু গোস্বামী।
শ্রীরাজকুমার পাল।

ডাক্তার :—

শৈলেশচন্দ্র সেন।
দুঃখ ভঞ্জন আগারওয়ালা।

ডাক্তারখানা :—

Malda Cheritable Hospital.
Dass Ghosh & Co.
Dass Seth & Co.

Press :—

Malda Samachar Press.

এখান হতে ১টী সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

Cycle :—

International Cycle store.

হালুয়াই —

উপেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

স্বর্ণকার —

কিশোরী সোনার—বালুচর, মালদহ

ডাল্টেন গঞ্জ—

রেল ওয়ের সংক্ষিপ্ত নাম D. T. O.

কাপড় ও সুতা—

কেদারনাথ সূর্য্যমল
ঘাসীরাম সাগরমল
লছমী নারাণ মহাদেও
বদরীদাস যমুনাদাস
পান্নালাল সূর্য্যমল
টিকরাম রামনারাণ
কানীরাম গনপত রায়

সরিষা, রবিশস্য ও ঘৃত—

কানীরাম গণপত রায়
কেদারনাথ সূর্য্যমল
রাম লোচনরাম রাধাপ্রসাদ
বৈজনাথ যুগল কিশোর
শিউপ্রসাদ (ঘৃত)

ষ্টেশনারী—

ঘোষ ব্রাদার্স
হেমচন্দ্র বড়াল

পেট্রোল ও কেরোসিন তৈল :—

গণেশীলাল সরাওগী

ঔষধের দোকান ও চিকিৎসক :—

এইচ-কে-দাস, এম, বি
ডাঃ গোপালচন্দ্র ধর, হোমিও
মৈত্র ফ্রেণ্ডস্
কবিরাজ পূর্ণানন্দ সেন

পুস্তকের দোকান :—

সরস্বতী পুস্তকালয়

ছাপাখানা :—

সিদ্ধরাজ প্রেস

ব্যাঙ্ক :—

ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন লিঃ
সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

কুলী চালানী :—

Indian Labour Supply Association Ltd.

বাসন :—

প্রভুরাম নন্দুরাম

ঘড়ী মেরামত :—

বসন্ত ব্রাদার্স

সাইকেল মেরামত :—

নারায়ণচন্দ্র দে এণ্ড সন্স

মিষ্টান্নের দোকান :—

শিতিকণ্ঠ মোদক।

সংবাদ পত্র বিক্রেতা :—

ত্রিবেণী প্রসাদ

এখানে ষ্ট্যাণ্ডার্ডঅয়েল কোং, বার্ম্মাশেল ও ইণ্ডোবার্ম্মা কোং'র এজেন্সী আছে।

শ্রীরামানুজ কর

ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নানা দেশের ব্যবসায়ীগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন জিনিষ হয়ত কিনিতে চা'ন বা বেচিতে চা'ন ; আমাদের কাগজের গ্রাহকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই সকল ব্যবসায়ীর সহিত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাদিগকে পত্র লিখিলে তাঁহাদিগের পত্র যথাস্থানে আমরা পৌঁছাইয়া দিব। বলা বাহুল্য আমাদিগের গ্রাহক ব্যতীত অন্য কাহারো পত্র পাঠান হয় না। এই সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি যদি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে অবিলম্বে পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

১। পত্র লিখিবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন।

২। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের নিকট পত্র লিখিতে হইলে বাংলাতেই লিখিবেন, কিন্তু বাংলার বাহিরের ব্যবসায়ীদিগের নিকট পত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিতে হইবে। প্রত্যেক Enquiry পড়িলে বুঝিতে পারিবেন, Enquiry কারক বাঙ্গালী কি বাংলার বাহিরের লোক।

৩। অনুসন্ধিৎসু গ্রাহকদিগের পত্র ভারতবর্ষের বাহিরে বিলাত, জার্ম্মাণী অথবা আমেরিকায় পাঠাইতে হইলে সেই দেশের মাশুলোপযোগী পোষ্টেজ পাঠাইতে হইবে। কোন্ দেশের ডাকমাশুল কত, তাহা Postal Directory খুঁজিলেই জানিতে পারিবেন।

৪। আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতে হইলে উত্তরের জন্য সর্ব্বদা পোষ্টেজ পাঠাইবেন। কারণ মনে রাখিবেন যে, নানা বিষয় জানিবার জন্য বহু লোকই আমাদিগকে পত্র লেখেন। পোষ্টেজ দিয়া সকলের চিঠির জবাব দেওয়া অসম্ভব।

৫। পত্র লিখিবার সময় যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার কারবার আছে, অথবা যে ব্যাঙ্কের referance দিতে চা'ন, তাহার উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ বড় বড় ব্যবসায়ী সহজে যে সে লোকের সহিত কারবার করিতে চাহে না, reference এর উপরে নির্ভর করে।

৬। পত্র লিখিবার সময় "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজে এই সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হইবে ; **নচেৎ পত্র যথাস্থানে পাঠানো হয় না।**

হাঁস, মুরগী এবং ডিমের ব্যবসা

SAFI UDDIN KHAN
48, Agasadek Road,
P. O. Ramna, Dacca.

ইনি উৎকৃষ্ট মোরগ, হাঁস প্রভৃতি কলিকাতায় সুবিধা দরে চালান দিতে চান এবং ভাল খরিদ্দার পাইলে প্রচুর পরিমাণে ডিম সরবরাহ করিতে পারেন। যাঁহারা কলিকাতায় এই সকল জিনিষ আমদানী করিতে চা'ন তাঁহারা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নামোল্লেখ করতঃ উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

Raw Silk Yarn & Silk waste.

এই Firm Raw Silk yarn এবং Silk waste সরবরাহ করিতে চা,ন এবং Silk waste এর খরিদ্দার খুঁজিতেছেন।

Sheokishen Premsukh
Raw silk yarn & silk cloth dealers.

জমাট দুগ্ধের কারবার

সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, নিম্নলিখিত জনৈক ভদ্রলোক উক্ত কারবারের জন্য প্রায় বার হাজার টাকা মূল্যের কল প্রভৃতি আনাইয়াছেন। এক্ষণে আরও দশ হাজার টাকা হইলে বাকী ২।১টী ছোট কল এবং আনুসঙ্গিক দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়া বিস্তৃতভাবে ভারতের বাজারে "স্বদেশী জমাট দুধ" সরবরাহ ও বিক্রীত হইতে পারে।

যদি কেহ মূলধনের জন্য বাকী দশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহার সহিত অংশীদার হইয়া উক্ত কারবার করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে জানাইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া লাভ কিরূপ হয় দেখাইয়া দিবেন, এই ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন—শ্রীসুধাংশু মোহন সরকার, আলমচাঁদ বাজার, কটক।

বিনা নজরে কৃষির জমি

সম্প্রতি মফঃস্বল হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তি আমাদের নিকট এইরূপ লিখিয়াছেন—শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ টাউনের ৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত দুর্লভপুর মৌজায় আমাদের একচকে তিন শত নয় একর উৎকৃষ্ট কৃষির উপযোগী ভূমি আছে। এই ভূমি সুর্ম্মা নদীর তীর হইতে অন্ততঃ দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহা এখন অনাবাদী অবস্থায় আছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে প্রচুর ধান, পাট, সরিষা ইত্যাদি ফসল উৎপন্ন হইতেছে। এই ভূমির চারি আনা অংশের তালুকে স্বত্ব আমরা ক্রয় করিয়াছি। অবশিষ্ট বার আনা অংশ চিরস্থায়ী কায়েমী বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে। R. S. N. Coর, জাহাজে কলিকাতা হইতে ভৈরব বাজার হইয়া সুনামগঞ্জে যাওয়া যায়। কৃষিকার্য্যে ইচ্ছুক কোন যুবক এই জমি বন্দোবস্ত নিতে চাহিলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। মোঃ মতিত্তর রহমান, হেডমাষ্টার. ইসলামিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা, পোঃ কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ।

বানর এবং পাখী রপ্তানী

মাদ্রাজের এক ফার্ম্ম আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসে প্রচুর পরিমাণে বানর এবং নানারকমের পাখীর চালান দিবার জন্য আমাদের কাছে এক পত্র লিখিয়াছেন। যদি কেহ এই ব্যবসায়ে নামিতে চান তাহলে Bank reference সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করুন।

T. M. Hassan & co
"Ghani Munzil"
116 Angappa Naick St.
Madras.

তামাকের পাতা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সন্নিকটস্থ কোনও ফার্ম্ম ২০০ মণ অল্প নষ্ট তামাকের পাতা বিক্রয় করিতে চাহেন।

কারবণ ও রিবণ

করাচীর "কারবণ ও রিবণ" ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী" সম্প্রতি দেশী কার্ব্বন ও রিবন বাহির করিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত কার্ব্বণ আমরা দেখিয়াছি। বাজার চলিত বিদেশী জিনিষের তুলনায় ইহা কোন অংশে খারাপ নহে।

কে, বানার্জ্জী ৮নং ব্যানিং ষ্ট্রীট, এই কোম্পানীর কলিকাতার এজেণ্ট।

চিনির কল

১৪।২ ওল্ড্ চীনাবাজার ষ্ট্রীট, হইতে এইচ, আর ব্রাদার্স এণ্ড কোং গুড় কিম্বা আখ হইতে চিনি তৈরী করিবার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। গৃহে বসিয়া অল্প মূলধনে এই কাজ করা যায়। ইহাতে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে।

স্বদেশী বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ

নিম্নে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের নূতন কাজের পরিমাণ দেওয়া হইল। গত বৎসরে ব্যবসা ও বাণিজে যে তালিকা বাহির হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে এ বৎসর মোট জীবন বীমা কাজ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের এইরূপ আর্থিক দুর্গতি ও রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মধ্যেও বীমা ব্যবসায়ে এই অগ্রগতি প্রকৃতই আশার কথা।

কোম্পানীর নাম	বর্ষ-শেষ	কাজের পরিমাণ (টাকা)
ওরিয়েণ্টাল	৩১-১২-৩১	৫,৩৪,৬০,৯৫৪
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্	৩০-৪-৩২	১,৪২,৩০,৭৫০
ন্যাশন্যাল্	৩১-১২-৩১	১,৩২,৩০,৭২৫
এম্পায়ার	২৯-২-৩২	১,০৫,২৭,০৭০
নিউ ইণ্ডিয়া	৩১-৩-৩২	৮৮,৩৭,২৫০
ভারত	৩১-১২-৩১	৭৯,২৮,৫৪৭
লক্ষ্মী	৩০-৪-৩২	৭০,৮১,৭৫০
বোম্বে মিউচুয়াল	৩১-১২-৩১	৬৮,৫৭,০০০
বোম্বে লাইফ্	৩১-১২-৩১	৫৮,৬৬,৩০০
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়্যাল্	৩১-১২-৩১	৫০,৪০,৬৬৬
ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৪৬,২৫,৭৫০
মেট্রোপলিটন	৩১-১২-৩১	৩৯,৮৪,৭৭৫
জেনারেল এসিওরেন্স	৩১-১২-৩১	৩১,৬৬,৫০০
ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৩১,৫৩,২৫০
জেনিথ	৩১-১২-৩১	২১,৫০,০০০
ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট	৩১-১২-৩১	১৮,৫৬,০০০
গ্রেট ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	১৭,১৮,২৫৫
জুপিটার জেনারেল	৩০-৬-৩১	১৫,০৭,৫০০
অন্ধ্র	৩১-১২-৩১	১৪,৩৮,২৫০
ইউনিক	৩১-১২-৩১	২১,৪০,৭০০
কমনওয়েল্থ্	৩০-৪-৩২	১০,৫৪,০০০
পিপল্স্	৩১-১২-৩১	৯,২০,১১৪
ট্রপিক্যাস্	৩১-১২-৩১	৯,০৩,০০০
ক্যাল্কাটা	৩১-১২-৩১	৭,২৯,৮৫০
ইণ্ডিয়ান গ্লোব্	৩১-১২-৩১	৭,১৩,০০০
ভেনাস্	৩১-৩-৩২	৬,৭৯,৩২৫
হিন্দু মিউচুয়াল্	৩১-১২-৩১	৫,০৫,০০০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৩০-৬-৩২	৪,৬২,০০০
ষ্টার অব ইণ্ডিয়া	৩১-১২-৩১	৪,৪৫,৫০০
সাউথ ইণ্ডিয়া জেনারেল	৩১-১২-৩১	৪,১৯,৫০০
পপুলার	৩১-১২-৩১	৩,১০,৫০০

ইন্সিওরেন্স এজেন্ট

(মিঃ এস, এন, গুপ্ত)

স্বদেশী যুগে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত শিক্ষিত এবং মার্জ্জিত রুচির যুবকদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে Field and Academy কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিক্ষিত এবং মার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন যুবকদিগের একত্রে মেলামেশা করিবার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর একদিকে সঙ্গীত সমাজ যেমন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সঙ্গীত চর্চ্চার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল, তেমনি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেদেরও সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি, সমাজতন্ত্র ও নানারূপ সুকুমার কলাবিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য

মিঃ এস-এন্ গুপ্ত

এই কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর সঙ্গীত সমাজের ঠিক অপর দিকে শিবনারায়ণ দাসের লেনে Field and Academyর প্রকাণ্ড বাড়ী ইহাদিগের মিলন ক্ষেত্র ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদিগের মধ্যে Club Life গড়িয়া তুলিবার বোধহয় ইহাই প্রথম চেষ্টা। আমরা দেখিয়াছি সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন এই Field and Academyর একজন উৎসাহী ও উদ্যোগী সভ্য ছিলেন।

তারপর স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের যুবকদিগের মতি গতি যখন ব্যবসাবাণিজ্য এবং কাজ কারবারের দিকে প্রধাবিত হইল তখন সুরেন্দ্র বাবুও গতানুগতিকের পন্থা পরিত্যাগ করতঃ স্বাধীন ব্যবসায়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের পক্ষে বীমার কাজ করা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল। বীমার কাজের সংগ্রাহক-দিগকে "Insurance Agent," "Agency Superintendent". "Insurance Adviser" ইত্যাদি নানারূপ ভদ্র ভাষায় Sugar Coated Pill এর ন্যায় যতই তাহাদিগকে ভদ্রসমাজে উপস্থিত করা যাক না কেন "তথাপি কাকঃ নচ রাজহংসঃ" জনসমাজে তবুও লোকে তাহাদিগকে বীমার দালাল বলিয়া মনে মনে উপহাস করিত, তা' সে যত টাকাই উপার্জ্জন করুক না কেন, এবং জনসমাজের, যত বড় উপকারী লোকই হো'ক না কেন। তা'র চেয়ে একটা চোগা চাপকান পরিয়া শামলা মাথায় দিয়া "হয়কে নয়," "দিনকে রাত," এবং "সাদাকে কালো" করার পেশায় লিপ্ত থাকিয়া—"রামের ধন শ্যামকে দিবার" চেষ্টায় সারাদিন আদালতে আদালতে ঘুরিয়া শূন্য হাতে এবং শুষ্ক মুখে বাড়ী ফেরাও যে ছিল ভাল—কারণ লোকে তবু ত' উকীল বলিত! কি রোজগার করে সে খবর ত'

ইন্সটিট্যুট অফ একচ্যুয়ারীস্ পরীক্ষা

(Institute of Actuaries Examinations 1932)

উপরোক্ত পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম বিভাগে :—

১। জগদীশ চন্দ্র আঢ্য
২। প্রমথ নাথ বক্সী
৩। কে, সি, চট্টোপাধ্যায়
৪। হীরালাল দত্ত
৫। সুশীল কুমার দে
৬। বমেরজী সোরাবজী গায়
৭। তেজময়া ঘোষ
৮। হীরেন্দ্র কুমার দত্তগুপ্ত
৯। বদন্থু রাম গুপ্ত
১০। এম, এক্রাম-উল-হক
১১। দেবীদাস পুরুষোত্তম দাস জায়
১২। কৃষ্ণজী গণেশ খণ্ডেকার
১৩। পি, ভেঙ্কলন্না কৃষ্ণমূর্ত্তি
১৪। ডি, এইচ, মাধবন
১৫। এস, মহানিঙ্গম
১৬। এন, এস, মুথুস্বামী আয়ার
১৭। ভি, শ্রীনিবাস রাঘবন
১৮। নরসিংহ মূর্ত্তি রামচন্দ্রন
১৯। মান্থব শ্রীনিবাস স্বামী রমন
২০। আর, রামস্বামী
২১। নন্দলাল মনিলাল শাহ
২২। জর্ম্মন লাল শর্ম্মা
২৩। এস, ডি, শ্রীনিবাসন
২৪। টি, আর, শ্রীনিবাসন
২৫। নারায়ণ স্বামী সুন্দরম
২৬। পি, এস, সুন্দরম
২৭। টি, এস, স্বামীনাথন
২৮। ইয়েজডেজার্ড ওয়াডাভাই টাটা
২৯। কেরানা বর্ম্মা
৩০। আর বেঙ্কটসুব্রহ্মণ্য আয়ার
৩১। এন, এস, বেঙ্কটরম
৩২। এম, এন, ভক্তেশ্বরণ

২য় বিভাগে—A

১। শ্রীধর ভিমজী ভোল্ডনে
২। আর, কোঠাধরমন
৩। অনন্তচারী রাজগোপালম
৪। টি, এস, রাজগোপালন
৫। ধর্ম্মরাজ শেষ আয়ার
৬। কান্তিলাল মোহনলাল শাহ

২য় বিভাগে—B

১। কে, বাল সুব্রহ্মণ্যম
২। দত্তাত্রেয় মহাদেব যোশী
৩। অনন্তচারী রাজগোপালন
৪। টি, এস, রাজগোপালন
৫। এস, এন, বৈদ্য

৪র্থ ভাগ—B

১। কে, আর, শ্রীনিবাসন।

কষ্টারিকোতে ইন্‌সিওরেন্স

বাহিরের সাহায্য না লইয়াই কষ্টারিকোর ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স ব্যাঙ্ক দেশে বীমার একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত ব্যবসাকে নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

অগ্নি (Fire)	ষ্টার্লিং ১২, ৭৫০, ০০০
জীবন (Life)	" ১, ৫০০, ০০০
মজুরের ক্ষতিপূরণ বাবদ (Workmen's Compensation)	" ২,,৭৭৫, ০০০
বিশ্বস্ততার গ্যারাণ্টি (Fidelity Guarantee)	" ২৫,০০০

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৩৯ { ১১শ সংখ্যা

বঙ্গীয় যুবকদিগের জীবিকার্জ্জনের উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বার্ণপুর (আসানসোল) টেক্‌নিক্যাল ক্লাস।

আসানসোলের ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোং ও পারিপার্শ্বিক অপরাপর কারখানায় শিক্ষানবিশ-গণের জন্য হীরাপুরে কতকগুলি টেক্‌নিক্যাল ক্লাশ খোলা হইয়াছে। একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির দায়িত্বে ক্লাশগুলি বসিতেছে এবং বাঙ্গলাদেশের মাইনিং ইন্‌ষ্ট্রাক্টরকর্তৃক পরি-চালিত হইতেছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।

ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসা চালাইতে যে সকল জ্ঞানের বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় সেই সকল বিষয়ে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিয়মিতরূপে শিক্ষা প্রদান করেন।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএর ছাত্রদের সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, ই, উপাধি লইবার জন্য পাঠান হয়। প্রবেশপ্রার্থীগণ ১৯ বৎসর বয়সের অধিক বয়স্ক হইবে না (কেবল যাহারা বি,

এস, সি, উপাধি পাইয়াছে ও দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে পারে তাহাদের বেলায় বয়স ২১ বৎসর হইতে পারিবে); তাহাদের ইংরাজী, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন লইয়া আই, এ, বা আই, এস, সি, পরীক্ষা অথবা কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য অপর যে কোন পরীক্ষা উহার সমান বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা অবশ্য পাশ হওয়া চাই। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যে ড্রয়িং'এর পরীক্ষা হইবে তাহাতে তাহাদের উপস্থিত হইতে হইবে ও তাহার জন্য ৪৲ টাকা ফিস্ দিতে হইবে। জুন মাসে ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত করিতে হইবে। আই, ই, কোর্সের (২ বৎসর) জন্য বৎসরে ১৬০৲ টাকা হিসাবে ও বি, ই, কোর্সের জন্য বৎসরে ২০০৲ টাকা হিসাবে পড়াইবার খরচা লওয়া হয় এবং আটটী সমান কিস্তিতে উহা আদায় করা হয়। ভারতীয়দিগের ১০৲ টাকা ও ইউরোপীয়ানদিগের ৩৫৲ টাকা বোর্ডিং খরচা পড়িয়া থাকে। আট কিস্তিতে ৪৭৲ টাকা "সিট' ভাড়াও দিতে হইবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠ্যাবস্থায় প্রতি সেসনের জন্য ১০০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে এবং হাতে কলমে কাজ শিক্ষার সময়ে প্রতি বৎসর মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে ১৩টি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া অপর কতকগুলি অল্প অল্প খরচা আছে, যেমন ভর্ত্তি হইবার ফিস্ খেলার ফিস্, ইত্যাদি, এবং এগুলিও বাধ্যতামূলক। যাহারা আই, ই, সার্টিফিকেট পাইয়াছে তাহারা পূর্ত্তবিভাগে মাসিক ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা বেতনের পদ পাইতে পারে। এক বৎসরের হাতেকলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএ বি, ই, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পাঁচ বৎসর হাতেকলমে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের পর ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদ ও পূর্ত্তবিভাগের অধীনে চাকুরী পাইবার উপযুক্ত হইবে।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল কোর্স।

নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ হইতে ৪ বৎসরের কোর্স ও তৎপরে ২ হইতে ৩ বৎসর হাতেকলমে কাজ শিক্ষা করিলে কলেজের এসোসিয়েটশিপ্ বা ডিপ্লোমার পরীক্ষা দিতে পারে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ও এখানকার ফিস একই, কেবল এই তফাৎ যে বর্ত্তমানে প্রতি সেসনে ১০৲ টাকা করিয়া স্কুলের ফিস্ লওয়া হয়। প্রতি বৎসর ৩০৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত কতকগুলি বৃত্তি দেওয়া হয়। যে সকল ছাত্র পাশ করিয়া হাতেকলমে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ লাভ বলিয়া বিবেচনা হয়।

ধানবাদে ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ মাইনস্-এ খনিজ ও ভূবিদ্যা শিক্ষা।

ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ্ মাইনস্-এ যে সকল কোর্স আছে তন্মধ্যে কয়লার খনিতে তিন বৎসর, ধাতব খনিতে ৩ বৎসর, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিংএ ৪ বৎসরের কোর্স এবং ভূবিদ্যায় ৪ বৎসরের কোর্স। প্রত্যেক ৩ বৎসরের কোর্স শেষ হইলে একটি করিয়া সার্টিফিকেট ও প্রত্যেক ৪ বৎসরের কোর্স শেষ হইলে এসোসিয়েটশিপের একটী ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর সেসন আরম্ভ হয় এবং তাহার জন্য ১৲ টাকা ফিস্ দিতে হয়। যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করে তাহার কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস, সি, বা উহার সমতুল্য

সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক। প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত, জড় রসায়ন (ইন্‌অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রী), প্রাথমিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও ইংরাজী রচনার প্রশ্নপত্র থাকিবে। প্রতি বৎসর ১৫ই জুলাই তারিখের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার দরখাস্ত করিতে হইবে। ডাক ও প্যাকিং খরচা ছাড়া নয় আনা মূল্য দিলে কলিকাতা ৮নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটস্থিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সেণ্ট্রাল পাব্লিকেসন্ ব্রাঞ্চের ম্যানেজারের নিকট যে স্কুল প্রস্পেক্টস্ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলী ও স্কুলের কোর্সের সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া আছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বৎসর মাসিক ৭০৲টাকা করিয়া একটি এবং মাসিক ৪০৲টাকা করিয়া দুইটি,মোট এই তিনটি বৃত্তি দিয়া থাকেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলানুসারে এগুলি দেওয়া হয়। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ মাসিক ৫০৲ টাকা মূল্যের চারটি স্কলারসিপ্ প্রত্যেক বৎসরে নয় মাস কাল দিয়া থাকেন, অপরাপর প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও স্কলারশিপ্ দিয়া থাকেন। ঝরিয়ার প্রধান প্রধান কয়লার খনির খুব নিকটে এবং বেঙ্গল কোলফিল্ড ও হাজারিবাগের অভ্র খনিগুলি হইতে খুব সহজেই আসিতে পারা যায়, এরূপ স্থানে স্কুলটি অবস্থিত। প্রায় ১৫০টি ছাত্রের হোষ্টেলে থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ জন ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। মেসের খরচা, পুস্তক, যন্ত্রাদি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি লইয়া মাসে মোট প্রায় ৬০৲ টাকা খরচা পড়ে। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্কুলে যথেষ্ট সরঞ্জাম ও শিক্ষকাদি আছে। ধাতব ও কয়লার খনিতে ও ভূবিদ্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে চাকরী পাওয়ার আশা করিতে পারা যায়।

জামসেদপুরে শিক্ষা।

জামসেদপুরের টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌স্‌টিটিউটে প্রত্যেক বৎসর ১লা নভেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহ ও ইস্পাতসম্বন্ধে ধাতুবিদ্যা শিখাইবার জন্য তিন বৎসর কাল পড়ান ও হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। খুব কঠোর প্রতিযোগিতা হয়, কারণ বাঙ্গলা হইতে প্রতি বৎসর মাত্র পাঁচটি ছাত্র পাঠান হয়। নির্ব্বাচিত প্রার্থীগণকে মাসিক ৬০৲ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। ভর্ত্তি হইতে হইলে যে শিক্ষা থাকা দরকার তাহা আই, এস্. সি, অথবা পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত সমেত কেমব্রিজ হাইয়ার স্কুলের সার্টিফিকেটের কম হইবে না। যে সকল ছাত্র বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেকানিক্যাল্, ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ অথবা মাইনিং ক্লাশের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারাও ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত। প্রার্থীগণ ২২ বৎসরের কম বয়স্ক হইবে, ইহারা যাহাতে সুস্থ ও সবল হয় এদিকেও বিশেষ নজর রাখা হয়।

প্রত্যেক বৎসরের ১লা নভেম্বর হইতে সেসন্ আরম্ভ হয় এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি চরম নির্ব্বাচন শেষ হয়। প্রত্যেক বৎসর ৩১শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে জামসেদপুর ইন্‌স্‌টিটিউটের ডিরেক্টরের নিকট পাঠ্য কোর্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। বঙ্গদেশের ডিরেক্টর অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রী, বাঙ্গালার পাঁচজন ছাত্রের প্রাথমিক নির্ব্বাচন করেন।

ইন্‌স্‌টিটিউট ও ওয়ার্কস্ কর্তৃপক্ষের সন্তোষ জনকরূপে শিক্ষানবিশের কোর্স শেষ করিলে পর, কোম্পানী ইচ্ছা করিলে শিক্ষানবিশকে টাটা আয়রণ ষ্টীল কোংর সহিত পাঁচ বৎসরের চুক্তি করিতে আদেশ করিতে পারিবেন। দৈনিক

৭৲ টাকা হিসাবে প্রথমে মাহিনা সুরু হইবে এবং ঐ পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসারে মাহিনা বাড়িবে।

ষ্টেট টেক্‌নিক্যাল স্কলারশিপ।

এই প্রদেশের শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুবিধা নাই অথচ যে সকল শিল্প বা তদনুরূপ শিল্প দেশে পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে ও তাহাতে শিক্ষিত ছাত্রদের জীবিকার উপায় হইতে পারে, সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতি বৎসর দুইজন করিয়া ছাত্র বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপস্থিত স্কলারশিপের হার এইরূপ—২০০ পাউণ্ড ও বৎসরে ৪০ পাউণ্ড বোনাস, দুই হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের হাই কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বিষয়ে স্কলারশিপ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করা হয় এবং জুন বা জুলাই মাসে সাধারণতঃ উহা প্রকাশিত হয়। আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্রদিগকে নির্ব্বাচন করা হয়, এবং প্রায় অক্টোবর মাসে সেসন্ আরম্ভ করিবার জন্য উহারা বিদেশে রওয়ানা হয়। যদিও এই ছাত্রদের আই, এস, সি, পরীক্ষার কম শিক্ষা হইলে চলিবে না, তথাপি প্রতিযোগিতা খুব প্রবল বলিয়া (যদি বয়সের সীমা ২৫ বৎসরের অধিক না হয়) বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটদিগকে, বিশেষতঃ যাহারা নির্দ্ধারিত শিল্পে প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাদেরই সাধারণতঃ পাঠান হইয়া থাকে।

উপসংহার।—মিঃ এ, এন, সেন কর্ত্তৃক লিখিত এই পুস্তিকায় শিল্প ও টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে যত প্রকারের জীবিকা অর্জ্জনের পথ আছে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং এগুলি বঙ্গদেশের শিল্পবিভাগের স্কলারশিপ দিবার যে ব্যবস্থা আছে তদনুসারে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক পিতা মাতা বা অভিভাবক যাঁহারা তাঁহাদের পুত্রাদির জীবিকার উপায় অন্বেষণ করেন তাঁহারা এই প্রবন্ধটি আগাগোড়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে উপকার পাইবেন।

পুকুরে মাছ ধরা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মৎস্য-জীবনের মূল-উৎস

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভারতীয় মাছের বাঁচিবার প্রধান উপাদান হইতেছে মশা। কাজেই ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা সঙ্গত বোধ করিতেছি।

বেশীর ভাগ লোকই ইহাকে মহা অনিষ্টকর পোকা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন -ইহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু সম্বন্ধেও গভীর গবেষণা হইয়া গিয়াছে। খবরের কাগজে, প্রবন্ধে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা প্রায়ই থাকে; কিন্তু কেহ ইহার সম্বন্ধে কোন ভাল কথা বলিয়াছেন, এরূপ মনে পড়ে না। আমি মনে করি যে মশা বেশ উপকারীও বটে; জল পরিষ্কার রাখা এবং মৎস্যের আহার্য্যরূপে পরিণত হওয়াই ইহাদের প্রধান কাজ। ডাঃ গিলক্রাইষ্ট ইহাদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা Journal of Literature and Science নামক পত্রিকায় দেখা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটী খুব চিত্তাকর্ষী ব্যাপার লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

United States Fish Commi sion এর একটী পুরাণো বুলেটিনে নিম্নলিখিত ব্যাপারটি লিপিবদ্ধ করা আছে:—"১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে গুনিমন উপত্যকার তুমিচি ক্রীকের মুখের দিকে গিয়াছিলাম। উহার স্রোত ও আন্দোলন-বিহীন একটী স্থলে দেখিতে পাইলাম যে কতকগুলি পার্ব্বত্য ট্রাউট মাছ জলে বেড়াইতেছে ও তাহাদের মাথার উপর এক ঝাঁক মশা চক্কর দিতেছে। ট্রাউটগুলি খুব ছোট ছোট ছিল; মাঝে মাঝে বোধ হয় উহারা বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য জলের সমান্তরাল করিয়া মাথা উচু করিতেছিল। মাথা উচু করিলেই উপরকার মশা বিদ্যুৎগতিতে নীচে নামিয়া আসিয়া ট্রাউটের মাথায় হুল বিঁধাইয়া দিয়া উহার সমস্ত জীবনশক্তি নিঃশেষে শুষিয়া লইত। মশার কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা উপরে উঠিত; মরা ট্রাউট মাছটীও ভাসিতে ভাসিতে দূরে চলিয়া যাইত। আমি ইহা কখনো শুনি নাই, বইয়েও পড়ি নাই; কাজেই অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া মশার এই আক্রমণ দেখিতে লাগিলাম। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে দেখা গেল যে ২০টী মৃত ট্রাউট মাছ ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে।"

ইহাও মশার ধ্বংসলীলা সূচিত করিতেছে। এখন উহার উল্টা পৃষ্ঠা দেখা যাউক।

ডিম ভাঙ্গিয়া যখন মশকশিশু বাহির হয়, তখন উহারা এত ছোট থাকে যে খালি চোখে

দেখা অনেক সময় দুষ্কর হইয়া পড়ে; চশমা ছাড়া আর নজরেও পড়িতে চাহে না। শুধু তাহাদের চঞ্চলতার জন্য বোঝা যায় যে মশকের অশিষ্ট শিশুরা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহারা এত ছোট থাকে যে চেলামাছের আহার্য্য হইবারও উপযুক্ত হয় না। শৈশবেই তাহারা ½ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে এবং তাহাদের কালো পায়ে শুভ্রবর্ণের দাগ পড়িয়া যায়। অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা মাছ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ পাউণ্ড ওজনের মাছ পর্য্যন্ত এই সমস্ত মশাকে অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ জলে যে সমস্ত জীব সঞ্চরণ করিয়া থাকে তাহাদের প্রত্যেকেই ইহা খাইতে ভালবাসে। যদি কোন মাছকে পোকা ও মশার মধ্যে আহার বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে উহারা মশাকেই গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ মনে করিবে। ইহা অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

আমাকে একবার রোহিত কাতলার বাচ্চাকে সিংহলে পাঠাইতে হইয়াছিল; আমি উহা পাঠাইবার কালে মশকশিশুর উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলাম। আমি "ছোট হাজরী"-র বন্দোবস্ত করাইয়া ও ডিনার প্রভৃতি দিয়া তাহাদিগকে সতেজ রাখিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। কাজেই যখন কলম্বো পৌঁছা গেল তখন ২১টি মাছের মধ্যে ১৯টাই সুস্থ শরীরে ও নির্ব্বিঘ্নে সেখানে পৌঁছিল; বাকী দুইটা জালার মুখ খোলা পাইয়া এক ফুরসুতে টপ্‌কাইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই আর একবার ৬০টা কর্ণাট প্রদেশীয় কার্পমাছ এবং ১৯টা রোহিতনন্দন ২৪২ মাইল রেলে রেলে ভ্রমণ করিয়াও ক্লান্ত হয় নাই।

মশক-শিশুকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার প্রধান সুবিধা এই যে অভিজ্ঞ লোকও ইহা মাছদিগকে খাওয়াইতে পারে; এবং বেশী করিয়া খাওয়াইলেও মাছের অসুখ হইবার কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ তাহারা জলে থাকে ততক্ষণ উহাদের সাহায্যে জল পরিষ্কৃত থাকে; মৎস্য-শিশুর ক্ষুধা পাইলেই উহারা আবার ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্ব সময়েই জলে থাকার জন্য মৎস্যেরও ইচ্ছামত ভোজন করিবার খুব সুবিধা হয়। মানুষের হাতে খাওয়াইবার ভার থাকিলে মাছকে একবার উপোষ করিতে হয়; একবার খুব বেশী করিয়া উদর পূরতি করিতে হয়। স্বাভাবিক ধরণের এই খাওয়াতে মাছের পূর্ণ তেজ বজায় থাকে। এতদ্ব্যতীত হাত দিয়া খাওয়াইলে সমস্ত মাছ উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে পায় না। যাহারা উহাদের মধ্যে নেহাৎ শিশু কিংবা দুর্ব্বল তাহারা বড় এবং শক্তিশালী মাছগুলির ভোজনপাঠ শেষ না হইলে খাইবার ভরসা পায় না। যাহারা মাছকে খাওয়াইতেছে তাহারা মনে করে যে আর বেশী খাওয়াইলে উহাদের অসুখ হইতে পারে; কাজেই দুর্ব্বল কিংবা শিশু মাছদের অর্দ্ধোপোষেই সময় কাটাইতে হয়। এতদ্ব্যতীত অগৃহীত খাদ্য জলে পড়িয়া থাকিলে জলও বিষাক্ত হইয়া উঠে। মশক-শিশুদের দ্বারা উহা হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এতদ্ব্যতীত বড় মাছদের খাওয়া হইয়া গেলে দুর্ব্বল মৎস্য-শিশুরা ইচ্ছামত পরে উহাদিগকে খাইতে পারে।

জল পরিষ্কার করাই যে মশকের কাজ তাহা উহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতেই বোঝা যাইবে। তাহাদিগকে কোথায় পাওয়া যায়, অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। যেখানে জল সুস্থির এবং অচঞ্চল, সেইখানেই মশকের দল ঝাঁক

বাঁধিয়া ফিরিতে থাকে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জল যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ, সেইখানেই মশকের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। যেখানে ড্রেনের পাক ফেলিয়া দেওয়া হয়, সেখানে তাহারা রক্তবীজের বংশের মত অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে। প্রয়োজন বোধ করিলে, সেখান হইতেই মশক-শিশু সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ডাঃ গিলক্রাইষ্ট বলেন যে পরিস্কৃত জলে উহাদিগকে রাখিয়া দিলেই বেচারাদের উপোষ দিতে হয়। আমি যদিও উহা লক্ষ্য করি নাই, তবু মনে হয় যে ডাঃ গিলক্রাইষ্ট শোধিত জলের কথাই বলিয়াছেন। আমি জলের মধ্যে ফিনাইল ঢালিয়া দিয়াও দেখিয়াছি যে উহাদের কোন বাহ্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় না। যখন তাহাদের দুর্দ্দান্তপনা থামিয়া যায়, তখন তাহারা নিতান্ত ভাল মানুষের মত জলের উপরে নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া থাকে। উহাদের উপর একটু অত্যাচার করিলেই, পাকা ডুবুরীর মতো উহারা জলের নীচে তলাইয়া যাইবে এবং সময় বুঝিয়া আবার উপরে ভাসিয়া উঠিবে। যদি কোন টপের মধ্যে এক টুকরা মাংস ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে মশকের দলও সঙ্গে সঙ্গে নীচে

নামিতেছে। মশক-শিশুরা খুব পেটুক এবং পচা খাদ্যই ইহাদের প্রধান আহার্য্য। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, প্রথম জীবনে ইহারা অন্যান্য পোকাদিগকে আক্রমণ করিবার প্রয়াস করে না। তাহাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গিয়া দেখিতে পাই যে তখনো তাহাদের মুখ হয় নাই এবং পিঠের দিকে উহাদের যে চোঙার মত আছে, তাহা দ্বারাই উহারা বাহিরের বাতাস গ্রহণ করিয়া থাকে। জলের নীচে ডুবিবার সময় মশক শিশুরা মাথা উপরের দিকেই রাখে এবং নিশ্বাসবায়ু বুদ্বুদের আকারে উপরের দিকে ভাসিয়া উঠে। এই অবস্থায় মাছ তাহাদিগকে খাইতে সুরু করে; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তখনও পুচ্ছ অভাবে ইহাদের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। প্রথম পর্য্যায়ে ইহাদের যে সমস্ত শারীরিক সংস্থান থাকে, দ্বিতীয় স্তরে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় অনেক পোকামাকড়ের আক্রমণ করিবার উপযুক্ত হুল আছে। ভারতে সাদা এবং কালো ডোরা-বিশিষ্ট যে সমস্ত মশা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐ শ্রেণীভুক্ত নহে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উহাদের খুব সুন্দর দেখায়। একটা ডিমকে ফুটাইয়া যদি ধোঁয়ায় উহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সদ্যজাত এই মশক-শিশুটীর সর্ব্বাঙ্গ মসৃণ লোমাবৃত; সাদা এবং কালো লোমের ছড়াছড়ি চোখে পড়িবে।

বিভিন্ন প্রকার মশকের বিভিন্ন ধরণের লোমবিন্যাস আছে. আমি উপরে যাহার কথা বলিলাম তাহা দক্ষিণ ভারতীয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহারা বৎসরে ২০০ হইতে ৩০০ ডিম পাড়িয়া থাকে। আমার ধারণা এই যে, ভারতীয় মশকেরা প্রত্যেক মাসেই ঐরূপ সংখ্যক ডিম পাড়িয়া থাকে; যদি কোন মেয়ে-মশা বছরের গোড়ার দিকে ১০০ ডিমও পাড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও মাসের শেষে দেখা যাইবে যে সে ৫০টী ধেড়ে এবং ৫০টা মেয়ে-মশকের জননী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় মাসে প্রত্যেকটী মেয়ে-মশক ১০০টা করিয়া ডিম পাড়িলে দেখা যাইবে যে, উহারা ৫০০০ ডিম প্রসব করিতে সমর্থ হইয়াছে। তৃতীয় মাসে ২৫০০ মেয়ে-মশা ২৫০,০০০ ডিমের জননী হইবে। অর্থাৎ বৎসরান্তে দেখা যাইবে যে একটা মশা হইতে ৪৮৮, ২৮১, ২৫০,০০০,০০০,০০০,০০০টা ডিমের সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। যদি ১ বৎসর ইহাদিগকে না মারা যায়, তাহা হইলে উহারা পৃথিবীর বুকের উপর এক ফুট উচু স্তর ফেলিয়া দিবে; ১০ বৎসরে তাহারা একটা উঁচু এবং পুরু দেয়াল গাথিয়া ফেলিতে পারিবে। উপরে যে সংখ্যা দিয়াছি, তাহাতে তাহারা পৃথিবীকে ৭৭, ৩৭৭, ১৯৫, ০৯২ বার বেষ্টন করিতে পারিবে এবং উহাদের সমবেত দৈর্ঘ্য পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের ২১ মিলিয়ন গুণ।

কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীতে মশক বাহিনীর সংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে। যদি উহাদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লালন-পালন করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে দিয়া মৎস্যের প্রচুর আহার্য্যের সংস্থান হইতে পারে। মশক খাদ্য অত্যন্ত সস্তাও পড়িবে।

ধেড়ে মশাকে সহজেই মেয়ে মশাদের গোত্র হইতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। ধেড়েগুলি কেবল যে আকারে ছোট তাহা নহে, উহাদের শরীর-সংস্থানেও বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

অম্নিডিম জেব্রাইকাম শ্রেণীর মেয়ে-মশার দুইটী সূক্ষ্ম চুলের মত antennae আছে; ধেড়েদের খাটো এবং অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পালক আছে। অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মেয়ে-মশাদের লম্বা এবং সূক্ষ্ম antennae লোমে পরিপূর্ণ; ধেড়েদের ছোট পালকগুলি কতকটা উট পাখীর পালকের অনুরূপ।

যখন মশা ডিম পাড়ে, তখন উহা সাধারণতঃ ভাসমান কোন জিনিষের উপরই সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করিয়া লয়। অনেক সময়ে জলের উপরেও উহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়; সেখানে উহারা দিব্য আরামে ভাসিতে থাকে। কাপড়ের ভাজে কিংবা আলনাতেও ডিম পাড়িতে দেখা গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে জল ছাড়াও মশার বংশবৃদ্ধি হইতে পারে। তবে আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক সূত্র এই হইবে যে মশা জলজ প্রাণী।

অনেক সময় শুষ্ক স্থানেও মশা ডিম পাড়িয়া থাকে, যদি কোন প্রকারে সেখানে জল পাইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে ডিম্বকোষে থাকিবার সময় মশাকে অবশ্য শুষ্ক আবহাওয়া হইতে বাঁচিয়া চলিতে হয়; কিন্তু জলের ছোঁয়াচ লাগিলেই উহা ডিম ফাটিয়া বাহির হয়।

আমি অনেক দূরে মশার ডিম খাদ্য হিসাবে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে উহা ডিম ফাটিয়া বাহির হইয়া পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই পলাইয়া যায়। বরফ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে উহাতে মশকের ডিমগুলির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিতে বিলম্ব হয় না।

কাজেই আমি অন্য একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম। মশার ডিম যে জলে থাকে, উহাকে ফ্লানেলের মধ্যে ছাকিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দাও। আমি ২৪ ঘণ্টা হইতে ৬দিন পর্য্যন্ত রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া দেখিয়াছি, কোন প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় কিনা! বস্তুতঃ এরূপ করিলে দেখা যাইবে যে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে উহারা বাহ্যতঃ মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু একটী জলের ছিটা দিলেই উহারা আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। তবুও ইহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে ছয়দিন পরীক্ষার পর অতি কম সংখ্যক মশকই জীবিত থাকিবে।

এই সমস্ত পরীক্ষা হইতে অনুমান করিলাম যে যদিও অসময়ের বৃষ্টিপাতে উহারা ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া থাকে, তবুও সামান্য জলেই ইহারা জীবিত থাকিবে। যদি এই সামান্য জলকণাও শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে উহারা আবার ধারা-পাত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে।

ব্যবসা গড়িয়া তুলিবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাল যদি বেশী পরিমাণে জমিয়া যায়, তাহা হইলে চুরি যাইবার সম্ভাবনা বেশ বাড়িয়া যায়। পুলিশ কোর্টের তথ্যগুলি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেই বোঝা যাইবে, ছোটখাটো জিনিষ যাহা লোকের নজরে পড়ে না, তাহা সরাইবার জন্য কতলোক আদালতে অভিযুক্ত হয়। অনেক সাধুলোকও অসতর্ক ভাবে রাখা জিনিষ সরাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। এই সমস্ত ছোটখাটো ব্যাপারেও নজর দিতে হয়, নতুবা অনেক সময় সারা দিনের লাভও চুরির ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। ব্যবসায়ী হয়তো ইহা খেয়ালই করেন নাই এবং সেদিনের রোজগারের সাফল্যের জন্য নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার অজ্ঞাতসারে যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিতে পারে।

ওজন করার এবং জিনিষপত্র সরাইয়া রাখিবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক থাকা চাই; দোকানের বিভিন্ন স্থলে প্যাক্ করিবার ব্যাগ, কাগজ প্রভৃতি ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাগ্ এবং কাগজে ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা ছাপা থাকিবে; উহা ফার্ম্মের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। ছোট ছোট প্যাকেট্ যাহা সচরাচর ঔষধের দোকানে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মোমের শীস্ দিয়া জুড়িয়া দিলে বেশ হয়। উহা বেশ পরিষ্কার দেখায় এবং কাজও শীঘ্র সম্পন্ন হয়। আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি মোম কেন সচরাচর ব্যবহৃত হয় না!

পাইকারী দোকানের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুদাম থাকিবার প্রয়োজন পড়ে; খুচরা বিক্রেতাগণ দোকানেই জিনিষপত্রাদি রাখিবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। বড় বড় দোকানের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য না হইলেও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এই কথাগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন।

আদর্শ বন্দোবস্ত সেইখানেই সম্ভবপর হইবে যেখানে জিনিষপত্রগুলি আদ্যক্ষর অনুসারে বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে। প্রত্যেকটী সেল্‌ফ এবং মালের থাকে নম্বর আঁটা থাকিবে এবং ডিপার্টমেন্টের নামানুসারে উহার গায়ে একটী লেবেল লাগানো থাকিবে। প্রত্যেকটী সহকারী যাহা বিক্রয় করে, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক থাকিবে, এবং উহার মধ্যে পার্সেন্টেজ হিসাবে

তাহার দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা বাৎসরিক মাহিয়ানার হিসাব থাকিবে। দিনের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে সহকারীর মোট বিক্রয়ের অঙ্ক নীচে টানিয়া আনিয়া উহার সঙ্গে তাহার দৈনিক বেতনের পরিমাণ তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাতে সহকারীর মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

লণ্ডনের একটী বিখ্যাত পাইকারী দোকান নিম্নলিখিতভাবে সজ্জিত রাখা হইয়াছে। সমস্ত ফার্ম্মটিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জিনিষ রাখা হইয়াছে। প্রত্যেকটী ডিপার্টমেন্টের মাথায় একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী কাজ করিতেছেন; তাঁহারা অন্যান্য শাখার সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্ত্তা না কহিয়াও মালপত্রের লেন-দেন করিতে পারেন। প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তাকে ব্যালান্স সীট দাখিল করিতে হয় যদি দেখা যায় যে আলোচ্য শাখাটি বেশ ভালই চলিতেছে, তাহা হইলে উহাকে আরও উন্নত করিবার চেষ্টা করা হয়, নতুবা কর্ত্তাকে উহার জন্য জবাবদিহী করিতে হয়। এরূপ স্থলে প্রত্যেক কর্ম্মচারীর উদ্যম ও দক্ষতা বিকাশের রাস্তা প্রশস্ত হয় তাহাদিগকে বেতনও প্রচুর দেওয়া হয়।

অনেক ফার্ম্মে প্রতিদিন যাহা বিক্রয় হয় তাহার একটা মোটামুটি খসড়া রাখা হয়। ইহাতে খাতাপত্র দেখিয়াই ব্যবসায়ের লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়। এই খসড়াতে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি থাকিবে :—

(১) সেদিন যে সমস্ত মালপত্রের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি তথ্য।

(২) বিক্রয়ের পরিমাণ—

(ক) বর্ত্তমান বৎসরে—

(খ) গত বৎসরে—

(৩) ক্যাস্ আদায়—

(ক) নগদ বিক্রয়—

(খ) অ্যাকাউন্ট হিসাবে

(৪) ব্যবসায়ের ব্যয়—

(৫) নগদ মজুত—

(৬) ব্যাঙ্কের ব্যালান্স –

(৭) যাহারা দোকানে কোন কিছুর সন্ধানে আসিয়া থাকে (callers)—

(৮) যাহারা ফার্ম্ম হইতে অনুপস্থিত থাকে, কিসের জন্য—

(৯) সহকারীগণ—

(১০) সহকারী বরখাস্ত এবং কেন –

ব্যবসায়ীদের অবিক্রয় মাল (dead stock) লইয়া বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হয়। যদি লাভ না হয় তাহা হইলে বিনালাভে উহা কাটাইয়া দেওয়াই ভাল। এমন কি, বৎসর জুড়িয়া মাল পড়িয়া থাকিলে উহাকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিক্রয় করিয়া দেওয়া উচিৎ; কেননা প্রতি বৎসর মাল পড়িয়া থাকিলে উহার মূল্য ৫।১০ পার্সেণ্ট হিসাবে কমিয়া যাইবে। নূতন এবং পুরাতন ব্যবসায়ী কেহই ইহা ভুলিবেন না।

ব্যবসায়ীর কোয়ালিফিকেশন।

ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে করিৎকর্ম্মা লোক হওয়া চাই। বস্তুতঃ পরিশ্রমী না হইলে ব্যবসায়ে সফল হওয়া অসম্ভব; ইহা বর্ত্তমানকে লাভজনক করিয়া তুলে, ভবিষ্যৎকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলে না। যেখানে মানুষের টিকিয়া থাকা উদ্যমশীলতার উপর নির্ভর করে, সেখানে পরিশ্রমকে অসম্মানের চোখে দেখা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বস্তুতঃ দেহ-মনকে সতেজ রাখিতে হইলে উভয়কেই পরিচালনা করা চাই। বাঁচিয়া থাকায়ই

মানে কাজ করা। ডানিয়েল ওয়েবষ্টার সত্যই বলিয়াছেন যে, "উপরের দিকে সর্ব্বদাই স্থান রহিয়া গিয়াছে।"

পরিশ্রমের ফললাভ করিতে হইলে একটু ত্যাগের স্পৃহা বর্ত্তমান থাকা চাই। প্রত্যেককেই ভবিষ্যদ্দর্শী হইতে হইবে, অসুবিধার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বলতা এবং মানসিক বিরক্তি পরিহার করিতে হইবে। বিপদে কখনো মনের স্থৈর্য্য নষ্ট হইতে দিবে না; সর্ব্বদাই ভাবিবে, "আমি ইহা করিব" কিংবা "করিতে পারিব।" এইরূপ করিয়াই মানুষ বড় এবং বিখ্যাত হইয়াছে। আর্ল অফ বেকন্‌স্‌ফিল্ড বলিয়াছেন, অধ্যবসায় থাকিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।" যাহারা কৃতকার্য্য হইতে চাহে তাহাদের অভিধান হইতে অসম্ভব শব্দটা তুলিয়া দেওয়া উচিৎ। নেপোলিয়নের জীবনের যে ইহাই মূলমন্ত্র ছিল তাহা অনেকের জানা আছে।

সফলতার জন্য নিজের উদ্যমের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুবাতাস কবে বহিতে থাকিবে, তাহার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া প্রতীক্ষায় থাকিলে তো চলিবে না! বস্তুতঃ পরের পরিশ্রমের ধনে আরাম করার কোন সুফল পাওয়া যায় না; নিজে চেষ্টা করিয়া যদি সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লওয়া যায়, তাহাই অনেকগুণে শ্রেয়ঃ এবং কাম্য। কথায় বলে "Slow but Sure"; প্রবাদটি ভাল বটে, কিন্তু আমরা উহাকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে চাই "Swift and Sure"। সর্ব্বদাই উদ্যমশীলতা যেন বজায় থাকে; কেননা সময় অমূল্য এবং জীবনও দীর্ঘ নয়। মনকে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে খুব কঠিন বিষয়েরও সহজ সমাধান হয়। ব্যবসায়ী, উকিল, তার্কিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি হিসাবে সফলকাম হইতে হইলে শীঘ্র চিন্তা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা চাই। যাহারা নিজের, সমাজের এবং পৃথিবীর উপকার করিয়াছে, তাহাদের কেহই অলস ছিলেন না। স্যার অ্যালফ্রেড জোন্স, যাহাকে এককালে শিক্ষানবিশীর কাজ পাইবার জন্যও হাবুডুবু খাইতে হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি কৃতকার্য্য হইতে চাও, তাহা হইলে তোমার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত লোকের চেয়েও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। উৎসাহ থাকিলেই উদ্যমের বিকাশ হয়; কেননা যে কাজ ভালবাসে সে কখনও সময় নষ্ট করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসও থাকা চাই। স্যার রিফেটিন বর্নিসন ১২ বৎসর বয়সের সময় ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কতকগুলি গুণ নিহিত থাকে; উপযুক্ত ভাবে উহাকে চালনা করিলেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্য, ব্যবসায়ে এই গুণ দুইটির আবশ্যকতা খুব বেশী। অনেক সময় ইহারা সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হইলেও ইহারা এক নহে। অধ্যবসায়কে ধৈর্য্যের কার্য্যকরী ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের নিষ্ক্রিয়ভাব (Passive)। কার্য্যে সফল হইতে হইলে কষ্ট এবং ধৈর্য্যকে ফাঁকি দিয়া গেলে চলিবে না; কেন না, কার্লাইলের ভাষায় 'Genius is another name of taking infinite pains". যে ব্যক্তি দৃঢ় ভাবে কোন কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে, জীবনে তাহার উন্নতি সুনিশ্চিত।

কৃতকার্য্যতার প্রধান সোপান হইতেছে, প্রাতরুত্থানের অভ্যাস। ইহা শরীর এবং মন উভয়ই সুস্থ রাখে; নিশাকালীন সমস্ত গ্লানি ও অবসাদ দূর করিতে প্রাতঃ ভ্রমণের মত ঔষধ আর

নাই। যে ব্যবসায়ী এই অভ্যাস বজায় রাখিতে পারিবেন, তিনি প্রতিদিনের কাজে সতেজ মন লইয়া নামিতে পারিবেন। সহকারীদেরও এই অভ্যাস ক্রমশঃ হইয়া আসিবে। যদি তাহারা দেখিতে পায় যে কর্ত্তা ঠিক দোকান খুলিবার সময়েই আসিয়া হাজির হইয়াছে, তাহা হইলে তাহারাও কাজে সকালে আসিতে চেষ্টা করিবে।

যাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপার বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কর্ম্মচারী কিংবা ভৃত্যদের সময়ানুবর্ত্তিতা জ্ঞান না থাকিলে ব্যবসায়ীর খুব বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। কোন ফ্যাক্টরীতে যদি ১০।১২ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকেই যদি ৫।৭ মিনিট দেরী করিয়া আসে, তাহা হইলে কাজ আরম্ভ করিতে করিতে যে ক্ষতি হইবে তাহার পরিমাণ দৈনিক ৫ শিলিং এর চেয়ে কম হইবে না। বাহ্যতঃ ইহাকে ক্ষুদ্র ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু শতকরা ৫ পার্সেণ্ট ধরে মিশ্র সুদের হারে হিসাব করিলে ২০ বৎসর পরে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন হাজার পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়াইবে। যদি ব্যবসায়ী নিজে সকালে আসিতে অভ্যাস করেন, অন্ততঃ পক্ষে চক্ষু লজ্জার খাতিরেও কর্ম্মচারীরা সকালে আসিতে চেষ্টা করিবে।

ব্যবসায়ে ঠিক সময় রাখার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী; অষ্টাদশ লুই বলিয়া ছিলেন, ইহা রাজাদেরও বেমানান হয় না। বাস্তবিক, হিসাব মিটাইয়া দেওয়ার জন্য এবং মোলাকাৎ এর সময় ঠিক রাখিবার জন্য সময়ানুবর্ত্তী না হইলে চলে না। একজন পরিচিত ভদ্র লোক আমাকে বলিয়া ছিলেন যে, কোন জায়গায় এন্‌গেজমেণ্ট থাকিলে, তিনি সর্ব্বদাই সেখানে ৫ মিনিট আগে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যখন টাকা দিবার কথা থাকে তখন উহা মিটাইয়া দিতে দেরী করিবে না। যদি উহা অসম্ভবই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নেই পার্টিকে উক্ত খবর জানাইয়া দিতে হইবে, নতুবা তোমার উপর নির্ভর করিয়া, সে আবার অন্যত্র অপদস্থ হইতে পারে। কখনো কেজো লোককে বসাইয়া রাখিবেনা; কেননা, তোমার বিলম্ব করার দরুণ তাহার অপর জায়গায় কোন এন্‌গেজমেণ্ট নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, খরিদ্দারকে কখনো বিমুখ করিতে চেষ্টা করিও না; তোমার গুদামে একটা নির্দ্দিষ্ট মাল নাই বলিয়া সমস্ত জিনিষ আটকাইয়া রাখিও না। যাহা আছে তাহাই পাঠাইয়া দিয়া বাকী মাল পরে প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিষ না পাঠাইতে পারার কারণ চিঠি লিখিয়া জানাইতে ভুল করিবে না।

যেখানে অনেক কর্ম্মচারী কাজ করে, সেখানে প্রত্যেক সহকারীর কর্ম্মে যোগদান করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে অনুপস্থিতির কাল ও কারণ প্রভৃতি একখানি বইতে লেখা থাকিবে। বাস্তবিক ঠিক মত বন্দোবস্ত করা না থাকিলে সময়ানুবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ভুল করিও না যে মিলিটারী ধরণের কেতাদুরস্ত সময় বিভাগ করা থাকিলে, উহা অনেকের বিরক্তিজনক হইয়া থাকে। মন এবং কার্য্যের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চট্‌পটে এবং সময়ানুবর্ত্তী হওয়াই সকলের চেয়ে ভাল।

ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে, যাহা ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। তাড়াতাড়ি হিসাব করিবার ক্ষমতা, স্মৃতি শক্তি প্রখর রাখিবার চেষ্টা এবং নোট রাখিবার অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ব্যব-

সাম্নীর পক্ষে তাড়াতাড়ি হিসাব করিবার ক্ষমতা বিশেষ ভাবে দরকারী। প্রত্যেকেই হিসাব বিষয়ে দক্ষ না হলেও অনেকেই চেষ্টা করিলে প্রয়োজনীয় হিসাবাদির সমাধান সহজেই করিতে পারেন। অনেকে কালি কলম লইয়া যে হিসাব করিতে পারেন না, অনেকে তাহা মুখে মুখেই কষিয়া দিতে পারেন। অভ্যাস করিলেই, ইহা ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিবে।

স্মৃতি শক্তির প্রয়োজনও কম নহে। যখন তোমার হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় যে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ আর কিছুতেই তোমার স্মৃতি পথে আসিতেছে না, তখন বিরক্তিটা খুব কম হয় না। সমস্ত দিনের খুঁটিনাটি ব্যাপার রাত্রিকালে একবার মনে করিতে চেষ্টা করিবে। তুমি প্রথমে কি করিয়াছিলে? তোমার হাতে কে চিঠিপত্রাদি দিয়া গিয়াছিল? কেহ কি ডাকিয়াছিল? কিসের জন্য,এবং তুমি কি জবাব দিয়াছিলে? তুমি সাড়ে বারটার সময় কোথায় ছিলে? স" তিনটের সময়? ৫ টা ২০ মিনিটের সময়? এমন অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে যাহা দিনের হৈ-চৈ তে ভুলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে উহা একে একে স্মৃতিপথে উদিত হয়।

চৈত্র মাসের কৃষি

এ সময়ে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, ঢেঁড়শ স্কোয়াস, পামকিন, বরবটী, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। উচ্ছে, করলা, কাঁকুড়, ফুটী, তরমুজ ও খরমুজ বীজ এখনও বপন করা চলে। চাঁপা, কনকা, প্রভৃতি নটে, পুঁই শাক এবং কাটোয়ার ডাটার বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। আউসে বেগুনের বীজ এসময় বপন করা আবশ্যক। গতমাসে মাচায় যে সমস্ত বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহাদের সবল চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল চারাগুলি জমি হইতে তুলিয়া ফেলা উচিত এবং আগাছা বাছিয়া চারাগাছের গোড়া নিড়ানি দ্বারা আলগা করিয়া দেওয়া দরকার। দুর্ব্বল ও নিস্তেজ চারা সহজেই কীটাক্রান্ত ও রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে ইহাতে অন্য গাছ ও ফসলের অনিষ্ট হওয়ার এ সময় আশঙ্কা আছে। এসময় শাকআলু, আকের কলম, পেঁপে এবং মাসের শেষ দিকে কার্পাস বীজ লাগান চলে। যব, গম, ছোলা মুগ মসুর, খেসারী, সরিষা, তিল প্রভৃতি রবিশস্য ফাল্গুন-চৈত্র মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে এ সময় উহা ঝাড়িয়া লইতে হয়, ভূট্টা

পাট, এবং সবুজ সারের জন্য শোণ ধঞ্চে প্রভৃতি বীজ বপন করা এসময়ের কার্য্য। আশুধানের জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। মাসের শেষ দিকে আশুধান্যের বীজ বপন করা চলে।

এ সময় শীতের শেষ। শীতের মরশুমী ফুল দেওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শীত প্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও পপি, ফ্লক্স মিগ্নোনেট প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হয়। এখন হইতেই গরম হাওয়া বহিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুল বীজের জন্য জমির পাট শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে এই মাসের শেষ দিকে ইহা বপন করা হয়।

শীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ ফুল ফোটা শেষ হইয়া আসে। এখন বেল, যুই, চামেলী মল্লিকা, গন্ধরাজ, প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন ফুল ফুটিবার সময় আসিল। যে সমস্ত ফুল গাছ এই সময় পুষ্পিত হয় তাহাদের গোড়ায় রীতিমত জল সেচন করা প্রয়োজন। দুই বেলা জল দিতে না পারিলে অন্ততঃ বৈকালে জল দেওয়া উচিত, নতুবা রৌদ্রের তেজে গাছ জখম হইয়া পড়ে। জলের সহিত অভাবে শ্রীহীন হইয়া যায় এবং রসের খইল গোবর প্রভৃতি গুলিয়া তরলসার হিসাবে মধ্যে মধ্যে প্রয়োগ করিলে গাছের খুব উপকার হয় এবং ফুলও দেয় প্রচুর।

আম, জাম, লেবু, লকেট, জামরুল, পীচ প্রভৃতি গাছে এসময়ে ছোট ছোট ফল ধরে। পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। এখনও তরল সার জলের সহিত দিতে পারা যায়। ইহাতে ফলের বোঁটা শক্ত হয় এবং ফল মিষ্ট ও রসাল হয়।

ফাল্গুন মাসে বাঁশ ঝাড়ের শুষ্ক গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং গোড়ায় পতিত শুষ্ক পত্রে অগ্নিসংযোগ করিবার প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়। এসময় বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটা প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয় এবং দীর্ঘ ও মোটা হয়। "ফাল্গুণে আগুণ চৈতে মাটি" বাঁশে দিও ধানের চিটা" ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে অনেক সময়ে সুফল ফলে। কোন কোন স্থলে বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটির সহিত ধানের চিটা প্রয়োগের রীতি আছে।

"কৃষিলক্ষ্মী"

ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর উপযোগী চালানী কাঠ

(শ্রীরোহিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

অন্যান্য দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীর কতিপয় স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সকল ম্যাচ্ বা দেশলাই প্রস্তুত হয়, তাহার উপযোগী কাষ্ঠ অধিকাংশ বাংলার জঙ্গল হইতেই সংগ্রহ হইয়া থাকে; এবং ঐ সমস্ত কাষ্ঠ একটু চেষ্টা করিয়া অনুসন্ধান করিলেই পাওয়া যাইতে পারে। নাতিদূর বঙ্গপল্লীর সন্নিকটে যে সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জঙ্গল রহিয়াছে তাহা বেওয়ারীশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; হয়তো বা তৎসন্নিকটস্থ কোন চাষা পল্লীর নিরীহ অবনত নিরক্ষরের হইলেও হইতে পারে। বাংলাদেশের এই শিক্ষিত বেকার যুবকগণ আজ যদি সচেষ্ট হইয়া বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিয়া ফ্যাক্টরী উপযোগী কাষ্ঠ চালানোর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন তবে এই সোনার বাঙ্গলার বন-ঝোড় হইতেও অজস্র অর্থ উপায় করিতে পারেন।

শিক্ষিত বেকার বাঙালী যুবকগণ সেই সমস্ত পল্লীতে গিয়া মাত্র ৫০্ টাকা মূলধনে যদি উক্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ সমস্ত নবপ্রতিষ্ঠিত ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে চালান দেন তবে তাঁহাদের খাওয়া খরচা বাদ যাইয়া যে টাকা লাভ হইবে তাহা কেরাণীর হাড়ফাটা রোজগার অপেক্ষা অনেক বেশী।

বেশীদূর যাইতে হইবে না শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে মাত্র ৪৮ মাইল পথ ব্যবধান, ২৪ পরগণার বীরনগর গ্রাম—এই বীরনগর অতি প্রাচীন ও সুবৃহৎ গ্রাম। জেলা নদীয়ার উখড়া পরগণার অধীন এই উলা বা বীরনগর গ্রাম। ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রাম বিশিষ্ট জনমানবে পূর্ণ ছিল। আনুমানিক ১২৭১ সালে ভীষণ মহামারীর করাল গ্রাসে এই গ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেই জনমানব বেষ্টিত নগরীর ত্যক্ত ভিটা আজ ঘোর অরণ্য-সমাচ্ছন্ন। চালানী ব্যবসায়েচ্ছু যদি কোন যুবক তথায় গিয়া ফ্যাক্টরী উপযোগী বৃক্ষ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন তবে একটু অনুসন্ধান করিলেই গ্রামবাসীদের নিকট সমস্ত সন্ধান পাইবেন।

গ্রামের অধিকাংশই ঘোর জঙ্গলাবৃত; তথায় দিবাভাগে শিবাগণের অশিব চীৎকার, নানারূপ বনবিহঙ্গের কাকলী কলরব সেই বিধ্বস্ত নগরীকে মুখরিত করিতেছে। তথাকার জঙ্গলে পিটুলি, সোদাল, জীবন তুঁত, বাবলা, সিমুল, দেবদারু, পঁয়া, বাঁশ, দেশী সেগুন, মেহগেনী, অশোক, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন প্রভৃতি ও অন্যান্য বৃক্ষাদি প্রচুর আছে।

বীরনগরের উত্তর প্রান্তে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন মৌজা পালিত পাড়ার অধীন্ ক্ষেমুয়াপাড়া, হাট পুকুর। আবার তাহার আশ পাশ সংলগ্ন আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী যথা বেশপুর, মাগুরখালী মামজোয়ান, খিসমা, বারাসাৎ, ইত্যাদি। বীরনগর বা উলার দক্ষিণপ্রান্তে মাত্র ১টী ক্ষুদ্র পল্লী, ঝাউগাছি উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীরই অধীন। উক্ত পল্লীর ভিতর অনুসন্ধান করিলে প্রশস্ত বা দৈর্ঘ্য ফ্যাক্টরীর উপযোগী সিমুল বা পিটুলী বৃক্ষ পাওয়া যাইবে।

গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে হরিপুর, পাহাড়পুর প্রভৃতি মুসলমান প্রধান গ্রাম। আজ সেই বিধ্বস্ত নগরের রূপ, সৌন্দর্য্য, আনন্দ কোলাহল এবং ঐশ্বর্য্য মহামারীর করালগ্রাসে নিপতিত হইলেও নগরবাসীগণের একটী জিনিষ আজিও অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত রহিয়াছে। সেটী হৃদয়ের ধর্ম্ম, মহত্ব বা দয়াবৃত্তি। আজিও তাই ভগ্ননগরীর বিধ্বস্ত নরনারীগণ আতিথেয়তার মহত্বে, মাতৃত্বে—গরীয়ান, মহীয়সী। এই পাহাড়পুরের পল্লীবাসীদিগের আঙ্গিনার আশ পাশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া চূর্ণীনদীর পাহাড় পর্য্যন্ত পিটুলী, সিমুল বৃক্ষাদি শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু দূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উক্ত গ্রামের জমীদার মহোদয়ের নিকট সন্ধান লইলে যৎসামান্য মূল্যে খরিদোপযোগী বহু বৃক্ষ আয়োজনের সুযোগ পাইতে পারেন।

উলার উত্তর পূর্ব্বপ্রান্তে আড়ণঘাটা রঘুনাথপুর, রাধাকান্তপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ইতর ভদ্র অনেকেরই বাস। ঐ সমুদয় গ্রামে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজিবীদের আঙ্গিনায় ও আশে পাশে সুউচ্চ সারযুক্ত পিটুলীবৃক্ষ প্রচুর পাইতে পারেন। নিরক্ষর দরিদ্র কৃষকদিগকে মিষ্টকথায় দুইআনা চারিআনা দিলেই তাহারা নিরাপত্যে উক্ত গাছ বিক্রয় করিবে। এইরূপ প্রতিগাছে যদি চারি আনা খরিদ ব্যয় হয় তাহা হইলে রেলে বা নৌকাযোগে যাহাতেই চালান দিন না কেন তাহার খরচা উঠিয়াও প্রচুর লাভ দাঁড়াইবে। চূর্ণীনদীর নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত ক্ষুদ্র পল্লীতে ফ্যাক্টরী উপযোগী বৃক্ষ আছে তাহা রেল অপেক্ষা নৌকাযোগেই রপ্তানী করিবার অধিকতর সুবিধা। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে সিমুল, পিটুলী, দেবদারু, বৃক্ষাদি আছে তাহা বীরনগর গ্রামের ষ্টেশনে আনিয়া রেল যোগে পাঠানই সুবিধা। পালিতপাড়া মৌজার অধীন খেনুয়াপাড়ার পল্লীপ্রান্তে সুবিস্তৃত আবাদী ও গোচর মাঠ। তাহারই বিশাল বক্ষে অগণিত সুবিশাল সিমুল বৃক্ষ বিদ্যমান। প্রতিবৎসর সেই সমুদয় বৃক্ষে তুলা ফুটিয়া ফাটিয়া হতাদরে স্তূপীকৃতভাবে মৃত্তিকায় পর্য্যবসিত হয়। ব্যবসায়েচ্ছু বাঙ্গালী যদি তুলার অনুসন্ধান করেন তবে যৎকিঞ্চিৎ মূলধন লইয়া অগ্রসর হইলেও যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন।

এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করিলে এই কাগজের কেয়ারে ডাকটিকিট সহ আমার নিকট পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

সাধারণ বাঙ্গালীর গ্রাহ্য কৃষিপদ্ধতি

(শ্রীসুরথ কুমার সরকার)

(পৌষমাসের অবশিষ্টাংশ)

সাধারণ বাঙ্গালী কৃষক একই স্থানে গড়ে দেড় বিঘা জমি চাষ করে। দেড় বিঘা জমির উপরে মোটরট্রাক্টর ঘুরে না, বা ঘুরিলেও তাহা দ্বারা উক্ত দেড় বিঘার মধ্যে দশ-বার কাঠা জমি মাত্র চাষ করা সম্ভব হয়। সুতরাং মোটর ট্রাক্টর সাধারণ বাঙ্গালী চাষীর পক্ষে চাষের উপযোগী যন্ত্র নহে। বাঙ্গালীকে তাহার নিজস্ব কামার ও ছুতারমিস্ত্রির প্রস্তুত বলদে টানা লাঙ্গলের উপরেই চিরকাল নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু চেষ্টা করিলে আমরা আমাদের এই বলদে টানা লাঙ্গলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে পারি।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ যেভাবে লাঙ্গল প্রস্তুত করা হয় তাহাতে জমি চষিবার সময়ে উত্থিত মাটির চাপড়া লাঙ্গলের ভাঁওরের উভয় পার্শ্বে পড়িয়া অনেকখানি অকর্ষিত জমি ঢাকিয়া ফেলে। ফলে চেষ্টা করিয়াও সম্পূর্ণ জমিতে ভালভাবে চাষ দেওয়া যায় না। লাঙ্গলের "ফাল" যদি প্রচলিত জিহ্বাকৃতি না হইয়া উহার যে কোনও এক পার্শ্বে পাখা লাগান হয়, তাহা হইলে এই অসুবিধা দূরীকৃত হইতে পারে। পাখা বা "কাণ" বিশিষ্ট লাঙ্গল হইলে কর্ষণে উত্থিত মাটির চাপড়াগুলি ভাঁওরের একই পার্শ্বে পড়ে বলিয়া জমিতে চাষ দেওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। এই শ্রেণীর লাঙ্গল শিবপুর ও অন্যান্য কয়েক স্থান হইতে বাহির করিবার চেষ্টা করিবার ফলে "শিবপুর লাঙ্গল" ও তদ্রূপ কোনও পেটেণ্ট নাম বিশিষ্ট কয়েক প্রকার লাঙ্গল বাজারে বাহির হইয়াছে। কিন্তু শক্ত মাটি কর্ষণের পক্ষে ইহাদের কোনটীই কার্য্যোপযোগী হয় নাই।

দোয়ার চাষ দেওয়া হইয়া গেলে মাটি অনেকটা নরম হয়। তখন সেই মাটির উপর একজোড়া বলদে তিনখানি লাঙ্গল আনায়াসে টানিতে পারে। সুতরাং বেশী চাষ দিবার দরকার হইলে তৃতীয়বার হইতে ৩টী বা ৫টী ফলাবিশিষ্ট হাত লাঙ্গলে বলদ জুড়িয়া চাষ দিলে অতি অল্প সময়ে উৎকৃষ্টরূপে জমি কর্ষণ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় একখানি লাঙ্গলের মূল্য ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকার মধ্যে।

জমি কর্ষণে আমাদের দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ আর একটি ভুল করে। লাঙ্গলের "মুট" ভাল করিয়া মাটিতে চাপিয়া ধরা ইহাদের অভ্যাস নাই। অবশ্য, একমাত্র অজ্ঞতাকেই ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না। দেশী লাঙ্গলে সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিলেই ৯।১০ ইঞ্চি গভীর করিয়া জমি চষা যাইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতা, জীর্ণ স্বাস্থ্য এবং ততোধিক জীর্ণ বলদ ইহার অন্তরায়। এদেশে সেইজন্য ২।৩

ইঞ্চির অধিক গভীর করিয়া জমিতে চাষ দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু, মাটি যত গভীর করিয়া কর্ষণ করা যায়, ফসল ততই ভাল হয়, ইহা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। পাশাপাশি জমিতে কেবলমাত্র কর্ষণের তারতম্যে ফসলের পরিমাণে আকাশপাতাল প্রভেদ হইয়া থাকে।

লাঙ্গল টানিবার জন্য যে শ্রেণীর মহিষ এ দেশে প্রতিপালিত হয় সেগুলিও সুস্থ নহে। গরু বা মহিষ যাহাই হউক না কেন সুস্থ ও সমর্থ না হইলে তাহা দ্বারা চেষ্টা করিয়াও গভীর ভাবে ভূমি কর্ষণ করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই দুইটী পশু এতদূর অবহেলিত যে তাহাদিগকে কদর্য্য আহার ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অতি সহজে রুগ্ন ও ক্ষীণজীবি হইয়া পড়িতে হয়। কৃষকগণের কৃষিবিষয়ক শিক্ষার অভাব এবং তাহাদের দারিদ্র্য ব্যতীত এই অবহেলার অন্য কারণ নাই।

আমাদের দেশের কৃষকগণ তাহাদের এই দারিদ্র্যনিবন্ধন পাশ্চাত্য ট্রাক্টর প্রভৃতি মূল্যবান কৃষিযন্ত্র যখন ব্যবহার করিতে অসমর্থ, তখন

যাহাতে তাহাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় গরু ও মহিষগুলি সুস্থ ও সবল হয় তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টিপাত করা উচিত। সুস্থ ও সবল বলদ ব্যতীত গভীরভাবে ভূমি কর্ষণ করা যায় না, এবং কর্ষণ গভীর না হইলে ফসল আশানুরূপ পাওয়া যায় না ইহা বহুযুগপরীক্ষিত সত্য।

আমাদের দেশের কৃষকগণের আর একটী প্রধান অজ্ঞতা—জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে। তাহারা ভূমি হইতে ফসল চায় ষোল আনা, কিন্তু সারের উপকারিতা বোঝে না। সাধারণতঃ তাহারা কোনও দিনই জমিতে কোনও প্রকার সার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। ইহার ফলে একই জমিতে সেই সত্যযুগ হইতে এই কলির শেষ পর্য্যন্ত একই প্রণালীতে চাষ হইয়া আসিতেছে এবং ভূমি নিজেকে নিঃস্ব করিয়া আমাদিগের আহার্য্য যোগাইতেছে। কিন্তু তাহার নিজের ক্ষয় পূরণের জন্য সে নির্ভর করিতেছে একমাত্র প্রকৃতির উপরে। ফলে জমির উৎপাদিকাশক্তি প্রত্যহই তিল তিল করিয়া কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে পাঁচ মণ ফসল পাওয়া যাইত এখন সেখানে একমণ পাওয়াও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। জমির এই ক্ষয় পূরণের জন্য জমিতে সার দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

এ দেশের কৃষক সাধারণ "সার" বলিতে কেবলমাত্র পচা গোবর ব্যতীত অন্য কিছুর ধারণা করিতে পারে না। যখনও সার ব্যবহার করিতে হইলে তাই গোবরই ইহারা ব্যবহার করে। আর, আমাদের দেশের খৈল ও হাড় কৃষকগণের অজ্ঞতাবশতঃ জাপান ও আমেরিকায় চালান যায় এবং তদ্দেশীয় শস্যের পুষ্টি সাধন করে। কৃষক সাধারণের মধ্যে যাহাতে এ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহার কোনও প্রকার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টও করেন নাই, সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা না হয় না ই বলিলাম। জেলার কৃষিতত্ত্বাবধায়কগণও (District Agricultural Superintendent) ইহার প্রয়োজনীয়তা আদৌ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের দেশের কৃষকগণের পরিশ্রমের ফল সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দয়ার উপরে নির্ভর করে। এই নিষ্কাম কর্ম্মীর দেশে কৃষকগণও তাই নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিয়া থাকে। তৎপরে সময়মত সুবৃষ্টি যদি হয় তাহা হইলে তখন তাহাদের মনে বাসনার উদয় হয় ও কিঞ্চিৎ ফসল পাইবার আশায় তাহারা উৎফুল্ল হইয়া থাকে; কিন্তু বৃষ্টির ইতরবিশেষে তাহারা যত অসুবিধা ভোগ করে তত অসুবিধা পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্যতাভিমানী কৃষক ভোগ করে না। এ বিষয়ে বাঙ্গালী কৃষক সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী! কিন্তু অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিবার দিন আর নাই। বিশেষতঃ যেখানে বৃষ্টি না হইলেও সামান্য চেষ্টায় ফসল রক্ষা করার উপায় করা যায় সেখানে অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া থাকা সম্পূর্ণ বোকামি।

প্রত্যেক কৃষিজীবির নিজ আবাদের মধ্যে বা সন্নিকটে জলাশয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। নিকটে জলাশয় না থাকিলে উহা খননের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই জলাশয় হইতে জল ছিটাইয়া প্রয়োজন মত সমগ্র ক্ষেত্র ভিজাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য force pump বিশেষ উপযোগী। আমাদের স্বদেশী "দোনা" অপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা

(২) নাটা খাইয়া জ্বর বন্ধ হইলে পুনরায় জ্বর হয় না (relapse)।

৩। ইহাতে মাথা ঘোরা, কাণ ভোঁ ভোঁ করা—এই সব দোষ হয় না।

(৪) নূতন পুরাতন—সব জ্বরই নাটায় ভাল হয়।

(৫) প্লীহা যকৃত ভাল করে।

(৬) শরীরে রক্তকণা (red corpuscles) জন্মায়।

(৭) বমি করায় ও প্রস্রাব করায়; কোষ্ঠ-গত বায়ু সাম্য করে।

(৮) পেটের অসুখ, মূর্চ্ছা, গর্ভাবস্থাতেও নাটা খাওয়ান যায়, কোন দোষ হয় না।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী—নাটার খোসা ভাঙ্গিয়া, শাঁস রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিবে। ঐ গুঁড়া শিশিতে রাখিবে। পিপুলচূর্ণ এক শিশিতে রাখিবে।

মাত্রা—পূর্ণ বয়স্ক রোগী ৮ গ্রেণ নাটার গুঁড়া এবং দুই গ্রেণ পিপুলচূর্ণ, ঠাণ্ডা জল মুখে রাখিয়া খাইবে। বয়স কম হইলে মাত্রা কম। কিছু কমবেশী হইলে কিছু দোষ হইবে না। ঔষধ খাওয়াইবার পূর্ব্বদিন একটী জোলাপ নিলে ভাল হয়; আর ঔষধ খাওয়াইবার ১০।১৫ মিনিট পূর্ব্বে এক পেয়ালা গরম দুধ রোগীকে খাইতে দিবে।

ম্যালেরিয়া বা নূতন পুরাতন জ্বর ইহাতে বেশ সারিয়া যাইবে। ব্যবহার করা তেমন শক্ত নয়, পয়সাও বেশী লাগে না।

অম্ল রোগের ঔষধ

অম্ল-অজীর্ণরোগের সন্ন্যাসী প্রদত্ত একটি ঔষধ নিম্নে দিলাম। এই ঔষধে শত শত রোগীকে আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি।

জোয়ান চূর্ণ ✓০ এক ছটাক, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ✓০ এক ছটাক, সোহাগার খই চূর্ণ ✓০ এক ছটাক

ও বিট লবণ চূর্ণ ৵০ আধ পোয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া আহারের পর ।• চারি আনা ওজনের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহ সেব্য। পথ্য সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিছু দিন ধরিয়া নিয়মিত ভাবে এই ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইবে।

রক্ত-আমাশয়

১। শেওড়া বা শড়া গাছের পুরানো পাতা ১৫।১০টী পাথরের পাত্রে ৵০ পোয়া আন্দাজ আকের গুড়ের সহিত মিশাইয়া খুব রগড়াইতে হইবে। কিছুক্ষণ রগড়াইলে উহার রস গুড়ের সহিত মিশিয়া যাইবে, ঐ রসযুক্ত গুড় সরবৎ করিয়া রোজ সকাল ও সন্ধ্যায় ৩।৪ দিন খাইলে অনেক দুরারোগ্য রক্ত-আমাশয় ভাল হইতে দেখা গিয়াছে।

২। তুলসীর মূল পানের সহিত সেবন করিলেও আরোগ্য হয়।

ঘামাচি নিবারণের উপায়

Bicarbonate of soda ১ আউন্স আন্দাজ ২ পাইট জলে মিশাইয়া রোজ স্নানের ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঘামাচি স্থানে ভাল করিয়া লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ ৩।৪ দিন করা দরকার।

ছুলির ঔষধ

১। ছুলি, ব্রণ, বসন্তের দাগ, মেচেতা পড়া ইত্যাদি যাবতীয় মুখের দাগ নিম্নলিখিত উপায়ে একেবারে উঠিয়া যায়, ইহা আমার বিশেষ জানা আছে।

শিমূল কাঁটা, কাঁচা গরুর দুধে চন্দনের মত ঘসিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইতে হয়, বেশী দিনের হইলে বেশী দিন ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু ফল পাওয়া যায় ২।৩ দিনেই। ইহা Film Artist দের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ছুলির ঔষধ

২। মূলার বীজ (টক্) দধির সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে—অথবা আশশেওড়ার ছাল ডাল সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কেওড়ার পাতার রস—দিন তিন চারবার মাখিলেই ছুলি বিনষ্ট হয়।

৩। শুষ্ক কলার পাতা পোড়াইয়া ছাই লইবে, এই ছাই জলে গুলিয়া খুব মোটা কাপড় ৪।৫ পুরু করিয়া ছাকিয়া লইবে—এই জলের সহিত সামান্য একটু হলুদ চূর্ণ মিশাইয়া মাখিলে ছুলি সত্বর আরোগ্য হইবে।

৪। দধি ও মূলার বীজ বা পুরাতন তেঁতুলের জল কিংবা যবক্ষার ও গন্ধক সমভাগে সর্ষপ তৈল সহ অথবা ঘষাচন্দনে সোহাগার খৈ মিশাইয়া ছুলির উপর মাখাইলে ছুলি আরোগ্য হয়।

বরফ প্রস্তুত প্রণালী

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বরফের চাহিদা খুব বেশী এবং ইহার প্রয়োজন ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। যেখানে মাছের ব্যবসা খুব ভালো চলে, সেখানে মাছ স্থানান্তরিত করিতে হইলে বরফের সাহায্য না লইলে চলেই না। কাজেই বরফ প্রস্তুত করা যে লাভজনক ব্যবসায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরো একটু সুবিধার কথা এই যে, এ-ব্যবসায় বিরাট ভাবে আরম্ভ করাও যেমন আর্থিক লাভজনক তেমনি অল্প পুঁজি লইয়া ব্যবসায়ে নামিলে ক্ষতিগ্রস্থ হইবার আশঙ্কাও নাই। যাঁহাদের এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা উভয় প্রকারেই বরফ প্রস্তুত করিতে পারেন।

কৃত্রিম উপায়ে বরফ প্রস্তুত করা ভারতে পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল না। মুসলমান আমলের কতকগুলো গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। তবুও ইহা অস্বীকার করা চলে না যে কেবলমাত্র আধুনিক সময়েই ইহার ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সকলে সচেতন হইয়াছেন। বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে সমস্ত কলকব্জা বিশিষ্ট ঠাণ্ডী মেসিনের (refrigeration) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্যই এই বিভাগে একপ্রকার যুগান্তর আসিয়াছে বলিলেই হয়। থার্মো-ডিনামিক্স্—এর নিয়মকানুন উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করাতেই উত্তাপ নষ্ট করিবার জন্য নব নব যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। কোন দ্রব্যে শীতলতার ভাব প্রবেশ করাইতে হইলেই উহার অন্তর্নিহিত তাপের হ্রাস সাধন করাইতে হয়। ষ্টীম ইঞ্জিন, তৈল কিংবা গ্যাস্ চালিত ইঞ্জিন অথবা ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা উত্তাপ পাম্প করিয়া আনিতে হয়। ঠাণ্ডী মেসিনের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব।

ঠাণ্ডী মেসিনের শ্রেণী বিভাগ

এই মেসিনকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) প্রথম শ্রেণীর মেসিন বাতাস কিংবা গ্যাসের চাপ দিয়া উত্তাপ বাহির করিয়া লইয়া থাকে। তৎপরে ঠাণ্ডা হইতে দিলেই উহা পরে প্রসারিত হইতে থাকে। এই উভয় কার্য্যের জন্যই সুবিধাপ্রদান করা বৈজ্ঞানিক মহলে একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মেসিন কোন রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং উহা সাধারণতঃ শৈত্যভাবপ্রধানই হইয়া থাকে। তৎপরে উহাকে একবার জমাইতে হয় এবং একবার বাষ্প করিয়া (vaporise) ফেলিতে হয়। আজকালকার দিনে প্রথম শ্রেণীর মেসিন আর চলে না, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেসিন ব্যবহার করাই হাল-ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকেও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) একটীকে বলে absorption process বা নিঃসারণ পদ্ধতি।

(খ) দ্বিতীয়টীর নাম Compression machine বা চাপ-কল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্‌স্‌ ইউরিং-এর গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে চাপ কল নিঃসারণ পদ্ধতির চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশী কার্য্যকরী।

ঠাণ্ডা মেসিনের বিভিন্ন ব্যবহার

ফলমূল, শাকশব্জী, ডেয়ারীর উৎপন্ন দ্রব্য, মাছ, মাংস প্রভৃতিকে শৈত্য দ্বারা রাখা করিবার জন্যই এই সমস্ত আধুনিক ঠাণ্ডা মেসিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক রাসায়ণিক ক্রিয়াতেও ইহার সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রতদ্ব্যতীত উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাতের গুণ-সমন্বয়ের tempering) জন্য, অ্যান্টি-টক্সিন এবং সিরাম চলচ্চিত্রের বহিরাবরণ ফটোগ্রাফীর কাগজ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি পরীক্ষার জন্য ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। ফ্যাক্টরী এবং থিয়েটার গৃহের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যও আজকাল ইহার প্রচলন হইতেছে। তবে বলা বাহুল্য যে, বরফ নির্ম্মাণেই ইহার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

চাপ-কলে বরফ প্রস্তুত করিতে গেলে একটী বরফ নির্ম্মাণ করিবার ট্যাঙ্কের বা চৌবাচ্চার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে ঠাণ্ডা করিবার উপযোগী কতকগুলি পাইপও লাগান থাকে। এই শ্রেণীর মেসিন নির্ম্মাণে যতই তফাৎ থাকুক না কেন, প্রত্যেকটীতেই চাপ, জমান, এবং বিস্তার করিবার উপযোগী সাজসরঞ্জাম বর্ত্তমান থাকে।

ঠাণ্ডা করিবার উপাদান

যে সমস্ত উপাদান ইহার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে তন্মধ্যে (১) Anhydrous ammonia, (২) Carbonic anhydride, ৩) অ্যালকহল, (৪) Bisulphide of Carbon, (৫) Gasoline, (৬) Eather, (৭) Methyl and sulphuric ether, (৮) Carbon bisulphide, (৯) methylated chloride, (১০) ethylene, (১১) pictean fluid প্রধান। ইহার মধ্যে anhydrous ammonia (NH_3) এবং carbonic anhydride (CO_2) নামক দুইটী পদার্থ anhydrous. আজকাল যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে আমোনিয়াই প্রধান এবং আধুনিক ফ্যাক্টরী-গুলিতে ইহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা যে সমস্ত মেসিনে ব্যবহৃত হয়, তাহার কাজ দুই প্রকারে চলিয়া থাকে, যথা, শুষ্ক-চাপ (dry compression) এবং সিক্ত-চাপ (wet compression)। ইহার দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন্‌টী বেশী কার্য্যকরী তন্মধ্যে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়া গিয়াছে।

অ্যামোনিয়ার চাপে (ammonia compression) এবং বিস্তার করিবার পদ্ধতিতে (expanssion system) যে সমস্ত কলে কাজ চলিয়া থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত অংশগুলি প্রধান :—

(১) চাপিবার কল, যাহা অ্যামোনিয়া গ্যাস্‌কে পাম্প করিয়া আনে।

(২) জমাইবার কল, যেখানে পূর্ব্বোল্লিখিত অ্যামোনিয়া গ্যাস ঠাণ্ডা হইয়া ঘূর্ণ্যমান জলের সাহায্যে দ্রব হইয়া আসে।

(৩) তৎপরে এই তরল অ্যামোনিয়া। অ্যামোনিয়া গ্রহণ করিবার কলে (Ammonia Receiver) জমা করিয়া রাখা হয়।

(৪) চাপ-কল হইতে যদি তৈল কোন প্রকারে বাহির হইয়া আসে তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য তৈল সম্বরণী যন্ত্র (oil interceptor) ও বর্ত্তমান আছে।

(৫) তৎপরে তরল অ্যামোনিয়াকে freezing coil এ ফেলিয়া বিস্তার সাধন করিবার জন্য একপ্রকার Expansion value ব্যবহৃত হয়।

(৬) বরফ প্রস্তুত করিবার উপযোগী ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা। ইহা ইস্পাতনির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং ভিতরেও পাইপ এবং পাশ (coil) বর্ত্তমান থাকে। এই চৌবাচ্চার মধ্যে যে লোনা জল থাকে তাহার মধ্যেই বরফের পাত্র। (ice can) চুবাইয়া দিতে হয়।

বরফ নির্ম্মাণ করিবার বিভিন্ন প্রণালী।

আজকাল তিন প্রকার পদ্ধতিতে বরফ নির্ম্মাণকার্য্য চলিয়া থাকে, যথা, Can System, Call System এবং plate system। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত প্রথাতেই সর্ব্বত্র কাজ চলিয়া থাকে। call system ও এক সময় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। Plate System এক সময়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, ইংলণ্ড এবং অন্যত্রও সমাদৃত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র Pluperfect পদ্ধতি ছাড়া ঐ উপায়ে আর কেহ বরফ প্রস্তুত করে না। এই তিন প্রকার প্রথার মধ্যেই can ice system ব্যবসায়ী মহলে আসন কায়েমী করিয়া লইয়াছে।

Can সহযোগে বরফ নির্ম্মাণ করা।

এই প্রথায় বরফ নির্ম্মাণ করিতে গেলে টিন কিংবা গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্ (galvanised) পাত্রে অথবা ছাঁচে জল ফেলিয়া জমাইয়া লইতে হয়। তৎপরে ইহাকে একটী ঠাণ্ডী লোনা জলের ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চায় বসাইয়া দিতে হয়। যাহাতে বরফের অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়াও এই তরল জল সময়োপযোগী কাজ চালাইয়া লইতে পারে তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা। সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড-এর সলিউসনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তাহা অথবা সেডিয়ম ক্লোরাইডের সলিউসনেও কাজ চালানো যাইতে পারে। পাত্রের চতুর্দ্দিকে লোনা জল থাকে এবং উহা সাধারণতঃ বাষ্পকারকের (evaporator) বহির্ভাগের সংস্পর্শে শৈত্যভাব বজায় রাখিয়া থাকে। জলকে বরফে পরিণত করিবার জন্য উহা হইতে উত্তাপ নিঃসারণ করিবার যে প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা লোনা জলের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়; কেন না, আকর্ষিত উত্তাপ ইহার সাহায্যেই বাষ্পকারকের চৌহদ্দিতে পড়িয়া থাকে।

পাত্র বা ছাঁচগুলি (can) দীর্ঘাকারের হইয়া

থাকে। উহার বিস্তার যতটা হইবে, গভীরত্ব তাহার তিনগুণ হওয়া চাই; এবং লম্বাতেও অন্ততঃপক্ষে বিস্তারের দ্বিগুণ হওয়া চাই। ইহার উপরেই বরফের আকৃতি, ঘনত্ব এবং দীর্ঘতা নির্ভর করে।

বরফ তৈয়ার করিবার মেসিনের আকৃতি বরফ বানাইবার ছাঁচের আকারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। স্থানীয় বাজারে কোন্ প্রকারের বরফের চাহিদা বেশী হইবে তদনুসারে আবার ছাঁচের আকারও ঠিক করিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ লিখিত ধরণের বরফ ও ছাঁচ নির্ম্মাণ করাই বাজারে রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে:—

৫৫ পাউণ্ড	৫"×১৪"×৩২"
১৪০ "	৮"×১৬"×৩৬"
১৫০ "	৮"×১৬"×৪২"
৩০০ "	১১½"×২২½"×৪৪"

যাহারা বরফ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাদের কাছে বরফের আকার ছোট বড় হইলে কিছু যায় আসে না। কেননা, তাহারা ইচ্ছা করিলেই বরফ চূর্ণ করিয়া লইয়া কিংবা করাত দিয়া কাটিয়া লইয়া উহাকে ইচ্ছাস্বরূপ ব্যবহার করিতে পারে। কলের মালিকের কাছে কিন্তু ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। কেন না, ক্রেতার ক্রয় করিবার ক্ষমতার কথা কোন ব্যবসায়ীই ভুলিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত, মেসিন চালাইবার খরচও ইহার উপর কতকটা নির্ভর করে। অভিজ্ঞতায় কিন্তু দেখা গিয়াছে যে বড় মিলের পক্ষে ৩০০ পাউণ্ডের বরফ প্রস্তুত করাই আর্থিক সুবিধাজনক। যাঁহারা মাঝারি আকারে কল লইয়া কাজ করিতে চাহেন, তাহাদের পক্ষে ১৫০ পাউণ্ডের বরফ নির্ম্মানোপযোগী কল ক্রয় করাই সুবিধাজনক। ছোট এবং মাঝারি আকারের কলে ৫৫ পাউণ্ড বরফ ধরিতে পারে এমন পাত্র ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ইহাতে জল তাড়াতাড়ি জমিয়া যায়, নাড়া চাড়া করিতেও সুবিধা, প্রারম্ভের ব্যয় বেশী নহে এবং আকারও বেশ কার্য্যোপযোগী।

বরফ প্রস্তুত হইতে কত সময় লাগিবে তাহা পাত্রের আকারের ওপর নির্ভর করিবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে জল পানের উপযুক্ত তাহা হইতেই বরফ প্রস্তুত হইতে পারে; এবং বেশীর ভাগ কলই এই কথাটী মনে রাখিয়া জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। কেননা, এরূপস্থলে জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু যেখানে জল কূয়া কিংবা ইঁদারা হইতে সংগ্রহ করা হয়, সেখানে উহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

খেলনার পুতুলের ব্যবসায়

ভারতবর্ষের প্রাচীন কারীকরগণ আজকালকার মত নানা ঢঙের পুতুল নির্ম্মাণ করিতে জানিত না। যাহাদের হাতে এই শিল্পের ধারা অব্যাহত রাখিবার ভার ছিল, তাহাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত; চিরাচরিত পন্থার ব্যত্যয় করিয়া তাহারা নূতন কিছু করিবার জন্য কোনদিন শিক্ষা পায় নাই। তাই যেদিন পাশ্চাত্য দেশসমূহের নানা রকমের পুতুল বন্যার মত ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেদিন উহার গতি ঠেকাইয়া রাখিতে আর কেহ সমর্থ হইল না। আমাদের দেশের পুতুল-শিল্পের যতই স্থায়িত্ব গুণ থাকুক না কেন, উহা জাপানী, আমেরিকান এবং ইউরোপীয় শিল্পীদের নির্ম্মিত খেল্‌নার মত নয়ন মনোরঞ্জক নয় বলিয়াই শিশুদের মহলে আর হাট বসাইতে পারিল না।

দেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেল্‌নার ব্যবসাও দেশ হইতে বিতাড়িত হইল এবং তাহার জয়গায় কায়েমী হইয়া বসিল বিদেশীর এই ঠুন্‌কো আপাতমনোহর কারুশিল্প। ব্যাপারটী বাহির হইতে দেখিতে গেলে কিছুই নহে বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে; কিন্তু বিষয়টী যে অনেকখানিই গুরুতর, তাহা একটু বিশেষভাবে বিবেচনা করিলেই বোঝা যাইবে। পুতুলের বাবদ যে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায় তাহার কথা বাদ দিলেও, মানুষগঠনের কথা হিসাবের বাহিরে নিয়া গেলে চলিবে না। কেননা, শিশুদের মনে ছোটবেলায় যে ছাপ পড়িয়া যায় তাহা আর সহজে দূরীভূত হইতে পারে না। আজকাল বিজাতীয় রুচিসম্পন্ন যে-সমস্ত পুতুল হু-হু বেগে আসিয়া দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কি আমাদের শিশুদের মনেও একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত করে নাই? আমরা বহুদিন হইল শৈশব অতিক্রান্ত করিয়াছি, বাজেই ইহার কোন সঠিক উত্তর দিতে আমরা পারিলাম না; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আমাদের কথা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন না। এতদ্ব্যতীত, পুতুল কিনিবার সময় আমরা উহার বিশেষত্বটুকু একটুখানি পরখ করিয়া না দিলে অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল করিব; কেননা, বিংশশতাব্দী বৈজ্ঞানিক ও কলকজার যুগ। এ সময়ে যদি শিশুদের মনে ইহার দিকে একটু পক্ষপাতীত্বের সূচনা করা যায়, তাহা হইলে দেশ যে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না তাহা আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি।

দেশে এই শিল্পের আদর ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ইহা যে আরো দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত একই ঠাঁটে চলিতে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই আমাদের মনে হয় যে সম্ভব হইলে এখনই প্রত্যেক প্রদেশে অন্ততঃপক্ষে

একটী করিয়া পুতুল নির্ম্মাণ করিবার ফ্যাক্টরী গড়িয়া তোলা উচিৎ। কোন কোন জায়গায় চাহিদা এত বেশী পড়িয়া যাইবে যে সেস্থলে দুইটী কিংবা তাহারো অধিক ফ্যাক্টরী বসাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইবে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরীর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জন হইবে না, পরন্তু যাহাতে উৎপাদিত শিল্পগুলি দ্বারা লোক শিক্ষিতও হইতে পারে তাহার দিকে নজর দিতে হইবে। জ্ঞান বিস্তার এবং দৈহিক শক্তির উদ্বোধনে যাহাতে এই শিল্প কার্য্যকরী হয়, তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিলে প্রকৃত দেশের উন্নতি করা হইবে।

পুতুল নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে যে অনেক লাভ আছে তাহা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পুতুল এবং অন্যান্য প্রকারের খেল্‌না সম্বন্ধে এই মন্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্ন কারখানা হইতে যে আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতেই পুতুল নির্ম্মাণকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। এই সমস্ত আবর্জ্জনা কোথায় পাওয়া যাইতে পারে, তৎ সম্বন্ধে আমরা কিছু নির্দ্দেশ বা অভিজ্ঞান দিতে চাই।

যে সব কারখানায় তুলা, সিল্ক কিংবা পশম লইয়া কাজ করা হয়, সেখান হইতে আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া উহা পুতুলের বেশ বিন্যাসের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাপাখানা কিংবা বুক-বাইণ্ডিং এর আড়ৎ হইতে বাজে কাগজও এইজন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। টিনের টুক্‌রা কিংবা লৌহ দিয়াও খেল্‌নার জন্য বিউগিল, তরবারি, গাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। নানান ঢঙের হাস্যকর ছবি (ক্যারিকেচার) এবং গোলকধাঁধা প্রস্তুত করিতেও বাজে কার্ডবোর্ড কাজে লাগিয়া যায়। গাড়ীর উপরে মানুষ প্রভৃতি বসাইতেও অনেক সময় পরিত্যক্ত কাঠের টুকরা ব্যবহৃত হয়। মোট কথা, নানান ঢঙের হাস্যকর খেল্‌না নির্ম্মাণের জন্য এই সমস্ত বাজে জিনিষের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। এইরূপেই নৃত্যদেদুল পুতুল, ঘাড়-নাড়িতে ব্যস্ত খেল্‌না, ম্যাজিকের ঠাট—সমস্তই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পুতুল এবং খেল্‌না মাটী, সিমেণ্ট,

রবারের পুতুল

এই প্রকারের খেল্‌না দুই শ্রেণীর হইতে পারে, ফাঁপা এবং নিরেট। শেষোক্ত শ্রেণীর পুতুল নির্ম্মাণ করা খুব বেশী শক্ত নহে। রবারকে ভাল কালাইজ. (উত্তাপের দ্বারা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত না করিয়া) উহাকে ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়; তাহার পরে উহাকে ঈষৎ চাপ দিলেই অতিরিক্ত মালমসল্লা বাহির হইয়া যায়। তখন কিছু ফ্রেঞ্চ চক্ বা সোপ্‌ষ্টোন্ গুড়া করিয়া সমস্ত জিনিষটাকে একটী শক্ত ছাঁচের (mould) মধ্যে রাখিতে হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহাতে এই ছাঁচের মধ্যে কোন প্রকারে হাওয়া প্রবেশ করিতে কিংবা থাকিতে না পারে। ছাঁচের মুখ যখন একেবারে বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই কাজের কথাটী ভুলিয়া গেলে চলিবে না। অনেকে আবার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা মোল্ড বা ছাঁচও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ছাঁচে ঢালিয়া ফাঁপা পুতুল এবং খেল্‌না অনেক সময় নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে। কুঁদ যন্ত্রের শঙ্কু (mandril) দিয়া ভিতরটাকে ফাঁপা করিয়া দেওয়া যায়। অনেকে আবার পুতুলের অভ্যন্তর ভাগ গ্যাসের সাহায্যেও ফুলাইয়া নিয়া থাকেন। শেষোক্ত পদ্ধতিতে বল প্রভৃতি স্ফীত করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সীট রবারের দুই অংশকে জোড়া দিয়াই এই প্রকারের খেল্‌নার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, এই শিল্পের হাতের কারিগরী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তবে বল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে অনেক সময়ে মেসিনেরও সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

রবারের বল

সাধারণ রকমের ফাঁপা রবার বল প্রস্তুত করিতে মিশ্রণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। কেননা; মিশ্রণ ঠিক মত না হইলে বল স্ফীত করিবার জন্য যে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা সহজেই বলের গাত্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে; নতুবা রবারের ছিদ্রকে পূর্ণ করিয়া উহার আবরণ নষ্ট করিতেও উহা প্রস্তুত করে না। এরূপ ক্ষেত্রে বলের বহিরাবরণ

যায়। কাজেই বলের উপাদানের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে পিচ, কিংবা ওজোকেরাইট্ (ozokerite) এবং পিচ্ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখা উচিৎ যে ইহার সঙ্গে কখনো সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করা কোন আবর্জ্জনাদি মিশাইবে না। ইহাতে বলের গায়ে নানা প্রকারের দাগ পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। পিচ্ ব্যবহার করা হইলে বলের রঙ্ অনেকটা কালো হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে বিভিন্ন রঙের বল নির্ম্মাণ করাই উদ্দেশ্য সেখানে একটু পিচ্ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হয় না। নিম্নলিখিত মিশ্রণগুলি ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি :—

(১)

Hevea Rubber	...	50	parts
Ceara ...	...	,,	,,
Sulphur ...	...	12	,,
Zinc white ...	..	120	,,
Whiting ...	...	150	,,
Pitch ...	...	3	,,

(২)

Hevea Rubber	...	160	parts
Ozokerite ...	...	4	,,
Sulphur ...	...	12	,,
Reclaimed rubber	...	80	,,
Zinc white ...	...	120	,,
Whiting ...	...	150	,,
Pitch ...	...	2	,,

এই সমস্ত মিশ্রণগুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া লইয়া উপযুক্ত ঘনত্ব-বিশিষ্ট পাত্ (sheet) তৈয়ার করিতে হয়। তারপরে প্রয়োজন ত কাটিয়া লইয়া উহার পার্শ্বদেশ মসৃণ এবং গোলাকার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইহার তিন টুকরা দিয়াই বল নির্ম্মিত হয়; অনেকে আবার ৪ হইতে ৬ টুকরা পর্য্যন্ত বল নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তৎপরে রবারকে ন্যাপ্থা (naphtha)র সঙ্গে গলাইয়া লইয়া যে রবার সলিউশন হইবে, তাহা দিয়া টুকরাগুলির পার্শ্বদেশ জুড়িয়া আটিয়া দিবে। এখন ইহা দেখিতে কতকটা সুপারীর মত হইবে। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত কার্য্য হাত দিয়াই সম্পন্ন করিতে হইবে, তবে অনেকে আবার মেসিনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই বল নির্ম্মাণ করিতে যে সমস্ত টুক্রার প্রয়োজন হইবে, তাহার একটীর অভ্যন্তরভাগে অল্প পরিমাণে ভ্যালকানাইজ্ (vulcanise) করা রবারের প্লাগ (plug) রাখিয়া দিবে; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। বলের মুখ আটকাইবার পূর্ব্বে উহার আকৃতি অনুসারে ৮ হইতে ৪৫ গ্রাম কার্ব্বোনেট অফ্ অ্যামোনিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। একটু উত্তপ্ত হইলেই এই উপাদানটী বাষ্পের সৃষ্টি করিয়া বলকে গোল কিংবা প্রয়োজনমত অন্য আকার প্রকার প্রদান করিয়া থাকে। কার্বোনেট অফ্ অ্যামোনিয়াকে ভিতরে রাখিয়া দেওয়ার পর বলের শেষ ছিদ্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়; বলটী যাহাতে এয়ার-টাইট বা বায়ুশূন্য হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহার পরে বলের আকৃতিবিশিষ্ট একটী লৌহ ছাঁচে রবারের দ্রব্যটী রাখিয়া দিতে হয় এবং ছাঁচগুলিকে ফ্রেমে আটকাইয়া ভ্যাল্কানাইজারে (vulcaniser) ফেলিয়া দিতে হয়। ছাঁচগুলিকে ঠিক জায়গামত রাখিবার জন্য সাধারণতঃ লৌহ-শলাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন; কেননা, যখন উত্তাপ ছাড়িতে থাকে, তখন ছাঁচের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। ফ্রেমগুলি শক্ত না হইলে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যদি একটী ছাঁচ কোন প্রকারে স্থানচ্যুত হইয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত ফ্রেমটীর কাজই মাটি হইয়া যাইবে। ইহার পর ছাঁচ হইতে বল বাহির করিয়া লইলে উহা সঠিক আকারেই হাজির হইবে, এবং গায়েও কোন প্রকার জোড়া দিবার দাগ নজরে পড়িবে না। কেবলমাত্র ছাঁচের গায়ে যে জোড়া দিবার চিহ্ন থাকে, তাহাই উহাতে পরিলক্ষিত হইবে। এই দাগ উঠাইবার জন্য সাধারণতঃ এক প্রকার পাথর ব্যবহৃত হয়। তৎপরে বলের গায়ে চাহিদানুরূপ রঙ্ করিয়া উহাকে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিলেই হয়।

(বারান্তরে সমাপ্য)

চামড়া ট্যান্ করিবার প্রণালী

আধুনিক কালে চামড়া প্রস্তুত করিবার দুই প্রকার প্রথা বিদ্যমান আছে। একটিকে বলে বল্কল বা বার্ক ট্যানিং, অপরটির নাম ক্রোম ট্যানিং।

বার্ক ট্যানিং

যে সমস্ত গাছের বল্কলে, ফলে এবং পাতায় 'ট্যানিন' নামক পদার্থ (যাহা চামড়া নির্ম্মাণের প্রধান উপাদান) বর্ত্তমান থাকে, তাহা দিয়াই বার্ক ট্যানিংএর কাজ করা হয়। যদিও বাংলা দেশের অনেক গাছেই এই পদার্থ পাওয়া যায়, তবুও নিম্নলিখিত চারিটি বৃক্ষের বল্কলে চামড়া প্রস্তুত করিবার ভাল উপাদান পাওয়া যায় এবং সাধারণ কার্য্যের জন্য উহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের নাম—

(১) বাবুলের বল্কল

(২) গোরানের বল্কল

(৩) সোমালির বল্কল

(৪) মায়রাবোলন্স

গোরান ব্যতীত সমস্তগুলিই বাংলাদেশের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। কেবলমাত্র গোরান সুন্দর-বন অঞ্চলে পাওয়া যায়; তবে ইহা প্রচুর পরিমাণে কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে।

বল্কল বা বার্ক ট্যানিং অনেক প্রাচীন প্রথা। যদিও আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানের দৌলতে এই পদ্ধতিতে অনেক উন্নতি সাধিত করা হইয়াছে, তবুও ইহার মূলনীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাতেও এই প্রথা অনেক কালের প্রাচীন। কাজেই এখানকার লোকেরা ইহার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানে। এমন কি পাড়াগাঁয়ের চামারগণ পর্য্যন্ত ইহার ব্যবহার জানে; একটু বুদ্ধি খাটাইলেই প্রচলিত পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধন করা যায়।

বার্ক ট্যানারীর যন্ত্রপাতি সমূহ

গাছের বাকল ট্যান্ করিতে গেলে মেসিনারী বা কলের যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইলেও চলে। যে সমস্ত ট্যানারীতে খুব বেশী প্রকার মালমসল্লা সঞ্চিত নাই সেখানেও বিক্রয়োপযোগী চামড়া হাত দিয়াই প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ছোট খাট বার্ক ট্যানারীর জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি না হইলেই চলিবে না।

(ক) গাছের বাকল এবং অন্যান্য উপাদান চূর্ণ করিবার জন্য একটি ঢেঁকি চাই। ধান ভানিবার জন্য বাংলা দেশে সাধারণতঃ যে প্রকার ঢেঁকি ব্যবহৃত হয়, ইহা তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের। কেননা, এই শ্রেণীর ঢেঁকির মূষলের মাথায় এক জোড়া বাটালির (chisel) মত অস্ত্র লাগানো থাকে। যেখানে মূষল পড়িবে সেখানে একখণ্ড কাঠের উপর গাছের বাকল প্রভৃতি রাখিতে হয়। ঢেঁকিতে পাড় দিলে পরেই মূষলস্থ বাটালির সাহায্যে চামড়া নির্ম্মাণ করিবার উপাদান সমূহ কুঁচাইয়া কর্ত্তিত হইয়া যায়, এই বাটালি যে কোন কামার নির্ম্মাণ করিতে পারে। ঢেঁকিও পাড়াগাঁয়ের ছুঁতারের সাহায্যে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ তিনজন

স্ত্রীলোক সহজেই একটী ঢেঁকি চালাইতে পারে। দুই জন পাড় দিতে থাকে, তৃতীয়া মুষলের কাছে বসিয়া বাকল প্রভৃতি কাটিতে সাহায্য করিয়া থাকে।

মায়রাবোলন্স-এর বাকল চূর্ণ করা সাধারণ ধান ভানিবার ঢেঁকিতেই চলিতে পারে। বিহার এবং পশ্চিমে গম কিংবা তামাক যেমন করিয়া প্রস্তুত করে, তেমনি করিয়া কাঠের হামানদিস্তা ও মুষল দিয়া মায়রাবোলন্স হইতে চামড়ার উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।

(খ) তৎপরে চামড়া ভিজাইয়া রাখিবার জন্য গামলা কিংবা বড় বড় কাঠের পাত্রের প্রয়োজন হইতে পারে।

রাজমিস্ত্রীরা চূণ-সুরকি প্রভৃতি ভিজাইয়া রাখিবার জন্য যে প্রকার ছোট ছোট চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে তেমনি চৌবাচ্চা মাটীর নীচে কিংবা জলো জায়গায় মাটীর উপরে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। গরু কিংবা বলদের চামড়া ভিজাইয়া রাখিবার জন্য ৬´×৫´×৪´ আকারের চৌবাচ্চার প্রয়োজন হয়, ছাগল ভেড়া প্রভৃতির চামড়ার জন্য ৩´×৩´×৩´ আকারের চৌবাচ্চাই যথেষ্ট। পার্শ্বের দেয়াল-গুলো অন্ততঃপক্ষে ২০ ইঞ্চি চওড়া হওয়া চাই; প্লাষ্টার দিবার সময় উত্তমশ্রেণীর লৌহোপাদান বর্জ্জিত সিমেণ্ট ব্যবহার করিতে হইবে।

ছোট ছোট ট্যানারীতে চৌবাচ্চার কাজ কাঠের পাত্র কিম্বা গামলাতেই চলিতে পারে। ৮০ গ্যালন ধরিতে পারে এরূপ মদের জালাকে (spirit barrel) দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেই চামড়া ভিজাইবার উপযোগী পাত্র হইবে। ছোট ছোট চামড়া ভিজাইবার জন্য ৪০ গ্যালন ধারণোপযোগী তৈলের জালাই (lubricating oil barrels) উপযোগী। গেঁয়ো কুমোরের তৈয়ারী মাটির জালা দিয়াও কাঠের পাত্রের কাজ চালানো যাইতে পারে।

(গ) পশ্বাদির লোম এবং চর্ম্মস্থ মাংস ছাড়াই-বার জন্য খেজুর গাছের কাণ্ড ব্যবহার করার রেওয়াজ আছে। ইহা প্রস্তুত করিবার ভার স্থানীয় ছুতারের উপর দেওয়া যাইতে পারে।

পছন্দসই একটি গাছ হইতে ৪টি কাণ্ড কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৪ ফিট করিয়া হওয়া চাই। ভিতরে ছোবরার মত যে অংশটি থাকে, তাহাকে বাদ দিয়া বাহিরাবরণ চাঁচিয়া ছুলিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। এগুলি অনেকদিন টিকিয়া থাকে এবং আলোচ্য কর্ম্মের জন্য খুব উপযোগীও বটে।

(ঘ) চামড়া রঙ করিবার ও মসৃণ করিবার জন্য একটি মার্ব্বেল কিম্বা পাথরের টেবিল চাই। উহার আকার হইবে ৬×৪ ফিট

(ঙ) যন্ত্রপাতির মধ্যে লোম ও মাংস চাঁচিয়া তুলিবার উপযোগী ছোট ছুরী চাই। এতদ্ব্যতীত লৌহ, পিত্তল, পাথর এবং কাঁচের Stickerও প্রয়োজনে পড়িবে। চামড়াতে চর্ব্বী লাগাইবার উপযোগী কয়েকটি বুরুশেরও দরকার আছে।

এই সমস্ত দ্রব্যাদি একটী স্বতন্ত্র গৃহে রাখিতে হইবে; উহা ইট পাথরের নির্ম্মিত না হলেও চলে। খড়ের ঘর, গোলপাতার ঘর, কিম্বা খোলার ঘর হইলেও আপত্তি নাই।

বাকল হইতে প্রস্তুত করা বিক্রয়োপযোগী বিভিন্ন ধরণের চামড়ার কথা এক্ষণে বলা যাউক।

(১) বলদের চামড়ার বুট্ এবং সাধারণ জুতার সোল নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম এবং মেসিন চালাইবার বেল্টও ইহা হইতেই প্রস্তুত হয়।

(২) গরুর চামড়ায় বুট এবং সাধারণ জুতার উপরিভাগ, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক, ষ্ট্র্যাপ বা ফিতা, ফুটবল প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ইহাকে বার্ণিশ করিয়া গাড়ীর কুসান বা আসন প্রভৃতিও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

(৩) ভেড়ার চামড়া হইতে বই বাঁধানোর কাজ নিষ্পন্ন হয়। জুতার উপরিভাগ এবং লাইনিং-এর কাজেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৪) ছাগলের চামড়ায় মরক্কো লেদার প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারা বুক বাইণ্ডিং-এর কাজ যেমন চলে তেমনি আবার বুট ও জুতার উপরিভাগও প্রস্তুত হ'তে পারে।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে উপরোল্লিখিত চামড়াগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা, রুক্ষ এবং পাতলা। চামড়ার আকার বুঝিয়া ট্যানি এর ঠাট ছোট বড় হয়। কিন্তু স্থানীয় বাজারের অবস্থা আজও এমন হয় নাই যে, চামড়ার কোন বিভাগে পারদর্শী হইলেও বেশী

আর্থিক লাভ হইবে। মফঃস্বলের ছোট ছোট সহরের সম্বন্ধেই এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এরূপস্থলে কোন বিশেষ রকমের চামড়ার চাহিদা খুব বেশী না থাকিতে পারে, কিন্তু ৩।৪ রকমের চামড়ার কাটতি হইলেই যে ট্যানারী চলিতে থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারণে মফঃস্বলের ট্যানারীতে রুক্ষ এবং পাতলা চামড়ার বন্দোবস্ত থাকা উচিৎ।

ক্রোম ট্যানিং

ক্রোম ট্যানিং করিতে হইলে ক্রোম নিমকের প্রয়োজন পড়িবে। বস্তুতঃ Basic salts of chromiumই ট্যানিং করিবার প্রধান উপাদান। ইহা বাইক্রোমেট্ অফ পটাশ, সোডা কিংবা ক্রোম অ্যালাম হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ক্রোম ট্যানিং করিবার দুইপ্রকার পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে। একটীকে বলে Single bath process, অপরটীর নাম Double bath process—প্রথমোক্ত উপায়ে কাজ করিতে হইলে basic salt প্রথম প্রস্তুত করিতে হইবে; তৎপরে একপ্রকার সুরাসারের মধ্যে basic salt দিয়া কাজ করিতে হয়। ইহাকেই ক্রোম-লিকার বা ক্রোম সুরাসার বলে। Double bath process এ আঁশগুলির উপর Basic salt of chromium কে বসিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

বার্ক ট্যানিং এর তুলনায় ক্রোম ট্যানিং-এর উভয় প্রথাই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়সাধ্য। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই শেষোক্ত প্রণালীর কাজ শেষ হইতে পারে; কিন্তু বার্ক ট্যানিং শেষ হইতে মাসের পর মাস লাগিয়া যায়।

ক্রোম ট্যানিং বিজ্ঞানের আধুনিক অবদান, ইহার ইতিহাস বার্ক ট্যানিং এর মত এত পুরাতন নহে। জনৈক রাসায়নিক ইহার উদ্ভাবন করেন, কাজেই কাজ চালানের জন্য রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। ক্রোম চামড়া প্রস্তুত করিবার নিয়ম পদ্ধতি এখানে সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে নাই; কাজেই, এই সম্বন্ধে টেক্‌নিক্যাল জ্ঞান এখনো সীমাবদ্ধ। কয়েকজন ভদ্রলোক এই প্রথায় কাজ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য ছাড়া এই ধরণের ট্যানারীর কাজ চলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বার্ক ট্যানিং এর জন্য কোনপ্রকার মেসিনারীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ক্রোম ট্যানিংএ উহা না হইলেই চলিবে না। হাতে প্রস্তুত করিতে গেলে উহার ফিনিস্ সুন্দর হয় না। মেসিনারী বা যন্ত্রপাতির সাহায্য না লইলে হাতের কাজে ক্রোম চামড়া অনেকটা অমসৃণ হয়। এরূপ ক্রোম লেদার বেশী বিক্রয় হইতে পারে না।

ক্রোম ট্যানারীর সাজ সরঞ্জাম

ক্রোম ট্যানারীর যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হইবে নীচে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল :—

(১) ধৌত প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের জন্য রাজমিস্ত্রিদের ব্যবহৃত চৌবাচ্চার মত একটী চৌবাচ্চা করিতে হইবে। এখানে ট্যানিংও করা যাইতে পারে। যে ফ্যাক্‌টারীতে ছোট ছোট চামড়া লইয়া কারবার করা হয়, সেখানে চৌবাচ্চার পরিবর্ত্তে গামলা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৮০ গ্যালন পরিমাণ অ্যালকহল ধরিতে পারে, কিংবা ৪০ গ্যালন পরিমাণ তৈল ধরিতে

পারে এমন জালাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কাজ চালাইতে পারা যায়। যদি চৌবাচ্চা ব্যবহার করাই ঠিক হয়, তাহা হইলে গাছের বাকল ট্যানিং করিতে যে প্রকার চৌবাচ্চার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাকল ট্যানিং করিবার জন্য যে প্রকার খেজুর গাছের কাণ্ড ব্যবহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এস্থলেও তাহাই প্রযোজ্য হইবে।

(৩) চামড়া ঠিক করিবার জন্য কাঠের টেবিলের প্রয়োজন হইবে; মার্ব্বেল পাথরের টেবিল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। উহার আকার হইবে ৬×৪ ফিট।

(৪) বাকল ট্যানিং করিবার উপলক্ষে আমরা যে সমস্ত যন্ত্রপাতির উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য।

(৫) রঙ লাগাইবার জন্য চর্ব্বীকে মদিন liquoring করিবার জন্য একটী ড্রাম লাগিবে। ছোট ট্যানারীর পক্ষে ৪ ফিট ব্যাস্ ও ৩ ফিট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটী কাঠের জালা বা ড্রাম হইলেই চলিবে। যে ফ্যাক্টরীতে হাতের কাজ চালানো হয়, সেখানে ড্রামের আকার হইবে, ব্যাসে ৩ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ২॥ ফিট।

(৬) একটী লোম-পরিষ্কারক (shaving) মেসিন।

(৭) একটী শঙ্কু (stake) যুক্ত মেসিন।

(৮) একটী মসৃণ করিবার মেসিন।

(৯) উপরোক্ত মেসিন সমূহের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটী ছোট পোর্টেবল ইঞ্জিন এবং বয়লার লাগিবে। এই কাজের জন্য ৮ হর্স পাওয়ারের বিশিষ্ট (N. H. P.) ইঞ্জিনই যথেষ্ট। অয়েল ইঞ্জিনের চেয়ে ষ্টীম ইঞ্জিনের ব্যবহারই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। কেননা ট্যানিং করিবার সময় গরম জল প্রস্তুত করিতে এবং লেদার শুকাইতে ইহার আবশ্যকতা বেশী; বিশেষতঃ শীত এবং বর্ষাকালে।

যে ট্যানারীতে মেসিনারী দিয়া কাজ চালানো হয় সেখানে কাঁচা ঘর হইলে ভাল হয় না; টিনের চালা, ইটের দেয়াল, এবং মেঝের চতুষ্পার্শ্ব পাকা হইলেই ভাল কাজ চলিতে পারে। যদি উপরের চাল টিনের হয় তাহা হইলে ছাদ দিতে হইবে ছেঁচা বাঁশের কিংবা কাঠের। নতুবা গরমের দিনে কাজ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত, ছাদ না থাকিলে টিন অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া চামড়ারও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। যদি ঘরের চালা টালি নির্ম্মিত হয় এবং দেয়াল মাটির হয়, তাহা হইলেও কাজ চলিতে পারে। উহা টিনের ঘরের চেয়ে সস্তাও হইবে। টিনের ঘরে বাঁস চিরিয়া দেয়াল বা বেড়া দিলেও চলে। অবশ্য ট্যানারীর মালিকের শক্তি এবং রুচি অনুযায়ী ইহার পরিবর্ত্তন করা চলে। হাতের কাজে কাঁচা ঘরে বেশী ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যে শ্রেণীর ও যে পরিমাণে লেদার প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার উপরই ঘরের আকার চৌবাচ্চা ও যন্ত্র পাতির সংখ্যা নির্ভর করিবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রোম চর্ম্ম

(১) বক্স সাইড্ নির্ম্মিত হয় গরুর চামড়া হইতে। ক্রোম পদ্ধতিতেই ইহার কাজ চলে।

(২) ক্রোম পদ্ধতিতেই ছাগলের চামড়া হইতে গ্লেস্ কিড্ নির্ম্মিত হয়

(৩) ভেড়ার চাম্‌ড়া হইতে যে ক্রোম লেদার প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে Chromed sheep skin

(৪) ক্রোম সোল, বেল্ট, লেস প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় বলদ এবং রুক্ষ গোচর্ম্ম হইতে। ক্রোম নির্ম্মিত পদ্ধতিতেই অবশ্য ইহার কাজ চলিয়া থাকে।

এই ৪ শ্রেণীর লেদারের মধ্যে ১নং (বক্স সাইড্) বিশেষ আদরণীয়। অন্ততঃ অর্দ্ধ ডজন সংখ্যক বড় বড় ভারতীয় ট্যানারী এই কাজে নিযুক্ত আছে। কিন্তু মফঃস্বলের ছোট ছোট সহরে উপরোক্ত ৪ শ্রেণীর বন্দোবস্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মফঃস্বলে বাকল কিংবা ক্রোম ট্যানারী স্থাপনের যৌক্তিকতা—

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে বার্ক ট্যানিং যে মূলতঃ কুটির শিল্প হিসাবে ক্রোম ট্যানিং তাহা নহে। কেননা, উহাতে মেসিনারীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী রহিয়া গিয়াছে; কাজেই মফঃস্বলে ক্রোমের চেয়ে বার্ক ট্যানিংই বেশী উপযোগী। যদি এই প্রকার চাম্‌ড়ার চাহিদা স্থানীয় বাজারে খুব বেশী থাকে তাহা হইলে ক্রোমের চেয়ে গাছের বাকলের চামড়া দিয়াই কাজ আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু আধুনিক সময়ে দেখা যাইতেছে যে বাকল হইতে প্রস্তুত চামড়ার চেয়ে ক্রোম লেদারের চাহিদাই বেশী। বেশীর ভাগ লেদারের বুট এবং অন্যান্য প্রকার জুতা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। মফঃস্বলেও কাজের জন্যই লেদারের চাহিদা আছে। কাজেই এখানকার কোন ট্যানারী এই দিকে দৃষ্টি সন্নিবেশ না করিলে কখনো উন্নতি করিতে পারিবে না।

সোলের জন্য সাধারণতঃ বাকল হইতে গৃহীত চর্ম্মেরই রেওয়াজ আছে। লাইনিংএর জন্যও ইহার প্রয়োজন যথেষ্ট। কাজেই মফঃস্বলেও আজকাল দুইপ্রকার জিনিষই কিছু কিছু লাগিবে। সোল এবং লাইনিংএর জন্য বার্ক ট্যানিং, জুতা বা বুটের উপরিভাগের জন্য ক্রোম ট্যানিং চাই। (ক্রমশঃ)

দ্রব্যাদি মসৃণ করিবার কাগজ

এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য বিশেষ কোন আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বালি-কাগজ কিরূপ প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং সর্ব্বত্রই ইহার চাহিদা কত বেশী। এই ধরণের অনেক কাগজ আছে, যথা, গ্লাস পেপার, এমেরি পেপার ইত্যাদি। কাঠ, শিং প্রভৃতির চতুষ্পার্শ্ব ঘষিয়া মসৃণ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী; এমন কি ধাতবদ্রব্যাদি চিক্কণ করিবার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাগজ প্রস্তুত কবিবার মূলসূত্রগুলি কিন্তু সর্ব্বত্রই একপ্রকার।

মসৃণতার স্তর-বিভাগ

দ্রব্যাদি মসৃণ করিবার জন্য যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা পুরু শক্ত এবং অমসৃণ হওয়াই বিশেষ দরকার। উহার কার্য্যকারিতা বর্দ্ধিত করিবার জন্য যে মালমসল্লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা গুড়া বা পাউডার করিয়া লইয়া গ্লু অর্থাৎ শিরিষ কিংবা অন্য কোন প্রকার আঠা দিয়া কাগজের সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হয়। এই ধরণের অমসৃণ কাগজের কতকগুলি স্তর-বিন্যাস করা থাকিলেও প্রত্যেকটী কাগজই নিজের তরফ হইতে সম্পূর্ণ।

ইহাদের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যাচাই করিয়া লইলে নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা নেহাৎ প্রয়োজনীয়:—

(ক) কাগজের উপর যে মালমসল্লার আচ্ছাদন দেওয়া হয়, তাহার তীক্ষ্নতা এবং শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) গুড়া বা পাউডার গুলির আকার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এই সব কারণের জন্যই মসৃণতার স্তরবিভাগ হইয়া পড়ে। কাগজগুলির মধ্যে যে গুলি বেশী শক্ত, তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলিতে পারে; অপেক্ষাকৃত মসৃণতরগুলি কেবলমাত্র কারুকার্য্যেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গ্লাস পেপার

কাঠ, হস্তীদন্ত, কচ্ছপের খোলস, হাড়, মাদার-অফ-পার্ল, অয়েল এবং ওয়াটার পেণ্ট বার্ণিশের কাজ মসৃণ করিবার জন্য গ্লাস পেপারই

সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক কথায়, ইহার চেয়ে মসৃণতর যে কোন জিনিষ মোলায়েম করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কাগজের পাউডার যদি ভালরূপে সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা ভাল কাজ করিতে থাকে।

গ্লাস চূর্ণীকরণ

গ্লাস পেপারের মসৃণতার স্তরবিন্যাস করিতে হয় বলিয়াই, গ্লাস-চূর্ণেরও ঐ অনুপাতে সমাবেশ করিতে হয়। অল্পস্বল্প কাজ করিতে হইলে, গ্লাস একটী ভারী হামানদিস্তা দিয়া লোহার কলে চূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য বাজে কিন্তু অপরিষ্কৃত নহে, এইরূপ ধরণের গ্লাস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন ময়লা, তেল অথবা অন্য কোন প্রকারের পেণ্ট থাকিলে উহা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া কষ্টিক্ লাই লাগাইলে হইবে; এইরূপ করিলেই চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্যাদি একদম উঠিয়া যাইবে। সাধারণতঃ. বেশী পরিমাণে গ্লাস থাকিলে উহা জাঁতা-কলে চূর্ণ করিয়া লওয়াই দস্তুর। ব্যবসার জন্য ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে ব্যাস্পচালিত "ষ্ট্যাম্প মিস"-এ কার্য্য করাই সুবিধাজনক। ইহাতে একটি সিন্দুকের মত থাকে

এবং সমস্ত মেসিনটিকে খাড়া রাখিবার জন্য উহার পার্শ্বদিকে কাষ্ঠ আবরণের দেয়াল থাকে। সিন্দুকটীকে বন্ধ করিবার জন্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত দরজা থাকে; ইহার তলদেশও আবার কাষ্ঠ আবরণ নির্ম্মিত। ভিতরের দিকে দুইটি লোহার সিলিণ্ডার থাকে এবং উহার গতি অভ্যন্তরভাগের দিকেই প্রযুক্ত করা থাকে। এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা লইয়া ইহা ষ্ট্যাম্পের প্রত্যেক আঘাতে ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। এই ষ্ট্যাম্পগুলিও আবার নিজেদের মণ্ডলে ক্রমাগত চর্কীর মত ঘুরিতে থাকে। ইহার চাপেই গ্লাস চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং বিভিন্ন স্তরের উপাদানের সৃষ্টি করিয়া থাকে। লৌহ নির্ম্মিত সিলিণ্ডারের মধ্যে কুলেট বা পরিস্কৃত বাজে গ্লাস ভরিয়া দিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ষ্টাম্পগুলি কাজে লাগাইয়া দিলেই হইল। পাউডার সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণ করা হইয়া গেলে, মেসিন থামাইয়া ভিতরের জিনিষগুলি নামাইয়া লইলেই আমাদের কাজের জিনিষ পাওয়া গেল।

চূর্ণিত মালমসল্লার শ্রেণীবিভাগ

বেশী পরিমাণে প্রস্তুত করিবার দরকার না পড়িলে ইহাকে সূক্ষ্ম পরিস্কৃত কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই হইল; নতুবা বিভিন্ন শ্রেণীর ছিদ্রযুক্ত ঝাঁঝড়ি ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। অতিসূক্ষ্ম গ্লাস-চূর্ণ হাওয়ায় নানাস্থানে সঞ্চালিত হইয়া যদি দেহে কোনরূপে প্রবেশ করিবার পথ পায়, তাহা হইলে অসুখ হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। এরূপ স্থলে, যাঁহারা চূর্ণিত মালমসল্লার শ্রেণীবিভাগ করিতে থাকিবেন তাঁহাদের উত্তমরূপে মুখাধার এবং নাসাপথ আচ্ছাদিত করিয়া লইতে হইবে।

ব্যবসা হিসাবে ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, একটী সিফটিং বা স্তরবিন্যাস করিবার মেসিন ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। ইহাতে একটী রুদ্ধকরা কাঠের সিন্ধুকের মত থাকে; ইহার ফ্রেমও সিলিন্‌ড্রিক্যাল। ইহাকে ওয়ার গজ (wire guaze) দিয়া ঢাকিয়া লইয়া বেল্ট্‌ পুলি (belt pulley) দ্বারা ঘুরাইয়া লইতে হয়। কলের এমনই ব্যবস্থা করা আছে যে ছাঁকনির কাজ স্বতঃই চলিতে থাকে। ভিতরে একটি পাখা আছে, উহা চলিতে থাকিলেই হাওয়ায় স্তরবিন্যাসের কার্য্য সুরু হয়। সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি তখন আচ্ছাদন ভেদ করিয়া আসিয়া নিম্নে প'ড়তে থাকে। অমসৃণ অংশগুলি কিন্তু সিলিণ্ডারেই জমা থাকে। নানা রকমের স্তরবিন্যাসের কার্য্য একটি মেসিনে সমাধা করিতে হয় বলিয়া বিভিন্ন ধরণের আধার বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনযোগ্য সিলিণ্ডারও আছে।

নির্ব্বাচন এবং কাগজে গ্লু বা আঠা লাগান

মসৃণকারী কাগজ তৈয়ার করিতে হইলে উপযুক্ত কাগজ মনোনীত করা একান্ত প্রযোজনীয়। ইহা যত দীর্ঘ এবং লম্বা আঁশযুক্ত হয়, ততই ভাল। ইহাতে অল্প পরিমাণে কাঠের পাল্‌প থাকাও বাঞ্ছনীয়; নতুবা কাগজ শীঘ্রই ক্ষয়িত হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত, ইহা আন্দাজমত পুরু এবং সমান হওয়া দরকার—কোন জায়গাতে বেশী মালমসল্লা পড়িয়া গেলে উহা বিশ্রী হইয়া যাইবে—উপরিভাগটা তাই সমান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

কাগজ দরকারমত কাটিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিতে হইবে এবং উহার চতুষ্পার্শ্ব পিন্‌ দিয়া টেবিলে আট্‌কাইয়া রাখিতে হইবে। তারপরে একটী বড় বুরুশ দিয়া কাগজের উপর গরম গ্লু বা আঠা পাত্‌লা ভাবে লাগাইতে হইবে। গ্লু শীঘ্রই ঘন হইয়া উঠে এবং দানা বাঁধিয়া যায়, কাজেই উহা সমানভাবে কাগজের উপর লাগাইতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই এই কার্য্য একটু শিক্ষা লওয়া দরকার। সবচেয়ে ভাল ফল পাইতে হইলে, গ্লু সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়া চাই। ইহা কতকাংশে আবার পাউডারের স্তরবিন্যাস এবং কাগজের কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে। পাত্‌লা গ্লু খারাপ কাগজে শুষিয়া যায়, ঘন গ্লু শীঘ্রই শুকাইয়া যাইয়া কাগজের উপর একটী শক্ত স্তরের মত আচ্ছাদন রাখিয়া যায়। যদি গ্লু সমভাবে লাগানো না যায়, তাহাহইলে কাগজের কোথায়ও পুরু কোথায়ও পাত্‌লা হইয়া উঠে।

পাউডার ছিটানো

কাগজে গ্লু মিশাইয়া গ্লাস-চূর্ণ একটী ছাঁকনিতে করিয়া লইয়া উহার উপর দিতে হইবে। প্রারম্ভে এই কার্য্যে যথেষ্ট সাবধানতার দরকার। যে পর্য্যন্ত সমস্ত কাগজে সমপরিমাণে গ্লাস-চূর্ণ বিছানো না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাউডার ছিটাইতে হইবে। বেশী চূর্ণ কোন জায়গায় পড়িয়া গেলে কাগজখানিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেই উহা পড়িয়া যাইবে। তারপরে একটী কাঠের রোলার মৃদুভাবে ইহার উপর দিয়া গড়াইয়া লইতে হইবে। ইহাতে গ্লাস-চূর্ণ গ্লুর সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, কাগজের উপরিভাগও সমতল হইয়া উঠিবে। সর্ব্বশেষে কাগজটীকে শুকাইবার জন্য ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

এই সমস্ত কার্য্য ব্যবসা হিসাবে সুরু করিতে হইলে, মেসিন দিয়া কাজ চালাইতে হইবে। কাগজ নির্ম্মাণকারক কিংবা ট্রেড মার্কের নাম দিতে হইলে পূর্ব্বেই একটী ষ্টেন্‌সিলের সাহায্যে ইহা করা উচিত।

পিউমিচ্‌ পেপার

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতেই পিউমিচ্‌ পেপার তৈয়ার করা চলিতে পারিবে। শক্ত কাগজের উপর গ্লু লাগাইয়া লইয়া বিভিন্ন স্তরের পিউমিচ পাউডার ছড়াইয়া দিতে হইবে। অন্য প্রণালীতেও অনুকরণ করা চলিতে পারে। পিউমিচ্‌ পাথর ভালরূপে চূর্ণ করিয়া জলে মিলাইতে হইবে। তারপরে উহা নাড়িয়া পাত্‌লা করিয়া, উহার সঙ্গে কার্য্যোপযোগী পাল্‌প্‌ এবং উত্তম তপ্ত তেল মিশাইয়া দিতে হইবে। যদি হল্‌দে রংয়ের আচ্ছাদনের প্রযোজন পড়ে, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে কিছু ওখার (ochre) মিলাইয়া লইতে হ'বে। যদি নীলাভ এবং লাল রঙের প্রয়োজন পড়ে, তাহা হইলে কল্‌কথার এবং ল্যাম্পব্লাক্‌ ব্যবহার করিতে হ'বে। শক্ত প্যাকিং পেপারএ একটী বুরুশ দিয়া পাত্‌লাভাবে এই পাল্‌প লাগাইতে হইবে। সমস্ত কাগজে ইহা লাগান হইলে পরে কাগজটীকে শুকাইতে দিতে হইবে। তারপরে আর একবার ঐ পাল্‌প লাগাইতে হইবে। ইহা শুকাইয়া গেলে, দুইটী রোলারের ভিতর দিয়া কাগজটীকে টানিয়া লইতে হইবে। কাগজের দুই পার্শ্ব সাধ্যমত মসৃণ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। যাহাতে দানা বাঁধিয়া না যায় সেইজন্য পাল্‌প সর্ব্বদাই নাড়িতে হইবে।

এই কাগজ দিয়া মরিচা ধরা লোহ এবং ষ্টীল উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিতে পারা যাইবে। গ্লাস পেপারের যে কাজ, ইহা দিয়াও সেই কাজ স্পষ্টরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু শক্ত মালমসল্লা দিয়া তৈরী হওয়ায় ইহার শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে ইহা ব্যবহার করিবার সময় অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন।

বেলে কাগজ এবং এমেরি পেপার

গ্লাস পেপার প্রস্তুত করিবার যে-পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতেও ঠিক সেইরূপে কাজ করিতে হইবে। বালু কিংবা চূর্ণ পাথরের স্তরবিন্যাস করিয়া লইয়া উহাকে পৃথক কাগজের সঙ্গে গ্লু দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে।

বেলে কাগজ এবং এমেরি পেপার প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্লু ব্যবহার করিতে হইবে। তারপরে রোলালের মধ্যে দিয়া উহা টানিয়া লইলে গ্লু সমানভাবে কাগজে লাগিয়া যাইবে। উহার উপর নির্দ্দিষ্ট আকারের বালু কিংবা এমেরি (যথা, গার্ণেট, কার্বোরাণ্ডাম, অ্যালাণ্ডাম ইত্যাদি) ছিটাইয়া দিতে হইবে। যদি কোথাও বালু বেশী পরিমাণে পড়িয়া যায়, উহা দেখিয়া দিতে হইবে; তারপরে কাগজটীকে আবার আর এক সেট রোলারের ভিতর দিয়া টানিয়া লইতে হইবে। এই কাজ করিবার সময় কাগজের উপর আর এক পর্দ্দা পাত্‌লা রকমের গ্লু লাগাইতে হইবে, তাহা হইলে বালু সহজে হাল্‌কা হইয়া যাইবে না। সকলের শেষে কাগজটীকে আস্তে আস্তে গরম করা পাইপের উপর একঘণ্টা ধরিয়া নাড়িতে হইবে; তারপরে ইহাকে জড়াইয়া কিংবা টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া লইলেই আমাদের জিনিষ প্রস্তুত হইল।
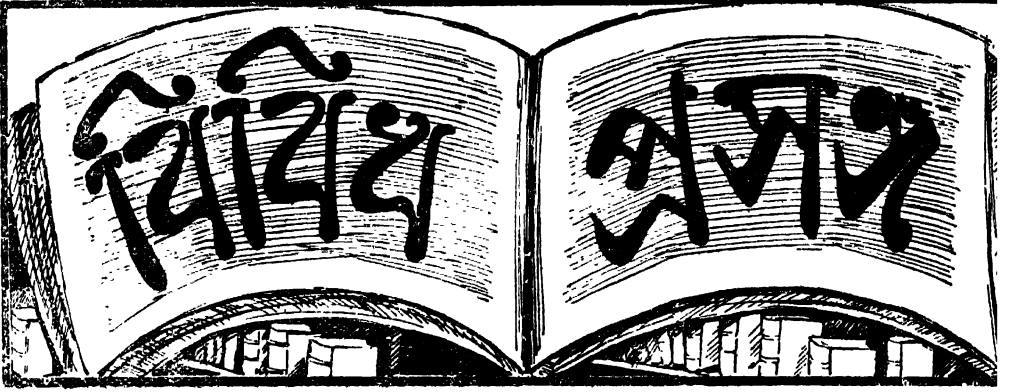
জাপানের নবাবিষ্কৃত চরকা

স্যর হরিসিংহ গৌর প্রাচ্যভূখণ্ডের বহুস্থান ঘুড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। জাপানের তন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, জাপানে ঐ ব্যবসায় খুব বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই পরিচালিত হইতেছে। এমন কি, মেয়েরাও বিশটী লুমের কাজ হাতে লইয়া দৈনিক ১।৹ হইতে ১॥৹ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতেছে। সেখানে সম্প্রতি নূতন ধরণের একটী কল প্রস্তুত হইয়াছে ; উহাতে ভারতীয় এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের অটোমেটিক চরকার তুলনায় আরো ২০ হইতে ২৫ পার্সেণ্ট বেশী কাজ পাওয়া যাইবে। ইহাকে এখনো পেটেণ্ট করা হয় নাই ; আবিষ্কারক মনে করেন যে তাহা হইলে ইহার মূলসূত্রগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে ; কাজেই ইহাকে রপ্তানী করিবার অধিকারও কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত, সেখানকার তন্তু কার্য্য বিশারদ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ভারতের ম্যানেজিং এজেন্সীর প্রথা উঠাইয়া দিয়া যদি একটী বিজ্ঞ ডাইরেক্টরেট্ বোর্ড সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে ভারতীয় তন্তু ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

স্যর হরিসিং'এর মতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের মত সস্তায় কেহ জিনিষ দিতে পারে না। ল্যাঙ্কাশায়ার কিংবা ভারতের পক্ষে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা একান্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। সেখানকার কুলীমজুরদের থাকিবার জায়গাও চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাপানী মেয়েদিগকে কাজ করিবার সময় এবং খেলাধূলা করিবার সময় লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাহারা যেন আনন্দ ও উৎসাহের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি।

জাপানের শিক্ষা পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিয়া ড়াঃ গৌর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে উহা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তেমনি কার্য্যকরীও বটে। মোটামুটি বলিতে গেলে জাপান যুদ্ধে এবং শান্তি-রক্ষায়—উভয় কার্য্যেই সমান দক্ষ। মিতব্যয়িতা এবং সুচারু শাসনের জন্য জাপান অনেক দেশের দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে।

চীনের সম্পর্কে তিনি বলেন যে সেখানকার লোকেরাভারতের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধে খাঁটী সংবাদ রাখিবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য

প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বন্ধনও আরো দৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতবাসীরা চীনে তাহাদের মাল কাটাইবার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করিতেছেন না। অনেক উচ্চ স্থানীয় চীনা-কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ভারতীয় মাল তাহারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ক্রয় করিবেন এবং ভারতীয়দিগকে বিশেষ সুবিধা দিবার জন্যেও তাঁহারা প্রস্তুত আছেন।

লেডী ইঞ্চকেপের সম্পদ

লর্ড ইঞ্চকেপ পি অ্যাণ্ড ও লাইন এবং অন্যান্য বিখ্যাত কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছিলেন। যখন ৭৯ বৎসর বয়সে মণ্টি কার্লোতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার বিধবা স্ত্রী প্রভৃতি সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন।

তাঁহার বাৎসরিক আয় হইল এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ সপ্তাহে প্রায় ২০০০ পাউণ্ড। ইহাতে কোন প্রকার কর, ইন্‌কাম ট্যাক্স, প্রভৃতি কিছুই দিতে হয় না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে—

স্কটল্যাণ্ডে	৮২৪৪৯ পাউণ্ড
ইংলণ্ডে	৪৭০৩১৯ "
অন্যান্য স্থলে	১৫৭১৮৯৯ "
মোট	২১২৮৭০৭ "

মৃত্যুকালের কর দিতে ১০২৭৪৪৭ পাউণ্ড লাগিয়াছিল এবং ১·৯৭২৬০ পাউণ্ড বিভিন্ন স্থলে দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁহার গ্লেনাপ দুর্গ এবং অন্যান্য বাড়ী যদি ব্যবহার করিবার ইচ্ছা না হয় কিংবা তিনি যদি মারা যান, তাহা হইলে তদীয় পুত্র ভাইকাউণ্ট গ্লেনাপ জীবিতকাল পর্য্যন্ত উহা ভোগ করিতে পারিবেন। লর্ড গ্লেনাপের মৃত্যু হইলে উক্ত সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কিংবা তদীয় ওয়ারীশের হইবে। এতদ্ব্যতীত লেডী ইঞ্চকেপ তাঁহার বিহার-তরণী (Yacht) ব্যবহার করিবার অধিকার পাইবেন। তাঁহার ভৃত্যদের মধ্যে যাহারা এক বৎসর কিংবা তদধিককাল চাকুরী করিয়াছে, তাহারা মৃত্যু-কর হইতে রেহাই পাইয়া এক বৎসরের পুরা বেতন বক্‌শীস পাইবে। তাঁহার প্রত্যেক ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ী পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত করিয়া পাইবে এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর হেন্‌রী হিল, ফ্রাঙ্ক ফার্নেস, উইলিয়াম টেলার, জন্ উইলিয়াম ফিস্কে ও উইলিয়াম বার্ণার্ড হাকুল, ইহাদের প্রত্যেকেই এক হাজার পাউণ্ড করিয়া পাইবে।

ডাবলিউ কোরী এণ্ড সনের ফ্রেডারিক জেম্‌স্ লেদার্স ও এক হাজার পাউণ্ড পাইবেন। গৃহের ভৃত্যের অনেকে দেড় শত অনেকে পঞ্চাশ পাউণ্ড করিয়া পাইয়াছে। লর্ড ইঞ্চকেপের লণ্ডন, গ্লাসগো, প্রভৃতি জায়গার কর্ম্মচারী ও ভৃত্যেরা এক মাসের মাহিয়ানা বখ্‌শীস পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পি অ্যাণ্ড ও লাইনারের অনেক কর্ম্মচারী এক শত হইতে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত পাইয়াছে। লর্ড ইঞ্চকেপ তাঁহার অংশীদারগণকেও এক হাজার পাউণ্ড করিয়া দিয়াছেন, অবশ্য যদি তাঁহারা গ্রহণ করেন। লেডী ইঞ্চকেপের মৃত্যুর পর বাকী সম্পত্তি তাঁহার ৪ জন পুত্র কন্যার মধ্যে সমানাংশে বিভাগ হইবে।

লর্ড ইঞ্চকেপ ছোট বেলা হইতেই তাঁহার স্ত্রীকে ভালবাসিতেন, এই ভালবাসা বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। উভয়ের জন্মস্থানই আর্ব্রোথ, সেইখানেই উভয়ের পরিচয় হয়। তাহার নাম ছিল তখন জিমি ম্যাকে, মেয়েটির নাম ছিল জেন্ শ্যাঙ্কস্। জেন্ স্থানীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের কর্ত্তার কন্যা ছিলেন। তখন কি তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন যে উভয়ে এক কালে লর্ড লেডী হইতে পারিবেন ?

বাইশ বৎসর বয়সের সময় ম্যাকে সাহেব ভারতবর্ষের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর অধীনে একটী কাজ পাইয়া চলিয়া আসেন। উন্নতি হইলে তিনি স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার আবাল্য সঙ্গিনীকে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতে উভয়ের মধ্যে আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই। জিমি ভারতে চলিয়া আসিলে তাঁহার পত্নীও তৎসঙ্গে এদেশে পদার্পণ করেন। যখন লর্ড ইঞ্চকেপ বিহার-তরণীতে মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তাহার সেবা-পরায়ণা স্ত্রীর সান্নিধ্যই আনন্দের খোরাক জুটাইত।

চোরাই মাল চালান দেওয়া

যাহারা চোরাই মালের কারবার করিয়া থাকে, তাহাদের চাতুরীর আর অন্ত নাই। মানুষের মস্তিষ্কে-মস্তিষ্কে যে লড়াই চলিয়া থাকে ইহা তাহারই একটা নমুনা মাত্র। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম একটি বড় চোরাই মাল ধরা পড়ে; ভিয়েনার একদল পোলীশ্ ইহুদী ৭টী বড় বড়

কাঠের বাক্সে নকল পার্টিশন বা কোঠা তুলিয়া উহার মধ্যে ২৫ পাউণ্ড ওজনের হিরোয়িন লুকাইয়া চালান দিবার সময় ধরা পড়ে। আর একদল ইজিপ্টে ৩০০ পাউণ্ড ওজনের হিরোয়িন, যাহার আনুমানিক মূল্য এগার হাজার পাউণ্ড, চালান দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। তাহারা মোমের মধ্যে এই সমস্ত হিরোয়িন লুকায়িত করিয়া কতকগুলি টিনের মধ্যে রাখিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, আরো তের হাজার পাউণ্ড মূল্যের হিরোয়িন এক হাজার কাঠের চেয়ারের মধ্যে ফাঁপা করিয়া তন্মধ্যে চালান দিবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিল। বস্তুতঃ এমন কোন উপায় নেই, যাহা তাহারা এপর্য্যন্ত চেষ্টা করে নাই। গত বৎসর অনেকে উহা রক্ষিত ফলের টিনে, পিয়ানোতে, যন্ত্রপাতির নানা অংশে লুক্কায়িত করিয়া চালান দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার সিন্ধু-সৈকতে খেলা করিবার সময়ে কয়েকটী বালক ভাসমান মৃত ছাগের উদর বিদীর্ণ করিয়া অনেক চোরাই মাল আবিষ্কার করিয়াছিল। সিরিয়া হইতে ইহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাহাদের সঙ্গীদের উহা এক রাত্রে উঠাইয়া লইবার কথা ছিল।

তুরস্ক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা চাতুরীপূর্ণ একটী অভিযানের সংবাদ আসিয়াছে। তুরস্কের একদল চোরাই মাল ব্যবসায়ী ৭টী মিলষ্টোন নির্ম্মাণ করিবার জন্য একজন উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোককে বায়না দিয়াছিল। উহার মধ্যে চোরাই মাল ভরিয়া মিলষ্টোনগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে কিছুই বোঝা যাইত না। টিনের মধ্যে উহা রাখিয়া দিয়া এমন ভাবে তারের ফ্রেম দেওয়া হইয়াছিল, যে, কাহারো কোনপ্রকার সন্দেহ করিবার অবকাশ ছিল না। সময় মত খবর পাওয়ার জন্য তুর্কী চোরাই মাল ব্যবসায়ীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

গত বৎসর অর্দ্ধটনের উপর হাসিস্ ৫টী বড় বড় ট্রাঙ্কে করিয়া চালান দেওয়া হইতেছিল। জুয়াচোরেরা কনসালের চিঠি জাল করিয়া কাষ্টমসের কর্ম্মচারীগণকে অনুরোধ করিয়াছিল যে ঐ ট্রাঙ্কগুলি যেন যোগ না হয়। জাহাজ ছাড়িবার সময় ইহার খবর পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া সমস্ত মাল ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। যখন ট্যাক্সিতে করিয়া সমস্ত মাল স্থানান্তরিত করিবার উদ্যোগ চলিতেছিল তখন যে ছদ্মবেশী ব্রিটিশ কর্ম্মচারী ড্রাইভারের কাজ করিতেছিলেন, তিনি পুলিশের সহযোগে এই গ্রীক জুয়াচোরদিগকে ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে চব্বিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের মাল ধরা পড়িয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত গত বৎসর একজন বিদেশী ভদ্রলোকের লোফেয়ার তাহার প্রভুর অজ্ঞাতসারে ৩৫ পাউণ্ড ওজনের হিরোয়িন রাখিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। একজন ক্রেতাকে ৩০০ পাউণ্ড অর্থের বিনিময়ে সাত পাউণ্ড হিরোয়িন ক্রয় করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল, টাকা অবশ্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কোনপ্রকার বিপত্তি ঘটায় সেবারে আর তাহাকে বন্দী করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। একবার তাহাকে অনুসরণ করিবার সময় সে বোধ হয় অনুসরণকারীগণকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছিল; তাই মোটর বিদ্যুৎ গতিতে চালাইয়া তাহার চোরাই মাল লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৩০০ পাউণ্ডের মধ্যে ৭০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছিল; নম্বরগুলি ঠিকঠাক মিলিয়া যাওয়ায় তাহাকে ৫ বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইতে পারা গিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত আরো এক প্রকারে চোরাই ব্যবসা চলিয়া থাকে। সিরিয়া হইতে প্রতি বৎসর বহুসহস্র উট প্যালেষ্টাইনের ভিতর দিয়া ইজিপ্টে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একদল ইজিপ্সিয়ান ফ্রন্টিয়ার গার্ড ২৫টী মাল শূন্য উটকে সেই পথে যাইতে দেখিয়া একজন উহার একটীকে সস্তায় কিনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কেননা, উহাদের স্কন্ধে যেরূপ দীর্ঘ লোম ছিল, তাহাতে সহজেই বহু অর্থ পাওয়া যাইত। অনাবৃত হস্ত দিয়া উটের কেশরগুলি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ একজনের হস্তে শক্ত একটী পদার্থ ঠেকিল। সে তখন বেদুইনদিগকে ডাকিয়া লইয়া সাধারণ নিয়ম অনুসারে উহাদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি অনুসন্ধান করা আরম্ভ করিল, অনুসন্ধান শেষ হইলে রাইফল উঁচু করিয়া তাহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলে, তাহার সহকর্ম্মীরা উহাদিগকে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল। তৎপরে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে উটের ঘাড় পরিষ্কার রূপে ক্ষৌরী করিয়া সেখানে গঁদের আঠাদিয়া উহা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপরে চুলগুলি লম্বা হইয়া খুব বড় হইলে হিরোয়িনের অস্তিত্বও বুঝা যাইত না।

বেদুইনের দল মনে করিয়াছিল যে তাহারা এইরূপে ১২০০০ পাউণ্ড মূল্যের হিরোয়িন ইজিপ্টে রপ্তানী করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। এই ব্যবসায়ের রাজার নাম মহম্মদ নফে, সমস্ত পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর জুড়িয়া তাহার অনন্ত আধিপত্য বর্ত্তমান। তাহার অনেকগুলি ষ্টীমারও আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় একজন পুলিশকর্ম্মচারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় অসাবধান মুহূর্ত্তে তাহার বন্দীর আভাষ পাওয়ায়, পুলিশকর্ম্মচারীটি তাহাকে কাষ্টমসে বামাল সহ গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

আরসোলার উৎপাৎ

যেখানে আরসোলা থাকে, সেই স্থানে এক চাপ কর্পুর রাখিয়া দিলে আরসোলার দৌরাত্ম্য কমে। কাগজ পোড়াইয়া ধোঁয়া লাগাইলে ফর্ ফর্ করিয়া আর উড়িয়া বেড়াইবে না।

ওলের গলা কুট্‌কুটানী নিবারণের উপায়

ওল একটা ভাল খাদ্য। ইহা অগ্নি বৃদ্ধি কারক ও রক্ত পরিষ্কারক। ওল অর্শ রোগ নিবারণ করে। ওলের একটা বেজায় দোষ— ঐ মুখ ধরা এবং গলা কুটকুটানী।

তিল বাটিয়া ওলগুলিতে মাখাইয়া খানিক-ক্ষণ রাখিয়া ধুইয়া ঐ ওলে যাহা রাঁধিবে, তাহাই সুন্দর হইবে, আর ধরিবে না। কচি তেঁতুল পাতার সহিত ওল সিদ্ধ করিয়া কোন তরকারীতে দিলেও গলা ধরিবে না।

হাঁপানী রোগের মহৌষধ

একটা ব্যাং ধরিয়া ব্যাঙ্গের হৃদ-পিণ্ডটা বাহির করিয়া লও। তাহাকে অর্থাৎ হৃদ-পিণ্ডটাকে চার ভাগ করিয়া কাট। এক এক ভাগ কলার ভিতর পুরিয়া চার দিন খাওয়াইলে হাঁপানী নিশ্চয়ই ভাল হয়। দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক রোগীকে এই রূপে ভাল করিতেন।

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের বিষ নষ্টের উপায়

বর্দ্ধমান সঞ্জীবনীতে বহু দিন পূর্ব্বে একটী ভদ্র লোক একটা ঔষধের বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই ঔষধ দ্বারা তিনি ৪১৫ জন রোগীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন :—

কাল আঁকড়ের শিকড়ের ছাল	১ তোলা
গোল মরিচ	২১ গণ্ডা

বাটিয়া কুকুর বা শৃগাল কামড়ান রোগীকে সেবন করাইতে হইবে। রোগীর শরীরে যদি বিষ থাকে তবে ঔষধ সেবনের পরই বমি করিয়া ফেলিবে। যদি বমি না হয়, তবে ঔষধ আর সেবন করান উচিত নহে; কারণ বিষ নাই বুঝিতে হইবে। যাহারা প্রথম দিবসে বমি করিয়া ফেলিবে, তাহা-দিগকে দ্বিতীয় দিবসও কাল আঁকড়ের শিকড়ের ছাল ও মরিচ দশ গণ্ডা দিয়া সেবন করাইবে। যদি সেদিন বমি করে, তাহার পর দিনও দ্বিতীয় দিবসের ন্যায় সেবন করাইবে, বমি বন্ধ হইলেই রোগী নির্বিষ বুঝিতে হইবে।

নিষেধ – শাক, অম্বল, গুড়। ঔষধ খাওয়াইয়া যদি রোগীর বেশী গরম বোধ হয়, তাহা হইলে মিছরির সরবৎ পাতি লেবুর রস দিয়া খাওয়ান যাইতে পারে এবং দেওয়াও আবশ্যক।

রাতকাণার ঔষধ

পানের বোঁটা হাতের দ্বারাই চাপ দিয়া রস বাহির করিয়া ২।৩ ফোঁটা চক্ষে দিলে শুনিয়াছি তৎক্ষণাৎ রাতকাণা সারিয়া যায়।

শয্যায় মূত্রত্যাগের ঔষধ

পটাস্ ব্রামাইড্	১০ গ্রেণ
টিং বেলেডোনা	১০ হইতে ২০ মিঃ

সামান্য জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে এ রোগ আরোগ্য হয়।

আফিং খাওয়ার অভ্যাস ছাড়াইবার উপায়

যাহারা আফিংখোর, তাহাদের আফিং বন্ধ করিলে চোক মুখ ঝাঁমরাইয়া আসে, হাই উঠে, আলস্য হয়, গা-হাত বেদনা করে, চক্ষে জল পড়ে, মনের অবস্থা অতিশয় খারাপ হয়। সুতরাং আফিংখোর আফিং ছাড়তে সহসা পারে না। সেইজন্য Dr. Ringer (ডাঃ রিঙ্গার) বলেন যে, আফিংখোরের শারিরিক ও মানসিক অবসাদ নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত মিকশ্চারটী ফলপ্রদ।

টিংচার কাপসিসি	৪ ড্রাম
পটাস ব্রোমাইড্	৪ ড্রাম
স্পিরিট এ্যামন আরোম্যাট	৩॥ ড্রাম
কর্পূর দেওয়া জল	৬ আউন্স্

ব্যবহার বিধি। এক ডেজাট চামচার এক চামচে দিবসে ২।৩ বার ব্যবহার করিতে হয়।

হাজা হওয়ার মলম
Eczema Ointment

Beta Napthol	1 Dr.
Sulpher	2 Dr.
Balsam Peru	1 Dr.
Petroleum	1 Dr.

আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে ভাল হইয়া যাইবে।

অর্শ—গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া শৌচ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

(২) অপামার্গের মূল চারি আনা, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত বাটিয়া খাইতে হয়।

(৩) হরীতকী, চিনি নবনীত ও পিপ্পলীর দানা চূর্ণ প্রত্যেক আধতোলা আধপোয়া জলে বাটিয়া সেবন করিতে হয়।

(৪) নাগেশ্বর চম্পক পুষ্পের কেশর চূর্ণ প্রত্যেক ৵০ আনা মাত্রায় লইয়া ১ তোলা মাখন বা নবনী সহ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সায়াহ্নে দুইবার সেবন করা উচিৎ।

(৫) গেঁদা ফুলের গাছের পাতা উত্তম রূপে ভাজিয়া অন্ততঃ তিন সপ্তাহ প্রাতে খাইতে হইবে। পরিমাণ অন্ততঃ এক তোলা।

(৬) মলত্যাগ করিয়া গরম জলে শৌচ করা উচিত।

(৭) অধিক দিনের অর্শ হইলে কাঁচা গেঁদাল পাতা বাটিয়া তিন সপ্তাহ যথাস্থানে প্রলেপ দিবেন।

(৮) গোমূত্রে হরীতকী দুইতোলা পেষণ করিয়া সম পরিমাণ ইক্ষুগুড় সহ সেবনে অর্শ বিনষ্ট হয়।

অস্ত্রক্ষত চিকিৎসা

অস্ত্র দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে, ক্ষত স্থানে গাঁদা ফুলের পাতা বাটিয়া প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হইবে ও ক্ষতস্থান দূষিত হইবে না।

অহিফেন সেবনে মৃত্যু নিবারণ

অহিফেন সেবন জানিতে পারিবামাত্র, পুরাতন কাগজ পোড়াইয়া জলে গুলিয়া সেবন করাইলে, তৎক্ষণাৎ বমি হইয়া উপকার হয়।

আমাশয়

এক তোলা গাঁদাফুলের পাতার রস ও আধ তোলা কাশীর চিনি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়।

(২) বহু বর্ষের পুরাতন তেঁতুল পূর্ব্বরাত্রে জলে ভিজাইয়া পরদিন পাকা চাঁপা কলার সহিত চটকাইয়া কাশীর চিনির সহিত ৩।৪ দিন সেব্য।

(৩) বহেড়া, শুষ্ঠি, সিদ্ধি, যমানি ও সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ৵৷৹ আধসের চিনির সহিত পাক করিবে, পরে অর্দ্ধতোলা প্রমাণ প্রত্যহ সেবন করিবে।

(৪) একবৎসর বয়স্ক তেঁতুল গাছের শিকড় ।৹ আনা, বড়জাম গাছের পাতার রস আধ ছটাক, জলশূন্য মহিষ দুগ্ধের ঘোল ১০ তোলা; এই ঘোলের এবং জামপাতার রসের সহিত ঐ শিকড় পেষণ করিয়া অবশিষ্ট ঐ জলশূন্য ঘোল ও জাম পাতার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সেবনে ২।৪ দিবসের মধ্যে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় উভয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৫) কুকসিমের পাতার রস প্রাতে সেবনে দুষ্কর আমাশয় আরোগ্য হয়।

(৬) কেয়ুরের শিকড় সিকি তোলা বাটিয়া আতপ তণ্ডুল ধোয়া জলের সহিত একটু করকচ লবণ মিশ্রিত করিয়া ৩ দিবস সেবন করিলে আমাশয় ভাল হয়।

আমরক্তাতিসার

একতোলা দালিমের কচি পাতা, দালিমের কুঁড়ি, তেঁতুলের কচিপাতা, জামের কচিপাতা ও চারি আনা ওজনের জিরা বাটিয়া জলে গুলিয়া খাইলে ৩।৪ দিনে ভাল হয়।

(২) আস্‌সেওড়ার শিকড়ের ছাল ২।৩ কুঁচ পরিমাণ দুইটী গোল মরিচের সহিত বাটিয়া তিনটী বড়ী করিবে। উহা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ১টী করিয়া সেব্য।

(৩) পাকা কয়েৎবেলের পানা মিছরির সহিত প্রত্যহ ২।৩বার সেবনে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

(৪) ২।৩ টা হরিদ্রা পাতার রস সমভাগ বাকারি চুণের জলের সহিত সেব্য।

(৫) কুকসিমের পাতার রস, প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে সেব্য।

(৬) ৫০টা আন্দাজ পেয়ারা পাতার রস, দুগ্ধ ও খুনখারাপি একত্রে তিন দিন খাইলে আরোগ্য হয়।

(৭) চাঁপাকলার শিকড় দুইকুঁচ পরিমাণ বাটিয়া ২।৩ দিন সেব্য।

(৮) তালের মূল মধুর সহিত সমভাগে নারিকেল জলের সহিত বাটিয়া খাইতে হয়।

(৯) কুর্‌চির ছাল, দাড়িম্বের ছাল, সাঞ্চিশাক, পুরাতন অম্লকেশি এক তোলা, অর্দ্ধসের জলদিয়া সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে এক ছটাক ও বৈকালে মধু সহ সেবন করিবে। বালক বালিকাদিগকে মাত্রা বিবেচনা করিয়া দিবে।

আগুনে পোড়া

আগুনে পুড়িয়া গেলে ঘৃতকুমারীর শাঁস বা গোলআলু বিনা জলে বাটিয়া লাগাইলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

(২) কাঁচা দুগ্ধের পটি দিলেও উপকার হয়।

(৩) চুণের জলের সহিত নারিকেল তৈল ফেনাইয়া দিলেও জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা হয় না।

(৪) জিরা, হরীতকী, ধূপ ও ধনিয়া একত্র বাটিয়া ঘৃতে পাক করিয়া লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ বিষ দুর হয়।

(৫) যবের গুঁড়ি তিল তৈলে পাক করিয়া কটু তৈল সহ লেপনে অগ্নিদগ্ধ বিষ দূর হয়।

(৬) বিশুদ্ধ খাঁটি সরিষার তৈল ২০ তোলা লইয়া আগুনের উপর বসাইয়া ঐ তৈলে ৮।১০টি তেজস্বী শিঙিমাছ উত্তমরূপে ভাজিয়া তৈল ছাঁকিয়া শিশির মধ্যে রাখিবে, পরে ক্ষতস্থান ভাল করিয়া ধুইয়া এবং মুছিয়া ঐ তৈল গরম করিয়া

৪।৫ বার লাগান উচিত। ইহাতে পোড়া ঘা দুঃসাধ্য হইলেও ভাল হয়।

(৭) বোরাসিক এসিড নারিকেল তৈলে পাক করিয়া মোম দ্বারা জমাইয়া মধ্যে মধ্যে লাগাইবে।

ইঁদুর মারা ঔষধ

চিনি ২ পাউণ্ড, মাখন ১৮ পাঃ সর্ষপ চূর্ণ ২৮ পাঃ, ফসফরাস ২ আউন্স গরম জল ২।৩ পাঃ। প্রথমে ফস্‌ফরাস্ গরমজলে গলাইয়া সর্ষপ চূর্ণ মিশাইবে, পরে বাকী জিনিষগুলি দিবে। রুটি বা অন্য কোন খাদ্য দ্রব্যে ইহা মিশাইয়া রাখিবে, খাইবামাত্রই ইন্দুর মরিবে। আকন্দ পাতার ধূমেও ইন্দুর পালায়।

উইপোকা নিবারণ

যে স্থানে উই ধরে, সেইস্থানে কেরোসিন তৈল বা তেঁতুলের জল দিলে উই তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।

উড়ুশ (ছারপোকা) ও মশক মারণ

বড় কাঁকড়ার খোলাতে আকন্দর মূল শামুক সহ প্রদীপ জ্বালিলে উড়ুশ (ছারপোকা) ও মশক মরে।

উপদংশ

সাদা ধূনার গুঁড়া ও মাখন সমভাগে মর্দ্দন করিয়া লাগাইতে হয়।

(২) হাতী শুঁড়ের গাছের শিকড় ও পাতা হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

(৩) ঘৃত একপোয়া, রসুন এক ছটাক, জাঙ্গাল আধ ছটাক, আশ্রসারি গন্ধক ১ ছটাক, তেকাঁটা মনসার শাঁস এক ছটাক। উত্তমরূপে কড়াতে জাল দিয়া অঙ্গারবৎ করিবে। পরে খলে মাড়িয়া ঘায়ের উপরে পটি দিবে। ৭।৮ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবে।

ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন

পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্টাংশ

শ্রীসুরথ কুমার সরকার

কলিকাতা সহরে দৈনিক সংবাদ পত্রের অভাব নাই। বিজ্ঞাপনদাতার অবস্থা ভাল হইলে তিনি ইহাদের সব কয়টীতেই বিজ্ঞাপন দিতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ইহাদের মধ্যে মাত্র একখানি বা দুইখানি কাগজ নির্ব্বাচন করিতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমেই তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে তিনি কোন্ শ্রেণীর লোকের নিকটে তাঁহার পণ্যের সংবাদ প্রেরণ করিতে চাহেন —National Partyর লোক বড় একটা Statesman পড়েন না, আবার যাঁহারা Statesman-এর পক্ষপাতী তাঁহারা Liberty পড়েন না। এইরূপ প্রত্যেকখানি সংবাদ পত্রের নিজ বৈশিষ্ট্য এবং তাহার গ্রাহকদেরও তদনুরূপ মতৈক্য আছে।

মফঃস্বলে বা সুদূর পল্লীগ্রামে বিজ্ঞাপন প্রেরণের পক্ষে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র দৈনিকের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি সাপ্তাহিকীর প্রচার কেবল মাত্র পল্লীগ্রামে; এবং সাতদিন অন্তর একবার করিয়া ইহাদের দর্শন পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের একটী লাইনও অপঠিত থাকে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এবং পল্লীবাসীগণের প্রয়োজনীয় পণ্য হইলে তাহার বিজ্ঞাপন এই শ্রেণীর সাপ্তাহিকে দেওয়া খুবই লাভজনক।

খেয়ালী, নিপাতী প্রভৃতি সচিত্র থিয়েটার ও বায়োস্কোপের সংবাদ বহুল সাপ্তাহিক পত্র প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের জন্য প্রশস্ত হইলেও সর্ব্বসাধারণের সকল প্রকার বিজ্ঞাপনের পক্ষে ইহারা তেমন লাভজনক নহে। তবে,বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের বাতিকগ্রস্ত যুবকগণের মধ্যেই ইহাদের কাটতি এক প্রকার সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় ও সখের দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিয়া এই সকল পত্রিকা হইতে যে ফল পাওয়া যাইবে, একটি Disintegrator বা একটী Motor pump-এর বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা পাওয়া যাইবে না। সচিত্র কাগজে সচিত্র বিজ্ঞাপনই অধিকতর ফলপ্রসূ ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যেখানে বাজার বা চাহিদা সৃষ্টি করিবার জন্যই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সেখানে কোনও যুক্তিই খাটেনা; সেরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী তাঁহার ইচ্ছামত বিজ্ঞাপন দিতে-পারেন।

দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র কেবল মাত্র বিজ্ঞাপনের উপরে নির্ভর করিয়াই যেমন জীবন ধারণ করে, সেইরূপ তাহারা বিজ্ঞাপনদাতাকে মাঝে মাঝে "write up" দ্বারা তাহার বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের প্রচার করিতে যথেষ্ট সাহায্যও করিয়া থাকে। বুদ্ধির সহিত লেখা 'write up' সাগ্রহে

পঠিত হয় এবং উহাদ্বারা পণ্য সম্বন্ধে যে অনুকূল জনমত সৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা কেবল মাত্র বিজ্ঞাপন দিয়া সৃষ্টি করা কোনও রূপেই সম্ভব নহে।

সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের হার spring অথবা রবারের ন্যায় Elastic. সর্ত্ত অনুসারে এই হারের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধির সহিত দর কষাকষি করিতে পারিলে যথেষ্ট সুবিধাজনক স্থান ও rate পাওয়া কঠিন হয় না।

দৈনিক সংবাদ পত্রে একবার বা দুইবার বিজ্ঞাপন দিতে গেলে কম পক্ষেও প্রতি ইঞ্চি আট আনা হিসাবে লইয়া থাকে। ইঞ্চি প্রতি দুই টাকা তিন টাকার হিসাব না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু উপযুক্ত দর কষাকষি করিয়া contract-এ বাঁধা হইলে সময়ে সময়ে প্রতি ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের মূল্য দুই আনাও পড়িয়া থাকে। অবশ্য এই দর কষাকষিরও একটা সীমা আছে। কারণ গৃহীত বিজ্ঞাপনের লাভ হইতেই সংবাদ পত্রের সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া যদি কিছুই লাভ না থাকে তাহা হইলে সেইরূপ বিজ্ঞাপন তাঁহারা প্রকাশ করিতে পারেন না। দীর্ঘ দিনের মেয়াদে অথবা Flat rate-এ বিজ্ঞাপনের contract না করিলে যে দর কষাকষি করিয়া বিজ্ঞাপনদাতা কিছু করিতে পারিবেন এমনও মনে হয় না।

মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান দৈনিক পত্রের ন্যায়ই লাভজনক। শিক্ষিত সমাজে সাহিত্য-প্রাণ মাসিক পত্রের আদর খুবই বেশী। বিশেষতঃ প্রবাসী, Modern Review, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, 'ব্যবসা বাণিজ্য' ও মাসিক বসুমতীর ন্যায় মাসিক পত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে সাদরে পঠিত হইয়া থাকে। যদিও এই সকল পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সহিত বিজ্ঞাপন না ছাপিয়া পৃথক কাগজে ছাপিয়া থাকেন এবং সেগুলিকে পত্রিকার পৃথক একটী অংশরূপে প্রবন্ধ ইত্যাদির পুরোভাগে কিম্বা পশ্চাৎভাগে গাঁথিয়াছেন, তাহা হইলেও মাসিকপত্র পাঠীর নিকটে বিজ্ঞাপনগুলিও অপঠিত থাকে না। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সকলে না-ও পড়িতে পারেন, কিন্তু মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন সকলেই একবারও অন্ততঃ পাঠ করেন। আমার মনে হয়, সংবাদ পত্র পাঠ করিতে যে পরিমাণ সময় একজন দিতে পারেন তদপেক্ষা একখানি মাসিক পত্র পাঠ করিতে তিনি অনেক বেশী সময় দিয়া থাকেন এবং উভয়ের কাগজ ও ছাপার আকাশ পাতাল পার্থক্যই ইহার প্রধান ও অন্যতম কারণ।

পূর্ব্বোক্ত প্রধান মাসিকপত্রগুলির সব কয়টাই চিত্রবহুল এবং অর্থ উপায়ের নানা তথ্যে পূর্ণ বলিয়া সকলেরই আকর্ষণের বস্তু। উহাদের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপন সেই জন্য সচিত্র হইলেই ভালহয়। সুচিত্রিত চিত্রের অভাবে Displayভাল হওয়া খুবই প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ না হইলে এই সকল পত্রিকার পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি আকর্ষণ করা সহজ হইবে না। মোট

কথা,বাঙ্গলার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্নেহের পাত্রদিগের নিকটে ব্যবসায়ের সংবাদ বহন করিবার প্রধান বাহন এই মাসিক পত্র ও দৈনিক পত্রগুলি। ইঁহাদের নিকট প্রদত্ত বিজ্ঞাপনেই যদি বিজ্ঞাপনদাতার শিক্ষার অভাব ধরা পড়ে তা' সে ভাষা, চিত্র, ভাব, ব্লক প্রভৃতি যেদিক দিয়াই হউক না কেন —তাহা হইলে সেই বিজ্ঞাপন এই সকল ক্রেতা আকর্ষণ না করিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে। তাই ইঁহাদের নিকটে ব্যবসায়ী তাঁহার পণ্যের বিজ্ঞাপন উপস্থিত করিতে চাহিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা, ভাব, চিত্র, ব্লক, Display প্রভৃতি সকল দিকেই বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

"শনিবারের চিঠি" বা তজ্জাতীয় পত্রিকা যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সাহিত্য সমালোচনা, তাহার মারফতে সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীগণের নিকটে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদির সংবাদ বহন করা যাইতে পারে। এম্ সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স্ এর নবপ্রকাশিত বইএর বিজ্ঞাপন এই শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশ করিলে যতদূর কাজ পাইবার আশা করা যায়, বিশ্বাস কোম্পানীর বন্দুকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ততদূর কাজ পাইবার আশা করা যায় না।

"ব্যবসা ও বাণিজ্য", "আর্থিক উন্নতি" প্রভৃতি মাসিকপত্র উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারা পঠিত হয়। কারণ, সকলেই কি করিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, কেমন করিয়া দু'পয়সা কম খরচ হইবে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। আর, "ব্যবসা ও বাণিজ্য" বা তজ্জাতীয় মাসিকপত্র সেই সংবাদ প্রতিমাসে নূতন নূতন রূপে আমাদের নিকটে বহন করিয়া আনে। বিশেষতঃ ব্যবসায়ী এবং জমিদার শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই সকল পত্রিকার খুবই আদর আছে। এইজন্য সর্ব্ব শ্রেণীর ব্যবসায়ী এবং অন্য সাধারণ উন্নতিকামী ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পণ্যের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার বিজ্ঞাপন এই শ্রেণীর পত্রিকায় প্রদান করা খুবই লাভজনক। এই সকল মাসিকপত্র গল্পপ্রধান নহে বলিয়া ব্যবসায়ী মহলে ইহার যথেষ্ট কাটতি। ইহার যাহারা গ্রাহক এবং পাঠক তাঁহারা প্রায় সকলেই কাজের লোক এবং ব্যবসায় বুঝেন বলিয়া পণ্যের উৎকর্ষা-পকর্ষ সম্বন্ধে ইঁহাদের মতামতের মূল্যও খুব বেশী। এই শ্রেণীর পত্রিকার গ্রাহকগণের কোনও পণ্য সম্বন্ধে অনুকূল মত সৃষ্টি হওয়ার অর্থ সেই পণ্যের আশাতিরিক্ত বিক্রয় এবং তাহার ব্যবসায়ীর পকেটে যথেষ্ট অর্থাগম।

হিন্দু সাধারণের নিকটে পণ্যের সংবাদ পাঠাইতে পঞ্জিকা অতি উৎকৃষ্ট medium. সুশিক্ষিত হিন্দুগণ যদিও পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনগুলি প্রথমেই ছিড়িয়া ফেলিয়া বইখানির ওজন কমাইয়া লইয়া থাকেন, তাহা হইলেও পল্লী-গ্রামের হিন্দু সাধারণ ইহার প্রত্যেকখানি পৃষ্ঠাই সযত্নে রক্ষা করেন এবং হাতে কাজ না থাকিলেই ইহার বিজ্ঞাপনগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করেন। ফলে, অনেক সময়ে ইহাদের মনে অপ্রয়োজনীয় জিনিষেরও একটা চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ীর ভি-পি পার্শ্বেলের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কবিরাজী ঔষধের বিজ্ঞাপনের কথা ধরা যাউক। পঞ্জিকার মধ্যে কবিরাজ মহাশয়গণ তাঁহাদের ঔষধের "মরা মানুষ বাঁচাইবার ক্ষমতা" বা তদ্রূপ অসম্ভব বিজ্ঞাপনের ভাষা বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অর্ডার পাঠায় তাহাদের

বিজ্ঞাপনে বর্ণিত বিষয়ের সম্ভবতা বা অসম্ভবতা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর অথবা বুদ্ধির অভাব দেখা যায়। তাই, বিজ্ঞপনপাঠী উহা পড়িবার সময় বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত লক্ষণগুলির সহিত নিজের শারীরিক অবস্থা মিলাইয়া দেখিতে থাকেন—আর যখনই দেখেন তাঁহার শারীরিক অবস্থার সহিত পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের অনেক অংশ মিলিয়া যাইতেছে এবং বিজ্ঞাপনদাতা তাঁহাকে রাতারাতি "অর্দ্ধেক রাজ্য সহ রাজকন্যা দিয়া" সিংহাসনে বসাইবার আশ্বাস দিতেছেন তখনই বিজ্ঞাপিত ঔষধের জন্য একটী order পাঠাইয়া দেন। ইহা পরিক্ষীত সত্য এবং এই কারণেই নামগোত্রহীন ব্যক্তিও পত্রিকার প্রসাদে করিয়া খাইতেছে।
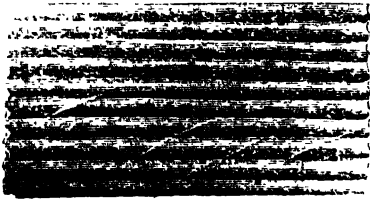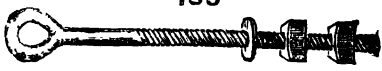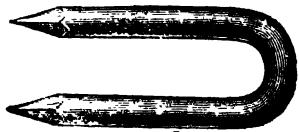
(ক্রমশঃ)

জীবন বীমার পুঁজি কি ভাবে খাটান হয়

অনেকেই জীবন বীমার পুঁজির বিশেষ কিছু সংবাদ রাখেন না। তিনি যদি বীমাকারী হন, তবে সাময়িক চাঁদার হার এবং যদি সম্ভব হয় ত লভ্যাংশের হার এই দুইএর সুসংবাদ পাইয়াই সন্তুষ্ট হন।

কাজ সংগ্রহ করা যেমন বীমা অনুষ্ঠানের এক মহৎ উদ্দেশ্য বীমার অর্থ ভাণ্ডার খাটাইয়া লভ্যাংশের সুবন্দোবস্ত করাও ইহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। এই অর্থ ভাণ্ডারের প্রসারের উপরই বীমা অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির টাকা কি ভাবে খাটান হয়, আমরা নিম্নে আদর্শ স্বরূপ চারি বৎসরের শতকরা পরিমাণ দিয়া দেখাই-তেছি।

		১৯২১	১৯২৩	১৯২৪	১৯২৫
কোম্পানীর কাগজ	শতকরা	১৫	৬৭	৬৫	৬০ টাকা
পোর্ট ট্রাষ্ট বা মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি অর্দ্ধ সরকারী অনুষ্ঠানের সাময়িক ঋণ	„	১৫	১৩	১৪	১৯ টাকা
সম্পত্তি বন্ধকী দ্বারা	„	৭	৬	৬	৭ টাকা
বীমাপত্রের উপর ঋণ	„	৩	৩	৪	৭ টাকা
অন্যান্য ভাবে	„	১০	১২	১১	১০ টাকা

আমরা উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৫ সালের লগ্নি টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ একথা জানা উচিত এ হিসাব ভারতের যাবতীয় দেশীয় বীমা কোম্পানীর পুঁজির ঘাট্তি টাকার উপরই হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি ১৯২৫ সালে যাবতীয় দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানের সঞ্চিত পুঁজির শতকরা ৬০৲ টাকা কোম্পানীর কাগজ ১৯ টাকা পোর্টট্রাষ্ট ও মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার ৭ টাকা সম্পত্তির বন্ধকী, পলিসীর উপর ঋণ ৪ টাকা এবং অন্যান্য নানাভাবে ১০ টাকা খাটান হইয়াছে। উপরি-উক্ত তালিকাপাঠে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে অধিকাংশ টাকাই কোম্পানীর কাগজে খাটান হয়, এবং সেই জন্য সুদ হিসাবে অপেক্ষাকৃত কম আদায় হয়।

ভারতের মত দেশে (যেথানে শিল্প বাণিজ্যের নব জাগরণ আসিয়াছে) সুদ আদায় হওয়া উচিত ঢের বেশী। কিন্তু অধিকাংশ পুঁজি কোম্পানীর কাগজে খাটান হয় বলিয়াই সুদের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে না। আমাদের দেশের এ ব্যবস্থার অনুপাতে অন্যান্য সভ্যদেশের বীমার তহবিল খাটাইবার পন্থা বিভিন্নরূপ দেখা যায়। তুলনার জন্য আমরা ১৯২৬ সালের যুক্ত প্রদেশের তালিকা নিম্নে দিলাম :—

সম্পত্তি বন্ধকী	শতকরা	৪২.৮	ভাগ
কোম্পানীর কাগজ	"	৯.৪	"
অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার	"	২৮.৮	"
পলিসীর উপর ঋণ	"	১২.২	"
জমি ক্রয় ইত্যাদি	"	১.৮	"
নগদ	"	.৯	"
অন্যান্য নানাবিধ	"	৪.৯	"

এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কোম্পানীর কাগজে মাত্র শতকরা ৯.৪ টকাই খাটান হয়। আমাদের দেশেও যদি এইরূপ বন্ধকী ইত্যাদি কাজে টাকা যথেষ্টভাবে খাটান যাইত তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক সুদ আসিত। আমাদের দেশীয় অনুষ্ঠানগুলি যদি এ বিষয়ে আরও একটু বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যথেষ্ট আদায় হইতে পারে। তাহা ছাড়া যদি মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির ষ্টক্ ও ডিবেঞ্চারে অধিকাংশ টাকা খাটান হইত, তাহা হইলেও শুধু যে পুঁজি নিরাপদ থাকিত তাহা নহে, ঘাটতি হিসাবে আদায়ের পথও সুপ্রশস্ত হইত। আমাদের দেশে এমন অনেক মিউনিসিপ্যালিটী আছে, যাহারা অর্থাভাবে আলো, পরিষ্কার জল সরবরাহ এবং জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াও তাহারা তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে সহরবাসীগণকে আধুনিক সুবিধা প্রদান করিতে পারিতেছে না। এমন কি গভর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টি পাইয়াও টাকার অভাবে কাজ আরম্ভ হয় না। আমাদের বিশ্বাস, যদি বীমা অনুষ্ঠানগুলি এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাহাদের তহবিল হইতে এইরূপ মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিকে ঋণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে দেশের যে কত মহোপকার হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে লগ্নী টাকা হারাইবার উপায় নাই কারণ, সরকার বাহাদুরের গ্যারাণ্টি দ্বারা আদায়ের পথ সংরক্ষিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু জনসেবা ও জাতিগঠনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে জাতীয় পরিপুষ্টির পথও সুপ্রশস্ত হয়। অনেক বিচক্ষণ জননায়কের মত এই যে, বীমার টাকা যখন জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তখন এই জনসাধারণের সেবাতেই ইহার সদ্ব্যয় হওয়া উচিত। ইহাতে আদায় হয় আশানুরূপ, এবং সাধারণের উপকারও হয় তদনুরূপ।

তাহার পর পলিসীর উপর বীমাকারীর ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ। তুলনা করিলে আমাদের দেশে ইহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু কম হইলেও এ কথা জানা খুবই আবশ্যক যে ঋণের পরিমাণ আরও কম হইতে পারে—যদি দেশের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতে থাকে। কারণ, বীমাকারী অভাবে পড়িয়াই এইরূপ ঋণ গ্রহণ করেন। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Consumptive Loan অর্থাৎ এই ঋণের দ্বারা শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি হয় না, অধিকাংশ স্থলে বীমাকারী গৃহস্থালীর আর্থিক অনটন পরিপূর্ণ করে মাত্র। অবশ্য ইহার ফলে বীমার উদ্দেশ্য অর্থাৎ অসময়ের সংস্থান সুসম্পন্ন প্রায়শঃই হয় না। কারণ, এই ঋণ দিন দিন সুদে বাড়িতে থাকে, এবং পরে যখন পূর্ণ হয় অথবা বীমাকারীর হঠাৎ মৃত্যু হয়, তখন দেখা যায় প্রাপ্য দাবীর পরিমাণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সঙ্কোচ পাইয়াছে। কারণ দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসার সময়ে এই ঋণের পরিমাণ বাদ দিয়া বাকী টাকা দেওয়া হয়। সুতরাং নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক উভয় ভাবেই বীমার উদ্দেশ্য নিস্ফল হয়। প্রত্যেক বীমাকোম্পানীরই এই ঋণের আবেদন পাইলে উপযুক্ত ভাবে বীমাকারীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে এইরূপ ঋণ দ্বারা তাঁহারাই অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বলা বাহুল্য, দেশে সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক দুরবস্থা হইলে এই ঋণের পরিমাণ রোধ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বৃদ্ধি পায়। তখন ইহার পথ রোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তবে যতটা সম্ভব বীমাকারীকে এবিষয়ে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবহিত হইতে

বলা প্রত্যেক বীমা-অনুষ্ঠানেরই কর্ত্তব্য। কারণ এই ঋণ একবার লইলেই বীমাকারী প্রত্যর্পণের পথ খুঁজিয়া পান না, এবং চক্রবৃদ্ধি হিসাবে তাহার সুদ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। যদি নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বীমা চলতি রাখিবার জন্যই ঋণ দেওয়া উচিত।

সম্পত্তি বন্ধকীর প্রসার আরও বেশী হওয়া উচিত। কারণ এইভাবে টাকা খাটানও যথেষ্ট নিরাপদ, এবং সুদও আসে যথেষ্ট।

শেষ ভাগে আমরা দেখিতে পাই পুঁজির শতকরা জমা অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে প্রথম, Personal securityর উপর ঋণ দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে খুব সাবধান হইলেও বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাহার পর এজেণ্টগণকে ঋণ দেওয়া হয় এবং তাহাদিগের কার্য্য প্রসারের সহিত এই ঋণ আদায় হয়। এজেণ্টের সততা এবং কার্য্যকুশলতার উপরই এই ঋণের আদায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্কে ক্যাশ ও ডিপজিট প্রভৃতি যথেষ্ট রাখা হয়। এই সমস্ত পুঁজি দেশের কিংবা দশের কাজে লাগে না, সুতরাং ইহারও প্রসার কমান উচিত।

আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠির দ্বারা হিসাব করিলে দেখা যায়, আমাদের দেশ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে। দেশের রেলপথ এবং সাধারণ রাস্তা এখনও সুচারুরূপে দেশের অভাব মেটায় নাই। ইহাদের বিস্তারে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করিবে। জীবন সংগ্রাম এত কঠোর হইয়া পড়িতেছে যে দেশ বিদেশের লোক ভারতময় ঘুরিয়া ফিরিয়া উপার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং ইহার দ্বারা অর্থনৈতিক পরিপুষ্টি দেখা দিবে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশমাতা তাঁহার ভাণ্ডারে শিল্প বাণিজ্যের সমস্ত সম্ভারই রাখিয়া দিয়াছেন। শুধু অর্থাভাবে সে সমস্ত শিল্প-বাণিজ্যের গঠন হইতে পারিতেছে না। আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তপ্রদেশ ও ক্যানাডার বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য্যের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় বীমার পুঁজির দ্বারা তাহারা কত রকমে জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়াছে। ক্যানাডার বিস্তৃত জঙ্গল আজ শস্যশ্যামলা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; দক্ষিণ আফ্রিকার ও অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাসও বারবার ঐ কথা সমগ্র জগতে প্রকাশ করিতেছে। আমাদের দেশেও যদি অনুরূপ নীতি ও কার্য্য কৌশল গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও দেশে আর দারিদ্র্য থাকে না, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার হয়, এবং জনসাধারণের উপার্জ্জনের পথও যথেষ্ট প্রশস্ত হয়।

জীবন বীমা ও জনসেবা

সাধারণতঃ আমাদের দেশের লোকের এইরূপ ধারণা যে বীমা শুধু টাকার কারবার লইয়াই হয়। সাময়িক চাঁদা গ্রহণ করিয়া এবং উপযুক্ত সময়ে দাবীর টাকা মিটাইয়াই বীমার কাজ ও কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়া যায়। একথা সত্য যে সকল প্রকারের বীমা অনুষ্ঠানই বাহ্যতঃ এইরূপ ভাবেই লেন দেনের কারবার করে। কিন্তু যদি বীমার গূঢ় উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই বীমার মধ্য দিয়াই কতবড় একটা জনসেবার আদর্শ জাতি ও সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত করিতে নিযুক্ত।

এই ধরুন অগ্নিবীমা। আমরা জানি, যখন কোন আবাস বা অট্টালিকা অথবা কারখানা আগুন লাগার জন্য বীমা করা যায়, তাহার জন্য শতকরা হিসাবে অনুরূপ বীমা কোম্পানীকে সামান্য চাঁদা দিতে হয়। ফলে, বীমা কোম্পানীর সহিত এই চুক্তি হয় যে বীমাকৃত সৌধে যদি অতর্কিতভাবে আগুন লাগে, তাহা হইলে যেটুকু ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করিয়া দিবে। এইরূপ বীমা সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য হয়, এবং এক বৎসরের মধ্যে যতবারই আগুন লাগুক না কেন, প্রত্যেক বারের ক্ষতি পূরণ করিতে বীমা কোম্পানী বাধ্য।

অন্যান্য নানাবিধ সর্ত্ত বাদ দিয়া আমরা অগ্নি বীমার মোটামুটি উদ্দেশ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম; ফলে, অগ্নিবীমা কোম্পানীগুলির উপর এইরূপ দায়িত্ব পড়ায় তাহারা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য যে, যে সমস্ত অট্টালিকা বীমার উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহা যেন এমনভাবে নির্ম্মিত হয় যে আগুন লাগা পারতপক্ষে যেন সহজসাধ্য না হয়। এই অবস্থায় স্থপতি ও পারদর্শী বীমা ইন্সপেক্টরের সহযোগিতা দৃষ্ট হয়। তাহার ফলে আবাস ও অট্টালিকার নির্ম্মাণে এমনভাবে উন্নত পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হয় যাহাতে শুধু আকস্মিক অগ্নিদাহ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা নহে, সৌন্দর্য্য ও সুবিধার দিকেও যথেষ্ট উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সৌধ নির্ম্মাণে এমন দক্ষতা প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয়, যাহাতে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। মোটামুটি ধরিতে গেলে এই মাত্র বোঝা যায় যে, আকস্মিক অগ্নিদাহের দরুণ অপরিমিত টাকা দিয়া যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় বীমা কোম্পানী তাহার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু তাহার ফলে যে জনসেবার দিক দিয়া উন্নত ও পরিমার্জ্জিত বাসস্থান ও অন্যান্য সৌধের ব্যবস্থা হইতেছে, একথা ভোলা উচিত নহে।

তাহার পর, দৈব দুর্ব্বিপাক (acoident insurance বীমার কথা বিবেচনা করা যাক্। আমাদের দেশে বড় বড় কারখানা ব্যতীত অন্যত্র এরূপ বীমার বিশেষ প্রচলন হয়

নাই। কিন্তু একথা নিশ্চিতই যে, আজকাল জীবন যাত্রার পথে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ও বিপদ এমনভাবে আক্রমণ করে, যে অনতিবিলম্বেই জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বীমার যথেষ্ট প্রচলন হইবে। পথ চলিতে গাড়ি ঘোড়া, ট্রাম, মোটরকার ত' আছেই, তাহা ছাড়া অপরিচিত কুকুর, সাপ ইত্যাদি জন্তু, গুণ্ডার অত্যাচার, সাময়িক রোগ, তাপ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি এ সমস্তই পদে পদে মানুষকে বিপদের আশঙ্কা আনিয়া দিতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে মানব যেমন সুখ ও সুবিধা অনেক পাইয়াছে, আবার অনেক বিপদও ডাকিয়া আনা হইয়াছে। এই বিপদ পাতের সুব্যবস্থার জন্যই এইরূপ বীমার প্রচলন হইয়াছে; এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও জীবন যাত্রার প্রতি পদেই যথেষ্টভাবে অনুভূত হইতেছে, বিশেষ করিয়া আধুনিক শিল্প অনুষ্ঠানগুলিতে—যেখানে বহু শ্রমজীবির সমাবেশ হয় এবং কল-কব্জার সামান্য অঘটনে জীবন বা অঙ্গহানি হইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে এই অবস্থায় অনুষ্ঠানের পরিচালককে হয় চিকিৎসার জন্য নতুবা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ভুক্তভোগী শ্রমিক অথবা তাহার পরিবারবর্গকে যথাযোগ্য অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। এইজন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানই কোন

না কোন বীমা কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এইরূপ যন্ত্রপাতির দোষে আকস্মিক বিপদের সহায়তার ব্যবস্থা করেন। এই সহযোগিতার ফলে বীমা কোম্পানীর এমন প্রতিনিধিগণ দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলির সাময়িক পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, যাঁহারা ঐ সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছেন। অনুষ্ঠানের কল কব্জা প্রভৃতিতে কোনরূপ বিপদ সঙ্কুল যোগাযোগ দেখিলেই তাঁহারা মালিক অথবা পরিচালককে দেখাইয়া উহার সংশোধন করান। তাহাতে দুই পক্ষেরই লাভ দৃষ্ট হয়। অনুষ্ঠানের দিকে শ্রমিকদিগের মধ্যে কার্য্যকুশলতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, কাজ বৃদ্ধি পায়, এবং বীমা কোম্পানীর ও শ্রমিকদিগের মধ্যে বিপদের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় দাবীর টাকার পরিমাণও কমিয়া যায়। উপরন্তু শ্রমিকদিগের জন্য যাহা হইল, জনসেবা হিসাবে ধরিলে তাহারও মূল্য যথেষ্ট। পাশ্চাত্যদেশে এইরূপ ভাবে উৎকর্ষ সাধিত হইয়া আজ শ্রমিকগণ আর কুকুর বিড়ালের মত গণ্য না হইয়া মানুষের মতই গণ্য হয়। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল আজ শ্রমিকগণের দলপতি বিলাতের প্রধান মন্ত্রীরূপে ইংলণ্ডের রাজ্যনীতি ক্ষেত্রে বিরাজিত হইবেন!

এইরূপ অন্যান্য সর্ব্বপ্রকারের বীমা কোম্পানী তাহাদের ক্ষেত্রে উন্নতির প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে আজ সামুদ্রিক বীমার (Marine insurance) জন্যই যাত্রীবহনে এত সুখ ও সুবিধা এবং যানবাহনে ক্ষিপ্রতা পরিদৃষ্ট হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সূচীপত্র

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১২শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩৯ { ১২শ সংখ্যা

চামড়া ট্যান করিবার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্থানীয় বাজারের অবস্থা

যে শ্রেণীর ট্যানারীই স্থাপন করা হউক না কেন, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই স্থানীয় অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইতে হইবে। উহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে :—

(১) রুক্ষ পাত্‌লা চর্ম্ম এবং অন্যান্য জিনিষের সরবরাহ কি প্রকার হইবে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

একমাত্র বার্ক ট্যানিংএর টান্ করিবার উপযোগী মালমসল্লার দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্রোম ট্যানিংএর জন্য যে-সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহা সহর হইতে কিনিয়া না আনিলে চলিবে না। ভাড়া সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, এবং উহাকে কখনো ফ্যাক্টরী স্থাপনের অন্তরায় বলিয়া গ্রহণ করিতে নাই। রেল, ষ্টীমার, নৌকা কিংবা গাড়ীর সাহায্য পাওয়া সুবিধার কথা বটে; আজকালকার দি'ন এমন জায়গা কমই আছে যেখানে ইহার

একটী-না-একটির সাহায্য আদৌ পাওয়া যাইবে না।

কার্য্যারম্ভের প্রধান কথা হইতেছে চর্ম্ম সরবরাহ লইয়া। যদি ট্যানারী তাজা কিংবা লবণ দেওয়া চামড়া সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে যে উহা খুব সুবিধাজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহারা বাকল কিংবা ক্রোম পদ্ধতিতে কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের উভয়ের পক্ষেই ইহা খুব সুবিধার কথা হইবে। শেষোক্ত প্রণালীতে কাজ করিতে গেলে তাজা মাল না হইলেই চলিবে না। শুষ্ক চর্ম্মে অনেক সময় অকেজো অংশও আসিয়া পড়ে এবং কাজ আরম্ভ না করিলে উহা অনেক সময় ধরা পড়ে না। তখন চোখে পড়া-না-পড়া সমান কথা হইয়া দাঁড়ায়। কেননা ইহা হইতে যে লেদার প্রস্তুত হয়, তাহা ভাল হয় না এবং বিক্রয় হইলেও, আবার উপযুক্ত অর্থ আসে না। কাজেই ট্যানারদিগের প্রবচন যে ট্যানারী খুলিতে হইলে যেখানে তাজা চামড়া ও খাল পাওয়া যায়, তাহার খুব নিকটেই খোলা উচিত।

(২) পরিস্কার জলের যথেষ্ট সরবরাহ হওয়া উচিত। এক কথায় পাতকুয়ার জল যদি "নরম" (soft) হয় তাহা হইলে খুব ভাল হয়, কারণ ঐ জল ঠাণ্ডা এবং স্বচ্ছ হয়; অভাবে নদীর জলেও কাজ চলে। পদ্মার জল ট্যানিংএর পক্ষে খুব সুবিধাজনক দেখা গিয়াছে। ভাগীরথীর (কলিকাতার গঙ্গা) জল জোয়ার ভাটা পড়ে বলিয়া লবণাক্ত এবং অপরিস্কার, তবে খুব "কঠিন" (hard) নহে। অবশ্য যদি এই গঙ্গার জল থিতিয়ে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ট্যানিংএর পক্ষে খুব ভাল কাজ করে। পূর্ব্ববঙ্গের কৃত্রিম পুষ্করিণীগুলির জলও ট্যানিংএর পক্ষে উপযুক্ত এবং ঐ কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার অধিকাংশ পুকুরের জল অত্যন্ত নোনা ও কঠিন, এই জন্য ট্যানিংএর কাজে ব্যবহার করা উচিৎ নহে।

(৩) যানবাহনের সুবিধা থাকা দরকার।

(৪) বাজার নিকটে থাকা উচিত।

আগে বলা হইয়াছে যে মফস্বলবাসী ট্যানারদিগের প্রধান খরিদ্দার স্থানীয় মুচি ও জুতা প্রস্তুতকারকরা। সুতরাং যে স্থানে অনেক মুচি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা জুতা প্রস্তুত ও মেরামত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই স্থানেই ট্যানারি খোলা সুবিধাজনক।

(৫) কারিগর ও কুলি সরবরাহও এই ব্যবসায়ে এক ভাবিবার জিনিষ। কারণ, দেশে জাতিভেদ থাকায় এক চামার ছাড়া অন্য কোন জাতি চামড়ার কাজে হাত দেয় না। বাঙ্গলাদেশের চামারগণ পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চাষবাস করিতেছে। যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে চামড়ার ব্যবসায়ে পয়সা আছে তাহা হইলে আবার তারা পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিবে। তাহা ছাড়া মুসলমানগণও ট্যানারির কয়েকটী কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে যেখানে ট্যানারি খোলা হইবে, এ সব ট্যানারি চালাইবার জন্য প্রথমেই ও কলিকাতা অথবা পশ্চিম দেশ হইতে ভাল কারিগর আমদানী করা দরকার। স্থানীয় লোক যখন যথেষ্টভাবে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবে, তখন ঐ সমস্ত আমদানী করা কারিগরগণকে বিদায় দিয়া স্থানীয় লোককেই বহাল করা যাইতে পারে। তাহাতে খরচে সাশ্রয় পড়িবে নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ছোট ট্যানারি খুলিবার ছকটী পদ্ধতি দেওয়া হইল। মফঃস্বলের উপযোগী করিয়াই এই সমস্ত স্কীম প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা কম মূলধনে কাজ আরম্ভ করিতে চাহেন তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার উপর নজর রাখিয়া এই সমস্ত স্কীম তৈয়ার করা হইয়াছে।

অন্ততঃপক্ষে ৫০০০ টাকা মূলধনের প্রয়োজন। ইহার কমে এ কাজ আরম্ভ করিলে সময়োপযোগী লাভ দৃষ্ট হইবে না। অবশ্য কমপক্ষে ৫০০০ টাকা হইতে আরম্ভ হইয়া ৬৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত মূলধনে ট্যানারি খোলা যাইতে পারে। এরূপ চামড়া তৈয়ার করিবার প্রথা নিদর্শন করা হইয়াছে যাহার চাহিদা বাজারে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মূলধনের কম বেশী প্রধানতঃ নির্ভর করে মাল তৈয়ারী ও সরবরাহের পরিমাণের উপর। বেশী মূলধন লাগাইলে চামড়া ট্যান্ হইবে বেশী, এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য চালান যাইতেও পারিবে বেশী। কম মূলধনে মালের পরিমাণ হইবে কম। কি কি ভাবে মূলধন প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লক ক্যাপিটাল

ব্লক ক্যাপিটাল মানে বুঝায়, যে অর্থ জমি, ঘর-বাড়ী, দ্রব্য সম্ভার এবং স্থায়ী ও মজবুত যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে খরচ হয়। এ সমস্ত জিনিষ প্রয়োজনীয়, কারণ, ইহাব্যতীত ব্যবসা চলিতেই পারে না। অথচ ইহাতে সোজাসুজি ভাবে কোনরূপ আয় হইতে পারে না, বরং ইহার মূল্য ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে (depreciation); সুতরাং ছোট-খাট ভাবে কারবার আরম্ভ করিতে হইলে যতদূর সম্ভব কম টাকা এই ভাবে প্রয়োগ করা উচিত। অন্ততঃ এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইলে জমি ও ঘর বাড়িতে খুব কম টাকা লাগান উচিত। ইহাতে তৈয়ারী চামড়ার গুণে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না।

জমি কিনিবার সময়ে এটুকু দৃষ্টি রাখা দরকার যে কারবার বিস্তৃত হইলে যেন আশে পাশে আরও জমি পাওয়া যাইতে পারে। মফঃস্বলে এরূপ জমি পাওয়া বিশেষ কঠিন নহে। সাধারণতঃ ৪০০০ টাকা বিঘা হিসাবে জমি পাওয়া যায়, অনেক স্থলে ইহা অপেক্ষা সস্তাতেও পাওয়া সম্ভব।

ঘর-বাড়ীও সস্তায় তৈয়ার করা উচিত। বাঁকারীর দেয়ালের উপর গোল পাতা অথবা খড়ের ছাউনি যুক্ত দালান এই সমস্ত কারবারের পক্ষে উপযুক্ত। মেঝে মাটির হইলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ বাড়ীতে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙ্গালী সপরিবারে বাস করেন। ইহাতে সুবিধা যথেষ্ট এবং তৈয়ারী করিতেও খরচ কম পড়ে। তবে একমাত্র ভয় আগুনের, কিন্তু সামান্য একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে ট্যানিংএর কাজ ঐরূপ দালান বাড়ীতে খুব সহজেই চলিতে পারে। কলিকাতার আশে-পাশে অনেক স্থানে শত শত ক্ষুদ্র ট্যানারি গোলপাতার ছাউনিযুক্ত বাড়ীতে বহুকাল যাবৎ সন্তোষজনকভাবে কারবার চালাইয়া আসিতেছে।

অন্যান্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে গর্ত্ত, (pit) মেসিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির নাম করা যাইতে পারে।

ট্যানিংএর জন্য যে সমস্ত গর্ত্ত তৈয়ার করা হইবে তাহা যেন ভাল করিয়া বাঁধান হয়, নতুবা চামড়ার রং উঠিয়া যাইতে অথবা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অনেকস্থলে গর্ত্তের জায়গায় কাষ্ঠনির্ম্মিত টব অথবা মাটীর গামলাও ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রপাতি সমস্তই প্রথমাবস্থায় কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনাই প্রশস্ত, পরে দেখিয়া শুনিয়া নিজগ্রামেই প্রস্তুত হইতে পারে। যেসমস্ত দোকানদার এই সমস্ত জিনিষ যোগান দিতে পারে তাহাদিগের ঠিকানা পরে দেওয়া যাইবে।

চল্‌তি মূলধন

২। চলতি মূলধনের প্রয়োজন হয় মাল কিনিতে, কারিগরের মাহিনা দিতে এবং উপযুক্ত চামড়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে। যতদিন পর্য্যন্ত তৈয়ারী চামড়া বিক্রয় না হয় ততদিন পর্য্যন্ত টাকা আটকাইয়া পড়িয়া থাকে। মাল বিক্রয় হইলে তবে লগ্নী টাকা এবং সেই সঙ্গে লাভও ফেরৎ আসে। মালের পরিমাণের উপরই চল্‌ত মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। তাহা ছাড়া মাল তৈয়ার করিতে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন সেই সময় বিক্রয়ের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে, কারণ যেখানে সময় বেশী দরকার হয় সেখানে টাকাও বেশী আটকাইয়া থাকিবার সম্ভাবনা। আবার বিক্রয়ের তৎপরতা যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে টাকা আটকাইয়া থাকিবার সম্ভাবনা কম, সুতরাং সেস্থলে কম মূলধনেই কাজ হইবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং দুইটী বিশেষত্বের উপর ট্যানিংএর কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে। ১ম, চামড়া তৈয়ারী করিতে প্রয়োজনীয় সময় এবং ২য়, যত তাড়াতাড়ি বিক্রয় হয়। কারণ তাড়াতাড়ি বিক্রয় হইলে নগদ টাকা ফেরৎ আসিলে আবার সেই টাকা লাগাইয়া ব্যবসাকে বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। আমরা নিম্নে যে ছয়টী স্কীম দিলাম, তাহাতে নানাবিধ চামড়া প্রস্তুত করিতে প্রয়োজনীয় সময় এবং বিক্রয়ের সময় এ-সমস্তই হিসাবে আনা হইয়াছে ; এবং ইহারই উপর চলতি মূলধনের হিসাব করা হইয়াছে। অবশ্য তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিবার যদি যথেষ্ট উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা না দেখা যায় তাহা হইলে স্বভাবতঃই অধিকতর মূলধনের প্রয়োজন হইবার সম্ভাবনা

লাভের খতিয়ান

ট্যানারীতে কি লাভ দাঁড়ায় তাহাও দেখান হইয়াছে। গড়পড়তায় কত খরচ হয় বিক্রয়ের দাম হইতে তাহা বাদ দিলে এই লাভ পাওয়া যায়। অবশ্য এই লাভ স্থির করা হইয়াছে ঐরূপ তৈয়ারী চামড়ার উপর যাহা বাজারে সচরাচর বিক্রয় হইতে পারে।

১ম স্কীম।

১ম স্কীম অনুসারে একটী ছোট বল্কল ট্যানারি মফঃস্বলে ৫০০০ টাকার মূলধনে কিভাবে দাঁড়াইতে পারে তাহাই দেওয়া হইয়াছে। এই স্কীম অনুসারে মহিষের চামড়া ব্যাগ্ প্রসেসে (bag process) এবং গরু ও মেষের চামড়া পিট

প্রসেস (pit process) দ্বারা উদ্ভিজ্জ ট্যানিং এর মসলা দিয়া ট্যান্ করিবার প্রথার হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

এই স্কীমে মাসে ১৫টী মহিষের চামড়া, ৩০টী গরুর এবং ৫০টী মেষের চামড়া তৈয়ার হইতে পারে।

ব্লক ক্যাপিটাল ;		২০৬৭৲
যথা,		
জমি ১ বিঘা ;	৪০০৲	
১টী শেড বা দালান ; (৬০ ফুট × ২০ ফুট—১২০০ বর্গফুট ব্যাঁকারির উপর গোলপাতা বা খড়ের ছাউনি, বাঁশের দেয়াল এবং মাটির জমি—যাহা ৮০ বর্গফুট খরচে তৈয়ার হইতে পারে।)	৯০০৲	
অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার		৪৩০৲
৪টী চূণের গর্ত্ত ৫ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট—প্রত্যেকটী করাইতে ৩৫৲ টাকা পড়িবে—	১৪০৲	
৪ টী ট্যান পিট—৬ ফুট × ৫ ফুট × ৪ ফুট—প্রত্যেকটীর খরচ ৩৫৲ টাকা হিসাবে—	১৪০৲	
২টী ঝুলাইবার গর্ত্ত (suspension pit) ব্যাগ ট্যানিং এর উপযুক্ত প্রত্যেকটী ৮ ফুট × ৩ফুট × ৩ফুট	৬০৲	
৯টী মাটীর গামলা প্রত্যেকটীর মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে	৯০৲	
	৪৩০৲	

যন্ত্রপাতি ৩৩৭৲

২ টী মাংস ছাড়াইবার ছুরী (fleshing knives) ৩৲ করিয়া ; ৬৲

২ টী লোম ছাড়াইবার ছুরী (unhairing knives) ২॥ টাকা করিয়া ৫৲

২ টী শেভিং ছুরী (shaving knives) ৫৲ টাকা করিয়া ১০৲

২ টী শেভিং বীম (shaving beams) ৭৲ টাকা করিয়া ১৪৲

২ টী ফ্লেশিং বীম (fleshing beams) ৫৲ টাকা করিয়া ; ১০৲

৬ টী ষ্টীল শার্পনার (steel sharpener) ৸০

২টী পিতলের স্লিকার (brass slickers) ১॥০ টাকা করিয়া ৩৲

২টী লোহার স্লিকার ২৲ (iron slickers) ১৲ টাকা করিয়া ২৲

৪টী লোহার হুক ১৲ টাকা করিয়া ৪৲

২ টী হাতুড়ী ১॥০ টাকা করিয়া ৩৲

২টী চিমটা (pincers ২৲ টাকা করিয়া ৪৲

৬ টি বালতী (galvanised buckets) প্রত্যেকটি ২ গ্যালন করিয়া ২৲ টাকা হিসাবে ১২৲

৬ টি ব্রাস ।৵০ করিয়া ২৲

৩ টি এনামেলের গামলা (enamelled bowls). ২৲ টাকা করিয়া ৬৲

১টি দাঁড়িপাল্লা ১০৲

১টি স্প্রিং ব্যালান্স (Spring balance) ৫০৲

১টি মার্ব্বলের টেবিল ৬ ফুট × ৪ ফুট ১৫০৲

১টি কর্ক বোর্ড ৫৲

২টি ঢেঁকি প্রত্যেকটি ২০৲ টাকা করিয়া ৪০৲

৩৩৬৸০

অর্থাৎ ৩৩৭৲

মোট ২০৬৭৲

চলতি মূলধন ১৮৪৬৲

থাল ও চামড়া ৮৯২॥০

১৫টী মহিষের থাল, প্রত্যেকটী ১০৲ টাকা করিয়া ২ মাসের জন্য ৩০০৲

৩০টী গরুর চামড়া, প্রত্যেকটী ৪৲ টাকা করিয়া ৪ মাসের জন্য ৪৮০৲

৫০টী মেষের চামড়া, প্রত্যেকটী ৸০ আনা করিয়া ৩ মাসের জন্য ১১২॥০

৮৯২॥০

ট্যান করিবার মালমশলা ৩৩৭॥০

২॥০ টাকা মণ হিসাবে ১৩৫ মণ

অন্যান্য সামগ্রী ৯৬৲

১২ মণ চুণ ১৬৲

২ মণ চর্ব্বি ৬০৲

১ মণ মাছের তৈল ২০৲

৯৬৲

৪ মাসের জন্য কারখানা চালাইবার খরচ	৫২০৲
৩জন কারিগরের মাহিনা মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে	৪৫৲
১ জন পাঞ্জাবী মিস্ত্রী ৫০৲ টাকা হিসাবে	৫০৲
১ জন দরওয়ান মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে	১৫৲
১ জন কেরাণী মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে	২০৲
	১৩০৲
মোট	১৮৪২৲

মোট মূলধন নিম্নলিখিত অংশে বিভক্ত হওয়া উচিত :—

ব্লক ক্যাপিট্যাল্	২০৬৭৲
চল্‌তি ক্যাপিটাল্	১৮৪৬৲
রিজার্ভ ক্যাপিটাল্	১০৮৭৲
মোট	৫০০০ টাকা

লাভের খতিয়ান

মহিষের খাল হইতে		১৫৲
তৈয়ার করিবার খরচ	১৫॥০	
বাজার দর	১৬॥০	
লাভ	১৲	

সুতরাং ১৫টী থালে মাসিক লাভ

দাঁড়াইবে	১৫৲
গরুর থাল হইতে	৪৫৲
তৈয়ার করিবার খরচ	৬৲
বাজার দর	৭॥৹
লাভ	১॥৹

সুতরাং ৩০টী চামড়ায় মাসিক

লাভ দাঁড়াইবে	৪৫৲
মেষের চামড়া হইতে	২৫৲
তৈয়ার করিবার খরচ	১।৹
বাজার দর	১৸৹
লাভ	॥৹

সুতরাং ৩০টী চামড়ায় মাসিক

লাভ দাড়াইবে	২৫৲

অতএব দেখা যাইতেছে উপরোক্ত তৈয়ারী চামড়া বিক্রয় করিয়া মাসে লাভ দাঁড়ায়

১৫৲+৪৫৲+২৫৲=৮৫৲

তাহা হইলে বাৎসরিক লাভ দাঁড়ায় ১০২৯৲। ৫০০০৲ টাকা মূলধনের উপর ঐ লাভ শতকরা ২০·৪ টাকায় দাঁড়ায়।

(ক্রমশঃ)

বরফ প্রস্তুত প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অস্বচ্ছ বরফ

যখন বরফের ব্যবসা ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে দাঁড়াইয়া গেল, তখন কলের মালিকগণ বরফের গুণের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এবং সেই জন্যই বরফের পাত প্রথম প্রথম বড্ড অস্বচ্ছ হইত। ইহার কারণ জল এত তাড়াতাড়ি বরফে পরিণত হইত যে উহার ভিতরকার বাতাস আর বহির্গমনের পথ খুঁজিয়া পাইত না, কাজেই দেখা যাইত যে বরফের যতই অন্তরের দিকে প্রবেশ করা যায়, ততই ইহার অস্বচ্ছভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই অস্বচ্ছভাব এত বেশী থাকে না, যেমন শীতপ্রধান দেশে থাকে। উত্তাপ যেখানে বেশী সেখানে হাওয়া হাল্কা হইয়া যায়; কাজেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জলে শীতপ্রধান দেশের জলের মত এত বেশী হাওয়া বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। বরফও তাই ওখানকার মত এত অস্বচ্ছ হইবার সুযোগ পায় না। ইহা যেমন চক্ষুর পীড়াদায়ক এবং সুদৃশ্য নহে, তেমনি ইহার কোয়ালিটিও আবার নিম্নতর শ্রেণীর হইয়া থাকে।

স্বচ্ছ বরফ

স্বচ্ছ বরফ নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত হইতে পারে :—

(১) সাবেকী বিশুদ্ধিকরণের প্রথায় (distillation method) বেশীর ভাগ হাওয়াই বাহির হইয়া যায়।

(২) আধুনিক সময়ে বেশীর ভাগ কলই নিম্নোক্ত প্রথায় হাওয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে। যখন পাত্রের জল বরফে পরিণত হইতে থাকে, তখন উহার জল ক্রমাগত নাড়িতে থাকিলে ভিতরকার বদ্ধ হাওয়া বাহির হইয়া যাইবার সুযোগ পায়।

যে-সমস্ত বরফের কলে সাবেকী বিশুদ্ধিকরণের প্রথায় বরফ তৈয়ার করা হইত, তাহা কয়েকবৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিলেও এখন আর ঐ প্রকারে কাজ করা হয় না। আজকাল ষ্টীম শক্তি নিয়োজিত মেসিন সমূহে জল আন্দোলন করিয়াই বরফ তৈয়ার করা হইয়া থাকে। যাঁহারা খুব বেশী পরিমাণে বরফ প্রস্তুত করেন না, তাঁদের পক্ষে শেষোক্ত পদ্ধতিতে কাজ করা যেমন আর্থিক সুবিধাজনক, তেমনিই আবার নির্ঝঞ্ঝাট। এমন কি, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য না লইয়াই এই কাজ চলিতে পারে।

ইহার কাজ নিম্ন-লিখিত প্রকারে চলিবে :—

বরফ নির্ম্মাণ করিবার ট্যাঙ্কের মধ্যে যে পাইপ থাকে তাহার সাহায্যে বিভিন্ন ট্যাঙ্কের জলে বাতাসের সহযোগে অল্প চাপ দিয়াই আন্দোলন সৃষ্টি করা যায়। প্রয়োজন পড়িলেই Self closing cock এর সাহায্যে হাওয়া প্রবেশ করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর বরফ নির্ম্মাণ করিবার কল ভারতে এবং বহির্ভারতে বিক্রয় হয়।

কাজ চালাইবার হিসাব

বরফ প্রস্তুত করিবার পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যয়-গুলি অপরিহার্য্য (১) মজুর (২) মেসিন শক্তি নিয়োজিত করিবার খরচ এবং (৩) জল। এই ব্যবসাতে কিরূপ আয় হইবে না হইবে তাহা এই সমস্ত খাতে যে খরচ হইবে তাহা দিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহার সঙ্গে তৈল, অ্যামোনিয়া এবং মেসিনের যন্ত্র লওয়া বাবদও কিছু খরচ হইবে। তৎপরে যেখানে কারখানা স্থাপন করা হইবে, সেখানকার বাজার দরের সহিত বরফ নির্ম্মাণ সামঞ্জস্য বুঝিয়া উহা লাভজনক হইবে কিনা তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। ব্যবসার দিক দিয়া দেখিলে কোথায় ফ্যাক্টরি করা সুবিধা-জনক হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কেননা, উহার উপরই অনেকটা সাফল্য নির্ভর করিবে।

যদি মেসিন ছোট হয় তাহা হইলে একজন লোকই সমস্ত কাজ চালাইতে পারিবে। বড় কল হইলে একজন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন পড়িবে বরফ বানাইবার জন্য। বিভিন্ন আকৃতির মেসিনের জন্য কত পাওয়ার (power) বা শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে এবং কি পরিমাণ জল খরচ হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে :—

দৈনিক খরচ	পাওয়ার বা কলের শক্তি H. P.	প্রথমবার যে পরিমাণ অ্যামোনিয়া লাগিবে ; পাউণ্ড
১। ১ টন (২২০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	৫	৭৫
½ টন (১১০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		
২। ২ টন (৪৪০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	৯	১০০
১ টন (২২০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		
৩। ৩ টন (৬৬০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	১২	১৫০
১½ টন (৩৩০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		
৪। ৪ টন (৮৮০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	১৫	২০০
২ টন (৪৪০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		
৫। ৫ টন (১১০০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	১৮	২৫০
২½ টন (৫৫০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		
৬। ৬ টন (১৩০০০ পাউণ্ড) ২৪ ঘণ্টায়	২০	৩০০
৩ টন (৬৬০০ পাউণ্ড) ১২ ঘণ্টায়		

৭। ৮ টন (১৭৬০০ পাউণ্ড)		
২৪ ঘণ্টায়	৩০	৪০০
৪ টন (৮৮০০ পাউণ্ড)		
১২ ঘণ্টায়		
৮। ১০ টন (২২০০০ পাউণ্ড)		
২৪ ঘণ্টায়	৪০	৫০০
৫ টন (১১০০০ পাউণ্ড)		
৯ ·৫ টন (৩৭০ ০ পাউণ্ড)		
২৪ ঘণ্টায়	৬০	৮৮০

যে কলে জল সরবরাহ করা ব্যয় সাধ্য নহে, যেখানে যত বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করা যায়, ততই কলের পাওয়ার বা শক্তির অপব্যয় কম হইবে। কোন জায়গায় মেসিনের জন্য অর্ডার দিতে গেলে উহার সঙ্গে জল সরবরাহের সুবিধা এবং জলের সর্ব্বোচ্চ উত্তাপের হারও উল্লেখ করা বিধেয়।

প্রতি বৎসরে যদিও সম্পূর্ণ একটী চার্জ্জ লাগে না, তবুও অ্যামোনিয়ার ব্যয়ের মধ্যে এক বৎসরের হিসাবই গ্রহণীয়। মেসিন মসৃণ রাখিবার জন্য যে তৈলের প্রয়োজন হয়, তাহা বছরে দুইবার করিয়া লইতে হইবে। যে মেসিনের একটন বরফ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আছে,

তাহার জন্য বাৎসরিক ১০ গ্যালন তৈলের প্রয়োজন হইবে।

ছোটখাট একটী ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণ করিবার জন্য মোটামুটি সর্ব্বশুদ্ধ ৯০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। নিচের তালিকাটি দেখুন—

কারখানার ঘর—

উপযুক্ত ঘর নির্ম্মাণ করিতে কত ব্যয় হইবে বলা শক্ত। কেননা মালমসল্লা, মজুর প্রভৃতির ব্যয় বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকার। ধরিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে ১০ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল এবং উপরে ছাপরার মত তুলিলে সর্ব্বসমেত ১০০০ টাকার মত ব্যয় পড়িবে। কারখানার আকার হইবে ১৫+২২ ফুট। বাকী ৮০০০৲ টাকা মেসিন সংক্রান্ত কাজে ব্যয় হইবে। এতদ্ব্যতীত কাজ চালাইবার জন্য প্রতিমাসে সর্ব্বসাকুল্যে ৫৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

দেখা যাউক ইহার তুলনায় মাসিক কত টাকা আয় হইতে পারে। বরফ তৈয়ার, প্রতি মাসে—½ টন×৩০=১৫ টন; যদি প্রতিমণ বরফের দাম ১।০ করিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে এক টন বরফের মূল্য হইবে ৩৫৲ টাকা। সুতরাং ১৫ টনের মূল্য হইবে ৩৫×১৫ অর্থাৎ ৫২৫৲ টাকা।

প্রতিমাসে ইহাই আয় হইবে।

উপরে যে হিসাব দেওয়া হইল তাহা লাভের নিম্নতর অঙ্ক। যদি বেশী আন্তরিক ও উদ্যমের সহিত কাজ চালানো যায় তাহা হইলে লাভের পরিমাণ যে আরো বেশী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পুতুলের খেলনার ব্যবসায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রবার নির্ম্মিত ফাঁপা খেলনা

'এই ধরণের পুতুল কিংবা জানোয়ার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে গেলেও উপরোক্ত প্রথার অনুসরণ করিতে হইবে। রবার প্রস্তুতকারকের কাছ হইতে রবারের টুকরা কিনিয়া লইয়া প্রয়োজনমত আকারে জোড়া দিলেই চলিবে। এতদ্ব্যতীত রবারের বল নির্ম্মাণে যেপ্রকার নরম উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতেও কোমল মিশ্রণ এই শ্রেণীর খেলনা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। কেননা, পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে, তাহা যাহাতে ছাঁচ হইতে সহজেই উঠান যাইতে পারে, সেই জন্যেই মিশ্রণের কোমলতার একান্ত আবশ্যকতা। নিম্নে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

(১)

Hevea Rubber	60 parts
Ceara	40 ,,
Sulphur	14 ,,
Zinc white	100 ,,

Whiting	80	,,
China Clay	40	,,
Paraffin wax	$2\frac{1}{2}$	,,

(২)

Fiscus elastica	60	,,
Hevea Rubber	40	,,
Antimonic Sulphide	30	,,
whiting	80	,,
China Clay	40	,,

এই সমস্ত উপাদানকে একত্র মিশ্রণ করিয়া একটি কোমল পদার্থে পরিণত করিতে হইতে। ইহার পরক্ষণেই যে প্রকার ঘনত্বের পাত তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে, তাহার দিকে নজর দেওয়া চাই। ইহাকে প্রয়োজন মত ভিন্ন ভিন্ন আকারে কাটিয়া লইয়া সোপষ্টোনের আবরণে ঢাকিয়া দিতে হয়। অতিরিক্ত যাহা গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত জোড়া দিয়া, বল তৈয়ার করিবার পদ্ধতিতেই কাজ সুরু করিয়া দিতে হয়। তবে এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পুতুল কিংবা খেল্‌নাটীকে ফুলাইবার জন্য জল ব্যবহার করাই সমীচীন। জিলাটিনের অভ্যন্তরে যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট এবং টার্টারিক এসিড থাকে, তাহা হইতেও কার্ব্বন ডাইয়োক্সাইড প্রস্তুত হইয়া একই ফল উৎপাদন করিতে পারে।

পুতুল নির্ম্মাণ করা

খেল্‌না নির্ম্মাণের মধ্যে পুতুল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। পুতুলের মাথা ছাঁচে ঢালিবার জন্য যে কারিগরীর প্রয়োজন হয় এবং তদনুরূপ ছাঁচ গঠন করিতে যে দক্ষতা লাগে,

তাহাই পুতুল নির্ম্মাণের বিশিষ্ট অঙ্গ। পুতুলের হাত, মাথা, পা প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়ব স্বতন্ত্র ছাঁচে ঢালিয়া উহাদিগকে মূল মডেলের সঙ্গে জোড়া লাগাইয়া দিতে হয়। উহার ভিতরে করাতের গুঁড়া পুরিয়া দিতে হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করা

করাতের গুঁড়া হইতে কাঠের টুকরা প্রভৃতি বাদ দিয়া লিনোক্সিনের (linoxin) সহযোগে একপ্রকার ঘন কাদার মত উপাদান তৈয়ার করিতে হয়। লিনসিডের তৈল পাথরের গাত্রে গরম করিয়া এবং উহার সঙ্গে ১০ পার্সেণ্ট লিথার্জ (litharge) যোগ করিলেই লিনোক্সিন প্রস্তুত হইবে। এই উপাদান ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হইয়া যায়, ইহাকে নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহার সাথে প্যারিস প্লাষ্টার ব্যবহার করা হয়। তৎপরে পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গ তৈয়ার করিবার জন্য উপাদানকে পিতল, লৌহ কিম্বা ইস্পাত নির্ম্মিত ছাঁচে ঢালিতে হয়। তদনন্তর ইহাকে প্যারিস প্লাষ্টারের আস্তরণে চুবাইয়া লওয়া হয়, সাধারণতঃ দুইটি আস্তরণ গায়ে দেওয়াই রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুইটীকে তফাৎ করিবার জন্য প্রথমটীতে সাদা রঙ্ বিন্যাস করা হয়, দ্বিতীয়টিতে বেগুনী রঙ্! প্যারিস প্লাষ্টারের সঙ্গে জল মিশ্রণ করিয়া লইতে হয়। ৫ পার্সেণ্ট অ্যালাম চূর্ণ কিম্বা বোরাক্স দিলে আস্তরণটী শক্ত হইয়া আসিবে, যদি উহা পূর্ব্বোক্ত মিশ্রণ তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে জলের সঙ্গে উহাকে মিশাইয়া দেওয়া যায়।

পুতুলের বহিরঙ্গে পাত্‌লা বেগুনী রঙের সমাবেশ করিতে হইলে প্যারিস্ প্লাষ্টারের মিশ্রণের সঙ্গে alkanet root লাগাইয়া দিতে হয়। water aniline কিংবা উদ্ভিজ্জ রঙে বর্ণবিন্যাস একপ্রকার হয় না।

পুতুলের মাথা প্যারিস প্লাষ্টার সংযুক্ত মিশ্রণ হইতে কখনো তৈয়ার হইতে পারে না। কেননা, এই উপাদান এত ভঙ্গুর যে শিশুদের দৌরাত্ম্যে দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গই প্লাষ্টার হইতে নির্ম্মিত হয়। মাথা তৈয়ার করিবার বিবরণ নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল :—

Silicate of soda	30 parts
Powdered quicklime	9 ,,
Ground earthen ware	20 ,,
Whiting	15 ,,
China Clay	10 ,,

সিলিকেট অফ সোডা বেশী ঘন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা যেমন পাথরের মত শক্ত হয়, তেমনি ছাঁচেও উহা পরিস্কার হইয়াই উঠে। সস্তা দরের পুতুল নির্ম্মাণের জন্য এই উপাদান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে আর একটী ফরমূলা দেওয়া গেল, তাহাতে সম্ভবমত সময়ের মধ্যেই বহিরাবরণের আস্তরণ শক্ত হইয়া আসিবে।

মিশ্রিত কর—

Paper pulp	2 lbs
Flour	$1\frac{1}{2}$,,
Whiting	1 lb
Unslaked lime	$\frac{1}{2}$ lb

ইহার সঙ্গে গরম ষ্টার্চ পেষ্ট (Starch paste) ঢালিয়া দাও। তারপরে ৪ ঘণ্টাকাল ইহাকে রাখিয়া দিয়া তৎপরে ইহাকে আবার নাড়িয়া দাও। তৎপরে ইহাকে তিনদিন রাখিয়া দিবে এবং অতিরিক্ত সুরাসার (liquor) যাহা থাকে, তাহাকে বাদ দিয়া দিতে হইবে।

এই পদ্ধতি তিনবার অনুসরণ করিতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে ইহার সঙ্গে আবশ্যকীয় রঙ-বিন্যাস করিতে হইবে।

ছাঁচ তোলা

পুতুলের মাথা তুলিতে বিশিষ্ট ধরণের ধাতব ছাঁচ ব্যবহার করিতে হয়। যাঁহারা এই ব্যবসা করিতে চাহেন তাঁহারা কখনো ছাঁচ ক্রয় করিতে কৃপণতা করিবেন না। বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাঁচ সংগ্রহ করাই উচিৎ। ইহার জন্য চতুর এবং নিপুণ আর্টিষ্ট নিয়োগও করা যাইতে পারে। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, মডেল এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে উহাকে যেন বিভক্ত ছাঁচে তুলিয়া লওয়া যায়। মূল মডেলকে মাটী দিয়াও তৈয়ার করা যাইতে পারে; ইহা হইতে প্রত্যেক পার্শ্বের একটী ছাপ লওয়া যাইতে পারে জিলাটিন ম্যাট্রিক্স দিয়া। তৎপরে উহাকে একটী পরিমাণমত আকারে বাক্সে রাখিয়া দিতে হইবে। জিলাটিন ব্যবহার করিলে শেষ ছাঁচের জোড়া দিবার অংশের সঙ্গে মডেলের বিভক্ত অংশ ঠিক খাপ খায় কিনা তাহা বিশেষভাবে দেখিবার প্রয়োজন পড়ে না। বাস্তবিক, যদি মূল মডেল শক্ত হয় তাহা হইলে নিষ্কলঙ্ক প্রতিমূর্ত্তি তোলাও অসম্ভব নহে। একটী বিদেশী আমদানীর সুন্দর পুতুলের মাথা হইতে এই প্রকারে একবার ছাপ গৃহীত হইয়াছিল। সাধারণতঃ half gelatine matrix গুলি এমনভাবে বসাইতে হয় যে উহারা যেন বিভক্ত প্লেটের মুখোমুখি লাগিয়া যায়। যখন ইহা শেষ হইবে, তখন জিলাটিনের ছাঁচ দিয়া সুন্দর sand plaster cast গৃহীত হইতে পারিবে।

ধাতব ছাঁচের মধ্যে প্লাষ্টার কাষ্ট্ ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ, একটী প্লাষ্টার কাষ্ট্ খুব ঘন করিয়া লইতে হয়; তৎপরে উহার বিভক্ত অংশের চিহ্ন ঠিক রাখিবার জন্য লাইনের উপর ছিদ্র করিয়া সূক্ষ্ম ধাতব পেরেক লাগাইয়া দিবে। যতক্ষণ প্লাষ্টার কাষ্টিং জমিয়া আসে, ততক্ষণ বাহিরের সৌষ্ঠবের দিকে নজর না দিলেও চলে। জমাইবার জন্য ক্রমান্বয়ে প্লাষ্টারের আস্তরণ ইহার উপর ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন ইহা ঘন হইয়া আসে তখন ইহাকে বালু সংযুক্ত ছাঁচে ফেলিয়া দিতে হয়। অর্দ্ধবিভক্ত ছাঁচে ভিন্ন করিয়াই এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

তৎপরে এই অর্দ্ধখণ্ডিত ছাঁচ দুইটিকে একত্রে জোড়া লাগাইয়া দিতে হয়। পুতুলের মাথায় ব্যবহার করিবার জন্য যে শক্ত প্লাষ্টার কাষ্ট্ থাকে তাহা দিয়াই এই বিভক্ত ছাঁচ দুইটীকে জোড়া লাগাইতে পারা যায়। তৎপরে ছাঁচের মধ্যে পেষ্ট্ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। পুতুলের দুই পার্শ্বই একই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং শেষে উহাদিগকে একত্রে জোড়া লাগাইয়া দেওয়া হয়। পুতুল নির্ম্মাণ করিতে গেলে উহার চক্ষু হয় রং দিয়া তৈয়ার করিতে হইবে নতুবা কাঁচ বসাইয়া দিতে হইবে। ইহা ছাঁচ তুলিবার সময় কিংবা পরেও করা চলে। পুতুলের বিভিন্ন অঙ্গও এই প্রকারে নির্ম্মাণ করিয়া করাতের গুঁড়া নির্ম্মিত যে কাঠামো থাকে তাহার সঙ্গে লাগাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে উহার গায়ে খদ্দরের রুচি অনুযায়ী পোষাক পরাইয়া দিতে হয়। অনেক পুতুলের মাথায় আবার কোকড়া এবং ঝাঁকড়া চুলও বসাইয়া দেওয়া হয়।

সেলুলয়েডের খেলনা

সেলুলয়েডের খেলনা শিশুদের অতি প্রিয় জিনিষ। নানাপ্রকার সেলুলোস্ (Cellulose),

যেমন, তুলা, ষ্টার্চ, আলু, কাগজ, পরিষ্কার এবং শুভ্র ন্যাকড়া প্রভৃতিকে প্রায় ১৫ মিনিট কাল নাইট্রিক এবং সালফিউরিক্ এসিডের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তৎপরে ইহাকে নিংড়াইয়া লইয়া তাজা এসিডের (যে সালফিউরিক এসিডের স্পেসিফিক্ গ্রেভিটি ১·৮৩৪, তাহার তিন ভাগ এবং ২ ভাগ তীব্র নাইট্রিক এসিড্) মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে। তৎপরে ইহাকে বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার-রূপে ধৌত কর এবং রৌদ্র বাতাসে ২৪ ঘণ্টা কাল শুকাইতে দাও। এই উপাদানটী একটু সেঁতসেঁতে থাকিবার সময়েই উহাকে গঁদ, রজন (resin) এবং রঙীণ পদার্থ বিশিষ্ট মিথেলেটেড্ স্পিরিট অথবা সালফিউরিক এসিডের মধ্যে চুবাইয়া লইতে হয়। ইহার অর্দ্ধ গ্যালন্ পরিমাণ জিনিষের মধ্যে পাঁচ পাউণ্ড সেলুলয়েড্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই অনুপাতেই উপাদানের পরিমাণ ঠিক করিয়া লইবে। তারপরে ইহাকে একটী পাত্রে (১৫০° হইতে ২০০° এফ্) লইয়া নরম কাদার মত করিয়া তুলিতে হইবে। যখন সমস্ত জিনিষটী উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া আসিবে, তখন উহাকে ১৫০° এফ্ তাপে আরো একটু শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে সমস্ত জিনিষটী একটু একটু নরম থাকিতেই ঈষদুষ্ণ ছাঁচে ঢালিয়া ফেলা যায়। ছাঁচের আকার চাহিদানুরূপই হইয়া থাকে।

পুতুলের চলাফেরা

আজকাল বিজ্ঞানের দৌলতে নানাপ্রকার খেল্না বাজারে বাহির হইয়াছে, যাহা ঘড়ির কলকজা, ষ্টীম, বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্য না লইয়াও "হাটি হাটি পা পা" করিতে পারে। শিশুরা তো পুতুলকেও তাহাদের মত হাটিতে দেখিয়া হাসিয়াই আকুল! ইহার জন্য বিজ্ঞানের কয়েকটী মূলসূত্র মানিয়া লইলেই চলে, যেমন মাধ্যাকর্ষণ, দেহের বিশেষত্ব, এবং রসায়ন বিদ্যার অ, আ, ক, খ।

আমরা অনেকেই জাপানী এবং জার্ম্মানী পুতুল দেখিয়াছি, যাহা ধাক্কা খাইলেও হেলিয়া-দুলিয়া আবার ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে। ইহার জন্য কোন বিশেষ কলকজার প্রয়োজন হয় না। একটী হাল্কা সেলুলয়েডের পুতুল তৈয়ার করিয়া উহাকে সীসার গোলকের অর্দ্ধেকটার উপর দাঁড় করাইয়া দিতে হয়। উপরকার পুতুল এত হাল্কা থাকে যে উহার কথা হিসাবের মধ্যে না আনিলেও চলে। কাজেই আর্টিষ্টের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে হয় নীচের সীসার গোলকের উপর। ইহা এমনভাবে নির্ম্মিত হয় যে একটু ধাক্কা খাইলেও হেলিয়া দুলিয়া আবার ঠিক সাবেকী অবস্থায় আসিয়া পড়ে। কেননা, মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা ইহার দ্বারাই রক্ষিত হয়।
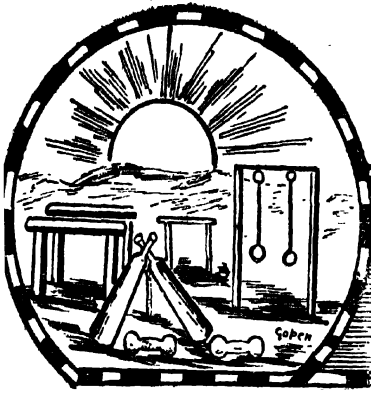
খাদ্য এবং দন্তপীড়ার কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দিন দাতের ব্যাধি এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। সচরাচর যে-দুই প্রকারের দাঁতের উপসর্গ মানুষকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে পাইয়োরিয়া এবং দন্তক্ষয় রোগ প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দন্তপাটী যে মাড়ির উপর সজ্জিত থাকে, তাহাকে জীর্ণ করিয়া তোলাই পাইয়োরিয়া রোগের প্রধান কাজ; দন্তক্ষয় রোগে আবার মাড়ির বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত না হইলেও দন্তগুলিই ইহার প্রকোপে পড়িয়া নষ্ট হইতে থাকে।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এই রোগ অসভ্য সমাজে খুব কম চোখে পড়ে। তাহাদের দাঁতের পীড়ার উৎপন্ন হয় শুধু বালু দিয়া দন্তমার্জ্জন করায় যে গুঁড়াগুলি দন্তমূলে লাগিয়া থাকে, তাহার জন্যেই। এতদ্ভিন্ন অপরিস্কৃত শিকড় এবং শাকশব্জী আহার করাব জন্যও অনেকটা তাহারা পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকে।

সভ্যতার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দাঁতের পীড়া ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে মিশরবাসীরা গ্রীকদের মতো কখনো দন্তপীড়ায় ভুগে নাই, এই উভয় জাতির পীড়া আবার রোমানদের সমতুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করে নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যখন চিনি এবং ইক্ষুদণ্ডের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন মিশরবাসীদের মধ্যে জানা ছিল না, তখনও তাহারা প্রকৃতিসম্ভব সাধারণ আহার্য্য খাইয়াই জীবনধারণ করিত। তাহাদের সভ্যতার মাপকাঠি পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবনের সুর উঁচু পর্দ্দায় বাধা হইতে থাকিলে, দন্তপীড়ায় আক্রমণও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন গ্রীকেরা আসরে দেখা দিল, তখন তাহাদের আহার্য্য দ্রব্যাদি বিলাসিতার পরিচালক হইয়া উঠিল; তাহাদের দাঁতের ব্যাধিও প্রায় সংক্রামক হইয়া উঠিল। ইতিহাসের প্রত্যেক পাঠকই জানেন যে রোমানদের জীবনে উৎসব উৎসের ধারা সর্ব্বদা বহিয়া চলিত; তাই সাম্রাজ্যের মধ্যে দন্তক্ষয় রোগ ও পাইয়োরিয়া বিপুল সমারোহে যেন চলিতেছিল।

যে সমস্ত ভূপর্য্যটনকারী পৃথিবীর অজ্ঞাতদেশ সমূহের অজ্ঞাততথ্য লোকলোচনের সম্মুখে আনিবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান সভ্যতার বহির্গত এস্কিমোদের দন্তপীড়া একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। অপর পক্ষে, যাহারা সভ্যজগতের

সীমান্তে থাকিয়াও মুখরোচক দ্রব্যাদি দ্বারা তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে নানারূপ দন্তপীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপের শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তখন ব্রিটিশ সৈন্যের দন্তপীড়ার কথা বেশী শুনা যায় নাই ; তাহাদের সুন্দর দন্তের বেশ সুখ্যাতি ছিল। গত জার্ম্মান-যুদ্ধের সময় কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যের দাঁত সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য ছিল। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, একশত বৎসর পূর্ব্বের জননীগণের মাতৃস্তন্যেই শিশুগণ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত ; আধুনিক জননীগণ ইহা করিতে পারেন না অথবা আদৌ পছন্দ করেন না। নানাপ্রকার সুরুচিসঙ্গত কৃত্রিম আহার্য্যদ্রব্য সেবনে শিশুদের দন্ত প্রথম হইতে খারাপ হইতে থাকে ; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা নানারূপ দন্তপীড়ায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এই জন্যই এক-শত বৎসর পূর্ব্বেকার ব্রিটিশ সৈন্যের দাঁত বর্ত্তমান ব্রিটিশবাহিনীর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর, এবং দৃঢ় ছিল।

মূলকথা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ আহার্য্য ও ভোগবিলাসের উপকরণাদির দিক দিয়া পূর্ব্বপুরুষের চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দাঁতের পীড়ার আক্রমণও বেশ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অনেক প্রাচীন চিকিৎসক আহার্য্য দ্রব্য ও দন্তপীড়ার মধ্যে একটী সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। হিপোক্রাটিশ (৪৬০ খৃঃ পূর্ব্বে জন্ম-গ্রহণ করেন) বলিয়াছিলেন যে শিশুদের ক্ষণস্থায়ী দাঁত ভ্রূণের পরিপোষক আহার্য্যের সার হইতে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে, জন্মের পর, উহার দৃঢ়তা মাতৃস্তন্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে চিরস্থায়ী দাঁত খাদ্যদ্রব্যের গুণা-গুণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। ৮০ বৎসর পরে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অরিষ্টটল বলেন যে দাঁতের গোড়ায় শর্করাজাতীয় পদার্থ আটকাইয়া থাকার জন্যই দাঁতের অকাল ক্ষয় হইতে থাকে। গ্যালেন্ (১৩১ খৃঃ অঃ জন্মগ্রহণ করেন) মনে করিতেন যে দেহের পরিপোষক-তার কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হইলেই দন্তপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়। তাঁহার সমসাময়িক বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি একটী ব্যাধির বর্ণনা দিয়াছেন ; উহা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি পাই-য়োরিয়া রোগের কথাই বলিতেছেন। ইহার মূল উৎস অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি বলিয়া-ছেন যে লোকের স্বভাবের উপর অত্যাচার করিয়া নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য আহার করা হইতেই এইপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইতিহাস কেবল মোটামুট ঘটনাগুলি বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের দৌলতে

আমরা জানিতেছি, যে, এই রোগ প্রাদুর্ভাব হওয়ার প্রকৃত কারণ কি? সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আহার্য্যদ্রব্য সুরুচি সঙ্গত করিতে যাইয়া উহাতে ভিটামিনের পরিমাণ অনেক কমাইয়া ফেলা হয়। শুধু তাহাই নহে, খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যে খনিজ লবণ এবং প্রকৃতির গুণ বর্ত্তমান থাকে, তাহাও এই সঙ্গে অনেকাংশে নষ্ট হয়। এই প্রকারের ভোজ্যদ্রব্য দাঁতে সৌকুমার্য্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

অনেকদিন ধরিয়া অনুসন্ধানকারীগণ ভিন্নপথে পরিচালিত হইতেছিলেন; কেননা, তাঁহারা মনে করিতেন যে দন্ত দেহযন্ত্রের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ নহে। কিন্তু উহা অত্যন্ত মারাত্মক রকমের ভুল; কেননা, দেহের একাংশ পীড়িত হইয়া পড়িলেও অন্য অংশ তাহার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

৫০ বৎসর আগে বার্লিনস্থ একজন আমেরিকান দন্ত-চিকিৎসক দন্তপীড়া সম্বন্ধীয় ব্যাপারে "কেমিকো প্যারাসিটিক" থিয়োরী খাড়া করেন। তিনি মনে করিতেন যে, দন্তক্ষয় রোগের প্রধান কারণ এই যে, দাঁতের গোড়ায় খাদ্যাবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য পচিয়া মুখের মধ্যে একপ্রকার এসিডের সৃষ্টি করিতে এবং তাহা হইতেই দন্তক্ষয় রোগের সূত্রপাত হইত। তিনি তবুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে তাঁহার থিয়োরী দিয়া সমস্ত দন্তরোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। অন্যান্য পর্য্যবেক্ষণকারীর মত তিনিও লক্ষ্য করিয়াছেন যে অনেকে টুথ ব্রাশ ব্যবহার না করিয়াও মুক্তার মত সুন্দর দাঁত বজায় রাখিয়াছেন, অনেকে আবার চিরকাল ধরিয়া টুথব্রাশ ব্যবহার করিয়াও দন্তক্ষয় রোগে ভুগিতেছেন।

থিওবল্ড স্মিথ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে পরীক্ষা মূলক স্কার্ভি-রোগের প্রথমদিক দিয়াই পাইয়োরিয়ায় ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে তাজা ফলমূল এবং শাকশব্জী না খাওয়ার জন্যই স্কার্ভি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ পরে লক্ষ্য করিয়াছেন যে ভিটামিন "গ" খাদ্যদ্রব্যে অভাব হইলেই পাইয়োরিয়া আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়।

যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব লইয়া গবেষণা করিতেছেন, বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব। ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে মেডিক্যাল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের নারী বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্তা মে মেলানবি প্রমাণ করিয়াছেন যে শিশুর দাঁতের অবস্থা গর্ভবতী নারী, মাতা এবং শিশুর আহার্য্য দ্রব্যের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি আরো দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া খারাপ দাঁতও উপযুক্ত ভোজ্যদ্রব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে এবং ভাল দাঁতও কিরূপে কদর্য্য ভোজ্যপেয়তে ক্রমাগত খারাপ হইতে পারে। অসলোর বিখ্যাত ডাক্তার গুতম প্রমাণ দেখাইয়াছেন যে উপযুক্ত আহার্য্যে কেবল যে গর্ভবতী মাতার দন্তপাটির সংরক্ষণ হয় তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে শিশুরও দন্তক্ষয় রোগ জন্মিতে পারে না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার হাউয়ে সাহেব উচ্চ শ্রেণীর বানরের খাদ্যাদির ব্যবস্থা ১৫ বৎসর ধরিয়া বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে দন্তক্ষয় হওয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের চিহ্ন এবং উপযুক্তরূপ আহার্য্য দ্রব্যাদি সেবন করিলে উভয়ই সংরক্ষিত

হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি খাদ্যাদির ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ইচ্ছামত দন্তক্ষয় এবং পাইয়োরিয়া রোগের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তন করিয়া আবার দন্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

ডাঃ বুন্‌তিং, জে এবং হাডের গবেষণা বিষেশভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা একদল স্কুলের ছাত্র লইয়া পরীক্ষা সুরু করেন এবং শর্করা-বিহীন খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া এক বৎসর ধরিয়া তাহাদের দন্তের ক্ষয়রোগ স্থগিত করান। যদিও অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া নানা প্রকার খাদ্য ও জন্তু লইয়া গবেষণা করিতেছেন, তবুও তাহা-দের বেশীর ভাগের সিদ্ধান্ত? এই যে দন্তক্ষয়রোগ এবং পাইয়োরিয়া অল্প ভিটামিন যুক্ত খাদ্যাদি এবং খনিজ লবণ প্রভৃতি ভোজনেই উপস্থিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও একটী কারণ আছে, তাহা এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। যদি বেশী পরিমাণ প্রোটিন (মাছ, মাংস ইত্যাদি এবং শস্যাদি খাওয়া যায়, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে এসিডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অ্যাল্‌ক্যালিন যুক্ত আহার্য্য ফল মূল, দুগ্ধ ইত্যাদি দ্রব্য সেবন করিয়া যদি উহার দোষ নষ্ট না করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে শরীরের পরিপোষকতায় সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার জন্য প্রকৃতি নিজহস্তেই দাঁত হইতে ক্যাল্‌সিয়াম গ্রহণ করিয়া শরীরের ক্ষতি পরি-পূরণের চেষ্টা করিবে। হাউয়ে সাহেব এই এসিড প্রাণযুক্ত খাদ্যাদির পরিমাণ কমাইবার জন্য বলিয়াছেন।

দন্তক্ষয় রোগ যুবক যুবতীদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়। ইহা হইতেই তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অভাব কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা অনেক সময় পাইয়োরিয়াতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে; সাথের সাথী হয় পেটফাঁপা, বাত এবং অন্যান্য প্রকার শারীরিক উপসর্গ। অনেক কাল ধরিয়া বৈজ্ঞা-নিকেরা মনে করিতেন যে পাইয়োরিয়ার জন্যই এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দিত, এবং দাঁত উঠাইয়া না ফেলিলে আর এই ব্যাধির উপশম হইবে না! অনেক উচ্চশ্রেণীর চিন্তাবীরেরা মনে করিয়া থাকেন যে, এই সমস্ত চিহ্নগুলি ব্যারামের লক্ষণমাত্র এবং উপযুক্ত আহার্য্য ব্যবহার না করিলে ইহার উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। দাঁত উঠাইয়া ফেলিলে স্থানীয় লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হইতে পারে বটে; কিন্তু মূল কারণ সমূহ আগের মতই বর্ত্তমান থাকিবে। ইহার প্রমাণ এই যে পূর্ব্বের মতই অস্বাভাবিক উপায়ে মাড়ির অংশ ক্ষয় হইতে থাকিবে।

আহার্য্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার সময় শক্ত দ্রব্যাদি খুব চিবাইতে হইবে। ইহাতে দাঁত এবং মাঁড়ির খুব কসরৎ হয়; রক্তের চলাচলও খুব বাড়িয়া গিয়া দাঁতকে পীড়ার হাত হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। দন্তক্ষয় রোগ এবং পাইয়োরিয়ার কথা আমাদিগকে আর আদৌ শুনিতে হইবে না যদি গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদাত্রী জননীগণ উপযুক্ত পরিমাণে শাকশব্জী, কাঁচা ফলমূল, তাজা দুগ্ধ, ডিম, মাখম, পনীর, মধু, পেস্তা, কিসমিস্ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া মাংস, শস্যাদি এবং বিশুদ্ধ শর্করার ব্যবহার কমাইয়া দেন।

———

নারিকেলের দড়ি

নারিকেলের দড়ির ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মালবার উপকূল এই ব্যবসায়ের একটি সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র, এবং জগতের যতস্থানে দড়ির ব্যবসায় আছে তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান। উজ্জ্বলতায়, বর্ণে এবং মনোহারিত্বে মালাবারের ছোবড়ার দড়ির ন্যায় সুন্দর জিনিষ আর নাই। নারিকেলের ছোবড়া হইতে এই দড়ি তৈয়ার করা হইয়া থাকে, জমির আবহাওয়া, স্থানীয় অবস্থা এবং সমুদ্রের সামীপ্যের জন্যই এই স্থানের নারিকেলের আঁশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দড়ির উৎকর্ষতা আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আঁশ যখন পরিপক্ক হয়, তখনই নারিকেল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। সুন্দর মজবুত দড়ি তৈয়ার করিতে হইলে আঁশ যাহাতে পাকা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাঁচা নারিকেলের দড়ি বর্ণে, উজ্জ্বলতায় অথবা স্থায়িত্বে কখনই ভাল হয় না। পুরাতন নারিকেলের ছোবড়ায় সাধারণ মোটা আঁশের দড়ি হয়, নূতন আঁশে পাতলা দড়ি তৈয়ার হইয়া থাকে।

দড়ির ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে দড়ির প্রয়োজনের অন্ত নাই। গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে ইহা সকল সময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দড়ি শনের দড়ির ন্যায় শক্ত না হইলেও লবণ জলে নষ্ট হয় না বলিয়া জাহাজে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

বাজে জিনিস হইতে দড়ি তৈয়ার

নানা জিনিষের পরিত্যক্ত অংশ লইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর দড়ি তৈয়ার হইতে পারে। যে-কোনও প্রকারের আঁশ, ছেঁড়া পাট, পুরাতন দড়ি, পরিত্যক্ত আঁশ, চট, ছালা প্রভৃতি যে কোনও জিনিষের আঁশ আছে, উহা একত্র করিয়া উত্তম রূপে জড়াইয়া দিতে পারিলেই দড়ি তৈয়ার করা যায়।

দড়ি প্রস্তুত করণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

১। শণ, ক্ষুমা ও তুলা দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকারের দড়ি তৈয়ার হয়।

২। মধ্যম শ্রেণীর দড়ির উপাদান মোটা আঁশ, মোটা শণও ক্ষুম প্রভৃতি।

৩। ছেঁড়া, কাটা বা পরিত্যক্ত জিনিস দিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর দড়ি তৈয়ার হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের দড়ি

দড়িশিল্পে কোন্ জিনিষকে কি বলা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ;

এক ইঞ্চির অধিক মোটা, শক্ত, লম্বা এবং শণের সূত্রদ্বারা গ্রন্থিত দড়িকে কাছি বলে। ইহার ইংরেজী নাম Rope. অপেক্ষাকৃত সরু দড়িকে রজ্জু, রশি, পাকা গুণ, সূত্র প্রভৃতি বলা হয়। যে আঁশের সমষ্টি লইয়া দড়ি তৈয়ার হয় তাহাকে সূতা, তন্তু বা আঁশ বলে। ১৬ হইতে ২৫ নাল সূতা বা তন্তু লইয়া মোটা দড়ির জন্য যে সরু

সূত্র তৈয়ার হয়,সেই সকল সূক্ষ্ম সূত্রকে গুণ বলে। একটি মোটা দড়ি হয়তো দশটি সরু দড়ি পাকাইয়া তৈয়ার হইয়াছে। তাহা হইলে সরু দড়ির প্রত্যেকটিকে গুণ বলা হইবে। তিনগুণের যে দড়ি দিয়া জাহাজের নিম্নস্থ গুরুভার জিনিষ তোলা হয় তাহাকে ইংরেজীতে 'হসার' Hawser বলে। মাস্তুলের রজ্জু চারিগুণ দড়ি দ্বারা তৈয়ার হয়। নোঙরের দড়ি বা Cable আরও মোটা। তিন খানা মাস্তুলের দড়ি অথবা জাহাজের ভারী জিনিষ তুলিবার 'হসার' দড়ি একত্রে পাকাইয়া Cable বা নোঙরের দড়ি তৈয়ার হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ সাদা ও আল্‌কাতরা মাখা দুই প্রকারের দড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে ফেলিয়া রাখিতে হইলে আল্‌কাতরা মাখা দড়িই সর্ব্বোত্তম। যদি অতিরিক্ত রৌদ্র বৃষ্টি লাগার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সাদা দড়িতেই চলে। আল্‌কাতরা মাখা দড়ি অপেক্ষা সাদা দড়ি অধিক দিন স্থায়ী হয়। প্রথমোক্ত প্রকারের দড়ি শীঘ্রই নষ্ট হয়। কোন্ দড়ি কিরূপ ভার বহনের উপযোগী নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

মোটা	ভারবহনক্ষমতা
১ ইঞ্চি	২০০ পাউণ্ড
১॥০	৪৫০ "
২	৮০০ "
২॥০	১২৫০ "
৩	১৮০০ "
৩॥০	২৪৫০ "
৪	৩২০০ "
৪॥০	৪০৫০ "
৫	৫০০০ "
৫॥০	৬০৫০ "

নির্ম্মাণ করিবার উপায়

আঁশযুক্ত একটীমাত্র সূত্রকে যদি জড়ানো যায়, তাহা হইলে উহার বহিরঙ্গ যেমন বিস্তৃত হইতে চেষ্টা করে তেমনি ভিতরের অংশগুলিও আবার পিষ্ট হইতে থাকে। কাজেই স্থিতিস্থাপকতার অবস্থা সর্ব্বত্রই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সূতাকে পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসে। কিন্তু যদি দুই গুচ্ছ সূত্রকে একইভাবে জড়াইয়া লইয়া নির্দ্দিষ্টস্থলে সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে এই জায়গা সমান শক্তির বিরুদ্ধগামীতার জন্য নিশ্চল অবস্থায় আসিবে; এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই অবশিষ্ট শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া নিজেকে জড়াইবার ক্ষমতা উপার্জ্জন করিয়া সাবেকী সূতার বিরুদ্ধ শক্তির অবসান করিয়া দেয়। এইরূপে মোটা কাছি দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্য ৩।৪টী অথবা আরও বেশী সূতা জড়ানো যাইতে পারে। ইহার ৩।৪টী আবার একত্র করিয়া জাহাজের কাছি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে shroud দড়ি মধ্যভাগে ফাঁপা হয় কিংবা এই শূন্যতাটুকু পরিপূরণ করিবার জন্য গুণের আকৃতিরও পরিবর্ত্তন করা দরকার হইয়া পড়ে। এই সমস্ত যোগাযোগে আঁশগুলির আপেক্ষিক অবস্থা এবং বিরুদ্ধভাব কিপ্রকার হয় তাহা হিসাব করিয়া বলা শক্ত। অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি হইবে যে দড়ির শক্তি বাড়াইবার জন্য গুণকে পাক দেওয়া দরকার; কিন্তু উহা এমনভাবে করিতে হইবে যেন তন্তুর স্বকীয় পাক খুলিয়া আসে। অর্থাৎ গুণের পাক দেওয়ার দিকেই কেবল নজর দিতে হইবে, তন্তুর দিকে নহে। সম্ভবতঃ, যখন সংবদ্ধ আঁশগুলির বক্রতাব একেবারে দূরীভূত হইয়া গিয়া সমস্ত তন্তু একপর্য্যায়ে

গিয়া দাঁড়ায় তখনই গুণের শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়।

অন্য প্রকারেও খুব শক্ত কাছি তৈয়ার করা যাইতে পারে। একটী দড়িকে কেন্দ্র করিয়া আরও ৫।৬টী দড়ি জড়াইলে খুব কড়া কাছি নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপস্থলে সাধারণতঃ কিছুকাল ব্যবহার করার পর ভিতরকার দড়িটি ছিন্নপ্রায় হইয়া আসে। এরূপ দড়িকাছি দিয়া গুরুভার জিনিষ উঠানামা করানো কিংবা এমন কাজ করা যাহাতে উহাকে ক্রমাগত বাঁকা করিতে হয়, তাহা আদৌ চলিবে না।

হাত দিয়া তৈরী করা

হাত দিয়া দড়ি নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমেই তন্তু ঠিক করিয়া বানাইয়া লইতে হইবে। যে ব্যক্তি তন্তু প্রস্তুত করিবে, তাহাকে এক বাণ্ডিল শণ পাঁজ করিয়া নিয়া কোমরে এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে বাণ্ডিলের দুই প্রান্ত যেন তাহার সম্মুখে থাকে। সে উপযুক্ত সংখ্যক তন্তু লইয়া আঙুলে পাক দিয়া লইবে এবং এই জড়ানো অংশ একটী চাকার নালে লাগাইয়া লইয়া সহকারীকে চাকাটী ঘুরাইতে বলিবে। সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে দড়ি তৈয়ারীর রাস্তা দিয়া পেছনের দিকে হটিতে হটিতে বাণ্ডিল হইতে শণ লইয়া তন্তুকে পাক দিয়া চলিতে থাকিবে। ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে আঁশগুলি যেন সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং জড়ানো অংশে উহা দিবার সময় যেন একপ্রান্ত ঢুকাইয়া দেওয়া হয়; মধ্যভাগ কথনো উহার মধ্যে জোড়া দিবে না। যখন সে রাস্তার শেষপ্রান্তে যাইয়া পৌঁছিবে, তখন আর একজন লোক চাকা হইতে তন্তু খুলিয়া লইয়া উহা অপর একজন লোককে রিলে লাগাইবার জন্য দিবে। এই দ্বিতীয় জনও পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের মত চাকার নালে শণ লাগাইয়া লইয়া পাক দিতে দিতে পূর্ব্ববর্ত্তী পথ ধরিয়া চলিতে থাকিবে। যখন রিলের সন্নিহিত লোকটী উহা ঘুরাইতে থাকিবে, তখন প্রথম ব্যক্তি তাহার তন্তুর শেষপ্রান্ত শক্ত করিয়া ধরিয়া রিলচক্র ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে উহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। রিলের কাছে পৌঁছিলে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির চাকার নাল হইতে তন্তু খুলিয়া প্রথম ব্যক্তির তন্তুর সঙ্গে না লাগাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ঐস্থলে অপেক্ষা করিবে। এই জোড়া দেওয়া তন্তু আবার রিলে চলিতে থাকে।

তারপর দড়ি নির্ম্মাণ করিবার পালা। এই কার্য্যের জন্য ২টী কিংবা আরও বেশী তন্তু নালের একপ্রান্তে লাগাইয়া দেওয়া হয়; তারপরে উহাকে তন্তুগুলির পাকের বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইলেই গুণ প্রস্তুত হইবে। তারপরে মধ্যস্থ দড়ি ব্যতীত ৩টী, কথনো কথনো ৪টী গুণ, লম্বালম্বিভাবে বিছাইয়া লইয়া উহাদের একপ্রান্ত ৩টী সমান্তরাল-ভাবে সজ্জিত বিভিন্ন নালে লাগাইয়া লইতে হইবে: আর প্রান্তগুলি শুধু একটী মাত্র নালে লাগাইতে হইবে। পাক দিবার উপায় এখন বর্ণিত হইতেছে। যে তিনটী নালের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহার বিরুদ্ধ দিকে একটী নাল ঘুরাইয়া লইতে হইবে এবং একটী গুণকে আশ্রয় করিয়া বাকী তিনটিকে এমনভাবে পাক দিতে হইবে যে তাহাদের বিপরীত প্রান্তগুলি ভিন্ন ২ ভাবে ততখানি পাক পায় যতখানি পূর্ব্ব সংযোগের সময় লওয়া হইয়াছিল।

উন্নততর উপায়

এখন উন্নততর উপায়ের কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

তন্তুতে পাক দেওয়া

দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমেই শণ-গুলিকে আচ্‌রাইয়া লওয়া দরকার। উপযুক্ত পরিমাণ শণ লইয়া তৌলদণ্ডে মাপ করিতে হইবে এবং উহার মধ্যে যতটুকু দরকার তাহা তুলিয়া লইয়া শণ আঁচরাইবার যন্ত্রে পাঁজ করিয়া লইতে হইবে। একটী বোর্ডে ষ্টীলনির্ম্মিত পিনের মুখাগ্র উপরের দিকে রাখিয়া কাজ করিয়া যদি দেখা যায় যে আচরানো ভাল হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পিনগুলি মজবুদ ও কার্য্যোপ-যোগী। পাঁজকরা শণগুলিকে অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন বাণ্ডিলে ভাগ করিয়া তন্তু প্রস্তুত করিবার জন্য উহাকে শিল্পীর হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। সুদীর্ঘ আচ্ছাদিত পথে এইরূপ তন্তু নির্ম্মাণের কাজ চলিয়া থাকে।

এই রাস্তার একপ্রান্তে একটী চরখা থাকে; বলা বাহুল্য, চরখাটির সাজসরঞ্জামের মধ্যে একটী বৃহৎ চক্রই দর্শকের চক্ষুকে আকৃষ্টে করিয়া থাকে। প্রত্যেক কপিকলের আলে একটী করিয়া নাল লাগান থাকে; এবং উহা চক্রের সাহায্যে ঘুড়িতে থাকে; কপিকলের আলও সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত আবর্ত্তিত হইতে থাকে। প্রত্যেক কপিকলের ভার এক একজন রজ্জুনির্ম্মাণকারীর উপরে থাকে এবং যে তাহার শরীরের চতুষ্পার্শে পাঁজ করা শণ রাখিয়া কাজ করিতে থাকে। তন্তুর আকার কিংবা পুরুত্ব বাড়াইবার জন্য যতখানি শণ দরকার তাহা বাণ্ডিলের পুরোভাগ হইতে গ্রহণ করিয়া জোড়া দেওয়া হইতে থাকে; ঘুর্ণমাল নালও উহাকে নিজের অঙ্গে জড়াইয়া লইতে দেরী করে না। রজ্জু নির্ম্মাণকারীও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের দিকে হটিতে হটিতে জড়ায়মান তন্তুর মধ্যে শণের আঁশ গুঁজিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া চলিতে থাকে। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে তন্তুর ক্ষমতা এবং সহজ চলার পথে কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হয়। এই সমস্ত কাজ করিবার সময় যাহাতে আঙ্গুল ছড়িয়া না যায়, তজ্জন্য উহাতে তুলার আচ্ছাদন দিয়া লইতে হইবে। রজ্জুনির্ম্মিত চক্রও পিছনের দিকে চলিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ঘনত্ব অব্যাহত থাকে। তজ্জন্য সে তন্তুর বামহাতে উহার গায়ে মাঝে মাঝে শণ জোড়া দিতে থাকে। হাতের তন্তু লম্বা হইতে থাকিলে দেয়ালের গায়ে যে পেরেক লাগানো থাকে, উহার উপর দিয়া তন্তু টানিয়া লইতে হয়। যখন তন্তুর নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে যাইয়া পৌছান হয়, তখন উহার কাজ শেষ করিবার জন্য কিংবা রিলে জড়াইবার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে দড়ি, রশি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাজারে চালান দিতে পারিলে বেশ লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলেরা সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

কলিকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে এবং এই নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান যাইতেছে যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে কলেরা প্রতিষেধক টীকা লইয়া এই সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিজেদের সাবধান রাখেন। কর্পোরেশন নিম্নলিখিত স্থান সমূহে কলেরার টীকা দিবার বিভিন্ন কেন্দ্র খুলিয়াছেন এবং যে কেহ উক্ত কেন্দ্র সমূহে বিনা খরচায় টীকা লইতে পারেন।

কেন্দ্রের নাম	শনি ও রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ বিকাল	শনিবার	রবিবার
১নং ডিষ্ট্রীক্টের হেল্‌থ অফিস, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।	৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত	বেলা ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত	সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত
২নং ডিষ্ট্রীক্টের হেল্‌থ অফিস, ২২নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।	ঐ	ঐ	ঐ
৩নং ডিষ্ট্রীক্টের হেল্‌থ অফিস, কর্পোরেশন বিল্ডিং, হগ ষ্ট্রীট।	ঐ	ঐ	ঐ
৪নং ডিষ্ট্রীক্টের হেল্‌থ অফিস, ১১ নং বেলভেডিয়ার রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
৫নং কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস, ১০ ও ১১ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
৬নং মানিকতলা মিউনিসিপ্যাল অফিস, ১০৯নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
৭নং কালিঘাট ডিস্পেন্সারী, ২৪০ নং কালিঘাট রোড।	ঐ	বিকাল ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত	ঐ
৮নং খিদিরপুর ডিস্পেন্সারী, ৩৬নং পাইপ রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
৯নং চেতলা ডিস্পেন্সারী, ২৯।৫নং চেতলা সেন্ট্রাল রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
১০নং তালতলা ডিস্পেন্সারী, ৫৮নং লোয়ার সারকুলার রোড।	ঐ	ঐ	ঐ

কেন্দ্রের নাম	শনি ও রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ বিকাল	শনিবার	রবিবার
১১নং বালিগঞ্জ ডিস্পেন্সারী, ২৩নং কুস্তমজী ষ্ট্রীট।	৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত	বিকাল ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত	সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত
১২নং চীৎপুর ডিস্পেন্সারী, ৩নং গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জী রোড, কাশীপুর।	ঐ	ঐ	ঐ
১৩নং মাণিকতলা ডিস্পেন্সারী, ১০৯নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
১৪নং উল্টাডাঙ্গা ডিস্পেন্সারী, ১২৩নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড।	ঐ	ঐ	ঐ
১৫নং গার্ডেনরীচ ডিস্পেন্সারী, ৩বি, প্রিন্স দিলওয়ারজা লেন।	ঐ	ঐ	ঐ
১৬নং সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরী, ৫নং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড	শনিবার ব্যতীত প্রত্যহ বিকাল ৩টা হইতে ৪টা	বেলা ১টা হইতে ২টা	

সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিস,
২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৩ সাল।

টি, এন, মজুমদার,
হেল্থ অফিসার।

আমের বিভিন্ন ব্যবসায়

আমাদের এই স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতবর্ষে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহার একটা না একটা প্রয়োজন আছেই আছে। কিন্তু আমরা এতদূর অনভিজ্ঞ যে, সেই সকল দ্রব্য অব্যবহার্য্য জ্ঞানে নষ্ট করিয়া ফেলি। অপর স্থলের লোকেরা সেই অব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসায়ে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। আমের কসি তাহার একটী উজ্জল দৃষ্টান্ত। আমের কসি কি কি ব্যবহারে আসে সে সমস্ত বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আম্র হইতে কি প্রকার ব্যবসায় হইতে পারে, সে বিষয় বলা প্রয়োজন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে এক-বার আমের ব্যবসায় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তথাপি পুনরায় এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমের প্রধান ব্যবসায় "আমসী"। আজকাল জাহাজের নাবিকেরা বহুল পরিমাণে আমসী ক্রয় করিয়া থাকে; কারণ জাহাজে ফল ফুলারি, শাক সব্জি আদি কিছুই টাটকা পাওয়া যায় না বলিয়া উহাদের কেবলমাত্র মাংসের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। শাক সব্জী না পাওয়া যাওয়ায় কেবলমাত্র মাংস খাইয়া উহাদের সর্ব্বাঙ্গে ছোট ছোট ফুসকুরি হয়, উহাকে scurvy কহে।

ঐ scurvy পীড়ায় উহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। এই কারণে ইহারা আহারের সময় কিঞ্চিৎ অম্ল ব্যবহার করিয়া থাকে। এইজন্য উহারা প্রচুর পরিমাণে আম্‌সি কিনিয়া রাখিয়া দেয়। কেননা, উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতঃ-পূর্ব্বে উহারা আমসী ব্যবহার করিত না। উক্ত পীড়া হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত লেবু ব্যবহার করিত। আজকাল লেবু, লেমনেড, লিমন সিরাপ, সাইট্রিক্ এসিড্ প্রভৃতি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় লেবুর দর অনেক চড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া লেবু শীঘ্র শুকাইয়া বা পচিয়া যায়; কাজেই আজকাল আর লেবু ব্যবহার চলে না। সেই কারণে লেবুর অভাবে আম্‌সী ব্যবহার করিয়া থাকে। আমসীর ন্যায় অন্য কোন অম্ল দ্রব্য বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে না বলিয়াও নাবিকেরা এই আমসী ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া যুক্ত প্রদেশের লোকেরা এই আমসীর ব্যবসায় করিয়া থাকে। ইহা এমন কিছু কষ্টকর

ব্যবসায় নয় যে অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে। এই অল্প শ্রমের ব্যবসায়—ইহাও যদি কষ্টকর বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা আর কি পারিব ?

সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া পরীরাণীর দ্বীপ হইতে পরীর বাচ্চাও আনিতে হইবে না, কিম্বা স্বর্গে যাইয়া স্বর্গের পারিজাতও আনিতে হইবে না, কেবলমাত্র কাঁচা আম্রগুলি ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া ; এমন করিয়া শুকাইতে হইবে, যাহাতে আম্রের অভ্যন্তরস্থ জলীয়ভাগ না থাকে। ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আর আপনা আপনি আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য্য প্রদীপের ন্যায় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিস্তার হয় না। ইতঃপূর্ব্বে যখন এই আমসীর ব্যবসায় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, কেহ কেহ আমসীর বিক্রয় ও দর যাচাই করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। যদি আমাদিগকে আমসীর বিক্রয় ও দর যাচাই করিবার নিমিত্ত জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের আর পত্রিকাখানি চালান হয় না। নিজেরা আসিয়া জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হয়, নতুবা ঘরে বসিয়া কেহ আপনাদের ব্যবসায়ের পসার করিয়া দিতে যাইবে না। অলসে ডুবিয়া থাকিয়া ব্যবসায় করিব, বাণিজ্য করিব বলিয়া চীৎকার করিলে কিছু ব্যবসায় ও বাণিজ্য করা যায় না। ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিয়া নিজের দৈন্য ঘুচাইতে হইলে অলসতা ছাড়িতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবে না। কেবল রং মাখিয়া সং সাজাই সার হইবে, আর চির অভ্যাসানুযায়ী পর পাদুকা বহিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

আমসীর ন্যায় আম্র হইতে আমচুর বা আমের আচার প্রস্তুত হয়। আমচুর প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায়। ইহাও একটী খুব লাভের ব্যবসায়। কাঁচা আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ৪।৫ ফালা করিয়া কাটিয়া ভিতরস্থ কসি বাহির করিয়া লইয়া লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। যখন ইহা বেশ শুকাইয়া আসে, তখন পরিমাণ অনুসারে হরিদ্রা ও লঙ্কা রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া ঐ শুকানো আম্রের সহিত গুড় সংযোগে বেশ করিয়া মাখাইয়া লইতে হয়। যখন সকল আম্রগুলিতে মসলাসহ গুড় উত্তমরূপে মাখান হইল, তখন উচ্চ একটী মাটীর হাঁড়ির

ভিতর রাখিয়া উপর হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গুড় ঢালিয়া দিতে হইবে। এখন এরূপ পরিমাণে গুড় দিতে হইবে যেন সেই হাঁড়িস্থিত আম্‌সী-গুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহা শোষণ করিতে পায়। অতঃপর হাঁড়ির মুখ সরাদ্বারা ময়দার আঠা দিয়া বন্ধ করিয়া গামছা বা কাপড়ের দ্বারা বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ গামছা বা কাপড় রাখিবার কারণ এই যে, যেন কোন প্রকার কীট পতঙ্গাদি উহাতে না পড়িতে পারে। তবে মাঝে মাঝে এক একবার উল্টাইয়া দিতে হয়। যখন উপর নীচের আম্রগুলি সমপরিমাণ গুড় শোষণ করিয়া লয়, তখন আর উল্টাইবার প্রয়োজন হয় না। অন্ততঃপক্ষে ঐ আমচুর একমাস পরে বাজারে বাহির করিবার মত হয়।

আম্র হইতে আবার "কাসুন্দী" প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বের ন্যায় আম্রের খোসা ছাড়াইয়া ফালা ফালা করিয়া ঢেঁকিতে দিয়া থেত্‌লাইয়া লইতে হয়। এই থেঁতলান আম্রগুলির সহিত লবণ মাখাইয়া একটী ঝুড়ি বা চুবড়ি করিয়া একটা পাত্রের উপর রাখিয়া দিতে হয়। উদ্দেশ্য, আম্রের অভ্যন্তরস্থ জল ঝরিয়া যাওয়া। অতঃপর ওই জল ঝরিয়া গেলে উহাতে সরিষার গুঁড়া মাখাইয়া হাঁড়িতে তুলিতে হয়। ওই সরিষা আম্র থেঁতলাইবার পূর্ব্বে ঢেঁকিতে কুটিয়া লইতে হয়। ইহার কারণ আম্র থেঁতলাইলে ঢেঁকির গড় ভিজিয়া যায়, ভিজা গড়ে সরিষা কুটিলে সরিষা নষ্ট হইবার সম্ভাবনায় পূর্ব্বেই উহা গুড়াইয়া লইতে হয়। গৃহস্থের বধূ বা গৃহিণীগণ শুদ্ধাচারে কাসুন্দী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধাচারে প্রস্তুত না করিলে কাসুন্দী নষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আম্রের সমুদয় জলীয় ভাগ নষ্ট না হইলে উহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে অতি শুদ্ধাচারে প্রস্তুত কাসুন্দীও নষ্ট হইয়া যায়, অথচ গৃহিণীগণ বলেন যে নিশ্চয় কোন অশুদ্ধাচার হইয়াছিল। আম্রের সহিত আম্রের জলীয় ভাগ থাকাই, কাসুন্দি নষ্ট হইবার অন্যতম কারণ। অতএব যাহাতে আম্রের সহিত তাহার জলীয় ভাগ না থাকিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল যে Fruit Press বা ফলের রস বাহির করিবার কল বাহির হইয়াছে, তাহার দ্বারা সুন্দররূপে আম্রের জলীয় ভাগ বাহির করিয়া লওয়া যায়। যদি আম্রের সহিত তাহার জলীয় ভাগ থাকে, তাহা হইলে কাসুন্দি অতি অল্পদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ জলের সহিত জীবাণু থাকে। জীবাণু যে দ্রব্যে প্রবেশ করে, সেই দ্রব্যই নষ্ট করিয়া ফেলে।

আম্র হইতে আম্র তেল প্রস্তুত হয়। আম্র-গুলিকে না ছাড়াইয়া দু'খানা করিয়া, কিম্বা আম্রটি অর্দ্ধেক চিরিয়া শেষ ভাগটি আস্ত রাখিয়া, আস্তে আস্তে কসি বাহির করিয়া লইয়া কসির স্থানে হরিদ্রা, মেথি, মৌরী কালোজীরা, লঙ্কা ও সরিষা গুঁড়া করিয়া পুর দিয়া তেলের ভিতর ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপ কিছুদিন রাখিয়া যখন আম্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে তৈল শোষণ করিয়া লয়, তখন উহা ব্যবহার করিতে হয়। ইহার ব্যবসায়ও যথেষ্ট লাভজনক এবং পশ্চিমারা এই ব্যবসায় করিয়া কলিকাতায় বাড়ীঘর করিয়াছে এরূপ অন্ততঃ দশ বার জন লোকের কথা আমরা জানি।

তারপর পাকা আম

ইহার ব্যবসায়ও বেশ হয়। ইহার বিষয় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাকা আম্রগুলি যখন পচিতে আরম্ভ করে, তখন উহা হইতে আমসত্ব প্রস্তুত হয়। খুব পাকা কিংবা একটু পচা আম্রগুলির খোসা ছাড়াইয়া একটি পাথরের পাত্রে আম্রগুলির কাৎ চট্‌কাইয়া বাহির করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া বেশ করিয়া চট্‌কাইতে হয়। একটী বেশ ফরসা পাতলা নেকড়ায় একবার ছাঁকিয়া লইতে হয়। যদি কোন খিচ বা ময়লা থাকে তাহা হইলে তাহা নেকড়ায় থাকিয়া যায় এবং পরিষ্কার অংশ নিম্নরক্ষিত পাত্রে পতিত হয়। অতঃপর একখানি চেটাইয়ে তেল মাখাইয়া শুকাইয়া লইয়া তাহার উপর অল্প অল্প করিয়া ঢালিয়া শুকাইতে দিতে হয়। এইরূপ ভাবে দেওয়ার পর যখন অর্দ্ধ শুষ্ক হয়, তখন উহার উপর আবার কিয়ৎ পরিমাণ ঢালিয়া দিতে হয়। এইরূপে বারবার আমের রস ঢালিয়া উহা শুকাইয়া লইয়া আমসত্বগুলি ইচ্ছানুযায়ী মোটা করিয়া লইতে হয়। চেটাইতে তেলের হাত মাখাইবার উদ্দেশ্য এই যে আমসত্বগুলি শুকাইলে যেন সহজে চেটাই হইতে ইহা তুলিয়া লওয়া যায়।

আমসত্বের ব্যবসা অতি সুন্দররূপে চলে। ইহা সব সময়েই ব্যবহার করা চলে; ঘন দুধের সহিত অথবা টক্‌রূপে আমসত্বের ব্যবহার এদেশে বহুকাল হইতে অতি প্রিয় এবং মুখরোচক খাদ্যরূপে প্রচলিত আছে; এইজন্য লোকে অতি আগ্রহের সহিত আমসত্ব কিনিয়া থাকে। আমাদের দেশে আম খাইয়া তাহার আঠি ফেলিয়া দেয়। কেননা, উহা অব্যবহার্য্য। কিন্তু উহা অব্যবহার্য্য নয়। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরা ওই সমস্ত আঠির ভিতরের কসি বাহির করিয়া বাঁশী প্রস্তুত করিয়া বাজাইতে থাকে। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের লোকেরা ঐ সকল আঠি বৃথা আমোদে ব্যবহার না করিয়া ইহার ব্যবসায় করিয়া থাকে। সেই কারণ উহারা রাশি রাশি আমের কসি কিনিয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশের লোকেরা আম্রের কসি কিনিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া উহার কস্ ফেলিয়া দিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া আঠার সহিত ভেজাল দেয়। উহাতে উহাদের ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। অথচ উহাতে কোন অনিষ্টকর পদা নাই।

আবার আম্রের কসি শূকরদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্তও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূকরদিগকে আম্রের কসি খাওয়াইলে উহাদের গায়ে চর্ব্বি হয় এবং দেহ বলিষ্ঠ হয়। এ কারণ শূকর ব্যবসায়ীরাও আমের কসি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকে। আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে যদি কেহ শূকর ব্যবসায়ী থাকেন, তিনি আম্রের কসি তাঁহার শূকরদিগকে খাওয়াইয়া তেজী ও বলিষ্ঠ করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত আম্রের কসি হইতে কালী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আম্রের কসিগুলি ঢেঁকির গড়ে দিয়া বেশ করিয়া থেঁতলাইয়া লইয়া একটি মাটীর নাদায় ভিজাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ ভিজাইয়া রাখিলে আম্রের কসির অভ্যন্তরস্থ কস্ বাহির হইয়া থাকে। ইহাকে ট্যানিন্ বলে। অনেকে হয়ত ঘরে লিখিবার জন্য চাল ভাজিয়া চোঁয়াইয়া লইয়া ওই চোঁয়া চাল ভাজা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া হীরাকস, টোরী ও ভূষা দ্বারা কালী প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহাও ঠিক

সেইরূপে প্রস্তুত হয়। কসির কস মিশ্রিত জলে হীরাকস, টৌরী ও হরিতকী পরিমাণ অনুসারে এই জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর ভুষা মিশাইয়া কালী প্রস্তুত করা হয়।

ইহার দ্বারা আরও একটী সুন্দর ব্যবসায় হয়। আমাদের পল্লীগ্রামস্থ যুবকগণ বৃথা কার্য্যে সময় অতিবাহিত না করিয়া এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে মন সংযোগ করিলেও তাহাদের অনেক উন্নতি হইতে পারে। আমের আঁঠিগুলি—যেগুলি হইতে কসিগুলি বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে সেই সকল আঁঠি—পোড়ান কার্য্যে লাগে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে আম্রের একটী দ্রব্যও উপেক্ষার বস্তু নয়। তাই আজ স্বদেশবাসিগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কোন বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া সামান্য বিষয়গুলিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মনে করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হউন।

সিরাপ প্রস্তুত প্রণালী

গরমের জন্য দ্বিপ্রহরে প্রাণ যখন আই ঢাই করিতে থাকে, তখন এক গ্লাস ভাল সিরাপ খাইলে অনেকটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। এই তৃপ্তিটুকুর সুযোগ লইয়া সিরাপের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় চলিতেছে। শুধু যে এখানকার ব্যবসায়ীরা সিরাপের ব্যবসায় ফাঁদিয়া গ্রীষ্মকালে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন তাহা নহে, বিদেশ হইতেও প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার সিরাপ এখানে আমদানী হইয়া থাকে। বিলাতী সিরাপের আমদানী দেখিয়া মনে হয়, এখনও দেশী ব্যবসায়ীর অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকার সিরাপ প্রস্তুতের প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

কিরূপে সিরাপ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে গোড়ার কয়েকটি কথা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম কথা হইতেছে, যে ফলের সিরাপ প্রস্তুত করা হয়, সেই ফলের সুগন্ধটুকু বজায় রাখাই ফলের সিরাপ প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট আখের চিনি এবং উৎকৃষ্ট তাজা ফল সিরাপ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করাই উচিত। খারাপ চিনি এবং বেশী পাকা ফল ব্যবহার করিলে সিরাপ গাঁজিয়া যাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং চিনির রস প্রস্তুত করিবার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যদি দৈবক্রমে রস বেশী ফুটিয়া যায়, তাহা হইলে জল মিশাইয়া আবার ফুটাইয়া লওয়া উচিত। সিরাপ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে রস বা প্লেন সিরাপ (plain syrup) কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

এক পাউণ্ড পরিস্কার আখের চিনি আধ পাইট জলে বেশ করিয়া গুলিয়া আগুনে চড়াইতে হইবে। কয়েক মিনিট ফুটিবার পর সমস্ত চিনি যখন জলের সহিত মিশিয়া যাইবে, তখন আগুন হইতে উহা নামাইয়া গাঁজলা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর ২২২ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে রস ফুটাইতে হইবে। ফুটান শেষ হইলে ফ্লানেলে উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছিপি আঁটিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে। ইহাকে প্লেন সিরাপ ওয়ান (plain syrup I) বলে। প্লেন সিরাপ টু (plain syrup II) প্রস্তুতের প্রণালী প্লেন সিরাপ ওয়ান প্রস্তুতের অনুরূপ। তবে ইহা ২.৫ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট উত্তাপে ফুটানো দরকার।

আদার সিরাপ

এক পাইট প্লেন সিরাপে কয়েক ফোটা আদার এসেন্স (essence of ginger) মিশাইয়া

খানিকটা ক্যারামেল রঙ (caramel colouring) মিশাইতে হইবে। ঠাণ্ডা অবস্থায় বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিলেই আদার সিরাপ প্রস্তুত হইয়া গেল।

লেবুর সিরাপ

আধ পাইট প্লেন সিরাপ প্রস্তুত করিয়া রাখ। সিকি পাইট লেবুর রস একটি পাত্রে থিতাইতে দাও। কিছুক্ষণ পরে লেবুর রসের উপর সরের মত পড়িবে। উহা তুলিয়া ফেলিয়া ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে। এইবার প্লেন সিরাপে লেবুর রস মিশাইয়া আস্তে আস্তে ২২২ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে ফুটাইতে হইবে। ফ্লানেল ব্যাগের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে।

কমলা লেবুর সিরাপ

লেবুর সিরাপ যে প্রক্রিয়ায় করিতে হয়, ইহাও সেই প্রণালীতে করিতে হইবে। কেবল লেবুর রসের পরিবর্ত্তে কমলা লেবুর রস ব্যবহার করিতে হইবে।

কমলা-ফুলের সিরাপ

এক পাইট প্লেন সিরাপ লইয়া ২২০ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট্ উত্তাপে উহা ফুটাও। তাহার পর উহাতে আধ পাইট কমলা-ফুলের জল (orange flower water) ঢালিয়া দিয়া দু'এক মিনিট ফুটাও। গাঁজলা তুলিয়া লইয়া ফ্লানেল ব্যাগের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখিতে হইবে।

বাদামের সিরাপ

এক পাইট মিষ্ট বাদাম এবং ৪ আউন্স তিক্ত বাদাম লইয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লও। অতঃপর হামানদিস্তার সাহায্যে বাদাম-গুলি বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেল। দুইটি লেবুর রস, এক আউন্স গাম এরেবিক (gum arabic এবং আধ পাইট জল মিশ্রিত কর। সকল পদার্থগুলি একত্র মিশাইয়া কাদার মত হইয়া গেলে, উহাতে আবার আধ পাইট জল মিশ্রিত কর। অতঃপর উহা ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত ২ পাউণ্ড ভাল আখের চিনি

মিশাও। উহা কয়েক মিনিট আগুনে ফুটাইবার পর চিনি গলিয়া গেলে, গাঁজলা তুলিয়া ফেলিবে। যতক্ষণ সিরাপ ঠাণ্ডা না হয়, ততক্ষণ নাড়িতে থাক। অতঃপর ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে একটু কমলা ফুলের জল (orange flower water) মিশাইয়া বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখ। এতদ্ব্যতীত আঃ কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে কি কি ফলের গন্ধ প্রস্তুত করিতে পারা যায় নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইল।

আপেলের গন্ধ

আল্‌ডিহাইড্	২	ভাগ
ক্লোরোফর্ম্ম	১	"
এসেটিক ইথার	১	"
নাইট্রাস ইথার	১	"
অক্সেলিক এসিড	১	"
গ্লিসারিণ	৪	"
এমিলভালেরিয়ানিক ইথার	১০	"

চেরি ফলের গন্ধ

বেঞ্জিক ইথার	৫	ভাগ
এসেটিক ইথার	৫	"
গ্লিসারিণ	৩	"
ইনান্থিক ইথার	১	"
বেঞ্জিক এসিড	১	"

পিচ ফলের গন্ধ

ফরমিক ইথার	৫	ভাগ
ভ্যালেরিয়ানিক ইথার	১	"
ব্যুটিরিক ইথার	৫	"
এসেটিক ইথার	৫	"
গ্লিসারিণ	৫	"
অয়েল অব পার্সিকো	৫	"
আলডিহাইড	২	"
এমিলিক আল্‌কোহল	২	"
সেবাসিজিক ইথার	১	"

এপ্রিকট বা খোবানীর গন্ধ

ব্যুটিরিক ইথার	১০	ভাগ
ভ্যালেরিয়ানিক ইথার	৫	"
গ্লিসারিণ	৪	"
এমিলিক আলকোহল	২	"
এমিল ব্যুটিরিক ইথার	১	"
ক্লোরোফর্ম্ম	১	"
ইনান্থিক ইথার	১	"
টার্টারিক এসিড	১	"

কুলের গন্ধ

গ্লিসারিণ	৮	ভাগ
এসেটিক ইথার	৫	"
আল্‌ডিহাইড	৫	"
অয়েল অব পার্সিকো	৪	"
ব্যুটিরিক ইথার	২	"
ফরমিক ইথার	১	"

আঙ্গুরের গন্ধ

ইনান্থিক ইথার	১০	ভাগ
গ্লিসারিণ	১০	"
টার্টারিক এসিড	৫	"
সাক্‌সিনিক এসিড	৩	"
আল্‌ডিহাইড	২	"
ক্লোরোফর্ম্ম	২	"
ফর্‌মিক ইথার	২	"
মিথিল সালিসিলিক ইথার	১	"

আনারসের গন্ধ

এমিল ব্যুট্রিক ইথার	১০	ভাগ
ব্যুটিরিক ইথার	৫	"
গ্লিসারিণ	৩	"
আল্‌ডিহাইড	১	"
ক্লোরোফর্ম্ম	১	"
ব্যুটিরিক ইথার	৫	"
এসেটিক্ ইথার	৫	"
এমিল এসেটিক ইথার	৩	"
এমিল-ব্যুটিরিক ইথার	২	"
গ্লিসারিন	২	"
ফরমিক ইথার	১	"
নাইট্রাস ইথার	.	"
মিথিল স্যালিসিলিক ইথার	১	"

ফুটির গন্ধ

সিবাসিলিক ইথার	১০	ভাগ
ব্যুটিরিক ইথার	৪	"
ভ্যালেরিয়ানিক	৫	"
গ্লিসারিন	৩	"
আল্‌ডি হাইড	২	"
ফরমিক ইথার	১	"

ব্যবসায় ও বিজ্ঞাপন

শ্রীসুরথ কুমার সরকার

পূর্ব্ব প্রকাশিতের অবশিষ্টাংশ

রেলগাড়ী, ট্রাম, মোটরবাস, ঠেলাগাড়ী (Trollies) বা আলোকের সাহায্যে যে-সকল বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় তাহাদিগকে এক কথায় আমরা যানবাহিত বিজ্ঞাপন বলিতে পারি। যানবাহিত বিজ্ঞাপনে বেশী কথা বলিবার বা চিত্রাদি দেওয়ার বিশেষ অবসর নাই। কারণ, এই সকল বিজ্ঞাপন খুব অল্প সময়ের জন্যই আমাদের চোখে পড়ে। ধরুন, একখানি মোটরবাস অথবা একখানি ট্রামগাড়ীর ছাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল। এখন, যে যাত্রী উক্ত বাস বা ট্রামে উঠিবে তাহার লক্ষ্য উহার ছাত পর্য্যন্ত পৌছায় না—তাহার লক্ষ্য থাকে উহার পা-দানি ও হাতলের উপরে; যে উহা হইতে নামে তাহারও নামার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়, বাস বা ট্রামের মাথায় কি আছে তাহা দেখিবার সে প্রয়োজন বোধ করে না। পথ-চলতি যাহাদের লক্ষ্যে ঐ বিজ্ঞাপন আসিবে, তাহাদিগকেও উহা পড়াইবার জন্য উক্ত বাস বা ট্রাম দাঁড়াইবে না অথবা Trolliesর ন্যায় মন্থরগামী হইবে না। সুতরাং চক্ষের নিমেষে যাহা পড়া যায় সেইটুকুই চকিতের জন্য পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে মাত্র। ইহাতে যে বিশেষ সুবিধাজনক বিজ্ঞাপনের কাজ হয় এরূপ বলা যায় না।

ট্রেণ, বাস বা ট্রামযাত্রীর অধিকাংশই বাড়ী হইতে কোনও একটী উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করে, এবং যে ২।৪ মিনিট বা ঘণ্টা ট্রামে বা ট্রেণে সে কাটায় তাহা মানসিক উদ্বেগ বা অশান্তি পরিপূর্ণ। মনের এইরূপ অবস্থায় চোখের সম্মুখে একতাল সোনা পড়িয়া থাকিলেও লক্ষ্য হয় না, বিজ্ঞাপন তো তুচ্ছ বিষয়। তাই, ট্রাম, ট্রেণ বা বাসের আরোহীদিগকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে উহার ভিতরে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন তাহাদের মনের উপরে বিশেষ ছাপ দেয় না। তবে "Smoking allowed—use Prodhan's specials" বা তজ্জাতীয় এক লাইনের বিজ্ঞাপনের hoarding এই সকল ক্ষেত্রে জোর করিয়া আরোহীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। একই কথার পুনরুক্তি ব্যতীত বাস বা ট্রামের মধ্যে সাধারণ পন্থায় বিজ্ঞাপন দিলে অনেক সময়েই আমাদের চোখ যখন উহা পাঠ করে মন তখন অন্য চিন্তায় ব্যস্ত থাকে বলিয়া তাহার দিকে বড় আকৃষ্ট হয় না। তাহা হইলেও ট্রাম বা বাসের বাহির অপেক্ষা ভিতরে বিজ্ঞাপন দেওয়া

অনেক ভাল। এক্ষেত্রে hoarding না করিলেও যাঁহারা ট্রাম, বাস প্রভৃতির প্রায় প্রতিদিনের যাত্রী তাঁহাদের অভ্যস্ত চক্ষুর সহিত মনও বিজ্ঞাপিত পণ্যের সহিত পরিচিত হইয়া যায়।

বায়োস্কোপে Slide দেওয়া উপরোক্ত যান-বাহিত বিজ্ঞাপনের অপেক্ষা অনেক অধিক ফলদায়ক। কারণ Slide সুচিত্রিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং দর্শকদিগের মনোযোগ আকর্ষণের জন্ত ইহাতে অনেক পন্থাই অবলম্বন করা যাইতে পারে। Slide অপেক্ষা film advertising আবার আরও অধিক ফলদায়ক। একখানি Slide সাধারণতঃ একমিনিটকাল দেখান হয়—যাঁহারা 'চিত্রা'র ন্যায় অত্যধিক Slideএর বিজ্ঞাপন দেখাইয়া থাকেন তাঁহারা আবার প্রতি Slideএ আধ মিনিট সময়ও দিতে পারেন না। ফলে, বিজ্ঞাপনটী হয় তো কেহ পড়িতে পারিলেন, কেহ পারিলেন না—এমন অবস্থাতেই তাহার স্থানে নূতন আর একটী বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব হইল, মন পূর্ব্বের বিজ্ঞাপন লইয়া আর চিন্তা করারও অবসর পাইল না। Film advertising হইলে বিজ্ঞাপনদাতার এই অসুবিধা হয় না। বিজ্ঞাপনটী দর্শকগণের

সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং উহার জন্য যত ব্যয়ই হউক না কেন, তাহা যে নিষ্ফল হইবে না ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

Premier Publicity Society, Aurora Arts & Publicity Co, প্রভৃতি কয়েকটী Society ও Companyর পেশা ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া নিজ দায়িত্বে সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করান'। ইঁহারা সকল প্রকার বিজ্ঞাপন সুন্দর ও কার্য্যকরীভাবে প্রকাশ করিবার দায়িত্ব লইয়া থাকেন। বিজ্ঞাপনের নানাপ্রকার হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে ব্যবসায়ী Premier Publicity Society প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীগণের কাহারও উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন। ইঁহারা দরদস্তুর করা হইতে বিষয় নির্ব্বাচন, আর্টিষ্ট নির্ব্বাচন, ডিজাইন প্রস্তুত,হাণ্ডবিল ছাপা, ব্লক প্রস্তুত, Slide প্রস্তুত, বিজ্ঞাপনের Contract করিয়া বিজ্ঞাপন প্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া ও তাহার Proof দেখা, পোষ্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজই করিয়া থাকেন। অথচ প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞাপনদাতার নিকট হইতে ইঁহারা কিছুই গ্রহণ করেন না। ইঁহারা যাঁহাকে বিজ্ঞাপন প্রদান করেন তাঁহার নিকট হইতেই শতকরা ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিশন পাইয়া থাকেন এবং ডিজাইন, ব্লক ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া দিয়া যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতেই ইঁহাদের সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ব্যবসায়ী নিজে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে যে আর্থিক ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা নহে; কারণ, সাধারণতঃ বাজার চল্‌তি Rateএর অপেক্ষা ইহারা কোনও বিষয়েই অধিক চার্জ্জ করেন না, maker, Press অথবা artistএর লাভের একটী অংশ গ্রহণ করেন মাত্র। যাঁহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে অনেক কাজ পাইবার আশা থাকে তাঁহাকে নিজের লাভের একটা অংশ দিতেও কেহ বড় আপত্তি করেন না।

যে সকল Advertising Agency বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের উপদেশ গ্রহণে ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের ব্যয় অপব্যয় হইবার আশঙ্কা থাকে না বলিয়াই মনে হয়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সদুপদেশ দিতেও ইঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। বিজ্ঞাপনের সকল প্রকার হাঙ্গামা ব্যবসায়ীর পক্ষ হইয়া নিজের স্কন্ধে বহন করিতে ইঁহারা কথনই পরাঙ্মুখ নহেন এবং এবিষয়ে ইঁহারা বহুদর্শী বলিয়া যাহারা ভালভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে অন্ততঃ একবার ইঁহাদের যুক্তি ও উপদেশ গ্রহণও বিশেষ ফলদায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিলাতে Advertising Agents ছাড়াও আর একপ্রকার ব্যবসায়ী আছেন। ইহাদের নাম Advertising Consultants. ইহারা একটী নির্দ্দিষ্ট ফি গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীকে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সকল প্রকার সদুপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে বিজ্ঞাপন লেখা বা প্রকাশ করা অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোনও ব্যাপারেই লিপ্ত থাকেন না। এই প্রকার Advertising Consultantsএর এদেশেও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে,কিন্তু এপর্য্যন্তও ইহাদের অভ্যুদয় হয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞাপনদানে ব্যবসায়ীর লাভ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছি যে যত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় তাহার আঠারগুণ টাকার পণ্য বিক্রয় হইয়া থাকে। বিষয়টী আরও

পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, ২০০০৲ টাকা সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিলে সেই বৎসর বিজ্ঞাপিত পণ্যের বিক্রয়ে নিট লাভ হইবে ন্যূনাধিক ৪০০৲ চারি শত টাকা। বিজ্ঞাপনের ব্যয় ৫০০০৲ টাকা হইলে নিট লাভ হইবে ১২০০৲ টাকা, এবং সেই বিজ্ঞাপনে এতদপেক্ষা যত অধিক অর্থ ব্যয় করা যাইবে লাভের অঙ্কের অনুপাতও সেই হিসাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তবে যে দ্রব্যে অনেকের প্রয়োজন থাকিলেও সকলের নাই অথবা যাহার মূল্য এত বেশী যে তাহা ক্রয় করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহার বিজ্ঞাপনে ব্যয় করিবারও একটা সীমা থাকা চাই। যদিও বহুল বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও বাধ্য করায়, তাহা হইলেও বিজ্ঞাপনের ব্যয়ের সহিত লাভের অনুপাত কিছুদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তৎপরেই Inverse Ratioতে কমিতে থাকে বলিয়া বিজ্ঞাপনের ব্যয়কে সর্ব্বদাই একটা ন্যায্য সীমার মধ্যে রক্ষা করা উচিত।

অনেকের ধারণা আছে, বহু বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের মূল্য তত্তুল্য অন্য কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এই ধারণা যে অমূলক তাহা অতঃপর বোধ হয় অধিক কথায় বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। বিজ্ঞাপনের ব্যয় উঠাইতে ব্যবসায়ীকে তাহার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হয় না বরং বহু বিজ্ঞাপিত পণ্য অপরের তত্তুল্য পণ্যের অপেক্ষা সস্তা হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপন নূতন নূতন ক্রেতা বা পৃষ্ঠপোষকের সৃষ্টি করে বলিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে অতি সামান্য পরিমাণে লাভ গ্রহণ করিলেও তাহার একুন একটা মোটা অঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু যাহার বিক্রয় অল্প তাহার পক্ষে বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের তুল্য দ্রব্য তাহার সমমূল্যে বিক্রয় করিতে হইলে একুনে দেখা যাইবে লাভ দূরে থাকুক, কিছু ক্ষতিই হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই বহু বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের সমমূল্যে তত্তুল্য অবিজ্ঞাপিত দ্রব্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

জীবন বীমা ও জনসেবা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বলা বাহুল্য, এবিষয়ে জীবনবীমা কোম্পানীগুলি মানবের উৎকর্ষ সাধনে যে কাজ করিয়াছে এবং করিতেছে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। আমাদের দেশে এখনও জীবন বীমার যথোচিত প্রচার হয় নাই বলিয়া ঠিক মত আমাদের জনসাধারণের মনে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের উপকারিতা উপলব্ধি হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশে বহুল প্রচারের ফলে জীবন বীমার অনুষ্ঠানগুলি এরূপ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট—যাহাতে বীমাকারীর আয়ু বর্দ্ধিত হয়। অবশ্য অর্থের দিক দিয়া দেখিলে মনে হইবে যে,এই আয়ু বৃদ্ধি হইলে কোম্পানীগুলির অকালমৃত্যুর দাবীর পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া লাভের পরিমাণ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু আবার জনসেবার ভাবে যদি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে দেখা যায়, এই সমস্ত সৎ সাহিত্য বীমাকারী ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হইয়া দেহতত্ত্বের বিষয়ে আমাদের কত জ্ঞান বাড়াইয়া দিতেছে। এই অনুষ্ঠানগুলি স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগ নিবারণ বিষয়ে আধুনিক সাহিত্য সাধারণের মধ্যে বিতরণ করে।

এখানে একথা বলা উচিত যে রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ নিবারণ করাই অতিশয় দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই হয়ত কোন বিদেশীয় কোম্পানীর নিকট হইতে উপরিউক্ত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তিকা পাইয়া থাকিবেন। এই সমস্ত

পুস্তিকায়, কিভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে এবং কি কি করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি হয় সেই সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মতামত লিখিত থাকে। পাশ্চাত্যদেশে এমন কয়েকটী বীমা অনুষ্ঠান আছে যাহারা বীমাকারীগণের সাময়িক ভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ পরীক্ষার ফলে বীমাকারী যদি স্বাস্থ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখান তাহা হইলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে সভ্য সমাজে জনসাধারণের মধ্যে অনেক রোগের নাম পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল না; কিন্তু আজ এই সমস্ত বীমা অনুষ্ঠানের প্রচার কার্য্যের ফলে সেই সমস্ত রোগ ও তাহার নিবারণ সম্পর্কে সকল শিক্ষিত লোকের মধ্যেই একটা সহজ জ্ঞান আসিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে ২০ বৎসর পরে যখন আমাদের দেশে বীমার প্রচলন আরও ব্যাপকভাবে হইবে,এদেশের জনসাধারণের মধ্যেও আমাদের মাতৃভাষায় অনুরূপ পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়া দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানগুলি আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

বীমা অনুষ্ঠানের এইরূপ উদ্যোগ অবশ্য খুবই আধুনিক। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কেহই ভাবে নাই যে প্রিমিয়মের চাঁদা আদায়, এজেন্টকে কমিশন দেওয়া এবং দাবীর টাকা মেটান ছাড়া জীবন বীমা কোম্পানীর আর কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে স্বাস্থ্য সুখ ও সুবিধার জন্য মানবজাতি কতরূপ পন্থা বাহির করিতে সচেষ্ট। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত দায়িত্ব জীবন বীমাগুলি বহন করিত, আজ তাহার তুলনায় ঐ আর্থিক দায়িত্ব খুবই সামান্য। আজ যেন জনসেবার এক বিরাট উদ্যোগে তাহারা নিযুক্ত; মানব জাতি যাহাতে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, নিরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, সেই প্রচেষ্টায় মগ্ন।

জীবন বীমার অনুষ্ঠানগুলি মানব হিতৈষণার প্রচেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশের নৈতিক ও আর্থিক উৎকর্ষ দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সেখানকার কৃষকদিগের সমৃদ্ধি আজ ঐ বীমার প্রচেষ্টার ফলেই হইয়াছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক আজ যে বাসগৃহের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, তাহা ঐ প্রচেষ্টার ফলেই; সেখানকার গ্যাস্ ও বৈদ্যুতিক শক্তির যে উৎকর্ষ দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয় বীমা কোম্পানীর অর্থ সাহায্য না পাইলে তাহা সম্ভবপর হইত না। পাশ্চাত্য দেশের রাজপথ ও রেলগাড়ির জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, সে টাকার সংগ্রহ হয় জীবন বীমা কোম্পানীর পুঁজি হইতে। এমন কি, স্কুল কলেজের শিক্ষা ও সুপ্রচারও এই বীমা অনুষ্ঠানগুলির দ্বারাই হইয়াছে। দেশের সমস্ত সদনুষ্ঠানের মধ্যেই জীবন বীমা কোম্পানীর আর্থিক আনুকূল্য যথেষ্ট ভাবে অনুভূত হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সেই সঙ্গে মানবের সমস্ত সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য যে জীবন বীমার অনুষ্ঠানগুলির উপর কতদূর নির্ভর করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের দেশে এখনও আমরা ব্যক্তিগত ভাবে, জাতিগত ভাবে ইহার উপকারিতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই নাই। কিন্তু আশা করা যায়, যেরূপ দ্রুতবেগে ইহার প্রচার বাড়িতেছে, আমাদের দেশীয় বীমা অনুষ্ঠানের এই মঙ্গলময় প্রভাব ও শক্তি আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে পুনরায় এক অপূর্ব্ব নবীনতা এবং পরিপুষ্টি

আনিয়া দিবে। ব্যক্তিগত ভাবে অসময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ ভাবে সহায়তা করে, প্রত্যেক বীমাকারী তাহা সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু এই সঙ্গে যে এই অনুষ্ঠানগুলি দেশসেবা ও জাতি সংগঠনে ব্যাপৃত, তাহা অনেকেই জানেন না। আশা করি, আমাদের এ প্রবন্ধ পাঠে একথা তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবেন।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সভ্যতার মাপকাঠিতে আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। আমরা প্রথমতঃ অর্থহীন দরিদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত। আমাদের শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য এখনও মোটেই উৎকর্ষ লাভ করে নাই; দেশে এখনও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট অভাব; এক কথায় বলিতে হইলে আমরা সমস্ত দিক দিয়াই পরাধীন। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন; কিন্তু এই দীন ভারতে সেরূপভাবে অর্থ সংগ্রহ করা অসম্ভব। তবে আমরা যদি নিজের স্বার্থ ও সেই সঙ্গে বীমা-অনুষ্ঠানের পরিপুষ্টি করি, তাহার ফলেও দেশের দুরবস্থা ফিরিয়া যাইবে। ইহাতে স্বার্থও আছে এবং দেশ ও জনসেবার সত্তিও আপনিই আসিবে।

জীবন বীমায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান

বীমাকারী মাত্রই অবগত আছেন যে জীবন বীমা করিতে হইলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিতরূপ প্রয়োজনীয়। জীবন বীমা অনুষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর যদি প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য পরিচালকবর্গ এবং প্রধান স্বাস্থ্য পরীক্ষক কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়, তাহা হইলেই প্রিমিয়ম লইয়া তাঁহাকে বীমা ভুক্ত করা হয়।

এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নানাবিধ প্রশ্ন থাকে। যথারীতি বুক ও পীঠ প্রভৃতি পরীক্ষার পর এই সমস্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য সঠিক উত্তর দেওয়া হয়। বংশে কোন রোগ ছিল কিংবা আছে কিনা, নিজের কোনরূপ বিপজ্জনক রোগ হইয়াছিল কিনা ইত্যাদি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাহা ছাড়া উচ্চতা ও ওজনের পরিমাণও দিতে হয়। প্রত্যেক ডাক্তারী পরীক্ষায় মূত্র পরীক্ষার নিয়ম আছে। কয়েকটী কোম্পানীতে আবার blood pressureএর ফলও চাহিয়া পাঠান।

এসমস্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বীমার প্রস্তাবকারীকে কিছুই খরচ করিতে হয় না। পরীক্ষার ফলে যদি অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবকারী আর বীমা করিবার অনুমতি পান না। তাঁহার প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়। আবার যদি তাঁহার স্বাস্থ্য অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে পত্র দ্বারা সে-কথা জানান হয় এবং বীমা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট প্রিমিয়ম চাহিয়া পাঠান হয়। এ অবস্থায় যদি তিনি কোন কারণে প্রিমিয়ম দিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ডাক্তারের ফী স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে বাধ্য করা হয়।

আমরা উপরে সামান্যভাবে "ভাল" এবং "মন্দ" স্বাস্থ্যের কথা বলিলাম। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এই "ভাল" ও "মন্দের"ও অনেক স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য বীমা অনুষ্ঠানে 'loading' প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ইংরাজী ভাষায় ঠিক যাহাকে normalli fe বলা হয়, তাহাই প্রস্তাবকারীর পক্ষে "ভাল" স্বাস্থ্য। বয়সের অনুপাতে উচ্চতা ও ওজন যদি নির্দ্দিষ্ট scale অনুযায়ী হয়, বংশে যদি কোনরূপ রোগ না থাকে, তাহা হইলেই normal lifeএর rate অনুসারে তাঁহাকে বীমাকারীরূপে গণ্য করা হয়। যদি সেই উচ্চতা বা ওজনে কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, অথবা বংশে এমন কোন রোগের ইতিহাস পাওয়া যায় যাহা সংক্রামক হইবার সম্ভাবনা, অথবা তাঁহার শরীর এমন রোগদুষ্ট হয় যাহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার স্বাস্থ্য

ভাল হইতে পারে, তাহা হইলে স্বাস্থ্যের তারতম্য অনুসারে হয় প্রিমিয়মের হার বাড়াইয়া তাঁহাকে লওয়া হয়, অথবা case যদি খুব খারাপ হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাবকে একবারে নাকচ করা হয়। এই পরিবর্দ্ধিত বীমার হারকেই ইংরাজী ভাষায় loading বলা হয়

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? অনেকেই এই স্বাস্থ্য পরীক্ষাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখেন, এবং এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোম্পানীর অসদভিসন্ধি বিবেচনা করিয়া বীমা করিতে ইতস্ততঃ করেন। এই ভীতি যে সম্পূর্ণ অমূলক একথা নিষ্প্রয়োজন।

অনেকেই ভুলিয়া যান যে বীমা-অনুষ্ঠান বীমাকারীর জীবন বীমা করিয়া কত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বীমা পত্রের চুক্তি অনুসারে যদি প্রিমিয়মের একটীও কিস্তি দিয়া রোগে অথবা দৈব দুর্ব্বিপাকে বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বীমা-পত্র লিখিত মোট টাকার অধিকারী হইবার দাবী করিতে পারেন। অবশ্য ইহার প্রধান সর্ত্ত তাঁহার স্বাস্থ্য প্রস্তাব পত্র ও স্বাস্থ্য পত্র লিখিত বর্ণনানুযায়ী হওয়া চাই।

সুতরাং এস্থলে স্বাস্থ্য-পত্রের দায়িত্ব যে কত অধিক তাহা সহজেই অনুমেয়। জীবন বীমার সহিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা বিদ্যার ও চিকিৎসকের যে কতদূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ ভাল করিয়া জানেন। রোগ বিশেষের পরস্পরের সম্বন্ধ, এবং শরীরের প্রতি তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, মানবের কর্ম্মজীবনে নানাবিধ রোগের উৎপত্তির সম্ভাবনা, শরীরের রক্ত চলাচলের ক্রিয়া ইত্যাদি সমস্তই জীবন-বীমার সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ হওয়াতে জীবন-বীমার প্রসারের সহিত নানাবিধ রোগ চর্চ্চা ও উহার প্রতীকারের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে যথেষ্ট ভাবে।

আমরা একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছি যে ব্যবসায়ের কথা ছাড়িয়া দিলে জীবনবীমা জনসেবার এক প্রধান অঙ্গ। সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে এই জীবন-বীমার প্রসার নানাবিধ মানবহিতকর কার্য্যে কিরূপভাবে নিযুক্ত, তাহার একটী নিদর্শন চিকিৎসা বিদ্যার পরিস্ফুটতা। এই দিক্‌কার এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব মানবের শারীরিক পরিপুষ্টি কি ভাবে আনিয়া দিয়েছে তাহা জীবন বীমার সম্যক্ ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। বাস্তবিক ধরিতে গেলে আধুনিক জীবন বীমার কৃতিত্ব নির্ভর করে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের উপর।

১ম, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত জন্ম মৃত্যু তালিকা;

২য়, আদম-সুমারী এবং

৩য়, উপরের দুই বিষয়ের সমন্বয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বীমা অনুষ্ঠানের পুঁজির ভবিষ্যৎ পরিমাণের হিসাবের উপর।

বিষয়টী একটু ভাঙ্গিয়া বলা দরকার। জন্ম-মৃত্যু তালিকা পাঠে বুঝিতে পারা যায়, কি হিসাবে দেশে অথবা সহরে কোন্ রোগে মৃত্যু হইতেছে। মনে করুন যদি হিসাব করা যায়. বৎসরে কলিকাতা সহরে গড়পড়তায় শতকরা ৫ জনের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জীবন-বীমা অনুষ্ঠান বীমাকারীগণের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিবেন, এবং বাকী ৯৫ জনের মোট প্রিমিয়মের এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে মৃত্যুর দাবীপূরণ করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে। এই average নিয়মিত ভাবে দৃষ্ট হয় বলিয়াই প্রিমিয়মের হারের সুব্যবস্থা.

লগ্নীর সময়োপযোগী বন্দোবস্ত এবং পরিচালনার মিতব্যয়িতার হিসাব হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, জন্ম-মৃত্যু তালিকায় রোগ নির্ণয়ও থাকে। সুতরাং এখানেও চিকিৎসকের সহযোগিতার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নহে, কোন রোগ বা মহামারীর বিশেষ ভয় দৃষ্ট হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিরোধে নিযুক্ত হন। ইহার সুফল যে বীমা কোম্পানীর উপরও বর্ত্তে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এখানেও জীবন বীমার সহিত চিকিৎসকের সমাবেশ স্বতঃই উপলব্ধি করা যায়। এই সমাবেশের আরম্ভ হয় ১৮৬০ সাল হইতে, তাহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে যে কয়েকটী অনুষ্ঠান বীমার কার্য্য করিত, তাহাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হইত না। তাহার ফলে বীমা কার্য্যে নানারূপ আর্থিক ক্ষতি দৃষ্ট হওয়াতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রচলন হয়।

আমাদের দেশে প্রত্যেক বীমা-অনুষ্ঠানের সহিত একজন প্রধান স্বাস্থ্য পরীক্ষক এবং একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষক সংযুক্ত থাকেন। প্রধান পরীক্ষক দেশ বিদেশের স্বাস্থ্য পরীক্ষকের দ্বারা বীমা প্রস্তাবকারীর বীমা গ্রহণ করিবার অথবা নাকচ করিবার সময়োপযোগী পরামর্শ দেন। এইজন্য পরীক্ষক মহাশয়কে অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তার এবং একচ্যুয়ারীর সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই স্বাস্থ্য পরীক্ষাই জীবনবীমার চক্ষু; সুতরাং এই চক্ষু দিয়া যদি বীমাকারীর স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রাখা হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতির যথেষ্ট সম্ভাবনা।

ইহা ছাড়া অনুষ্ঠানের নানাবিধ কর্ম্মকেন্দ্রে যে-সমস্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষক নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও এজেন্ট। বীমার প্রস্তাব-কারীগণকে তাঁহাদের সম্মুখে পেশ

করাইয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এ বিষয়ে অনেক অনুষ্ঠানে শিথিলতা দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে এজেণ্টের পরামর্শানুসারে ডাক্তার নিযুক্ত হন বলিয়া ডাক্তার প্রায়ই এজেণ্টের বশীভূত থাকেন। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার পার্থক্য দৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। অনেক অনুষ্ঠানে আবার ডাক্তার নিযুক্ত করিবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম না থাকাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বাস্থ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই উভয় প্রথাই বীমা-অনুষ্ঠানের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাহার প্রধান কারণ, ডাক্তারকে কখনও এজেণ্টের বশীভূত থাকা উচিত নহে। সে অবস্থায় রিপোর্টে প্রস্তাবকারীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন অসত্য সংবাদ লিখিতে বাধ্য হইতে হয়, যাহা সাময়িকভাবে এজেণ্টের উপকারে আসিলেও বীমা অনুষ্ঠানের পক্ষে অনিষ্টজনক। প্রকৃতপক্ষে এজেণ্টের সহিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনরূপ আর্থিক বা আত্মীয়তা সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে।

কোন ডাক্তারের নামে অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্তাগণের নিকট সুপারিশ আসিলে তাঁহাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা কিরূপ। তিনি যে কলেজ হইতে পাশ করা এবং আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রেশন করাইয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্যক। তাঁহার স্বভাব চরিত্রের বিষয়েও সন্ধান লওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি, অনেক এরূপ স্বাস্থ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত হন যাঁহাদের নিকট ওজন করিবার অথবা মূত্র পরীক্ষাদির যন্ত্রপাতি থাকে না। অনেক সময়ে তাঁহারা আন্দাজে সারিয়া দেন, তাহার ক্ষতিজনক ফল দৃষ্ট হয় কোম্পানীর অসাময়িক মৃত্যু তালিকায়। বীমা অনুষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে এবিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সংখ্যাতীত স্বাস্থ্য পরীক্ষক নির্ব্বাচনও অমঙ্গলজনক নহে। বেশী ডাক্তার নিযুক্ত হইলেই পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসিয়া দাঁড়ায়, এবং এজেণ্টের অনুগ্রহ পাইবার আশায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শিথিলতা

দৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস লোক সংখ্যা হিসাবে কোন স্থানে দুইজনের অধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষক নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা অবশ্য কলিকাতা, বোম্বাই, রেঙ্গুন ও মাদ্রাজ প্রভৃতি জনবহুল সহরের জন্য আরও দুই একটী বেশী চিকিৎসক নিয়োগেও আপত্তি করিব না। মোট কথা, চিকিৎসক নিয়োগেও অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা ও প্রধান স্বাস্থ্য পরীক্ষককে যথেষ্ট বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা দরকার।

আজকাল মহিলাদিগেরও জীবন-বীমার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে অনেক অনুষ্ঠান শিক্ষিতা মহিলাগণেরই জীবন-বীমা গ্রহণ করেন। যে পরিবারে মহিলাগণ অবরোধ প্রথা মানিয়া চলেন অনেক অনুষ্ঠানই তাঁহাদের বীমা লইতে অস্বীকার করেন। কারণ, আমাদের দেশে পর্দ্দানশীনতা এখনও এমন কঠোরভাবে প্রচলিত যে তাহার ফলে মহিলাগণের স্বাস্থ্য অকালেই ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ স্বাস্থ্য জীবন বীমার উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। কোন্ স্থলে মহিলা বীমা প্রার্থিনীকে অবরোধ-মুক্ত বলা যাইতে পারে, এবং কোন্ মহিলার বীমা প্রস্তাব অস্বীকার করা উচিত, প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের একথার সন্তোষজনক মীমাংসা করা উচিত। আমাদের ধারণা, যে মহিলা পুরুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইতে নারাজ তাঁহাকে পর্দ্দানশীনের মধ্যে গণ্য করা উচিত। এরূপ মহিলার জীবন-বীমা করা আর্থিক হিসাবে বিপজ্জনক। আমরা অবশ্য একথা বলিতে বাধ্য যে যেখানে নারী-বিশেষজ্ঞের পরীক্ষা প্রয়োজনীয়, সেখানে মহিলা স্বাস্থ্য পরীক্ষক দ্বারাই সে পরীক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ পরীক্ষা যদি পুরুষ চিকিৎসক দ্বারা করাইতে রাজী না হন, তাহা হইলে সে রমণীকে বীমা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে জীবন বীমায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থান এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধেই সবিশেষ আলোচনা করিতেছি। এই প্রবন্ধে আমরা বীমাকারীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি তাহাতে স্বাস্থ্য-পরীক্ষকের দায়িত্বের বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। বীমা অনুষ্ঠানের স্বাস্থ্য পরীক্ষক শুধু প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক হইলেই চলিবে না, তাঁহার অনুভাবনা শক্তি এরূপ থাকা উচিত যাহাতে পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও আয়ু সম্বন্ধে বিচক্ষণতাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করিবার শক্তি রাখিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্রগণকে বীমা সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয় শিক্ষা দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই। সেইজন্য অনেক দায়িত্বজ্ঞান চিকিৎসকও এইরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় এমন ভুল করিয়া বসেন, যাহা বীমা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক বিবেচিত হইতে পারে। একজন চিকিৎসক প্রস্তাবকারীর পরীক্ষায় বহুমূত্র রোগ পাইয়াও First class life বলিয়া তাঁহার পরীক্ষাপত্র পাঠাইয়াছিলেন। আর

একজন ডাক্তার Brights disease পাইয়াও প্রস্তাবকারী সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পারিবারিক ইতিহাস লিখিতে গিয়া অনেক চিকিৎসকই heart failureকে মৃত্যুর সন্তোষজনক কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাই বসাইয়া দেন, অথচ তাঁহারা জানেন মানুষের যে কোন কারণে মৃত্যু হইলেই তাহার পূর্ব্বে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক সময়ে জ্বরকেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া লেখা হয়; বীমা প্রস্তাবের পক্ষে এইরূপ উত্তর কতদূর অস্পষ্ট এবং পরোক্ষভাবে অনিষ্টজনক তাহা প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা এবং প্রধান স্বাস্থ্যপরীক্ষক সহজেই বুঝিতে পারেন।

এই সমস্ত বিষয়ে সুশিক্ষার ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্টভাবে হইয়াছে। প্রত্যেক বীমা অফিস হইতে প্রত্যেক স্বাস্থ্য-পরীক্ষকের নিকট নিয়ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় আসিতেছে। ইহা ছাড়া স্বাস্থ্য-পরীক্ষা সম্বন্ধে স্থানীয় অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাহিত্যও যথেষ্টভাবে প্রচার পায়। অনেক মেডিকেল কলেজে এই ইন্সিওরেন্স বিষয়ে বিশিষ্ট ও পারদর্শী চিকিৎসকদ্বারা বক্তৃতাও দেওয়ান হয়। আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষার কোনরূপ
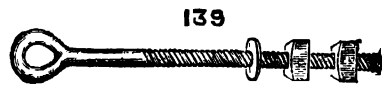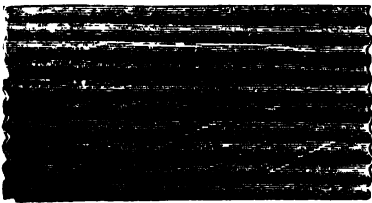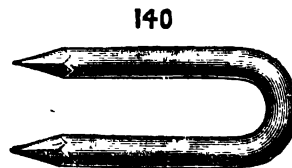
ব্যবস্থা হয় নাই ; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার যে খুবই দরকার, একথা প্রত্যেক বীমা অনুষ্ঠানই অনুভব করেন। দেশে জীবন-বীমার প্রসার হইয়াছে, এবং বীমা-অনুষ্ঠানগুলিও এই প্রসারের ফলে আর্থিক হিসাবে পরিপুষ্টি পাইয়াছেন যথেষ্ট। এই অনুষ্ঠানগুলি যদি একত্র সম্মিলিত হইয়া স্থানীয় মেডিকেল কলেজে বৃত্তিদানের বন্দোবস্ত করিয়া ছাত্রবর্গকে জীবন-বীমায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিক্ষা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করেন,তাহা হইলে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান হয়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ কাজে খরচ হইবে অপেক্ষাকৃত কম, অথচ ভবিষ্যতে ইহার সুফল সকল বীমা-অনুষ্ঠানই পাইবার আশা রাখিতে পারেন।

এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা যদি নিদর্শন মত হয় তাহা হইলে দূর ভবিষ্যতের জন্য কোন বীমা-অনুষ্ঠানকে কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হয় না। সেজন্য প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরীক্ষককে তাঁহার কর্ত্তব্য বিষয়ে সজাগ হওয়া উচিত ; প্রত্যেক বীমা-অনুষ্ঠানকেও তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষকগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা দান করা প্রয়োজন। শুধু মেডিকেল কলেজের উপাধি দেখিলেই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা কাজে পারদর্শিতা আছে বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না। যেখানে স্বাস্থ্য-পরীক্ষকের কাজে অসাধুতা দৃষ্ট হয়, সেখানে সমস্ত অনুষ্ঠান-গুলির সহযোগিতা পূর্ব্বক ঐরূপ অসাধু পরীক্ষকের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কাজে অধিকতর সততা এবং পরীক্ষাকার্য্যেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দৃষ্ট হইবে।

বলা বাহুল্য, দেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎসাহিত্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা এরূপ অনুভূত হইতেছে যে, একাজ বীমা অনুষ্ঠানগুলিদের এখনই হাতে লওয়া উচিত। এখানে মনে রাখা উচিত, জন-সাধারণের মধ্যে এইরূপ সৎসাহিত্যের প্রচারের সুফল বীমা-অনুষ্ঠানগুলিই পাইবেন। তাহার ফলে বীমাকারীর মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃই কমিতে থাকিবে, এবং অর্থভাণ্ডারে অধিকতর পরিপুষ্টি আসিবে। এ বিষয়ে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ যে দৃষ্টান্ত জগত সমক্ষে ধারণ করিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই অনুধাবনযোগ্য। আমরা উদাহরণ স্বরূপ মেট্রপলিটান লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর নাম করিতেছি। এই অনুষ্ঠানটী পুঁজি হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ বীমা অনুষ্ঠান। এখানে বলা ভাল যে,বীমা কোম্পানীর পুঁজির প্রসার বৃদ্ধির সহিত দায়িত্বও বৃদ্ধি হয় যথেষ্ট, সুতরাং ইহার দায়িত্বও খুব বেশী। এই অনুষ্ঠানটী প্রথম ১৯০৯ সালে "যক্ষ্মার সহিত সংগ্রাম" এই নামে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; এবং জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে এবং বিনা মাশুলে বিতরণ করেন। সে সময়ে যুক্ত প্রদেশে যক্ষ্মার যথেষ্ট প্রকোপ ছিল এবং নানাবিধ স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, এই কাজের প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে সৎশিক্ষা ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছিল। মেট্রপলিটানের এই উদ্যম শুধু বীমাকারীদিগের হিতার্থেই করা হয় নাই, জন-সাধারণের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া ভবিষ্যত বীমাকারীদিগের সুশিক্ষার জন্যও এরূপ প্রচার করা হইয়াছিল। তখন হইতে এই অনুষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিবৎসর নানাবিধ রোগ সম্বন্ধে সহস্র সহস্র পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার করিতেছেন। দুই একখানি পুস্তক আমাদিগেরও হস্তগত হইয়াছে; এরূপ সরল ভাষায় জ্ঞানপূর্ণ পুস্তিকা সাধারণের কত উপকারে আসে তাহা একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে ; তাঁহারা

যখন কোন পত্রিকায় তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করেন, তাহাতে চলিত প্রথানুযায়ী মূলধনের প্রসার ও বীমার পুঁজির কোন সংবাদই থাকে না। তাহাতে থাকে শুধু নির্দ্দিষ্ট রোগ বিষয়ে সতর্কবাণী ; এই সঙ্গে একথাও লেখা থাকে যে পাঠক যদি অমুক রোগের বিষয়ে বিশদ বর্ণনা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে সময়োপযোগী পুস্তক পাঠান হইবে। মহিলাদিগের সুবিধার জন্য প্রায় ৫০০০ ধাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগের জন্য টিউবারকিউলোসিস স্যানাটোরিয়মও খোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও নানাভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্দোলন চালাইতেছেন। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে,—an ounce of prevention is better than a pound of cure ; অর্থাৎ দুই পয়সা খরচ করিয়া যদি রোগের আক্রমণ হইতে নিবারণ করা যায় তাহা হইলে রোগ আসিতে দিয়া পাঁচসিকার ঔষধ খাইয়া সারিবার চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। উক্ত বীমা-কোম্পানী কাজে ও কথায় এই বাণীটির স্বার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। বাস্তবিকই বীমা অনুষ্ঠানের পশ্চাতে জনসেবারূপ যে মহান আদর্শ প্রতি অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাতে এইরূপভাবে প্রচার ও প্রসার দ্বারা এই আদর্শকে বরণ করাই সমীচীন।

জীবন বীমা কোম্পানীর বোনাস্

আমাদের দেশীয় কয়েকটী জীবন বীমা কোম্পানী আজকাল উচ্চহারে পলিসিহোল্ডারগণকে বোনাস দিতেছে। এরূপ বোনাস পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। এমন কি, বিদেশীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু কোম্পানীও পূর্ব্বে সাবধানের সহিত বোনাস্ দিত। যে সমস্ত সাময়িক পত্র বা পত্রিকা জীবন বীমার আলোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপ উচ্চহারের বোনাস্ সম্বন্ধে মস্ত সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। কেহ লেখেন, উচ্চহারের বোনাস বীমা কোম্পানীর ঐশ্বর্য্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। কেহবা ইহার মধ্যে বীমা বাড়াইবার অসত্য ও ক্ষতিজনক পলিসির গন্ধ পাইয়া ইহার বিরুদ্ধে খুব জোর সমালোচনাও চালাইতেছেন। অথচ কোন উক্তির

সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ম কোনরূপ যুক্তি দেখান হইতেছে না। বেচারী বীমাকারী যে অজ্ঞানের তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়। ঠিক কোন্ কথাটা সত্য বিবেচনা করিয়া কোন্ বীমা কোম্পানীতে তাহার জীবন বীমা করিবে সে বুঝিতে পারেনা; ফলে এই দাঁড়ায়, বীমা করিবার ভবিষ্যত সুফল সে কিংবা তাহার পরিবারবর্গ ভোগ করিতে পারে না। এবং বীমা কোম্পানীগণও তাহাদের কাজ হারায়। বীমাকারী প্রায়ই মনে করেন এই ব্যাপারে এত মাথা ঘামানোর চেয়ে বীমা না করাই ভাল। আমাদের দেশে এখনও পর্য্যন্ত জীবন বীমার অবশ্যম্ভাবী সুফলের যথেষ্ট পরিচয় হয় নাই বলিয়াই দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ঐরূপ ঔদাসীন্যের ভাব মনে মনে পোষণ করেন। এরূপ ঔদাসীন্যের ভাব পাশ্চাত্য দেশে প্রায়ই দেখা যায় না; ভাল হউক, মন্দ হউক একটা সুস্পষ্ট বিচার করিয়া তাহারা জীবন বীমার পলিসি একটী লইবেই।

খুব বেশী হারে বোনাস দিলেই যে কোম্পানী খারাপ হইবে একথা ঠিক নহে; এবং বোনাস না দিলে কিম্বা কম বোনাস দিলেই যে কোম্পানী ভাল, সে ধারণাও ভুল। বোনাস্ কি ভাবে দেওয়া হয় এবং কোথা হইতে আসে বুঝিতে পারিলে এ বিষয়ে আর বিশেষ ধাঁধা থাকে না। সুতরাং জীবনবীমা কোম্পানীর বোনাস্ সম্বন্ধে একটু বুঝাইয়া দিলে জনসাধারণকে বীমা করিবার সময়ে বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হইবে না।

প্রথম কথা জানা উচিত মানুষের মৃত্যুর হার কিভাবে হয়। মৃত্যুর বিষয় সাধারণতঃ কিছুই বলা যায় না। আজ রাম ২৫ বৎসরের যুবক, সুস্থ, সবল, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং প্রত্যহ ১০টা ৬টা আফিস করিতেছে, ক্লাবে যাইতেছে। হঠাৎ একদিন প্রাতে শোনা গেল গত রাত্রে রাম কলেরায় মারা গিয়াছে! কিংবা রেলগাড়ী হইতে পড়িয়া মাথা ফাটিয়া গিয়া তিন দিন পরে রামের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যু এমনিই অনিশ্চিত। কিন্তু দেখা যায়, যেখানে একজনের মৃত্যু বিষয় খুবই অনিশ্চিতের মধ্যে থাকা যায়, সেখানে সজ্ঘভাবে হিসাব করিলে, মৃত্যুর হারের প্রায়ই সঠিক আন্দাজ করিতে পারা যায়। যেমন, আমাদের দেশে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মৃত্যুর হার সাময়িক ভাবে হিসাব করা হয়, এবং অন্যান্য দেশে বয়স অনুপাতে কি হারে মৃত্যু সংখ্যা বাড়ে বা কমে তাহারও হিসাব রাখা হয়। এই মৃত্যুর হারের হিসাবের উপরই জীবন বীমা কোম্পানীর উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা লাভ ও লোকসান নির্ভর করিতেছে।

জীবন বীমা ২০ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত হয়। সকলেরই জানা আছে ২০—৩৫ পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব কম। ইহার মধ্যেও তারতম্য আছে। যেমন ২০ বৎসরের ১০০ জন তরুণের মধ্যে যদি বৎসরে ৫জনের মৃত্যু হয়, দেখা যায় ৩০ বৎসর বয়সের ১০০ জনের মধ্যে গড়ে বৎসরে ৭ জনের মৃত্যু হয়, এবং যতই বয়স বাড়িতে থাকে সেই হিসাবে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। (ক্রমশঃ)

ইহা ছাড়া স্থানের তারতম্য এবং ঋতু ও সময়ের তারতম্যেও মৃত্যুর হার কমে ও বাড়ে। নাতিশীতোষ্ণ প্রধান দেশে মৃত্যু সংখ্যা অনুপাতে কম, বর্ষা ও গ্রীষ্মে অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা বেশী হয়। আবার দেখা যায়, যে সময়ে যে দেশে যখন মড়ক আসে বালক-বৃদ্ধ-যুবক হু-হু করিয়া মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হয়। এই সমস্ত হিসাব করিয়া এবং গড়পড়তা কি হারে মৃত্যু হয় তাহারও একটা গড়পড়তা করিয়া ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ম ঠিক করা হয়। সুতরাং সব দেশেই একই দরে প্রিমিয়ম আদায় হয় না। বিলাত, আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে স্বাস্থ্যনীতির বহুল প্রচারের ফলে মানবের শারীরিক স্বাস্থ্য যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে, এবং গড় পড়তায় মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং সেখানকার বীমার হার আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশে যে সমস্ত কোম্পানী খোলা হইয়াছে, তাহারা সকলেই এইরূপ রোগ এবং মৃত্যুর সংখ্যার হিসাব করিয়া এবং তাহাদিগের জন্য যথেষ্ট margin রাখিয়া এই প্রিমিয়মের রেট কষিয়াছেন। অবশ্য আমাদের দেশে এখনও জীবন বীমার কার্য্যের পূর্ণ চর্চ্চা হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে যে সমস্ত রেট কষা হয় সমস্তই বিলাতী কোম্পানীর অভিজ্ঞতা হইতেই সঙ্কলিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য দেশসমূহ হইতে মৃত্যুর হার ঢের বেশী। এই জন্য বৃটীশ রেট অপেক্ষা এখানকার রেট একটু বেশী করা হয়। এই পার্থক্যটুকু আমাদের দেশের মৃত্যুর হার বেশী হইবার জন্য additional margin of safety বলিয়া বিবেচিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সংগৃহীত প্রিমিয়মের টাকা খাটাইয়া যে আদায় দাবীর টাকা দিবার জন্য প্রস্তুত রাখা হয় এবং সাময়িক যেটুকু লাভ হইয়া থাকে তাহারও সম্পূর্ণ হিসাব ঐ উপরিউক্ত মৃত্যুর হিসাব দেখিয়া করিতে হয়। সংগৃহীত প্রিমিয়ম হইতে আবার management এর খরচ বাদ দিলে তাহাতে দাবীর টাকা দিবার পক্ষে যথেষ্ট সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং সে টাকা খাটাইয়া সুদ হিসাবে যাহা আদায় হয় তাহারও প্রকৃত হিসাব করিয়া তবে প্রিমিয়মের রেট কষিবার পক্ষে সুবিধা হয়। বিলাত অপেক্ষা আমাদের দেশে এই সুদের হার একটু বেশী, সুতরাং ইংরাজ একচুয়ারী তাঁহাদের দেশের জন্য যে ভাবে হিসাব কষিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আমাদের দেশে সুদ হিসাবে তাহা যথেষ্ট অনুকূল। এখানে একথাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের দেশেও মধ্যে মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার সময়ে ঐ অনুগত সুদও কম বেশী হয়। ব্যবসায়ে আর অবসাদের ঢেউ আসে না; সুতরাং তাহার জন্যও একটু margin of safety রাখার দরকার। এই margin of safety সাধারণতঃ এরূপভাবে নিরূপিত হয় যে তাহাতে বিচক্ষণতার সহিতই জীবন বীমার কার্য্য চলিতে পারে, এবং সাময়িক অণুবেক্ষণের পর কোম্পানীর কাজে যথেষ্ট লাভও পরিদৃষ্ট হয়।

যে সমস্ত বীমা কোম্পানী তাহাদিগের প্রিমিয়মের রেট অসঙ্গত ভাবে কম করিয়া সাধারণের মধ্যে বীমার বহুল প্রচারের প্রয়াস পান, তাঁহারা প্রায়ই এইরূপ trade depression সময়ে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন এবং পলিসি হোল্ডারদিগকেও বিপদে ফেলেন। পলিসি হোল্ডারগণ না বুঝিয়া কম রেট পাইয়া তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত কোম্পানীতে জীবন বীমা করাইতে যান, পরে ঘা খাইয়া

জীবন বীমার উপরই শ্রদ্ধা হারান। আবার এমনও কয়েকটী কোম্পানী আছেন, যাঁহারা এই margin of safety অতিক্রম করিয়া আরও বর্দ্ধিতাকারে রেট প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগের পরিচালকগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন পাইয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন,এবং অবিমৃষ্যকারীতার সহিত সেই অতিরিক্ত ধন এমনভাবে খাটাইবার প্রয়াস পান যে তাহাতে লোকসান বই লাভ হয় না। ফলে পলিসী হোল্ডারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। অধিক ধন হাতে পড়িলে মানুষ যেরূপ অধিকতর লাভের লোভে অন্ধ হইয়া পড়ে, কোম্পানীরও অবস্থা প্রায় সেইরূপই হয়। কারণ কোম্পানী মানুষ দিয়া গড়া। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই রেটের কোন দিকই অতিরিক্ত ভাল নহে—কোম্পানীর পক্ষেও নহে, বীমাকারীর পক্ষেও নহে। ন্যায়সঙ্গতভাবে margin of safetyকে রক্ষা করিয়া যদি প্রিমিয়মের রেট করা হয়, তাহা হইলে বীমাকারীগণও ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এবং কোম্পানী ব্যবসা হিসাবে তাহাদের টাকা যথানিয়মে খাটাইতে পারেন। সুচিন্তিত হিসাব করিয়া যদি রেট নিরূপিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। এই হিসাব অবশ্য এমনভাবে করা উচিত যে দেশের রোগ শোক, অকালমৃত্যু ও অভাব সমস্তরই বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী নির্দ্ধারিত margin of safety রাখা হয়। প্রতি কোম্পানীরই ৩ বৎসর বা ৫ বৎসর অন্তর একবার করিয়া পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ হয়। valuationএর পর দেখা যায়, যদি ঐরূপ উপরিউক্ত margin of safetyর টাকা খরচ হয় নাই, অর্থাৎ অকালমৃত্যু ও অন্যান্য দাবীর টাকা হিসাব অপেক্ষা কম খরচ হইয়াছে তাহা হইলে যে টাকা বক্রী থাকে তাহা বোনাসরূপে পলিসিহোল্ডারগণকে দেওয়া হয়। বোনাসের খতিয়ান করিলে পলিসিহোল্ডারগণ স্বতঃই বুঝিতে পারিবেন তাঁহাদের প্রিমিয়মের নগদ মূল্য কত কম। মনে করুন একজন যুবক বাৎসরিক ৪০৲ টাকা দিয়া একটী লাভসহ পলিসী কিনিয়াছেন। সে টাকা ২৫ বৎসর পরে অথবা অকাল মৃত্যুতে প্রাপ্য। যদি তিনি ২৫ বৎসর জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নগদ ১,০০০ টাকা তিনি পাইবেন; এবং মনে করুন কোম্পানীর কার্য্য কুশলতা এত ভাল যে ৫ বৎসর অন্তর valuationএ প্রতিহাজার টাকার পলিসীতে ২৪৲ টাকা বোনাস দিতেছে। তাহা হইলে ১০০০৲ টাকা এবং বোনাসের ৬০০৲ টাকা তাঁহার প্রাপ্য হইল। সুতরাং তিনি বাৎসরিক ৪০ টাকা দিয়া ১৬০০৲ টাকা পাইলেন। ইহার তুলনায় যে কোম্পানী ১০০০ টাকার পলিসী ইস্যু করিয়া বাৎসরিক ৩৫৲ টাকা প্রীমিয়ম ধার্য্য করিয়াছে, অথচ বোনাস মোটেই দিতে পারিতেছে না, এমন কোম্পানী শেষকালে অপেক্ষাকৃত ক্ষতিজনকই দৃষ্ট হয়। বীমাকারী দিতেছেন ৮৭৫৲ টাকা বটে, কিন্তু অনুপাতে তিনি পাইতেছেন কম অর্থাৎ মোট ১০০০৲ টাকা মাত্র। ঐ অনুপাতে যদি তিনি ১০০০৲ টাকা দেন, তাঁহার শেষ প্রাপ্য হয় মাত্র ১১৪২৸৶০ আনা। বরং একটু বেশী দর দেওয়া ভাল, তাহাতে উপস্থিত সামান্য অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু টাকা নিরাপদ থাকে এবং ভবিষ্যতে বোনাস্ যোগ দিয়া অনেক বেশী আদায় হয়। ইহাকেই ইংরাজীতে বলে, maximum protection at minimum cost।

প্রায়ই দেখা যায়, ভাল কোম্পানীর রেট একটু বেশী হইলে কি হয়, বোনাস হিসাবে প্রচুর আদায় হইতে পারে। যে আফিস একাধিক্রমে আশানুরূপ বোনাস দিতেছে, সাধারণতঃ

বুঝিতে হইবে সে আফিস কর্ম্মকুশলতাকে এবং পলিসি হোল্‌ডারদিগের টাকা খাটান সম্বন্ধে সুপরিচালিত পন্থাবলম্বনে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছে।

বোনাস সম্বন্ধে আরও একটু বিস্তৃত বর্ণনা আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনে করুন, পপুলার কোম্পানী নামক একটী নূতন জীবনবীমা অফিস খোলা হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী বৎসরে ১০০ জন করিয়া বীমাকারী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যেককে ১০০৲ টাকার পলিসি দিতেছেন। সেই ১০০৲টাকা অবশ্য ২০ বৎসর পরে প্রাপ্য। তাঁহারা প্রত্যেক ১০০৲টাকার পলিসীর জন্য প্রত্যেক বীমাকারীর নিকট হইতে বাৎসরিক ৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা আদায় করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রথম বৎসর ৫০০৲ আদায় করিলেন। প্রথম বৎসরের বীমাকারী দ্বিতীয় বৎসরে ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিলেন, এবং দ্বিতীয় বৎসরের নূতন বীমাকারী আরও ৫০০৲ টাকা (৫৲ টাকা হিসাবে) চাঁদা দিলেন। সুতরাং দুই বৎসরের শেষে ১৫০০৲ টাকা আদায় হইল। এইরূপ তিন বৎসরের পরে ৩,০০০৲ টাকা, এবং ৪ বৎসরের পরে ৫,০০০ টাকা এবং ৫ বৎসর পরে ৭,৫০০৲ টাকা তাঁহাদিগের খাতায় জমা হইল। ৫ বৎসর পরে তাহাদের খাতায় ৫০০ বীমাকারীর নাম উঠিল। অবশ্য গোড়া হইতেই এই টাকা হইতে অফিস ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়া বাকী টাকা সুদে খাটান হইতেছে। মনে করা যাউক এই ৫ বৎসরে আফিস সংক্রান্ত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ ৪,৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এবং টাকা খাটাইয়া সুদও ১৭৫৲টাকা আসিয়াছে। আমরা উপস্থিত বিষয়টীকে আরও সরল করিবার জন্য সুদের কথা উত্থাপন না করিয়া বীমার খরচের বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত বর্ণনা এখানে প্রয়োজন মনে করি। অনেকেই হয়ত জানেন না যে বীমাকারীর প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ম হইতে বীমা অফিস কিছুই সঞ্চিত রাখিতে পারেন না, অনেক সময়ে ইহারও অধিক খরচ হইয়া যায়। মনে করুন, আমাদের উপরি উক্ত কল্পনাজাত কোম্পানীর প্রথম বৎসর খরচ হইল ৫০০৲ টাকা, দ্বিতীয় বৎসর ৭০০৲ টাকা, তৃতীয় বৎসর ৯০০৲ চতুর্থ বৎসর ১,১০০ টাকা এবং পঞ্চম বৎসর ১,৩০০ টাকা—মোট ৪৫,০০ শত টাকা খরচ হইল। এই টাকা অফিস চালাইবার, এজেন্টের কমিশন, সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া ইত্যাদিতে খরচ হয়, সুতরাং ইহার মধ্যে কিছুই সঞ্চয় করিবার উপায় নাই। তাহার পর কোম্পানীর তহবিলে অকাল মৃত্যুর জন্যও প্রত্যেক বৎসর একটী নিয়মে অর্থ সঞ্চিত থাকে। মনে করুন, হিসাব করিয়া কোম্পানী দেখিল যে প্রথম বৎসর ১০০ জন বীমাকারীর মধ্যে ৭ জনের অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা, সুতরাং সেজন্য খাতায় ৭০০ টাকা জমা রাখিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, যদিও উক্ত পপুলার কোম্পানী ১ম বৎসর ১০০ জনের জীবন বীমা করিয়াছে, তথাপি অন্ততঃ ৫০০ টাকা আফিস ও সংগ্রহে খরচ হইয়াছে এবং আরও ৭০০ টাকা, একুনে ১২০০ টাকা বীমার তহবিলে সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইতেছে। এইরূপ হিসাব করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ২য় বৎসর ৯১ জন, ৩য় বৎসর ১৬ জন, ৪র্থ বৎসর ২০ জন এবং ৫ম বৎসর ২৫ জনের মৃত্যু সম্ভাবনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই হিসাবে আমরা দেখিতে পাই, ৫ম বৎসরে আয় হইল মোট ৭,৫০০ টাকা, এবং খাতায় খরচের জন্য মজুদ রাখা হইল অফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত ৪,৫০০ টাকা এবং মৃত্যু সম্ভাবনার জন্য ২৫ জনের উপযোগী পলিসীর টাকা

২,৫০০৲ ; মোট ৭,০০০ টাকা অফিসের বইএ জমা রহিল। বাকী ৫০০ টাকার একটী ফণ্ড খোলা হইল যাহাকে সাধারণতঃ Life assurance fund বলে।

আমরা একটী কাল্পনিক অনুষ্ঠানকে যতদূর সম্ভব সরলভাবে অঙ্কের সহিত বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এসমস্ত বিষয় ও সংখ্যা ঐ সমস্ত হিসাবে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিদ্বারা যথেষ্ট গবেষণার পর নির্দ্দিষ্ট হয়। এখন ৫ বৎসর পর অডিটার সমস্ত হিসাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল প্রকাশ করিলেন। মনে করা যাউক, অফিস ও কার্য্যসংগ্রহ ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচ হিসাব মতই হইয়াছে ; এবং সাধারণতঃ ঐরূপ হওয়া সম্ভব; কারণ,ইহা মানুষেরই হাতে। এখন ৫ বৎসর পরে দেখা গেল এই ৫ বৎসরের বীমাকারীদিগের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা সম্ভাবিত সংখ্যার ভিতরে আছে, অর্থাৎ ২৫জনের স্থানে হয়ত ১৯ জন হইয়াছে, অথবা উহার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা দুই প্রকারে ইহার হিসাব দেখাইতে পারি। প্রথম, যদি মৃত্যু সংখ্যা ১৯জন হয় তাহা হইলে ৫ম বাৎসরিক valuationএর ফলে দেখা গেল ৭,৫০০ টাকা আয় এবং ৬,৪০০ (অফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত ৪,৫০০ টাকা মৃত্যুর খরচ ১৯ জনের ১৯০০ টাকা একুনে ৬,৪০০ টাকা) খরচের খাতায় পড়িল। অবশ্য Estimate ছিল অন্যরূপ ; সুতরাং এবার দেখা যাইতেছে খরচ খরচা বাদে বাকী রহিল ১,১০০ টাকা, যাহার মধ্যে পূর্ব্বের বাজেট অনুসারে ৫০০ টাকা Life insurance Fundএ জমা দেওয়া হইয়াছে। এখন বাকী রহিল ৬০০ টাকা। ঐ টাকার একাংশ (ধরুন ১০০ টাকা) যায় মূলধনের শেয়ার হোল্ডারগণকে লভ্যাংশ দিতে ; এবং বাকী ৫০০ টাকা পলিসী হোল্ডারগণকে বোনাস হিসাবে বণ্টন করা হয়। বর্ত্তমান কোম্পানীর খাতায় ৫ বৎসরে ৫০০ জন পলিসী-হোল্ডারের নাম উঠিয়াছে, এবং হিসাব করিয়া ঐ ৫০০ জনকে বাৎসরিক রেটে বোনাস দেওয়া হয়। এমন ভাবে হিসাব হয় যাঁহারা প্রারম্ভেই বীমা করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ৫ বৎসরের জন্য বোনাস পান, যাঁহারা ৪ বৎসর প্রিমিয়াম দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ৪ বৎসরের, এইভাবে তিন, দুই ও একবৎসরের হিসাব করিয়া সমভাবে বোনাস দেওয়া হয়। অবশ্য এ বোনাস তৎক্ষণাৎই দেওয়া হয় না, হয় ২০ বৎসর বাদে, যখন পলিসী mature হয় অথবা পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারীর হস্তগত হয়। এবার ধরা যাউক মৃত্যু সংখ্যা হিসাবের বাহিরে গিয়া ৩৬জন হইয়াছে। তাহার ফলে ৭,৫০০ টাকা আয়ের স্থানে খরচ হইল ৮,১০০ টাকা (অর্থাৎ ৪,৫০০ × ৩৬০০ টাকা)। সুতরাং এখানে ক্ষতি হইল ৬০০ টাকা। এস্থলে Life assurance fundএ কিছু ত' আসিলই না, অধিকন্তু এই অতিরিক্ত খরচ পোষাইবার জন্য কোম্পানীর মূলধনের উপর টান পড়িল, এবং হিসাবের খাতায় জমা অপেক্ষা খরচই বেশী হইল। আমরা যে লাভের কাহিনী লিখিলাম তাহা বাস্তবিকই কাল্পনিক ; কারণ, এমন কোম্পানী খুব কমই দেখা যায়,যাহারা প্রথম valuationএ এই লাভ দেখাইয়া shareholder ও policyholderকে profit কিংবা bonus দিতে পারে। অন্ততঃ ১৫ বা ২০ বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে কোম্পানীর স্থায়িত্ব ও লাভের বিষয় স্থির নিশ্চয় হওয়া কঠিন। কারণ, অন্ততঃ একবার এক প্রস্ত পলিসী ম্যাচুর হইবার ফলে কি হয় দেখিতে না পাইলে কোম্পানীর ভিত (foundation) ভাল করিয়া বোঝা যায় না। এখানে দেখা যাইতেছে

কোম্পানীর কার্য্যকারিতা নির্ভর করিতেছে শুধু বীমাকারীর সংখ্যা ও চাঁদার হারের উপরই নহে, বীমাকারীর আয়ু ও স্বাস্থ্যের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। সেজন্য অবশ্য এজেন্ট ও ডাক্তার প্রধানতঃ দায়ী,তবে কোম্পানীকেও সর্ব্বদা বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এজেন্টগণ দক্ষতার সহিত স্বাস্থ্য হিসাবে normal persons দেরই জীবনবীমা করিতেছেন কিনা। কারণ অনেক সময়ে দেখা যায়, কাজের হিড়িকে অনেক এমন বীমাকারীর নাম কোম্পানীর খাতায় আসিয়া পড়িয়াছে। যাহাদের স্বাস্থ্য ও আয়ুর পরিমাণ মোটেই আশাপ্রদ নহে অন্ততঃ জীবনবীমার হিসাবে। এখানে জানা খুবই প্রয়োজন যে standard of healthy personsএর মাপকাটী ছোট করিলেই অসময়ে মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই বেশী হইবে। উপযুক্ত সংখ্যায় স্বাস্থ্যবান বীমাকারী,উপযুক্ত প্রীমিয়ম এবং ন্যায্য খরচের সুবন্দোবস্ত হইলে কোম্পানী সুনিশ্চিতভাবে লাভজনক দৃষ্ট হইবে। সেইজন্যই বলিতেছিলাম, কোম্পানীর কার্য্যকুশলতার প্রয়োজন ত' আছেই, অধিকন্তু এজেন্টগণেরও সততা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করা খুবই প্রয়োজন।

চিনির কারখানা

(মাঘ মাসে প্রকাশিতের পর)

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায়

ইক্ষুক্ষেত্রের আবাদ

যে জমিতে আখ দিতে হইবে তাহাতে আউস ধান্য ও পাট কাটিবার সময় হইতেই দেশী লাঙ্গল বা আধুনিক উন্নত প্রণালীর লাঙ্গল দিয়া চাষ দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। সুতরাং কার্ত্তিক হইতে চাষ আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক হইতে প্রতি মাসে দুইটি করিয়া হাল চাষ করিয়া প্রায় ১০।১২টি চাষ এবং ৫।৬টি মই দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রতি একরে ১৫০/০ হইতে ২০০/০ মণ গোবর ক্ষেত্রে দিয়া মই দ্বারা বিছাইয়া দিতে হইবে। এই সার বিছান কার্য্য অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে করিলেই ভাল হয়। এই সময়ে জমি হইতে সকল প্রকার জঙ্গল ও আগাছা (ঘাস ইত্যাদি) সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে।

দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে জমি ১০।১২ বার চাষ করিতে হয়। কিন্তু উন্নত প্রণালীর 'পাঞ্জাবী লাঙ্গল' দ্বারা দুই বার লম্বালম্বি ও দুইবার আড়াআড়ি ভাবে চাষ করিয়া "স্প্রীংটুথ হ্যারো" দ্বারা দুই বার এবং "জিগ্‌জ্যাগ-হ্যারো" দ্বারা দুই বার চাষ করিলে ও মই দিলেই সুন্দররূপে ক্ষেত্র চাষ হইয়া যায়।

জমীর মাটী লাল হইলে তাহাতে গোবর দিবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে একর প্রতি দশ মণ চূণ ছিটাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ঢাকা কৃষি কার্য্যে এইরূপ করা হয়।

উপরিউক্ত প্রকারে জমির আবাদ কার্য্য শেষ হইলে তাহাতে প্রতি ৩।৪' ফিট অন্তর সমান্তরাল ভাবে অন্ততঃ ৯" ইঞ্চি হইতে ১২" চওড়া এবং ৭" হইতে ৯" ইঞ্চি পর্য্যন্ত গভীর কতকগুলি নালা বা ড্রেইন সমুদয় ক্ষেত্রে কাটিতে হইবে। রিজিং প্লাউ' সাহায্যে এই কার্য্য সুচারুরূপে সহজে সম্পন্ন হয়। তৎপর নালাগুলির তলদেশস্থ মাটী কোদালী দ্বারা অন্ততঃ ৬" হইতে ৯" ইঞ্চি গভীর ভাবে মিহি করিয়া কোপাইয়া তন্মধ্যে একর প্রতি অন্ততঃ ৫০/০ মণ গোবর সার, পাঁচ মণ খইল, ১॥০ মণ হাড়চূর্ণ ছিটাইয়া কোদালী দ্বারা ভালরূপে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে হইবে।

এই প্রকারে আবাদ কার্য্য নবেম্বর বা অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হয়। তৎপর আখের ডগা প্রস্তুত হইলে ঐগুলি নালার মধ্যে দুই তিন ইঞ্চি মাটীর নীচে বসাইতে হইবে। এই সময়ে মাটিতে উত্তম রস বা 'পুস' না থাকিলে নালাগুলির ভিতরে যথেষ্ট জল সেচন করিয়া বা ঢালিয়া কাদা বা ভিজা মাটিতে ডগাগুলি বসাইলেই ভাল হয়। ইহাতে চারাগুলি সহজে বাহির হইতে পারে। যতদিন চারাগুলি বাহির না হয় ততদিন মাঝে মাঝে ঐরূপ জল দেওয়া বিধেয়।

সময় সময় দেখা যায় যে সবগুলি চারা জীবিত থাকে না। যদি কোন স্থানে বেশী ফাঁক পড়িয়া যায় - অথবা কোন চারা মরিয়া যায় তবে সেখানে নূতন চারা বা ডগা বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ডগা বা চারাগুলি বসাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ডগায় চোখগুলি মাটীর উপর এবং আখের নীচে চাপা পড়িয়া মাটীর উপর সমান্তরাল ভাবে প্রোথিত না হয়। চাপা পড়িলে সেই চোখগুলি হইতে চারা বাহির হয় না।

চারা বপন ও উৎপাদন সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞ বহুপ্রকার গবেষণা করিয়াছেন। চারাগুলিতে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া চোখ রাখিয়া দেওয়া হয়। চোখগুলি পর পর পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে। চারা দুই প্রকারে করা হয়। (ক) কেবল ডগা দ্বারা। (খ) সমুদয় আখ হইতে। সমুদয় আখ হইতে চারা প্রস্তুত করিবার সময়— প্রতি খণ্ডে তিন তিনটি করিয়া চোখ রাখা হয়। চোখগুলি সতেজ থাকিলে তাহা হইতে ভাল চারা জন্মে। ডগাগুলিতে ৩টি অথবা ৪টি করিয়াও চোখ থাকে।

কেহ বলেন কেবল ডগা হইতে যে চারা জন্মান হয়, তাহাই ভাল এবং তাহাদের প্রায় শতকরা ৯৫টি বাঁচিয়া থাকে। কাহারও মতে ডগা ব্যতীত ইক্ষুদেহ হইতে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে চারা প্রস্তুত হয় তাহাই চারার পক্ষে ভাল। যেহেতু ইক্ষুদেহ ডগা হইতে অধিকতর কঠিন ও শক্ত বলিয়া তজ্জাত চারাগুলিও যথেষ্ট বলবান হয় এবং অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করিয়া থাকে। কাহারও মতে ইক্ষুখণ্ডগুলি মাটিতে লাগাইবার সময় উহার একদিকের একটি চোখ মাটীর উপর এবং ইক্ষুদেহের নিম্নে রাখিয়া রোপণ করা উচিত; কারণ তিনটি চোখ হইতে তিনটি চারা না উঠাইয়া মাত্র একদিকের দুই প্রান্তের দুইটী চারা উঠাইলে তাহা আরও সতেজ ও বলবান হয় এবং তাহা হইলে ডেমী চারা (Tillering) অনেক বেশী হয়।

কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃষকগণ ইক্ষুদেহ জাত চারা হইতে ডগাজাত চারাগুলিই অধিক পছন্দ করে। আমি নিজেও যে কয়েকটি পরীক্ষা (Experiment) করিয়াছি তাহাতে ডগার বীজগুলিই উত্তম ফল দেখাইয়াছে। কিন্তু কৃষি বিভাগ সকল স্থানের চারাই প্রশংসা করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা উন্নত প্রণালীর কোইম্বাটোর ইক্ষু আবাদ প্রচার করিতে উভয়বিধ চারাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আখের রোপণ কার্য্য শেষ হইলে উহাদিগকে তদবস্থায় কিছুকাল থাকিতে দিতে হয়। বৃষ্টির জল না পাইলে এবং মাটী শুকাইয়া নীরস হইতেছে দৃষ্ট হইলে মাঝে মাঝে জল দিতে হইবে। যখন চারাগুলি বাহির হইয়া যায় এবং ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন নালার দুই পার্শ্বের মাটী অল্প অল্প করিয়া নামাইয়া ড্রেইনগুলি কতকাংশে ভরিয়া দেওয়া হয়। ঝুরা মাটী আলগাভাবে চারাগুলির গায় লাগিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে চারাগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঐগুলি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ড্রেনগুলিতে আরও মাটি দিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি পাইয়া চারাগুলি যখন বেশ বাড়িয়া উঠিবে তখন আর একবার একর প্রতি ৫/০ মণ খৈল ও ১৷৷০ দেড় মণ হাড়চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আখগুলির গোড়ায় উত্তমরূপে ছিটাইয়া দিয়া কোদালীর সাহায্যে মাটী দিয়া ড্রেনগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার শেষ ভাগে বৃষ্টি একটু কমিয়া মাটী একটু শুষ্ক হইলে ভরাট করা ড্রেনগুলির উপর ও ইক্ষুর গোড়ায় উঁচু করিয়া উত্তমরূপে মাটী দিতে হইবে এবং ঘাষ, আগাছা উঠিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। ইক্ষুর গোড়ায় উচু করিয়া মাটী দিবার সময় দুই লাইনের মধ্যবর্ত্তী ফাঁক জায়গা হইতে মাটী খুড়িয়া দিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী নালা ভরিয়া উচু 'ভিলি' বা 'আইল' বা 'বাঁধ' হইবে আর যেখানে পূর্ব্বে 'ভিলি' ছিল সেখানে 'ড্রেন' হইবে। এই ড্রেণগুলির সাহায্যে বর্ষার জল যাহাতে উত্তমরূপে ক্ষেত্রের বাহির হইয়া যায়, ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে তদ্রূপ জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জল আটক পড়িলে ইক্ষু নষ্ট হইতে পারে।

এই সময়ে ইক্ষুর গায় অনেক পাতা জন্মিয়া এবং প্রত্যেক চারার পার্শ্ব হইতে আরও বহু সংখ্যক 'ডেমী' গাছ জন্মাইয়া বৃহৎ ঝোপের সৃষ্টি করে। শেষ মাটী দিবার পর 'যো বুঝিয়া ইক্ষুর ঐ পাতাগুলি উত্তমরূপে ঐ ঝোপের ইক্ষুর চতুর্দ্দিকে বাঁধিয়া দিতে হইবে কিম্বা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

পাতা ঝাড়ন

পাতা ঝাড়ন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ আছে। কাহারও মতে পাতা না ঝাড়িয়া ইক্ষুর গাত্রে বাঁধিয়া দেওয়াই ভাল। তাহাতে ইক্ষুগুলি পরস্পর বাঁধা থাকায় ঝড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তাহাতে শৃগালাদির উপদ্রবও কম থাকে এবং গ্রন্থী হইতে গেঁজ বা ডেমী ও শিকড় কম হইয়া থাকে। কিন্তু কাহারও মতে ঐ প্রথা উত্তম নহে। যেহেতু আখগুলি পাতা দ্বারা ঢাকা থাকিলে তাহাতে আলো বাতাস লাগিতে পারে না—সুতরাং তাহার মিষ্টতা ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় না, অপিচ পত্রাদি আবর্জ্জনা দ্বারা বেশীদিন আখগুলি ঢাকা থাকায় পোকা মাকড় এবং ইক্ষুকীট তন্মধ্যে বাসা বাঁধে এবং

কৃষকের দৃষ্টির অগোচরে আখগুলি আক্রমণ করিয়া নষ্ট করে। আমাদের এতদ্দেশে বিহার ও ইউ, পি প্রদেশের তুলনায় ঝড়ের উপদ্রব বেশী বলিয়া আখগুলি বাঁধিয়া রাখা অন্যায় নহে। তবে এখানে পাতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্তও অপ্রচুর নহে। কৃষি-বিভাগ সমূহে সাধারণতঃ শেষোক্ত প্রথাই প্রচলিত।

বন্যাবাদল বা "কেতনের" সময় আখগুলি যাহাতে মাটীতে পড়িয়া না যায় তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ মাটীতে পড়া আখে শর্করা অংশ কমিয়া যায় এবং তাহাতে অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়।

ইক্ষুর বীজ প্রস্তুত

ইক্ষুর বীজ নিম্নলিখিত প্রকারে প্রস্তুত হয়—

১। ফুলবান ইক্ষুর বীজ হইতে ইক্ষুর চারা জন্মান যায়।

২। ইক্ষুর কর্ত্তিত ডগা হইতে।

৩। ইক্ষুর সমুদয় দেহ হইতে।

ইক্ষুর বীজ হইতে চারা জন্মান বড়ই কঠিন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একটি মাত্র ইক্ষুজাত বীজ হইতে সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষাগারে বা ক্ষেত্রে উপ্ত বীচি হইতে যে সকল চারা জন্মান গিয়াছে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে। (১) কোনটা বেশ সতেজ, সরল, অল্প গ্রন্থিযুক্ত, রক্তিম বর্ণ-বিশিষ্ট। (২) কোনটা দুর্ব্বল, বক্র, গ্রন্থি-বহুল, ভিন্ন বর্ণের। (৩) কোনটা লতান এবং গ্রন্থিহীন। (৪) কোনটা জঙ্গলজাতীয়। সুতরাং বীচি হইতে বীজ জন্মান সাধারণের কার্য্য নহে। কেবল মাত্র কৃষি বিভাগে উহা চলিতে পারে।

বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে চারা সংগৃহীত বা প্রস্তুত হয়।

ক্রমশঃ)

ভিক্ষাবৃত্তির লোপসাধন
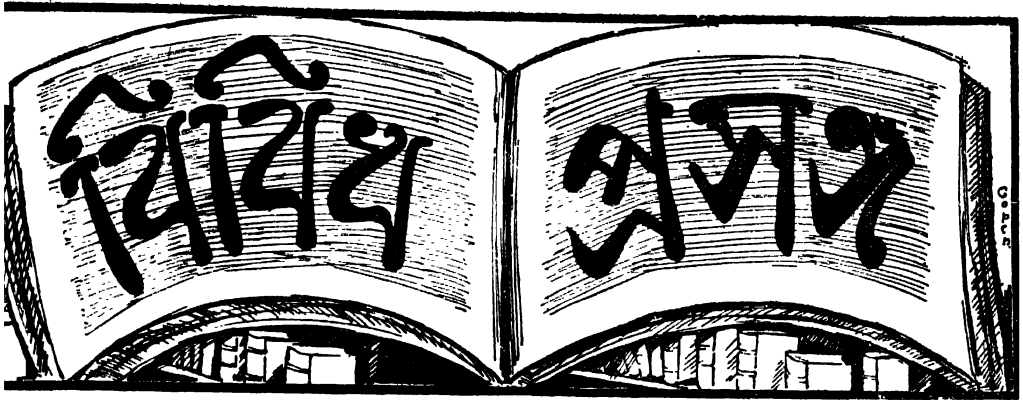
সময়ের গতি অনুসারে দাতব্য করিতে হয়। মহানুভব যাঁহারা পরোপকারকে জীবনের মহৎ ব্রত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও দাতব্য সম্পর্কে একটা নিয়ম পালন করিয়া চলা উচিৎ। গভর্ণমেণ্ট যতদিন ভিক্ষুকদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত আইন করিয়া এই বৃত্তি উঠাইয়া দিবার চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। নিজামের রাজ্যে এই সম্বন্ধে বিলের যে খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মুখবন্ধনা উপরে উল্লিখিত হইল। বলাবাহুল্য, ভারতে এই ধরণের প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রথম নিজামের রাজ্যেই আরম্ভ হইল।

ভিক্ষুকের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি রাস্তায়, লেনে অথবা দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা চাহিয়া থাকে, কিংবা যদি কেহ কর্ম্মবহুল স্থলে বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া কোন লোককে কিছু দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ভিক্ষুক বলা যাইবে। ধর্ম্ম-গুরু কিংবা মিশনারীর বাড়ী ব্যতীত অন্যত্র একই উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেও তাহাকে উপরোক্ত সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইবে।

দরিদ্রালয়

একটী সাধারণ কমিটি নিযুক্ত হইবে, তাহাতে মিউনিসিপ্যাল্ কমিটীর মেম্বর, কিংবা লোকাল বোর্ড হইতে মনোনীত সাব কমিটি স্থানে স্থানে দরিদ্রালয় স্থাপন করিবেন। তাহাদের কাজ হইবে ভিক্ষুকদের জন্য আহার, বাসস্থান, শারীরিক ব্যায়াম, ব্যবসা ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা। যদি জনসাধারণ কোনপ্রকার দরিদ্রালয় স্থাপন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কমিটি উহা সাহায্য করিতে কিংবা নিজেদের বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন।

কমিটি প্রত্যেক দরিদ্রালয়ের জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন; এবং তাহাদের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা কি তাহাও বুঝাইয়া দিবেন।

প্রত্যেক দরিদ্রালয়ে, নিম্নলিখিত বন্দোবস্ত থাকিবে :—

(১) ভিক্ষুকদের আহার্য্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত।

(২) তাহাদের স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখা।

(৩) হাতের এবং মেকানিক্যাল কাজের শিক্ষা দেওয়া।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যা।

প্রত্যেক ভিক্ষুক কিংবা যাহার কোনপ্রকার সহায়ক নাই, সে এই দরিদ্রালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। তবে প্রবেশকালে তাহাকে একটী সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হইবে, যে, সে দরিদ্রালয়ের সমস্ত নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

ত্যাগ করিবার অনুমতি

যদি ফৌজদারী নিজাম (স্থানীয় ফৌজদারী বিচারক) কোন ভিক্ষুককে দরিদ্রালয়ে পাঠাইয়া থাকে তাহা হইলে সে চুক্তিকাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে থাকিতে বাধ্য হইবে। এই সময় অতীত হইলে ফৌজদারী নিজাম অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুকটি স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী হইয়াছে কিনা!

যদি কোন ভিক্ষুক দরিদ্রালয়ের নিয়মসমূহ পালন না করে কিংবা চুক্তিকাল অতীত না হইতেই পালাইয়া যায়, তাহা হইলে সে বন্দী হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে।

জেনারেল কমিটি দরিদ্রালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সাধারণের কাছ হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই আইন যাহাতে ভঙ্গ না হয়, সেজন্য জেনারেল কমিটি বিশিষ্ট অফিসার কিংবা গভর্ণমেণ্টের গেজেটেড অফিসার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই বিল প্রকাশিত হইবার ছয় মাস পর হইতেই এই আইন সমস্ত মিউনিসিপ্যাল সহরগুলিতে প্রযোজ্য হইবে। তবে গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধ করিলে ইহা রাজ্যের অন্যান্য স্থলে পরে করিতে পারিবেন।

ল্যাঙ্কাশায়ার বনাম জাপান

ট্যারিফ্ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জন মাথাই বোম্বাই ইউরোপীয়ান চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধির কাছে বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে যে সম্পর্কই বিদ্যমান থাকুক না কেন, জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম ল্যাঙ্কাশায়ারের জন্য ভারতীয় ট্যাক্স-দাতা ও ক্রেতাকে দায়ী করিলে চলিবে না।"

সাম্রাজ্যিক সুবিধানীতির (Imperial preference) সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছিলেন, "১৯৩০ সনে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লি' যখন আপেক্ষিক শুল্ক (Preferential duty) নির্দ্ধারণ করেন, তখন ল্যাঙ্কাশায়ারকে ভারতের বাজারে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ার আদৌ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই আজ ভারতীয় ক্রেতার কথা ভাবিতে হইতেছে। যদি আপেক্ষিক শুল্কের সুবিধা ল্যাঙ্কাশায়ার গ্রহণ করিতে না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতার ঘাড়ে সিন্ধবাদের কাঁধের বোঝার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইবে। জাপানী মাল পত্রের দাম যেমন ভাবে কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, যে ৬ পার্সেণ্টের পরিবর্ত্তে যদি ২০ পার্সেণ্ট করিয়াও সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলেও ল্যাঙ্কাশায়ার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। আপেক্ষিক শুল্কের উদ্দেশ্য যাহ, তাহা আর কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না।

প্রেসিডেণ্ট সর্ব্বশেষে বলিয়াছিলেন যে আমার সমস্ত যুক্তিতর্কের ভিত্তি এই, যে, জাপান এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের মালপত্রের মূল্যের পার্থক্য ২০ পার্সেণ্টের মত হইবে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ও ফটোগ্রাফি

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফটোগ্রাফ তোলার নানা প্রকার বিপদ আছে, যেমন, উত্তাপ, আদ্র্রতা, অল্প জল, পোকামাকড় প্রভৃতি। ফটোগ্রাফের মালমসলা ছাপ-উন্মুখ (Sensitive) হইয়া থাকিলে উহা যে সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সে কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। কাজেই container খোলা হইয়া গেলেই অবিলম্বে ফিল্ম কিংবা কাগজ লাগাইতে হইবে।

ছাপ-সংযুক্ত (exposed) ফিল্মকে টিনের মধ্যে প্যাক্ করিয়া রাখিতে নাই; যদি উহার একপার্শ্ব ফুটা করিয়া হাওয়া চলাচল করিবার বন্দোবস্ত থাকে, তবেই উহা করিবে, নতুবা নহে। ছাপ লওয়া হইয়া গেলে ফটো ডেভেলপ্ করিতে বেশী দেরী করিও না; কেন না, ক্যামেরাতে থাকিবার সময় spool paper আদ্র্রভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ছাপ-উন্মুখ ফিল্মের উপর ইহার প্রভাব ভাল নহে।

Dish development করিতে হইলে ফিল্মটীর প্রত্যেক পার্শ্ব ক্লিপ দিয়া আটকাইয়া লইতে হইবে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফটোগ্রাফী কাজের জন্য ব্যবহৃত প্রত্যেক সলিউসনটিকে যথাসম্ভব কাছে রাখিবে। এবং অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কাজ সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে। কাজ খারাপ হইয়া গেলে pre-hardening bath লাগানো চলিতে পারিবে। উহা নিম্ন-লিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়:—

Sodium Sulphate	৪ আউন্স
Chrome Alum	১ „
জল	৩০ „

ফিল্মকে এক মিনিটের জন্য এই সলিউসনে সিক্ত করিয়া তুলিতে হইবে; তারপরে তাড়াতাড়ি ডেভেলপ্ করিতে হইবে। এই কার্য্য ২।৩ মিনিট ধরিয়া চলিবে, অবশ্য উত্তাপ বুঝিয়া। তারপরে উহাকে পরিস্কার করিয়া নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত hardening fixing bath এ ভিজাইয়া লইতে হইবে:—

জল	১ পাইণ্ট
Hypo	৫ আউন্স
Pot. Metabisulphite	৬০ গ্রেণ
Chrome Alum	অর্দ্ধ আউন্স

যাহাতে একটী রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত না হইবার পূর্ব্বে অপরটি উহার সঙ্গে মিশাইয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। ছাপ তাড়াতাড়ি উঠাইবার জন্য ফিল্মে সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিবে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া একটানা ভাবে ধৌত করার চেয়ে কয়েকবার সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাই শ্রেয়ঃ। যদি জিলাটিন খুব নরম না হয়, তাহা হইলে নিংড়ানো শ্যাময় লেদার দিয়া ফিল্মের আর্দ্রতা দূরীভূত করিবে এবং সম্ভব হইলে উহা তাড়াতাড়ি শুকাইবার জন্য পাখা ব্যবহার করিবে। অনেক পোকামাকড় জিলাটিনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; কাজেই উহাদের দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারী ব্যবহার করা দরকার হইয়া পড়িতে পারে। অনেক সময় একবারেই সম্পূর্ণ ফিল্ম ধৌত করা সম্ভবপর হয় না; তখন "সাময়িকভাবে" আংশিকরূপে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করাই ভাল। নেগেটিভ-গুলিকে স্থায়ী করিবার জন্য ধৌত করার কাজ খুব তাড়াতাড়িতেই সমাপ্ত করিতে হইবে; কেন না, ঐ সময়ে নেগেটিভগুলি কার্য্যের অনুকূল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে।

ছাপ তুলিবার কাগজগুলিকে 'Tropically packed' অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। তবে সলিউসনগুলির তাপ যাহাতে ঠিক অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য বরফ ব্যবহার করা দরকার। নতুবা ডেভেলপ্ করিবার সময় কাগজে দাগ পড়িয়া যাইতে পারে। ডেভেলপ্ করা ও ছাপাইবার (fixing) মাঝখানে তাড়াতাড়ি ডিস ধৌত করা উত্তম, প্রবাহমান জলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শুকাইবার পূর্ব্বে উহার আর্দ্রতা মুছিয়া ফেলিতে হইবে।

গ্লাস কার্ট্রিজ এবং প্যাকেটে করিয়া ডেভেলপার পাওয়া যায়। তরল সলিউসনের চেয়ে জমানো সলিউসনও ভাল থাকে। ছিপির (cork) চেয়ে ষ্টপার ভাল এবং যে বোতলটী সলিউসনে পূর্ণ থাকে তাহা অর্দ্ধশূণ্য শিশির চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিবে।

সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত কাজ শেষ করিতে চেষ্টা করিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেগেটিভ ও ছাপাই নাড়াচাড়া করিবে না। একটী ছিদ্রবহুল পত্রকে ভিজা কাপড় দিয়া জড়াইয়া দিলেই উহার মধ্যে ফটোর মালমসলা বেশ নিরাপদে থাকিবে। সেপিয়া-টোন্ প্রিন্টিং প্রায় চিরস্থায়ী হয় এবং পেষ্টের চেয়ে ড্রাই-মাউন্টিং-ই প্রার্থনীয়। এক্সপোজ লওয়া ফিল্মকে জমাইয়া না রাখিয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলাই ভাল।

কলিকাতার বাজারদর

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল

টাকশালের বার প্রতি ভরি	২৯৸৶০
বড়ালের „	২৯৸/০
চিনাপাত „	৩১৷৹
রূপা প্রতি ১০০ পাইকারী	৫৬৸/
ঐ খুচরা	৫৬৸/০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স, ২৮নং লা সায়ালো লেন কলিকাতা।

চাউল

দাদখানি	৭৸০	হইতে	৮৲
কাটারি ভোগ			৫৲
বাদসা ভোগ	৪৸০	„	৪৸৹
মাজাবাঁকাতুলসী (সরেস)	৪৸৹	„	৫৸৹
ঐ কোরা	৪৲	„	৫৷০
ঐ আতপ	৪৸০	„	৫৲
ভাসা মাণিক			৩৸৹
নাগরা অথবা ঝিঙ্গাশাল			৩৸০
পাটনাই (সরেস)	৩৷০	„	৩৸০
ছাটা বালাম			৪৷০
ছাচি মোটা			২৸৶০

বঙ্গলক্ষ্মী চাউলের আড়ৎ, ৩নং মহেন্দ্র সরকার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা ও ৪'৮।১ নং রাসবিহারী এভিনিউ

আটা ও ময়দা

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

প্রতি মণ

পেটেণ্ট ময়দা	৫॥৶০	হইতে	৫৸০
সুপার ফাইন	৫।৶০	„	৫॥০
হাউস হোল্ড	৫৲	„	৫৶০
সুজী	৫।৶০	„	৫॥০
আটা 'বি'	৫৶০	„	৫।০
আটা ২নং	৪৸০	„	৪৸৶০
আটা 'এস'	৪॥৶০	„	৪৸০
আটা ক	৪৶০	„	৪।০
আটা ৩নং	৩৸০	„	৩৸৶০
পোলার্ড	২৸/০	„	২৸৶০
ব্রান	২৸০	„	২৸/০

এই সকল ইউরোপীয়ান পরিচালিত মিল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যেরই দর দেওয়া হইল।

কাশিম ও ইস্মাইল, ময়দার দোকান ৫।২ গাষ্টিন প্লেস, কলিকাতা।

ঘৃত

কলিকাতা, ১৪ই এপ্রিল

প্রতি মণ

শ্রী—	৫১৲
ভারতী—	৪৬৲
খুরজা—	৪৪৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪০৲
বাদাসাগর—	৩৫৲
দেশলক্ষ্মী—	৪০/

শ্রীঅশোক চন্দ্র রক্ষিত লিঃ, ২৬নং কটন ষ্ট্রীট ফোন ৭১১ বড়বাজার

চিনি

সুখচর	দোবরা	চিনি	১৮।৫
„	একবরা	„	১৬৶০
„	পেতে	„	১৪॥৫
চাফেরা			„
কোটচাঁদপুর দোবরা		„	১৮৲৫
„	একবরা	„	১৬/৫
আকড়া বা দুলুয়া			১০৲৫
গোঁড়	৮।৫		৮॥৫
শান্তিপুর দুলুয়া			১১৲৫
„	গোড়	„	৮॥ঃ
মুন্সিগঞ্জ দলুলা		„	১১॥৫
	মধ্যম আকড়া	„	১০৲৫
„	চাঁদি গোড়	„	৯॥০
„	কমালালি	„	৮।৫

কানপুর চিনি

কানপুর দানাদার	১নং	„	১০॥৶০
„	২নং	১০৲	১০৶০
„	৩নং	„	৯৸০
পিটি	১নং	„	১০।০
„	২নং	„	১০৶০
„	৩নং	„	১০৲
ছাঁচি ইক্ষুজাত			১১৲
কাশীর চিনি			১১৸০, ১১।০

যতীন্দ্রনাথ দাঁ।

ধাতু ও রং

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

ব্লক টিন বা রাং	১২৬৸৶০	প্রতি হন্দর
তামার ইনগট	৩১৸৶০	„
সীসার বাট বি এম, ছাপ	১২/০	„

এ্যান্টিমণি	২৮৷৵০	"
ফসফর ব্রাঞ্জ নগট	৯৮৷৷০	"
পিতলের চাদর	৩৭৸৵০	"
পিতলের ছড়	৩৪৶১	"
তামার চাদর	৫৮৷৵৫	"
তামার ছড়	৫১৷৷০	"
সীসার চাদর	১৮৸০	"
দস্তার টালী আমদানী	১৪৷৷০	"
ঐ দেশীয়	১৩৷০	"
সাদা দস্তা রং	৩৪৸০	"
সাদা সীসা রং	২৪৷৵০	"
সবুজ রং	২৫৵০	"
লাল রং	২৫৷৷০	
তারপিন তৈল	১৭৷০	প্রতি ড াম
তিসির তৈল [পাকা]	৮৸০	
ঐ [কাঁচা]	৮৵০	
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭৷৷৵০	প্রতি টন
ঐ আমদানী	৯৷০	প্রতিপিপা

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬।এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন নং ৬৬৪ কলিকাতা

করগেট ও লোহা

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

টাটা—	প্রতি হন্দর
কড়ি মার্কা ৪৸৵০ হইতে	৫৸০
ঐ বে-মার্কা ৪৲ "	৪৸০
বরগা ৫৷৷০ "	৫৸৵০
এঞ্জেল ৫৶০ "	৫৷৷৵০
বল্ট (আধ ইঞ্চি ও উর্দ্ধ)	৫৷৷৵০ হইতে ৫৸৵০

গরাদে ঐ	৫৸০	" ৬৲
ব্ল্যাক সিট ও প্লেট	৫৸০	" ১১৷০
করগেট টিন (২২ গেজ)	১১৷৷০ হইতে	১৩৸০
" (২৪ গেজ)	১০৸০ "	১১৷৷০
গ্যালভেনাইজড্ চাদর (২৪ গজ)	১১৷৷০—১৩৲	

কন্টিন্যাণ্টাল :— প্রতি হন্দর

গোল রড (৩ সূতা ও নিম্ন)	৪৷০ হইতে	৫৲
টানা রড ঐ	৪৷৷০	৬৲
করগেট টিন (২৬ গেজ)	১২৷৷০ হইতে	১৪৷৷০
গ্যালভেনাইজড্ চাদর (২৬ গেজ	১১৷৷০—১৩৷৷০	
কাঁটা তার	৯৷৷০—১১৲	

কন্টিন্যাণ্টাল অন্যান্য দ্রব্যের দর টাটার দরের সমান।

ইংলিশ— প্রতি হন্দর

টাটার বৃটিশ মালের সমান মাল ও বৃটিশ মালের দাম উপরোক্ত মালের দর অপেক্ষা হন্দর করা ২৲ হইতে ৩৲ টাকা অধিক।

করগেট—

আর, পি, ডি (২৪ গেজ) ১২৷০—১৩৷৷০

কুবের লিমিটেড, লৌহ ও ষ্টীল বিভাগ ৮৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা টেলিফোন নং কলিকাতা ৫৯৪৫।

কলিকাতা ১৪ই এপ্রিল

করগেট চাদর ২২ গেজ	১১৸০	হন্দর	
" ২৪ "	১০৸৶১৫		
" ২৬ "	১৩৵০		
জয়েষ্ট বা কড়ি	৪৷৷০	৬৷৷০	
টী বা বরগা	৫৶০	৬৵০	
এঞ্জেল	৪৵০	৬৸৵০	
বোল্ট [গোল]	৪৵০	৭৵০	
" [চৌকা]	৪৷৷৵০	৭৷৵০	
কাঁটা তার		১১৷৶১৫	

মটকা ৷৷০ হইতে ১১৷৶০ প্রত্যেকটী

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
৮৬এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন, কলিকাতা ৬৬৪

দুনিয়ার কথা

আমেরিকায় শ্রমিকদের শতকরা ৩৭ জন স্ত্রীলোক, ইহাদের মধ্যে বিবাহিতার সংখ্যা ৪০ লক্ষ।

* * *

ভবিষ্যতে মানুষ চিনিবার সুবিধার জন্য আমেরিকার বহু হাসপাতালে তথাকার প্রসূত শিশুদের পায়ের গোড়ালির ছাপ রাখা হইতেছে।

* * *

আক মাড়াইবার পর ছিবড়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া তাহা হইতে নাইট্রিক এসিড ও উৎকৃষ্ট নকল সিল্ক প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা মোজা তৈরীর চেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রে চলিতেছে।

* * *

ঋণের দায়ে এবং জরিমানা আদায়ে লোককে জেলে পাঠান উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে হাউস অব লর্ডসে লর্ড স্নেল ঘোষণা করেন যে, স্ত্রী-পুত্রকে ভরণ পোষণ করিবার টাকা না দিতে পারায় ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর সাত হাজার লোককে জেলে যাইতে হয়।

* * *

লণ্ডন ভূগর্ভস্থ রেলে সম্প্রতি মাসিক টিকিট বিক্রয়ের যে কল বাহির হইয়াছে তাহাতে টিকিটে তারিখ ছাপা, টাকা বা নোট মেকি ধরা এবং উহাদের ভাঙ্গানি ফেরৎ দেওয়া সবই যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

* * *

লণ্ডন ক্লাবের মহিলা সদস্যগণকে গৃহস্থালী, পরিবেশন, বাড়ীঘর তৈরী খবরের কাগজের কাজ শিক্ষা করিতে হয়।

* * *

লণ্ডন সহরে যে সমস্ত লোক রাস্তায় ফেরী করে তাহাদের সংখ্যা ৩০ হাজার, ইহাদের মধ্যে ৭ শত লোকশুধু স্যান্ডুইচ বিক্রী করে।

* * *

ডেনমার্কেশ্বর দশম ক্রিশ্চিয়ান বর্ত্তমান নৃপতি মণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। তাঁহার দৈর্ঘ্য ৬ ফিট ৬ ইঞ্চি। তাহা ব্যতীত ইহার আর একটী গুণ আছে। ইনি ৫টি ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারেন।

* * *

সমস্ত ট্যাঙ্গনিকা সহর ইন্দুরের দৌরাত্ম্যে ধ্বংস হইয়াছে। ইন্দুর দল প্রথমে কার্পাস ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহার পর সহর। অবশেষে সহরবাসীরা নিরুপায় হইয়া সহর ত্যাগ করিয়াছে।

* * *

বৃটিশ যুবরাজের একখানি মোটর গাড়ীতে বেতার যন্ত্র সংযুক্ত আছে। যখন ইচ্ছা তিনি এই গাড়ীতে ভ্রমণ করিতে করিতে বেতারের গান শুনিতে পান এবং তাঁহার চালকেরও ইহা শ্রবণের ব্যবস্থা আছে।